নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

একবিংশ খণ্ড—১৩১০

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible]ন টাকা মাত্র।

All rights reserved.

একবিংশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী।

নব্যভার

১। অন্তর্ধান। (পদ্য) (শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম-এ, সি-এস) ... ... ৫৬(ক)
২। অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। (শ্রীকিশোরীমোহন রায়) ৫৩১
৩। অর্থ ও নীতি। (সম্পাদক) ৬৫৭
৪। আমি কে? (শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার) ... ১৮৪
৫। আশিস। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ... ৬৩
৬। আমাদের ভিতর ও বাহির। (শ্রীধর্ম্মানন্দ ম[illegible] ... ৪০০
৭। ইংরাজ রাজত্বে ভারতের শিক্ষা। (শ্রীউমেশ[illegible] মৈত্র) ৪৫, ৭৬, ১৬৮, ৩১৯
৮। ইংলণ্ড। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ৩৮২
৯। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য কি কল্পনা? (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ৪২
০। উত্তরাখণ্ড। (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) ৫৯
১। উপনিষদের উপদেশ। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ৬৪, ২০৭, ২৪৩, ৩৯৮, ৩৯৮, ৪৯৫; ৬২৬
২। উত্তরা। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ৪৮৫
৩। উদ্বেগে। (পদ্য) (শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী) ৪২০
৪। উপনিষদ গ্রন্থাবলী। (শ্রীশশধর রায়) ৫৭১, ৬১০
৫। কবিবর হেমচন্দ্র। (শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, বি-এল) ৬৩৬
৬। কপালে আগুন। (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) ৩৭৩
৭। কর্ত্তব্য। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ৫৩০
৮। কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত) ৩০, ২১০, ৪০৫, ৫৪০
৯। কয়লার খনি। (শ্রীএম, এন, রায়) ৬৭, ৪২৩
০। কলিকা ও ফুল। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ৬০২
১। কাপুরুষতা। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত, এল, এম, এস) ৫৭
২। কান্না—অভিমান। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ৩৭১
৩। কি চাহিব আর? (পদ্য) (শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী) ৪৩
। কুচবিহারে সাহিত্য চর্চ্চা। (শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ) ৫৭৫
। চট্টগ্রামে মহামুনির মেলা। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ... ২৪
। চন্দনা। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ১৫৫
। চণ্ডীদাস। (শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল) ৫৭৯, ৬৬১
। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনচরিত। (শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী) ... ১৯৮
। জগৎকিশোর ও জিতেন্দ্রকিশোর। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ... ৬৫০
। জুতা ও গুঁতা। (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) ২৫২
। ত্রিকলিঙ্গ। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ৩৪৫
। দিল্লি মহোৎসব কাব্য। (শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, এম-এ) ৬৩৫
। দীপ্ত শিরায় দাহন। (সম্পাদক) ৬০২
। দেবীসূক্ত। (শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এল) ৪২১
। দেহ। (শ্রীহরসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বি-এল)... ... ... ৩৮৩
। দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তা। (শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস) ৩২৯
। দোলপূর্ণিমা। (পদ্য) (শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ) ৬৬১
। ধর্ম্মজীবন গঠনে সহানুভূতি ও সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা। (শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়) [illegible]
। নবযুগ। (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী) ... ... [illegible]
। নিবেদন। (পদ্য) শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ... ... [illegible]
। নিশীথে। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ... [illegible]
। পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ। (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) ... ... [illegible]
। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি) ... ... [illegible]
। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে জন্মান্তরবাদ। (শ্রীআশুতোষ দেব, এম-এ) [illegible]
। ঐ ঐ (প্রতিবাদ) (শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র) [illegible]
। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ... ৫৫, ১২৯, ২৫২, ৩১৮, [illegible]
। পৃথিবীর গতি। ([illegible] রায়, বি-এ) ... [illegible]
। পুরাতন ও নূতন। (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ... [illegible]
। পুনর্জন্ম। ([illegible] সেন, Bar-at-law) [illegible]
। বসন্তে বিরহ। (পদ্য) ([illegible] মিত্র, [illegible]) [illegible]

৫১। বনপথে। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ... ...
৫২। বারুণী স্নান। (শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী) .. ...
৫৩। বিশ্বামিত্র। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ...
৫৪। বিশ্ব-সঙ্গীত। (শ্রীপ্রমথনাথ রায়, বি-এল) ... ...
৫৫। বিদায়। (পদ্য) (শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ) ... ...
৫৬। বেদমাতা সবিতা দেবীর প্রতি। (পদ্য) (স্বামী কেশবানন্দ) ...
৫৭। ভক্তিবিচার। (শ্রীকৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ) ... ...
৫৮। ভারতের অন্ধ ও মূকবধির। (শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রাহা) ... ...
৫৯। ভাইফোঁটা। (পদ্য) (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার) ... ...
৬০। মগধেশ্বরী। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ... ...
৬১। মনুবাক্য ও শঙ্করাচার্য্য। (শ্রীজয়চন্দ্র দাস) ... ...
৬২। মনুষ্য—পরলোকে। (শ্রীআশুতোষ দেব, এম-এ) ... ...
৬৩। মহানুভব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর। (শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ...
৬৪। মহাভারতীর জুতা ও গুঁতা। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ...
৬৫। মহাভারতীর কপালে আগুন। (ঐ ঐ) ... ...
৬৬। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। (শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এল) ১১৮,
৬৭। মায়াবাদ পরীক্ষা। (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ, এম-এ, বি-এল)... ...
৬৮। মেনকার খেদ। (পদ্য) (শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক) ... ...
৬৯। মৌর্য্যবংশের ইতিহাস। (শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ) ...
৭০। রাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্ররত্ন। ... ...
৭১। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড কি প্রক্ষিপ্ত? (শ্রীকুমুদকান্ত বসু, বি-এল) ...
৭২। ঐ ঐ প্রতিবাদ। (শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী) ..
৭৩। রামায়ণের কেন্দ্র-কৌশল। (শ্রীকুমুদকান্ত বসু, বি-এল) ... ...
৭৪। রাজসিংহ। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি) ... ...
৭৫। রাজর্ষি কালীনারায়ণ। (সম্পাদক) ... ...
৭৬। শঙ্করাচার্য্য। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ...
৭৭। শকুন্তলায় উপদেশ। (শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস) ... ...
৭৮। শাস্ত্রীয় বিধি ও বর্ত্তমান সমাজ। (শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী) ... ...
৭৯। শ্রাবণ। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ... ...
৮০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। (শ্রীম-কথিত) .. ..
৮১। শ্রীমদ্দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর। (৺ভক্তিনিধি হারাধন দত্ত) ... ...
৮২। সন্ন্যাসী। (পদ্য) (শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী) ... ...
৮৩। সমাজ ও তাহার আদর্শ। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ বি-এল) ১৩৬,১৪৩, ২৩৩,৩৩৩,৩৯১,৪৭১,৫৫৯,
৮৪। সুরারাণী। (পদ্য) (শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী) ... ...
৮৫। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত বিচার। (শ্রীমহেশচন্দ্র সেন) ... ...
৮৬। সেবা। (সম্পাদক) ... ...
৮৭। স্বর্গীয় সরলা দাস, বি-এ। (শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত) ..
৮৮। সাধ্বী শবরী। (শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ) ... ..
৮৯। স্বেচ্ছাচারিতার যুগ। (সম্পাদক) ... ...
৯০। স্রষ্টা ও সৃষ্টি। (শ্রীজয়চন্দ্র দাস) ... .
৯১। হিতৈষী দল—টাকা ও যশ মানের কুহকে। (সম্পাদক) ... ...
৯২। হেরড সাহেবের হাকিমী। (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) ... ...
৯৩। হেমচন্দ্র শ্মশানে। (পদ্য) (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ... ...
৯৪। হেমচন্দ্র। (১) (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ... ...
৯৫। হেমচন্দ্র। (পদ্য) (শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়) ... ...
৯৬। হেমচন্দ্র। (পদ্য) (শ্রীবঙ্কিমবিহারী বসু) ... ...
৯৭। হেমচন্দ্র। (পদ্য) (শ্রীজগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) ... ...
৯৮। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীনগেন্দ্রবালা সরস্বতী, শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীবিজয়কুমার সেন, শ্রীসর্ব্বানন্দ, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী, শ্রীগয়াপ্রসাদ গিরি ও শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ৭৩, ২১৯,

নব্যভারত

একবিংশ খণ্ড।

সেবা।

"You have need of your brother men at every step and cannot satisfy the simplest wants of your existence without aiding yourself by their work."

"Your task is to found the Universal Family, to build up the City of God, and unremittingly to labour towards the active progressive fulfilment of His great work in Humanity."

Joseph Mazzini.

এক মহারাজা পিতৃশ্রাদ্ধে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এত টাকা ব্যয় করায় তাঁহার মনে কিছু আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বোধ হয় এইরূপ কার্য্যে এদেশে এত টাকা আর কেহ ব্যয় করে নাই!" মন্ত্রী বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি, প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনার চেয়েও এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এদেশে আছে। আপনার ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ, চারি লক্ষ টাকায় তাহার কিছুই আসিয়া যায় নাই;—ভাণ্ডার ধনে পূর্ণই রহিয়াছে। কিন্তু অমুক ব্যক্তি তাহার মাতার মাতৃশ্রাদ্ধে বাড়ী ঘর, ঘটী বাটী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কাঙ্গালীভোজন করাইয়া ফকীর হইয়াছিল।" মহারাজ সেবাধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া লজ্জায় [illegible] হইয়াছিলেন।

মহাত্মা শ্রীচৈতন্য [illegible] "[illegible] [illegible]

বিধাতার মূর্ত্তি কেহ দেখে নাই, তাঁহার প্রকট রূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে—জীব-জগতে পরিস্ফুট; জীবের প্রতি যাহার দয়া নাই, বিধাতার উপর তাহার আস্থা নাই, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম কল্পনা এবং জল্পনা মাত্র। জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানব। মানব-জন্ম লাভ করিয়া মানব-ঘৃণা যে পোষণ করে, সে আর যাহা হয় হউক, কিন্তু সে নরকের কীট। তুমি মানুষ, তুমি পশু পক্ষীর প্রতি দয়াবান হইতে না পার, কিন্তু তোমার দুঃখী পাড়া-প্রতিবেশী দরিদ্র কাঙ্গালদিগের মঙ্গল-চিন্তাও কি মনে স্থান দিতে পার না? উহাদের স্বার্থের সহিত তোমার স্বার্থ যে বিজড়িত, তাহা কি জান না? তোমার ছেলে মেয়েকে [illegible] উহাদিগকেও [illegible] করিতে হইবে। [illegible] তুমি [illegible]

৫১। বনপথে। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চে
৫২। বারুণী স্নান। (শ্রীঅচ্যুতচরণ চে
৫৩। বিশ্বামিত্র। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র
৫৪। বিশ্ব-সঙ্গীত। (শ্রীপ্রমথনাথ রায়,
৫৫। বিদায়। (পদ্য) (শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্ট
৫৬। বেদমাতা সবিতা দেবীর প্রতি।
৫৭। ভক্তিবিচার। (শ্রীকৃষ্ণমোহন বি
৫৮। ভারতের অন্ধ ও মূকবধির। (শ্রী
৫৯। ভাইফোঁটা। (পদ্য) (শ্রীপ্রবোধচ
৬০। মগধেশ্বরী। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়
৬১। মনুবাক্য ও শঙ্করাচার্য্য। (শ্রী

জন্যই তাঁহাদিগের মঙ্গল চিন্তা তোমাকে করিতে হইবে। বিধাতা তাঁহাদিগকে তোমার সহায়তা করিবার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে পারিতেছ না কি? কৃষক চাষ না করিলে, কুম্ভকার গৃহের দ্রব্যাদি প্রস্তুত না করিলে, রজক বস্ত্রাদি না ধৌত করিলে, মেথর ময়লা পরিষ্কার না করিলে, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিকেও কত কষ্টে পড়িতে হয়। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য নর নারী প্রতিদিন মানুষের সেবার জন্য তৎপর। লোকে বলে, অর্থ না হইলে তাহাদের চলে না; এই জন্য তাহারা কাজে তৎপর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, লোক-সংবাস তাহাদের প্রয়োজন, আদান-প্রদান বিধাতার প্রেম-বন্ধনের মূল কারণ, এই জন্যই বিধাতা নানা জনকে নানা কাজের ভার দিয়া এই সংসারে পাঠাইয়াছেন। কেন না, নিত্য আহারের তণ্ডুল সংগ্রহের জন্য সকল দরিদ্র চাষ করিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের দিন গুজরান হইত, এত খাটুনির প্রয়োজন থাকিত না। খাটুনি, বিধাতার আদেশ। খাটুনি, প্রেমের সহচর। একজনকে অপরের সহিত বাঁধিবার জন্যই বিধাতার রাজ্যে খাটুনির এত আদর। স্বাধীন বাণিজ্য (free-trade) বিধাতার প্রেম-বিস্তার ও সেবা-প্রচারের সরল পথ। পিতা মাতা, সন্তানের জন্য; সন্তান, পিতা মাতার জন্য; ভাই, ভগ্নীর জন্য; ভগ্নী, ভ্রাতার জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীর্ণদেহ হইতেছেন। অম্লানচিত্তে একের সর্ব্বস্ব অপরের জন্য ব্যয় করিতেছেন। লোকে বলে, রক্তের সম্বন্ধের জন্য এই ব্যাপার। রক্তের সম্বন্ধ ত কচ্ছপের বাচ্চার সহিতও কচ্ছপ-মাতার আছে, কই তাহারা ত বাচ্চার জন্য ব্যস্ত নয়। বিধাতা প্রেমের দুর্লভ [illegible]-শৃঙ্খলে মানব-পরিবারকে বাঁধিবার জন্যই একের ভার অন্যের হস্তে দিয়াছেন। এইরূপে সমাজ ও দেশ-বন্ধনের অপূর্ব্ব কৌশল রচনা করিয়াছেন। যৌবনের তাড়নায় মাতাইয়া রমণীকে পুরুষের দিকে, এবং পুরুষকে রমণীর দিকে টানিতেছেন, কত রূপে একের বোঝা অন্যের মস্তকে চাপাইয়া দিতেছেন। এইরূপে বিশেষত্বে দেশ সকলকে চিহ্নিত করিয়া, এক দেশকে আর এক দেশে আকর্ষণ করিতেছেন। আমাকে যদি কেবল আমার ভাবনাই ভাবিতে হইত, বনে জঙ্গলে যাইয়া একাকী সাধন করিলেই চলিত। কিন্তু তাহা বিধাতার লক্ষ্য নয়। বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম এই, একের জন্য অন্যকে ভাবিতেই হইবে। সেই ভাবনাটা পরিত্যাগ করিয়া কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে কি?

মানুষের ললাটে গুপ্ত প্রেম-বাণী লিখিয়া দিয়া বিধাতা এই সংসারে মানুষকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু মানুষ বড় কৃপণ। সকলের সাহায্য তাহার নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু সে অন্যকে সাহায্য করিবার সময় বড় চিন্তাকুল। হাত চলে কি না চলে? আমি প্রসন্ন মনে পিতা মাতার সাহায্য লইয়া বড় হইয়াছি, সমাজের অসংখ্য লোকের সাহায্য পাইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, কিন্তু আমি কুপুত্র, পিতা মাতার কথা ভাবিতে পারিতেছি না, তাঁহাদের জন্য কিছু করিতে হইলে যেন আমার মস্তকে বজ্রপাত হয়;—কিন্তু আমি সমাজের কুপোষ্য, আমি বড় হইয়া আর কাহারও উপকারের কথা ভাবিতে পারিতেছি না? কত কত লোক নিজ

প্রত্যুপকার পাইবার জন্য আমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে, সে সকল দেখিলেই যেন আমার শরীর নিস্‌পিস্‌ করে, এত উৎপাত কি সহ্য করা যায়? আমিও মানুষ, তাঁহারাও মানুষ, আমার জন্য তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই করিয়াছেন! নিজ ইষ্ট সাধন করিতে যাইয়া যদি কোন ব্যক্তি ঘটনা ক্রমে অন্যের উপকার করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়, তবে সে কিছু প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করিতে পারে না। পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত যিনি আমার যে কিছু উপকার করিয়াছেন, নিঃস্বার্থভাবে কেহ করিয়াছেন কি? আমার ত তাহা মনে হয় না। সকলেই ব্যবসাদারী করিয়াছে,—কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া কেহ কি কিছু করিয়াছে? তবে আমি কেন অন্যের চিন্তায় ঘাম ফেলাইতে বসিব? নিজের চেষ্টায় অর্থোপার্জ্জন বা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, নিজেই সম্ভোগ করি। পরের উপকারের কথা আমার কাণে তুলিও না। আমি তাহা পারিব না। এইরূপ কত কত দিগ্বিজয়ী কথা আমার মনে, তোমার মনে নিত্য জাগিতেছে। একবার যদি কাহারও কিছু করিতে ইচ্ছা হয়, অমনি কি চিন্তায় যেন প্রতিনিবৃত্ত হই! এই ভাবে তোমার আমার দিন যাইতেছে। পশু পক্ষীরাও নিজের জন্য ব্যস্ত, আমরাও তাই। আমরা কি পশু অপেক্ষাও হীন নহি?

আমি প্রত্যুপকার না করিতে চাহিলেও, কিন্তু একজন আমাকে ছাড়েন না। তাঁহার উত্তেজনায় আমি বড় জড়সড় হইয়া পড়িতেছি। আমি মনে করি, আমি আর কাহার জন্য কিছু করিব না;—অমুক লোককে কত কষ্টে লালন পালন করিয়াছি, সে আমার কত কি অনিষ্ট করিয়াছে; অমুক লোককে কত করি বড় মানুষ করিয়াছি, সে এখন উপহাস করে অসাক্ষাতে নিন্দা করে—ইত্যাদি ইত্যাদি এ মানব-ঘৃণার তীব্র উচ্ছ্বাস প্রতিনিয়ত আমা বিহ্বল করিতেছে;—তাই আমি প্রতিজ্ঞা- হইতে চাই, আর আমি কাহারও কিছু করি না। কিন্তু কিছুতেই প্রতিজ্ঞা পালন করি পারিলাম না; এক জনের হস্তে আমি কিছুতে নিষ্কৃতি পাইলাম না! আমি প্রতারিত, শ্রা ক্লান্ত-অবসন্ন; কিন্তু তবুও একজন আমা ছাড়িতেছেন না!! আমি করিব কি?

বাল্যকালে সামান্য যে কর্ত্তব্যের বী প্রাণে রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন, এখন বার্দ্ধক্যে সেই কর্ত্তব্য-বীজ বহু শাখা প্রশাখা বি করিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই বৃক্ষ আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে;—আমার আমিত্ব নির্ব্বাণ হইবার উপক্রম হ য়াছে। সামান্য একটী বটবৃক্ষ, ছাদের এ কোণে গজাইয়াছিল, সেই বৃক্ষ এখন সতে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত, সে এখন সম বাড়ী দখল করিয়া বসিয়াছে। বাড়ীখানি অস্তিত্বও এখন যেন বুঝা যায় না। আমিত্ব, স্বামিত্ব, প্রভুত্বের বড় বড়াই করে আমিও এক দিন করিতাম; কিন্তু এখন বার্দ্ধক্যে দেখিতেছি, আমিত্ব বলিয়া যাহা তাহা কর্ত্তব্যরূপ মহাবৃক্ষ গ্রাস ক ফেলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমিত্ব-প্রস কিছু পরিচয় দিয়াছি, তাহা দিন দিন স খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে;—কর্ত্তব্য-জ্ঞা আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। বড়? আমি বড় না তিনি বড়? [illegible] বড়, না তাঁহার ইচ্ছা বড়? তিনি [illegible] বিরাট মূর্ত্তি ধারণ [illegible] [illegible]

তুমি কাহারও জন্য কিছু করিবে না, আমিও তাম, অনেক ঠকিয়াছি, আর না। কিন্তু তুমি বা পারিলে কই, আমি বা পারিলাম ? ভাবিলাম অনেক, দেখিলাম আরো নেক ;—খাটুনির পরিসমাপ্তি হইল কই ? বনব্যাপী খাটুনি খাটিয়া পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু তবুও কর্ত্তব্য অসমাপ্ত ! ঐ বিরাট পারকে কে শেষ করিতে পারিয়াছে ?

জল্পনা কল্পনা করিয়া যে মানুষ পরের োঝা বহিতেছে—এত খাটুনি খাটিতেছে, তা নয়। সে না খাটিয়া পারে না, তাই খাটে। নে কন্যার দুঃখ দেখিলে সে অস্থির হয়, নুষের দুঃখ-ভারাক্রান্ত মলিন বেশ দেখিলে ব্যস্ত হয় ;—কিছু না করিয়া থাকিতে রে না। জীবে দয়া মানুষের দুর্লঙ্ঘ্য পরি-াম। এই প্রেমের পথে মানুষকে যাইতেই ইবে। শ্রীচৈতন্যের ঐ উক্তি যদি ধর্ম্ম হয়, তবে এই ধর্ম্মে সকলকেই মজিতে হইবে।

যদি তাহাই হয়, তবে আর চিন্তা কি ? চিন্তা নাই, এবং চিন্তা আছেও। চিন্তা নাই এই জন্য,—আমি ইচ্ছা করি বা না করি, মাকে ধর্ম্মের পথে চলিতে হইবেই হইবে : জ হউক বা কাল হউক, আমাকে প্রেম-খলে বাঁধা পড়িতেই হইবে। চিন্তা আছে ই জন্য, যদি এক দিন বাঁধা পড়িতেই হয়, বে কেন আজ বাঁধা পড়ি না। নিশ্চয় এক এক ইতে হইবে :—সুতরাং এখন যাওয়ার ত্রা সংগ্রহ করাই সঙ্গত নয় কি ? কেন প্রেয়ের পথে বৃথা ধাবমান হই, শ্রেয়ের পথে ময় থাকিতে অগ্রসর হই না কেন ? প্রবৃত্তির রিচালনা করিয়া আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা জানিতে আর বাকী নাই,—খন, সময় থাকিতে একটু একটু নিবৃত্তির টি না কেন ? যাহা প্রিয়, তাহা ছাড়িয়া যাহা শ্রেয়, তাহা অবলম্বন করি না কেন ? এই চিন্তায়, এই বার্দ্ধক্যে, আমি বড়ই প্রপীড়িত হইতেছি ?

চিন্তা যখন করি, কর্ত্তব্যের গুরুত্ব এবং আমার ক্ষুদ্রত্ব স্মরণে ম্রিয়মান হই। হায়, কত দরিদ্র এই ভারতে অভুক্ত, অশিক্ষিত, অনুন্নত,—দেশের কত কত কত অভাব !! পরাধীনতায় ও পরপীড়নে সকলে জীবন্মৃত,—একতাহীন, ধর্ম্মহীন, ভাষাহীন, উৎসাহহীন,—মলিন ও নিষ্প্রভ। এক দিকে ভারতের অভাবের বিশালত্ব এবং আর এক দিকে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব স্মরণে মুহ্যমান হই। একএকবার ইচ্ছা হয়, যদি কিছু করিতে না-ই পারিলাম, তবে আর জীবন ধারণে কাজ কি ? কিন্তু ঐ সর্ব্বগ্রাসী তাড়নার হস্ত হইতে তবুও নিষ্কৃতি পাইলাম না। ভাবিয়া কূল কিনারা না পাইয়া এক একবার বসিয়া পড়ি ;—কিন্তু আবার কে যেন জাগাইয়া দেয়। এইরূপ করিতে করিতে এতদিন অতীত হইয়াছে। এখন দিন দিন নিরাশার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। বল নাই, বুদ্ধি নাই, অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, সম্পদ নাই :—কি দিয়া কি করিব ? হায় হায় হায়, আমাদের দ্বারায় কিছুই হইবার নয়—কিছুই হইল না !!

এইরূপ নিরাশার মধ্যে যখন ডুবি, তখন ইচ্ছাময়ের মহাইচ্ছা আবার জাগাইয়া দেয়। মহাইচ্ছার মহানুপ্রাণন এই—‘কাজের পরিমাণে বিচার হইবে না, সৎ ইচ্ছার পরিমাণে বিচার হইবে।’ মহাইচ্ছা বলেন,—“তুই কিছু করিতে পারিলি, কি না পারিলি, সে জন্য কাতর হয়ে কাজ নাই—তুই কেবল সৎইচ্ছা পোষণ কর্—ইচ্ছা কর্—জগতের, দেশের, সমাজের, পরিবারের—সকলের মঙ্গল হউক।

বিপদে পড়িয়াও, নির্য্যাতনে ডুবিয়াও, অনাহারে মরিয়াও, রোগে শোকে তাপিত হইয়াও এই এক কামনা কর যে—সকলের মঙ্গল হউক। কিছু দিবার বা করিবার শক্তি না থাকে, করিয়া বা দিয়া কাজ নাই, ইচ্ছার কার্পণ্যের প্রয়োজন কি,—ইচ্ছা কর যে, সকলের ভাল হউক। কোটি টাকা ব্যয় করিয়াও তাহার মোক্ষ লাভ হয় না, যে সৎ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হয়; আর যে এক কপর্দ্দকও দিতে পারে না, কিন্তু দিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে, মোক্ষ লাভ তাহার করায়ত্ত। পাপ পুণ্যের বিচার বাহিরের কাজে নয়, মনের মধ্যে ইচ্ছা-পোষণে।" আমি মহা ইচ্ছার এই আশার বাণী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি। পিতৃশ্রাদ্ধে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজা অহঙ্কারী হইয়াছিলেন, তাঁহাপেক্ষা, যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব মাতার আদ্য শ্রাদ্ধে ঢালিয়া দিয়া দীন ফকীর হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই ধন্য মনে করিতেছি; এবং সঘনে সরবে ঘোষণা করিতেছি, সৎ ইচ্ছার জয় হউক। মরিয়া, মরিয়া, মরিয়াও নিত্য যেন গাইতে পারি,—সৎ ইচ্ছার জয় হউক।

সৎ ইচ্ছার সহচর কে, বন্ধু, তুমি শুনিবে কি? বন্ধু, তুমি বিশ্বাস করিবে কি? আমাকে রাজরাজেশ্বর বলিয়া দিয়াছেন, সৎ ইচ্ছার নিত্য ভৃত্য "সেবা"। সৎ ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হও, সেবাদাসী তোমার ঘরে আবির্ভূতা হইবে। কি জানি কোথা হইতে নামিয়া আসিয়া নব বলে তোমাকে মাতাইয়া তুলিবে। এমন ভাবে মাতাইয়া তুলিবে যে, তুমি অম্লানচিত্তে খাটিয়া খাটিয়া সমস্ত নিঃশেষ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। সে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি নয়;—সে মোক্ষ-প্রাপ্তি। বন্ধু, এ কথা যদি তুমি বিশ্বাস কর—তবে মহা সৎ ইচ্ছার সাধনায় নিযুক্ত হও। যাহা হইবার, ঐ সাধনেই হইবে।

খ্রীষ্টের সদিচ্ছা তাঁহার দেহ-ত্যাগের শ্মশান হইতে পুনরুত্থিত হইয়া জগৎকে এক অকৈতব সেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে;—নিরঞ্জন-নিরঞ্জনার তট হইতে বিস্তৃত হইয়া বুদ্ধের অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম-কাহিনী জগৎকে সাম্যবাদে দীক্ষিত করিয়াছে;—অবশেষে শ্রীচৈতন্যের অহেতুকী সেবা-মন্ত্র "নামে রুচি জীবে দয়া" ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। নিরাশা এজগতে অনেক;—আশার বাণীও অনেক। নিরাশা ভিন্ন আমাদের ব্যক্তিত্ব নাশের, অহং-জ্ঞান-বিনাশের আর কিছু অস্ত্র আছে কি? নিরাশ হইয়া হইয়া আমরা তবে আপনাকে ভুলিতে পারিব। আপন শক্তিতে কুলায় না, যখন বুঝিব, তখনই তাঁহার তপস্যায়-নিযুক্ত হইব। নিরাশাতেই খ্রীষ্টত্ব, বুদ্ধত্ব ও শ্রীচৈতন্যত্বের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। নিরাশ হইয়া আত্ম-বলি না দিলে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম এ জগতে পুনরুত্থিত হইত না। ইঁহাদের মহা মহীয়সী জীবন-কাহিনী পাঠে এই শিক্ষা পাইয়াছি, আপনাকে ডুবাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে, তবে "সেবা ধর্ম্মের" জয় হইবে। "আমি করি, আমি বলি, আমি চলি"—এই স্বামিত্ব-বোধ সর্ব্বনাশের মূল। "এ আমার আপন, এ আমার পর"—ইহা অহং-জ্ঞান হইতে প্রসূত। অহং-বিসর্জ্জিত হইলে থাকে কি?—কেবল সৎ ইচ্ছা—জগৎ ব্যাপিয়া কেবল সৎ ইচ্ছার রাজত্ব। আপনার ব্যক্তিত্ব লোপ পাইলে পর আর কিছু থাকে না, থাকেন কেবল তিনি;—ব্যক্তিত্ব তখন তিনিময়ত্বে মজিয়া এত বিশাল হয় যে, তাঁহার সব পুত্র কন্যাকে তাহা পরিব্যাপ্ত হয়। আপনাকে ভুলিয়া তখনই জগতের সেবার জন্য মানুষ মাতিয়া উঠে। মাতিয়া উঠিয়া দেখে, জগৎই বা কোথায়? সব যে এক

হুংকারে একাকার হইয়া গিয়াছে ;—সকল মানবত্ব এক বিরাট চিন্ময়ত্বে পরিণত হইয়াছে। প্রমত্ত, আত্মহারা মানুষ তখন সেই চিন্ময়ের ধ্যানে জ্ঞানে মজিয়া যায়। প্রেম মজিয়া সেবার উংপত্তি হইয়াছিল, সেবা মজিয়া এখন ভক্তির উংপত্তি হইল। সেবা ও ভক্তিতে অভিন্নতা দেখিয়া নর নারী তখন তন্ময় হইয়া গান ধরে—"জয় সচ্চিদানন্দ হরে।"

নিবেদন।*

প্রাণের নির্ঝরে ঝরে গলিত রজত ধারা,
সম্ভোগ-জীবন-নাট্য যৌবনে করিলে সারা,
আয়ত লোচনে সখা, বরষা ক'রেছে ভর.
নিশ্বাসে মলয়বায়ু কেঁপে উঠে থরথর ;
বৈরাগ্যে প্রকৃতি রাণী ধরেছে যোগিনী বেশ.
কোথা প্রিয়া ? কোথা প্রেম ? কোথা সুরু ? কোথা শেষ ?

অজিন-সজ্জিত প্রেম-বিভূতি মাখিয়া গায়,
শুদ্ধ মনে বসিয়াছে অভিনব তপস্যায়,
প্রাণ পূজা মহাব্রত মৌনকান্তি সুবিস্তার.
বাহিরে উদাস ভাব চিত্তে সান্দ্র উপচার।
দেবরাজ্যে শুভ্র দেহ ঘুরি গ্রহ গ্রহান্তর,
দেবীর সকাশে নীত এবে সখা যে সুন্দর,
কোন কল্প-কুঞ্জমাঝে চিন্ময় চেতনা তব,
গাঁথিছে সাধের মালা, মন্দার তুলিয়া নব
গাহিছে মিলন গাথা ঝঙ্কার পশিয়া কাণে
ক্ষীণ-সুখ-সুপ্তি-স্রোত আবার আমারে টানে !
নিষ্প্রভ মলিন স্মৃতি উঠে যেন দীপ্ত হ'য়ে,
পুরাতন আলাপন কৌতুক তরঙ্গ ল'য়ে।
এসোনা বিলাস গেহে, যোগী বেশ পরিহরি,
বেঁধোনা নিজেরে পুনঃ নাটুয়ার বেশ ধরি,
সুখস্পর্শ তরে যেন লালসা বিরক্ত থাকে
নব বল্গু রূপরসে ডুবাও না আপনাকে।

শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী।

হে রবীন্দ্র—

মধুভরা জয়দেব-নিভ সুকুমার
বিচ্ছুরিত কলতানে, রচিয়া কম্পন,
ঢালিতেছ তীব্র সুধা, তীব্র হাহাকার,
শিহরি উঠিছে তাই বসন্ত পবন।

কাব্যবিশ্ব-কেন্দ্রীভূতা কবিতা তোমার,
বরষে সপত্নী তরে তপ্ত অশ্রুজল,
কেঁদে উঠে সমরসপায়ী-সখাদল,
লঘু করিবারে চায় তব গুরু ভার।

যেতেছ লইয়ে বিশ্ব স্বর্গের সকাশে,
বিরহ বিজনে বসি, সম্ভ্রমে. যতনে,
আরম্ভ করহ যজ্ঞ, জ্বলন্ত ইন্ধনে
ঢাল স্মৃতি হবি-রাশি, হুতাশে, হুতাশে।
ভালবাসা বেচে থা'ক, প্রেম থা'ক জীয়ে
মঞ্জু 'মাধুরীরে' রেখো ঘিরে স্নেহ দিয়ে।

শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী।

---

* রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কবিতা দুইটী লিখিত।

স্বর্গীয়া সরলা দাস, বি-এ।

এদেশে উচ্চ-শিক্ষিতা উপাধিধারিণী মহিলার সংখ্যা অতি অল্প; কিন্তু এই অল্প সংখ্যক মহিলার মধ্য হইতেই একটী তরুণ বয়স্কা রমণী সংসারের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই রমণী তেইশ বৎসর ছয়মাস মাত্র সংসারে বাস করিয়াছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে যদিচ তিনি তাঁহার জ্ঞানে ও গুণে যশস্বিনী হইয়া পিতা মাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; মহত্ত্বে ও মিষ্ট ব্যবহারে বন্ধু বান্ধবদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; এবং হৃদয়ের সুগভীর প্রীতিদ্বারা স্বামীকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তথাপি এই রমণী অধিকাংশ লোকের নিকটই অপরিচিতা। এমন কি, তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাও তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতেন না। তাছাড়া তিনি দেশের জন্যও কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। নির্জ্জন বন-কুসুম যেমন অরণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া অরণ্যেই ঝরিয়া পড়ে, তাহার সৌন্দর্য্যও কেহ দেখিতে পায় না, সুগন্ধও কেহ গ্রহণ করিতে পারে না; তেমনি এই সুশিক্ষিতা রমণী, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, জ্ঞান ধর্ম্মে বিকশিতা হইয়া লোকের অজ্ঞাতসারেই সংসারারণ্যে ঝরিয়া পড়িল। ইঁহার সুন্দর জীবনপুষ্পের শোভাও অনেকে দেখেন নাই, সৌরভও অনেকে পান নাই।

তবে আবার এই অল্পকালস্থায়ী জীবনের অকিঞ্চিৎকর ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে প্রয়াস কেন? প্রয়াসের কারণ আছে। এদেশের উচ্চ-শিক্ষিতা রমণীগণ কিরূপ ঘরকন্না করেন, কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা জানিবার জন্য আমাদের একটা ঔৎসুক্য আছে। সেই ঔৎসুক্য নিবারণের জন্যই একটী অসম্পূর্ণ জীবনের অকিঞ্চিৎকর কাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই রমণীর নাম সরলা। সরলা রেঙ্গুনের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা। সরলার বয়স যখন সবে মাত্র ছয়মাস, তখনই তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া রেঙ্গুন গমন করিয়াছিলেন। সরলা পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রেঙ্গুনের মেথডিষ্ট-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়িতে আরম্ভ করার চারিবৎসর পরেই রেঙ্গুন-বিভাগের প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, এবং মাসিক আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

এই সময় সরলার পিতা সরলার বুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া অতিশয় প্রীত হন; সরলাকে কলিকাতার বেথুন-বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া উচ্চশিক্ষা দিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু কনভেণ্টের শিক্ষয়িত্রীগণ সরলার সরলতায়, সরলার সদ্গুণে এবং সরলার নম্র-ব্যবহারে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তমা ছাত্রীকে কিছুতেই ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। সরলাকে তাঁহাদের কাছে রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সরলার পিতা সে অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি সরলার এগার বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা আসেন, এবং বেথুন বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

এই সময় বেথুন-বোর্ডিং-এর অন্যান্য মেয়ের চেয়ে সরলার ভিতর কিছু নূতনত্ব দেখা যাইত। কেবল চেহারায়ই তাঁহাকে বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া মনে হইত। নহিলে তাঁহার কথা বার্ত্তা, চাল চলন অনেকটা ইংরাজের মেয়ের মতনই ছিল। শৈশবকাল হইতে মেমদের সংসর্গে থাকায় বাঙ্গলা এক রকম শিখিতেই পারেন নাই। সকলের সঙ্গেই ইংরাজীতে কথা বলিতেন। তা ছাড়া বাঙ্গালীদিগের সহিত খুব একটা মেশামেশি না থাকায় বাঙ্গালী সমাজের অনেক রীতি-নীতিই জানিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী সমাজ বলিয়া কেন, একটী এগার বৎসরের বালিকার সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেরূপ জ্ঞান তাঁহার কোন সমাজ সম্বন্ধেই ছিল না। ইহাতে তাঁহার অপকার না হইয়া উপকারই হইয়াছিল। পৃথিবীর কোন মলিন চিত্র তাঁহার চক্ষে পড়িত না, সংসারের কোন কলঙ্ক-রেখাও তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইত না; তিনি শিশুর ন্যায় এমন সরল, এমন পবিত্র ছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই তাঁহার প্রতি কেমন একটী আকর্ষণ জন্মিত।

ইহার পর সরলার বয়স যখন তের বৎসর, তখন দার্জ্জিলিঙ্গে আমরা তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পাই। তখন তিনি তের বৎসরের বালিকা বটে, কিন্তু তাঁহার সরলতা ও হাসি খুসী ভাব দেখিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহাকে শিশু বলিয়া মনে হইত। তখন কোন কোন বিষয়ে তিনি এমন সকল প্রশ্ন করিতেন, আমরা শুনিয়া অবাক্ হইতাম। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একদিনকার একটী কথার উল্লেখ করি। সরলা যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর গৃহিণী একদিন তাঁহাকে বলিতেছিলেন "সরলা, তুমি বড় হইয়াছ, তোমার এখন সকলের সঙ্গে মেশা উচিত নয়।"

সরলা যেন একটু বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "কেন? তাতে কি হয়?—বাবুকে আমি ভালবাসি, আমি তাঁহার সহিতও মিশিব না?"

সরলার কথা শুনিয়া গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন। সরলা তাঁহাকে বলিলেন "আপনি হাস্‌চেন কেন, বলুন না তাতে কি হয়?"

সরলার এই সরলতা দেখিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী দার্জ্জিলিং-প্রবাসী-দিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কাহারো কাহারো সঙ্গে এরূপ স্নেহের বন্ধন হইয়াছিল যে সরলার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত সে বন্ধন অটুট ছিল।

এই বৎসর সরলা বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন; এবং কিছু কিছু বাঙ্গলাও শিখিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে বাঙ্গলা শিখিবার জন্য এবং রান্না শিখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আগ্রহ থাকিলে হইবে কি? খুব সহজ বইও তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। নিতান্ত পরিচিত লোক না হইলে লজ্জায় কাহারো সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন না। অথচ তাহার কিছুদিন পরেই Second Language ফরাসী ভাষা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায়ই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন। আমরা ত শুনিয়াই অবাক্! মনে ভাবিলাম, সরলা আর সব বিষয়েই পাস হইবেন, হয় ত এক বাঙ্গলার জন্যই ফেল হইয়া যাইবেন।

তারপর যখন পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইল, তখন দেখি, সরলা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম

হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন; এবং তিন বৎসর পূর্ব্বে যে বালিকা বাঙ্গলা এক-রকম জানিতেনই না, সেই বালিকাই বাঙ্গলা ভাষায় সকলের প্রথম হইয়াছেন। তখন সরলার বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম।

ইহার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ সরলা তাঁহার ষোল বৎসর বয়সের সময় এফ্-এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম স্থান অধিকার করেন। ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, সরলার পূর্ব্বে আর কোন মহিলা এফ্-এ, পরীক্ষায় এরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই।

এফ্-এ পরীক্ষার পরই সরলার নানা বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি সুন্দর রূপে বিকশিত হয়। এই সময় সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হৃদয়োন্মাদকারী বক্তৃতা ও প্রাণস্পর্শী উপদেশ শুনিয়া সরলার অত্যন্ত উপকার হয়, মনে অনেক মহদ্ভাব প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য সরলা শাস্ত্রী মহাশয়কে এরূপ ভক্তি করিতেন এবং ভালবাসিতেন যে, যেদিন শাস্ত্রী মহাশয় সরলার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, সেদিন সরলার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। শাস্ত্রী মহাশয় মাসের মধ্যে একবারও যদি তাঁহাদের বাড়ী না যাইতেন, তাহা হইলে সরলার অত্যন্ত দুঃখ হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি এই যে অনুরাগ, হয় ত এই অনুরাগ হইতেই সরলার ভাল হইবার এবং ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল।

তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন, স্বভাবতঃই সরলার মনে ধর্ম্ম ও মহৎ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরলা যখন তের বৎসরের বালিকা, তখন দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে দেখিতাম, তিনি উপাসনার ভাষা বুঝুন, আর না বুঝুন, কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবে গিয়া উপাসনার জায়গায় বসিতেন, ভক্তির সহিত আচার্য্যের কথা শুনিতেন। দার্জ্জিলিঙ্গে আমরা এক বাড়ীতেই থাকিতাম। প্রতিদিনই সরলা এবং বাড়ীর অন্যান্য ছেলে মেয়েরা আমাকে গল্প বলার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। গল্প বলা কাজটা যে আমার পক্ষে বিশেষ অপ্রীতিকর ছিল, তাহা নহে। তবে দশ পনর দিনের মধ্যেই আমার পুঁজি ফুরাইয়া আসিল; অথচ বাড়ীর ছেলে মেয়েরাও ছাড়ে না। আমি তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ধার্ম্মিক লোকদিগের জীবনের কথা গল্পের মতন করিয়া বলিতাম। সরলা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন; এবং শুনিতে শুনিতে কেমন এক সুন্দর ভাবে তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তখন মহাত্মা কেশব চন্দ্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি দেখিতে পাইতাম। তিনি বলিতেন "আমার বাবা কেশব চন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।"

সরলা কেশবচন্দ্রের বিষয় তেমন কিছুই জানিতেন না; অথচ তাঁহার বাবা যে কেশব-চন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, ইহাতেই কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার ভক্তি!

এই উক্তিতে আমরা তাঁহার পিতৃভক্তিরও পরিচয় পাইতেছি। বাস্তবিকই সরলা তাঁহার পিতাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। পিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার করুণ নেত্রদ্বয়ে কেমন এক আনন্দের জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আর সরলার পিতা তাঁহার এই

প্রিয়তমা কন্যাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা কে নিরূপণ করিবে? কত অর্থব্যয় করিয়া কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, কত স্নেহ দিয়া, কত উপদেশ দিয়া, কত যত্ন করিয়া কন্যাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা করিয়াছিলেন; হায়, এই কন্যা সম্বন্ধে তাঁহার মনে হয়ত কতই উচ্চ আশা ছিল; কিন্তু কালের কঠোর আঘাতে সে আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইয়া গেল। আজ সেই পিতা সম্পদ এবং সম্মানের উচ্চ শিখরে আসীন হইয়াও সংসার-শূন্য দেখিতেছেন, অশ্রুজলে নয়নকে আর্দ্র করিয়া তুলিতেছেন।

এফ্-এ, পরীক্ষার দুই বৎসর পরে সরলা বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে সেকেণ্ডক্লাস অনার পাশ করেন, এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের দশম স্থান অধিকার করেন।

বি-এ পাশ করার পর কোন একটা ভাল কাজে কিছু সময় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, একদিকে যেমন তাঁহার বিস্তর সময় আছে, অন্যদিকে দেশেরও অনেক অভাব আছে, রমণীদিগের করিবার কাজও যথেষ্ট আছে, তাঁহার সে সকল করিতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু কেমন করিয়া করিবেন? করিবার মতন তাঁহার কি শক্তি আছে? শক্তি থাকিলেই বা সুবিধা কোথায়?

তিনি এই চিন্তায় বড়ই বিমর্ষ হইয়া তাঁহার কোন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "আমি আমার জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিরাশ হইয়া পড়ি। আমি যে কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না। আপনি বলুন, আমি কি করিতে পারি?"

বন্ধু। তোমার বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, সুন্দর হৃদয় আছে; তুমি চেষ্টা করিলে অনেক কাজ করিতে পার।

সরলা। আপনি আর পণ্ডিত মহাশয় কেবল আমার প্রশংসাই করেন। আপনারা ত আমার কিছুই জানেন না।

বন্ধু। আর কিছু না হয়, তুমি সাহিত্যের অনুশীলন কর। কাগজে পত্রে লিখিতে আরম্ভ কর। সে ত একটা মস্ত কাজ; তাহাতে দেশেরও উপকার হইবে, তোমারও হৃদয় মন উন্নত হইবে।

সরলা। ঠিক্ বলিয়াছেন। সাহিত্যের সেবা অতি উৎকৃষ্ট কাজ। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় যে আমার বিদ্যা! আমি চেষ্টা করিলে ইংরাজীতে কিছু লিখিতে পারি, সেরূপ লেখার লাভ কি?

ইহার পর সরলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন "হাঁ, তবে একটা কাজ করিতে পারি। এতদিন বোর্ডিংয়ে ছিলাম, এখন মায়ের কাছে আসিয়াছি। আমার অনেক ভাই বোন। আমি যদি ভাই বোনদের দেখি, তাহাদের পড়াশুনার উপর চোখ রাখি, তাহা হইলে মায়ের অনেক সাহায্য হয়।"

এ বিষয়ে সরলা তাঁহার ১৮৯৮ সনের ১লা বৈশাখের ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—"পৃথিবীর কিছু কাজ করিতে এবং ভাই ভাগিনীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে, ও পিতা মাতার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব—এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়—"

এস্থানে বলা প্রয়োজন সরলার মাতা সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতা থাকিতেন। তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে সরলাই সকলের বড় ছিলেন। সরলা ভাইবোনদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ভাইবোনদিগের উপর তাঁহার ভালবাসাও ছিল এবং কিছু শাসন করিবারও ক্ষমতা ছিল। ভাই বোনেরা সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত।

আমরা জানি, সরলা বিবাহের পরও তাঁহার ভাই বোনদের অভিভাবকের মতন ছিলেন। একটা কিছু হইলেই সরলার মাতা সরলার কাছে সংবাদ পাঠাইতেন; সরলার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। সরলা প্রতি রবিবারই স্বামীর সঙ্গে পিত্রালয় যাইতেন, এবং সমস্ত দিন ভাই বোনদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে কাটাইতেন। হায়, আজ সেই ভাই বোনেরা সরলার অভাবে আপনাদিগকে অসহায় মনে করিয়া কতই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে!

ইহার পর অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ১১ই অক্টোবর হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় দুর্গা মোহন দাস মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশ রঞ্জন দাস ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সরলার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়।

কিন্তু এই পরিণয় সুসম্পন্ন হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিণয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; সরলার পিতা সরলাকে এই বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তৎকালে সরলা বলিয়াছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। তৎপর যখন শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষরূপে পরিচয় হইল, তখন দুজনেই দুজনার ভালবাসায় আকৃষ্ট হইলেন, তাঁহাদের অভিভাবকেরা চেষ্টা করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, পরস্পরের প্রীতির আকর্ষণেই তাহা সঙ্ঘটিত হইল। এ সম্বন্ধে সরলা তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন :—

> "কিন্তু সে আশা এখন দূর করিলাম। এখন সংসারের কিছু কাজ করিতে, এবং ভাই ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে, ও পিতামাতার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব, এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় সতীশ আসিয়া আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলেন। তিনি বলিলেন, আমরা উভয়ে জগতের কিছু কার্য্য করিব; এবং সেই কার্য্যে সতীশরঞ্জন আমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিবেন।"

এই বিবাহের পর সরলা আপনাকে এতই সুখী মনে করিয়াছিলেন যে, একদিন কথায় কথায় তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "এক সময় ভাবিতাম, আমি বিবাহ করিব না, কুমারী থাকিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিব। কিন্তু বিবাহের পর বুঝিতেছি, বিবাহে কত সুখ?"

বিবাহে সরলা যে কেবল নিজেই সুখী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার স্বামীকেও সম্পূর্ণ সুখী করিয়াছিলেন। সরলার হৃদয়ে যেন স্নেহের উৎস লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু সংসারে দেখিতে পাই, যাহার গৃহে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহারই অর্থের জন্য অতিশয় অস্থিরতা? সরলার হৃদয়ে ভালবাসার উৎস লুক্কায়িত ছিল বলিয়াই তিনি যেন লোকের ভালবাসা পাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। সরলার এই ভালবাসা সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন :—

> "অপরের ভালবাসা ও সদ্ভাব লাভ করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতাই ছিল! কেহ তাঁহাকে ভাল না বাসিলে তিনি তাঁহার ভালবাসা পাইবার জন্য আকুল হইয়া উটিতেন। তবে ইহা তাঁহার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, যাঁহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সরলাকে ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেন। সরলার ভিতর এমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকেরাও তাঁহার বন্ধু ছিলেন। ধার্ম্মিক এবং নাস্তিক, তরুণবয়স্ক ও পূর্ণবয়স্ক, যাঁহারাই তাঁহার সংসর্গে আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।"

সরলার স্বামীর এই উক্তি পাঠ করিয়া

বুঝিতেছি, সরলার হৃদয় কি সুমধুর প্রীতিতে পরিপূর্ণ ছিল। সরলা তাঁহার এই নির্ম্মল প্রীতি-সুধায় স্বামীর হৃদয় সিক্ত করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সরলা তাঁহার স্বামীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন যে, তাহা বর্ণনা করিলে অনেকটা উপন্যাসের মতন হইয়া পড়ে। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে সরলা কোন ক্রমেই তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেন না। স্বামী যখন পাঠাগারে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন, তখনও সরলা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন।

কিন্তু এক দিকে সরলার আত্মহারা ভালবাসা, অন্য দিকে মনস্বিনী রমণীর ন্যায় তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানও উজ্জ্বল ছিল। প্রয়োজন হইলে কর্ত্তব্য জ্ঞানের দ্বারা এই ভালবাসাকে নিয়মিত করিতে পারিতেন। সরলার বিবাহের দুমাস পরেই কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত সতীশ রঞ্জন দাসকে বোম্বাই যাইতে হইয়াছিল। আর সেই বৎসরই বোম্বাই সহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন কলিকাতার লোকেরা প্লেগের নামেই ভয়ে আড়ষ্ট হইত। সুতরাং সরলার মনেও ভয়ের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। এই জন্য সরলা প্রথমতঃ কিছুতেই তাহার স্বামীকে বোম্বাই যাইতে দিবেন না। তাঁহার পর যখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামীর বোম্বাই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তখন তিনি কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা আপনার মনকে বশীভূত করিলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে সরলা তাঁহার ডায়েরীতে যেটুকু লিখিয়াছেন, তাহার দু একটা লাইন বড় মধুর; আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"S (সতীশ রঞ্জন) বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত খারাপ লাগিতেছে। কাঁদি নাই। কারণ যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমার মুখে হাসি দেখিতে চাহিয়াছিলেন।"

সতীশ রঞ্জন বোম্বাই যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, সাত দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে তাহার আরো কিছু দিন বোম্বাই থাকা প্রয়োজন হয়। তিনি বোম্বাই আরো কিছুদিন থাকিবেন কি না, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট চিঠি লিখেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবার সরলার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। সরলার ত ইচ্ছা, সতীশ রঞ্জন আর একটী ঘণ্টাও বোম্বাই সহরে বিলম্ব না করেন। কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা সে ইচ্ছাকে সংযত করিলেন। ভাশুরকে বলিলেন, "আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, করুন।"

কিন্তু তাঁহার স্বামীর বোম্বাই সহরে আরো পনর দিন বিলম্ব হইবে শুনিয়া স্বামীকে আর মনের কথা না লিখিয়া পারিলেন না। তিনি লিখিলেন।

"আমি কাল সন্ধ্যার সময় শুনিলাম, বোম্বাইতে তোমার আরো পনর দিন বিলম্ব করিতে হইবে। শুনিয়া আমার বড়ই খারাপ লাগিতেছে। আমি বাড়ীর সকল লোকের সম্মুখে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম। * * তুমি রবিবার আসিবে ভাবিয়া বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল।

"যাক, এখন আর সে কথা ভাবিয়া কি হইবে? তুমি যে তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছ, তাহার সুফল ঈশ্বর তোমাকে দিবেন। এবং আমার প্রতি পরমেশ্বরের যে অশেষ করুণা, তাহা দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সুস্থশরীরে ফিরাইয়া আনিবেন।"

সরলার এই কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও আত্মসংযমের আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সরলার মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতে-

ছিল। ডাক্তার তাঁহাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহার স্বামী কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর বেড়াইতে যাইতে চাহিতেন না। তিনি জানিতেন, সেই স্নিগ্ধ অপরাহ্নে সরলার কাছে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিলে, সরলার আর আনন্দের সীমা থাকিবে না। কিন্তু সরলা নিজের সুখ ও সন্তোষের চেয়ে স্বামীর স্বাস্থ্যের প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। তৎকালে সরলা তাঁহার স্বামীকে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিবার জন্য কিম্বা একটু টেনিস খেলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। এমন কি, মৃত্যুর দিন সরলা যখন বেদনায় অত্যন্ত কাতর, তখনও তাঁহার স্বামীকে কাছারী যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এ দেশে লোকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিলে অনেক সময়ই নিজের পাঠ, নিজের চিন্তা, নিজের সুখ ও সুবিধা এবং নিজের খুঁটি নাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে; তদ্ভিন্ন গৃহকার্য্য, সন্তান পালন ও পতিসেবা প্রভৃতি রমণীর নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকিবে না। আমরা সরলার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা দ্বারা এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, সরলার সন্তানাদি জন্মে নাই। কিন্তু সরলা সম্পদের ক্রোড়ে লালিতা, সংসারের অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞা হইয়াও তাঁহার স্বামীকে গৃহের সমস্ত চিন্তা হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন; এবং এক মাত্র নিজের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বলে গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এখন উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে পুরুষেরা পরিহাস করিয়া বলেন "হস্! শিক্ষিতা মেয়েরা আবার রান্না করিবেন? আগুনের তাপে সোণার অঙ্গ যে কালি হইয়া যাইবে!"

সরলা কিন্তু প্রয়োজন হইলেই রান্না করিতে যাইতেন। তাঁহার স্বামী যে কয়েকটী তরকারি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন, সেই কয়েকটী তরকারি অনেক সময় নিজে স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। কোন নিরামিষ-ভোজী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিলে নিজেই রান্না করিতে প্রস্তুত হইতেন। এ সম্বন্ধে এক দিনকার কথা বার্ত্তার উল্লেখ করি। সরলা তাঁহার কোন নিরামিষভোজী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিতেছিলেন—"আপনাকে মাছ খাইতেই হইবে। আমরা যাহা প্রতিদিন খাইতে পারি, আপনি কি আমার অনুরোধে একদিনও তাহা খাইতে পারিবেন না?"

বন্ধু। কেন? তোমার বাবুর্চ্চি বুঝি নিরামিষ রান্না করিতে পারে না?

সরলা। বাবুর্চ্চি না পারে, আমিত পারি।

বন্ধু। তুমি কি রান্না করিতে পার?

সরলা। বটে! আপনি বুঝি মনে করেন, আমি রান্না করিতে জানি না? এই ত ক্রমান্বয় সাতদিন আমি রান্না করিয়াছি।

বন্ধু। কেন?

সরলা। বাবুর্চ্চির শরীর বড় খারাপ। প্রায়ই জ্বর হয়। বেচারা গরিব, ছাড়াইয়াও দিতে পারি না। কাজেই রান্না করিতে হয়।

বন্ধু। কি রকম রান্না কর? খুব ভাল?

সরলা। ওঁর ত বেশ ভালই লাগে। আর আপনারও বোধ হয় ভাল লাগিবে, আপনি আমাকে ভালবাসেন কি না?

এইরূপ গৃহকার্য্যে এবং স্বামীর সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যায় সরলা কিরূপ ভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন, এখন আমরা শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের লেখা হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিব।

তিনি সরলার জীবনের অনেকগুলি ঘটনা ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের কোন বন্ধুর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমরা স্থানে স্থানে সেই লিপির অনুবাদ প্রদান করিব।

মিষ্টার দাস এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "সরলা তাঁহার স্বামীর জন্য যে কি করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, বলিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণ রূপে সরলার চেষ্টায়ই হইয়াছে। সরলা তাঁহার স্বামীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই সাহায্য করিতেন। যদিচ সরলার সাংসারিক জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব ছিল, তথাপি সরলার ভিতর এমন এক স্বাভাবিক ও সহজ কর্ত্তব্যজ্ঞান (Instinct) ছিল যে, তাঁহার কি করা উচিত, কি করা অন্যায়, তাহা সর্ব্বদাই বুঝিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে কি গভীর ভাবেই ভালবাসিতেন, এবং স্বামীর ভালবাসা পাইবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতাই ছিল! তবুও তাঁহার স্বামীর যে কি কর্ত্তব্য, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। * * তিনি তাঁহার স্বামীর মঙ্গলের জন্য কিরূপ চিন্তা করিতেন, তাহা তাঁহার ডায়েরীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ১৮৯৮ সালের ৬ই জুনের ডায়েরীতে লিখিয়াছেন :—

"আমি চাই আমার স্বামী যেন বিবেকপরায়ণ, ও সর্ব্বতোভাবে মহৎ হন। কারণ তাহাতেই মানুষের গৌরব। আমার স্বামীকে যখন বিবেকানুমোদিত মহৎভাব পূর্ণ কথা বলিতে শুনি, তখন আমিও অতিশয় গৌরব অনুভব করি। কর্ত্তব্য ঈশ্বর-বাণীর কঠোর প্রকৃতি দুহিতা; (Duty is the stern daughter of voice of God) এই কর্ত্তব্যের আদেশ-পালনজনিত সুখই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ। কিন্তু এই আদেশ পালন করা অত্যন্ত কঠিন। আহা, আমি যদি কর্ত্তব্যপরায়ণা ও মহৎভাব-সম্পন্না হইতে পারিতাম। * * তাহা হইলে আমার স্বামীর অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম। আমি যাহা ভাল মনে করি না, এমন কোন কাজ আমার স্বামীকে করিতে দেখিলে কিম্বা সেইরূপ কোন কথা বলিতে শুনিলে মনে এত আঘাত পাই—সে সময় আমার মন বড় নিরাশ হয়। কারণ আমার স্বামী যে সকল বিষয়েই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি তাহাই বিশ্বাস করিতে চাই। বস্তুতঃ তিনি আমার চেয়ে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার মনে হয় Instinct আমার অধিক আছে।"

"সরলা তাঁহার স্বামীকে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবেন, এই আশায় আইন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লর্ড এলডেন যখন John Scott নামে পরিচিত ছিলেন; অর্থাৎ যখন তিনি লর্ড উপাধি পান নাই; এবং ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অত্যন্ত সংগ্রাম করিতেছিলেন; তৎকালে তাঁহার পত্নী তাঁহার জন্য কি করিয়াছিলেন;—একদিন সরলার স্বামী সরলাকে তাহা পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। একস্থানে লেখাছিল, লর্ড এলডেন সংসারের কোন কাজে মন দিলে, পাছে বা তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের উন্নতির কোনরূপ ব্যাঘাৎ ঘটে—সমগ্র শক্তি ব্যারিষ্টারী কার্য্যের উন্নতিতে নিয়োগ না হয়; এইজন্য লেডী এলডেন কখনো স্বামীকে সংসারের কোন বিষয় চিন্তা করিতে দিতেন না।"

"সরলা ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই লেডী এলডেনের তুল্য পত্নী হইতে চেষ্টা করিবেন। সরলা এজন্য ঈশ্বর চরণে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন। সরলার দৈনন্দিন লিপির একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, সরলা প্রার্থনা করিতেছেন :—

"হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে এবং আমার স্বামীকে দয়া কর। আমরা যেন দুজনে দুজনাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারি। আমি আদর্শপত্নী হইবার জন্য কত ব্যাকুল! প্রভু, তুমি আমাকে সাহায্য কর, সাহায্য কর।"

"সরলার সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঈশ্বর সরলার এই সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সরলা তাঁহার সংকল্প পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সংসারের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সচরাচর সংসারের যে সকল কার্য্য পুরুষেরা করিয়া থাকেন, সে সমস্ত কার্য্যও তিনি করিতেন। বলিতে গেলে তিনি তাঁহার স্বামীর সকল কার্য্যে মন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহার পরামর্শের বিপরীত যে দুই একটী কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারও পরিণাম দেখিয়া তিনি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে, সরলার পরামর্শানুসারেই চলা উচিত ছিল। ইহার পর তাঁহার স্বামী কি সাংসারিক কি বৈষয়িক, কোন কাজই তাঁহার মতের বিরুদ্ধ করেন নাই।"

সরলার স্বামীর এই সকল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে নয়নের সম্মুখে এমন একখানি মনোরম চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহা যেমন সরল, তেমনি বুদ্ধিসম্পন্ন, যেমনি স্নেহপ্রবণ, তেমনি কর্ত্তব্য পরায়ণ! বস্তুতঃ এক বৃক্ষের ফুল ও ফলের ন্যায় মাধুর্য্য ও মনস্বিতা, কোমলতা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান--সরলার মনের পাশাপাশি শোভা পাইত।

সর্ব্বশেষে সরলার স্বামী বলিতেছেন,—

"সরলা কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। তবে, সরলা যে তাঁহার চারিবর্ষব্যাপী বিবাহিত জীবনের দ্বারা, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু সৎ, তৎপ্রতি তাঁহার স্বামীকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।"

আমরা জানিনা, সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে ইহাপেক্ষা আর কি গৌরবের বিষয় আছে। যে স্ত্রীর মৃত্যুন্তে স্বামী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার মহদ্গুণ বর্ণনা করেন, সে স্ত্রীর রমণী-জন্ম সার্থক। উচ্চ শিক্ষায় অথবা পাশ্চাত্য আদর্শে রমণীরা যদি যথার্থই রান্না বান্নায় কিঞ্চিৎ অসমর্থা হন, এবং গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে একটু শিথিলভাব প্রকাশ করেন; কিন্তু জ্ঞানে ও কর্ম্মে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া যদি স্বামীকে পূর্ণ করিয়া তোলেন, স্বামীর সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া স্বামীর সকল কার্য্যকে সফল ও শ্রী সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে রমণীর উচ্চশিক্ষা সার্থক!

আমরা এখন সরলার বিশেষ বিশেষ সদ্গুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

সরলতা :—সরলার সরলতা বিষয়ে অগ্রেই অনেক কথা বলা হইয়াছে। তথাপি আরো কিছু বলিতে হইবে। কারণ সরলতাই সরলার জীবনের একটী বিশেষত্ব।* সরলার বাবা, মা যেন তাঁহার সরল ভাব দেখিয়াই সরলা নাম রাখিয়াছিলেন। সরলা দেখিতে খুব্ই যে একটা সুন্দরী ছিলেন, তাহাও নহে। অথচ উষার ফুলের মত নির্ম্মল মুখখানিতে শুভ্র হাসি হাসিয়া যখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার সেই হাস্যোজ্জ্বল সরল মূর্ত্তিখানি কি সুন্দরই দেখাইত! চোখে মুখে যেন সরলতার স্বচ্ছ আভা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত।

সরলার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সরলতা কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। এইজন্য তাঁহার জীবন শিশুর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ছিল। সরলার সরলতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী বলেন "লোকে যাহাকে শুভ্র মিথ্যা (white lie) বলে, সে শুভ্র মিথ্যাই হউক, আর কৃষ্ণ মিথ্যাই (Black lie) হউক, জ্ঞাতসারে তিনি কোনরূপ মিথ্যাই বলিতেন না। নিজের সম্বন্ধে অথবা অপরের সম্বন্ধে এমন অনেক অপ্রিয় সত্য কথা আছে, হিসাবী লোকেরা

প্রায়ই তাহা অন্যের কর্ণে প্রবেশ করিতে দেন না। “সে বিষয়ে কেহ কোন প্রশ্ন করিলেও এ কথা সে কথা বলিয়া আসল কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সরলা তাহা পারিতেন না। সরলা বাহিরের লোকের কাছে ঐরূপ অপ্রিয় সত্য বলিয়া ফেলিতেন বলিয়া কখনো কখনো তাঁহার স্বামী তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। কিন্তু সরলা বলিতেন “আমি কি করিব? “ও কথা সত্য কিনা?” আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করায়, আমি আর মিথ্যা বলিব কেমন করিয়া?”

“তিনি নির্ম্মল কাচখণ্ডের ন্যায় পবিত্র ছিলেন। সংসার তাঁহাকে কিছুমাত্র অপবিত্র করিতে সক্ষম হয় নাই। সংসারের ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা ও নিকৃষ্টভাব সম্বন্ধে বিবাহের পূর্ব্বেও তাঁহার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। বিবাহের পর বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশিয়া মানুষের শঠতা ও মন্দভাব অনেকটা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক সাধুতার প্রতি তাঁহার এমনই বিশ্বাস ছিল যে, কেহ কোন ব্যক্তির কুকার্য্যের উল্লেখ করিলে; সহজে তিনি প্রত্যয় করিতে চাহিতেন না। বলিতেন “এমন কথা কেন বলিতেছেন? ওরূপ খারাপ কাজও কি মানুষে করিতে পারে?”

দয়া :— সরলতার পরই সরলার দয়ার কথা বলা প্রয়োজন। যাঁহার হৃদয় কোমল নয়, অন্যের দুঃখে যাঁহার প্রাণ কাঁদে না; আর্ত্তের ক্রন্দন ধ্বনি যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে না, সেরূপ পাষাণ-প্রকৃতি মানুষের ভিতর সরলতাও থাকিতে পারে না। সরলার যেমনই সরলতা, তেমনই তাহার পাশে স্নেহ এবং করুণা ছিল। সরলা বাল্যকালে এক অন্ধ ভিখারীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ‘আহা, বেচারার কি কষ্ট! আমি বড় হইয়া যদি টাকা উপার্জ্জন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দুঃখীদের খুব দান করিব।” আমাদের একজন বন্ধু বলিলেন “যখন বড় হইবে, তখন আর একথা মনে থাকিবে না।”

কিন্তু সরলা তাহার বাল্যকালের এই সংকল্প বিস্মৃত হন নাই। তিনি বৃত্তিতে এক সহস্রেরও অধিক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কিছুই নিজের জন্য খরচ করেন নাই। অধিকাংশ টাকা দ্বারাই গরিব ছাত্র ও ছাত্রীদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। সরলা যখন বৃত্তি পাইতেন, তখন তিনি বোর্ডিংএ থাকিতেন। এই জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্র বন্ধু বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমরা জানি, সরলা দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য প্রতিমাসেই কেদার বাবুর হস্তে কিছু কিছু টাকা প্রদান করিতেন। সরলার বি-এ পরীক্ষার পর যখন আর তাঁহার নিজের হাতে টাকা রহিল না, তখন তিনি কেদার বাবুকে তাঁহার মাতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য কেদার বাবুর হস্তে কিছু কিছু অর্থ অর্পণ করিতেন।

সরলার এই দান সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন :—

“সরলা অতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। তাঁহার দানের বিষয় প্রকাশ হইলে বড়ই লজ্জিত হইতেন। এই জন্য গোপনে তিনি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। বৃত্তি দ্বারা প্রায় এক সহস্র টাকা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই টাকার একটা পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই। আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার একজন শিক্ষকের অভাবের সময় বৃত্তির টাকা হইতে দুইশত টাকা দান করিয়াছিলেন।”

“আমি বারম্বার দেখিয়াছি, অপরের ক্লেশ

নিবারণ করিবার জন্য কখনো কখনো তিনি আপনার হৃদয়ের ভাব ও মনের ইচ্ছাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার এক আত্মীয়া কোন বিবাহে অর্থাভাবে কিছুই যৌতুক দিতে পারিতেছিলেন না। অথচ সেই বিবাহে কিছু যৌতুক না দিলে সম্ভবতঃ পাত্রী তাহা মনে করিয়া রাখিবেন। সরলা স্বয়ং সেই পাত্রীকে উপহার দিবার জন্য একটী জিনিস ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আর একটী ক্রয় করিয়া যে তাঁহার আত্মীয়াকে অর্পণ করিবেন, এরূপ সুবিধা ছিল না। তখন তিনি নিজে উপহার প্রদানের আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া, তাঁহার দ্রব্যটী অম্লানচিত্তে উক্ত আত্মীয়াকে প্রদান করিলেন।"

লজ্জা ও বিনয়—সরলা পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বর্দ্ধিতা হইয়াও রমণী প্রকৃতির নিরুপম মাধুর্য্য যে লজ্জাশীলতা, তাহা কখনই হারান নাই। তিনি যাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিতেন, যাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, স্বাভাবিক সরলতা বশতঃ নিঃসঙ্কোচে ঠিক্ আপনার লোক মনে করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন; কত সময় ছেলে মানুষের মতন আদর আব্দার করিতেন। এই প্রবন্ধলেখক যতবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তুমি কেমন আছ?" বরাবরই জবাব দিয়াছেন "আমি তা বলিব না, আমার চেহারা দেখিয়া বুঝিয়া নিন।"

কিন্তু এই হাস্য ও কৌতুকের মধ্যে তাঁহাকে চপল হইতে দেখি নাই; চপলতা তিনি ভালবাসিতেন না। আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "মেয়েরা যে কেবল হাসে, ঠাট্টা করে, আমার তা ভাল লাগে না। শুধু মেয়েরা কেন, পুরুষদের সম্বন্ধেও আমার এই কথা। তবে দুঃখ এই যে, আমাকে ঐরূপ হাসি ঠাট্টার মধ্যেই অনেক সময় পড়িতে হয়। আমার বন্ধুরা যদি আমার সঙ্গে কোন মহৎ বিষয়ে কথা বার্ত্তা বলেন, তাহা হইলেই আমার আনন্দ হয়।''

সরলার হাসি খুসী ভাবের মধ্যেও এমন এক গাম্ভীর্য্য ও মনের দৃঢ়তা দেখিতে পাইতাম যে, হৃদয় শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িত।

সরলার এরূপ স্বাভাবিক লজ্জা ছিল যে, তিনি উচ্চশিক্ষিতা হইয়াও অপরিচিত লোকদিগের সঙ্গে মিশিতে সঙ্কুচিতা হইতেন। সরলার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ গান গাহিতে পারেন, হারমনিয়ম, পিয়োনা ও এস্রাজ বাজাইতে জানেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মধুর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করিতে পারেন। কিন্তু সরলা তাঁহার অতিরিক্ত লজ্জাবশতঃ পিয়োনা বাজানো ছাড়া আর কিছুই শিখিতে পারেন নাই। একবার তিনি আমাদের অনুরোধে "মুকুল" পত্রিকার জন্য একটী গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে কথা ছিল, তিনি যে সেই গল্পটী রচনা করিয়াছেন, তাহা মুকুলের সম্পাদক মহাশয়কেও জানান হইবে না। জানাইলে তাঁহার ভয়ানক লজ্জা হইবে। আর একবার তিনি একখানি ছবি আঁকিয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে উপহার দিয়াছিলেন। উপহার দিবার সময় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, "দেখুন, এই ছবিটা যে আমি আঁকিয়াছি, এ কথা আপনি আর কাহাকেও জানিতে দিবেন না।"

সরলার এই লজ্জাশীলতার সঙ্গে বিনয়েরও কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না। সরলা বড় লোকের মেয়ে, বড়লোকের পুত্রবধূ; নিজে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা—উপাধিধারিণী; তা বলিয়া একদিনও ত তাঁহাকে অহঙ্কার করিতে

দেখি নাই। বরং তাঁহার আত্মশক্তির প্রতি এমন একটা অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে,, কোন ভাল কাজের কথা বলিলেই বলিতেন, "আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি নাই।"

জ্ঞানানুরাগ :—সরলার বাল্যকাল হইতে লেখা পড়া শিখিতে কিরূপ যত্ন ছিল, তাহা পূর্ব্বেই এক রকম বলা হইয়াছে। এখানে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। সরলা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার কিছুদিন পূর্ব্বে রেঙ্গুনে তাঁহার পিতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতা আসিবার আয়োজন ঠিক হইল। কিন্তু জাহাজ ছাড়িবার দিন বঙ্গোপসাগরে ঝড় আরম্ভ হয়। সেই জন্য সরলার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন। কিন্তু পাছে বা পরীক্ষা দিতে কোন বিঘ্ন হয়, এই জন্য সেই ঝড়ের মধ্যে একজন অভিভাবকের সঙ্গে কলিকাতা চলিয়া আসেন। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

সরলা বি-এ পাশ করিয়া এবং বিবাহ করিয়াও বিদ্যা দেবীকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি অধিকাংশ সময়ই অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। সরলার এই অধ্যয়নের বিষয় চিন্তা করিলে, এ দেশের অয়নক জ্ঞানগর্ব্বিত পুরুষকেও লজ্জিত হইতে হয়। সরলার দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি এক একখানি গ্রন্থ অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন; এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টী বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতেন। আবার সেই চিন্তাগুলি দৈনন্দিন লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আমরা তাঁহার দৈনন্দিন লিপির দুই একটী স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

২১শে মার্চ্চ, ১৮৯৮।

(টমাস্ হার্ডিস প্রণীত Two in a Tower" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।)

"আমরা যাঁহাদিগকে ভালবাসি, তাঁহাদিগের উপকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই কত ব্যস্ত হই, এ বিষয়ে আমরা কতই অধীরতা প্রকাশ করি। কত সময় আমাদের অহং ভাব আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তথাপি মনে করি, আমরা প্রিয়জনেরই মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সেরূপ করা কি ঠিক? আমরা যখন সম্পূর্ণরূপে আমাদের আমিত্বকে প্রিয়জনের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করিতে পারি, প্রকৃতপক্ষে তখনই আমরা প্রিয়জনের মঙ্গল সম্পাদন করিতে সমর্থ হই।"

২৪শে মার্চ্চ, ১৮৯৮।

টেনিসনের জীবন-চরিত পড়িতে পড়িতে লিখিয়াছেন :—

"টেনিসনের Mrs. Vyner এর লিখিত চিঠিখানি এবং তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিগুলি বড়ই সুন্দর :—

"The only thing that makes life, when far away from home and friends, alone and in a wild country, beautiful and endurable is the strong and stern sense of duty, the consciousness that where God has placed us is our lot to be, and that our most becoming posture is to accept our destiny with grateful humility."

"এই সকল কথা অতি সত্য। কিন্তু এই প্রকার কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান ঠিক রাখা কতই কঠিন। যদিও আমাদের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সহ্য করিয়া যাই; এবং বলি যে, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।" কিন্তু এই উক্তি দ্বারা কি প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, না ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে বিধান করেন, সেই বিধানকে নত মস্তকে মানিয়া লওয়া হয়? এই প্রকার নির্ভর কখনই ত অকৃত্রিম নহে। আমাদিগকে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমাদের পক্ষে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ঈশ্বর তাহা জানেন, এবং তিনি আমাদের আত্মার পক্ষে যাহা কল্যাণজনক, তাহাই বিধান করিতেছেন। আমাদের সুখ দুঃখ উভয়ের জন্যই পূর্ণ অন্তরে তাঁহার নিকট

কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। আমাদের এইরূপ অবস্থা হইলেই আমরা যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতেছি, এ কথা বলা সার্থক হইবে।"

আমরা ভাবিয়াছিলাম, আরো কয়েকখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে সরলার চিন্তাপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করিব। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা আর করিলাম না।

এই অধ্যয়নের ফলে ইংরাজী ভাষা তাঁহার কাছে মাতৃভাষার মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফরাসী ভাষা এরূপ উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন যে, উক্ত ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় কিছু লিখিবার জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বাঙ্গলা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই গদ্য ও পদ্যের বিশেষ অনুরাগিনী পাঠিকা ছিলেন। তিনি বলিতেন "আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময় বাঙ্গলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ লেখক এবং শ্রেষ্ঠ কবি।" রবীন্দ্র বাবুর কোন সুন্দর রচনা প্রকাশিত হইলেই তিনি তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধ-লেখককে পত্র লিখিতেন। তাঁহার এক খানি পত্র আমাদের সম্মুখে আছে। তাহার এক স্থানে লিখিয়াছেন:—"প্রদীপ পড়িয়াছি। রবি বাবুর কবিতাটী বড় ভাল লাগিয়াছে। "ভারতী"ও আসে। রবি বাবু প্রায় সমস্তই লিখিয়াছেন। Sedition Bill এর Lecture টী অতি সুন্দর।"

মহৎ বিষয়ে অনুরাগ ও মহৎ কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা:—সরলতার সাধুতা ও মহদ্বিষয়ের প্রতি এমনই অনুরাগ ছিল যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিতেন। তিনি ত কত রকমই বই পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার ডায়েরীতে হাস্যামোদ ও অসার বিষয়ে একটী কথাও দেখিতে পাই না। কিন্তু যেখানেই মহৎ বিষয়ে একটী ভাল কথা পাঠ করিয়াছেন, সেই খানেই সেই ভাল কথা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন; এবং সেই চিন্তা দৈনন্দিন লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে কোন মহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে শুনিলেই তৎসঙ্গে তাঁহার যোগ রাখিতে ইচ্ছা হইত। যে সকল যুবকেরা সমাজের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সরলার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সরলা তাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই শ্রেণীর যুবকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা ছিল।

সরলার ভাল হইবার জন্য এবং ভাল কথা শুনিবার জন্য কিরূপ যত্ন ছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

সরলার বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যুবকদিগের জন্য একটী "মণ্ডেমিটিং" করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রতি সোমবার স্বয়ং সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া যুবকদিগেব সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতেন, এবং নানা প্রকার সৎকার্য্যে যুবকদিগকে উৎসাহিত করিতেন। সরলা এই সভার কথা শুনিয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "আমার ঐরূপ সভার সঙ্গে যোগ রাখিতে বড়ই ইচ্ছা হয়।"

বন্ধু বলিলেন "বেশ ত, তুমি প্রতি সোমবার সভাতে যাইবে, শাস্ত্রী মহাশয় তোমার বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন!"

সরলা কহিলেন "না না, সেখানে সকলেই পুরুষ, তাঁহাদের মধ্যে আমার ভারি লজ্জা হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা

হইলে আমি বলিব, "আপনি বড় ছেলেদের জন্য মণ্ডেমিটিং করিয়াছেন, বড় মেয়েদের জন্য কি কিছু করিতে পারেন না? বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য সাণ্ডে স্কুল আছে; বড় মেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষার ত কোন বন্দোবস্তই নাই।"

সরলা শাস্ত্রী মহাশয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সরলার অনুরোধে বয়স্কা মেয়েদের ধর্ম্মালোচনার জন্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সরলার মহৎ বিষয়ে শুধু যে আলোচনা করিতেই আগ্রহ ছিল, তাহা নহে। কোন মহৎ কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য, কোন ভাল কাজ করিবার জন্য তাঁহার মন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার ডায়েরী পড়িলেই উৎকৃষ্টরূপে অনুভব করা যায়। আমরা এস্থলে তাঁহার ডায়েরী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

" ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রেল।

জগতে চিরস্থায়ী কিছু করিয়া যাইতে হইবে। কিছু না করিয়া, আমার অস্তিত্বের কোন চিহ্ন না রাখিয়া, যেমন সংসারে আসিয়াছিলাম, তেমনি যেন চলিয়া না যাই।"

১০ই আগষ্ট।

আমার মনে হয়, আমি শীঘ্রই মরিব। জানি না, কেন এ ভাব আমার মনে উদয় হয়। আমি কাঁদিতেছি। হায়, আমি কাহারো জন্য কিছুই করিতে পারিলাম না। এমন কি, সতীশের জন্যও না। প্রায়ই মনে করিতাম, আমি কিছু না কিছু করিতে পারিব। কিন্তু দেখিতেছি, আমাতে কোন পদার্থ নাই। এত দুর্ব্বল, আমি কি করিব, বুঝি না। আত্ম জীবন লইয়াও সুখী নহি, কাহারো জন্য এ পৃথিবীতে কিছু করিতেছি না। আমার জীবন নিতান্তই অসার!"

দেশের কোন ভাল কাজ করিবার জন্য সরলার মনে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কিছুই করিতে পারিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এ দেশে রমণীদিগের কাজ করিবার উপযুক্ত কোন ক্ষেত্রই নাই। যে টুকু আছে, তাহার মধ্য হইতেও সরলা তাঁহার উপযুক্ত কোন কার্য্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই। তাঁহার বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা সামান্য, এ জন্য, কোন ভাল কাজের কথা বলিলেই লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন। বলিতেন "এইরূপ কাজ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু শক্তি কোথায়? আমার ইচ্ছা আছে, শক্তি নাই।"

সরলা তাঁহার এই শক্তির অভাব সম্বন্ধে ডায়েরীতে লিখিয়াছেন,—

"আমি ফরাসী ভাষা হইতে যে পুস্তকখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া সতীশ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, আমি বেশ সুন্দর করিয়া পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়াছি। আমি কি গর্ব্বিতা! সামান্য একটু প্রশংসা আমাকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত এবং সেই সময়ের জন্য অহঙ্কারী করিয়া তোলে। তবে আমার এই ভাব নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। একটু পরেই আমি এ সকল ভুলিয়া যাই। এবং আমার চির-অভ্যস্ত আত্ম শক্তির প্রতি নির্ভরহীনতা জয়লাভ করে। যদিও বাল্যকাল হইতে জর্জ্জ ইলিয়ট উল্লিখিত "অদৃশ্য গায়কদলের" সঙ্গে যোগ দিবার জন্য আমার উচ্চাভিলাষ, তথাপি আমার কখনই মনে হয়না যে, আমি কোন কাজ করিতে পারি, অথবা কোন কাজ করিতে সমর্থ হইব। এই আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস আমার জীবনের এক মহৎ দোষ। ইহা আমার অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বর আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন, এবং আমার এই জীবনকে পৃথিবীতে থাকিবার উপযুক্ত করুন।"

সরলার স্বামী লিখিয়াছেন, "সরলা প্রতিকূল সমালোচনাকে বড় ভয় করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—"কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যদি কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করেন, আর যদি সেই কার্য্যের

দোষ ত্রুটি দেখিয়া লোকেরা তীব্র সমালোচনা করে, তাহা হইলে সমালোচনার ভয়ে সমস্ত জীবনে আর কোন কাজ করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং প্রথম তিনি শিখিবেন, কাজের জন্য প্রস্তুত হইবেন, তৎপর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।”

আমরা শেষকালে তাঁহাকে সাময়িক পত্রে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের অনুরোধে পড়িয়া ‘ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার” নামক ব্রাহ্মসমাজের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী লিখিতে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার জন্যই তাঁহার আগ্রহ ছিল। তিনি বালকদিগের "মুকুল” পত্রিকার জন্য একটী গল্প রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সেটী আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ইহা ছাড়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সংস্কৃত না জানিলে কেহ ভাল বাঙ্গালা রচনা করিতে পারে না। তজ্জন্য তিনি পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্র বাবুর প্রণীত সংস্কৃত শিক্ষার বই কয়েকখানি সমাপ্ত করিয়া “নলদময়ন্তী” পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, বুদ্ধিমতী রমনী যদ্যপি সংস্কৃত শিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের অনেক উপকার হইত।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সরলা তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে বড় সঙ্কুচিতা হইতেন। এবং তাঁহার ধারণা ছিল, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তবে আমরা জানি, উপাসনায় তাঁহার বেশ অনুরাগ ছিল। ভক্তিভাবে উপাসনায় যোগদান করিতেন। প্রতিদিনই রাত্রে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিয়া এবং একটী প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিতেন। কিন্তু ইহা অতি সামান্য কথা। ইঁহার দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই তরুণ-বয়স্কা রমণী হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে কি উজ্জ্বল ধর্ম্ম বিশ্বাস পোষণ করিতেন। আমরা সরলার দৈনন্দিন লিপির কয়েকটী স্থান হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“This love is wholly selfish and is no love at all, since it does not smite the chord of self and make it pass out of sight, but only strikes it out louder and brings it more into prominence. I don't think I was so selfish before. Now I want Satish to think of me and love me and me alone and no one else. I sometimes feel afraid when I think that this morbid love I have for S. will make me forget everything and every body and God will be displeased and take him away from me. Oh God, I cannot think of it. As I am writing my eyes are filling. Oh God, I hope Thou will moderate my love and make it pure and holy and just what Thou wouldst like it to be. Oh God, help me to love Thee and be of some use to Thee.”

“আমার (স্বামীর প্রতি) এই ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপর, এবং প্রকৃত ভালবাসা নয়। কারণ ইহা আমার আমিত্বের তন্ত্রীকে ছিন্ন করিয়া দেয় না। আমিত্বকে দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া দেয় না; বরং আরো উচ্চ হইতে উচ্চতর সুরে ইহাকে বাজাইয়া তোলে। আমার মনে হয় না যে, আমি আগে এতটা স্বার্থপর ছিলাম। এখন আমি ইচ্ছা করি, সতীশ কেবল আমাকেই ভালবাসুন, আমারই চিন্তা করুন, আর কাহারো নহে। সময় সময় আমার এ কথা মনে করিয়া ভয় হয় যে, সতীশের প্রতি আমার এই অসঙ্গত ভালবাসার জন্য আমি আর সকল বস্তু, ও সকল ব্যক্তিকে ভুলিয়া যাইব, এবং তখন ঈশ্বর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবেন। উ! ঈশ্বর, আমি এই কথা ভাবিতে পারি না। লিখিতে লিখিতে অশ্রুতে আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে প্রভু, আমি আশা করি, তুমি আমার ভালবাসাকে সংযত ও পবিত্র করিবে, এই ভালবাসা তুমি যেরূপ হওয়া উচিত মনে কর, সেইরূপই করিয়া

লইবে। হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবাসিতে এবং তোমার কোন কাজের উপযুক্ত হইতে আমাকে সাহায্য কর।"*

এই বর্ণনাটী পাঠ করিয়া এক দিকে যেমন সরলার স্বামীর প্রতি সরলার অপূর্ব্ব ভালবাসা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, অন্য দিকে তাঁহার মহদ্ভাবের বিষয় চিন্তা করিয়াও পুলকিত হইতে হয়; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী সহজ সুশোভন ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

যে সকল রমণী আর সকল ভুলিয়া কেবল স্বামীকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারেন, আমরা তাঁহাদিগকে সাধ্বী এবং সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করি। কিন্তু সরলা আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ এই ভালবাসাকে অসঙ্গত মনে করিয়া ভয়ে ভীতা হইয়া ঈশ্বর চরণে ক্রন্দন করিতেন, এবং ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্য ও তাঁহার প্রিয় কাজ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন।

এই উন্নত আদর্শ অকৃত্রিম বলিয়া মনে করা অনেকের পক্ষে কঠিন হইতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, সেই সরলা রমণী কৃত্রিমতার কোন ধার ধারিতেন না। তিনি শৈশবে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গপ্রাণা অনুপম ধর্ম্মবিশ্বাস-সম্পন্না রোমাণ-ক্যাথলিক নান্‌দের কাছে থাকিয়া যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কোমল প্রাণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মভীরুতা তাঁহার মধ্যেও পরিলক্ষিত হইত।

ইঁহার ডায়েরীর অন্য এক স্থানে আছে,—"অন্তর্জ্জগতের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করা হইলে, আমরা পুনঃ পুনঃ সতর্কতার বাণী শুনিতে পাই। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিলে সে বাণী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, পরে আর সে বাণী শ্রুতিগোচর হয় না। আমাদিগের ধ্বংসই তাঁহার অবশ্যম্ভাবী ফল।"

অন্যত্রঃ—"আমার সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে আমি অতি অহঙ্কারী; এবং সহজেই এত উত্তেজিত হই যে, সুখ দুঃখের সময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিতে পারি না। অনেক সময় সত্য সত্যই আমি অকৃত্রিম ভাবে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আমি যাহার উপযুক্ত নই, তাহার চেয়ে অনেক অধিক আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু যখন মনে অবসাদ ও অশান্তি আসিয়া পড়ে, তখন আমি কিয়ৎ পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া পড়ি।"

সরলার মনে এইরূপ ধর্ম্মভাব ছিল বলিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সরলার স্বামী বলেন, "সরলার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যখন তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, এবং যখন তিনি আপনাকে কোন কাজের উপযুক্তা বলিয়া মনে করিবেন, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন মহৎকার্য্যের সঙ্গে যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন।"

যদি যথার্থই উচ্চ শিক্ষিতা ও সম্পদের ক্রোড়ে বর্দ্ধিতা একটী রমণী ব্রাহ্মসমাজের কোন মহৎকার্য্যের সঙ্গে যোগদান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য ও দৃষ্টান্তে সমাজের অনেক উপকার হইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। কে জানে স্বর্গে তাঁহার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই তিনি অকালে এই সুন্দর পুষ্পটীকে বৃন্তচ্যুত করিলেন, এবং আপনার নির্ম্মল হস্তে পুষ্পটী তুলিয়া লইয়া

---

* এই ডায়েরীর ফুট নোটে সরলার স্বামী লিখিয়া রাখিয়াছেন:—"সরলার স্বামীর প্রতি ভালবাসা এত অধিক ছিল যে, তাঁহার সর্ব্বদাই ভয় হইত, এই ভালবাসা পাছে বা তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এখানে বলা আবশ্যক, তাঁহার জীবনে কখনো এরূপ হয় নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি এ জন্য ভয় করিতেন।"

কালের অসীম রহস্যে চিরদিনের মত লুক্কায়িত করিলেন !

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরলার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে অল্প একটু জ্বর হইত ; কিন্তু কয়েক দিন পরে তাহা সারিয়া যায়। তৎপর একদিন (১৯০১খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর) বেলা সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ তাঁহার পেটে ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হয়। এই সাংঘাতিক বেদনায় রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসককে ডাকান হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না। সরলা এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত এই বেদনা সহ্য করিয়া সংসারের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করেন। সরলার মৃত্যুতে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া সরলার স্বামীর নিকট পত্র লিখিয়াছেন। আমরা সে সকল পত্র প্রকাশ না করিয়া এস্থানে কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান-মেসেঞ্জার হইতে সরলা সম্বন্ধীয় কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অনেকে মনে করেন, উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত মহিলারা সাংসারিক কাজের অযোগ্য হইয়া থাকেন। তিনি (সরলা) স্বীয় জীবনে এই অভিযোগের অসারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি সুন্দর সুগৃহিণী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। সমাজের ও দেশের সেবা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি মেসেঞ্জার পত্রিকাতে সময় সময় লিখিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা ছিল।" তত্ত্বকৌমুদী, ১লা পৌষ, ১৮২৩ শক।

"Their married life was the very happiest possible. Mr. Das found in her a friend and a counsellor of rare judgment. Highly educated as she was, she was an excellent housewife, and in her short life gave a concrete refutation of the charge that high education unfits women for domestic duties. When her husband was pushing his difficult way in the Calcutta bar, she encouraged him in his difficulties and disappointments. She was by nature retiring. But to the small circle of her friends she was the very emblem of courtesy, kindness and amiability. She always longed to be of some service to her country and Church ; and deplored that there was no field for her work. She was an occasional contributor to the INDIAN MESSENGER and the Mukul. Mrs. Das was only twenty three at the time of her death. In her we have lost a promising young lady and an ardent member of the Brahmo Somaj. We do not know what words of consolation to offer to her bereaved husband, and parents, except that she is happy in the land where she has passed, and that they have our sincerest sympathy in their grief. May God almighty give them grace and strength to bear their loss." INDIAN MESSENGER.

8th December, 1901.

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

নিশীথে।

(১)

হৃদয়ে আমার এস একবার
সখাহে, বিজনে বসাব !
গোপন বারতা মর্ম্মের কথা
সরম তেজিয়া শুনাব।

নিত্য যাহারা সহচর,
বান্ধব যারা প্রিয়তর,
একটী বর্ণ তাদের কর্ণে
প্রবেশিলে লাজে মরিব

আঁধার নিশিতে তাই হে
একেলা তোমারে চাই হে,
চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া সাধিয়া
প্রার্থনা কত করিব।

(২)

যবে থাক দূরে, ইঙ্গিত কোরে
সঙ্গীতে গাহি যাতনা;
সে দুঃখ বেদনে আকুল রোদনে
তুমি কি কখনো কাঁদনা ?

তুমি যদি পতি জগতের,
তুমি যদি সখা হৃদয়ের,
তেজি এ বক্ষ কেন অলক্ষ্যে
রবে দূরে দূরে বল তা ?
নিত্য রহ গো সহচর,
বান্ধব হতে প্রিয়তর,
আমার হৃদয়ে নিভৃত নিলয়ে
অন্তরপুর-দেবতা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চট্টগ্রামে মহামুনির মেলা।

চৈত্র সংক্রান্তিতে বিষুপূজা পূর্ব্ববাঙ্গালার সর্ব্বত্র দেখা যায়। বিষুব সংক্রান্তি হইতে বিষুর জন্ম হইয়া থাকিবে, অথবা বিষু হইতে বিষুব, কে বলিবে ? চট্টগ্রামে বিসু বিষু নামেই পরিচিত। খ্রীষ্টিয়ানের ক্রিষ্টমাসের ন্যায় বিষুর দিনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করিতে হয়। বিষু বিহু নামে আসাম অধিকার করিয়া আছে। আসামে কখনও যাই নাই, বিহুর উৎসব দেখি নাই, শুনিয়াছি, হিন্দুস্থানীর হোলির ন্যায় আসামে বিহু উৎসব।

এই চৈত্র-সংক্রান্তিতে হিন্দুর চড়কে ধর্ম্মপূজা। চড়ক বোধ হয় রাশি-পরিবর্ত্তনের পরিচায়ক। চড়ক পূজা গম্ভীরা, গাজন ও ধর্ম্মপূজা নামে বিভিন্ন স্থানে পরিচিত। পৌত্তলিক পৌষপার্ব্বণকে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টমাস নাম দিয়া একটী খ্রীষ্টান উৎসবে পরিণত করিয়াছে। চড়কের বীভৎস পৌত্তলিক উৎসবকে বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপূজা নাম দিয়া এবং হিন্দুরা বিষ্ণুপূজা নাম দিয়া আপন আপন উৎসবে পরিণত করিয়া থাকিতে পারে। চড়কপূজায় হিন্দুরা হরগৌরীর ও বিষুপূজায় একই দিনে নারায়ণের পূজা করে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় এইরূপ দেখা গিয়াছে। বিষ্ণু হইতে বিষুর উৎপত্তি অসম্ভব নহে এবং বিষুকে বিষ্ণুতে পরিবর্ত্তন করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

বিষুপূজার দিনে অগ্নিপক করিয়া কিছু খাইবার নিয়ম নাই। সাধারণতঃ লোকে ছাতু খাইয়া থাকে। চট্টগ্রামে দেখিলাম, এই দিন কোন হিন্দু গাভী দোহন করে না। কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় গোদোহন নিবারিত নহে। রাজসাহী অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী পৌণ্ড্র বা পোঁড়াজাতি কখন দুগ্ধ খাইত না। আসামের কোন কোন পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে দুগ্ধপান এখনও নিষিদ্ধ আছে। ছাতু খাওয়া ও গাই না দুহিবার ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব।

সে যাহা হউক, এই চৈত্র-সংক্রান্তিতে চট্টগ্রামে একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে, তাহার নাম মহামুনির মেলা। মহামুনি বৌদ্ধদেব। চট্টগ্রাম হইতে উত্তরে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে, কর্ণফুলীর পশ্চিম পার্শ্বে, পাহাড়ের নিকটে পাহাড়তলি নামক একটী গ্রামে এই

মেলাটী হয়। এই পাহাড়ের এক প্রান্তে মঙ্গ, মধ্যে চাকমা এবং অপর প্রান্তে বোমঙ্গ-জাতির বাস। পাহাড়তলি বৌদ্ধ গ্রাম। বড়ুয়া নামে অনেকগুলি বৌদ্ধ গৃহস্থ এই গ্রামে বাস করেন। গ্রামের ভিতর একটী কিয়াঙ অর্থাৎ বৌদ্ধ পাঠশালা আছে। দুই টীস্থবির বা মোহন্ত রাউলি নামে এই কিয়াঙের অধ্যক্ষতা করেন। ব্রহ্মভাষায় বৌদ্ধ শিশুদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ করান, যাহারা শ্রমণ হইতে চাহে বা দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহে, তাহাদিগকে মন্ত্রদান, বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি রাউলিদিগের কার্য্য। হিন্দু পুরোহিতদিগের ন্যায় রাউলিরা সাধারণতঃ অশিক্ষিত। পালিভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহার অর্থও বুঝে না, ভাল করিয়া উচ্চারণও করিতে পারে না। তথাপি তাহাদিগের প্রভুত্ব ও সম্পত্তি যথেষ্ট।

বুদ্ধদেব কখন ভক্তিমার্গের শিক্ষা দেন নাই। কমনীয় বৃত্তির উৎকর্ষের প্রয়োজন বুঝেন নাই। জ্ঞানমার্গে দুঃখের আত্যন্তিক নিরস্তরতা বুঝিয়া সচ্চরিত্রতার অনুশীলনে দুঃখের নিবৃত্তি করিতে শিখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানীর ধর্ম্ম। অজ্ঞান নিম্নশ্রেণী হিন্দু ধর্ম্মের আবশ্যকতা না বুঝিলেও, ভক্তি-মার্গের উৎকর্ষণ হেতু তাহার প্রকৃতিতে ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সে দেবতার কাছে অবনত মস্তক, তাহার হাবভাবে একটু শান্তভাব। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী বৌদ্ধ যদি হিন্দু সমাজের পার্শ্বে বাস করে, তাহার একটু ধর্ম্মভাব দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুসমাজের বাহিরে অবস্থিত অশিক্ষিত বৌদ্ধের চরিত্র নির্দ্দোষ হইলেও তাহার ব্যবহারে ভক্তিভাব দেখা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন ভারতবর্ষে যাহারা বৌদ্ধ আছে, তাহারা পার্ব্বতীয় মঙ্গোলিয়ান জাতি অথবা খুব নিম্নশ্রেণীর অনার্য্য জাতি। উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা তন্তুবায় শরাক জাতি নামে বিখ্যাত। বোধ হয়, ইহারা পূর্ব্বে শ্রাবক ছিল। তাহারা এখনও তথাগত বুদ্ধের আদর যথেষ্ট করিলেও, কালী তারা গণেশের পূজা করে এবং তাঁহাদের মন্ত্রগুলি বাঙ্গালা, উড়িয়া ও পালি মিশ্রিত। হাড়ী ডোম বাউরীর মধ্যে ধর্ম্ম পূজার আধিপত্য। তাহারা অনার্য্যজাতি, হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া অতি নিম্ন শ্রেণীতে অবস্থিত আছে। যে সকল সাঁওতাল এখন হিন্দু হইতেছে, তাহারাও হিন্দুসমাজের নিম্নতম সোপানে স্থান পাইতেছে।

চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ অধিকাংশ বড়ুয়া। বড়ুয়া উপাধি কোথা হইতে আসিল? আসামের উত্তর হইতে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পর্য্যন্ত, কামাখ্যা হইতে চন্দ্রনাথ এই বড়ুয়া শব্দ শুনা যায়। ব্রাহ্মণ, সূত্রধর নানা জাতির উপাধি বড়ুয়া। স্বর্গগত মহাপুরুষ রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া ও বলী নারায়ণ বড়ুয়া ব্রাহ্মণেতর-জাতি। ভাবিয়াছিলাম, বটু হইতে বড়ু ও বড়ুয়া হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ রাজ-বৈদ্য ছিলেন, তাঁহারা বৈদ্যবটু বা বেজ-বড়ুয়া হইয়াছিলেন। জটিলাকে চৈতন্য-চরিতামৃতে “বড়ুয়ার ঝি” বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি ত গোয়ালার মেয়ে।

চট্টগ্রামের বড়ুয়াদিগকে হিন্দুরা রাজবংশী বা চণ্ডালজাতীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাদের ব্যবহার জোলাদের মত, হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবহার-মিশ্রিত। পরিচ্ছদ হিন্দুর

মত, মেয়েদের অলঙ্কার মুসলমানের মত। শুনিয়াছি, ইহারা পূর্ব্বে শূকর মাংসও খাইত। এখন বাড়ীতে মুরগী পোষে, দেখিয়াছি। চাষবাস করে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান কিছুই নাই। কখন কিয়াঙে গিয়া রাউলির পদধূলি লয়, কখন শিবপূজায় যোগ দেয়, কখন ব্রাহ্ম হইতে যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই তাহাদের ঘৃণা করে। সহানুভূতি পাইবার আশায় এদিক ও ওদিক দৌড়ায়। যদি কোন বৌদ্ধ ইহাদিগকে চালাইতে পারেন, চট্টগ্রামে আবার বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কর্ণেল অলকাট ও মহাবোধি-সমিতির সুবাতাসে ইহাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইতেছে। হিন্দু পূজা পদ্ধতি ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বিবাহাদি-ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধমতে হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। মাংসভক্ষণে অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে।

চট্টগ্রামের পার্শ্বে যে সকল পার্ব্বতীয় জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে মঙ্গ, চাকমা ও বোমঙ্গেরা বিখ্যাত। সংখ্যায় চাকমারা বেশী। মহামুনির মেলায় চাকমাদের অপেক্ষা মঙ্গের সংখ্যা অধিক দেখিলাম। এজন্য এই মেলাকে মগের মেলা বলিয়া থাকে। হিন্দুস্থানের ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাইএর যেমন গৌরব, চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশে চাকমাদের ভূতপূর্ব্ব রাণী কালিন্দীর তেমনি গৌরব। কাপ্তেন লুইন ও কালিন্দীরাণীর সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাইলাম। সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই বলিয়া সে সকল কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। রাজা ভুবন এখন চাকমাদের রাজা। তিনি বাঙ্গালীপ্রিয়। চাকমারা একরকম বাঙ্গালা বলে, প্রায় চট্টগ্রামের বাঙ্গালার মত। শুনিলে বুঝা যায়। পূর্ব্বে মহামুনর মেলায় চাকমারা বহুসংখ্যায় উপস্থিত হইত। কিন্তু মগদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হইত বলিয়া এখন একই দিনে, চৈত্র সংক্রান্তিতে তিন চারিক্রোশ দূরে চাকমাদের স্বতন্ত্র মেলা হয়। কিন্তু অন্য মেলায় যাইতে কাহারও নিবারণ নাই।

মঙ্গদিগের অন্য নাম জুমিয়া। জঙ্গলের মধ্যে একটী গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে সারা বৎসরের মত বীজ রাখিয়া জঙ্গল আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। সেই বীজ হইতে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়! এইরূপ চাষকে জুম বলে। যাহারা এইরূপে চাষ করে, তাহাদিগকে জুমিয়া বলে। চাকমা ও বোমঙ্গেরাও এইরূপে চাষ করে। সুতরাং কেবল মঙ্গদিগকে জুমিয়া বলিলে ভুল হয়।

মঙ্গ, বোমঙ্গ ও চাকমা সকলেই গৌরবর্ণ, তবে মঙ্গদিগের মধ্যে এক এক জন শ্যামবর্ণ দেখা যায়। চাকমারা সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ এবং মঙ্গ ও বোমঙ্গদিগের অপেক্ষা বর্ণে ও চেহারায় ব্রহ্মবাসীদিগের অদিকতর নিকটবর্ত্তী। ব্রহ্মাণী দাঁড়াইলে মাথার চুল পায় লুটাইয়া যায় দেখিয়াছি। চাকমানীর চুল তত বড় নহে। মঙ্গ ও চাকমা রমণী পরচুলও ব্যবহার করে। বোধ হয়, মঙ্গদিগের অপেক্ষা চাকমাদের চুল বড়।

পরিচ্ছদে মঙ্গ ও চাকমাদের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে, প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষ্য হইবে না। একখণ্ড লুঙ্গী বা থগড়া সকলেই পরে। কোমর হইতে বুক পর্য্যন্ত খোলা। বুকের উপর আধ হাত বিস্তৃত একখানি কাপড় জড়াইয়া বুক ঢাকিয়া রাখে। দুইখানি কাপড়ই গৃহনির্ম্মিত। বুকের কাপড়খানিতে নানা কারুকার্য্য রচনা করে। বোমঙ্গ নর নারী মাথায় একখানা রুমাল বা কাপড়

সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখে। তিন জাতির মধ্যে মেয়েদের কেহ কেহ এক একটা জ্যাকেট পরে। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধাদের সংখ্যা অধিক। গলার মালা দেখিয়া বুঝা যায়, কে কুমারী, কে বিবাহিতা। মঙ্গ রমণীর লুঙ্গী প্রায় এক বর্ণের। কিন্তু চাকমা রমণীর লুঙ্গী বিবিধ বর্ণের। চাকমাদেব মধ্যে দুই শ্রেণী। যাহারা নবাগত, তাহাদিগকে আসল চাকমারা স্থান দেয় না। আসল চাকমা রমণীর লুঙ্গীর মধ্যভাগ কালরঙ্গের ও দুই প্রান্ত লাল। নবাগতদের লাল, কাল, হলদে, বিবিধ রঙ্গের।

জুমিয়া ও চাকমা সকলেই নানারঙ্গের পুঁথির মালা গলায় পড়ে। কাণে ঝুমকা দেয়। কেমিকাল রূপার গহনা হাতে ও গলায় পরিতে শিখিয়াছে। সকলেই মাথায় ফুল গুঁজে। বনফুল অভাবে কাগজের ফুল চলে। পুরুষেরা টুপিতে ফুল গুঁজিয়া দেয়। পুরুষদিগের প্রায় সকলে বিলাতী ধুতী পরে। গায় কোট ও মাথায় টুপি। যুবকদের হাতে এক একটা বাঁশী থাকে। মেলায় আসিয়া বেহালা বা এসরাজ কিনিতে ইহারা যথেষ্ট ব্যয় করে। বাজাইতে জানে না, তবু রাত দিন খ্যাঁ খোঁ করিতেছে। তিন দিন মেলায় থাকে, তাহার মধ্যে একটা ভাঙ্গিবে, বাড়ী ফিরিবার সময় আর একটা কিনিয়া লইয়া যাইবে।

চেহারা ও পরিচ্ছদ সকলেরই সুন্দর। তবে খুঁত ধরিতে বসিলে দোষের অভাব থাকে না। অনাবৃত স্কন্ধ বাহু ও বক্ষের অর্দ্ধাংশে কেহ শীলতার অভাব মনে করিতে পারেন। কিন্তু বক্ষের পীনতা এত সামান্য যে, আমার চক্ষে পরিচ্ছদটী অশ্লীল বোধ হইল না। সাধারণতঃ সকলেই কৃশাঙ্গিনী। মুখের বিস্তৃতি দীর্ঘতা হইতে অল্প, নাক তত চাপা নহে, চোখ তত ছোট নহে। লেপচাদিগের অপেক্ষা সুন্দরী, প্রায় ব্রহ্মাণীর মত। গাউন পরাইলে অনেককে মেম সাহেব বলিয়া চালান যাইতে পারে। শরীরের উর্দ্ধভাগের অপেক্ষা অধোভাগ অপেক্ষাকৃত হ্রস্বায়তন। পা দুখানি খর্ব্ব পেশল ও ব্যাবৃত, আসামী মহিলার ন্যায়। পায়ের পাতা কুৎসিত-বিস্তৃত।

এই পার্ব্বতীয় জাতি সকলেই বৌদ্ধ। শতকে দশ জন, প্রায়ই বয়স্কেরা শুভ্রবস্ত্রে মন্দিরের ভিতরে যাইয়া মহামুনির সম্মুখে ফুল ও ভাত রাখিয়া দেয়, দু একটী গাথাও পড়ে, বাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়। যুবক যুবতীরা দল বাঁধিয়া বেহালা, বাঁশরী বা এসরাজ বাজাইয়া, কেহ কেহ নাচিয়া নাচিয়া প্রদক্ষিণ করে ও মাঝে মাঝে ফুঁকি দেয়। প্রদক্ষিণ করিয়া ক্লান্ত হইলে একবার বাহির হইয়া কিছু খাইয়া আসিয়া আবার প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। শুনিয়াছি, এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে বিবাহের কথাটা ঠিক করিয়া লয়। কেহ কেহ মাটীতে গর্ত্ত করিয়া জল দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহার পার্শ্বে কাগজের পতাকা পুতিয়া দেয়। কেহ লম্বা লম্বা বাঁশ পুতিয়া তাহাতে সাত হাত, চৌদ্দ হাত বা একুশ হাত কাপড় ঝুলাইয়া দেয়। কেহ কেহ সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া বিবিধ কারুকার্য্যখচিত এক এক খানি কাপড় বুনিয়া আনে। এই কাপড় বাতাসে যত উড়িতে থাকে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সুখ-বাটীতে তত উচ্চতর আসন লাভ করে। আহার আমাদের মত ভাত, মাছ, মাংস ও তরকারী।

পাহাড়ী জাতি প্রফুল্লতার জন্য বিখ্যাত। লেপচাদের প্রফুল্লতার তুলনা নাই। সাঁওতাল ও কোলদিগকে খুব প্রফুল্ল দেখিয়াছি। কিন্তু মঙ্গ, বোমঙ্গ ও চাকমাদিগকে তেমন

প্রফুল্ল দেখিলাম না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব নহে—লেপচারাও বৌদ্ধ। কেহ বলেন, বাঙ্গালীদের অত্যাচারের ভয়ে ইহারা এখানে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। মন্দির মধ্যে বিশেষতঃ প্রদক্ষিণের সঙ্গে এখন আর বাঙ্গালীদিগকে যাইতে দেওয়া হয় না। পাহাড়ীয়ারা তিন দিন থাকিয়া চলিয়া যায়, তখন বড়ুয়াদের মেলা হয়। বড়ুয়া মেলা শেষ হইলে বাঙ্গালী মেলা আরম্ভ হয়। আট দশ দিন মেলা থাকে; মেলায় দুই তিন হাজার পাহাড়ী দেখিলাম—পুরুষ রমণীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। যুবক যুবতীর সংখ্যা শতকরা নব্বইটী।

জগৎপুর-আশ্রম।

মহামুনির মেলা হইতে ক্রোশান্তরে একটী বাঙ্গালীর আশ্রম দেখিলাম—নাম জগৎপুর-আশ্রম। ঠাকুরের নাম পূর্ণানন্দ স্বামী, পূর্ব্বনাম বসন্ত কুমার দে, জাতি বৈদ্য, ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের উত্তীর্ণ, বহুদিন কুমিল্লা সাহায্য-কৃত বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিয়াছিলেন। বয়স ষাট বৎসর হইবে। স্বামিজীর পোষাক আমাদের মতন শাদা কাপড় পরা, সামান্য দাড়ী ও লম্বা চুল আছে। হুঁকাতে খুব তামাক খান। তাঁহার আহারে তেমন বাচ বিচার নাই। লোকটী খুব বুদ্ধিমান। দেখিলে সাত্ত্বিক বলিয়া বোধ হয় না। স্বামিজীর বিধবা কন্যা, একটী সধবা রমণী রাজকুমারী, আর একটী সধবা হেমাঙ্গিনী, আর একটী অনাথা কুমারী বাসন্তী এবং স্বামিজীর দুইটী শিশু সন্তান, যশোহরের উকীল রামোত্তম বাবুর একটী সন্তান, হেমাঙ্গিনীর স্বামী মনোমোহন ও তাঁহার একটী শিশু পুত্র ও একটী শিশু কন্যা, বগলা বলিয়া একটী ব্রাহ্মণকুমার, রাজকুমারীর স্বামী চন্দ্রনাথ—চট্টগ্রাম ইনেস্পেক্টর আফিসের কেরাণী চন্দ্রনাথের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা, বইবাঁধা-ব্যবসায়ী বঙ্গচন্দ্র দে এদেশীয় কায়স্থ, বিক্রমপুরের একজন পণ্ডিত ও তাঁহার তিনটী ছাত্র এবং বোধ হয় আরও তিন চারিটী বালক এই আশ্রমে বাস করেন। স্বামিজীকে সকলে ঠাকুর বলিয়া ডাকে। ঠাকুর বড় সুকণ্ঠ। পাহাড়ের শিখরে বসিয়া যখন ঠাকুর কলকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সেই দিগুন্মাদকারী—

"নয়ন না পারে তোমারে দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে"

গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন এবং ঋষিকুমারেরা বালকোমলস্বরে তাহার প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল, তখন শরীর শিহরিয়া উঠিল। বোধ হয়, ঠাকুরের হিপনটিক্ বা যোগশক্তি যথেষ্ট আছে; দীর্ঘক্ষীণকায়, টিকলনাসা ও জ্যোতিষ্মান আয়ত চক্ষু। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইনেস্পেক্টর বাবু সারদাচরণ সেন ও যশোহরের উকীল রামোত্তম বাবু প্রভৃতির ন্যায় বিচক্ষণ, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান উকীল, ডেপুটী ও মুনসেফ ঠাকুরের অনেকগুলি শিষ্য আছে। আতিথ্য সৎকারে যথেষ্ট মাসিক ব্যয়, দেড়শত টাকার কম নহে। পণ্ডিত মহাশয়ের বেতন কুড়ি টাকা ও তাঁহাদের চারিজনকে আহার দিতে হয়। নিজেরাও পনর কুড়িটী এবং আতিথ্য। সম্বল চন্দ্রনাথের বেতন ত্রিশ টাকা ও বঙ্গের বই বাঁধিবার আয় ৪০।৫০ টাকা। চন্দ্রনাথ ও বঙ্গ গৃহত্যাগী। শিষ্যেরা সাহায্য করেন। সারদা বাবুর ব্যয়ে একটী বাগান তৈয়ার হইতেছে। কিন্তু প্রধান সহায় হুগলীর গবর্ণমেণ্ট-প্লিডার বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্রের দানশীল-জননী নীরদা দেবী;—যখনই যাহা অভাব হয়, তাহা তিনি পূর্ণ করেন। তাঁহার ব্যয়ে এই পাহাড়ের মধ্যে একটী দিব্য

পুষ্কর্ণী প্রস্তুত হইয়াছে। নতুবা জলের অভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। নীরদা নাম সার্থক হইয়াছে।

পাহাড়ের উপরে আশ্রম। আশ্রমের ভিতর কোনও প্রতিমা বা ঠাকুর ঘর নাই। একটী পাহাড়ে একখানি বড় ঘরে যুবকেরা বাস করে, আর একটী পাহাড়ে দুইখানি ঘরের একখানিতে সন্ন্যাসিনীরা ও অন্য খানিতে সাবালকদিগকে লইয়া চন্দ্রনাথ ও বঙ্গ বাস করেন। তাহার নীচে একখানি ঘরে পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁহার গৃহী ছাত্রেরা বাস করেন। পাহাড়ের তলায় রান্নাঘর ও গোয়াল ঘর।

কোথায়ও বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। ধোপা নাপিত নাই। গেরুয়া কাপড়, লম্বা চুল ও লম্বা নখ সকলেরই। বাসন্তীর হাতে চুড়ী দেখিয়াছি। রাজকুমারী ও হেমাঙ্গিনী পীড়ায় শয্যাশায়িনী ছিলেন। তাঁহাদের ভূষণ দেখি নাই। মাটীতে বসা, চেটাই পাতিয়া শোয়া। একখানি কাল কম্বল ও তিন চারিটী চেটাই, থান দুই ছেঁড়া কাঁথা সম্বল দেখিলাম। একটী বন্দুক ও একটী পিস্তল আছে। আমরা বসিয়া অনতিদূরে হরিণের শব্দ পাইলাম। মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়।

পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে সকলে সংস্কৃত পড়ে। বাসন্তী এ বৎসর উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ঠাকুরের কন্যা ও রাজকুমারী মধ্য পরীক্ষা দিয়াছেন। নয় দশ বৎসরের দুটী শিষ্য আদ্য পরীক্ষা দিয়াছে। চন্দ্রনাথের চারি কি পাঁচ বৎসরের কন্যা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিল। সে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেছে। আশ্রমে দেবভাষা ভিন্ন কথা কহিবার অধিকার নাই। টোল যে অতি উত্তমভাবে চলিতেছে, সন্দেহ নাই। বগলা এণ্ট্রাস পাশ করিয়া কয়েক মাস ব্রহ্মচারী হইয়াছে, সে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারে। এখন কেবল সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়ান হইতেছে। ঠাকুরের বড় ইচ্ছা, সন্ন্যাসিনী চারিটীকে বেদান্ত পড়াইবেন। অর্থের অভাবে বেদান্তের পণ্ডিত আনিতে পারিতেছেন না। শিশুগুলি সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া ও সঙ্গত করিয়া শুনাইল। পৌত্তলিকতার গন্ধ কোথায়ও পাইলাম না।

ক্ষেত্রকার্য্য ঠাকুর ও সকলে, সন্ন্যাসিনীরা পর্য্যন্ত নিজেরা করেন। গৃহকার্য্য ত করিতেই হয়, দাসদাসী কেহ নাই। জাতিভেদ রক্ষা করা হয় বলিয়া বোধ হইল না। আহার্য্যে কঠোরতা অত্যন্ত অধিক। কেহ ভাত বা লবণ খাইতে পায় না। দুইমাস অলবণ-সিদ্ধ-পক্ক ও দুইমাস অসিদ্ধ ভক্ষণ। এই পর্য্যায়ে বারমাস কাটে। আলু কচু সিদ্ধ এবং চাতুর্ম্মাস্যে ভিজা সাগু পাকা কলা; দুধ নিষিদ্ধ নহে, তবে মিলে না। দশ এগার বৎসর এরূপ চলিয়াছে—শিশুরা পর্য্যন্ত এইরূপ চালাইতেছে; শরীর যে কাহারও খারাপ হইতেছে, বোধ হইল না।

এ আশ্রমের উদ্দেশ্য, প্রাচীন ঋষিযুগের পুনরভ্যুদয়। ধর্ম্মমত বা সাধন কি, বুঝিলাম না, বোধ হয় উপনিষদের ধর্ম্ম। নরনারী, যুবকযুবতী একত্র থাকিবার জন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই। ইহারা উপাচার্য্য হইয়া, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলে, বিলাসিতার বিনাশ ও পবিত্রতা স্থাপিত হইলে, সকলে মিলিয়া সমস্বরে "শিবোহহং" "শিবোহহং" গান করিলে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য নিনাদিত হইলে, আবার আর্য্যযুগ ফিরিয়া আসিবে, পূর্ণানন্দের এই

কামনা। উদ্দেশ্য মহৎ, সকলের সহানুভূতির উপযুক্ত, ফল ভগবানের হস্তে। জাহ্নবী কি আর হিমালয়ে ফিরিয়া যাইবে? সে মহা উদ্দেশ্যের সাধন করে, সে বরণীয়। বাসন্তীর নম্র লজ্জানত কোমল পবিত্র মুখখানি যেন তপোবনে বাল্মিকীর চরণতলে সীতা। তপোবনের সে সুন্দর মহাদৃশ্য কখন ভুলিব না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (১১)

প্রাচীন আচার ব্যবহার।

ধর্ম্ম :—শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই বয় প্রকার উপাসক থাকিলেও, সাধারণত শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুই শ্রেণীর ধর্ম্মই এ প্রদেশে প্রচলিত। পূর্ব্বে ভাগবতী বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও, শাক্তদিগেরই বিশেষ প্রাবল্যছিল। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্য্যের কথা পাঠ করিলে বুঝা যায়, শাক্তদিগের ক্রিয়াকর্ম্মে বৈষ্ণবদিগকে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইতে হইত, সেইজন্য তিনি বিষ্ণুভক্তি প্রেরণের জন্য নিয়ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, প্রেম ভক্তি প্রচারার্থ নিমাইচাঁদ প্রেরিত হইলেন, বাঙ্গালায় যুগ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিবার কাহারও সাহস ছিল না, ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে, যিনি যত শাস্ত্রীয় বচন প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তিনিই জয়ী হইতেন। যুক্তি, শাস্ত্রানুযায়িক না হইলে তাহা কুযুক্তি, সুতরাং অগ্রাহ্য হইত। বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম বাঙ্গালায় কখন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মই বৌদ্ধদিগের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা জনসমাজকে ধর্ম্মপথে অটল রাখিবার জন্য এমন অচ্ছেদ্য পদ্ধতি-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছিলেন যে, লোকের জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত, চিরজীবনই ধর্ম্মে বাস করিতে হইত। প্রভা[illegible] হইতে রাত্রের নিদ্রা পর্য্যন্ত প্রতি নিশ্বাসে ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিতে হইত। এমন আশ্চর্য্য প্রবল ধর্ম্মশাসন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞান সেই পর্ণকুটীরবাসী তালপত্রবাহী দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের শাসন-শৃঙ্খল স্পর্শ করিতেও কম্পিত হইতেছে। অবশ্য কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস ধর্ম্মের নামে বাঙ্গালীজাতির অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তত্রাচ ইহা নিশ্চয় বলিতে হইবে, উপরোক্ত প্রকার কঠোর শাসনে আবদ্ধ না থাকিলে, প্রবল মুসলমান রাজত্ব-কালের শেষে বঙ্গদেশে হিন্দু নামে পরিচয় দিবার জন্য কেহ থাকিত কিনা সন্দেহ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে স্নান আহ্নিকের কথা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে পালনীয় পর্ব্ব অর্থাৎ "পাল পার্ব্বণের," ব্রতানুষ্ঠানের,

ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের এমন, কি, আমোদ প্রমোদ ও ভীষণ পাপ অত্যাচারের মধ্যেও ধর্ম্ম কিপ্রকার প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি।

সম্বৎসরে অর্থাৎ বারমাসে তেরটী পর্ব্ব, যথা।—

চৈত্রমাসে চড়ক পূজা গাজনে বাঁধে ভারা (১)
বৈশাখ মাসে দেয় সকল তুলসীগাছে ঝারা (২)
জ্যৈষ্ঠমাসে ষষ্ঠীবাঁটা জামাই আনা আনি (৩)
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা দড়া টানাটানি (৪)
শ্রাবণ মাসে ঢেলাফেলা হয় চড়চড়ী (৫)
ভাদ্র মাসে টকপান্তা খান মনসা বুড়ী (৬)
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা কাটে মোষ পাটা (৭)
কার্ত্তিকে কালিকা পূজা (৮) ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা (৯)
অগ্রাণে নবান্ন নূতন ধান কেটে (১০)
পৌষ মাসে বাউনী বাঁধ [illegible] ঘরে পিটে (১১)
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি (১২)
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি (১৩)

উপরোক্ত পর্ব্ব ভিন্ন আরও অসংখ্য ব্রত পূজা ও নিয়ম আছে, তাহা সমস্ত প্রকাশ করা অসম্ভব। কতকগুলির কথা বলিতেছি। বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজা, জল সংক্রান্তি ব্রত, রামনবমী, মদন ত্রয়োদশী বা কন্দর্প পূজা, (১) অক্ষয় তৃতীয়া—শিব গঙ্গা কৈলাস হিমালয় ও ভগীরথের পূজা, সীতা নবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী—প্রহ্লাদ ও বিষ্ণু পূজা, চন্দন যাত্রা বা ফুলদোল, ত্রিলোচনাষ্টমী, সাবিত্রী ব্রত—জম পূজা, ফলহারিণী কালিকা পূজা, রম্ভা তৃতীয়া ব্রত, উমা চতুর্থী ব্রত, ষট পঞ্চমী, আরণ্য ষষ্ঠী, দশহরা—গঙ্গা ও মনসা পূজা, স্নানযাত্রা, অম্বুবাচী, হোড়া পঞ্চমী, বিবস্বৎ সপ্তমী, চাতুর্ম্মাস্য (২) ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, অঘোর চতুর্দ্দশী, আলোক অমাবস্যা বা গো সহস্রী, লক্ষ্মী পূজা, হরিতালিকা ব্রত, সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত, রক্ষা পঞ্চমী, মন্থন ষষ্ঠী পূজা, ললিতা সপ্তমী বা কুক্কুটী ব্রত, রাধাষ্টমী বা দুর্ব্বাষ্টমী ব্রত, সীতাষ্টমী বা জীমুতবাহন পূজা, তর্পণ অমাবস্যা, বীরাষ্টমী ব্রত, কোজাগার পূর্ণিমা বা লক্ষ্মীপ্রতিমা পূজা, ভূতচতুর্দ্দশী, দীপাবলী, কাত্যায়ণী ব্রত, গোষ্ঠাষ্টমী, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, মহা দ্বাদশী, গুহ ষষ্ঠী, মিত্র সপ্তমী, পাষাণ চতুর্দ্দশী, রটন্তী কালিকা পূজা, বরদা চতুর্থী, বিনায়ক ব্রত বা গণেশ পূজা, শীতলাষ্টমী, ভীম একাদশী, শিবরাত্রি, ঘণ্টাকর্ণ (ঘেঁটু) পূজা অশোক ষষ্ঠী প্রভৃতি। বালিকাদিগেরও অনেকগুলি ব্রত আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিলাম :—ঋতু পূজা (৩) গোকাল গাভী পূজা, ফল গছান, ধন গছান, সেঁজুতী ব্রত, পুণ্য পুকুর, জম পুকুর, নখচুল প্রভৃতি।

উপরে যতগুলি বিষ্ণু পূজা বিষয়ক পর্ব্ব ও ব্রত লিখিত হইল, সে সমস্তই ভাগবতী বৈষ্ণবকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়েরাও চৈতন্য দেবের আবি-

---

(১) ইহা এক্ষণে দক্ষিণ বাঙ্গালায় প্রচলিত দেখা যায় না, কিন্তু উত্তর বঙ্গে বিশেষত কুচবিহার ও আসাম প্রদেশে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

(২) যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপামেববা,
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ।
শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্র পদে তথা,
দুগ্ধ মাশ্বযুজেমাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

(৩) অগ্রহায়ণের ১লা ও প্রতি রবিবার প্রাতে প্রত্যেক বালিকা প্রতিপালন করিতে বাধ্য। প্রাতে গৃহিণী বালিকাদিগকে লইয়া শয্যায় ঋতু অর্থাৎ সূর্য্যদেবের পূজার মাহাত্ম্য গল্প শুনাইয়া শয্যাত্যাগ করিতেন, যতক্ষণ না পূজা হয়, ততক্ষণ বালিকারা জল পর্য্যন্ত পান করিতে পায় না।

র্ভাবের পর হইতে অনেকগুলি স্মরণীয় দিনে মহোৎসবাদি করিয়া বৈষ্ণব পর্ব্বদিনরূপে প্রচলিত করিয়াছেন।

যোত্রমান লোকে বারমাসে তের পার্ব্বণত করিতেনই, তদ্ভিন্ন জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক প্রভৃতি পূজাও তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। যাঁহার গৃহে বৎসরে দুই তিনটী পরবের অনুষ্ঠান না হইত, তিনি পাঁচজনের একজন বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন না। অনেক ভদ্রলোক মহরম পর্ব্বেরও অনুষ্ঠান করিতেন, পথে তাজিয়া বাহির করিয়া হাসন হুসেনের নাম করিয়া বুক চাপড়াইতেন ও লাটী খেলিতেন।

হিন্দু মুসলমানে কেহ কাহারও ধর্ম্মে আঘাত দিয়া বাদ বিসম্বাদ প্রায় করিত না। এক গ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান পরস্পর সম্পর্ক পাতাইয়া সুখে বাস করিতেন, "দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা" বলিতেন। পরস্পরের বিপদে সাহায্য ও সম্পদে যতদূর সাধ্য, যোগদান করিতেন। অনেক মুসলমান গোবধ দূরে থাকুক গো মাংস ভোজনও করিতেন না। অনেকে হিন্দু দেবতার পূজা দিতেন। বসন্ত রোগ হইতে কেহ আরোগ্য লাভ করিলে, প্রতিবাসী হিন্দুর গৃহে শীতলা প্রতিমা পূজা করাইয়া যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। তদ্ভিন্ন অনেক মুসলমান জমীদার দুর্গোৎসব করিতেন। পূর্ণিয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ সবডিবিসনের মুসলমান জমীদারেরা আজিও তাঁহাদের কুতবগঞ্জ বাজারটী দুর্গোৎসবের ব্যয়ের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন, প্রতি বৎসর উক্ত বাজারে মহা সমারোহে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। আমরা একবার এই পূজার সময় উপস্থিত ছিলাম, এই স্থানে হিন্দুর বাস নাই বলিলেও হয়, দলে দলে মুসলমান স্ত্রী পুরুষ আসিয়া "দুর্গো বিবিকে" দর্শন করিয়া পয়সা দিয়া সেলাম করিয়া যায়। কেবল দুর্গোৎসব নহে, এই জমীদারের বাটীর সংলগ্ন স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিগ্রহের রীতিমত ঠাকুর বাটী, পূজারী, লোকজন এবং নিত্য অন্ন ভোগের ব্যবস্থা আছে, হিন্দু অতিথি আসিলে এই ঠাকুর বাটীতে সেবা প্রাপ্ত হয়।

মুসলমান রাজত্বকাল মধ্যে গৌরনগরে গণেশ নামক যে রাজা ক্ষণপ্রভার ন্যায় কয়েক দিন হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতের জন্য সত্যনারায়ণের ও শুভচণ্ডীর পূজা প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমোক্তটী পুরুষদিগের, দ্বিতীয়টী স্ত্রীলোকদিগের জন্য। উভয় পূজাতেই মুসলমানকে সাদরে নিকটে বসাইতে হয়, পূজা ও দেবতার মাহাত্ম্য পাঠান্তে সভাস্থ মুসলমানকে অগ্রে প্রসাদ বিতরণ করিতে হয়, শুভচণ্ডীর পূজাও ঐরূপে অগ্রে মুসলমান সধবার মস্তকে তৈল সিন্দুর, প্রসাদ ও পান সুপারি দিয়া আদর করিতে হয়।

যিনি দুইটাকা আড়াইটাকা বেতনের চাকুরী করিতেন, তাঁহার গৃহে দোল দুর্গোৎসব হইবে। বিশেষত ব্রাহ্মণ গৃহে দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজা, পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের গৃহে বা টোলে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে সরস্বতী পূজা, সৌখীন লোকের গৃহে কার্ত্তিক পূজা, আর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের বাসগৃহে, উদাসীনের আখড়ায় সমস্ত বৈষ্ণব পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত। চারি পাঁচখানি দুর্গোৎসব হইত না, এমন গলি ভদ্র পল্লীতে দেখা যাইত না। পূর্ব্বে যে যে গৃহে পূজার মহা আড়ম্বরে পল্লী আমোদিত হইত, এখন তাঁহাদের অনেক পরিবার হীনাবস্থ হওয়ায়, পূজা বন্ধ হইয়াছে। এখনকার কালে যাঁহারা সহরে নূতন ঐশ্বর্য্যবান

হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যে কার্পণ্য প্রযুক্ত পূজা আনয়ন করেন না, তাহা বলিতে পারি না, তাঁহাদের বিবিধ প্রকার ব্যয় ভূষণেও তাহা বলে না। ইংরাজী শিক্ষা আর ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞানই তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে দূরে রাখিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। বৎসরের পর বৎসর কলিকাতায় অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িতেছে, অথচ সকল পূজারই প্রতিমা সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর কমিয়া আসিতেছে, ইহা দেখিয়া কোন্ চিন্তাশীল লোকে না বলিবে যে, আর পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রতিমাপূজা জনশ্রুতিতেই থাকিয়া যাইবে। ইতিমধ্যেই কোন কোন প্রাচীন পরিবারের পূজার তৈজসাদি খড়্গা মোষছাগবলির রক্ত চন্দনের হাড়ি কাঠ, পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ মিউজিয়মের ন্যায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সাধারণ লোকে ভক্তি পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত সাত্ত্বিকভাবে পূজা করিতেন, আড়ম্বরের জন্য নহে, সুতরাং অল্পব্যয়ে কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন। ২০।২৫ টাকায় দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিতে শুনা গিয়াছে। রেষারেষির পূজাও যে ছিল না, এমন নহে, "বড় বাবু চারিটা ঢোল দুইটা ঢাক রাখিয়াছে, আমায় আটটা ঢোল চারিটা ঢাক রাখিতে হইবে। ওখানে দুইটা পাঁটা বলি হইবে, আমি আটটা বলি দিব।" ইত্যাকার ব্যাপারও ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিজে নিস্ব হইলেও ভিক্ষা করিয়া পূজা করিতেন। আমাদের পল্লীর এক ব্রাহ্মণীর কথা এখানে উপমাস্থলে বলিলে সে কালের অনেক আলোক প্রকাশিত হইবে। তাঁহার নাম বামাঠাকুরাণী। তিনি কুলীনের কন্যা, চিরদিন তাঁহাকে সধবা দেখিয়াছি, কিন্তু কখন তাঁহার স্বামীকে দেখি নাই, তাঁহার কথাও শুনি নাই। বামাঠাকুরাণী পল্লীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় সমস্ত হিন্দু পরিবারের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেন। কাহারও মা, কাহারও মাসী, কাহার পিসী, কাহার দিদী, কাহার বা ঠাকুরুণদিদী সুবাদ লইয়া ধনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকল গৃহে ষোল আনা পসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রোগে শোকে ক্রিয়া কর্ম্মে তিনি সকল অন্তঃপুরের প্রধান পরামর্শ-দায়িনী, সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী। অনেক গৃহে ক্রিয়া উপলক্ষে রন্ধন-শালার কর্ত্রী, মেয়ে কর্ম্মে ভাণ্ডারের রক্ষয়িত্রী হইতেন। একাদশীর দিনে সধবারা তাঁহার ললাটে সিন্দূর দিয়া যথাসাধ্য দান করিতেন। ভদ্রগৃহে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে তিনি এক এক খানি সাড়ী ও একটী সিধা পাইতেন। এইপ্রকারের আয়ে তাঁহার সম্বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু নিজে কখন কাহাকেও কোন অভাবের কথা জানাইতে শুনি নাই, অথচ সকল বিবাহাদিতে আইবুড়ভাত ও যৌতুকাদি দেওয়াছিল, অবশ্য প্রণামী পাইতেন। বামাঠাকুরাণী প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন। তাঁহার পূজায় তামসিকতার প্রবেশ নিষেধ ছিল, সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন হইত। উভয় পূজা উপলক্ষে পল্লীর ইতর ভদ্র কাহারও গৃহে বন্ধন না হয়, ইহা তাঁহার একান্ত অনুরোধ থাকিত। অসংখ্য প্রতিবাসীকে খেচরান্ন ভোজন করাইতেন, যে সকল বাটীর স্ত্রীলোকেরা পূজা গৃহে যাইতে অক্ষম হইত, তাহাদের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন, অনেকের গৃহে নিজে প্রসাদ বহন করিয়া দিয়া আসিতেন। ভদ্রলোকে প্রণামী ভিন্ন রীতিমত সিধা পাঠাইতেন, দরিদ্রেরা প্রণামী না দিলেও, যথাসাধ্য সিধা দিতে

কাতর হইত না। সে সময় একটী ভাল সিধার মূল্য এখন অপেক্ষা অনেক সুলভ ছিল। একমণ চাউলের মূল্য ১৸০, পাঁচসের ডাল ।/০, একপোয়া তৈল /০, একপোয়া ঘি ৵০, একসের লবণ /০, কাষ্ট মসলা ও তরকারি দিগর ৶০ এই আড়াই টাকার মধ্যে এমন একটী সিধা হইত, যাহা এক্ষণে দশ টাকার কমে হয় না। এইরূপ সিধা দশ পনরটী আসিলেই বামাদেবীর দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া যাইত, বিচিত্র কি? কেবল আমাদের পাড়ায় নয়, সকল পল্লীতেই দুই একজন এই শ্রেণীর লোক বাস করিতেন। "পাত পাতিলেই ভাত" ব্রাহ্মণ বাড়ীর ইহা অতি প্রাচীন প্রবাদ। ব্রাহ্মণ যেমন চিরদিন ভিক্ষাজীবী, তেমনি শূদ্র গিয়া তাঁহার নিকট প্রসাদ-প্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে কখনই বিমুখ করিবেন না, ইহাই চিরন্তন প্রথা। পূজার সময় ব্রাহ্মণ বাটীতে অনিমন্ত্রিত গরিব লোক গিয়া বসিলেই আদরের সহিত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া আসিত।

জন্মতিথি পূজাও একটী অতি সুন্দর ও প্রাচীন পদ্ধতি। ইহার অনুষ্ঠান দেখিয়া বোধ হয়, পৌরাণিক কালের অনেক পূর্ব্বে ইহার প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে দুগ্ধের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করা, তিল বপন করা ও মৎস্যজীবীর নিকট হইতে জীবিত মৎস্য আনিয়া জলাশয়ে ছাড়িয়া দেওয়া প্রধান অনুষ্ঠান। তিনটীর মধ্যেই সুভাব নিহিত দেখা যায়। দুগ্ধের সহিত গুড় ভোজনের অর্থ এই যে, ভগবান আমায় এক বৎসর যখন বাঁচাইয়া রাখিলেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সুখাদ্য ভোজন করি, দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য তিলের ন্যায় বংশ বৃদ্ধি হউক, আর তৃতীয়টীতে একটী জীবের প্রাণ দান করা হইল। দুগ্ধ গুড় দেখিয়া অনুমান করা যায়, যখন চিনি আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন হইতে এই পদ্ধতি প্রচলিত। নববস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া পূজান্তে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, বয়ের ন্যায় চিত্রিত পীড়ায় বসিয়া, দিবসে প্রদীপের আলোকে বন্ধুবান্ধব ও সমবয়সীদিগের সহিত একত্র বসিয়া আহার করাটীও দেখিতে অতি সুন্দর।

"গৃহস্থ যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা ভগবানে সমর্পিত হউক'' মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রের এই মহাবাক্য পূর্ব্বের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা রীতিমত প্রতিপালন করিতেন। চক্ষুরুন্মিলন হইতে চক্ষু মুদ্রিত করণ পর্য্যন্ত কোন কার্য্য ভগবানকে স্মরণ না করিয়া করিতেন না। বালার্ক ও সন্ধ্যা প্রদীপ অবশ্য প্রণম্য ছিল। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার গৌরবের বিষয়। ইহা সকলেই বলিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা ইহা জীবনে সর্ব্বদাই দেখাইতেন। উপবাস বা ভোজনের ব্যবস্থা হিসাব করিলে বৎসরের মধ্যে চারি মাসেরও অধিক দেখা যায়। সকলেই যে সমস্তগুলি পালন করিতেন, তাহা না হইলেও, অনেক বিধবা ও অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরুষ অনেক উপবাসাদি করিতেন। ইহাতে তাঁহদের শরীর ভালই থাকিত। এক বিধবাকে উপর্য্যুপরি তিন চারিদিন উপবাস করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার এই উপবাসে কি কোন কষ্ট হইতেছে না, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি জাননা, আত্মা যত শুকাইবে, ততই ভাল থাকিবে।

ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম করাই শ্রেষ্ঠজীব মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ধর্ম্মের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস প্রবেশ লাভ করিলে ধর্ম্মকেই অধর্ম্ম

করিয়া তোলে। হজরত মহম্মদ বলিয়াছিলেন, "মেঘ হইতে এবং পর্ব্বত ভেদ করিয়া যে জল ধারা পতিত হয়, তাহা নির্ম্মল, সেই নির্ম্মল জল পৃথিবী দিয়া যত দূরে গমন করিতে থাকে, ততই কর্দ্দম ও আবর্জ্জনায় অতি জঘন্য মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া অপেয় হয়, তদ্রূপ ভগবানের ভাব যখন সাধু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ভিতর হইতে প্রকাশিত হয়, তখন খাঁটি সত্য, তাহাই লোক পরম্পরায় নানা অসত্য ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় মিশ্রিত হইয়া অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়।" অতি প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস মিশ্রিত হইয়া সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় ইংরাজ জাতি যদি ভারতের রাজা না হইতেন, তাহা হইলে এত দিনে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তুষানল,অগ্নিকুণ্ড,জগন্নাথের রথচক্র, গোমুখী পর্ব্বত, এলাহাবাদের ত্রিবেণী, আসামের ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতিকে স্বর্গের দ্বার বিশ্বাস করিয়া কত শত ধর্ম্মবীর যে হাস্যমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। অন্ধ বিশ্বাসে জ্ঞানশূন্য হইয়া গর্ভধারিণী জননী অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে স্বহস্তে সাগরজলে বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে সত্যমুক্ত মনে করিতেন। (১)১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই ভীষণ প্রথা রহিত করিয়া আমাদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, ভগবান তাঁহার বংশকে অক্ষয় করুন। উক্ত বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় সাগরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া প্রসূতিদিগকে উক্ত কার্য্য করিতে নিবারণ করা হইয়াছিল।

গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জ্জলি প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহ ঘরে মরিলে প্রেতত্ব লাভ করিত। আত্মহত্যা বা অপমৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যু যেমন নিশ্চয় প্রেতত্বের লক্ষণ, ঘরের মধ্যে খট্টার উপর "ত্রিশূন্যে" মরিলেও তদ্রূপ বিশ্বাস করা হইত। বৃদ্ধ বৃদ্ধা ঘরে মরিলে আত্মীয় স্বজনের নিন্দা হইত, পিতা মাতা ঘরে মরিলে পুত্র লোক সমাজে

---

(১) অনেক প্রসূতির নিজের অসুস্থতা বশত দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতে প্রথম শিশুটী মারা পড়ে, স্ত্রীলোকেরা এই মৃত্যু নিবারণার্থ নানা প্রকার "তুক তাক" করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কড়ি লইয়া ধাত্রীকে পুত্র বিক্রয় প্রথাটীও প্রচলিত, কড়ির অনুপাতে এক কড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাত কড়ি এমন কি নকড়িতে বিক্রয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সংস্কারের উপর কোন আপত্তি নাই, দেবতার পূজা মানাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু সাগরকে পুত্রদান স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পুত্রের প্রার্থনা কি ভীষণ নৃশংস ব্যাপার! "হে সমুদ্র আমার কোলে একটী আর কাঁকে বা হাতে একটী হইলে আমি একটী সন্তান তোমাকে প্রদান করিব" বলিয়া মানস করিয়া রাখা হইত। সাগরের কৃপায় (!) যদি তাহাই হইত তবে পৌষ সংক্রান্তির সাগর স্নানের সময় সাগর সঙ্গমে লইয়া গিয়া কোলের শিশুটীকে গভীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। নিকটে অল্প জলে ফেলিলে অপরে তুলিয়া লইবে, প্রসূতি প্রতিপালন না করিয়া অপরের দ্বারা পালিত হইলেও চলিবে না, কারণ তাহাতে সন্তানটীর মায়া কাটাইয়াত সাগরকে দেওয়া হইল না। সেই সময় নরমাংসলোলুপ শত শত হাঙ্গর কুম্ভীর শিশু গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদন করিয়া থাকিত, সুতরাং কোন মনুষ্য সাহস করিয়া নিক্ষিপ্ত শিশুকে রক্ষা করিতে যাইত না। কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলাম ভাবিয়া প্রসূতি হাস্যমুখে অপর শিশুটীর "সাগর দাস" নাম রাখিয়া কোলে লইয়া গৃহে ফিরিতেন। সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ঔষধ সেবন করিয়া প্রসূতির মৃতবৎসা রোগ আরোগ্য হইলে একটী পুত্র সন্ন্যাসীর প্রাপ্য হইত। পঞ্চম বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে সন্ন্যাসী আসিয়া প্রার্থনা করিবামাত্র পুত্রটীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইত। চৈতন্যদেবের প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ প্রভুও এই নিয়মে অবধূত সম্প্রদায়ী হইয়াছিলেন।

মুখ দেখাইতে পারিতেন না। সজ্ঞানে তীরস্থ হইয়া অন্ততঃ ত্রিরাত্রি গঙ্গাতটে বাস, গঙ্গাজল পান, গঙ্গা দর্শন, হরিনাম উচ্চারণ, হরি কথা শ্রবণান্তর স্বহস্তে বৈতরণী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মৃত্যুকালে গঙ্গাসৈকতে অর্দ্ধনাভি জলে নিমগ্নাবস্থায় শায়িত হইয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিবে। চারিদিকে আত্মীয়গণ "অঙ্গে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল" বলিয়া নাম ডাকিতে থাকিবে। যিনি এই অবস্থায় মরিতে পারিতেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। চির জীবন পাপই করুক আর পুণ্যই করুক, এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বর্গের দ্বার অনিবার্য্য। সেই জন্ত চূড়ামণি দত্ত নিজের গঙ্গাযাত্রা কালে যে দর্প-গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার শেষে ছিল "যপ তপ কর কি ভাই মর্ত্তে জান্‌লে হয়।" ঘাটে লইয়া গিয়া আর চিকিৎসা করা হইত না, তখন তাহাকে মরিতেই হইবে, মৃত্যুর বিলম্ব বুঝিলে আত্মীয়েরা "স্থত" করিতেন। দধি, ঘোল, চাঁপাকলা প্রভৃতি শ্লেষ্মা উত্তেজক বস্তু খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র আপদ চুকাইবার চেষ্টা করাকে "স্থত" করা বলে। ইহাতেও যদি কেহ বাঁচিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকিত না, "ঘাট ফেরতা" বলিয়া সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত, গৃহে তাহাকে আর স্থান দেওয়া হইত না। হতভাগ্য নিজ গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও পরিবারের অকল্যাণ ও লোকগঞ্জনার ভয়ে নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন তীর্থে গিয়া বাস করিত। আত্মীয়েরা মৃত নিশ্চয় করিয়া যাহাকে সৎকারার্থে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে, সে যদি জীবনের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে "দানায়" পাইয়াছে, বিশ্বাস করিয়া কুদালি, কুঠার প্রভৃতির আঘাতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করা হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও নিষ্ঠুর ব্যাপার, হিন্দু-রমণীর সহমরণ-প্রথা। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে ধর্ম্মের জন্ত অনেক লোক হত হইয়াছে, কিন্তু সে সমস্তই ধর্ম্মযুদ্ধে, কোথাও উভয়েই শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, আর কোন কোন স্থানে এক জনের হস্তে ক্ষমা ও বিশ্বাসের অস্ত্র, অপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দ্বারা সাধু হত্যা করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থাতেও অনেক লোক ধর্ম্মার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। অন্ধ বিশ্বাস নাই, এমন ধর্ম্ম জগতে দুর্ল্লভ না হইলেও, হিন্দুর ইহাতে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আরব্যোপন্যাসে মৃত পত্নীর সহিত জীবিত পতিকে পর্ব্বতগহ্বরে মরিতে প্রেরণ করার গল্প পাঠ করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তবুও তাহা গল্প মাত্র, আর আমাদের পিতামহীরা আত্মীয় কুটুম্ব ও গর্ভজাত সন্তানের সাহায্যে যেরূপে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ দান করিতেন, তাহার গল্প শুনিলে কাঁদিতে হয়, লজ্জায়, শোকে ও ক্রোধে অধীর হইতে হয়। আজিও অনেক সতীর গর্ভজাত সন্তান পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কারণ সে ত অধিক দিনের কথা নহে, ৭৬ বৎসর পূর্ব্বের মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

[বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে।]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ দাঁড়াইয়া। গলায় ফুলের মালা। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ খোল করতালি লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।

সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে, কিয়ংক্ষণ পরে কীর্ত্তনও থামিল।

এবারে ভক্তেরা ঠাকুরকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

ঠাকুর কিয়ংকাল বিশ্রাম করিয়া, নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়া, আহার করিতে বসিলেন। ভক্তেরাও আনন্দ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[গোস্বামী সঙ্গে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রসঙ্গে।]

আহারের পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বিশ্রাম করিতেছেন, কিন্তু ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে। বাহিরের বারাণ্ডা গুলিও লোকে পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত, কেদার (চাটুর্য্যে), সুরেশ (মিত্র), রাম, মনোমোহন, গিরীন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। রাখালের বাপ আসিয়াছেন, তিনিও ঐ ঘরে বসিয়া আছেন। একটী বৈষ্ণব গোস্বামী ও এই ঘরে উপবিষ্ট। ঠাকুর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখিলেই ঠাকুর মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেন—কখন কখন তাহাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইতেন।

(নাম-মাহাত্ম্য না অনুরাগ?)

শ্রীরামকৃষ্ণ, (গোস্বামীর প্রতি)। আচ্ছা তুমি কি বল? উপায় কি?

গোস্বামী। আজ্ঞে তাঁর নামেতেই হবে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। তা না হলে শুধু নাম করে যাচ্চি, কিন্তু কামিনী কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?

"বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না—ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়।

গোস্বামী। তা হলে অজামিল? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই যে সে করে নাই, কিন্তু মরবার সময় নারায়ণ বলে ছেলেকে ডাকাতে উদ্ধার হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অজামিলের পূর্ব্বজন্মে অনেক কর্ম্ম করা ছিল।

"তা এ রকমও বলা যায় যে, তার তখন অন্তিমকাল। হাতীকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধূলা কাদা মেখে যে কে সেই! তবে হাতীশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ আগে ঝুল ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে গা পরিস্কার থাকে।"

"নামেতে একবার শুদ্ধ হলে ; কিন্তু তার পরেই হয়ত নানা পাপে লিপ্ত হয়। মনে বল নাই, প্রতিজ্ঞা করে না যে আর পাপ করব না। গঙ্গাস্নানে পাপ সব যায়, গেলে কি হবে? লোকে বলে থাকে, পাপ গুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে তখন ঐ পুরাণ পাপ গুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে (সকলের হাস্য)। সেই পুরাণ পাপ গুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে, স্নান করে দুপা না আসতে আসতে আবার ঘাড়ে চড়েছে।

"তাই নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাহাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যে সব জিনিষ দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মনে দেহের সুখ, তাহাদের উপর যাহাতে ভালবাসা কমিয়া যায়।

[বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি) আন্তরিক হ'লে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হোলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করিয়া বসে। তারা বলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না ; কি আমাদের মা কালীকে না ভজিলে কিছুই হইবেনা ; আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে না নিলে কিছুই হবে না!

"এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি, অর্থাৎ আমার ধর্ম্মই ঠিক, আর সকলের ধর্ম্ম মিথ্যা। এবুদ্ধি বড় খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়।

"আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন্, এই বলিয়া আবার ঝগড়া। যে বৈষ্ণব সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহা হইলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আরো তিনি কত কি আছেন, তা বলা যায় না।

"কতকগুলা কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে এ জানোয়ারটার নাম হাতী। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হোলো হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগিল। একজন বল্লে, হাতী একটা থামের মত! সে কাণাটী কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বল্লে, হাতীটা একটা কুলোর মত! সে কেবল একটা কাণে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল, তারা নানা প্রকার বলতে লাগিল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখ্ছে, সে মনে করছে, ঈশ্বর এমনি আর কিছু নয়।

"একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বল্লে, আমি গাছতলায় একটী সুন্দর লাল গিরগিটি দেখে এলুম। আর একজন বল্লে, আমি তোমার আগে সেই গাছতলায় গিছ্লুম, লাল কেন হবে? সে সবুজ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বল্লে, ও আমি বেশ জানি, আমি তোমাদের আগে গি'ছিলাম, সে গিরগিটী আমিও দেখেছি। সে লালও নয়, সবুজ ওনয়, আমি স্বচক্ষে দেখেছি নীল। আর দুই একজন ছিল তারা বল্লে, হল্দে, পাঁসটে, নানা রং। শেষে সব ঝগড়া বেধে গেল। সকলেই জানে, আমি যা দেখেছি তাই ঠিক। তাদের ঝগড়া দেখে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? যখন সব বিবরণ শুনলে

তখন বল্লে, আমি ঐ গাছ তলাতেই থাকি, আর আমি ঐ জানোয়ার কি, আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বলচ তা সব সত্য, ও গিরগিটি কখন সবুজ, কখন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। আবার কখন দেখি, একেবারে কোন রংই নাই!

(সাকার না নিরাকার ?)

(গোস্বামীর প্রতি) তা ঈশ্বর শুধু সাকার বল্লে কি হবে! তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন এও সত্য, আবার নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে. সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে।

“কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত-সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তি হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্ত্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্যে সাকার। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে বরফ গলে যায়, আগেকার যেমন জল তেমনি জল। অধঃ ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে। ঠাকুর, তুমিই সাকার, তুমিই নিরাকার, আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে আবার তোমাকেই বাক্য মনের অতীত বলেছে!

“তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন যায়গা আছে, যেখানে বরফ আর গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।

কেদার। আজ্ঞে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস কয়টী দোষের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করেছেন। এক যায়গায় বলেছেন, “হে ভগবন্! তুমি বাক্য মনের অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা—তোমার সাকার রূপবর্ণনা করে'ছি, অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। তাঁর ইতি করা যায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার-বৈরাগ্য।]

রাখালের বাপ বসিয়া আছেন। রাখাল আজ কাল ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। রাখালের মাতা ঠাকুরাণীর পরলোক প্রাপ্তির পর রাখালের পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন, তাই পিতা মাঝে মাঝে আসেন, থাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন না। ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মকদ্দমা সর্ব্বদা করিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকীল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে রাখালের পিতা মাঝে মাঝে আসেন। তাঁহাদের নিকট বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সংপরামর্শ পাইবেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা রাখাল তাঁর কাছে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি)। আহা, আজ কাল রাখালের স্বভাবটী কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়া দেখ—দেখতে পারে মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়চে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কি না, তাই ঠোঁট নড়ে।

“এসব ছোকরারা নিত্য সিদ্ধের থাক, এরা ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মিয়াছে। এরা একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে হোমা পাখীর

কথা আছে, সে পাখী আকাশেই থাকে, মাটীর উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম্ পাড়ে—ডিম যখন পড়তে থাকে, কিন্তু এত উঁচুতে পাখী থাকে যে পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখীর ছানাটা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে থাকে। কিন্তু তখনও এত উঁচু, যে পড়তে পড়তে ওর পাখা উঠে ও চক্ষু ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে, আমি মাটীর উপর পড়ে যাব। মাটীতে পড়লেই মৃত্যু! মাটী দেখাও যা, অমনি মার দিকে চোঁ চাঁ দৌড়। একবারে উড়তে আরম্ভ করলে যাতে মার কাছে পৌঁছতে পারে। এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া।

"এসব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলে বেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বর লাভ হয়।

"যদি বল বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি, এমন জ্ঞান হয় কেমন করে? তার মানে আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে তা হলে তাতে ছোলা গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে বলে কি অন্য গাছ হবে?

"আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে! তা হবে নাই বা কেন? ওল যদি ভাল হয়, তা'র মুখীটীও ভাল হয়, (সকলের হাস্য)। যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে!

মাষ্টার (একান্তে গিরীন্দ্রের প্রতি)। সাকার নিরাকারের কথাটী ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবরা বুঝি কেবল সাকার বলে?

গিরীন্দ্র। তা হবে। ওরা একঘেয়ে।

মাষ্টার। 'নিত্য সাকার,' আপনি বুঝেছেন? স্ফটীকের কথা? আমি ওটা ভাল বুঝতে পারছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা তোমরা কি বলাবলি কচ্ছ?

মাষ্টার ও গিরীন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন।

বৃন্দে ঝী (রামলালের প্রতি)। ও রামলাল, এ লোকটীকে এখন খাবার দেও, আমার খাবার তার পরে দিও।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[পঞ্চবটীমূলে কীর্ত্তনানন্দে।]

অপরাহ্নে ভক্তেরা পঞ্চবটীমূলে কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। আজ ভক্ত সঙ্গে মার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে ভাসিলেন।

গান (১ম)।

শ্যামা পদ আকাশেতে মন ঘুড়ি খান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল॥
মায়াকান্নি হোলো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি।
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞান মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে।
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছজন জয়ী হল॥
ভক্তি ডোরে দিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধাঁ।
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল॥

আবার গান হইল ও গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল করতালি বাজিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

গান (২)।

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামা পদ নীল কমলে।
(শ্যামা পদ নীলকমলে, কালী পদ নীল কমলে)
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কাল ভ্রমর কাল কালয় কালয় মিসে গেল।
পঞ্চ তত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তেরি মনে আশাপূর্ণ এতদিনে।
তায় দুঃখ সুখ সমান হল আনন্দ সাগর উথলে॥

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, ভক্তেরা গাহিলেন

গান (৩)।

শ্যামা মা কি এক কল করেছে।
(কালী মা কি এক কল করেছে)
চোদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপনি থাকি কলের ভিতরি,
কল ঘুরায় ধরে কল ডুরি,
কল চলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে কলে জেনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

গান (৪)।

ভবে আসা খেলতে পাশা, কত আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙ্গাদশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম॥
পো বারো আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল।
শেষে কচে বারো পড়ে মাগো, পঞ্জাছক্কার বন্দী হলাম॥

ভক্তেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটু থামিলে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরে ও আশপাশে এখনও অনেকগুলি ভক্ত আছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণাস্য হইয়া পঞ্চবটী হইতে নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার। বকুলতলায় আসিলে পর ত্রৈলোক্যের সহিত দেখা হইল। তিনি প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)। পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। চলনা একবার—

ত্রৈলোক্য। আমি গিয়ে কি করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন বেশ একবার দেখতে।

ত্রৈলোক্য। আমি একবার দেখে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা আচ্ছা বেশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্ম্ম।]

প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা হইল। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব্ব বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। গৃহস্থ ভক্তদের দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি)। সংসারত্যাগী সাধু সেত হরিনাম করবেই। তার ত আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা করে তা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা না করে, সে যদি হরিনাম না করে, তা হলে বরং সকলে নিন্দা করবে।

"সংসারী লোক যদি হরিনাম করে,তাহলে বাহাদুরী আছে। দেখ জনক রাজা খুব বাহাদুর! সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম্ম। এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আর একদিকে সংসারের কর্ম্ম করছে।

"নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ মনে খুঁটীয়ে করে, কিন্তু সর্ব্বদাই উপপতিকে চিন্তা করে।

"সাধু সঙ্গ সর্ব্বদা করা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারে।

কেদার। আজ্ঞে হাঁ! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। যেমন রেলের এন্‌জিন্ (Engine) পেছনে কত গাড়ী বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। অথবা যেমন নদী বা তড়াগ কত জীবের পিপাসা শান্ত করে।

ক্রমে ভক্তেরা গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একে একে সকলে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, তুই আজ আর যাস্ না। তোদের দেখেই উদ্দীপনা।

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স ১৯ উনিশ ২০ কুড়ি। গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ। ঈশ্বরের নামে চক্ষে তাঁহার জল আসিত। ঠাকুর তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিতেন।

উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য কি কল্পনা ?

হুনজেতা, কবি এবং কাব্যপ্রিয়, মালবপতি বিক্রমাদিত্যের নামের প্রবাদ, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। হুয়েন সাং, এলবেরুনি, মেরুতুঙ্গ, কহ্লন প্রভৃতির কথায় এ প্রবাদ অতি সুস্পষ্ট। হুয়েন সাং হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল রাজাদিগের নাম ও বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে প্রকৃত ব্যক্তি, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, মালবের শীলাদিত্য রাজার ভাগিনেয় এবং কানোজের বা থানেশ্বরের শীলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের জামাতা ধ্রুবসেন, ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বলভী রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। বলভীদিগের শিলালিপি হইতেও ৬৩৫ হইতে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চক্রবর্ত্তী চতুর্থ ধ্রুবসেনকে পাই। হুয়েন সাং বলেন যে, শীলাদিত্যের পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য মালবের রাজা ছিলেন। হুয়েন সাংএর গণনায় ৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে শীলাদিত্যের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল। কানোজের হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, এবং এই সময়ে বাণভট্টের অভ্যুদয়। বাণভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি সুবন্ধুর বাসবদত্তায় উল্লিখিত আছে যে, তাঁহার সময়ের অল্প পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল এবং তাঁহার সময়ে কুৎসিত রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। নেপালের হর্ষ বিক্রমাদিত্য সংবৎ, হর্ষবর্দ্ধনের সংবৎ, কাজেই ঐ সংবৎসরের গণনায় এই বিক্রমাদিত্যের সময় নিরূপিত হইতে পারে না।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে গুপ্তবংশীয় স্কন্দ গুপ্ত সর্ব্ব প্রথম হুনদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। স্কন্দ গুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার একটী দ্বিতীয় নাম পাওয়া যায়; সেটী সকল পণ্ডিতই "ক্রমাদিত্য" বলিয়া পড়িয়াছেন। ঐ কথাটার ভাল অর্থ হয় কি? সম্ভবতঃ শব্দটা বিক্রমাদিত্য, কিন্তু কোন মুদ্রাতেই 'বি' পাওয়া যায় না। এই স্কন্দগুপ্ত মগধের রাজাধিরাজ ছিলেন; তাঁহার শাসনকর্ত্তারা মালবদেশ শাসন করিত, এবং অবন্তীতে তখন কদাচ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বিত হইতে পারে নাই। এই জন্য স্কন্দগুপ্তকে উজ্জয়িনী-পতি বলিলে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫ হইতে ৪৬৮ পর্য্যন্ত। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের অবসানে, হীনবল মগধ রাজাদিগের রাজ্য ধ্বংস করিয়া হুনেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; এবং বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত প্রভৃতি পশ্চিম মালবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মগধে কৃষ্ণগুপ্তের রাজত্ব আরম্ভ হয়। গোয়ালিয়রের প্রস্তরলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, হুন-বীর তোরমানের মৃত্যুর পর ৫১৫ হইতে ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুনরাজ মিহিরকুল, কাশ্মীর হইতে আসিয়া পুনঃ পুনঃ মালব আক্রমণ করেন; এবং এই সময়ে প্রাচীন গুপ্তবংশীয় বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্ত পশ্চিম মালবে ছিলেন। বালাদিত্যের সেনাপতি কর্তৃক মিহিরকুল পরাজিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন, এবং বালাদিত্যের মাতার দয়ায় তাঁহার প্রাণবধ করা হয় নাই, এ সকল কথাও কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছে। হরন্‌লি

সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাশ্মীরের মাতৃগুপ্ত এবং মিহিরকুল একই ব্যক্তি। এরূপ অবস্থায়, এই অনুমান অসঙ্গত নহে যে, বালাদিত্যের মাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত বলিয়া, মিহিরকুল মাতৃগুপ্ত নাম পাইয়াছিলেন। একথাটা কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীর প্রবাদ উক্তির সঙ্গেও মিলিয়া যায়। বালাদিত্যের মৃত্যুর পর হুনজেতা সেনাপতি যশোধর্ম্মা, রাজাধিরাজ নাম লইয়া মালবে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মাণ্ডাসোরের প্রস্তরলিপি হইতে অনুমান করা যায় যে, ইঁহার রাজত্বকাল ৫৩০ হইতে ৫৪০ পর্য্যন্ত। জানা গিয়াছে যে, বালাদিত্যের একটী পুত্র ছিল; অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তিনি ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর মালবের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই রাজার নামও বিক্রমাদিত্য। এখন হুয়েন সাং, সুবন্ধু এবং এলবেরুণী প্রভৃতির কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে এই বিক্রমাদিত্যকেই করুর ক্ষেত্রের যোদ্ধা বলিয়া মনে হয়। যদি ইঁহার রাজত্বকাল ৫৪০ হইতে ৫৬০ পর্য্যন্ত ধরিয়া, শীলাদিত্যের (ধর্ম্মাদিত্য; প্রতাপশীল) রাজত্ব ৫৮০ পর্য্যন্ত ধরা যায়, তাহা হইলে হুয়েন সাংএর উক্তির সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। এই উজ্জয়িনীপতিগণ সম্ভবতঃ প্রাচীন গুপ্তবংশীয় হইলেও মগধের কৃষ্ণগুপ্তের বংশধরদিগকে রাজাধিরাজ বা সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতেন; কারণ এ সময়ে মগধ গুপ্তেরা যে প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য যে সকল রাজার বিক্রমাদিত্য নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের কাহাকেও উজ্জয়িনীপতি বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, প্রতিনিধি দ্বারা, অন্যান্য দূরদেশের মধ্যে মালব দেশও শাসন করিতেন; মালবদেশ শাসনে কোন প্রকার বিশেষত্ব ছিল না।

রাজতরঙ্গিণীর গণনায় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীপতি ছিলেন; মেরুতুঙ্গ বলেন যে, ধর্ম্মাদিত্যের (শীলাদিত্য) পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন; হুয়েন সাং বলেন যে, শীলাদিত্য প্রতাপশীলের পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য মালবের রাজা হইয়াছিলেন; প্রাচীন লিপি প্রভৃতি হইতেও বালাদিত্যের পুত্র বিক্রমাদিত্যকে ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জয়িনীতে পাইতেছি। কাজেই ৫৪০ হইতে ৫৬০ পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের কথা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কি চাহিব আর।

(১)

বিভো! কি চাহিব আর?
আজি এই নব বর্ষ,
নব দুঃখ নব হর্ষ,
নবীনতা মাখা আজি সমস্ত সংসার,

এস নিখিলের স্বামী,
শ্রীপদে প্রণমি আমি,
দিতে দাও শ্রদ্ধা ভক্তি নব-উপহার;
আজি কি চাহিব আর!

(২)

বিভো! কি চাহিব আর?
ভরিয়া হৃদয়-ভূমি,
কত কি দিয়েছ তুমি,
সুখ দুখ, ভয় আশা, আলোক আঁধার,
দিয়েছ মমতা প্রীতি,
আনন্দ বিষাদ স্মৃতি,
কল্পনা কামনা দে'ছ যোগ্য যা' আমার.
এবে কি চাহিব আর!

(৩)

বিভো! কি চাহিব আর?
দেছ রবি শশী তারা,
বসন্ত, বরিষা ধারা,
দেছ শত্রু মিত্র, দেছ পর আপনার;
মানবের প্রাপ্য যত,
আমারে দিয়েছ কত,
বাকী যাহা আছে সেতো অদৃষ্ট আমার!
এবে কি চাহিব আর!

(৪)

বিভো! কি চাহিব আর?
আমার এ বসুন্ধরা,
তোমারি আদর ভরা,
যেদিকে যখন দেখি সকলি তোমার;
হেথা পাপ পুণ্য মাঝে
তোমার করুণা রাজে,
তবু মোর পোড়া মনে কত আবদার!
এবে কি চাহিব আর!

(৫)

বিভো! কি চাহিব আর?
অদৃষ্টের শুভ যোগ,
অর্থ, যশঃ রাজ্য ভোগ,
ইন্দ্রজালময় তৃপ্তি ভোগ বাসনার,
আর নাহি চাহে মন,
খুলেছে সে আবরণ,
আর নাহি ভাল লাগে মায়ার সংসার।
এবে কি চাহিব আর!

(৬)

বিভো! কি চাহিব আর?
"সুখ" হেতা কারে বলে,
কি মন্ত্রে সংসার চলে—
এই আছে এই নাই "সুখ" নাম যার;
রোগ-জরা-মৃত্যু-ভয়,,
পলে পলে পাপ হয়,
অবিশ্বাস, হতাশ্বাস,ঘৃণা, অবিচার!
হেথা কি চাহিব আর!

(৭)

বিভো! কি চাহিব আর?
তোমারি প্রেমের জয়,
তোমার অনেক স'য়,
মানবে সহিবে এত—হেন ভাগ্য কার?
আর কাজ নাহি মম—
কাছে এস প্রিয়তম!
এ হীন হৃদয়ে দাও প্রেম একবার,
দেখাও সে স্বর্গপুরী সুখ পারাবার!

(৮)

বিভো! কি চাহিব আর?
তাহা হ'লে নিরজনে,
রহিব তোমারি সনে,
ক্ষুদ্র তারা রহে যথা কোলে চাঁদিমার;
জগত সুদূরে রবে,
কেহ নাহি কথা ক'বে,
দেখিবেনা শত নেত্র কভু জনতার!
আমি কি চাহিব আর!

(৯)

বিভো! কি চাহিব আর?
কানন কুন্তলা নদী,
বহি যাবে নিরবধি,
কুলু কুলু তানে যথা মহা পারাবার,

শ্যামল পাদপে থাকি,
গাহিবে পাপিয়া পাখী,
মিশিবে তাহারি সাথে মধুপ ঝঙ্কার;
বিশাল ভূধর অঙ্গে,
কুসুম হাসিবে রঙ্গে,
নাচিবে বিশুভ্র বায়ু গন্ধ বহি তার;
সে শোভা দেখিতে চেয়ে,
হৃদয় উঠিবে ছেয়ে,
তোমারি সৌন্দর্য্য ছটা অনন্ত অপার!
আহা! কি চাহিব আর!

(১০)

বিভো! কি চাহিব আর।
তখন আমার দেশ,
জানিবে না পাপ লেশ,
সবি পুণ্য, সবি ধর্ম্ম, সকলি উদার;
তুমি আমি গেছি ঘুচে,
শেষ রেখা গেছে মুছে,
ভালবেসে সবি দেছি চরণে তোমার!
তোমারি অমৃত সুধা,
খাইয়া গিয়াছে ক্ষুধা,
তোমাতে ডুবিয়া গেছি হয়ে একাকার!
তাই চাহি শ্রীচরণে—কি চাহিব আর।

শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতের শিক্ষা। (১)

এতদিন, এই দীর্ঘকাল, ভারতে যে ভাবে শিক্ষাপ্রদান-কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি, সেই শিক্ষাপ্রদান-কার্য্যে সম্যক্ ফল লাভ না হওয়ায়, ভারতের বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড কার্জ্জন ভারতের শিক্ষা সংশোধন মানসে যত্নশীল হইয়াছেন, এবং সেই যত্নের ফলে সেকেণ্ডারি ও প্রাইমারী শিক্ষা-সংস্কার করিয়া, এখন উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কল্পে শত বৎসর ইউনিভার্সিটী-কমিশন বসাইয়াছিলেন। অন্যের কথা বলিতে পারি না, তবে আমি আমার ক্ষুদ্র বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই মাত্র বলিতে সাহসী যে, প্রকৃতই ভারতবাসীকে ইংরেজ-রাজ এত দিন যে ভাবে শিক্ষাপ্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে ভারতের ক্ষতি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

এত দিন যে ভাবে এ দেশে শিক্ষা প্রদান কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, তাহা আমাদের এই পরাধীন পরমুখাপেক্ষী দরিদ্র দেশের পক্ষে কোনই ফলোপদায়ক হয় নাই,—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যে শিক্ষা দ্বারা মনের বা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয় না, যে শিক্ষা দ্বারা নিজের বা পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা জন্মে না, যে শিক্ষার দ্বারা পরোপকারী ও স্বদেশপ্রেমিক হওয়া যায় না, এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, যে শিক্ষায় মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত জীবে পরিণত করিয়া দেয়, এমন শিক্ষাকে কুশিক্ষা ভিন্ন কখনই সুশিক্ষা বলিতে পারি না। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু অর্থোপার্জ্জন নহে, শুধু আপনার ও প্রিয়তমার বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তি নহে,—শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, যাহাতে মনুষ্যকে, এক কথায়, দেবত্বে পরিণত করে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের

বিষয় যে, এই বর্ত্তমান শিক্ষায় দেবত্ব তো দূরের কথা, আমাদিগকে বরং দিন দিন পশুত্বে পরিণত করিয়া দিতেছে। এই দীর্ঘকালের কুশিক্ষায় আমাদের এতই ক্ষতি হইয়াছে যে, সে ক্ষতি কত কালে যে পুরণ হইবে, বিধাতাই জানেন।

আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছে। তার পর দেখাইব যে, এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার সংস্কার করিলে আমাদের শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। প্রথমতঃ 'আমাদের এই শিক্ষায় আমরা একমাত্র বুঝিয়াছি যে, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকুরী অথবা ওকালতি। চাকুরীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং আমাদের দেশের লোকের ঝুঁকি একমাত্র ওকালতি বা মোক্তারীর দিকে। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ের যে অবস্থা, তাহাতে ওকালতি বা মোক্তারীতেও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। দিন দিন উকীল মোক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু মোকদ্দমার সংখ্যা এতই বৃদ্ধি হইতেছে যে, দেশের লোক উকীল মোক্তারের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া মোকদ্দমার মোহে পরিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, প্রতিবাসীর সর্ব্বনাশ,এই সকলে সিদ্ধহস্ত হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, এই সব দেখিয়া শুনিয়া সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম চন্দ্র একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আগে দেশের টাকাটা যেমন চোর ডাকাইতে লইত, এখন ইংরেজের আমলে সেই টাকাটা পুলিশে ও উকীলে লইতেছে।" কথাটা খাঁটি সত্য কথা। দিন দিন উকীল মোক্তারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতেছে, দেশের লোকও ততই দিন দিন আপনার সর্ব্বনাশ সাধনের পথে অগ্রসর হইতেছে। আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার বলে বেশ বলিতে পারি যে, জীবনের এই দীর্ঘকালে, কোন উকীলের নিকট মোয়াক্কেল আসিলে,—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধীধারী উকীল বাবু কখন যে আপোষের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখি নাই।

এই সব কুশিক্ষা হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে, প্রকৃতই শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজন। তবে যে ভাবে কমিসন শিক্ষা-সংস্কার করিতে বলেন, আমাদের মতে সে ভাবে শিক্ষা-সংস্কার করিলে যে কোন ফল হইবে, ইহা মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস যাহা, তাহা পরে বলিব। এখন এই মাত্র বলিতে হয়, যাহাই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন, সেই শিক্ষা যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয়, সতত তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে পাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-দত্ত একখানি প্রশংসা-পত্র বাঁধিলেই হইবে না। এখন যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে শিক্ষার্থীর রুচির প্রতি কোনই লক্ষ্য রাখা হয় না, কিন্তু শিক্ষা-সংস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষার্থীর আপনার প্রবৃত্তি ও রুচির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু দেশের বড় দুর্ভাগ্য যে, সে দিকে দেশের এক জনেরও দৃক্পাত নাই। আমাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই, অথচ, বুঝিবার দোষেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, গবর্ণমেণ্ট যদি কোন কার্য্যে হাত দিতে অগ্রসর হন, অমনই তার স্বরে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু, প্রকৃত কোন্ পথ অবলম্বন করিলে যে আমাদের উপকার সাধন হয়, সে দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। একে বিদেশীয় রাজা, তাহার পর ভিন্ন দেশ ভিন্ন রুচিগ্রস্ত লোক, সুতরাং অনেক সময়ে যে তাঁহারা

তাঁহাদের বুঝিবার ভুলে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইবেন,—ইহা আশ্চর্য্য নহে। এরূপ স্থলে, শুধু চড়া গলায় রাজার দোষ কীর্ত্তন না করিয়া, পরাধীন জাতির ন্যায় মধুর কথায় দেশের প্রকৃত অভাব অভিযোগ রাজার কর্ণে প্রদান করাই কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে রাজা হইতেই তাহার প্রতিকার হয়, স্থির ও সংযত ভাবে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; এবং যতদূর বিশ্বাস, ধীর ভাবে রাজার গোচরে আনিলে আমাদের এই অভাব অভিযোগ রাজার নিকটে কখনই উপেক্ষণীয় হইবে না,— সম্যক্ পূর্ণ না হইলেও যে, কতকাংশে পূর্ণ হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। অথচ আমাদের এমনই স্বভাব যে, যাহাতে দেশের প্রকৃত সুশিক্ষা হয়, যাহাতে সুশিক্ষার বলে স্বদেশবাসীগণ "স্বাস্থ্য" "সাহস" "সত্য" ও "সেবায়" শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়, আমরা আমাদের সাধ্যমত সে চেষ্টা না করিয়া, গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার বুঝিবার ভুলে অথবা আপনার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোন-সংস্কার-প্রয়াসী হন, অমনই আমরা তার স্বরে গবর্ণমেণ্টের দোষ উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইতেছি। এত দিন যাহা হইবার হইয়াছে, গত কার্য্যে অনুশোচনা করিয়া কোনই ফল নাই। বরং যে সময়টা অনুশোচনায় কাটাইব, সে সময়টার মধ্যেও যদি দেশের প্রকৃত কোন উপকার করিতে পারা যায়, এখন আমাদিগকে সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে—করাও উচিত। দরিদ্র পরাধীন ভারতবাসী এই কুশিক্ষার ফলে দিন দিন মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে। আপন আপন শারীরিক মানসিক শক্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অথবা করিয়াও কোন ফল নাই ভাবিয়া, এত দিন যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছিল, সেই কুশিক্ষায় মনুষ্যত্ব ও স্বাস্থ্য উভয়ই বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে,—দীর্ঘকাল এমনই ভাবে এই শিক্ষা পাইতে থাকিলে, বোধ হয়, অচিরেই এ জাতি জগতে একটা অদ্ভুত পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাই স্বদেশবাসীদের সমীপে আমার সানুনয় প্রার্থনা, এখন সময় থাকিতে আপনারা আপনাদের এই দেশ-প্লাবিত কুশিক্ষার গতিরোধে বদ্ধপরিকর হউন, নচেৎ আপনাদিগের নির্দ্দোষী ভাবী পুরুষেরাই আপনাদের এই জ্ঞানকৃত পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে আপনাদিগকে অভিসম্পাত করিবে।

পরাধীন ও পরপ্রত্যাশী ভারতবাসীর বর্ত্তমান শিক্ষা যে কুশিক্ষা, তাহা দেখাইলাম, এবং ইহাতে সুফল না হইয়া দিন দিনই যে কুফল প্রসব করিতেছে, তাহাও দেখাইলাম। এখন উচ্চশিক্ষার সংস্কার মানসে গতবৎসর যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসিয়াছিল, সে কমিশন যে সব বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাতেও যে দেশের বিশেষ কোন উপকার হইবে, আশা হয় না। তার পর নিম্ন শিক্ষার যে সংস্কার হইয়াছে, তাহাতেও আশানুযায়ী ফল পাইবার কিছু মাত্র আশা নাই; তবে একটু মাত্র এই দেখিতেছি যে, নিম্ন স্কুলের কোমল-বয়স্ক ছাত্রগণ এত দিন অল্প বয়সে যে রাশি রাশি পুস্তক লইয়া শৈশব হইতে মাথা কুটিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছিল, বর্ত্তমান কিণ্ডারগারটেন শিক্ষাপ্রণালীর হাতে পড়িয়া, গাধার ন্যায় পুস্তকের মোট বহিবার হাত হইতে কতকটা রক্ষা পাইবে, আশা করা যায়। কিন্তু সম্যক ফল লাভের আশা নাই, কেন যে নাই, তাহার কথা পরে বলিব।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি স্বদেশবাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, দেশের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য, স্বদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য, এখন প্রকৃতই আমাদের শিক্ষা-সংস্কার করা কর্ত্তব্য। যে ভাবে শিক্ষা-সংস্কার হইতেছে, তাহা প্রকৃত সংস্কার নয়। কি করিলে প্রকৃত শিক্ষা সংস্কার হয়, কি করিলে দরিদ্র স্বদেশবাসী সাহস ও সত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নিজের ও দেশের প্রকৃত সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন, আমি ক্রমে ক্রমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমাদের এই পরাধীনদেশে এখন অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে,—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কেন না, আগে জীবিকার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে, তারপর অন্য কথা। নতুবা জীবনই যদি দিন দিন মরণের পথে ধাবিত হইল,—উপযুক্ত আহারের অভাবে স্বদেশবাসী যদি মরিয়া রহিল, তবে তাহার উচ্চ শিক্ষায় কি ফল লাভ হইবে? উদরের উপযুক্ত অন্ন সংস্থানই যদি করিতে না পারিল, তবে এত সাহিত্যদর্শন, গণিত, বিজ্ঞানাদি ঘাঁটিয়া শুধু শরীর নষ্ট করিয়া কি হইবে? এত দিন যে ভাবে এই অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, এখন আর সে দিন নাই। কেন না, এত দিন এই অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আমরা চাকুরী ছাড়া ওকালতি, মোক্তারি ও ডাক্তারিতে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় অবলম্বন করিতেছিলাম, কিন্তু দিন দিন যে কাল পড়িতেছে—উকীল, মোক্তার ও ডাক্তারের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এ পথে আর কোনই সুফল পাইবার আশা নাই, এখন ভিন্ন পথের অন্বেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন পথের প্রয়োজন সত্য, কিন্তু ভিন্ন পথাবলম্বন করিতে হইলে দেশে যে শিক্ষার দরকার, সে শিক্ষার উপায় কৈ? আর যে শিক্ষার দরকার, তাহাও দুই দশটা টেক্‌নিক্যাল আর্ট স্কুলে কুলাইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তাই এখন দেশের লোককে প্রচুর পরিমাণে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দেওয়ার উপায় ও সুবিধা অন্বেষণ করিতে হইবে। তবে এই স্থলে এ কথারও উল্লেখ করা দরকার যে, সেই পথ অবলম্বন করিলেই প্রকৃত কোন উপকার হইবে কিনা, জানি না। কেন না, এই দেশের লোক হুজুগে নাচে। সুতরাং, শুধু হুজুগে না নাচিয়া যাহাতে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা হয়, এখন তাহারই উপায় আলোচনা করা দরকার এবং সেই আলোচনাই করিব।

আমি যে নিয়মে এই শিক্ষা সংস্কার-কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, সে অনুরোধ পালন করিতে হইলে শুধু এক মাত্র গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; কেন না, গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয়, ভিন্ন প্রকৃতির লোক। যদি আপনারা এ কার্য্যে অগ্রসর হইলে. কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করেন—উত্তম, নহিলে নিজে নিজে স্বাবলম্বন করিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে। ইহার জন্য যাঁহার অর্থ প্রদান করিবার শক্তি আছে, তিনি স্বদেশের কল্যাণ কামনায় অকাতরে অর্থব্যয় ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবেন, যাঁহার চিন্তা ও বিচার করিবার শক্তি আছে, তিনি আপনার নূতন নূতন চিন্তার দ্বারায় এই শিক্ষা-সংস্কার কার্য্যের সহায়তা করিবেন। জ্ঞানচক্ষে আমি যতটা দেখিতেছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রকৃত ভারতহিতেচ্ছু মহাপুরুষেরা একবার এই শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেই ধীরে ধীরে কৃতকার্য্য

হইবেন। দেশের লোক এখন কুশিক্ষায় জর্জ্জর, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট এই শিক্ষাসংস্কারকল্পে, আপনাদের রুচি ও ইচ্ছানুসারে দেশের লোককে সুশিক্ষিত করিবার জন্য, উপায় উদ্ভাবন মানসে গত বৎসর ইউনিভারসিটি-কমিশন বসাইয়াছিলেন। সে দিন কনভোকেশন-সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যানছেলার, বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের সভাপতি মান্যবর র‍্যালে সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমরা সুশিক্ষাপ্রদান মানসে এমন পথ অবলম্বন করিয়া শিক্ষা সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব যে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা পাউক আর না পাউক, যাহারা উচ্চশিক্ষা পাইবে, যাহাতে তাহাদের সুশিক্ষা হয়, আমরা তাহাই করিব।" পরিষ্কার ও উত্তম কথা। আমরাও তাহাই চাহি। যে, যে শিক্ষাই পাউক না কেন, সে যেন সেই বিদ্যার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে,—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। আর, যাহারা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের সমর্থ নয়,—যাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হীনতা প্রযুক্ত উচ্চ শিক্ষা আবর্জ্জনা স্বরূপ, আইস, আমরা সেই সব দরিদ্র স্বদেশবাসীর জন্য নূতনতর শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া, দেশের প্রকৃত হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হই।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমার মতে এখন এদেশে অর্থকরী বিদ্যারই বিশেষ দরকার, কেন না, উদারন্ন সংস্থান করিয়া জীবন রক্ষা করিতে না পারিলে শুধু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কি হইবে ? বর্ত্তমান বিবিধ বিষয় শিক্ষার কঠোরতায় এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে আমাদের দুর্ব্বলতা যেমন জন্মিতেছে, তেমনই, সেই সঙ্গে ভীরুতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অনন্ত দোষের আকর হইয়া আমরা জগতে ঘৃণিত হইতে ঘৃণিততম এক প্রকার অদ্ভুত জীবে পরিণত হইতেছি। সুতরাং যাহাতে আমাদের দেশ কাল ও পাত্র ভেদে শিক্ষার প্রকৃত সংস্কার হইয়া আমরা সুশিক্ষা লাভ করিতে পারি,—যে সুশিক্ষায় আমাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন হয়,—যে শিক্ষায় আমরা সতত সত্যপথে থাকিয়া সাধুভাবে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তাহাতেই সুখে দিনপাত করিতে পারি এবং সেই সঙ্গে পরোপকারিতা প্রভৃতি অনন্ত গুণের অধিকারী হই,—এখন সর্ব্বতোভাবে আমাদের সেই শিক্ষাই দরকার। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের প্রবৃত্তি কতটা যে নীচ হইয়া পড়িতেছে—এবং কালে আরো কত যে নীচ হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে সেই নীচতার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমি আমার জীবনে অনেকবার দেখিয়াছি যে, যাঁহারা আমাদের দেশের শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, যাঁহারা দেশের গৌরব স্থল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সব গৌরব-রত্ন—যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা দেশের ও সমাজের গৌরব করিয়া থাকি, তাঁহাদের, সেই সব উচ্চ শিক্ষিতদের অধিকাংশের হৃদয় যতটা নীচ প্রকৃতির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহারা অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, তাঁহাদের হৃদয় এখনও ততটা নীচ হয় নাই। কিন্তু সু-আদর্শের অভাবে তাহা যে দীর্ঘকাল ঐরূপ থাকিবে, মনে হয় না। এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, এক জন মুদী বা দোকানী, সামান্য এক জন জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারী বা মহরির দ্বারে কোন ভিখারী বা অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে, সেই মুদি বা পাটোয়ারী, দোকানী বা মহরি নিজে বড় কষ্টে যে শাকান্নে আপনার উদর পূর্ণ করেন, সেই শাকান্নের

একাংশ দিয়া অতিথি ও ভিখারীর সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য ও পবিত্র মনে করে। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী কোন কোন উকীল বা হাকিম, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বা অর্থশালীর ঘরে এমনই ভাবে কোন ভিখারী বা অতিথি আসিলে, ভিক্ষা পাওয়া দূরের কথা ,বরং সময় বিশেষে দুই চারিটা লগুড়াঘাতও ঘটিয়া থাকে। পাঠক! কেন এমনটী হয়, বলিতে পারেন কি? যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত, যাঁহাদিগকে আমরা আমাদের দেশের ও সমাজের গৌরব-স্তম্ভ মনে করিয়া গৌরব করি, যাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান জীবন নাকি দেশের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন,—সেই সব মহাশয় লোকদের দৈনন্দিন জীবন এমনভাবে গঠিত হইতেছে কেন, বলিতে পারেন কি? আমার বিশ্বাস, ইহাও দেশের বর্ত্তমান শিক্ষার দোষ। উর্ব্বরক্ষেত্রে বীজ বপন হইলে যেমন ফলোপকারিতা বেশী হয়, মরুময় ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে সে ফল কখনই পাওয়া যায় না—পাইবার কোন আশা পর্য্যন্ত নাই। আমাদের দেশে বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার ফলও ঠিক তেমনই হইয়াছে—মরুময় ক্ষেত্রে বীজ বপনের মতই হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার অধিকারী, উচ্চ শিক্ষায় তাঁহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে—সে ক্ষেত্রে সুফলও যথেষ্ট পাওয়া যাইবে,ইহাতে আর সংশয় কি? আবার যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে উচ্চ শিক্ষার সম্পূর্ণ অযোগ্য, অধিকাংশ স্থলে, সেই ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষায় নিয়তই কুফল প্রসব করিতেছে, যত দিন শিক্ষা-সংস্কার যথাযথ ভাবে না হইতেছে, তত দিন নিয়ত এমনই কুফল প্রসব করিতে থাকিবে। তাই বলিতেছিলাম যে, যখন আমাদিগকে অর্থকরী বিদ্যাই শিখিতে হইবে, তখন যে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষায় বিনা ক্লেশে দিন যাপনের সহিত 'সত্য', 'স্বাস্থ্য', 'সেবা' ও 'সাহসের' সমন্বয় সাধিত হয়, এখন আমাদিগকে সেই শিক্ষারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কোন্ উপায়ে সেই পথ দেখিব—এখন তাহারই মীমাংশায় প্রবৃত্ত হইব। এত দিন যে অর্থকরী শিক্ষা পাইলাম, পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে আর সুবিধা নাই। সুতরাং দেশ কাল পাত্র ভেদে এখন অন্য প্রকারের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য। যে অর্থকরী বিদ্যা শিখিলে কখন কাহারও তোষামোদ না করিয়া, কখন কাহারও পদ-লেহন না করিয়া, এক কথায়, আপনার মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়,—এখন আমাদিগকে সেই চেষ্টাই দেখিতে হইবে। সে শিক্ষা কি? আমার মতে, যে শিক্ষা দেশের লুপ্তপ্রায় কৃষি ও শিল্পের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, এখন আমাদিগকে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কিন্তু দেশের লোকের যে প্রকার প্রকৃতি, তাহাতে নীরস কৃষি ও শিল্প শিক্ষাতেই যে আপন সন্তান সন্ততিকে নিযুক্ত করিবেন, মনে হয় না; সেই জন্য, শুধু কৃষি ও শিল্পের উপর নির্ভর না করিয়া, কৃষি ও শিল্পাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যাদি সুকুমার বিষয়েরও শিক্ষা দিতে হইবে। নহিলে, সহসা শুধু কৃষি ও শিল্প-শিক্ষায় লোকের মন উঠিবে না। এখন এ শিক্ষাপ্রদান কার্য্যে সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন বা সাহায্য করেন—উত্তম কথা; নহিলে এক মাত্র স্বাবলম্বনের দ্বারায় এ কার্য্য আমাদিগকেই অগ্রসর হইয়া সাধন করিতে হইবে। যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের বৈঠকে শুধু বাক্যস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া, কেবল রাজদ্বারে দেশবাসীর উচ্চ রাজপদ, ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য প্রভৃতি

রাজসম্মান কামনায় লালায়িত হইলে চলিবে না; যাহাতে দেশে সুশিক্ষার বীজ বপন হয়, স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রের তাহা করা কর্ত্তব্য। দুই বৎসর হইতে কংগ্রেসের সহিত দেশের কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের প্রদর্শনী খোলা হইতেছে,—ইহা কতকটা মন্দের ভাল; কিন্তু শুধু প্রদর্শনীর সীমা মধ্যে শিল্প কৃষির উৎকর্ষের সীমা নিবদ্ধ করিলে চলিবে না, যাহাতে দেশের লোক আপন আপন জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কৃষি ও শিল্পাদি বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, এখন হৃদয় ও মন দিয়া আমাদের সেই কার্য্য করাই বিধেয়, এবং কংগ্রেস ও কনফারেন্সের ইহাই সর্ব্ব প্রধান মূল মন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের জন্মাবধি এই দীর্ঘকাল তো স্বদেশবাসীগণ অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন করিলেন—অনেক অর্থ ব্যয় করিলেন, কিন্তু একবার স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখুন যে, এই দীর্ঘকালের সাধনা ও বিপুল অর্থ ব্যয়ে দেশের প্রকৃত কোন উপকার হইয়াছে কি না? ইংরেজরাজের নিকট হইতে কোন নূতন স্বত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না? ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যাহা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা আপনারা কংগ্রেসের বৈঠকে আন্দোলন করুন বা না করুন, তাহা আমাদিগকে দিবেনই; আর যাহা আমাদিগকে দান করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, আপনারা চিরকাল ধরিয়া চীৎকারের পর চীৎকার করিলেও বিদেশীয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন দিন সে অধিকার পাইবেন না—পাইবার আশা করাও মূঢ়তা। সে আশা থাকিলে, মহামতি গ্লাডোষ্টোন ব্যর্থ-মনোরথ হইতেন না। তাই কংগ্রেস ও কংগ্রেসওয়ালা স্বদেশবাসীদের নিকট কর-যোড়ে প্রার্থনা, রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে দেশে কৃষি ও শিল্পাদির উন্নতি হয়, দেশের লোক কৃষি ও শিল্পাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া দেশের উপকার করিতে পারেন, একবার সেই চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন? ইংরেজ-রাজ, আমাদের উন্নতির চারিদিক বন্ধ করিয়া থাকিলেও, কৃষি শিল্পাদির উন্নতির পথ বন্ধ করেন নাই,—এখন একবার এই পথে বিচরণ করিয়া দেখুন না কেন,—দেশের দুঃখদারিদ্র্য, দেশের অন্ন-কষ্ট, এক কথায় দেশের হাহাকার কমে কি না? ইচ্ছা করিলে আপনারা দেশের যেটুকু প্রকৃত উপকার করিতে পারেন, তাহা না করিয়া কেন বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে অরণ্যে রোদন করিতেছেন! একবার এই পথে অগ্রসর হউন,—জগদীশ্বর সহায়, তিনি আপনাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

◆

পৃথিবীর গতি।

দ্বৈপায়ন ঋষি প্রভৃতির অতুলনীয় জ্ঞান-গরিমানভিজ্ঞ লেখকের "সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত" পাঠ করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের অবতারণা। সেই ঋষিগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী সময় সমুদ্র-মন্থন করিয়া যে সকল জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিয়াছেন, তাহা উপহাসের বিষয়ীভূত নহে। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও গণিতের রাজত্বকাল—কঠোর যুক্তিবলে সুশাসিত,

এখন যাহা কিছু বলিলেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় না।

পাশ্চাত্য জগতের অতীতের ইতিহাসে ভাস্করাচার্য্যের ভূকেন্দ্রিক মত টলেমিকসের মত (Ptolemic theory) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; পরে আর্য্যভট্টের মতানুযায়ী কোন গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদের মত-সূত্র অবলম্বন করিয়া কপার্নিকস্ সৌরকেন্দ্রিক মতের সমর্থন করেন। তিনি সেই সময়ে ঐ মতের সমর্থনে অন্য কোন কারণই দিতে পারেন নাই, কেবল এইটুকু বলিয়াই বিরত ছিলেন যে, যখন সৌর-জগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহই সূর্য্যকে কেন্দ্র স্থানীয় করিয়া আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, তখন পৃথিবীও তাহাই করে, ইহাই সম্ভব। অতঃপর মহাপ্রাজ্ঞ নিউটন আবির্ভূত হইয়া তাঁহার আবিষ্কার দ্বারা জগৎকে স্তম্ভিত করেন। তন্মধ্যে তিনি পদার্থ সমূহের গতিবিষয়ক যে তিনটী নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাহার উপরেই গতিবিজ্ঞান (Dynamics) সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং এই গতিবিজ্ঞানের উপর জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) প্রতিষ্ঠিত।

নিউটনের পদার্থ সমূহের গতিবিষয়ক নিয়ম তিনটী এই :—

(১) কোন বস্তু একবার স্থির থাকিলে অথবা একবার চলিতে থাকিলে, অন্য কোন শক্তি দ্বারা তাহার অবস্থান্তর না ঘটাইলে, সেই বস্তু চিরদিন একই ভাবে থাকিবে, অর্থাৎ যে স্থির ছিল, সে চিরদিন স্থির থাকিবে এবং যে চলিতেছিল, সে চিরদিন চলিবে।

তবে যে একটী বল্‌কে মাটীর উপর দিয়া গড়াইয়া দিলে তাহা কিছুকাল পরে স্থির হয়, তাহার কারণ, মৃত্তিকা-ঘর্ষণ দ্বারা ও বায়ু বাধা প্রদান করিয়া বলকে স্থির করে।

(২) পদার্থ সমূহের মোমেণ্টাম (momentum) যে বলে বস্তুটীকে আঘাত করা হয়, তাহার অনুরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এবং বস্তুটী শক্তির আজ্ঞাকারীরূপে ঐ শক্তির অনুকূল দিকেই প্রধাবিত হইয়া থাকে। *

কোন সমান্তরাল সমতলের উপর একটী বস্তু রাখিয়া তাহাতে একটু বল্ প্রয়োগ করিলে, ঐ বস্তুটী কিছু দূর গমন করিবে। আবার তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বল প্রয়োগ করিলে ওটী দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইয়া দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করিবে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, বস্তুটীর গতি, যেরূপ বলে তাহাকে আঘাত করা যায়, তাহার উপর নির্ভর করে। আবার ঐ বস্তুটীর আকার অর্থাৎ পদার্থ সমষ্টি (mass) যদি প্রথমবারের দ্বিগুণ হয়, তবে ঐ বস্তু দ্বিগুণ বল্ প্রয়োগেও প্রথমবারের ন্যায় বেগে যাইবে ও প্রথমবার যতদূর গিয়া থামিয়াছিল, তত দূর গিয়া থামিবে। তবেই আবার ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, বস্তুটীর আকারের (mass) উপরেও তাহার গতি নির্ভর করে; অতএব যেরূপ বল্ দ্বারা বস্তুটীকে আঘাত করা হয়, তাহার উপর উহার বেগ ও পদার্থ সমষ্টি (mass) এতদুভয়ের গুণফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই গুণফলের নাম মোমেণ্টাম (momentum)।

(৩) প্রত্যেক ক্রিয়ার এক একটী বিপরীত ও তুল্য প্রতিক্রিয়া আছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৃতীয় নিয়মটীর আলোচনার আবশ্যক নাই।

প্রথম নিয়ম হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইবে যে, কোন বস্তুতে যদি একবার বল্ প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহা অনন্তকাল ধরিয়া

---

* The rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and the change takes place in the direction of the line in which the force acts,

সমান বেগে চলিতে থাকিবে এবং দ্বিতীয় নিয়মের শেষাংশ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, একটী বস্তুতে যতদিক হইতে এককালে যত প্রকার বল্ প্রয়োগ করা হউক না কেন, ঐ বলগুলির প্রত্যেকটী আপন আপন গতির দিকে এবং আপন আপন শক্তির অনুরূপ গতিতে ঐ বস্তুটীকে পরিচালিত করে। ইংরাজীতে বল্ সমূহের এই স্বাধীন ক্ষমতার নাম Physical independence of forces কহে।

এই জটিল বিষয়টীর মীমাংসার জন্য কয়েকটী উদাহরণের প্রয়োজন।

কোন স্রোতস্বতী নদী আড়াআড়ি পার হইবার জন্য যদি কোন বাষ্পীয় পোত কোন নির্দ্দিষ্ট বেগে ধাবিত হয়, তবে তীরস্থিত ব্যক্তি দেখিবে যে, ঐ পোতখানি নদীর বেগ ও নিজের বেগের সমন্বয়ে যে একটী নূতন দিকে নূতন বেগের সৃষ্টি করিয়াছে, উহা সেই বেগে সেই দিকে যাইতেছে; কিন্তু সেই নদীর উপর ভাসমান কোন নৌকাস্থিত ব্যক্তি যদি ঐ পোতখানির দিকে দৃষ্টি করে, সে দেখিবে, পোতখানি এক তীর হইতে ঋজুভাবে অন্য তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কারণ পোতখানি স্রোতের বেগে যেরূপ ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে, নৌকার লোকটীও সেই বেগে স্রোতোমুখে ভাসিয়া যাইতেছে; সুতরাং নৌকাস্থিত লোকের নিকট পোতের স্রোতোমুখী গতি লক্ষিত হইবে না, কিন্তু তাহার অন্যতর গতি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, পোতখানির পক্ষে একই সময়ে স্রোতের অনুকূল গতি ও তাহার নিজের স্বাধীন গতি হওয়া সম্ভবপর।

সার্কাসে অশ্বারোহী ব্যক্তি বেগবান অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে যখন উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠে, তখনও অশ্ব চলিতে থাকে। আবার যখন অশ্বারোহী নিম্নগামী হয়, তখন অশ্বের পৃষ্ঠের উপরেই পতিত হয়। কারণ ঐ ব্যক্তি অশ্বে অবস্থান সময়ে যে গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থান ও নিম্নে পতন সময়েও তাহার সে গতি থাকিয়া যায়। (নিউটনের প্রথম নিয়ম।) সুতরাং সে ব্যক্তি অশ্বের বেগে অশ্বের গতির দিকে যেমন যাইতেছে, তেমনি উর্দ্ধেও উঠিতেছে, কাজেই আবার যখন পতিত হয়, তখন অশ্বের পৃষ্ঠেই পতিত হয়।

এই কারণেই পক্ষী একবার আকাশে উড্ডীন হইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাহার কুলায় হারায় না। এই কারণেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে শিলা নিক্ষেপ করিলে, স্থির পৃথিবী হইলে শিলাখণ্ড যেখানে পড়িত, পৃথিবীর গতিশীলতা সত্ত্বেও তাহা সেই স্থানেই পড়ে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তু পৃথিবীসংলগ্ন বলিয়া পৃথিবীর অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। যদি কোন সময় ঐ বস্তু পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তবুও তাহাতে পৃথিবীর গতি ঐ দিকে থাকিয়া যায়। আমরাও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল; কাজেই আমরা পূর্ব্বোক্ত নৌকাস্থিত লোকের ন্যায় ঐ বস্তুর পৃথিবীর অনুরূপ গতির বিষয় বুঝিতে পারি না, কেবল উর্দ্ধগতি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বায়ুরাশিরও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে একটী গতি আছে, তদ্ব্যতীত তাহাদের অন্য যে গতি অনুভব করি, তাহাই ঝড়, বাতাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর গতি বশতঃ ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন অট্টালিকা মঠমন্দিরাদি ভগ্ন হইবার কারণ নাই, কারণ পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাহাদেরও গতি হইয়াছে। রেল গাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দিলে গাড়ীর গতির বিষয় আমরা কিছু

বুঝিতে পারি কি ? যদি ঐ গাড়ী ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগেও যাইতে পারিত, তবুও তাহা বুঝিতে পারিতাম না। গাড়ীর অভ্যন্তরে যে কম্পন অনুভব করি, তাহার কারণ রেল লাইনের অসমতা, অসমতলতা ও স্থানে স্থানে বক্রভাব।

উল্লিখিত চাক্ষুষ উদাহরণটীর ন্যায় ভ্রাম্যমান পৃথিবীর গতি, এখন যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা যদি শতগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং পৃথিবী যদি সৌরজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ্যহীন উড্ডীয়মান ফানসের ন্যায় অনন্তের পানে ছুটিতে থাকে, তবুও, সূর্য্যের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়ায়, দিবারাত্রি ও ঋতু পরিবর্ত্তনের বিশৃঙ্খলা ব্যতীত, অন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিব না, পৃথিবী কোথায় যাইতেছে, কি বেগে ধাবমান হইতেছে, কিছুই জানিতে পারিব না।

এখন দেখা যাউক, আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ গতি বিষয়ে কি কি প্রমাণ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

১ম প্রমাণ। দৃষ্টান্ত (Analogy) ; এটী পূর্ব্ববর্ণিত কপার্নিকসের যুক্তি।

২য় প্রমাণ। ফুকোর দোলক পরীক্ষা (Foucault's Pendulum experiment) যদি কেহ পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর নিকটে একটী অতি উচ্চ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চূড়া হইতে অভ্যন্তর দেশে একটী দোলক (Pendulum) দীর্ঘ সূত্র দ্বারা ঝুলাইয়া দেয় এবং ঐ পেণ্ডুলাম যেখানে পৃথিবী স্পর্শ করিবে, সেখানে পৃথিবীর উপরে যদি বালুকা বৃত্তাকারে বিছাইয়া দেয় এবং মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশি বহিষ্কৃত করিয়া যদি ঐ পেণ্ডুলাম সরল-রেখায় দোলাইয়া দেয়, তবে ঐ পেণ্ডুলাম ঘড়ীর পেণ্ডুলামের ন্যায় পুনঃ পুনঃ একই ভাবে এক সরল রেখায় চলিতে থাকিবে। কিন্তু ঐ পেণ্ডুলামের নিম্নস্থিত বালুকাবৃত্তের বিভিন্ন স্থানে ঐ পেণ্ডুলাম কর্ত্তৃক ব্যাসরেখা-ক্রমে চিহ্ন পাওয়া যাইবে, কারণ পেণ্ডুলাম একই ভাবে চলিলেও তাহার নিম্নে পৃথিবী ও তৎসহ বালুকারাশি বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে, আর ঐ বালুকারাশি ২৫ ঘণ্টায় একবার মাত্র ঘুরে, তদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথিবীও ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে।

সত্য বটে মঠ পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। সেই জন্য যে সূত্রে গোলক ঝুলান আছে, ঐ সূত্রে মঠে সংলগ্ন থাকা হেতু ২৪ ঘণ্টায় একটী মাত্র পাক পড়িতেছে। কিন্তু ঐ পাকের এত দূর ক্ষমতা থাকিতে পারে না যে, ঐ পেণ্ডুলামের গতি পরিবর্ত্তন করে। পেণ্ডুলাম যে সমতলে ঘুরিতেছে, তাহা স্থির থাকিবে। নিম্নে পৃথিবী বালুকাস্তরণ সহ বৃত্তাকারে ঘুরিয়া যাইবে এবং কেবল এই জন্যই পেণ্ডুলামটী একবার বালুকাস্তরণের উপর যে রেখা অঙ্কিত করিয়া গেল, পুনরায় সে রেখার উপর দিয়া ফিরিয়া আসিবে না, নূতন রেখার উপর দিয়া আসিবে। আমরা পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান বলিয়া আমাদের মনে হইবে পৃথিবী ঘুরিতেছে না, কিন্তু পেণ্ডুলামটী পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিয়া আসিতেছে।

ফুকো অগ্রে গণিতদ্বারা নির্ণয় করিয়া লইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কোথায় কত সময়ে ঐ পেণ্ডুলাম এইরূপ ভাবে (অর্থাৎ apparently) একবার ঘুরিয়া আসিবে, পরে পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করেন যে, গণিতের ফল ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল ভিন্ন নহে।

ঐরূপ পরীক্ষা যদি পৃথিবীর অক্ষ রেখার (Equator) উপর করা যায় ও পেণ্ডুলামটী যদি পূর্ব্ব পশ্চিমে দোলাইয়া দেওয়া হয়, তবে স্বতঃই অনুমিত হইবে যে, এবার পেণ্ডুলামের গতি একই ভাবে এক সমতলে থাকিবে, ঘূর্ণায়মান গতি প্রাপ্ত হইবে না। বস্তুতঃও তাহাই ঘটিয়া থাকে।

৩য় প্রমাণ। নিউটনের পরীক্ষা।

পৃথিবী গোল বলিয়া তাহার কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান যে পরিমাণ বেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে, তাহাপেক্ষা অধিক বেগে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরিতেছে এবং তাহা অপেক্ষাও অধিক বেগে পর্ব্বত বা মঠের চূড়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে। এই জন্যই মঠের

চূড়া হইতে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড মঠের চূড়ার গতি লইয়া পড়িবে বলিয়া ও মঠের চূড়াপেক্ষা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কম বেগে ধাবিত হওয়ায়ই শিলাখণ্ড মঠ-মূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়িবে। ঐ কারণেই মঠের পশ্চিমের দিকে শিলাখণ্ড ত্যাগ করিলে উহা মঠের গাত্রে আঘাত করিবে।

৪র্থ প্রমাণ। গণিতের প্রমাণ (Mathematical proof) একখণ্ড শিলায় রজ্জু বাঁধিয়া ঐ রজ্জুর শেষভাগ আমাদের একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে বাঁধিয়া ঐ শিলাখণ্ড বৃত্তাকারে ঘুরাইলে, তাহা ঐ বৃত্তের পরিধি পরিত্যাগ করিয়া জ্যা-রেখা ক্রমে দূরে যাইবার জন্য বল্ প্রয়োগ করে। সেই বলের প্রতিরোধার্থ আমাদের অঙ্গুলির শেষ ভাগেও অন্য বল্ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। কিরূপ আকারের (mass) বস্তু কি পরিমাণ বেগে ঘুরাইলে তাহাকে বৃত্তাকার পথে রাখিবার জন্য কি পরিমাণ কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির আবশ্যক, তাহা গণিতশাস্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রগণ লক্ষ লক্ষ গুণ বড়, সুতরাং পৃথিবী কেন্দ্র স্থানীয় হইয়া এই অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রগণকে তাহার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইতে হইলে গণিতশাস্ত্রানুসারে পৃথিবীর যে শক্তি থাকার আবশ্যক, তাহা আদৌ তাহার নাই। এজন্যও পৃথিবী স্থির হইতে পারে না।

এই বিষয়টী বড়ই জটিল। কেবল বি, এ শ্রেণীতে যাঁহারা গণিত অধ্যয়ন করেন, তাঁহারই এ বিষয় প্রথম পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এরূপস্থলে আমরা অতি সহজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোককে বুঝাইতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ।

শ্রীতারকেশ্বর রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। আরতি।—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কুন্তলীন প্রেস। মূল্য ১৷৷০।

আরতিতে ১২টী ছোট কবিতা এবং শেষে গৌরাঙ্গ ৮৮ পৃষ্ঠা। এই গৌরাঙ্গ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারও একখানি উপহার পাইয়াছি, তাহার মূল্য ১৷৷০। এই উভয় গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। ছাপা এবং কাগজ উভয় গ্রন্থেরই অতি পরিপাটী।

ধন্যবাদের কারণ এই, পচা জিনিস অনেকেই অনেককে বিলাইতে পারে, ভাল জিনিস কয়জনে বিলায়? ভাল জিনিস যাঁহাদের ঘরে আছে, তাঁহারা বিলাইতে কুণ্ঠিত। কি জন্য কুণ্ঠিত? পাছে কেহ নিন্দা করে, পাছে কেহ তীব্র সমালোচনা করে। কেবল কি সমালোচনার তীব্রতার ভয়ে লোকেরা কৃপণ? আমাদের তাহা মনে হয় না। মনে হয়, ভাল জিনিসের আদর কেহ যদি না করে, এই ভয়! এই ভয়, অভিমান-জাত। এই অভিমান বশত সকলেই কৃপণ।

কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মগীতোপনিষৎ একখানি অতি সুন্দর পুস্তক। আমরা এই পুস্তকের এক একখানি অনেককে সাদরে উপহার দিয়াছি; কিন্তু শুনিতেছি, তাহা বড় কেহ পড়ে না। তবে পড়ে কি? প্রণয়-কলুষিত চুটকি গল্প, চাটুকারের স্তুতিবন্দনা, পরনিন্দার মধুর কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি কি? হায় রে দেশ!!

এহেন দেশে প্রমথনাথের জন্ম। এহেন দেশে অকাতরে প্রমথনাথ মুক্তা ছড়াইতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করার যোগ্য? তবুও আমাদের প্রতি তাঁহার অতুল দয়া। এইজন্যই ধন্যবাদ দিতেছি।

বলিতে কি, বাস্তবিকই প্রমথনাথের ন্যায় স্বদেশভক্ত, প্রেমিক, পরদুঃখকাতর, সচ্চরিত্র কবির এদেশে এহেন কালে সমুচিত আদর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যিনি স্বদেশভক্তদলের সহিত নাম লেখাইয়া গবর্ণমেণ্টের আদরের মায়া পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন, তিনি কি দেবতা, না মানুষ? যে পরদুঃখ কবি গাইতে পারেন—

"কৌতুহলী যে জনতা   এতক্ষণ ছিল ঘিরি,
একে একে ভঙ্গ দিল সব ;
শুধু সপ্নাবিষ্ট সম   দাঁড়ায়ে রহিনু আমি
নিস্পন্দ নীরব।

কে যেন প্রাণের মাঝে   বিঁধিতে লাগিল মোরে
কণ্টকের তীক্ষ্ণ কশা দিয়া ;
ত্রস্তে দু'টি মুদ্রা রাখি   ত্যজিলাম সেই স্থান,
নীরবে কাঁদিয়া।

নিরুদ্দেশে ঘুরি' ঘুরি'   ফিরিনু আলয়ে যবে
মিলাইছে পঞ্চমীর শশী ;
জ্বলে কক্ষে ম্লানালোক ; ভৃত্য মোর প্রতীক্ষায়
রহিয়াছে বসি।

জানাইনু রুদ্ধস্বরে   বিস্মিত ভৃত্যেরে—'মোর
আহারের নাহি প্রয়োজন ;'
শয্যা লইলাম যবে,   উচ্ছাসি উঠিল বেগে
নিরুদ্ধ রোদন।

পরদিন অতি প্রাতে   খাদ্য আর বস্ত্র হাতে
গিয়ে দেখি, নাই সেথা তারা ;
সে অবধি ওরা কোথা,   বিশাল বিশ্বের মাঝে
হয়ে আছে হারা।

তার পর বহুদিন   কাল স্রোতে হ'ল লীন,
কিন্তু কভু তিলেক ভুলিনি,—
সেই রোগী, কথা তার,   আর সতী প্রতিমার
সে পুণ্য কাহিনী।"

তাঁহার আবির্ভাবে এ বঙ্গ ধন্য হইয়াছে। মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশে কত অমর কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমন পরদুঃখকাতর, এমন উদার-হৃদয় স্বদেশপ্রেমিক কবি বুঝি বা আর দেখি নাই। সত্যই প্রমথনাথের আবির্ভাবে এই দেশ ধন্য হইয়াছে। আমরা এই নবীন কবির চরিত্রের অস্ফুট অনেক কথা তাঁহার গ্রন্থে পাঠ করিয়া মোহিত হইতেছি। কে জানে, যে জীবন হইতে গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব জীবনের মধুর লীলা পরিব্যক্ত হইয়াছে, সেই জীবন সেবা-ধর্ম্মের পুনরভিনয়ে এই বঙ্গকে আবার মাতাইবে কি না? ঈশ্বরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা এই,—নবীন কবির হৃদয়ে যে ভাব ও প্রেম আছে, লেখায় যে সরসতা আছে, জীবনে যে চরিত্রবল আছে, তাহা জমাট হইয়া এমন উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রদীপ্ত করুক, যাহা দেখিয়া এ দেশ ধন্য হইয়া যাইবে। বিধাতা এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

২। প্যারীচরণ সরকার (জীবনচরিত)

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত।

যে শুভ মুহূর্ত্তে মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার ইংরাজি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয়। হেয়ার-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া, যাঁহারা সেকালে হিন্দু কলেজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। প্যারীচরণ, ভূদেব, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, রামতনু, রামগোপাল প্রভৃতি নাম সমগ্র বঙ্গদেশে পূজিত। ইঁহাদিগের জীবনচরিত, এবং প্রাসঙ্গিকভাবে ইঁহাদের সময়ের বঙ্গসমাজের অবস্থা জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হয়। বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সুলিখিত মাইকেল-চরিত, এই জন্যই এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত একজন কৃতী ব্যক্তি, রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সুপবিত্র জীবনের কথা অবলম্বন করিয়া, বঙ্গসমাজের তৎসাময়িক অবস্থাদির বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন ; কিন্তু আজিও ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না। এডুকেশন গেজেটে কয়েকবার কয়েকটী প্রবন্ধ দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, যে চিন্তাশীলতা এবং পাণ্ডিত্য সামাজিক প্রবন্ধাদিতে পরিস্ফুট, শীঘ্রই তাহার উৎপত্তি এবং পরিবর্দ্ধনের ইতিহাস পাইব। অনেক দিন চলিয়া গেল, আজিও ভূদেবচরিত পাইলাম না। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের জীবনচরিত পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইঁহার বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মভীরুতা, সংযম এবং দানশীলতার কথা সকল শ্রেণীর পাঠকেরাই সযত্নে পাঠ করিবেন।

এই জীবনচরিত গ্রন্থে মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্রের একখানি ছবি আছে এবং স্বতন্ত্রভাবে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকায় ইঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বিষয়েও অনেক উল্লেখ আছে। ইঁহাদের সকলের জীবনচরিত কথাই শিক্ষাপ্রদ ; এই জন্য নবকৃষ্ণ বসুর গ্রন্থ বঙ্গদেশে আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

অন্তর্ধান।

অনন্ত গম্ভীর-নীল অম্বর বিদারি,—
মণ্ডিত স্ফুরৎ-প্রভ তড়িৎ-কেয়ূরে
বাহিরিল শ্বেতবাহু ; ঝলসি নয়ন
দীপ্তিশুভ্র-বহ্নি-তেজে। অদূরে, যথায়
ভাস্বর-তপন-কান্তি হেমচন্দ্র কবি
বঙ্গকাব্যাকাশে রাজে,—ঢালি জ্বালাময়
কিরণ-প্রপাত, যাহে ঘুরিছে, ফিরিছে,
উছলি রচিছে ঊর্দ্ধে চারু ইন্দ্রধনু
কল্পনার মহাবর্ত্ত, দিগন্ত আলোড়ি,—
সেই দিকে গতিশীল সে প্রদীপ্ত বাহু,
ছুটাইয়া ব্যোম-ঊর্ম্মি স্ফুলিঙ্গ-খচিত।
অমনি বিমানমার্গে অশনি-নিঃস্বনে
ধ্বনিল গম্ভীর বাণী—"জড়-বিজড়িত
প্রতিভার দীপ্ত সূর্য্য! পার না সহিতে
সৌর-কলঙ্কের ভার,—অমঙ্গল সূচি,
কালিমা নিবিড় যাহে গূঢ় উপেক্ষায়,
অকৃতজ্ঞ পূজা-ব্যতিক্রমে? এস তবে,
জড় যেথা চিৎ, আর কলঙ্ক মণ্ডন!"

স্তম্ভিত মরত-বাসী সে দৃশ্যে, নিনাদে।
না খুলিতে আঁখিপাতা বিহ্বলে মুদিত,
না মিলাতে প্রতিধ্বনি চক্রবাল-সীমে,
গ্রহিল সে দিব্যহস্ত, নিমেষ-মাঝারে,
দীপ্ত-শম্ভুশূল-সম অঙ্গুলিতে ঘিরি,
বঙ্গকবিতার সূর্য্য! কিম্বা যেন কোন
করুণার শুভ্র রাহু গ্রাসিল তাহায়!
বঙ্গভূমিলগ্নপদ ঊর্দ্ধনেত্র যত
নরনারী দেখিল সে আকাশে চাহিয়া।
সেই চিরপরিচিত উজ্জ্বল পরিধি,—
কোথা এবে?—কোথা সেই প্রণম্য মহিমা?
দৃশ্য মাত্র,—শিথিলিত কপিশ গগনে
আকুঞ্চিত শ্বেতবাহু, জ্বলন্ত, ভয়াল,—
বিধাতার স্ফুরদগ্নি ভ্রূকুটির মত।

ত্রাসিত অযুত হৃদে শোণিত-প্রবাহ
সহসা থামিল, যেন আকুল আবেগে;
অনুতাপ-অশ্রু-যুত অযুত নয়ন;

উচ্ছ্বসিল অবরুদ্ধ অযুত কণ্ঠেতে
তপ্তশ্বাসে অর্দ্ধস্ফুট—"হেমচন্দ্র কোথা !"
জানু পাতি ঊর্দ্ধনেত্রে যতেক পরাণী
বসিল যাচিবে বলি কাতরে করুণা ।
ভয়ে, গুরু পরিতাপে, স্মৃতির দংশনে,
অর্চ্চনার ত্রুটি-জাত কঠিন পাতকে,
প্রকট বিধাতৃরোষে, বিরাট বিয়োগে,
যুগপৎ উদ্বেলিত যতেক হৃদয় ।
কি বচনে রচিয়া সে বিবিধ বেদনা
নিবেদিবে দেবতার বেদীপাদপীঠে,
নাহি জানে, নিরাশার ভাষাহীন মোহে ;
স্থাপিত কাতর দৃষ্টি কপিশ আকাশে ।

আবার জীমূত-মন্দ্রে দীর্ণ নভস্তল ;
করালীর-জিহ্বা শত ক্রূর সৌদামিনী,—
স্ফুলিঙ্গিয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকাল আবার ;
আবার ধ্বনিল বাণী শূন্যপথ হতে ;—
"ভাগ্যহীন বঙ্গদেশ ! ভুঞ্জিছ কি এবে
নিজ কর্ম্মফল-জাত পাতক-যাতনা ?
ক্ষরিছে কি শোণিতাশ্রু, স্রোতে গণ্ড বহি,
হৃৎপিণ্ড ফাটি ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড আঘাতে ?
ধ্রুব সত্য,—পরিতাপ পাপ-মহৌষধি ।
হেমচন্দ্র লুপ্ত নহে, লুক্কায়িত শুধু ;
তব দৃষ্টিযোগ্য কভু সেই দিব্য বিভা ?
নিষ্কলঙ্ক কর আঁখি ; স্বার্থমুক্ত হৃদি ;
ব্রত ধরি, মহাভাবে পুষ্ট করি প্রাণ,
কর তায় ভক্তিপূত, অর্চ্চনা-প্রবণ,
ভাতিবে নয়নে পুনঃ সেই মহাগ্রহ ।—
ভাস্বর-তপন-কান্তি হেমচন্দ্র কবি
বঙ্গের কবিতাকাশে চির জ্যোতিষ্মান্ !"

থামিল ভৈরব রব ; নিবিল সহসা
দীপ্ত সেই শ্বেতবাহু গগন-মাঝারে ;
নিবিড় রজনী আসি গ্রাসিল সংসার ।
সান্দ্রীভূত অন্ধকার, মসীবিন্দু হয়ে,
কলঙ্ক-বরষা ঢালে বঙ্গের বদনে ;
অধোমুখে, অন্ধভাবে, কৃষ্ণঝটিকায়,
সপ্ত দিবানিশি বঙ্গ কাঁদিল নীরবে !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র ।

কাপুরুষতা।

মহামতি গ্লাডষ্টোন আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্ত শাসনের জন্য শেষ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবাসীর জন্য তিনি কিছুই করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, ভারতবাসী কাপুরুষ। যে কাপুরুষ, সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং তাহার জন্য চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

মানুষ একবার মরে, কাপুরুষ শতবার মরে, এবং ঐ মৃত্যু মৃত্যু বলিলে শত ক্রোশ দূরে পলায়ন করে। এক পীরখাঁ নাজির ১৫।২০ জন প্যাদা বলে সমস্ত বগুড়া জেলায় আতঙ্ক তুলিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দ্বারা পুকুর খনন করিয়াছিল, ভদ্রলোক দ্বারা হীনকার্য্য করাইত, কুলবধূর ধর্ম্মনাশ করিত, এবং অকথ্য অত্যাচারে দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। বোধ হয়, দুই জন লোক যদি প্রাণভয় ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইত, এবং উপরস্থ কর্ম্মচারীর নিকট সকল কথা বলিয়া দিত, তবে সহজেই তাহার শাসন হইত। কিন্তু শত কাপুরুষ এক ইন্দুরের ভয়ে মূর্চ্ছা যায়, এক বীর পুরুষ সিংহ বিনাশে অধিকারী হয়।

কুঠিয়ালগণ অত্যাচার করিত, কুঠিয়াল থাকিত একজন মাত্র, আর থাকিত মুখুর্য্যে মহাশয়, ঘোষ মহাশয়, গুপ্ত মহাশয়, চাঁদ খাঁ, সৈয়দ পিরবক্স প্রভৃতি। এই দেশীয় লোক দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিত। সেই কাপুরুষ কর্ম্মচারীগণ দেশীয় লোকের সকল ছিদ্র কুঠিয়ালগণকে বলিয়া দিত, আর সেই পাষণ্ড হীনধর্ম্ম অসুরগণ অকথ্য অত্যাচারে দেশের সর্ব্বনাশ করিত। যদি একজন ক্ষমতাপন্ন লোক কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া সেই পাশবদলের বিরুদ্ধে প্রাণ পণ করিয়া দাঁড়াইত, তবে কি সেই পাশব শক্তির কোনই প্রতিবিধান করিতে পারিত না? সৌভাগ্য ক্রমে দুই এক স্থানে সক্ষম না হইয়াছিল, তাহা নহে।

পুলিস ঘুস লয়, কেহ মরিলে ঘুস, চুরীর এজাহার দিতে গেলে ঘুস, ডাকাইতিতে ঘুস, সকল বিষয়ে ঘুস। সার চার্লস ইলিয়টকে লোকে যতই নিন্দা করুক না কেন, তিনি যে বলিয়াছিলেন, পুলিসের চরিত্র চতুর্দ্দিকের লোকের চরিত্র অনুসারে গঠিত হয়, সে কথা ঠিক। পুলিস যখন আসিয়া বলিবে, তোমার জলনিমগ্ন পুত্রকে তুমি খুন করিয়াছ, অতএব তোমায় চালান দিব, তখন তুমি যে তাহাকে ৫০০৲ টাকা ঘুস দেও, ইহা কি তোমার কাপুরুষতা নহে? দেশে আইন আছে, বিচারক আছে, বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট আছে, লাটের কাউন্সিল আছে, একবার বীরের ন্যায় দাঁড়াও দেখি, বল "দেও তুমি চালান, আমি ঘুস দিব না।" তখনই দেখিবে, পুলিস বাবাজীর মুখ চুণ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি নিজে চোর, বা কাপুরুষ। নিজে পরের সর্ব্বনাশ করিবে, পুলিস তাহার ভাগ নিবে না কেন? তুমি যদি কাপুরুষ না হও, পুলিস কখনও ঘুস চাহিবে না, একবার যদি জানে, তুমি ঘুস দিবেনা, পুলিস বলিবে, এ শক্ত লোক।

একজন গোরা মদ খাইয়া টলিতে

টলিতে যাইতেছে। তুমি তাহাকে দেখিয়া চাণক্যের সুশিষ্যের ন্যায় ৫ হাত দূর দিয়া চলিয়া গেলে, তোমার অনুকরণে শত শত পান্থ ঐরূপ দেওয়ালের দিকে ঠেস দিয়া চলিল, গোরা ভাবিল, ভারি মজা, আমি মানুষ, তথাপিও ইহারা আমাকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় ভয় করে, এই বলিয়া গোলযোগের মধ্যে গুলি ছাড়িয়া দিল, নগরের ভূতনাথ নামক একজনের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল। পুলিশ আসিল, তোমরাও সকলে পলাইলে, ২।১ চাষাকে পুলিষ ধরিয়া সাক্ষী দিল, বহু সাহেবের মধ্য হইতে কেহ সেনাক্ত করিতে পারিল না, তাই ইউরোপীয় জুরীর বিচারে সে বেকসুর খালাস হইল। যদি তোমরা দশজন যাইয়া তাহাকে ধরিয়া দেখিতে পারিতে, এবং পুলিসকে ধরাইয়া দিতে পারিতে, তবে কি ইহার প্রতিবিধান হইত না? তুমি হিন্দু গৃহস্থ, তোমার ৫০ বর্ষ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, তুমি পুত্রার্থ ক্রিয়তে ভার্য্যা, এই শ্লোকের সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক আবার একটী অষ্টম বর্ষে ভবেৎ গৌরী গোছের গৌরীর পাণিগ্রহণ করিলে। আর তোমার গৌরীদানের ফলদায়িনী দশমবর্ষীয়া কন্যা বিধবা হইল; তুমি তাহার জন্য অবলীলাক্রমে নিবৃত্তিমার্গ ব্যবস্থা করিলে, তোমার বিদ্যা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বয়স, বহুদর্শিতা বলেও নিজে যাহা পারিলে না, অনায়াসে সেই দুগ্ধপোষ্যা, পৃথিবীর কাণ্ডজ্ঞানহীনা, শত প্রলোভনে আকৃষ্টা, নিঃসহায়া, নিরাশ্রয়া অভাগিনীর ভাগ্যে সেই কঠোর বিধান চালাইলে; কোনদিকে চাহিলে না! আহা! এই বৈশাখ মাসের রৌদ্রে একাদশীর দিন নির্জ্জলা একাদশী তাহার জন্য ব্যবস্থা করিলে, অথচ তোমার আইস্ লেমনেডের ক্ষণকালের জন্য বিরাম নাই! বল ত, তুমি কাপুরুষ নও ত কি? তোমরা বল, সাহেবেরা আমাদের অধিকার দিতে চায় না। অথচ তোমরা, তোমাদের নিজ পরিবারস্থ প্রাণের অধিক, হৃদয়-শোণিতজাত স্নেহের ধনকে সমান অধিকার দিতে জান না। তোমাদের কি জেতার সহিত সমান অধিকার চাহিতে লজ্জা বোধ হয় না?

পাড়ার নটবর, হলধর, পাঁচু শেখ প্রভৃতি একটী কুলবধূকে বাহির করিয়া তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিল। তুমি সেই সকল পাষণ্ডের কিছু করিতে পার না, অথচ সেই অত্যাচারিতা, নিরাশ্রয়া, দুঃখ-ক্লেশ-পাপ-প্রপীড়িতা অনাথিনীকে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিতা করিয়া বাজারে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে; আর সেই পাষণ্ড কাপুরুষ অত্যাচারীদিগের কিছুই করিতে পারিলে না। তাহারা তোমার মাথার মুকুট হইয়া সমাজে বিরাজ করিতে লাগিল। বল দেখি, তুমি কাপুরুষ নও ত কি? আমার বড় ঘৃণা হয় যে, এমন কাপুরুষ দেশে কাপুরুষ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

পুকুরে একটী লোক জলে ডুবিল, চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতেছে। অথচ কাহারও সাধ্য হয় না, কাপড় গুটাইয়া জলমধ্যে বেগে গমন করিয়া ডুবিয়া সেই মনুষ্যকে রক্ষা করে। এ জাতি কি কাপুরুষ নয়?

কত আর বলিব, যতই আমামের অধঃপতনের কথা, আমদের কাপুরুষতার কথা মনে হয়, ততই হৃদয়ে দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হয়। হায়, কি পাপে আমরা এহেন পাপদেশে পাপী

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? বাঙ্গালী, ভারতবাসী, অন্যান্য শিক্ষার সহিত একবার মরিতে শিক্ষা কর। মনে করিও না, চিরদিনের জন্য তোমরা এদেশে আসিয়াছ, একদিন না একদিন তোমার ঐ মাজ্জিত অপার স্নেহের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, অগ্নিতে ছাই হইয়া যাইবে। অথচ তুমি ভাবিতেছ, মান যাক, ধন যাক্, দেশ যাক্, ধর্ম্ম যাক্, কিন্তু প্রাণ রক্ষা করিতেই হইবে! ধিক্ সে প্রাণকে, যাহা শত মৃত্যু স্বত্বেও এক মৃত্যু ভয়ে আকুল হয়। তাই মনে হয়, এ পাপ দেশে যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোহস্য বিশ্রাম। তাই বলি ভাই, একবার মরিতে শিক্ষা কর। এক ঈশার মৃত্যুতে পাশ্চাত্য জগৎ জীবন পাইয়াছে; ধর্ম্মবীরগণের শোণিতে ইউরোপের জাতীয় জীবনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে, শিখগণ প্রাণ দিতে শিখিয়াছেন, তাই তাহারা জগতে শ্রেষ্ঠবীর। আর বাঙ্গালী, তোমরা কি কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া একবার প্রাণ দিতে শিখিবে না?

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

উত্তরাখণ্ড।

হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সমূহ মধ্যে উত্তরাখণ্ড ভারতীয় পূর্ব্বমহিমা, পূর্ব্বগৌরব, পুরাকালীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-বিশ্লেষণের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান আশ্রম বলিয়া পরিগণিত। কোকিলকণ্ঠ কবিকুল-চূড়ামণি বাল্মীকি, বেদ চতুষ্টয়ের বিভাগকর্ত্তা মহামতি বেদব্যাস, ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমৎ ভাগবতের ঋষিকুলধুরন্ধরগণ, মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিত, পারমার্থিক বলে বলবান শুকদেব, শাস্ত্রতত্ত্বদর্শী সনাতন, তপঃপ্রভাবশালী নারদ, কলির ব্যবস্থাকর্ত্তা যোগীবর পরাশর, দর্শনশাস্ত্রবিদ্ উর্ব্বর-মস্তিষ্ক জৈমিনি প্রভৃতি পুরাকালীয় আর্য্য মনীষীবৃন্দ এক সময়ে উত্তরাখণ্ডে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আধ্যাত্মিক তেজে সমস্ত পৃথিবীকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। উত্তরাখণ্ডেই দেবাদিদেব মহাদেবের কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত এবং এই স্থানেই সতী-পিতা ক্ষ নরপতির রাজত্ব ও আলয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। মানস সরোবর, চম্পক সরোবর, গৌরী-ভূমি, কেদারনাথ, কনখল, হরিদ্বার প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রমণীয় দৃশ্য সমূহ উত্তরাখণ্ডেই অবস্থিত এবং ভুবন-বিখ্যাত বদরিকাশ্রম, গঙ্গোত্তরী, গোমুখী ও "বসুধারা" প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি সমূহ উত্তরাখণ্ডের সীমাকে অতীব মনোহারিণী এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতরা করিয়া রাখিয়াছে। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী (গঙ্গা) উত্তরাখণ্ড হইতেই নিঃসৃতা হইয়া ভারতের নানা স্থানে প্রকীর্ণ কলেবরে "পতিত পাবনী"নামে প্রখ্যাতো হইয়াছেন। অভ্রভেদী অত্যুচ্চ হিমালয়ের শত সহস্র যোজন-ব্যাপী মহাসীমা মধ্যে উত্তরাখণ্ড কি সুন্দর, কি শাশ্বত, কি পবিত্র!! কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন অতীব শোভাময়, অথবা স্বদেশবৎসল মহানুভব পুরুষের বিবেচনায় সমগ্র পৃথিবীমধ্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি যেমন প্রিয়তমা, হিন্দুশাস্ত্র মতে ভাগীরথী-প্রমুখ উত্তরাখণ্ড

ভূমি তেমনি শোভাময়ী, তেমনি পবিত্রা এবং তেমনি প্রিয়তমা। হিন্দুর শাস্ত্র হইতে উত্তরাখণ্ডের নাম লুপ্ত বা অন্তর্হিত হইলে, হিন্দুর প্রায় অর্দ্ধেকটা ধর্ম্মনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উত্তরাখণ্ড নামক মহাতীর্থ হিন্দুর প্রাণের প্রাণ স্বরূপ এবং সেই জন্যই ইহা শাস্ত্রমতে স্বর্গভূমি অথবা কৈলাস।

ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উত্তরাখণ্ডে গমন করিতে হইলে যেরূপ কষ্ট, যেরূপ অসুবিধা এবং যেরূপ অযথা উপদ্রব সহ্য করিতে হয়, হিংলাজ ভিন্ন ভারতের আর কোনও তীর্থে ইহার শতাংশের একাংশও সহ্য করিতে হয় না। এমন দূরবর্ত্তী ও দুর্গম পথে পঞ্চচত্বারিংশ বয়ক্রমের পরে গমন করা একেবারেই অসম্ভব; যাহারা কৃশ, বৃদ্ধ, অথবা সহজে কাতর কিম্বা সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগকে এই পার্ব্বত্য পথে আসিতে আমি বিনীতভাবে নিষেধ করি। যাঁহাদের উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিবার সুবিধা হয় নাই, তাঁহাদের জন্য এই প্রশস্ত প্রদেশের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমার বিবেচনায়, হরিদ্বার হইতে উত্তরাখণ্ড গমন করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। আমি হরিদ্বারে নৌকাযোগে গঙ্গা নদী পার হইয়া, পাণ্ডাদিগের সঙ্গে, প্রায় একমাস ছয় দিনে উত্তরাখণ্ডে পৌছিয়াছিলাম। সঙ্গে পাণ্ডা না থাকিলে এই পথে ভ্রমণ করা সুকঠিন, অথবা ব্রজনকারী সন্ন্যাসী কিম্বা পথিকদিগের সঙ্গেও যাওয়া যাইতে পারে। যাত্রীরা একাকী যায় না। পদব্রজে সুদূর পথ অতিক্রম করিতে হয়; অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তি অথবা অন্য প্রকার যানের সম্পূর্ণ অভাব। এক প্রকার ছোট "ঝোলা"য় আরোহণ করিয়া যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা এত ব্যয়সাধ্য এবং এমন অসুবিধাজনক যে, এক সহস্র পুরুষের মধ্যে একজনের ভাগ্যেও তাহা ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। অনেক সময়ে এই ঝোলা পাওয়া যায় না; বর্ষা ও শীত ঋতুতে এই পথে যাত্রী আসিতে অসমর্থ হয়, কারণ বর্ষায় সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়া যায় এবং শীতে বরফ পতন জন্য পথ বন্ধ থাকে। অনেক স্থানে আদৌ পথ নাই, অতি কষ্টে পাহাড়ে আরোহণ এবং পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে হয়। স্থানে স্থানে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে। এই পথে কেবল আস্তিকের আশা ও ধর্ম্মভাব একমাত্র সহায়। পথে দস্যু-ভয় নাই, সুতরাং এই প্রদেশ নিরাপদ। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইটী স্থানেরই বিশেষ উল্লেখ করিবার আকাঙ্ক্ষা করি। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী নদীর ইহাই উৎপত্তি স্থান। বদরিকাশ্রম হইতে এই দুইটী স্থানে পথিকেরা গমন করিয়া থাকেন; হিন্দি ভাষায় বদরিকাশ্রমের অপর নাম "বদ্রী নারায়ণ"। হরিদ্বার হইতে বদ্রীনারায়ণ যাইতে হইলে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা লেখনীর বর্ণনায় বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন। এরূপ দুর্গম তীর্থ ক্ষেত্রে কেবল ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুজাতিই আগমন করিতে পারে, এজন্য হিন্দুর বলবতী ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জগতের ইতিহাসে চিরকালই গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। পথের মধ্যে একটী ভয়ানক স্থান দড়ির ঝোলার সহায়তায় পার হইতে হয়, এই মহাভীষণ

স্থানের নাম "লছমন-ঝোলা"। এই অত্যদ্ভুত স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেক পথিক নিজের "শ্রাদ্ধ ক্রিয়া" সম্পন্ন করিয়া রাখেন, কারণ "লছমন-ঝোলা" অতিক্রম করিয়া প্রাণ রক্ষা করা আর ব্যাঘ্র-বদন-বিবর হইতে বাঁচিয়া আসা প্রায় একই কথা। সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতার এক সুপ্রসিদ্ধ বদান্য মাড়োয়ারী মহাজনের যত্নে ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ঐ স্থানে সম্প্রতি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং পথিকের আর ঐ স্থানে ভয়ের কারণ নাই।

হিমালয় পার্ব্বত্য প্রদেশের যে মহাসীমায় গঙ্গোত্তরী তীর্থ অবস্থিত, তাহা গড়োয়াল রাজার অধিকার-ভুক্ত এবং তিরি পরগণার তাকুনোর মৌজার শাসনাধীন। এখানকার পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ চতুর্ব্বিংশ সহস্র ফিট, এই শৃঙ্গের নাম গঙ্গোত্তরী শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের অপর দিকে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে, সর্দ্দার অমরসিংহের যত্নে লোহিত বর্ণের প্রস্তর-নির্ম্মিত গঙ্গোত্তরী মন্দিরের সন্নিকটে, শোভাময় হিমাচলের গাত্র ভেদ করিয়া পতিতপাবনী ভাগীরথী ক্ষুদ্রাকারে নির্গতা হইয়াছেন। এই "জলধারা"র এক পার্শ্বে মহারাজা ভগীরথ এবং অপর পার্শ্বে মহাদেবের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অল্প দূরে রজতময়ী গঙ্গাপ্রতিমা, প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং আরও একটু দূরে হরগৌরীর সুন্দর যুগল মূর্ত্তি অবস্থিত আছে। ইহারই পার্শ্বে পর্ব্বত-গুহায় সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং ঋত্বিক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদিগের বসতি। এই ব্রাহ্মণেরা অবিবাহিত এবং অগ্নিহোত্রী।

গঙ্গোত্তরীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যপুঞ্জ এরূপ রমণীয় যে, তাহা মহাকবির লেখনীর সহযোগে অথবা র‍্যাফেলের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করের তুলিকায়, কিম্বা অর্ফিউশ বা নারদের বীণায় শতাংশের একাংশও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর, গঙ্গোত্তরীর অপূর্ব্ব শোভায় মন প্রাণ মোহিত হইয়া যাইবে, তুষারাচ্ছাদিত শিখরমালা, শিখরের পাদদেশে নানা জাতীয় প্রসূন পাদপ, নিম্নে বহুবিধ বর্ণের অদ্ভুত প্রস্তররাজি, সম্মুখে মনোমোহন আকাশের অবর্ণনীয় শোভা এবং অদূরে রুদ্রাচল নামক গিরিরাজের "সুধা-ধবল" নামক শৃঙ্গের প্রাকৃতিক কারুকার্য্য, পথিককে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রায় করিয়া থাকে। গঙ্গোত্তরী গিরির শিখরমালা, তুষারময় মুকুটে মস্তকাচ্ছাদন করিয়া অনন্ত আকাশের দিকে প্রকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পথে দিবাকরের দিব্যালোক প্রাপ্ত হইয়া বিমল কিরণমালার সুবর্ণ জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হেমকান্তি ধারণ করিয়াছে; সে দৃশ্য কি অপূর্ব্ব, কি মনোমোহন!! কুলুকুলু শব্দকারিণী ভাগীরথীর নির্ম্মল হিম নীর প্রপাতে রাশি রাশি প্রস্তরপুঞ্জ বিগত-মল হইয়া শুভ্র রজতের ন্যায় চকমক্ করিতেছে; যে ব্যক্তি তাহা দেখে নাই, নির্ম্মলতার ধারণা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অতীব হিমপাত নিবন্ধন অটল অচলের যে সকল স্থানে বৃক্ষ লতাদি জন্মিতে সমর্থ হয় না, গঙ্গোত্তরী সে অংশের অন্তর্ভূত নহে, এইজন্য এ অঞ্চলে তরুলতা ও ব্রততী দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, তুষারক্ষেত্রে বৃক্ষলতাদি জন্মিতে পারে না, তাঁহারা এস্থানে আগমন করিলে হিমানী-আবৃত ভূমিখণ্ডে নানা বর্ণের অত্যাশ্চর্য্য প্রসূনপুঞ্জ অবলোকন

করিয়া বিগত-ভ্রম হইতে পারেন। কেবল তাহাই নহে, দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং লোকালয় দেখিয়া বিস্মিত হইতে পারেন।

গঙ্গোত্তরী প্রান্তরে গঙ্গার সর্ব্বপ্রধান বিস্তার ৪২ হাতের অধিক নয়; গভীরতা কটিদেশ পর্য্যস্ত। এই স্থান হইতে পর্ব্বতের উপর দিয়া কাশ্মীর গমন করা যায়, এবং পথিমধ্যে "যশীমঠ" নামক শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী মঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশীমঠের নিম্নে অলকানন্দা নদী প্রবাহিতা, ইহাই ভাগীরথীর সর্ব্ব প্রথম শাখা। এই পথের জলবায়ু অতীব শীতল, স্থানে স্থানে পর্ব্বত শিখর চিরকাল তুষারাবৃত থাকে, এই অঞ্চলে সবুজবর্ণের পত্র দৃষ্ট হয় না। এখান হইতে আনুমানিক তিনশত ছত্রিশ ক্রোশ দূরে আমি একটী বৃহদাকার গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানকার জলবায়ু খুব শীতল নহে। ঐ গ্রামের নাম ভর্ত্তিহি। কোনও কোনও ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভ্রমক্রমে ইহাকে ভারত বা ভারতী লিখিয়াছেন। এই স্থানের অধিবাসীরা গৌরবর্ণ এবং অতীব সুন্দর। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আকৃতিতে পার্ব্বতীয়ভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকগুলি অধিবাসী মৃগনাভি, পশুচর্ম্ম, পার্ব্বত্য লবণ প্রভৃতি বিক্রয় করে। এই স্থানে অলকানন্দের "ধাওলী" (ধবলী) নামক এক শাখা প্রবাহিত হইয়াছে। পশুদিগের মধ্যে ছাগ ও মেষ এবং উদ্ভিদ-জাতির মধ্যে কয়েক প্রকার ফলবৃক্ষ দেখিয়াছিলাম। গঙ্গোত্তরীর ন্যায় এখানে কতকগুলি হ্রদ আছে, তাহা বরফের জলে প্রায় বারমাসই পূর্ণ থাকে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ্রদের গভীরতা ৭১ ফিটের অধিক নহে।

ভর্ত্তিহি গ্রাম হইতে গঙ্গোত্তরী ক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিয়া আমি একদল ব্রাহ্মণ-পথিকের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। ইহারা হরিদ্বার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ; কলসে গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজল লইয়া গিয়া দেশ-দেশান্তরে ইহারা বিক্রয় করিয়া থাকে। গঙ্গোত্তরীর নিম্নে কেদারগঙ্গা-নাম্নী একটী বেগবতী নদী গঙ্গার অন্যতম শাখা বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছে। জল-ভার-বাহী-ব্রাহ্মণবৃন্দ প্রায় এই স্থান হইতেই জলোত্তোলন করিয়া থাকে। কেদার ও জাহ্নবীর সঙ্গমস্থল গৌরীকুণ্ড নামে প্রখ্যাত। এই সঙ্গমস্থলে একটী প্রস্তরময় সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গোত্তরী মন্দির এই স্থানেই অবস্থিত। সঙ্গমস্থলে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে ব্রহ্মা, ভবানী, গণেষ এবং মহাকালীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গঙ্গোত্তরীর মন্দির উচ্চতায় ২০ ফিটের অধিক নহে। ভাগীরথী এই স্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া, এই স্থানের নাম "গঙ্গোত্তরী" বা গঙ্গাবতরণ। প্রবাদ আছে, মহারাজা ভগীরথ গঙ্গানয়ন-কামনায় এই স্থানেই উপবেশন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা দ্বারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। এই মহাপ্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডকে সন্ন্যাসীরা দেখাইয়া দিয়া বলিয়া থাকেন; "ইহাই ভগীরথের তপাসন।" পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, গঙ্গানদীর একটী শাখা হিমাচল ভেদ করিয়া তির্ব্বতদেশে পতিত হইয়াছে, কিন্তু সে দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর বসতি বলিয়া ঐ শাখা "পবিত্রা" বলিয়া গণ্য হয় নাই।

গোমুখী হইতে গঙ্গোত্রী প্রায় ৬০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। গঙ্গোত্রী গিরি হইতে ভাগীরথী

নির্গতা হইয়া “মণিবন্ধ’’ পর্ব্বতের একস্থানে অকস্মাৎ ভয়ানক প্রতিরোধ বশতঃ অতীব সঙ্কীর্ণাবস্থায় পতিতা হইয়াছেন। পুরাণে প্রবাদ আছে, এই স্থানেই ঐরাবত গজেন্দ্র, ভাগীরথীর পথরোধ করিয়াছিল। এই পার্ব্বত্য পথের অপর পার্শ্বে ভাগীরথীর তিনটী শাখা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন পথ হইতে অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে আসিয়া ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে, এই জন্য পথ সঙ্কীর্ণ হইলেও বেগ অত্যন্ত প্রবল। অত্যন্ত প্রবল বেগ বশতঃ গিরি গাত্র ভেদ করিয়া গঙ্গা নিতান্ত সূক্ষ্ম ধারায় (কিন্তু মহাগর্জ্জন-শব্দ সহকারে) বহির্গত হইতেছে। সে স্থানের আকৃতি গাভীর মুখের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, এই কারণ বশতঃ উহার নাম গোমুখী। হিন্দু রাজারা সুবিমল সুবর্ণ, পরিশুদ্ধ রজত এবং বহুমূল্য রত্ন মাণিক্য দ্বারা ঐ “মুখ’’ বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এখানে রৌপ্য-নির্ম্মিত বৃহদাকার গো-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রহরী নিযুক্ত আছেন। অল্পদূরে ‘‘শত পান্থ’’ শিখর দেখা যায়। এস্থান হইতে ক্রোশ চতুষ্টয় পরে কেবল নিরবচ্ছিন্ন তুষার ক্ষেত্র; ইহার দক্ষিণে কেদার মন্দির এবং পূর্ব্বোত্তর কোণে দক্ষ রাজার আশ্রম। গোমুখী অতি সুন্দর স্থান, এখানকার শোভাও অত্যন্ত মনোমোহিনী; এখান হইতে ৫৬ ক্রোশ দূরে বিষ্ণুপ্রয়াগী নামক গঙ্গার অন্যতম শাখা অতীব প্রশস্ত ভাবে প্রকীর্ণ হইয়াছে। বদ্রিনাথ (বদরিকাশ্রম) মন্দিরের উপরস্থিত পাহাড়ে বিষ্ণু গঙ্গা ও সরস্বতী নদী দ্বয়ের সঙ্গম স্থল। বিষ্ণুগঙ্গার অনুসরণ করিয়া ৩৬ ক্রোশ অন্তরে উপস্থিত হইলে, “বসুধারা” দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গঙ্গোত্তরীর অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সম্মিলিত হইয়া, বড় বড় “ফোয়ারার’’ ন্যায় অনবরত চারি দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত নির্ম্মল শুভ্র ও হিম সলিল রাশিকে ছড়াইয়া ফেলিতেছে। নিকটে যাওয়া সুকঠিন। জল এত শীতল যে, তাহার শৈত্যপূর্ণ বায়ুতে “নিউমোনীয়া” হইবার আশঙ্কা আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, হরিদ্বারের পর্ব্বত মালা হইতে আরম্ভ করিয়া তিব্বতের মানস সরোবর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এতন্মধ্যে চব্বিশটী স্থান হিন্দুর তীর্থ ক্ষেত্র; এই সকল তীর্থে অন্যান্য তীর্থের ন্যায় ধুমধাম কিছুই নাই; পাণ্ডারাও দরিদ্র এবং অশিক্ষিত; কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষতায় উত্তরাখণ্ড, কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে নহে—সমগ্র বিশ্বমণ্ডল মধ্যে—সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত, প্রাচীন ও পরমানন্দদায়ক আধ্যাত্মিক আশ্রম।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

আসিব।

আসিব ফাল্গুন চৈত্রে ঋতুরাজ রূপে,
দিও তব ভালবাসা কুসুম স্বরূপে!
আসিব বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হইয়ে নিদাঘ,
ঢালিও বৈশাখী ঝড়ে নব অনুরাগ!

আসিব বরষা হ’য়ে আষাঢ় শ্রাবণে,
মোছাইও অশ্রুজল সকরুণ মনে!
আসিব আশ্বিন ভাদ্রে হইয়ে শরৎ,
দিও তব স্নেহ কোল পদ্মবনবৎ!

আসিব হেমন্ত রূপে কার্ত্তিক আগুনে,
করুণা মমতা মায়া দিও শতগুণে !
আসিব পউষ মাঘে হ'য়ে ঘোর শীত,
নিও বুকে আবরিয়া স্নেহের সহিত !
আসিব বাতাস হ'য়ে টেনে নিও বুকে,
আলোকে আসিব, চেয়ো পুলকে কৌতুকে !
সলিলে আসিব, তুমি সুখে ক'রো পান,
ক্ষিতিতে আসিব, ক'রো চরণে সম্মান !
আসিব আকাশ হ'য়ে,—বেড়িব তোমায়,
রেখে দিয়ে লাজ লজ্জা, মেখে নিও গায় !
অন্তিমে আসিব আমি হ'য়ে নারায়ণ,
কণ্ঠেতে বৈকুণ্ঠ রচি দিও সিংহাসন !
সর্ব্বশেষে আসিব হইয়ে নির্ব্বিকার,
এক অদ্বিতীয় আত্মা তোমার আমার !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

উপনিষদের উপদেশ। (৪)

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

একান্ত অভাবাত্মক অসৎ পদার্থ হইতে যে এই সদাত্মক বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না, এতত্ত্ব, পিতা অরুণি শ্বেত কেতুকে বুঝাইয়া দিলে, শ্বেতকেতু তাঁহার যুক্তিগুলি বিশেষরূপে হৃদয়ে অনুধাবন করতঃ, পরদিন পুনরায় পিতার নিকটে আসীন হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—"পিত ! নিত্য নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এই অনিত্য, সাবয়ব জগৎ প্রসূত হইল, একথার উপদেশ দিতে চাহিয়াছিলেন। অদ্য সেই তত্ত্বটী আমাকে বুঝাইয়া দিন্।" পিতা বলিতে লাগিলেন :—

"আমি তোমাকে সে দিন যে ব্রহ্ম পদার্থের কথা বলিয়াছি, সেই অদ্বিতীয়, সৎ, ব্রহ্ম চৈতন্য সিসৃক্ষু হইয়া বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্ব-প্রলয়ে যে সমস্ত বস্তু তাঁহাতে সূক্ষ্মশক্তিরূপে বিলীন আছে, তাঁহার জ্ঞানে সেই গুলিরই আলোচনার নাম ব্রহ্মের "ইচ্ছা" বা "ঈক্ষা"। এই সিসৃক্ষু, অদ্বিতীয়, জ্ঞানময় ব্রহ্মের কামনা * হইতে মায়াবলে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে ; তাহা হইতে বায়ু এবং তাহা হইতে পরে তেজ সৃষ্ট হইয়াছে। দাহকারী, পাকক্রিয়ার

---

* শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন:—"ব্রহ্মের এই যে বহু হইবার কামনা, এই কামনা হইতেই ব্রহ্ম যে চৈতন্যময় পদার্থ, তাহা শ্রুতি বলিয়া দিয়াছেন। কেন না, অচেতন পদার্থ কামনা করিবে কিরূপে ? ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনি অচেতন পদার্থ। পরে প্রকাশিত যাবতীয় নাম-রূপ, যাহা তাঁহাতে প্রলয় কালে বিলীন হইয়াছিল,—সূক্ষ্ম বীজাকারে অবস্থিত ছিল,—সেই গুলি সমস্তই তাঁহার জ্ঞানে একদা যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, সে অবস্থায় তাঁহাকে "সর্ব্বজ্ঞ" বলা গিয়া থাকে। জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানে নিয়তই প্রকাশিত থাকে। কামনা বাসনাদি যেমন জীবকে বশীভূত করে ও চালিত করে, ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত ও স্বাধীন বলিয়া, কামনাদি তাঁহার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। ব্রহ্মই, প্রাণীদিগের কর্ম্মের অপেক্ষা বশতঃ, সেই কামনাদিকে প্রবর্ত্তিত করান। জীবের পক্ষে যেমন কামনাদি আত্মা হইতে ভিন্ন এবং দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-সাপেক্ষ, কামনা জীবকে প্রবর্ত্তিত করে ;— ব্রহ্মের কামনা সেরূপ কোন পদার্থ নহে। কামনা ব্রহ্মেরই আত্মভূত, আত্মব্যতিরিক্ত নহে। এবং কামনা, জীবের ন্যায় কোনরূপ ইন্দ্রিয়াদি-পরতন্ত্রও নহে। সুতরাং তাঁহারই আত্মভূত বলিয়া, কামনা তাঁহার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। বীজরূপে, শক্তিরূপে

সম্পাদক, প্রকাশক এবং লোক প্রসিদ্ধ তেজ বা অগ্নি পরে প্রাদুর্ভূত হইল। সেই তেজোগত ব্রহ্ম আরো বহু হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন সেই তেজোগত ব্রহ্ম হইতে অপ্ প্রাদুর্ভূত হইল। এই জল, দ্রবগুণাত্মক, স্নিগ্ধ, স্যন্দনাত্মক ও শুক্ল বর্ণ বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই সাবয়ব সৃষ্ট, জলের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্ম আরো বহু হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তাঁহা হইতে অন্ন বা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ব্রীহী, যবাদিও এই পৃথিবীরই অন্তর্ভুক্ত। এই পৃথিবী গুরুত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট, স্থির এবং কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই সমস্ত স্থলে শ্রুতি যে বলিয়া দিলেন যে, 'তেজ বহু হইবার ইচ্ছা করিল,' 'অপ্ বহু হইবার ইচ্ছা করিল'—এ সমস্ত স্থলে, তেজ, অপ্ প্রভৃতি অচেতন বলিয়া,—তাহাদের নিজের মুখ্য কোন ইচ্ছা বা কামনা মনে করিও না। ইহারা সকলেই এক চেতন, জ্ঞানময় পদার্থ হইতে অভিব্যক্ত হইল বলিয়া, সেই ব্রহ্মেরই ইচ্ছা, ইহাদিগের উপরে আরোপিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। "নদীর কূল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে"—এস্থলে যেমন চেতনের ক্রিয়া অচেতনে আরোপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মেরই ইচ্ছা অচেতন জলাদিতে আরোপিত হইয়াছে মাত্র। অচেতনেও, চেতনের ক্রিয়ার আরোপ লোকে করিয়া থাকে, তাহাতে অচেতনই চেতন হইয়া যায় না। শ্রুতি সর্ব্বত্রই সেই চেতন কারণকেই "আত্ম" স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; এই আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের সত্ত্বা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং এতদ্ দ্বারা জগতের কারণ যে সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় অচেতন নহে, ইহাও শ্রুতি প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন, একথাটীও তোমাকে মনে রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে অচেতন মহাভূত সকল প্রাদুর্ভূত হইল।

পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী সমূহের তিন প্রকার মাত্র কারণ বীজ; অণ্ডজ, জীবজ এবং উদ্ভিজ্জ। পক্ষি, সর্পাদি হইতেই, পক্ষি, সর্পাদির জন্মলাভ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং পক্ষি সর্পাদিই, পক্ষি সর্পাদির বীজ-কারণ। এইরূপ, অণ্ড হইতে জাত অন্যান্য প্রাণীবর্গের, তাহাই বীজ হইতেছে। জীবজ বীজ অর্থ জরায়ু হইতে জাত; যেমন মনুষ্য, পশ্বাদি। উদ্ভিজ্জ অর্থ স্থাবর হইতে জাত; অতএব উদ্ভিজ্জই, স্থাবরের বীজ। মায়ারূপ উপাধিগ্রস্তব্রহ্মই এই জগতের কারণ বলিয়া, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে অনুভূত এবং মায়াতে সংস্কার রূপে বিলীন, পদার্থ নিবহের স্মৃতি, ব্রহ্মের জ্ঞানে উপস্থিত হইয়া, সেই সেইরূপে ক্রমে জীবাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল। (এই মায়া কি, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রকাশিত "ব্রহ্ম ও জগৎ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মই "জীব" পদবাচ্য। তেজ, অপ্ ও অন্ন—এই ভূতত্রয়ের অংশ বিশেষের সংসর্গ বশতঃ, বিশেষ বিজ্ঞান লাভ করিয়া জগতে নামরূপের প্রাদুর্ভাব হইল। এখন তুমি প্রশ্ন করিতে পার যে, সর্ব্বজ্ঞ, চৈতন্যময় পরমাত্মা

সমবস্থিত, নিজেরই আত্মভূত, যাবতীয় নামরূপ যখন অব্যক্তাবস্থা হইতে, ব্যক্তাবস্থা ধারণ করে, সেই নামরূপাভিব্যক্তিই,—তাঁহার "বহু ভবন"। নতুবা নিরবয়ব পদার্থ বহু হইবেন কিরূপে? নামরূপ কি, ব্রহ্মের বহু ভবন কিরূপ, এ সকল বিষয় "ব্রহ্ম ও জগৎ" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে ও হইবে। উপন্যাসের মধ্যে এই নিরস দার্শনিক তত্ত্ব গুলির অধিক পরিস্ফুটন আমরা করিব না।

বুদ্ধি পূর্ব্বক, এই শত সহস্র যাতনাময় ও অনর্থের আধার এই দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, দুঃখভোগ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন কেন? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই, এ কথার উত্তর পাওয়া যাইবে। ব্রহ্ম নিজে, দুঃখ পাইব বলিয়া, কাহারও মধ্যে প্রবেশ করেন না। জলে যেরূপ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, দর্পণে যেমন পুরুষের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, এ প্রবেশও তদ্রূপ। পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ ও বুদ্ধ্যাদির সংসর্গ হওয়াতেই, অর্থাৎ ব্রহ্ম চৈতন্যে বুদ্ধ্যাদি-ভূতাংশ সকলের প্রতিবিম্বপাত হওয়াতেই, ব্রহ্মকে জীবরূপে ব্যবহার করা গিয়া থাকে। ব্রহ্মে নিত্যই যে তাঁহার মায়াশক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত সম্বন্ধবশতঃই, বুদ্ধ্যাদির সহিতও তাঁহার সংসর্গ সিদ্ধ হইতেছে। আবরণ এবং বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট সেই মায়া শক্তির সম্বন্ধবশতঃই জীব সুখী, দুঃখী প্রভৃতি বলিয়া নিজকে বিবেচনা করিয়া থাকে। নতুবা স্বরূপতঃ জীবের সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই। সূর্য্য যেমন কর্দ্দম-পঙ্কিল জলে প্রতিবিম্বিত হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে মলিনতাদি দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ সূর্য্যকেও আবিল ও মলিন দেখায়; জীবেরও বুদ্ধ্যাদির সংসর্গে সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। অতএব ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই জগৎ এবং জীব, সেই সৎস্বরূপেরই শক্তিজাত বলিয়া, তাঁহারাও সত্য পদার্থ; মিথ্যা বা অলীক পদার্থ নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া, নাম রূপ সকল সত্য ও নিত্য। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে,—ভিন্ন রূপেই—কেবল ইহাদের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম চৈতন্যকে ছাড়িয়া দিয়া, ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, অব্যাকৃত নামরূপ সকল, ব্রহ্মেরই আত্ম-স্বরূপ মাত্র এবং ইহারা তাঁহাতেই শক্তিরূপে বিলীন ছিল। ইহারা তাঁহার সংকল্প বা ইচ্ছাবশতঃ প্রথমতঃ তেজ, অপ্ ও অন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, উহারা "ত্রিবৃৎকৃত" * হইল। প্রত্যেক সূক্ষ্মভূত ত্রিবৃৎকৃত হইয়া লোকের প্রত্যক্ষীভূত হইল।

পরিদৃশ্যমান অগ্নির যে লোহিতবর্ণ দেখিতেছ, উহা সেই সূক্ষ্ম তেজ পদার্থেরই রূপ বলিয়া জানিবে। আবার উহার যে শুক্লতা দেখা যাইতেছে, তাহা ইহার অন্তঃপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম জলেরই রূপ বলিয়া জানিবে। ইহাতে যে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণচ্ছায়া দেখিতেছ, সেটী ইহার মধ্যস্থিত অন্নেরই (পৃথিবী পরমাণুর) রূপ বলিয়া জানিবে। অতএব এইরূপ ছাড়িয়া দিলে, অগ্নির আর পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। শুভ্র স্ফটিককে যেমন জবাকুসুমের সংসর্গে রাখিলে, উহাতেও লোহিতবর্ণের প্রতীতি হয়, কিন্তু যখন স্ফটিকের কথা মনে হয়, তখন যেমন উহার লোহিত বর্ণটীকে আগন্তুক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ অগ্নির এই লোহিতাদি রূপ সূক্ষ্ম ভূতত্রয়েরই সংযোগবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, জানিবে। অতএব, বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে ঐ সূক্ষ্মভূতত্রয়ই প্রকৃত পদার্থ, অগ্নি বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা বস্তু মাত্র। এইরূপ, পরিদৃশ্যমান সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতির যে লোহিত,

---

* ত্রিবৃৎকৃত শব্দটী ছান্দোগ্যেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী সূক্ষ্মভূতে, অন্য দুইটী সূক্ষ্মভূতের অংশ প্রবিষ্ট হয়, নিজের অংশটীরই বেশী প্রাধান্য থাকে। তিনের এই সম্মিলিত অবস্থার নাম ত্রিবৃৎকৃত অবস্থা।

শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যুগপৎ প্রতি পদার্থেই অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতেছ, উহারা উহাদের উপাদানীভূত সেই সূক্ষ্ম ভূতত্রয়েরই রূপ। উহাদের স্বতন্ত্র কোন রূপ নাই। এই ভাবে প্রতি বস্তুতে যে অল্পাধিক্য পরিমাণে, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও শব্দ আছে, তাহাও এই ভূত সংসর্গেরই ফল মাত্র। সমস্ত বিশ্বই যখন "ত্রিবৃৎকৃত" হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তখন যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা বলিয়া দেখান হইল, তেম্‌নি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যা। কেবল উহার উপাদান স্বরূপ ভূতত্রয়কেই সত্য বলিয়া বুঝিবে। আবার এই কার্য্য কারণ-প্রক্রিয়ার দিক্ দিয়া দেখিলে, আরো একটী বিষয় উপলব্ধ না হইয়া পারে না। পৃথিবীর কৃষ্ণ রূপটী শুক্লরূপাত্মক জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেননা জলই উপাদান। আবার জলের শুক্লতা, লোহিত রূপাত্মক তেজ হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে, কেননা তেজই জলের উপাদান। তাহা হইলে, পৃথিবী ও জল উভয়ই মিথ্যা দাঁড়াইতেছে; কেবল এক তেজই সত্য পদার্থ। আবার, আমরা দেখিয়াছি যে, লোহিত রূপাত্মক তেজও একমাত্র সেই অদ্বিতীয় সৎ-পদার্থ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে *। সৎ পদার্থ ব্যতিরেকে,—উহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে—তেজের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অতএব কেবল মাত্র সেই সৎ, সেই অদ্বিতীয় পদার্থটীই সত্য দাঁড়াইতেছে। অতএব একমাত্র ব্রহ্মকেই উত্তমরূপে জানিতে পারিলেই, আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, কারণের জ্ঞান হইলেই কার্য্যজ্ঞানও অনিবার্য্য। অতএব হে সৌম্য! বোধ হয় এখন বুঝিলে যে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, অনুভূত হইলে, জগতের আর অন্য কোন জ্ঞান বাকী থাকে না। বিষয়টী নিতান্ত নীরস। আর একদিন আবার অন্যরূপে ইহা বুঝাইয়া দিব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কয়লার খনি। (৪)

মেশিনারী।—কয়লার খাদে আবশ্যকীয় কল কবজার বন্দোবস্ত করিয়া খাদে কার্য্য আরম্ভ করিবে। আফিষ, ষ্টোর, কামারশালা ইত্যাদি অগ্রে নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত জিনিষ পত্রাদি, প্রস্তুত রাখিতে হইবে। আফিষে খাতা পত্রাদি, ষ্টোরে গাঁইতি, বিতগাতি শভেল (shovel) জাঁতা নেয়াই, হাতুড়ি, দাইটব, প্লেট, বাঁট ইত্যাদি

---

* শ্রুতি এস্থলে শব্দ ও স্পর্শ গুণাত্মক অন্তরীক্ষ ও বায়ুর কথা না বলিলেও, উহারাও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতি এস্থলে পঞ্চীকরণ না বলিয়া, ত্রিবৃৎকরণ মাত্র বলিয়াছেন বলিয়া, আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে যে, হয়ত বায়ু ও অন্তরীক্ষকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। বায়ু ও অন্তরীক্ষকে ধরিলেও পূর্ব্বোক্ত ফলই পাওয়া যাইত। কেননা, তেজের যে রূপ, তাহাতে স্পর্শশব্দও গূঢ়ভাবে নিহিত আছে; যেহেতু তেজ সেই স্পর্শ গুণাত্মক বায়ু হইতেই জন্মিয়াছে; আবার বায়ু শব্দগুণময় আকাশ হইতে জাত। আকাশ সেই ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত। অতএব এই পঞ্চীকরণ মতেও, কেবল এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিতেছেন। ফলতঃ, যথাক্রমে পঞ্চতন্মাত্রই উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মই উহাদের মূল কারণ।

ষ্টোর হিসাব ভুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। কামারশালায় একটী নেয়াই পুঁতিয়া জাঁতা বসাইতে হইবে। ঐ জাঁতার দ্বারা প্রত্যহ অগ্নির দাহিকাশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া গাঁইতি পাঁজাইবে এবং অন্যান্য কয়লার খাদের আবশ্যকীয় শালের কার্য্য সম্পাদন করিবে। দাইটব সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বোল্টু ও মৌরী প্রস্তুত হয় (bolts + nuts) ভার্টিকেল, হরাইজণ্টেল কর্নিস ল্যাঙ্কারসায়ার ও লোকোমোটিভ বয়লারগুলি কয়লার খাদে দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রকারে ভার্টিকেল বয়লার বসাইতে হইবে। সাধারণতঃ এক ফুট কিম্বা দেড় ফুট বেশ শক্ত ইটের গাঁথনি উচ্চ করিয়া উহা লেভেল করিয়া লইবে। এবং ঐ গাঁথনির নিকটে একটী বড় শক্ত কাঠের মাস্তুলে একটী কপিকল সংলগ্ন করিবে; পরে ঐ মাস্তুলের চতুষ্পার্শ্বে দড়ির টান দিয়া উহাকে দাঁড় করাইবে। ইহা বলা আবশ্যক যে, বয়লারের নিম্ন প্রদেশের মাপানুযায়ী ইটের গাঁথনিটী অগ্রে প্রস্তুত করিতে হইবে। বয়লারটী গাঁথনির নিকটে না থাকিলে উহাকে গড়াইয়া উহার নিকটে আনিবে। ভার্টিকেল বয়লারের মধ্য প্রদেশের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ম্যানিলা রোপ কিম্বা লৌহ শৃঙ্খলের একপার্শ্ব দ্বারা উহা বেষ্টন করিয়া বাঁধিবে। ঐ রোপ কিম্বা শৃঙ্খলের অপর প্রান্ত মাস্তুলের সংলগ্নস্থিত কপিকলের মধ্যভাগে প্রবেশ করতঃ সন্নিকটবর্ত্তী ক্রেনের প্রবেশ করাইবে। পরে ক্রেনের হাতল ঘুরাইয়া রজ্জু কিম্বা শৃঙ্খল সঙ্কোচন করিতে থাকিবে। এবম্প্রকারে বয়লারটীকে ঝুলাইয়া পূর্ব্বোক্ত গাঁথনি স্থানে বসাইবে। বয়লারটী সোজা কিম্বা বক্রভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে কি না, উহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ওলন বয়লারের গাত্রে ঝুলাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। বয়লার সোজা না বসাইলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। ভার্টিকেল বয়লারে জল তুলিবার জন্য সমচতুষ্কোণবিশিষ্ট দশফুট, গভীরতা পাঁচফুট চৌবাচ্চা উহার নিকটে প্রস্তুত করিবে। ইনজেক্টারের দ্বারা বয়লারে জল তোলা হয়। ঐ ইনজেক্টারের জল আকর্ষণ করিবার পাইপটী চৌবাচ্চার জলে প্রবেশ করিয়া রাখিবে। চেক ভেল্‌ভেট দ্বারা ষ্টীম ও জলের গতি খোলা ও আবদ্ধ হইয়া থাকে। চৌবাচ্চার জল সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। ঐ জলে ময়লা থাকিলে বয়লার প্লেটের অনিষ্ট এবং ষ্টীম প্রস্তুত হইবার বিলম্ব ঘটে। ইনজেকটারের দ্বারা বয়লারে জল নীত হইলে যখন দেখিবে যে, গেজ গ্ল্যাসে দুইভাগ পরিমাণ জল উঠিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, বয়লারে আর অধিক জলের আবশ্যক নাই এবং তখনই ইনজেকটারের চইল ভল্‌ভ দ্বারা জলের গতি বন্ধ করিয়া দিবে। ষ্টীম গেজ, ওয়াটার গেজ, সেফ্‌টী ভল্‌ভ, ম্যান-হোল ব্লোয়ার ককগুলি বয়লারের প্রধান অঙ্গ। ষ্টীম গেজের আকৃতি ঠিক ঘড়ির ন্যায় এবং উহাতেও ঘড়ির ন্যায় একটী কাঁটা আছে। ঐ কাঁটার দ্বারা ষ্টীমের পরিমাণ নির্দ্দেশ হয়।

ওয়াটার গেজে বয়লারের জলের পরিমাণ পরিমিত হয়। গেজ গ্ল্যাসটী সংলগ্নস্থিত টেষ্ট কক বয়লারের গাত্রে পরিষ্কার করিয়া সংলগ্ন করিয়া রাখিবে, যাহাতে ষ্টীম এবং জলের স্রোত সর্ব্বদা উহাতে প্রবেশ করে, তাহা দেখিবে।

সেফ্‌টী ভল্‌ভে অধিক পরিমাণে ষ্টীম হইলে তাহা দূর করিয়া দেয়। ব্লোয়ার কক দ্বারা বয়লারের জল নির্গমন হয়। ম্যানহোলের দ্বারা বয়লারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় এবং উহাতে ইনজেকটারের দ্বারা জল তুলিবার পূর্ব্বে দুই ভাগ পরিমাণ জল (একভাগ শূন্য রাখিয়া) বয়লারে দেওয়া হয়। এগেস্তেড্‌ বয়লার বসাইবার প্রণালী স্বতন্ত্র। বয়লারের দৈর্ঘ্যতা পরিমাণের চারি ফুট বেশী ধরিয়া প্ল্যাটফর্‌ম ভাল ইটের দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ প্ল্যাটফর্‌মটীর উচ্চতা সুবিধাজনক করিবে। এবং উহার প্রস্থ বয়লারের ব্যাসের (Diameter) দ্বিগুণ হইবে। উক্ত প্ল্যাটফর্‌মটীর উপর বয়লার বসাইবার জন্য দুইটী প্রাচীর উত্তোলন করা আবশ্যক এবং উহাদের উচ্চতা বয়লারের ব্যাসের (Diameter) এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ এবং ব্যবধান (ব্যাসের) অর্দ্ধেক হওয়া উচিত। উক্ত প্রাচীরদ্বয় প্রতি দশ ফুটে আদ ইঞ্চি ঢাল জ্বাল দরজার অভিমুখে দিয়া গাঁথিবে এবং উত্তম প্রকারে শুকাইলে বয়লারটী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রেন ও মাস্তল দ্বারা উহাদের উপরে বসাইবে। প্রাচীরদ্বয় এমন ভাবে ফায়ার ব্রিকের দ্বারা গাঁথিবে যে, উহা বয়লারের ভার সংরক্ষণ করিতে পারে। জ্বাল দরজাও ফায়ার ব্রিকের দ্বারা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। বয়লারটীর চতুপার্শ্বে দেড় ফুট প্রস্থ এবং দুই ফুট উচ্চ অবরুদ্ধ খিলান প্রস্তুত করিয়া ধূম্র নিঃসরণের ব্যবস্থা করিবে। বয়লারের পশ্চাদ্ভাগে উহার নিম্ন প্রদেশ হইতে ধূম্র খিলানে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দেড় ফুট স্কোয়ার একটী দ্বার রাখিবে, এবং চিমনিতে ধূম্র প্রবেশ করিবার পথ উক্ত মাপানুযায়ী রাখিবে। এ বিষয়ে কোন নিয়মের স্থিরতা নাই। তবে ইহা দেখিতে হইবে যে, চতুপার্শ্বস্থ ধূম্রনিঃসরণের খিলান এমতভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, যাহাতে বয়লারের গাত্র উত্তমরূপে উত্তপ্ত হয়। চিমনি ও খিলানের সংলগ্ন স্থলে একটী ফায়ার ড্যাম্পিয়ার অর্থাৎ অবরোধক রাখিবে। উক্ত অবরোধকের দ্বারা ষ্টীমের প্রবলতা ও হীনতা উদ্ভাবিত হয়। বয়লারের সন্নিকটে চিমনি ব্যবস্থা করিবে। চিমনির বনিয়াদ আকৃতি অনুযায়ী হওয়া বিধেয় এবং বয়লারের উপরিভাগে সম লেভেল করিয়া চিমনির নিম্ন স্তর প্রস্তুত করিবে। ঐ নিম্ন স্তরের পরিমাণ বয়লারের ব্যাসের তুল্য হইবে। চিমনির অভ্যন্তরের মাপ বয়লারের ব্যাসের একতৃতীয়াংশ এবং প্রত্যেক দশ ফুটে আর্দ্ধ ইঞ্চি ন্যূন হওয়া কর্ত্তব্য। এবম্প্রকারে কুড়ি ফুট ঘোড়ার জোরের বয়লারে দশ ফুট দূরে চিমনি থাকিলে উহার উচ্চতা পঞ্চাশ ফুট হইবে। বয়লারের জ্বালদিবার স্থান ব্যাসানুযায়ী দীর্ঘ এবং উহার তিন ভাগের এক ভাগ প্রস্থ হইবে। উক্ত অগ্নিদিবার স্থানের চতুর্দ্দিকে ফায়ার ব্রিকের দ্বারা প্রস্তুত করা প্রয়োজন এবং লৌহ নির্ম্মিত কপাট দ্বারা ষ্টীম হইবার সময় জ্বালমুখ বন্ধ করিবে। ভার্টিকেল বয়লারের ন্যায় এগেস্তেড্‌ বয়লারেরও জলের চৌবাচ্চা আবশ্যক।

কর্ণিশ বয়লারের একটী এবং ল্যাঙ্কারসায়ারের দুইটী জ্বালমুখ আছে। উহাদেরও চিমনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইট কিম্বা লৌহার প্লেট দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং

বয়লারের মাপানুযায়ী এগেওেড্ বয়লারের ন্যায় প্ল্যাট ফর্মোপরি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাদের জন্যও ফায়ার ব্রিকের ফ্লো (অর্থাৎ খিলান ফোকর) প্রস্তুত করিতে হয়। লোকোমোটিভ বয়লারে খাদকাটাই কার্য্য উত্তমরূপ চলে। উহার নিমিত্ত কোন প্ল্যাটফরম কিম্বা চিমনি আবশ্যক হয় না। আধুনিক অনেক বয়লার ও ইঞ্জিন্ একত্রে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, এবং উহার সহিত প্ল্যাটফরম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বয়লারে জল তুলিবার জন্য লৌহ-নির্ম্মিত সায়ার সংলগ্ন থাকে। বয়লার, ড্র্যামসহ ইঞ্জিন্, হেডগিয়ার, পুলী, চেন, খাদের জল তুলিবার জন্য স্পেশ্যাল পম্প কিম্বা পলসোমিটার প্রভৃতি কয়লার খাদ চালাইবার আবশ্যকীয় বস্তু। এক্ষণে দেখা যাউক, কয়লা কি প্রণালীতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। সিঁড়িখাদ অর্থাৎ ইন্‌ক্লাইনে অনেক দূর হইতে অধিক পরিমাণ কয়লা তুলিবার জন্য হলিং ইঞ্জিনের আবশ্যক। ইনক্লাইন খাদের মূল মুঁদে একটী কেন্দ্র নির্ণয় করিতে হইবে। উক্ত কেন্দ্র হইতে একটী দড়ি কিম্বা সূতা ইনক্লাইনের উপরিস্থ অপর প্রান্তে একটী খোঁটার সহিত এমন সোজাভাবে বাঁধিবে যেন কার্য্যোপযোগী ঢাল ও লেভেলের সামঞ্জস্য হয়। লেভেল ঠিক করিবার পর ইনক্লাইনের উপরোক্ত প্রান্তের পঞ্চাশ, ষাট ফুট ব্যবধানে ইঞ্জিনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উহার বুনিয়াদের উপর বসাইবে।

বয়লার ইঞ্জিনের নিকটে থাকা আবশ্যক। ষ্টীম না হইলে ইঞ্জিনের গতিবিধি হয় না। ড্র্যামের সেণ্টার (centre) ও খাদের সেণ্টার এক লাইনে হইবে। উক্ত লাইনের উভয় পার্শ্বে এক ফুট ব্যবধানে দুই ফুট প্রস্থে রেল লাইন বসিবে। ঐ সেণ্ট্রাল লাইনের প্রত্যেক দশ ফুট অন্তর ড্র্যামরোপের গতিবিধি জন্য এক একটী হুইল লাইনের উভয় পার্শ্বে অবরুদ্ধ করিয়া দিবে, এবং ইঞ্জিনের অগ্রে ও পশ্চাতে লেভেল করিয়া ষ্টীলের চাদর পাতিবে। ঐ চাদরের উপর টব সহজেই ঘুরিবে ফিরিবে।

ইঞ্জিন। বয়লার অভ্যন্তরস্থ জলরাশিকে অগ্নির উত্তাপ প্রদান করতঃ বাষ্পীয় পদার্থে পরিণত করিলে একটী মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। ঐ শক্তি বয়লার হইতে ষ্টীম পাইপ দ্বারা ইঞ্জিনে প্রবেশ করিয়া উহাকে পরিচালনা করিয়া থাকে; সুতরাং ইহা ষ্টীম ইঞ্জিন নামে অভিহিত। একটী অথবা দুইটী সিলিণ্ডার বিশিষ্ট ফ্লাই হুইল এবং ড্র্যাম সংলগ্ন ইঞ্জিনের সাহায্যে খাদের নিম্নে ও উপরে বাউতি বা টব দ্বারা উঠিতে এবং নামিতে পারা যায়। কয়লাও ঐ প্রকারে উত্তোলিত হইয়া থাকে। একটী সিলিণ্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিনে একটী ফ্লাই হুইল এবং একটী ড্র্যাম দৃষ্টিগোচর হয়। ডবল সিলিণ্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিনে একটী ছোট এবং আর একটী বড় পিনিয়ন থাকিবে। ছোট পিনিয়নটী ইঞ্জিন স্যাফ্‌টের, এবং বড় পিনিয়নটী ড্র্যাম স্যাফটের সহিত আবদ্ধ থাকে। ড্র্যাম দুইটী সিলিণ্ডারের মধ্যে কিম্বা পার্শ্বেও দৃষ্ট হয়। ব্রেক দ্বারা ইঞ্জিনের গতি রোধ হয়, আর লিভারের সাহায্যে ইঞ্জিন অগ্র ও পশ্চাৎ চলিতে থাকে।* ইঞ্জিনের বুনিয়াদের

---

* লিভারটী সমোকোণ ভাবে ধরিলে ইঞ্জিনের কার্য্য বন্ধ হয়। উহা সম্মুখের দিগে টানিলে কেজ কিম্বা বাউতি উঠিয়া আসিবে। এবং বিপরীত দিক ঠেলিয়া ধরিলে নামিয়া যাইবে।

উচ্চতা পীট খাদের চানক সমতুল্য হইবে, কিম্বা ড্র্যামের ব্যাসার্দ্ধোপরি এক ফুট ধরিয়া যত ফুট হইবে, সেই পরিমাণ বুনিয়াদের উচ্চতা করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে ড্র্যাম চাকার ন্যায় সহজে ঘুরিবে ও ফিরিবে। ইঞ্জিনের বুনিয়াদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ড্র্যামের কেন্দ্র খাদের কেন্দ্রের সহিত একরেখা করিবে, এবং ড্র্যামের কেন্দ্র অন্ততঃ চল্লিশ ফুট দূরে থাকিবে। ওয়াণ্ডিং রোপ পুলি হইতে বাহির হইয়া যাহাতে হেডগিয়ারের কাষ্ঠে সংলগ্ন না হয় ও ড্র্যামের নিম্নস্থ কেন্দ্রে এক রেখায় মিশিয়া যায়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যে স্থলে দুটী পুলি, তথায়ও অবস্থানুযায়ী রোপ নির্দ্দেশ করিবার স্থান অগ্রে পরীক্ষা করা উচিত। ইঞ্জিনের ব্যাকপ্লেট যে পরিমাণে দীর্ঘ হইবে, তাহার অতিরিক্ত দুই ফুট উভয় পার্শ্বে এবং প্রস্থে ইঞ্জিন স্যাফ্‌টের পরিমাণের অতিরিক্ত দুই ফুট অধিক ধরিয়া বুনিয়াদ প্রস্তুত করিতে হইবে, আর ব্যাকপ্লেটে হোল্ডিং বোল্টুর ছিদ্রানুযায়ী বোল্টু আঁটিয়া দিবে। ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, ইঞ্জিন বসাইবার পূর্ব্বে স্থানটী স্পিরিট্‌ লেভেল দ্বারা উত্তম রূপে সমতল করিবে।

হেডগিয়ার বা পাল্লা। ডবল রেল, অ্যাঙ্গল আয়রণ, জয়েষ্ট, লোহার পাটী, উত্তম শ্লীপার কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খাদের গাঁথনি প্রস্তুত হইলে উহার মুখ পাটাতন কিম্বা বাঁশের মাচান দ্বারা অবরোধ করিয়া হেডগিয়ারের কার্য্য আরম্ভ করিবে। মনে কর, একটী খাদের চৌদ্দ ফুট ব্যাস আছে; এক্ষণে উহার চতুপার্শ্বে কার্য্যোপযোগী গাঁথনি করিয়া তিন ফুট গর্ত্ত করিয়া রেল বসাইতে হইবে। রেলগুলি টনসিট্‌ দ্বারা দৃঢ়রূপে বসাইবে। পাল্লার উচ্চতা সাধারণতঃ পঁচিশ, ত্রিশ ফুট দৃষ্ট হয়। দুইখানি ডবল রেল সংলগ্ন করিয়া চতুষ্কোণে আটখানির দ্বারা পাল্লা নির্ম্মাণ করিবে, এবং ইঞ্জিনের দিকে দুই খানি ঠেশ রেল পাট্টায় সংলগ্ন করিয়া দিবে। ঐ দুই খানি ঠেশ রেলের নিম্নে আবার দুইখানি ডবল রেল ভূমিতে পুঁতিয়া উহাদের অপর প্রান্ত ঠেশ রেলের সহিত বোল্টু দিয়া আঁটিয়া দিবে। পাল্লার এক এক পার্শ্বে তিন তিন খানি অ্যাঙ্গল আয়রণ দ্বারা টাইরড প্রস্তুত করিয়া দিবে। এবম্প্রকার টাইরড সংলগ্ন করিলে পাল্লার দৃঢ়তা পরিবর্দ্ধিত হয়। ডবল রেলের উপরি ভাগে চারিদিকে চারিখানি শাল কাষ্ঠ বসাইয়া উহার কোণ মারিয়া দিতে হইবে এবং ঐ কাষ্ঠের উপরে পুলি বসাইবার জন্য দু দুখানি করিয়া চারি খানি কাষ্ঠ বসাইবে। উক্ত কাষ্ঠ চতুষ্টয়ের উপর পুলিব্লক বসিবে। মাস্তুল ও ক্রেন দ্বারা বয়লারের ন্যায় হেডগিয়ারের রেল এবং কাষ্ঠাদি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতে হইবে। দুইটী পুলির স্থান অগ্রে উহা হইতে ওলন ঝুলাইয়া নির্দ্দেশ করিয়া লইবে। পুলি এবং ব্যাসের মাপ তুল্য হইলে রোপ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। চারিখানি শ্লীপার কাষ্ঠ সমচতুষ্কোণ আকারে চানকের মুখে বসাইয়া উহার উপরি ইটের গাঁথনি করিয়া দিবে এবং দুখানির উপরে লোহার চেয়ার বসাইয়া রেল আঁটিয়া দিবে। ঐ রেল লম্বা করিয়া খাদের উপরি লাইন করিয়া দিবে; খাদগাড়ী এই লাইনের উপর দিয়া চলিবে এবং খাদ মুখ বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিলে খাদ গাড়ীর দ্বারা উহা বন্ধ করা যায়। যখন বাউতি খাদ হইতে উঠিবে, তখন

খাদগাড়ী খাদের মুখ হইতে সরাইয়া আনিবে এবং বাউতি খাদগাড়ীর সমতলের একটু উপরে উঠিবা মাত্রই গাড়ী ঠেলিয়া খাদের মুখ বন্ধ করিলে বাউতি গাড়ীর উপরে বসিবে। উহা খাদ গাড়ীর মধ্যে এবম্প্রকার স্থিত হইলে খাদগাড়ী চানকের মুখ হইতে টানিয়া লইবে। উক্ত খাদগাড়ি খাদের মুখের মাপানুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।

কেজ-পিট।—ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন। চানকের নিম্নে অন্ততঃ দশ ফুট্ প্রস্তর কর্ত্তন পূর্ব্বক ককটী সমচতুষ্কোণ সায়ার (চৌবাচ্চা) করিবে এবং ঐ সায়ারের উপরে চারিখানি শক্ত শাল স্লীপার কাষ্ঠ লম্বা করিয়া সায়ারের উপরে রাখিয়া গাঁথিয়া দিবে। পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠদ্বয়ে গাইড রোপ সংলগ্ন করিবার জন্য ক্ল্যাম্প আঁটিয়া দিবে। ক্ল্যাম্পের মধ্য দিয়া গাইড রোপহাইড্রেণ্টের সহিত নাচি করিয়া দিলে হাইড্রেণ্ট্টী ঝুলিবে। সায়ারে যাহাতে জল না জমে, তাহা দেখিতে হইবে। জল জমিলে হাইড্রেণ্টের গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। চানকের নিম্নে সমস্ত পাটাতন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিবে। ঐ কাঠের উপরে রেলের লাইন বসাইয়া সুঁদের লাইনের সহিত সমতল করিতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, টবগুলি সহজেই সুদ হইতে চানকের মুখে কেজের উপরে আসিতে পারে। ইহা গেল নিম্ন চানকের কথা। এক্ষণে দেখা যাউক, চানকের উপরে কি প্রণালীতে কার্য্য হইবে। উপরের চানকের দু তিন ফুট্ নিম্নে কেপ্স্ বসাইবার জন্য তিন ফুট ব্যবধান করিয়া দুইখানি শক্ত শালকাষ্ঠ লম্বালম্বি ভাবে চানকের উভয় পার্শ্বে বসাইতে হইবে এবং যে স্থানে কেজ বসিবে, তাহার চারিদিকে কাঠের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। কেজ উঠিবার ও নামিবার সময় উহার উভয় পার্শ্বস্থ ফটক্ উঠিবে ও নামিবে। হেডগিয়ারের উপরে ডবল রেল বোল্ট্ দিয়া চারিখানি কাষ্ঠ ব্যতীত আরও ছয় খানি কাষ্ঠ ঐ ফ্রেমের উপর সোজা ভাবে সংস্থাপিত করিবে। উক্ত ছয়খানি কাষ্ঠের মধ্যে পার্শ্বস্থ কাষ্ঠদ্বয়ে টাই-রড দ্বারা গাইড রোপ আঁটিয়া দিতে হইবে এবং অপর চারি খানিতে দুইটী পুলিব্লক বসাইবে। কেপ্সের উপর কেজ বা ডুলি বসিয়া থাকে। হেডগিয়ারের উপরে কাষ্ঠের আচ্ছাদন করিয়া দিবে এবং উহার উপরে উঠিবার জন্য একটী সোপানও প্রস্তুত রাখিবে। ঐ সোপানের দ্বারা উপরে উঠিয়া পুলিব্লকআদি পরীক্ষা ও তেল দিবার ব্যবস্থা করিবে। সেফ্টিলিঙ্কের ব্যবস্থায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা কম। খাদের জল নিঃশেষ করিবার জন্য স্পেশ্যাল পম্প ব্যবহার হইয়া থাকে। ১০″ × ৫″, ১২″ × ৬″, ৮″ × ৪″ এবং ১৪″ × ৬″ আকৃতির পম্প কয়লার খাদে দৃষ্ট হয়। ১২″ × ৬″ স্পেশ্যাল পম্পের কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়। জল টানিবার জন্য পম্পে স্যাকশন্ পাইপ সংলগ্ন থাকে। উহার মুখে জলের মধ্য রাখিলে জল আকর্ষণ করিয়া ডেলিভারি পাইপ দ্বারা জল খাদের বাহিরে নির্গত করিয়া দেয়। ষ্টীম পাইপ দ্বারা বয়লার হইতে ষ্টীম যাইয়া স্পেশ্যাল পম্পে শক্তি প্রদান করে। স্তকশন্ পাইপ সমকোণ ৩৪ ফুটের অতিরিক্ত স্থানের জল আকর্ষণ করিতে উত্তম রূপে সক্ষম হয় না, কিন্তু শায়িতভাবে ৩০০ শত ফুট পর্য্যন্ত জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। ডেলিভারি পাইপ

করিতেই হইবে। তজ্জন্য আমি বলিয়াছি যে, এখন কৃষি ও বিবিধ শিল্প বিদ্যা দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে পরে দেশের লোক এই শিল্প ও কৃষির সাহায্যে বিনা ক্লেশে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন এবং যাহাতে দেশের অধিকাংশ লোক উচ্চ শিক্ষার বাহ্যিক মোহে মুগ্ধ না হইয়া দিন দিন কৃষি ও শিল্প শিক্ষায় অগ্রসর হয়, আমাদিগকে সেই পথই দেখিতে হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষার যে আমূল সংস্কার করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

আমার মত এই যে,দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কার করিতে হইলে, প্রথমে আমাদের দেশের এই শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। সেই দুই ভাগের এক ভাগ উচ্চ শিক্ষা—অর্থাৎ University Education, অন্যভাগ সাধারণ শিক্ষা বা Mass Education.। আমার মতে এখন দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন—এক শ্রেণী কলেজ্ ও কলেজিয়েট্ স্কুল,—অন্য শ্রেণী Industrial বা কৃষি বা কৃষি শিল্প বিষয়ক স্কুল। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই উভয় শিক্ষার বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

উচ্চশিক্ষা এতদিন যে ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, এখনও সেই ভাবেই চলিবে, তবে অনেকটা সুসংস্কার করিতে হইবে। তাহার আলোচনা পরে করিব। যাঁহারা উকীল, হাকিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হইবেন, তাঁহারাই বাল্যকাল হইতে এই সব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, আপন আপন পাঠ সমাপনান্তে বিভিন্ন বিভাগে [illegible] করিয়া, সেই সেই বিভাগের উন্নতি সাধন করিবেন। এই শ্রেণীতে অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় যাহাতে অধিক পরিমাণে লোক প্রবেশ করিতে না পারেন, তাহারই সম্যক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আমার যতদূর বিশ্বাস, প্রত্যেক বিভাগে একটা করিয়া ভাল কলেজ্ ও তৎসংলগ্ন কলেজিয়েট্ স্কুল রাখিলেই চলিতে পারিবে। এই শিক্ষার প্রথম পরীক্ষা অর্থাৎ (Entrance Examination) প্রবেশিকা পরীক্ষা একমাত্র কলেজিয়েট্ স্কুল হইতেই দিতে পারিবে—অন্যত্র হইতে নহে,এবং যতদূর সম্ভব কলেজের সহিত ইহার সমন্বয় রাখিতে হইবে। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর অন্যান্য উপাধী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, শিশুদিগের শৈশব প্রকৃতি দেখিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম করিবার শক্তি এবং পিতা মাতা বা অভিভাবকের উপযুক্তরূপ অর্থব্যয় করিবার শক্তি আছে কি না, এই সব বেশ উত্তমরূপে বুঝিয়া বালকের অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তানদিগকে উচ্চ শিক্ষার্থ এই সব কলেজিয়েট্ স্কুলে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। আর যে সব শিশু শৈশব হইতে রুগ্ন, মানসিক পরিশ্রম করিতে অসক্ত এবং যে সব অভিভাবকদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থব্যয় করিবার শক্তি নাই, যাঁহাদের বাসস্থান সহরে অথবা সহরের সন্নিকটে নহে, রীতিমত চরিত্রবান উপযুক্ত অভিভাবকদের নিকট স্ব স্ব সন্তানদিগকে রাখিবার কোনই উপায় নাই, সে সকল পিতা মাতা যেন উচ্চ শিক্ষার দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া, আপন আপন সন্তানদিগকে এই সব কলেজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া না দেন, ইহাই প্রার্থনা।

এই গেল এক শ্রেণীর শিক্ষা—যাহাকে আমরা উচ্চ শিক্ষা বলিলাম। এখন সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতেছি, এই সাধারণ শিক্ষা, প্রথমতঃ নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পর, আমার প্রস্তাবিত Industrial School এ কয়েক বৎসর পাঠান্তে, সমাপ্ত হইবে। এখন যেমন, জেলায় জেলায় জেলা স্কুল, স্থান বিশেষে হাইস্কুল এবং কোন কোন স্থানে ট্রেনিং স্কুল আছে, আমার প্রস্তাবানুসারে, এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি ভাঙ্গিয়া Industrial স্কুল গঠন করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রগণ সাহিত্য গণিতাদি বিবিধ বিষয়ের সহিত কৃষি, চিত্র, ভাস্কর ও দেশের উপযোগী নানাবিধ শিল্প কার্য্যাদি প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা করিতে পারে—তাহারই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এখন যেমন মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রগণ ট্রেনিং অথবা উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে, অতঃপর তাহাদিগকে আমাদের প্রস্তাবিত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি না করিয়া, এই সব Industrial স্কুলে ভর্ত্তি করাইতে হইবে। রীতিমত কয়েক সৎসর এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, আপন আপন ইচ্ছানুসারে, কেহ বা কৃষি কার্য্যে, কেহ বা চিত্রাদি ভাস্কর কার্য্যে, কেহ বা কোনরূপ শিল্পাদি কার্য্যে, কেহ বা জমিদারী কার্য্যে, কেহ বা এই সব নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে—যিনি যে বিষয়ে সুবিধা মনে করিবেন,—তিনি সেই সেই বিভাগে প্রবেশ করিয়া আপন আপন বিভাগের উন্নতি সাধন করিবেন এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম ও সত্য পথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভাবে এ দেশের লোক শিক্ষিত হইলে, দেশের অভাব, অভিযোগ এবং অর্থ কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হইবে,নহিলে,দেশের শিক্ষা শুধু উচ্চ শিক্ষায় সীমাবদ্ধ রাখিলে, দেশের উন্নতির আশা তো দূরের কথা, বরং দিন দিন দেশে হাহাকার উপস্থিত হইবে। এখন যেমন ভার্ণাকুলার-মাষ্টার সিপ্ (Vernacular Mastership) পরীক্ষা আছে, ভবিষ্যতে আমাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে হইলে, এই পরীক্ষার নামকরণ ইণ্ডাসট্রিয়াল মাষ্টারসিপ একজামিনেসন্ (Industrial Mastership Examination) করিতে হইবে এবং এতদিন যেমন তিনবৎসর (এখন দুই বৎসর) এই সব ট্রেনিং স্কুলে পাঠ করিয়া এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, অতঃপর তৎপরিবর্ত্তে অন্যূন সাত বৎসর পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সাহিত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সহিত কৃষি শিল্পাদি বিষয় বিশেষে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার পর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা (Diploma) পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কিণ্ডার-গার্টেন নিয়মানুসারে মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে যে ভাবে শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও সেই ভাবেই শিক্ষাদান কার্য্য চলিতে থাকিবে। তবে দুইটী বিষয়ের সংস্কার করিতে হইবে। প্রথম শিক্ষক নিয়োগের বিষয়। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। দ্বিতীয়, ম্যাক্‌মিলান ও লংম্যান্ কোম্পানি মহাপ্রভুদের প্রকাশিত বিবিধ ভ্রমপ্রমাদ-পরিপূর্ণ অপাঠ্য পুস্তকের

পরিবর্ত্তে, যাহাতে এদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রণীত সুপাঠ্য পুস্তকাবলী অধিক পরিমাণে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়, এ বিষয়ে ঘোর আন্দোলন করিতে হইবে এবং যাহাতে ইহার সম্যক্ সংস্কার হয়, প্রাণপাত করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে। এই সব মহাত্মাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী যেমন অদ্ভুত ভাষায় রচিত, তেমনই পত্রে পত্রে বিবিধ ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ। কিন্তু, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, একমাত্র হিতবাদী ভিন্ন অন্য কোন কাগজেই এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা দেখিতে পাইতেছি না। আমার বিশ্বাস যে, এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকামী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য সভার প্রথম-পথ-প্রদর্শক হওয়া কর্ত্তব্য, এবং যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে এই দুই সভা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। এদেশে যদি এই সব পুস্তক রচনায় লোকাভাব হইত, তবে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন, তাহা শোভা পাইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এদেশে পাঠ্য-পুস্তক-প্রণেতার অভাব নাই। কি ইতিহাস ভূগোল—কি বিজ্ঞান, কি গণিত, কি সাহিত্য,—বঙ্গে মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দ্বারায়ই যখন এ কার্য্য সুচারু রূপে চলিতে পারে, তখন কেন যে গবর্ণমেণ্ট কুপাঠ্য পুস্তক প্রচলন করিয়া দেশের এই সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বুঝিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের আপামর-সাধারণ এ বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। যে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার মূল ভিত্তি, সেই প্রাথমিক শিক্ষাই যদি কতকগুলি অসার পাঠ্য পুস্তকের ভিতর সীমাবদ্ধ হয়, তবে এদেশের ভবিষ্যতের শিক্ষা যে কেন বাহ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ না হইবে,—কেমন করিয়া বলিব? আশা করি, এখনও সময় থাকিতে দেশের যাঁহারা মুখপাত্র, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রথম এই পাঠ্য পুস্তক সংস্কারে মনোযোগী হইয়া এ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ও সাহিত্য-সভার সদস্যগণ এবং বাঙ্গালার প্রত্যেক মাসিক ও সাপ্তাহিক, ইংরেজী, বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগেরও বিশেষ মনোযোগী হইয়া এ বিষয়ে সংস্কার-প্রয়াসী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দশে মিলিয়া কার্য্য করিলে এ সংস্কার সাধনে কখনই বিফল-মনোরথ হইতে হইবে না।

আমরা দেখাইলাম যে, আমাদের দেশের শিক্ষা দুই ভাবে বিভক্ত করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। একশ্রেণী—উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষা, অন্য শ্রেণী—সাধারণ শিক্ষা। এই দুই শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে, উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যাহাতে খুব অল্প লোকে পায়; অথচ যাঁহারা এই শিক্ষা পাইবেন, তাঁহারা যাহাতে অতি উত্তমরূপে এই শিক্ষা পাইতে পারেন, তাহারই যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর অন্য শ্রেণীর শিক্ষা, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা, দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে এবং উত্তমরূপে পায় এবং সাহিত্য গণিতাদির সহিত কৃষি ও ইচ্ছানুযায়ী বিবিধ শিল্পাদি বিষয়ে সুশিক্ষা পাইয়া, পরে শিল্পাদির আশ্রয়ে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। এখন আমরা প্রথমে

উচ্চশিক্ষার পাঠ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা সুস্থ, শিক্ষার আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন করিতে যাহাদের অভিভাবকগণ সম্যক্ সমর্থ, যাহারা সহর বা সহরের সন্নিকট বাসী, তাহারাই এই শিক্ষার উপযোগী। ছাত্রদিগকে এই উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করাইবার কালে ছাত্রদের অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তানদিগের শৈশব প্রতিভা, বাল্যরুচি প্রভৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া, সেই সকল সন্তানদিগকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন। যাঁহারা আপন আপন সন্তানদিগের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বুঝিয়া এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন, তাঁহারা প্রথমে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় দুই চারিখানি ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম দুই খানি পুস্তক যত্ন সহকারে আপন আপন গৃহে পড়াইয়া কলেজিয়েট্ স্কুলে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। কলেজিয়েট্ স্কুলে প্রবেশ করিয়া, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী হইতে নবম বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত নয় বৎসর রীতিমত কলেজিয়েট্ স্কুলে অধ্যয়ন করাইবার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম (Entrance or Matriculation) পরীক্ষা দিবেন। তৎপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ছাত্রগণ আপন আপন রুচি ও অবস্থা অনুসারে, কেহবা আর্ট, কেহ বা বিজ্ঞান, কেহবা মেডিক্যাল, কেহ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবেন।

কলেজিয়েট্ স্কুলে যে নয় বৎসর অধ্যয়ন করার কথা বলিলাম, এই নয় বৎসর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম (Entrance or Matriculation) পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে আরও দুইটী পরীক্ষা প্রণালী রাখিতে হইবে। ইহার একটী First Standard Examination.—কলেজিয়েট্ স্কুলে প্রবেশ করিয়া প্রথম পাঁচ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার পর এই পরীক্ষা দিতে হইবে। অন্যটী Second Standard Examination,—এই পরীক্ষা কলেজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ ও সপ্তম বার্ষিক, এই দুই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া দিতে হইবে। এই Second Standard পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে ৮ম ও ৯ম বার্ষিক বার্ষিক শ্রেণীতে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা দিতে হইবে।

কলেজিয়েট স্কুলে যে নয় বৎসর পড়িতে হইবে, তাহার বিষয় সমূহ ও পুস্তকাদির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থানে দিব, এবং এই নিয়মানুসারে কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা প্রদান প্রবর্ত্তিত হইল, কলেজে শিক্ষার পথ বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অধিকতর সহজ ও সুগম হইবে। তবে এই স্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, যেমন মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলে, অথবা ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে নিয়ম আছে যে, বৎসর (Session) আরম্ভ হইবার প্রথমেই সকলকে ভর্ত্তি হইতে হইবে, কলেজিয়েট স্কুলেও ঠিক সেই নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে, বৎসরের প্রথমেই উচ্চ শিক্ষাভিলাষীদের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিবার পর নিম্নলিখিত নিয়মে অধ্যয়ন করিতে হইবে:—

প্রথম ষ্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষা বা First Standard Examination.

(ক) প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

এই শ্রেণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ও পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিতে হইবে।

প্রথম, ইংরেজি—সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা, ইংরেজি হিত্য (পদ্য ও গদ্য), ৺প্যারিচরণ সরকার ; Third book of Reading অথবা সদৃশ কোন পুস্তক। সরল ইংরেজি-করণ (Primer of English Gram-r) ও ইংরেজি অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র না।

তীয়, দ্বিতীয় ভাষা—সপ্তাহে ৯ ঘণ্টা। (এখানে শুধু বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের কথা বলিব।) বাঙ্গলা সাহিত্য—বিদ্যাসাগর-প্রণীত চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী বা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। একখানি বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ, ও বিদ্যাসাগর-প্রণীত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, সন্ধি পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়া ইংরেজি হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ ও বঙ্গভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা।

তৃতীয়, গণিত—সপ্তাহে ৪ঘণ্টা। ইংরেজী পাটীগণিত (Arithmetic) অমিশ্র চারি নিয়ম ও বিবিধ প্রশ্ন।

চতুর্থ, স্বাস্থ্যবিদ্যা—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বঙ্গভাষার প্রথম পুস্তক।

পঞ্চম, ড্রইং—সপ্তাহে দুই ঘণ্টা।

দ্বিতীয় বর্ষ।

প্রথম, ইংরেজি সাহিত্য ;—সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা। ৺প্যারিচরণ-কৃত Fourth book of Reading অথবা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। ১ম বর্ষের ন্যায় ইংরেজি ব্যাকরণ, ইংরেজি কম্পোজিসন (English composition), অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা।

দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ভাষা—সপ্তাহে ৯ ঘণ্টা। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত চারুপাঠ প্রথম ভাগ বা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। বাঙ্গলা কবিতা পুস্তক। উপক্রমণিকা ব্যাকরণ (শব্দরূপ) এবং প্রথম বার্ষিকের ন্যায় ইংরেজি হইতে বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গলা সরল রচনা।

তৃতীয়, গণিত—সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা। প্রথম বার্ষিকের ন্যায় পাটীগণিত, মিশ্রচারি নিয়ম, গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ ও বিবিধ প্রশ্ন।

চতুর্থ, স্বাস্থ্যবিদ্যা—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ন্যায়।

পঞ্চম, ড্রইং—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ন্যায়।

তৃতীয় বর্ষ।

প্রথম, ইংরেজি—সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা। ৺প্যারিচরণ সরকার-কৃত Fifth book of Reading অথবা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। ইংরেজি ব্যাকরণ (English Grammar ও কম্পোজিসন্ (English composition) অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা।

দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ভাষা—সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ অথবা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। কবিতা পুস্তক। ব্যাকরণ—উপক্রমণিকা (সম্পূর্ণ, সহ দেবনাগর বর্ণপরিচয় ও পাঠ।) অনুবাদ ও রচনা।

তৃতীয়, গণিত—সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা। ইংরেজি পাটীগণিত (Arithmetic) ভগ্নাংশ চারি নিয়ম, বিবিধ প্রশ্ন, দশমিক ভগ্নাংশ।

চতুর্থ, স্বাস্থ্যবিদ্যা—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বঙ্গভাষায় কোন গ্রন্থ।

পঞ্চম, ড্রইং—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা।

ষষ্ঠ, ভূগোল—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা। ইংরেজি ভূগোল (Geography) Blockman কৃত প্রথম ভূগোল বা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষ।

(First Standard Examination)

(দুই বর্ষে একই পাঠ্য।)

প্রথম, ইংরেজি—সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা। লেথব্রিজ্ (Lethbridge) কৃত Easy selection from modern English Literature বা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ।

Rowe and Webb কৃত Elementary English Grammar অথবা D.N. Basu, G. C. Basu প্রভৃতি প্রণীত Middle English Grammar'এর ন্যায় কোন এক খানি গ্রন্থ। English composition। অনুবাদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা ও চিঠি পত্রাদি লেখা।

দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ভাষা—সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা। সংস্কৃত ঋজুপাঠ ১ম ভাগ বা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। ব্যাকরণ-কৌমুদী ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ (সম্পূর্ণ)। সীতার বনবাস বা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। বাঙ্গলা কবিতা পুস্তক। অনুবাদ ও বাঙ্গলা রচনা।

তৃতীয়, গণিত—সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা। ইংরেজি পাটীগণিত (Arithmetic) সাঙ্কেতিক, ত্রৈরাশিক,বহুরাশিক,বিবিধ প্রশ্ন। ব্যবহারিক জ্যামিতি, পরিমিতি (Practical Geometry and Mensuration)

চতুর্থ, স্বাস্থ্যরক্ষা অথবা ড্রইং—সপ্তাহে ২ঘণ্টা।

পঞ্চম, ইতিহাস ভূগোল—সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস অথবা তৎসদৃশ ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গালার ইতিহাস। ভূগোল (Geography) তৃতীয় বার্ষিকের ন্যায় কোন গ্রন্থ, (সম্পূর্ণ।)।

First standard Examination এর ৪র্থ ও ৫ম বার্ষিক শ্রেণীতে স্বাস্থ্য বিদ্যা অথবা ড্রইং (Drawing).—উভয়ের একটা লইতে হইবে।

দ্বিতীয় ষ্টাণ্ডার্ড বা (Second Standard Examination) ৬ষ্ট ও ৭ম বার্ষিক শ্রেণী।

প্রথম,—ইংরেজি। সপ্তাহে ৯ ঘণ্টা। ইংরেজি সাহিত্য-গদ্য ও পদ্য (Lethbridge's selection from Modern English Literature অথবা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ।

Hints on the study of English by Rowe and Webb. Higher English Composition by Gangadhar Banerji অথবা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। ইংরেজি অনুবাদ, চিঠি পত্রাদি লেখা ও ইংরেজি রচনা।

দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ভাষা—সপ্তাহে ৭ ঘণ্টা।

(ক) সংস্কৃত—বিদ্যাসাগর-কৃত ব্যাকরণ-কৌমুদী ৪র্থ ভাগ (সম্পূর্ণ)। ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ বা তৎসদৃশ কোন গ্রন্থ। ইংরেজি হইতে সংস্কৃত, সংস্কৃত হইতে ইংরেজি, ইংরেজি হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনা।

অথবা—(খ) বাঙ্গলা-সাহিত্য—কাদম্বরী, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতির ন্যায় কোন গ্রন্থ। হেম, নবীন ব মধুসূদন প্রভৃতি বাঙ্গলার বড় বড় কবিদের প্রণীত কোন উপযুক্ত কাব্য।

ইংরেজী হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ ও বাঙ্গলা রচনা।

তৃতীয়, গণিত—সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা। ইংরেজি বীজগণিত(Algebra) সাধারণ ভগ্নাংশ চারি নিয়ম, লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ এবং উৎপাদক ও বর্গমূল। ইংরেজি পাটীগণিত (Arithmetic) সম্পূর্ণ (ঘনমূল ও ঘাত বাদ।) Euclid's Elements of Geometry—১ম ও ২য় অধ্যায় অনুশীলনী সহিত। ইংরেজি পরিমিতি (Mensuration)।

চতুর্থ, ইতিহাস ও ভূগোল—সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত History of India or তৎ সদৃশ কোন গ্রন্থ। প্রাকৃতিক

ভূগোল (Primer of Physical Geography) ও সাধারণ ভূগোল (General Geography)।

পঞ্চম, স্বাস্থ্যবিদ্যা অথবা ড্রইং (Drawing) সপ্তাহে ২ ঘণ্টা।

দ্বিতীয় ষ্টাণ্ডার্ড (Second Standard Examination) পরীক্ষায় স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক বঙ্গ ভাষায় পড়াইতে হইবে।

এই দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরে, Entrance or Matricluation পরীক্ষা দিতে পারিবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রথম (Entrance or Matriculation) পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উত্তমরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া Entrance অথবা Matriculation পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কেহ বা সাধারণ পথে (General Line) কেহ বা মেডিক্যাল কলেজে, অপরে কেহবা ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে, তাহারই উপায় করিয়া দিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালে যে ভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা চলিয়া আসিতেছে, তাহার সংস্কার করিয়া নিম্নলিখিত মতে পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

পাঠ্য-বিষয়।

প্রথম, ইংরেজি সাহিত্য—ইংরেজি সাহিত্যে ৩খানি প্রশ্ন পত্র করিতে হইবে। একখানি ইংরেজি পদ্য (English poetry), একখানি ইংরেজি গদ্য (English prose), ও একখানি ইংরেজি ভাষা ও প্রবন্ধ (English Language, composition, essay ও Letter writing) বিষয়ক। প্রথম দুইখানি প্রশ্ন পত্রের মধ্যে ইংরেজি ব্যাকরণের প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট হইবে। পাঠ্য পুস্তক ঃ বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা উচ্চদরের এবং প্রস্তাবিত Second Standard Examination এর পাঠ্য পুস্তকের পর যথোপযুক্ত পুস্তক।

দ্বিতীয়,—দ্বিতীয় ভাষা—সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী, পারসী প্রভৃতি বিবিধ ভাষার একটা ভাষা। ইহারও তিনখানি প্রশ্নপত্র করিতে হইবে, ১মখানি পদ্য, ২য়খানি গদ্য, ৩য় খানি অনুবাদ রচনা প্রভৃতি।

(ক) সংস্কৃত পদ্য ভট্টিকাব্য, গদ্য বিষ্ণুপুরাণ বা দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা প্রভৃতির ন্যায় কোন গ্রন্থ। সংস্কৃত ব্যাকরণ-কৌমুদী কয়েক ভাগের বিশেষ আলোচনা ও মুগ্ধবোধের বা সিদ্ধান্ত কৌমুদীর বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ।

(খ) বাঙ্গালা-সাহিত্য—উচ্চদরের বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ।

(অন্যান্য বিষয়গুলি যথোপযুক্ত
নির্দ্দিষ্ট হইবে।)

তৃতীয়, গণিত।—পাটীগণিত (সম্পূর্ণ), বীজগণিত, ইউক্লিড ১—৪ অধ্যায়, সরল ত্রিকোণমিতি।

চতুর্থ, ১। (ক) ইতিহাস—History of India, History of England. অথবা

(খ) স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—ইংরেজী ভাষায় লিখিত স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক।

২। (ক) ভূগোল General Geography, Physical Geography, Astronomical Geography. অথবা—

(খ) ন্যায় ও অর্থনীতি, A primer of Logic, A primer of Political Economy অথবা—

(১) ড্রইং (Drawing),

পঞ্চম বিজ্ঞান (ক)—Physics অথবা Botany.

(গ) Chemistry.

Entrance অথবা Matriculation পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা Medical college অথবা Engineering college এ প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সংস্কৃত আরবী প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি কোন একটা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপ গ্রহণ করিতে এবং ইতিহাসের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ভূগোল ও ন্যায়ের পরিবর্ত্তে ড্রইং (Drawing) লইতে পারিবেন।

এমনই ভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর কলেজে প্রবেশাধিকার পাইবেন।

এখন.এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে কয় বৎসরের দরকার, সেটা একবার ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আজি কালিকার দিনে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরে ছেলেদের হাতে খড়ি দেওয়া হয়। হাতে খড়ির পর, গৃহে দুই চারি খানি ইংরেজি বাঙ্গালা বহি পড়িতে প্রায় তিন বৎসর ধরিলাম,—মোটামুটি নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করিলে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে। বি-এ পাস করিতে চারি বৎসর এবং এম,এ, পাস করিতে দেড় বৎসর, মোট তেইশ বৎসরের দরকার, সুতরাং সরকারী চাকুরী পাইতে কোনই গোল থাকিল না। তবে অধিক প্রতিভাশালী ছাত্রেরা ইহার কম বয়সেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

তার পর, এখন কলেজের অধ্যাপনার বিষয় আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিব। কালেজে এখন যে ভাবে পড়াশুনা হইতেছে, সেই ভাবেই চলিবে, তবে পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। এই সংস্কারের পূর্ব্বে বর্ত্তমান বি-এ, ও B-sc.-পরীক্ষা-প্রণালীর ন্যায় এফ-এ,-পরীক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া Licentiate of Art এবং Licentiate of science—এই দুইটী পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর যাঁহারা Licentiate of Art পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা বি-এ, আর যাঁহারা Licentiate of science পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা B. s.c. পরীক্ষা দিবেন,—এই নিয়ম করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার এই প্রস্তাবে অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ঠিক Entrance বা Matriculation পরীক্ষা পাসের পর বিজ্ঞানের বড় বড় পুস্তক পাঠ সহজসাধ্য নহে এবং তাহা হইবে না। কিন্তু ইহাও মনে করা উচিত যে, একেবার বিজ্ঞানের বড় বড় পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে, সেই সেই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সরল সরল পুস্তক পাঠ করিয়া বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় কতকটা জ্ঞান লাভ করিলে পর, পরে বড় বড় পুস্তক পড়িতে কোনই ক্লেশ হইবে না। এ স্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এফ-এ পরীক্ষায় বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা Biology, Geology, Botany প্রভৃতি বিষয়ের কোন ধারই ধারিলেন না, এফ এ পাসের পর হঠাৎ বি-এ,অথবা B. Sc. পরীক্ষা দিতে যাইয়া এই সব অপঠিত বিষয়ের ভাব গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে কতটা কঠিন, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। তারপর,

আমাদের প্রস্তাবানুসারে প্রবেশিকা পরীক্ষা-পদ্ধতি সংস্কার করিলে, আর বিশেষ কোনই কষ্ট থাকিবে না; কেন না, প্রস্তাবিত Entrance বা Matriculation examination বর্ত্তমান পরীক্ষা অপেক্ষা অনেকটা কঠিন হইবে এবং উচ্চদরের ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার নিয়ম করিলে ইংরেজি ভাষাতেও একালের অপেক্ষা অনেকটা অধিক জ্ঞান জন্মিবে। তারপর Licentiate of art ও Licentiate of science পরীক্ষা দুইটীও বি-এ, ও B. Sc. পরীক্ষার মত হইলে অধীত বিষয় কমিয়া শুধু তিনটী বিষয়ে পরিণত হইবে, তখন এইরূপ ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং আমার যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে ছাত্ররাও নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া অধ্যয়নে সম্যক্ ফললাভ করিতে পারিবেন।

এখন এই দুইটী পরীক্ষা,—Licentiate of Art এবং বি-এ পরীক্ষার সংস্কৃত অধ্যাপনার বিষয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং তাহাতে দেখাইয়াছি যে, প্রস্তাবিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্য বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা একটু উচ্চদরের হইবে এবং ছাত্রেরা যাহাতে শুধু অনুবাদ ও স্মৃতি শক্তির সাহায্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া সংস্কৃত ভাষায় রীতি মত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহারই বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে হারে সংস্কৃত শিক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি হইল, সেই হারে Licentiate of Art ও বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের মাত্রা বর্ত্তমান কাল হইতে কতকটা বাড়াইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃতের পরীক্ষা প্রণালীর সম্যক সংস্কার করিতে হইবে। আমার প্রস্তাবানুসারে Licentiate of Art পরীক্ষার বিষয় বর্ত্তমান এফ-এ, পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঁচটী বিষয়ের পরিবর্ত্তে মোটে তিনটী মাত্র বিষয় (বর্ত্তমান বি-এ পরীক্ষার মত) হইবে, সুতরাং বর্ত্তমান কালাপেক্ষা ঐ দুই পরীক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষা যাহাতে অধিক উচ্চদরের হয়, তাহারই নিয়ম করিতে হইবে। এবং সেই চেষ্টার ফলে Licentiate of art পরীক্ষায় রঘু নৈষধাদি কাব্য, দুই এক খানি পদ্যগ্রন্থ ও নাটক এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চ্চা অধিক পরিমাণে রাখিতে হইবে। এইভাবে এল-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইলে, বি-এ পরীক্ষায় সেই চর্চ্চা আরও বেশী করিতে পারা যাইবে। এবং বর্ত্তমান কালের ন্যায় বি-এ, পরীক্ষায় Honour কোর্সে সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ রহিত করিয়া শুধু pass কোর্সে কাব্য নাটক অলঙ্কার শাস্ত্রাদির সীমাবদ্ধ করিয়া, Honour কোর্সে স্মৃতি, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের কোন একটা বিষয় গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে এল-এ ও বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের আলোচনা বৃদ্ধি পাইলে, আশা করা যায় যে, আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিতদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা দিন দিন বৃদ্ধি হইবে, এবং সংস্কৃত ভাষার অত্যধিক আলোচনার সহিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা এবং উন্নতি যে দিন দিন বেশী হইবে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

বিশ্বামিত্র।

তুচ্ছ করি ক্ষত্রবল, সম্পদ-গৌরব,
লভিবারে সযতনে ব্রাহ্মণ্য-বিভব,
বসিলেন বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায়
বিজনে পুষ্কর তীর্থে। বিস্বাদ কষায়
কটুঃতিক্ত ফল মূল পানীয় সেবন
করিয়া করেন অতি কঠোর সাধন।
টলিল কনকাসন স্বর্গে দেবতার,
হইল ইন্দ্রের প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার।

নিভৃতি দেবেন্দ্র ডাকি কহেন রম্ভারে,—
"হে রূপসী দেবদাসী, বিবিধ সম্ভারে
সাজাইয়া বরতনু, সাজিয়া মোহিনী,
নরলোকে একবার যাও সুহাসিনী।
যাও যথা মরুক্ষেত্রে পুষ্করেব তীরে
তপোরত বিশ্বামিত্র। হেরিলে তোমারে
তপস্যা রক্ষিতে পারে, কে আছে এমন?
রূপমুগ্ধ দেবগণ ত্রিদিবে যখন?"

হাসিয়া নয়নবাণ নিক্ষেপি সুন্দরী
নমি দেবেন্দ্রের পায় কহিল, "কিঙ্করী,
তপোভঙ্গব্রতে আছে নিয়ত নিযুতা;
কর তারে আশীর্ব্বাদ।" "হও সিদ্ধিযুতা"
কহিলেন দেবরাজ। অবতরি ধীরে,
গেল রম্ভা নরলোকে পুষ্করের তীরে।
দেখিল সে বিশ্বামিত্রে মগ্ন মহাধ্যানে,
স্থাণু যেন অচঞ্চল অচল আসনে।

সযতনে অযতন সৃজিয়া সুন্দরী,
এলাইয়া দিল তার মোহন কবরী,
ত্রস্ত করি বক্ষপুটে কৌষিক অঞ্চল,
দাঁড়াইল পুরোভাগে। তবুও চঞ্চল
হে তপস্বীর ধ্যান। তখন সে বালা,
করিতে তপস্বীচিত্ত প্রেমেতে উতলা,
নব নব হাব্ ভাব কত না সৃজিল,
আপনি খুলিয়া নীবী আপনি বাঁধিল।

স্থিরনেত্রে বিশ্বামিত্র নিরখিয়া তারে
কহিলা,—"পাপিনী তুই এসেছিস্ মোরে
ভুলাতে কৃত্রিম প্রেমে অকরুণ প্রাণে;
প্রাণসম অঙ্গ তোর গড়িব পাষাণে।
রহিবি পাষাণী হয়ে, এই তীর্থ কূলে।
জড়সমা জড় প্রাণে স্বর্গ-সুখ ভুলে।"
পাষাণী হইয়া রম্ভা রহিল সে শাপে।
সে উগ্র তপস্যা হেরি ত্রিভুবন কাঁপে।

আপনি আসিয়া ব্রহ্মা, দিয়া দরশন,
কহিলেন,—"বিশ্বামিত্র! সফল সাধন
হইল তোমার আজি; যাও গো সংসারে;
প্রখ্যাত রাজর্ষি আমি করিনু তোমারে।"
প্রণমি ব্রহ্মার পায় বিশ্বামিত্র কহে,—
"এ সিদ্ধি লভিতে দেব, মোর ব্রত নহে।"
স্বরগে গেলেন ব্রহ্মা; নীরবে আবার
বিশ্বামিত্র মহাধ্যানে ভুলিল সংসার।

আবার টলিল স্বর্গে ইন্দ্রের আসন।
ডাকি মেনকায় দেব কহেন তখন,—
"বিশ্বামিত্র তপোরত পুষ্করের তীরে;
করি তার ধ্যান ভঙ্গ এস তুমি ফিরে।"
শিরে ধরি আজ্ঞা তাঁর মেনকা সুন্দরী,
স্বর্গ হতে নরলোকে আসিয়া উতরি,
হেরিল ধরার শোভা নব মধু মাসে;
হেরিল রাজর্ষি মূর্ত্তি পুষ্কর প্রদেশে।

"এমন অনিন্দ্যরূপ!" ভাবে সুরনারী—
"কেমনে করিব ছি ছি ছলনা চাতুরী?

এত যে সুন্দর ধরা জানিনিত আগে।
হেথাকার সুখ দুঃখ বড় ভাল লাগে।
দুঃখ শূন্য উপভোগে সুখ কোথা হায়?
তাপশূন্য দেহে তৃপ্তি কোথায় ছায়ায়?
বিচিত্র চঞ্চলরূপে সজ্জিতা ধরণী;
সুস্থির ত্রিদশ শোভা বিষসম গণি।”

মানবীর আশা বুকে পূরিয়া মেনকা,
পুষ্করে কলসীকক্ষে নিত্য যায় একা।
অনুরাগে ব্রীড়া ভরে হেরি তপস্বীরে,
ফিরে ফিরে দেখে যায়, ঘরে যায় ফিরে।
যুবতীর লাজমাখা অনুরাগ দিঠি
কাটিল তপস্যাবন্ধ। ঋষি ভূমে লুটি
ধ্যান করে প্রমদার সুন্দর বদন,
ভুলিয়া বিপুল সিদ্ধি, ব্রাহ্মণত্ব ধন।

মেনকারে লয়ে ঋষি রহিলা কুটীরে;
বসন্ত শরৎ বর্ষা এল ফিরে ফিরে।
তারপর একদিন পূর্ণ মধু মাসে
জনমিল কন্যা রত্ন। চমকি তরাসে
চাহিলেন ঋষিবর; ভাবিলেন, “হায়,
কোথা মোর ব্রাহ্মণত্ব, তপস্যা কোথায়?”
বিশ্বামিত্রে অনুতপ্ত হেরি বরনারী
সভয়ে কম্পিত হৃদে গেল সুরপুরী।

তপস্যায় বহুদিন আবার অতীত।
কিন্তু সে মায়ার স্বপ্নে হৃদয় ব্যথিত।
কভু ঋষি ব্রাহ্মণত্ব চাহে দেবতায়,
কভু প্রাণ ভরে যায় প্রেমের চিন্তায়;
কভু বা কাঁদিয়া কহে; “ব্রহ্ম সনাতন,
একবার দেখিব সে দুহিতা রতন।”
পাইলে পরের শিশু কোলে নিয়ে ঋষি,
করিত আদর কত কুটীরেতে বসি।

ব্রাহ্মণত্ব ঋষিত্বের সংকল্প কঠোর
ভুলিলেন বিশ্বামিত্র; একি মায়া ঘোর!
আসিত পুষ্কর তীর্থে অনাথিনী যত,
তাদের সেবায় ঋষি হইলেন রত।
আর বার ব্রহ্মা আসি দিয়ে দরশন,
কহিলেন, “বিশ্বামিত্র, সফল সাধন
হইল তোমার আজি; যাওগো সংসারে;
ব্রাহ্মণত্ব আজি আমি দিলাম তোমারে।”

“নহি উপযুক্ত আমি, দেব দয়াময়,
লভিবারে ব্রাহ্মণত্ব; আমার হৃদয়
স্নেহ প্রেম বিজড়িত।” কহিলেন ঋষি।
কহিলেন ব্রহ্মা তাঁরে, সাদরে আশ্বাসি,
“স্নেহহীন নির্ম্মমতা ব্রাহ্মণত্ব নহে।
জানি, যে সন্তাপে সদা তব চিত্ত দহে।
সে সন্তাপ নাহি যার, সে নহে ব্রাহ্মণ।
স্নেহময় লোকহিতে হও নিমগন।”

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীমদ্দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর।*

শ্রীপাঠ

সপ্তগ্রাম

গোহাটি নগরের সুধিবর শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় (পত্রী দ্বারা) নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং নব্যভারত মাসিক পত্রিকায় উত্তর প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন এই;—

> “মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
> সর্ব্বভাবে সেবে, নিত্যানন্দের চরণ॥”
>
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

---

* ভক্তিনিধি মহাশয়ের জীবিত কালে এই প্রবন্ধটী আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, স্থানাভাব বশতঃ এতদিন প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত আছি। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় ইহা প্রকাশ করিলাম। ন, স,।

(১) ইনি কে? কোন্ বংশ, তার প্রমাণ কি?

(২) শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশ্বরাংশ, কি ভক্ত, কি পূর্ণ, তাহার প্রমাণ।

(৩) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ একবস্তু কি ভিন্ন ভিন্ন?

(৪) শ্রীনিত্যানন্দ, অবধূত হইয়া, পশ্চাৎ গৃহী হইবার কি কারণ?

(৫) তিনি কি শূদ্রের পাক অন্ন গ্রহণ করিতেন?

(৬) সর্ব্বভাবে সেবা, ইহার অর্থ কি?

(৭) সপ্তগ্রাম এবং অম্বুয়া মুলুক কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

ভক্তিশাস্ত্র বৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকায়,—

"শ্রীদামশ্চ, সুদামশ্চ, সুবলশ্চ, মহাবল।
সুবাহু, ভদ্রসেনশ্চ, স্তোককৃষ্ণ, সুরামোকৌ,
লবঙ্গস্য, মহাবাহু, গন্ধর্ব্ব্য, বীরবাহুকৌ।"

শ্রীকৃষ্ণাবতারে ব্রজভূমে এই যে দ্বাদশ গোপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন; তন্মধ্যে "সুবাহু যোঁ ব্রজে গোপা দত্ত উদ্ধারণাখ্যক" অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গবতারে তিনিই উদ্ধারণ দত্ত নামে বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার হইবার কিছু পূর্ব্বে এবং শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর ১৪০৩ শকে এই মহাত্মা;—

"প্রদ্যুম্ন নগরাৎ যাম্যা, সরস্বত্যা স্তথোত্তরে,
তদ্দিক্ষণঃ প্রয়াগস্তু, গঙ্গাতো যমুনা গতা;
ত্রিবেণীতি সমাক্ষ্যাতা, ধর্ম্ম কামার্থদায়িনী॥"
(মহাভারত)

অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মুক্ত বেণীর স্থান পুণ্যতীর্থ—ত্রিবেণী তীরবর্ত্তী সপ্ত গ্রামাখ্যা বৈশ্যাবতংশে "সুবর্ণ বণিক কুলে" জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম ভদ্রাবতী, ও পুত্রের নাম শ্রীনিবাস, উপাধি দত্ত, ও শাণ্ডিল্য গোত্র। তাহার প্রমাণ এই—

তাঁহার এক সঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর এবং কীর্ত্তনিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক এবং সুকবি শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর "যিনি পূর্ব্ব যুগে" শ্রীকৃষ্ণের গন্ধর্ব্ব নামে সখা ছিলেন, তিনি নিজ গাথায় লিখিয়াছেন;—

"শ্রীকর নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাতঃ।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত॥
শাণ্ডিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর, সুবর্ণ বণিক খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণ পদ, ধ্যায় নিরন্তর, বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি॥
বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য, মলগ্রাম ত্যাজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাচারী॥
লীলাচল পুরে, প্রভু মিলিবারে, সদা ইতিউতি ধায়।
আশাঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়া, প্রসাদ যাচিয়া খায়॥
প্রভুভক্তগণ, পাই নিজ জন, রাখিল যতন করি।
এ দাস মুকুন্দ, পরম আনন্দ, দত্তের দৈন্যতা হেরি॥"
পদ-সমুদ্র, ৩০৪১।

ইনি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত যে সময়ে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রকট হইয়াছিলেন, সে সময়টী অতি চমৎকার। তৎসময়ে বঙ্গদেশ দেব-দুর্লভ স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রে শ্রীহরি সাধনের যেরূপ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতীব কঠোর এবং বহুকাল সাধ্য। কিন্তু কলিকালে, জীবের পরমায়ু অতি অল্প পরিমিত, অথচ এই অল্প কালের মধ্যে মানব জীবনের কর্ত্তব্য সকল সমাধান করিতে হইবে, এই নিমিত্তই সেই সর্ব্ব-দেবাত্মক শ্রীচৈতন্য দেব শ্রীনবদ্বীপধামে উদিত হইয়া একমাত্র মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ, যজ্ঞ, তপস্যা, সম, দম, দান, ইত্যাদি দ্বারা যে পরম রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া বৃথাবোধ করিয়াছিলেন, মোক্ষানুসন্ধান বিফল হইয়াছিল, প্রণব গায়ত্রী দ্বারা উপাস্যের সন্তোষ সাধনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সংসারের উন্নতি সাধন ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদন সমালোচনায় তাঁহাদের বিশুদ্ধ হৃদয় শুষ্ক হইয়াছিল, ভগবান শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীপদ্মাবতীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, ভারতে যে নাম সম্যক প্রকারে কথন স্ফুরিত হয় নাই, সেই হরিনাম পরমার্থ তত্ত্বের অমূল্য রতন অকাতরে অবলীলাক্রমে সর্ব্বজীবে সমানভাবে বিতরণ করিয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র ভেদ করেন নাই।

ব্রজধামের রসাস্বাদনে, কীর্ত্তনের সারতত্ত্বে এবং সমস্ত রসাশ্রিত প্রেমাকৃষ্ট হরি নামে পরমার্থ তত্ত্বের সহজ পন্থা উদ্ঘাটন করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে পরমেশ্বরের প্রীতিস্রোতে ভাসাইয়া স্বর্গসম পরমানন্দ ধাম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আদিকালে সরস্বতী তীরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, মধ্যকালে বদরিকাশ্রমে পল্লবিত হইয়াছিল, এবং তৎপরবর্ত্তী কালে নৈমিষারণ্যে মুকুলিত হইয়াছিল, তাহা এই শেষকালে, অর্থাৎ কলিকালে, শ্রীনবদ্বীপ ধামে ফলবান ছায়া-বিশিষ্ট প্রবল বৃক্ষে পরিণত হইয়া একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয়ের স্থল হয়।

কি কঠোর তপস্যারত যোগিগণ, কি সরল বিশ্বাসী সাংসারিকগণ, এই হরিনামে সকলেরই সমান অধিকার। এ নাম লইতে ব্যক্তি বা জাতি বিচার নাই। সাধনের এমন সহজ এবং অনায়াস-লভ্য উপায়ও আর দ্বিতীয় নাই।

কেবল সরল বিশ্বাসী হইয়া যে ব্যক্তি একান্ত-মনে এই নাম সংকীর্ত্তনরূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি দয়াল নামের গুণে আয়াস-সাধ্য কঠোর তপস্যাজনিত বিমলানন্দ উপভোগের অধিকারী হইতে পারেন।

এই কারণেই তৎসময়ে শ্রীদত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর দারা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন হীন কাঙ্গাল বেশে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত সেব্য সেবক ভাব অবলম্বন দ্বারা, চিরজীবন তাঁহাদের পদ যুগলের সেবাকেই আপনার নশ্বর জীবনের সার্থকতা বলিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তদীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ভক্তদিক্‌দর্শিনীতে লিখিত আছে ;—

তিনি, ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ৬ বৎসর নীলাচলে, এবং ৬ বৎসর শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে অর্থাৎ ১৪৫৩ শকের মার্গ শীর্ষ মাসে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী দিবসে স্বকাম পূর্ণ এবং সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নশ্বর-দেহ ঈশ্বরে সমর্পণ করতঃ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দিন আমাদের শোকের দিন বলিয়া প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে তদোদ্দেশে পিতৃকৃত্য এবং মহোৎসব করিতে হয়।

শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবটের নিকট [illegible] তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থ কি পদ পদাবলী নাই। পরন্তু তিনি অধ্যয়নের নিমিত্ত বহুবিধ গ্রন্থ ও নানাশাস্ত্র ও

পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। তিনি ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ আর হরিনাম সংখ্যা করিতেন। শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রীহরি নামেই তাঁহার গাঢ় ভক্তি ও তদ্গত চিত্ততা ছিল। এই মহাপুরুষের আদি নাম "শ্রীভবেশ দত্ত"। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অযোধ্যা প্রদেশে বাস করিতেন।

ঐ ভবেশ দত্ত মহাশয় ৯৭৫ শকে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বাণিজ্যহেতু আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী সুবর্ণগ্রামে বাস ও তত্রস্থ বৈশকুল-সম্ভূত, শ্রীকাঞ্জিলাল ধরের ভগ্নী শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সনক আঢ্য মহাশয় ঐ আদিশূরের সময়ে ব্রহ্মপুত্র তট বহু বাণিজ্যের স্থল বলিয়া অযোধ্যা হইতে ;—

"দে দত্তশ্চন্দ্র আঢ্যশ্চ, শিলঃ সিংহো ধরস্তথা।
বড়ালঃ পালো নাগস্তু, মল্লিকো নন্দী বর্দ্ধনঃ
দাসো, লাহা, তথা সেনঃ ষোড়শখ্যাতিরুত্তমা॥"

এই ১৬ ঘর প্রধান ও তাহাদের অনুগত অপর ৩০ ঘর অপ্রধান বৈশ্য সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপুত্র তটে বসতি করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পবিত্র-সলিলা সরযূ-প্রবাহিতা প্রদেশবাসী সমস্ত এই জাতিদিগকে "বয়েশ বলিয়া" কেহ কেহ কনক ক্ষত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বয়েশ শব্দটী বৈশ্য শব্দের অপভ্রংশ। এই জাতির বাণিজ্য প্রভাবে যখন সেই নগরী উন্নতির চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন কুবের তুল্য ধনবান বৈশ্য কুশলচন্দ্র আঢ্যের সনক, সনাতন, ও সনৎকুমার নামে তিন পুত্র হয়; তাহাদিগকে তিনি বাণিজ্য বিভাগ করিয়া দেন, যথা ;—

"জাতা স্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রাঃ
বাণিজ্যকারী সনকস্য হেম্নঃ।
আসীন্মুনে তেষু সনাতনো বৈ,
গন্ধাদিসত্ত্বস্য সনৎকুমারঃ॥" কুলজী।*

অর্থাৎ কুশলের ঐ পুত্রত্রয়ের মধ্যে সনক কনক-ব্যবসায়ী, সনাতন মণি-ব্যবসায়ী ও সনৎকুমার গন্ধাদি ব্যবসায়ী ছিলেন। কনক-ব্যবসায় প্রযুক্ত সনক কনকক্ষত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা অনেকের এরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, কনক ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় শব্দ এস্থলে জাতিবাচক নহে। তজ্জন্য কুলাচার্য্যগণ এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যথা ;—

"পূর্ব্বস্মিন্ কালে এতেষাং সুবর্ণবণিজামাদিপুরুষঃ বরেণ্যঃ সর্ব্বগুণাকরঃ সনকনামা কনকক্ষত্রিয় এক আসীৎ। কনকস্য ক্ষেত্রং বিদ্যতে যস্য স তথা কৃষকস্য ক্ষেত্রকার্যাদিনা ক্ষেত্রিসজ্ঞা, তথা হিরণ্যরূপব্যবহারেণ কনকক্ষেত্রীতি সজ্ঞা।

বণিক্ শব্দে যে বৈশ্য, অভিধানে তা প্রকাশ আছে, যথা ;—

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বণিজো বণিক্।"

রাজনির্ঘণ্টে অমরে,—

"বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকো পণিজো বণিক্।।"

ব্যবসা সম্বন্ধে বেদবেত্তা মুণিগণ বলেন ;—

যথা, মনুবচনম্।

(১) "পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যযনমেবচ,
বণিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ। ১।৯০
"মণি মুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্যচ,
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্। ৯।৩২৯
"শস্ত্রাস্ত্রভৃত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশু কৃষির্বিশঃ
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ।১০।৭৯।

পরাশরোক্তম,—

(২) লৌহকর্ম্ম তথারত্নগবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যংকৃষি কর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা। ৬০

হারীতবচনম্,—

(৩) "গো রক্ষা কৃষি বাণিজ্যান্ কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।

গারুড়োক্তম্ :—

(৪) "দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।"

পদ্মপুরাণোক্তম,—

(৫) পালয়েচ্চ পশূন্ বৈশ্যঃ পিতৃবৎ ধর্ম্মমজ্জনম্।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়,—

(৬) "কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।"

শ্রীমদ্ভাগবতে,—

(৭) "কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্চতে।"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

(৮) "ইজ্যাধ্যয়নদানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্যচ।
প্রতিগ্রহাদিকং বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা॥
প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম, প্রজানাং পরিপালনম্।
কুসীদং কৃষিবাণিজ্যং পশুপাল্যং বিশঃস্মৃতম্॥

সামবেদে,—

(৯) "বিশো বিশো যো অতিথিং বাজয়ন্ত পুরুপ্রিয়ম্।

(১০) "বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহঃ।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণং॥

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বৈশ্য অর্থাৎ বণিকগণ মণি মাণিক্যাদি ব্যবসা করিয়া থাকেন। এখনও করিতেছেন। সঙ্কর জাতির সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বৈশ্যাচারধর্ম্ম পালনেই ইহারা অনুরক্ত, এবং সদাচারী। ইহাদের ধর্ম্ম দান, যজ্ঞ, ব্রত, এবং পুত্রাদি জননে দশবিধ সংস্কার ও উপবীত ধারণাদি।

ঈশ্বরের নানা অবতারের পর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত সময়ে বঙ্গদেশ, মগধরাজ্য হইতে পৃথক হইয়া, একটী স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে রাজা আদিশূর স্বধর্ম্মানুরক্ত অর্থাৎ বৈদিকাচারী ছিলেন। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ সমস্ত ভারত বিপ্লবিত করিয়া তৎকালে কথঞ্চিৎ স্তিমিত-তেজ হইলে, সনক জন্মভূমি অর্থাৎ অযোধ্যার মায়া একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া বৈদিক ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূরের শরণাপন্ন হইয়া কথিত ব্রহ্মপুত্র তটে বসতি করিয়াছিলেন, তাহার কারণ নিম্নে দিতেছি।

তখন চীন, আরাকান, এবং বর্ম্মাদেশের লোক জলযানে বাণিজ্যার্থ স্বদেশীয় দ্রব্যাদি বিনিময়ের নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিতেন। এবং বণিকগণও বাণিজ্যাশয়ে পোতারোহণে শুক্তিমতি, এবং বরাটক * অর্থাৎ কড়ী সংগ্রহের নিমিত্ত সমুদ্র যাত্রা করিতেন। তন্নিমিত্ত সিংহল রাজ অতি সমাদরে আপনার দেশ-ভাষায় পোতারোহী বণিকদিগকে "পোতাদার" বলিয়া (১) উপাধি দান করেন। (২) দ্বিতীয়তঃ রাজা আদিশূরের অনুগ্রহে সনক স্বদলে ব্রহ্মপুত্র তটে বাস করিয়া দূরদেশী বাণিজ্যকারীদের সহিত বহুল পরিমাণে স্বর্ণ ও রজতাদি ব্যবসা দ্বারা, অল্প কালের মধ্যে, সেই স্থানকে আশাতীত উত্তম অবস্থাপন্ন এবং অতি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করিয়াছিলেন।

রাজা আদিশূর তদাবলোকনে এবং অন্যান্য কারণে সনকের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সনকের সম্মান বর্দ্ধনার্থে "সুবর্ণ-বণিক" এই উপাধিযুক্ত তাম্রফলকে একটী শ্লোক রচনা করিয়া সনককে উপহার দিয়াছিলেন। আর সনক-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মপুত্র-তটবর্ত্তী অভিনব নগরীকে "সুবর্ণ-গ্রাম" বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। আদিশূর-রাজ-প্রদত্ত সেই তাম্রফলকে এই কবিতাটী লেখা আছে;—

"স্বর্ণবাণিজ্যকারিত্বাৎ দত্তাস্থিতি বিশাং ময়া।
সুবর্ণবণিগিত্যাখ্যা, দত্তা সম্মানবৃদ্ধয়ে॥

এ সম্বন্ধে প্রাচীন কুলজীতে যে সকল পয়ার ও প্রবন্ধ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে

---

* "এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ে সমুদ্রোৎপন্ন কড়ীর আদান প্রদান অধিক ছিল।"

এস্থলে তাহা পরিহার করিয়া কেবল সার ভাগ লিখিতেছি। পূর্ব্বে পোতদার কি সুবর্ণবণিক বলিয়া শাস্ত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই; বৈশ্য বলিয়াই চিরকাল প্রসিদ্ধ। ঐ সকল উপাধি কেবল রাজ-প্রদত্ত। এক্ষণে কেবল ঐ উপাধি (এক প্রকার) জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আনুমানিক ৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আদিশূরের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ উপাধিই চলিতেছে। বস্তুত এতদ্দারা বৈশ্যত্বের কোন হানি হয় না।

এই জাতি লইয়া আদিশূরের পরে যে ঘটনা হয়, প্রসঙ্গক্রমে তাহার কথা কিছু বলিতেছি। ঘটককারিকায় লিখিত আছে;

"আদিশূরের বংশধ্বংশ, সেন বংশ তাজা।
বিজয় সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র, বল্লাল সেন রাজা।"

অনেকের বিশ্বাস যে, বল্লাল সেন রাজা আদিশূরের দৌহিত্র। কিন্তু সে প্রবাদ সত্য নহে। আদিশূরের বংশ লোপ হইয়াছিল। রাজা অশোকের পর ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেন বঙ্গ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ৩৫ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

সেই রাজার শাসন সময়ে বঙ্গদেশে সমাজ সংক্রান্ত যে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার বেগবান স্রোত এখনও পর্য্যন্ত সতেজে একাদিক্রমে বঙ্গদেশকে প্রতিনিয়তই প্লাবিত করিতেছে। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় বঙ্গের এমন একটীও দিন গত হয় নাই, যেদিন বঙ্গবাসী কেহ না কেহ সেই দোর্দ্দণ্ড মহারাজকে স্মরণ করিয়া নিদারুণ শোকসন্তপ্তহৃদয়ে অন্ততঃ একবারও ললাটে করাঘাত না করে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ললনা কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপনের বিষময় ফল-জনিত নিদারুণ যন্ত্রণায় নয়নবারি নিক্ষেপ করে নাই, এমন দিনই নাই।

বল্লালের গুপ্ত চরিত্র অতিশয় কদর্য্য ছিল; আনন্দ ভট্ট কর্ত্তৃক বল্লাল-চরিত প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে;—

'তিনি পদ্মিনীর লক্ষণাবিশিষ্টা এক ডোম কন্যার সহিত প্রসক্তি করিয়া তাহার সহ একত্রে আহার বিহার করিতেন। এই অকার্য্যে যখন চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল ও জনশ্রুতির সহস্র রসনায় ঐ অপবাদ যখন তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি দুঃখিতান্তকরণে পিতাকে উপদেশ দেওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বিবেচনায়, এই জঘন্য ব্যবহার সম্বন্ধে কুবের তুল্য ধনবান এবং গণ্যমান্য বৈশ্যকুলোদ্ভব বল্লভানন্দ আঢ্যের সৎ পরামর্শে পিতাকে সঙ্কেত পত্র লেখেন;—

"শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব, সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা।
কিং ব্রুমঃ শুচিতাং ভবন্তি, শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে॥
কিম্বান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

হে জল, তোমার শৈত্য আর স্বচ্ছতা-গুণ সহজ ও স্বাভাবিক, তোমাকে স্পর্শ করিয়াই যখন লোকে পবিত্র হয়, তখন তোমার পাবনতার বিষয় কি স্তুতিবাদ করিব? তুমি লোকের জীবন, তুমি যদি স্বয়ং নীচগামী হও, তোমাকে কে নিবারণ করিতে পারে?

কামাহত বল্লাল সেই পত্রের এইরূপ উত্তর লেখেন;—

"তাপো নাপগত তৃষা নচ কৃষা ধৌতান ধুলি স্তনৌ।
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলং কা নাম কেলী কথা।
তুরম্মুক্তকরেণ হস্ত করিণা, স্পৃষ্টা নবা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ।"

তাপও অপগত হয় নাই, শরীরের ধূলাও ধৌত হয় নাই, এবং কন্দও স্বচ্ছন্দে ভক্ষিত হয় নাই, ক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক,

হস্তী কর প্রসারিত করিয়া পদ্মিনীকে স্পর্শ করিতে না করিতে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার ও কোলাহল করিয়া উঠিল।"

নির্লজ্জ পিতার এইরূপ উত্তর পাইয়া লক্ষ্মণ সেন পুনর্ব্বার লেখেন ;—

"পরীবাদ স্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথা প্যেষোনূনং হরতি মহিমানং জনরবঃ
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষ তমসো,
রবে স্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥"

"অপবাদ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, উহার জনরবই মহৎ ব্যক্তির মহিমা বিনষ্ট করে ; যেমন অশেষ অন্ধকার নাশক যে সূর্য্য, তিনিও আশ্বিন মাসে কন্যা গমন করার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ তুলা অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস উত্তীর্ণ হইলেও অগ্রহায়ণাদি মাসে তাহার সে তেজ থাকে না।"

নিলর্জ্জ পিতা এই পত্র পাইয়া এই উত্তর লেখেন ;—

"সুধাংসো র্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা,
বিধাত্তুর্দোষোহয়ং নচগুণনিধেস্তস্য কিমপি।
চন্দ্রো নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ
র্নবা হস্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বান বসতি॥"

"সুধাকরের কলঙ্কাপবাদ তাহার নিজ দোষ জনিত নহে ; সে দোষ বিধাতারই। কিন্তু সে কলঙ্কে চন্দ্রের কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি কি সেই অত্রিমুনির সন্তান নন্? মহাদেব কি তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন না? এবং তিনিও কি জগতের উপরিভাগে বাস করেন না?

সৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন, পিতার এইরূপ কদর্য্য উত্তর দানে, তাঁহার চরিত্র সংশোধনে অকৃতকার্য্য হইয়া, নিরতিশয় মনস্তাপে ধর্ম্মলোপ ভয়ে পিতাকে পরিত্যাগ ও স্বদলভুক্ত বৈদ্যগণ সহিত অভিমানে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই হইতে বৈদ্যদিগের ২টী থাক হয়। সেকালে বণিকগণ লক্ষ্মণের পৃষ্টপোষক ছিলেন।

এইরূপে পিতা পুত্রের মনোমালিন্যের কারণ হওয়াতে শেষে রাজা উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ গো মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু কলিতে গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ। একারণ,অধ্যাপকবর্গ স্বর্ণ নির্ম্মিত গো দানের ব্যবস্থা করেন। রাজা তদনুসারে সমাজভুক্ত এবং সমাজ গঠন করিবার উদ্দেশে বর্ণ চতুষ্টয়কে ভক্ষ ভোজনাদির নিমন্ত্রণ করেন। পরন্তু সুবর্ণ বণিকগণ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। রাজা সেই কারণে এবং অন্যান্য কারণে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সভাস্থলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

প্রতিজ্ঞানীতে ;

যদি হিরণ্যবণিজো নীচজাতিয়ানাং মধ্যে ন
গণয়িষ্যামি ;
বল্লভানন্দপ্রভৃতীনাঞ্চ ন দাস্যামি, তদা গো-ব্রাহ্মণ-
যোষিদ্-ঘাতেন যানি পাপানি ভবন্তি, তানি মে
ভবিষ্যন্তীতি।
অঞ্জসা রাজ্ঞঃ শতপুত্রবিনাশে ভীমসেনেন যাদৃশী
প্রতিজ্ঞা কৃতা স্বর্ণবণিজাঃ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী
জ্ঞাতব্যা॥"

পরিশেষে কূটবুদ্ধি রাজা ঐ প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছায় ছলনা দ্বারা এবং রাজ ক্ষমতা বলে, দানোপযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি সহস্রধেনুর মধ্যে একটী ধেনুর উদরে অলক্ত জলপূর্ণ স্বর্ণকারের দ্বারা গো গঠন করাইয়া ;—

"হড় গড় পল সাঁই।
ইহার নীচে বামুন নাই॥'

ঘটক-কারিকায় এই যে কথা লিখিত আছে, রাজা সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে পাল উপাধিধারী, "বিজয় নামা" জনৈক লোভী ব্রাহ্মণকে বশে আনিয়া তদ্বারা ঐ ধেনু

পরীক্ষা জন্ত "মৃপঞ্জয় পাইন" নামক জনৈক বণিকের দোকানে পাঠাইয়া দেন।

বণিক রাজ-কৌশল অনবগতে লৌহ-শলাকা অর্থাৎ ছেনী আঘাতে ঐ ধেনু পরীক্ষা করিবার কালে ছিদ্র হইতে অলক্ত জল বাহির হয়, ব্রাহ্মণ তদ্দৃষ্টে চিৎকার করতঃ রাজসভায় উপনীত হইয়া গো হত্যাকারী বলিয়া বণিকের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। রাজা ঐ সূত্রে ভৌতিক বিচারে সুবর্ণগ্রাম-নিবাসী সুবর্ণবণিকদিগের উপর মিথ্যা কলঙ্কারোপে প্রকাশ্য সভায় আজ্ঞা প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত ধারণং ব্যর্থং। এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং অতোঽদ্য পর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ এতেষাং শূদ্রবৎ ক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি।

বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজাং স্বর্ণগোস্তুর গোহত্যা

*কারিণশ্চ তবেতে অদ্যপর্য্যন্তং পতিতা শিষ্টেরগ্রাহ্যাঃ এতৈঃ সহ যে ভোজনবিহরনৌকাসনা ক্রমণ যজন পঙক্তি ভোজনাদিকং করিষ্যতি তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি। অতস্তদ্ যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্য প্রভৃতি পাতিত্যম্।

বল্লাল কর্ত্তৃক এই আজ্ঞা প্রচারের পর রাজ-নিযুক্ত দুর্ব্বৃত্তগণ স্বজোরে সুবর্ণ বণিক্দিগের উপবীত চ্যুত এবং নির্ব্বিশেষে অন্যান্য অত্যাচার সহকারে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত সম্প্রদায়িকগণের সহিত যুক্তি করিয়া বণিকগণকে "অপঙক্তেয়" অর্থাৎ এক-ঘরিয়া করিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে বণিকদিগের প্রতি এই অত্যাচার ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বয়ং রাজা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অত্যাচার করিলে কে রক্ষা করে?

বৈশ্য কুলজীতে লিখিত আছে ;—

"বল্লালের অত্যাচারে, বণিক সমস্ত।
নানাস্থানে সকলে যাইতে হৈল ব্যস্ত ॥
কেহ গেল দক্ষিণে, কেহ গেল রাঢ় দেশে।
কেহবা কর্জ্জনায় বাস, করিলেন শেষে ॥
কেহবা মিথিলা গেলা; বিদ্যাধ্যয়নে।
কেহবা গুজরাটে গেলা, বাণিজ্য কারণে ॥
কেহবা উত্তরে গেলা, কেহ রৈল বঙ্গে।
পরস্পর নাহি দেখা, স্বজনের সঙ্গে ॥
সোণার সুবর্ণগ্রাম, শ্রীহীন হইল।
দুই চারি ঘর মাত্র, স্বস্থানে রহিল ॥ ইত্যাদি।

* * *

বল্লালের অত্যাচারে দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুরের উর্দ্ধতম দশম পুরুষ, ভবেশ দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাবালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সমভিব্যাহারে বিহার প্রদেশে গিয়া তত্রস্থ জনকরাজ বংশীয়ের আশ্রিত হইয়াছিলেন।

সনক আঢ্য বংশীয় বল্লভানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তমে গিয়া তত্রস্থ কেশরী বংশীয় রাজার শরণাপন্ন হন, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে একটী মহামূল্য মাণিক্য দান করেন। অদ্যাপি সেই মাণিক্য শ্রীজগন্নাথ দেব ললাট-ফলকে ধারণ করিতেছেন। উহা আঢ্য মাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মিথিলা দেশে ষড় শাস্ত্র দর্শনে নিপুণ হইয়া একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, একদা শ্রীশ্রীকাশীধামে দণ্ডী সভায় বিচারে জয় লাভ করিয়া "পুরুষোত্তম শর্ম্মা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। বাহুবলে মিথিলা তাঁহার সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

ধর্ম্ম চর্চ্চা সম্বন্ধে রাজা লক্ষ্মণের বিশে অনুরাগ ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শ্রীহরি বিষয়ক পদ্যগীত রচনা করিতেন তাঁহার কৃত কয়েকটী পদ শ্রীপদ-সমুদ্র গ্র আছে। তিনি বিবিধ শাস্ত্র-বেত্তা কবিকু

কেশরী পণ্ডিতগণকে অমাত্য স্বরূপ সভায় রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা এবং কাব্য অনুশীলন করিতেন।

কবি উমাপতি ধর, এবং গোবর্দ্ধন আচার্য্য ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীগীত-গোবিন্দ-কাব্য-রচয়িতা কেন্দুবিল্ব-নিবাসী শ্রীজয়দেব গাস্বামী লক্ষ্মণ রাজের সভাসদ্ ছিলেন। হারাজ লক্ষ্মণ শ্রীজয়দেব-কৃত মহাকাব্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীজয়দেব স্বামীকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য সপ্তসতী নামে কাব্য প্রকাশ করেন।

শ্রীজয়দেব-কৃত সংস্কৃত গীতগোবিন্দ কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নয়, সমগ্র ভারতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই আদৃত এবং সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারে এক অদ্ভুত পদার্থ। ভারতীয় কাব্য সমূহের মধ্যে ইহার তুলনা নাই; শ্রীজয়দেব স্বামী এই কাব্যের মঙ্গলাচরণে, চতুর্থ শ্লোকে, এই

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং।
নীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহা দৃতে ॥”

ইত্যাদি,

উমাপতি ধর মহাত্মার নাম কীর্ত্তন রয়াছেন, ইনিই সুবর্ণগ্রাম-নিবাসী কুলোদ্ভব, পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জিলাল ধর শয়ের পুত্র, এবং উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের াদিপুরুষ শ্রীভবেশ দত্ত মহাশয়ের শ্যালক পুত্র। ইনি, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের অমাত্য স্বরূপ রাজ সভায় উপস্থিত থাকিয়া কবিতা রচনায় বাক্য পল্লবিত করিতেন। সরল, কঠিন, এবং দ্রুত রচনায় প্রশংসনীয় এবং তাম্র-শাসন-রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ের যে সকল তাম্রফলকাদি মুদ্রা আছে, তাহাতে উমাপতি ধর মহাশয়ের নাম দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মণ সেনের সময় এক অব্দ প্রচলিত ছিল। মিথিলার পণ্ডিতগণ ঐ অব্দ অনুসারে গণনা করিয়া থাকেন। উহা লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সামান্য লোক ছিলেন না, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও পুরুষোত্তম শর্ম্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য বলে মহারাজ লক্ষ্মণের সভায় কথায় কথায় শ্রীগীত-গোবিন্দের সমুদায় অংশ প্রথমতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পক্ষে, দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীশিবদুর্গা পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া "গঙ্গা" নামে এক অদ্ভুত টীকা করেন। কবি উমাপতি ধর এবং শ্রীকৃষ্ণ দত্তের জীবনী সম্বন্ধে সে কালের ভাষা কুলজীতে এই মত ব্যক্ত আছে।

(১) কাঞ্জিলাল ধর নাম, বণিক প্রধান।
কবি উমাপতি ধর তাহার সন্তান ॥
নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া।
বিচারার্থে রাজ সভায় দেন পাঠাইয়া ॥
আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তি দেখিয়া রাজন।
অমাত্য পদেতে তারে, করেন বরণ ॥
* * * ইত্যাদি।

(২) কাঞ্জিলালের ভগ্নী, নাম ভগবতী।
ভবেশ দত্তের পত্নী, গুণবতী সতী ॥
দেশ ত্যাগ করি করে মিথিলায় বাস।
তত্ত্ব না পাইয়া ধর, বড়ই উদাস ॥
উমাপতি পুত্র সহ, করিয়া মন্ত্রণা।
ভগ্নী স্থানে যাইবারে হইল উন্মনাঃ ॥

* * * *

(৩) মিথিলা যাইতে ধর, সুসজ্জিত হৈল।
তা শুনি লক্ষ্মণ রাজ নিষেধ করিল ॥
এখন যেওনা ধর, দুর্গমের পথে।
পশ্চাৎ যাইবে তুমি, আমাদের সাথে।
এখন মিথিলা দেশ, মোর অধিকার।
দূত পাঠাইয়া তত্ত্ব, করহ তাহার ॥

পরীক্ষা জন্য "মৃপঞ্জয় পাইন" নামক জনৈক বণিকের দোকানে পাঠাইয়া দেন।

বণিক রাজ-কৌশল অনবগতে লৌহ-শলাকা অর্থাৎ ছেনী আঘাতে ঐ ধেনু পরীক্ষা করিবার কালে ছিদ্র হইতে অলক্ত জল বাহির হয়, ব্রাহ্মণ তদ্দৃষ্টে চিৎকার করতঃ রাজসভায় উপনীত হইয়া গো হত্যাকারী বলিয়া বণিকের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। রাজা ঐ সূত্রে ভৌতিক বিচারে সুবর্ণগ্রাম-নিবাসী সুবর্ণবণিকদিগের উপর মিছা কলঙ্কারোপে প্রকাশ্য সভায় আজ্ঞা প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত ধারণং ব্যর্থং। এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং অতোঽদ্য পর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ এতেষাং শূদ্রবৎ ক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি।

বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজাং স্বর্ণগোস্তুর গোহত্যা কারিণশ্চ তথেতে অদ্যপর্য্যন্তং পতিতা শিষ্টেরগ্রাহ্যাঃ এতৈঃ সহ যে ভোজনবিহরনৌকাসনা ক্রমণ যজন পক্তি ভোজনাদিকং করিষ্যতি তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি। অতস্তদ্ যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্য প্রভৃতি পাতিত্যম্‌॥

বল্লাল কর্ত্তৃক এই আজ্ঞা প্রচারের পর রাজ-নিযুক্ত দুর্ব্বৃত্তগণ স্বজোরে সুবর্ণ বণিক্‌দিগের উপবীত চ্যুত এবং নির্ব্বিশেষে অন্যান্য অত্যাচার সহকারে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত সম্প্রদায়িকগণের সহিত যুক্তি করিয়া বণিকগণকে "অপঙক্তেয়" অর্থাৎ এক-ঘরিয়া করিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে বণিকদিগের প্রতি এই অত্যাচার ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বয়ং রাজা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অত্যাচার করিলে কে রক্ষা করে?

বৈশ্য কুলজীতে লিখিত আছে ;—

"বল্লালের অত্যাচারে, বণিক সমস্ত।
নানাস্থানে সকলে যাইতে হৈল ব্যস্ত॥
কেহ গেল দক্ষিণে, কেহ গেল রাঢ় দেশে।
কেহবা কর্জ্জনায় বাস, করিলেন শেষে॥
কেহবা মিথিলা গেলা; বিদ্যাধ্যয়নে।
কেহবা গুজরাটে গেলা, বাণিজ্য কারণে॥
কেহবা উত্তরে গেলা, কেহ রৈল বঙ্গে।
পরস্পর নাহি দেখা, স্বজনের সঙ্গে॥
সোণার সুবর্ণগ্রাম, শ্রীহীন হইল।
দুই চারি ঘর মাত্র, স্বস্থানে রহিল॥ ইত্যাদি।

* * *

বল্লালের অত্যাচারে দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুরের উর্দ্ধতম দশম পুরুষ, ভবেশ দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাবালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সমভিব্যাহারে বিহার প্রদেশে গিয়া তত্রস্থ জনকরাজ বংশীয়ের আশ্রিত হইয়াছিলেন।

সনক আঢ্য বংশীয় বল্লভানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তমে গিয়া তত্রস্থ কেশরী বংশীয় রাজার শরণাপন্ন হন, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে একটী মহামূল্য মাণিক্য দান করেন। অদ্যাপি সেই মাণিক্য শ্রীজগন্নাথ দেব ললাট-ফলকে ধারণ করিতেছেন। উহা আঢ্য মাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মিথিলা দেশে ষড়্ শাস্ত্র দর্শনে নিপুণ হইয়া একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, একদা শ্রীশ্রীকাশীধামে দণ্ডী সভায় বিচারে জয় লাভ করিয়া "পুরুষোত্তম শর্ম্মা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। বাহুবলে মিথিলা তাঁহার সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

ধর্ম্ম চর্চ্চা সম্বন্ধে রাজা লক্ষ্মণের বিশে অনুরাগ ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শ্রীহরি বিষয়ক পদ্যগীত রচনা করিতেন তাঁহার কৃত কয়েকটী পদ শ্রীপদ-সমুদ্র গ্র আছে। তিনি বিবিধ শাস্ত্র-বেত্তা কবিকু

কশরী পণ্ডিতগণকে অমাত্য স্বরূপ সভায় থিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা এবং কাব্য শীলন করিতেন।

কবি উমাপতি ধর, এবং গোবর্দ্ধন চার্য্য ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীগীত-গোবিন্দ-ব্য-রচয়িতা কেন্দুবিল্ব-নিবাসী শ্রীজয়দেব াস্বামী লক্ষ্মণ রাজের সভাসদ্ ছিলেন। হারাজ লক্ষ্মণ শ্রীজয়দেব-কৃত মহাকাব্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীজয়দেব মীকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করিয়া-লেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য সপ্তসতী নামে ব্য প্রকাশ করেন।

শ্রীজয়দেব-কৃত সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নয়, সমগ্র ভারতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই আদৃত এবং সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারে এক অদ্ভুত পদার্থ। ভারতীয় কাব্য সমূহের মধ্যে ইহার তুলনা নাই; শ্রীজয়দেব স্বামী এই াব্যের মঙ্গলাচরণে, চতুর্থ শ্লোকে, এই

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং।
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহা দ্রুতে॥"

ইত্যাদি,

য উমাপতি ধর মহাত্মার নাম কীর্ত্তন রিয়াছেন, ইনিই সুবর্ণগ্রাম-নিবাসী বণ্ণকুলোদ্ভব, পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জিলাল ধর হাশয়ের পুত্র, এবং উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের াদিপুরুষ শ্রীভবেশ দত্ত মহাশয়ের শ্যালক পুত্র। ইনি, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের অমাত্য স্বরূপ রাজ সভায় উপস্থিত থাকিয়া কবিতা রচনায় বাক্য পল্লবিত করিতেন। সরল, কঠিন, এবং দ্রুত রচনায় প্রশংসনীয় এবং তাম্র-শাসন-রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ের যে সকল তাম্রফলকাদি মুদ্রা আছে, তাহাতে উমাপতি ধর মহাশয়ের নাম দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মণ সেনের সময় এক অব্দ প্রচলিত ছিল। মিথিলার পণ্ডিতগণ ঐ অব্দ অনুসারে গণনা করিয়া থাকেন। উহা লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সামান্য লোক ছিলেন না, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও পুরুষোত্তম শর্ম্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য বলে মহারাজ লক্ষ্মণের সভায় কথায় কথায় শ্রীগীত-গোবিন্দের সমুদায় অংশ প্রথমতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পক্ষে, দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীশিবদুর্গা পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া "গঙ্গা" নামে এক অদ্ভুত টীকা করেন। কবি উমাপতি ধর এবং শ্রীকৃষ্ণ দত্তের জীবনী সম্বন্ধে সে কালের ভাষা কুলজীতে এই মত ব্যক্ত আছে।

(১) কাঞ্জিলাল ধর নাম, বণিক প্রধান।
কবি উমাপতি ধর তাহার সন্তান॥
নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া।
বিচারার্থে রাজ সভায় দেন পাঠাইয়া॥
আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তি দেখিয়া রাজন।
অমাত্য পদেতে তারে, করেন বরণ॥
* * * ইত্যাদি।

(২) কাঞ্জিলালের ভগ্নী, নাম ভগবতী।
ভবেশ দত্তের পত্নী, গুণবতী সতী॥
দেশ ত্যাগ করি করে মিথিলায় বাস।
তত্ত্ব না পাইয়া ধর, বড়ই উদাস॥
উমাপতি পুত্র সহ, করিয়া মন্ত্রণা।
ভগ্নী স্থানে যাইবারে হইল উন্মনাঃ॥

* * * *

(৩) মিথিলা যাইতে ধর, সুসজ্জিত হৈল।
তা শুনি লক্ষ্মণ রাজ নিষেধ করিল॥
এখন যেওনা ধর, দুর্গমের পথে।
পশ্চাৎ যাইবে তুমি, আমাদের সাথে।
এখন মিথিলা দেশ, মোর অধিকার।
দূত পাঠাইয়া তত্ত্ব, করহ তাহার॥

(৪) রাজা পাঠাইলা দূত, ভবেশ উদ্দেশে।
পত্র লয়ে দূত গেলা মিথিলার দেশে॥
ভবেশের বাসস্থান, করিয়া নির্ণয়।
দূত গিয়া উপনীত তাহার আলয়॥
পাইয়া নৃপতি আজ্ঞা ভবেশ হর্ষিত।
নিজপুত্র কৃষ্ণদত্তে, পাঠান ত্বরিত।”

* * * *

(৫) মাতুল গৃহেত কৃষ্ণ, উপনীত হয়ে।
রাজার সহিত ভেট করিলেন গিয়া॥
বুধ মণ্ডলীতে তিনি আসন পাইলা।
শ্রীগীতগোবিন্দ অর্থ করিবারে দিলা॥
অত্যাশ্চর্য্য কাব্য দেখি, হর্ষযুক্ত হয়ে।
দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করে অর্থ লাগাইয়া॥
প্রথমতঃ কৃষ্ণ পক্ষে অর্থ সংস্থাপিলা।
শেষে শিব পক্ষে অর্থ বুঝাইয়া দিলা॥
তা দেখি পণ্ডিতগণ হইলা মোহিত।
গঙ্গা নামে টীকা বলি, হইল আখ্যাত॥

* * * *

এই পণ্ডিত-প্রধান শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের উর্দ্ধতম নবম পুরুষ। ইহাঁর কৃত শ্রীগীতগোবিন্দের (গঙ্গা) নামক টীকায় বিশেষ ব্যক্ত আছে এবং গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিভূষণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজকৃত অনুবাদের “মুখবন্ধে” গঙ্গা নামে টীকা স্থলে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তের ব্যাখ্যায় মহারাজ লক্ষ্মণ সেন অত্যন্ত প্রীত হইয়া ইহাঁকে “সুবর্ণ-গ্রামে” বাসোপযুক্ত একখণ্ড ভূমি দান করেন। ইনি, লক্ষ্মণ রাজের আগ্রহাতিশয়ে, মিথিলার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বৃদ্ধ পিতা, মাতা, এবং ভাই ভগ্নী ও পরিবারাদি সহিত সুবর্ণগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইনি, সর্ব্বতোভাবে বৈশ্য ধর্ম্ম পালন, এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। পশ্চাৎ ইহাঁর বংশধরগণ বাণিজ্য আশায় শ্রীগঙ্গার উপকূল বাণিজ্য প্রধান স্থান সপ্তগ্রামে বাস করেন।

ঈশ্বরানুগ্রহে কোন কালে এবংশের অবনতি নাই। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর অনুগ্রহে বংশ পরম্পরায় ধনবান, পুত্রবান এবং বিদ্যাবান। মূল হইতে আজ ২১ একবিংশতি পুরুষ অধিগত হইল, ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় বংশ বিস্তার হইয়া বংশীয়গণ কর্ম্ম সূত্রে বঙ্গের স্থানে স্থানে বাস ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অভীষ্টদেব পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ শরণ ব্যতীত এবংশের অন্য গতি নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে;—

“যতেক বণিকগণ, উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক তাহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকে যে দিলা প্রেম, ভক্তি অধিকার॥
উদ্ধারণ দত্ত, মহাবণিক উদার।
নিত্যানন্দ সেবায়, যাহার অধিকার॥”

* * *

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

“গৌরাঙ্গো ভগবস্তক্তো নচ পূর্ণো ন চাংশকঃ॥

অনেক মূর্খ বিটলে এই কৃত্রিম অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ণত্ব বা অংশ স্বীকার করে না, সেটী তাহাদিগের বুঝিবার ভ্রম। বস্তুতঃ শ্লোকটী অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় হইলেও আমরা তাঁহাদের কথিত ঐ অর্দ্ধ শ্লোকটী স্বীকার করি; কিন্তু অর্থটী স্বীকার করি না। কারণ উহার প্রকৃত অর্থ তাহাদের কথিত মত না হইয়া এই অর্থ হইবে, যথা,—

গৌরাঙ্গো ভগবস্তক্তো ন, অংশো ন,
অর্থাৎ স পূর্ণঃ।

বেদে পুরাণে এবং ভারতে আছে যথা;—

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

(১) কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥

শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্ব সহস্র নামে।

(২) "সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ। ৭৫
সুবর্ণবর্ণহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ৯২

এই পদদ্বয়ে শ্রীমদ্ বেদান্ত আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন ;—

'সুবর্ণস্যেব বর্ণংরূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ ॥'

শ্রুতে,—

হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণানি বর্ণাধিষ্ঠানানি যস্য
স হেমাঙ্গঃ।

বরাণি সৌন্দর্য্য যুক্তাঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ।

চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি
চন্দানাঙ্গদী।

সুবর্ণবর্ণাদিচতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণচৈতন্যতায়াং
যোজয়ন্তি ॥ ৯২

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতাং দ্যোতয়ন্নাহ ষড়্ভিঃ।

"সন্ন্যাসং পরিব্রাজ্যং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ

"সাম্যত্যালোচয়ন্তি রহঃ সংতারয়তি (সমঃ)

"শাম্যতাপরস্যাতি কৃষ্ণস্য বিষয়াদিতি (শান্তঃ)

"নিতিষ্ঠতি হরিকীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তিঃ যস্মা ইতি
(নিষ্ঠা)

"শাম্যন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলা দ্বৈতপ্রমুখাইতি
(শান্তি)

"মহাভাবস্থানাং ভাবভেদানাং পরমমরণমিতি
(পরায়ণং)

সামবেদে।

ওঁ যদাপশ্যতি ঈশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমিশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ;—

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনপরমসাম্যমুপৈতি ॥ অথর্ব্বস্য তৃতীয়কাণ্ডে।

ব্রহ্মভাগানন্তরং।

ইহ "ইহ কৃষ্ণঃ" সন্ন্যাসইব ভবিষ্যামি।

স্বগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামভূ র্নির্ব্বাণ স্তীরঙ্গোহলোকনন্দয়াঃ

কলৌ চতুঃসহস্রাঙ্গি পরিপক্বসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যে বিদিতয়া গোহস্যাং।

পুরুষবোধন্যাং সপ্তমে গৌরবর্ণবিস্ফুরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্যপ্রাপ্তে প্রাতগুপ্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ
স্বমনুশিক্ষয়তি ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীমথুরানাথ বচনং।

(৩) "কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহং মহীতলে
ভাগীরথী তটে রম্যো ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

শ্রীনারদীয়ে শ্রীদ্বারকানাথবচনং,—

(৪) "অহমেব কলৌ বিপ্র, নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ গৃহ্নামি সর্ব্বথা ॥

গারুড়ে শ্রীগোলোকনাথবচনং ;—

(৫) "কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাং
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥

যামলে শ্রীগোকুলনাথ বচনং ;—

(৬) "অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ
মায়াপারে নবদ্বীপে, বারমেকং শচীসুতঃ।

(৭) "দিবিজা ভুবিজায়াধ্বং জায়াধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।

(৮ও৯) "সত্যে দৈত্যকুলাদিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নৃসিংহ
কেশরী,—
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ।
গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারংহরন্ দ্বাপরে,
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ
যদ্গোপীকুচকুম্ভসম্ভ্রমভরারম্ভেণ সংবর্দ্ধিতঃ
যদ্বা গোপকুমারদারকলয়ন্ রক্ষশ্চ ভঙ্গীকৃতঃ
মদ্বৃন্দাবনকাননে প্রচলিতঃ শ্রীদামদামাদিভিঃ
তৎপ্রেম প্রকটঞ্চকার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বিলাস মূর্ত্তি শ্রীবলরাম নিত্যানন্দ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

(১) দুই ভাই এক প্রভু সমান প্রকাশ।

(২) যৈছে বলদেব, পরব্যোম নারায়ণ।

অর্থাৎ পর ব্যোমস্থিত মহা সঙ্কর্ষণ।

(৩) অভিন্ন চৈতন্য সে, ঠাকুর অবধৌত।

শ্রীচৈ·মঙ্গল।

ইত্যাদি প্রমাণে একই আত্মা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট, শ্রীবলরামও তদ্রূপ দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ রূপে ১৩৯৫ শকে রাঢ়দেশে একচক্রা নগরে দ্বিজকুল-শ্রেষ্ঠ শ্রীহাড়াই

পণ্ডিতের গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন। ইনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অবধূত বেশে শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারাবতী, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা প্রভৃতি মহামহা তীর্থ পর্য্যটনের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করেন। ইনিও সেই সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাংসারিক হইবার কারণ ;—

ঈশ্বরের লীলা স্বতন্ত্র, তাহার লীলা কে বুঝিতে পারে? একদিন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলেন, ভাই তোমার মুনি ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। আপন উদ্দাম পরিহার কর। সত্বরে গৌড়ে গমন করিয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এবং সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার কর, কেহ যেন পাষণ্ডী না থাকে। তাহা হইলেই লীলা পূর্ণ হয়।

দুই প্রভুতে নিভৃতে বসিয়া যখন এই কথা হয়, তখন সেই ক্ষেত্রে শ্রীগঙ্গাধর দাস ছিলেন, তিনি সেই কথা শ্রুত মাত্র নিজ গাথায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই ;—

(১) "বিরলে নিতাই পেয়ে, হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর ভাবে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়া,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সবজীব হৈল অন্ধ,
কেহত না নিল হরিনাম।
কত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কৃপা করে লওয়াইবে নাম॥
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে
সুখে যেন হরিনাম লয়।
যমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়,
হরিনামে বঞ্চিত না হয়॥
কুমতি তার্কিকগণ, অধম পড়ুয়াগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেম দাস হরি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সকলের দুঃখ॥
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া,
পূর্ণ কর সকলের আশ।
চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হয়ে,
সঙ্গে চলু গদাধর দাস॥" পদ-সমুদ্র।

এই প্রসঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন ;—

(১) একদিন শ্রীগৌর সুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা, নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে শুন, নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি, নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু মুঞি, আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র, ভাসাব প্রেম সুখে॥
(২) তুমিও থাকিলে যদি, মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাবে, সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত, পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা, করিবে উদ্ধার॥
এতেক তোমার বাক্য, সত্য যদি চাও।
তবে গৌর দেশে তুমি অবিলম্বে যাও।"
ইত্যাদি।

(৩) "আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেইক্ষণ।
চলিলেন গৌড়দেশে লয়ে নিজগণ॥"
ইত্যাদি

(৪) উদ্ধারণ দত্ত, ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তাহা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তার॥

* * * ইত্যাদি।

ইতিবৃত্তে কথিত আছে ;—

সপ্তগ্রামনিবাসী বণিকগণ বৈশ্য ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বৈদিক বিধি অনুসারে উপবীত ধারণ করিতেন। একদিন নিত্যানন্দ মহ

প্রভু পরিহাস করিয়া উদ্ধারণকে বলিলেন, উদ্ধারণ স্কন্দ পুরাণাদি দেখিয়াছ ? উদ্ধারণ বলিলেন, না প্রভু ! তখন প্রভু বলিলেন—যদি শাস্ত্র না দেখিয়া থাক, তুমিও মূর্খ, তোমার স্বজাতিরাও মূর্খ। কারণ স্কন্দপুরাণে আছে ;—

"হরিনামাক্ষরং ভুক্তং ভাগে গোপীমুদ্রাঙ্কিতঃ।
তুলসীমালিকাঙ্গাঙ্গ নস্পৃশেৎ যমোস্তটাঃ ॥"

* * * ইত্যাদি।

ইহা নিশ্চিত যে, শুধু উপবীত ধারণে কিছুই ফল হয় না, যাবৎ কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠের মালা না থাকে, এবং তিলক ধারণ না থাকে, এবং তিলক ধারণ না করিলে দেহ অপবিত্র অর্থাৎ শ্মশান তুল্য। দেখ দেখি, আমি অবধূত উপবীত-ত্যাগী, তথাপি আমাকে কে না চেনে ? তাই বলি, চেনা বামুণের পৈতার কি কাজ।

উদ্ধারণ, প্রভুর এই ইঙ্গিতে, স্বজাতি-বর্গে সেই দিন হইতে মালা তিলক ধারণ করেন। ফলতঃ কুলধর্ম্ম উপবীত ত্যাগ করেন নাই। প্রভু সুবর্ণবণিকদিগের এই ব্যবহার এবং হরিনামে গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া ;—

"সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনি নিতাইচাঁদ কীর্ত্তন বিহরে ॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে সেবিলেন, লইয়া শরণ ॥
বণিক সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥"

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

প্রভুর পূর্ব্বকথার পোষকতার্থে গ্রন্থকার আভাসে লিখিয়াছেন ;—

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে করিলেন পার ॥"

প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থকারের ঐ উক্তি তুচ্ছার্থবোধক নহে। মহাজন মাত্রেই ঐরূপ দীনতা স্বীকার করিয়া থাকেন ? যথা ;—

"পুরীষের কীট হইতে মুঞিত লঘিষ্ঠ।"
"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ ॥"

এইরূপ দৈন্যোক্তিতে কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ গোস্বামী কখনও নীচত্ব প্রাপ্ত হন নাই ; সকলের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিলেন। প্রভুর ঐরূপ ইঙ্গিত বাক্য কেবল জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে শিক্ষার উপদেশ। যথা ;

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু বণিকদিগের ভ্রম ঘুচাইয়া এইরূপ উপদেশ প্রদান দ্বারা কৃতকৃতার্থ করিয়া সপ্তগ্রামে কিছুদিন অবস্থিতি করণানন্তর পশ্চাৎ বিদিত হইলেন ;—পূর্ব্ব পত্নী লক্ষ্মীরূপা রেবতী দেবীর অংশিনী অম্বিকা নগরের সন্নিকট শালিগ্রামে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুধা নাম প্রকাশ করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত দার পরিগ্রহের ইচ্ছা করিলেন।

যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পরিশিষ্টে ;

(১) একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া।
অম্বিকা নগরে যান, এক ভৃত্য লয়া ॥
জাতিতে বণিক নাম উদ্ধারণ দত্ত।
প্রভু পারিষদ্ হন পরম মহাত্ম ॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারেতে রহিয়া।
অন্তঃপুরে দত্তেরে দিলেন পাঠাইয়া ॥
(২) তিঁহো গিয়া কহিল প্রভুর সমাচার।
শুনিয়া পণ্ডিত আসি, কৈল নমস্কার ॥
প্রভু কহে তোমার কাছে, আইলাম আমি।
বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি।
পণ্ডিত কহেন প্রভু, ইহা কৈছে হয়।
বর্ণ যুক্ত গৃহাচারী, আছে জাতি ভয়।
যদ্যাপি সন্ন্যাসীরূপে, তুমি নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগী, আমি যে ব্রাহ্মণ।

এত শুনি নিত্যানন্দ, চলিলা ফিরিয়ে।
লোক সব নিরখয়ে, চমৎকার হয়ে।
(৩) হেন কালে গৃহ মধ্যে, ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার কি হল কি হল॥
ধেয়ে সবে প্রবেশিল গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডব দুয়ারে॥
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম।
আচম্বিতে অঙ্গকম্প, নয়ন উত্তান॥
চিকিৎসকগণ দেখি মরণ নির্দ্ধার
কদাচিৎ প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার।
(৪) এত শুনি সূর্য্য দাস কাঁদিতে লাগিল।
তারে সম্বোধিয়ে, গৌরী দাস কিছু কৈল।
বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়ে আনহ তারে, করিয়া যতনে।
বাঁচাইতে পারে যদি, কন্যা দিব তারে।
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিনু তোমারে।

* * *

(৫) "প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ মূলে।"
স্বগণ সহিত গৌরী দাস পায়ে পড়ে॥
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত বাধ্য হয়ে।
সূর্য্যদাস ঘরে পুনঃ আইল ফিরিয়ে॥
(৬) প্রভুরে দেখিয়া সবে, গাত্রোত্থান কৈল।
যেখানে ছিলেন বসু, তথা লয়ে গেল॥
নবম দশার শেষ, তনুতে প্রকাশ।
ঐ সময়ে শ্রী অঙ্গের, লাগিল বাতাস॥
অঙ্গ গন্ধ গিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশিল।
মৃত সঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন হইল॥
তনুর বসন সে বদনে ঢাকি দিল।
একি? একি? বলি নিজ গৃহে প্রবেশিল॥

* * *

(৭) লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিলা।
প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি, ষড় ভুজ হৈলা॥
ঊর্দ্ধে ধনুর্ব্বান মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে, দণ্ড কমণ্ডল॥
মস্তকে কিরীট শোভে, শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গে মণিভূষা, করে ঝলমল॥
দেখিয়া সকল লোক, পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করেন স্তুতি, কর যোড় হৈয়া॥
ব্রাহ্মণ সকল দেখি, হৈলা চমৎকার।
দেখিতে দেখিতে, অবধূতের আকার॥

* * *

(৮) পণ্ডিত কুলীন আর, কুলাচর্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ একমত॥
বেদ সংস্কারে পুনঃ দিব উপবীত।
পূর্ব্বাশ্রমের গোত্রে গাঁই যেবা আছে নীত॥
প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু, করিল স্বীকার॥

অনন্তর, সকলের মতে বিশেষতঃ সূর্য্য দাসের ভ্রাতা গৌরী দাসের প্রতিজ্ঞানুসারে শুভদিন শুভক্ষণে প্রভুর যজ্ঞোপবীত এবং বসুধারা সহিত বিবিধ ঘটায় বিধিপূর্ব্বক বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সূর্য্যদাস যৌতুক স্বরূপ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীজাহ্নবী দেবীকে দান করিয়াছিলেন। প্রভুর উপবীত এবং বিবাহ দিবার প্রধান নেতাই দত্ত উদ্ধারণ। বিবাহের পরদিন অম্বিকানগর ও তৎচতুপার্শ্ব পল্লীর যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলাচার্য্য প্রভৃতি সমবেত হইয়া হাস্য পরিহাসযুক্তে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন;—

(৯) শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ।
প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাধয়ে উতারি।
(১০) তাঁরা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন্ জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কিবা নাম কোথায় বসতি।
(১১) প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি ইহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি করিণু স্বীকার॥
বৈশ্য কুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন, ঘৃণা নাহি করি॥

* * * ইত্যাদি।

শ্রীবৈ,ভাগবতের পরিশিষ্ট।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।

যদিও ঈশ্বরের রুচি স্বতন্ত্র, তথাপি প্রকাশ্যে সে কথা বলা অসঙ্গত। তবে

পুরাণে এবং গ্রন্থে উল্লেখ আছে বলিয়াই সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলিতেছি।

একদা, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন ;—

শ্রীচৈ, ভা,

“গৃহ্নীয়াৎ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রাহ্মণৈর্ বন্দ্যঃ নিত্যানন্দপদাম্বুজঃ ॥

হরি ভক্তিবিলাসে, পদ্মপুরাণোক্ত বচনং,—

“হরি নাম পরায়স্তু, বিষ্ণু পূজা পরায়ণ।
কৃষ্ণ মন্ত্র যো গৃহ্নন্তি, বিষ্ণুর্জানাতি বৈষ্ণব ॥”

যোগবাশিষ্ঠ ;—

“আচারাৎ ফলতে ধর্ম্মমাচারং, ফলতে ধনং”
“আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

“ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করয়ে ভোজনে ॥”

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ,—

“যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিবিধ অপেক্ষা নাহি চায় ॥”

ভক্তমালে ;—

“কিবা বিপ্র কিবা ক্ষত্র, কিবা বৈশ্য শূদ্র।
ভক্তি করি যেবা দেয়, তাহা প্রভুর খাদ্য ॥

সারাবলী ;—”

“আপনে আচারে ধর্ম্ম, অন্যের শিখান।
ভক্তি করি যে কিছু দেন তাহা প্রভু খান ॥”

প্রভু নিত্যানন্দ, ভক্তের ভগবান। বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি, ভক্তি এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, বিশিষ্ট আচারের সহিত যে কিছু দ্রব্য ভগবানে অর্পণ করেন, ভগবান প্রীতি সহকারে তাহা ভোজন করিয়া থাকেন।

করুণাবতার শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু সুবর্ণবণিক জাতিকে ভক্তিমান এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারী দেখিয়াই উদ্ধারণের পাক অন্ন গ্রহণ করিতেন। যেহেতু উদ্ধারণ শূদ্র নহে; তৃতীয় বর্ণের অন্তর্গত। শ্রীভাগবতে;—“মুখ বাহু রূপ দেভ্য পুরুষোস্থ শ্রমি সহ।” ইত্যাদি

(৬) ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর। যথা বৈষ্ণবাভিধানে ;—

সর্ব্ব ভাবে সেবার অর্থ (১) আরাধনা (২) পরিচর্য্যা (৩) শুশ্রূষা (৪) আশ্রয় (৫) উপদেশ (৬) পূজা (৭) উপকার (৮) ভিক্ষা অর্থাৎ আহার ভোজন (৯) সংস্কৃত্য (১০) প্রত্যাশা (১১) অনুবৃত্তি (১২) পাক, এই দ্বাদশ প্রকার। দত্ত উদ্ধারণ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহা প্রভুর তুষ্টি নিমিত্ত এই সকল সেবার অধিকার পাইয়াছিলেন। যথা ;—“ভক্তি যোগ পরিপন্থা ইত্যাদি।”

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর।

ইতিবৃত্তিতে কথিত আছে ;—

কান্যকুব্জের প্রিয়াবন্ত নামক রাজার সপ্ত মহর্ষি সন্তান (১) অগ্নীত্র (২) রমণক (৩) তপিসন্ত (৪) স্বরবান (৫) বরাট (৬) সবন (৭) দ্যুতিমন্ত্র, সপ্তগ্রামে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দ চরণার বৃন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম অম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

“সেই সপ্তগ্রামে আছে, সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে, ত্রিবেণী ঘাট গ্রাম ॥”
“এই মত সপ্তগ্রাম, অম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেণ নিত্যানন্দ, পরম কৌতুকে ॥”

“স্মার্ত্তধৃত মলমাসতত্ত্বে মহাভারতোক্তম ; দক্ষিণ প্রয়াগসপ্তগ্রামাপ্যাৎ নগরাৎ যাম্যা ত্রিবেণী নামে প্রসিদ্ধা।” যথা ;

“প্রদ্যুম্ননগরাৎ যাসৌ সরস্বত্যা স্তথোত্তরে”

ইত্যাদি।

প্রবাদ আছে, পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের অভিসম্পাতে সপ্তগ্রামে আদৌ তৃণ কুশ জন্মে না।

পূর্ব্বে “এসিয়া ইয়োরোপের মধ্যবর্ত্তী কাস্পিয়ান” নামক অতি বৃহৎ হ্রদের তট-

স্থিত আমুল নামক নগরী হইতে "সাইদ ফকিরুদ্দিন নামে" জনৈক পাঠান সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয়, আমুল শব্দের অপভ্রংশে অম্বুয়া মুলুক বলিয়া নামকরণ হইয়াছিল। এক্ষণে উহা হুগলী জেলার অন্তর্গত।

ফকিরুদ্দিনের পুত্র জামালদ্দিন ঐ স্থানে মসজিদ প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এ পর্য্যন্ত দীপ্তিমান আছে। ফকিরুদ্দিন ও আমালদ্দিন ও তদীয় মাতৃস্বসা এই তিনের কবর স্থানে ৩ খানি খোদিত প্রস্তর আছে।

পরিশেষে দিল্লির বাদসাহের প্রতিনিধি গৌড়ের নবাব হুসেন সাহা সপ্তগ্রামে গড়, এবং অট্টালিকাদি যাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার ভিত্তি-চিহ্ন আছে। পূর্ব্বে শ্রীমৎ রূপ সনাতন ঐ স্থানে পারস্য বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দাস রঘুনাথ গোস্বামীর পিতা কায়স্থকুলোদ্ভব হরিপুরনিবাসী বদান্যবর শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ও জ্যেষ্ঠভ্রাত শ্রীহিরণ্য দাস সপ্তগ্রাম নবাবের নিকট পত্তনি লইয়াছিলেন।

উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের যে স্থানে বাস ছিল, সেই স্থানে একটী বহুকালের মাধবীলতা বৃক্ষ আছে। ঐ লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নাই। ঐ লতা বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বট বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে, তাহার গুঁড়ির বেড় চতুর্হস্ত। প্রবাদ আছে, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে অন্ন ভোজন করিয়া "ভাতের কাঠি" ঐ স্থানে প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহাই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে।

ঐ মাধবীলতার স্থল বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ পাঠের মধ্যে একটী পাঠ। ঐ শ্রীপাঠে সাধু বৈষ্ণবের সমাগম ও প্রতিদিন হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। এখন সপ্তগ্রামে কিছুই নাই।

হুগলী বালীগ্রামে স্বর্গীয় জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে পূর্ব্বকালের ভাস্কর-নির্ম্মিত মহাত্মা দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের দারুময় স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বিরাজমান করিতেছেন, প্রতিদিন তাহার পূজা হয়। মূর্ত্তিটী অতি চমৎকার এবং স্থূলাকার, দেখিতে অতি মনোহর ঠিক ব্রজের রাখাল ভাব। বিভিন্নতার মধ্যে বৈষ্ণবের চিহ্ন সম্মুখের সর্ব্ব অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত ছাপ এবং কণ্ঠে ও হস্তে হরিনামের মালা আছে।

আর একটা কথা, "বিষস্য বিষমৌষধং" যেমন বিষে বিষ নষ্ট হয়, সেইরূপ অন্য রাজার আদেশ অন্য রাজা কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, বর্ত্তমান ইংরাজাধিকারে গত "সেন্‌শস্‌" অর্থাৎ লোক গণনায় সুবর্ণ বণিকদিগকে পূর্ব্ববৎ বৈশ্যজাতি বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। যাহাই হউক, সুবর্ণবণিক মহোদয়গণ "বৈষ্ণব ধর্ম্মটী বজায় রাখিয়া" অন্নপ্রাসনাদি সংস্কার পথটী যদি সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, বড়ই সুখের বিষয়।

* বৈষ্ণব দাস দাসানুদাস
শ্রীহারাধন দত্ত। বদনগঞ্জ।

মৌর্য্য বংশের উৎপত্তি।

মৌর্য্য রাজগণ।

চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক প্রভৃতি রাজগণের নাম ভারতের ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সকল রাজা যে বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নাম মৌর্য্যবংশ। মৌর্য্য এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলাই এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিষ্ণুপুরাণের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে মৌর্য্যরাজগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

[বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, পরিচ্ছেদ ২৩]

মৌর্য্যবংশ।

চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩২০
বিন্দুসার
অশোকবর্দ্ধন
সুযশঃ
দশরথ
সঙ্গত
শালিশুক
সোমশর্ম্মা
শতধন্বা
বৃহদ্রথ

মহাবংশ নামক সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ পালি ইতিহাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোক, এই তিন জন মৌর্য্য (মোরিয়) রাজের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিব্যাবদান নামক সুবিপুল বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের মতে রাজা বিন্দুসার নন্দের পুত্র। উক্ত গ্রন্থে অশোক ও তাঁহার বংশধরগণ মৌর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। সর্ব্ব প্রথম মৌর্য্যরাজ কে? তদ্বিষয়ে কোন আভাস দিব্যাবদান গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দিব্যাবদান অনুসারে বিন্দুসার ও তাঁহার বংশধরগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

[দিব্যাবদান, ২৬ এবং ২৯ অধ্যায়]

বিন্দুসার
অশোক
কুনাল
সংপদী
বৃহস্পতি
পুষ্যধর্ম্মা
পুষ্যমিত্র।

দিব্যাবদান মতে পুষ্যমিত্রের ধ্বংসেই মৌর্য্যবংশের ধ্বংস হয়।

বিষ্ণুপুরাণ ও দিব্যাবদান এতদুভয় গ্রন্থে উল্লিখিত মৌর্য্যরাজগণের নামের পরস্পর অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এই অসামঞ্জস্যের *

---

* অশোকের অনেক পুত্র ছিল। কেহ তক্ষশিলা, কেহ মগধ, কেহ কলিঙ্গ ইত্যাদি স্থানে রাজত্ব করিত। গ্রন্থবিশেষে পুত্রবিশেষের নাম উল্লিখিত হওয়ায়, নামসমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই।

কারণ কি? তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আমি, মৌর্য্য, এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মৌর্য্য নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্য হইতে এস্থলে তিনটী প্রধান মত উদ্ধৃত হইল :—

সংস্কৃত মত।

(ক) বিষ্ণুপুরাণের (৪র্থ অংশ ২৩ পরিচ্ছেদের) টীকায় লিখিত আছে, রাজা নন্দের মুরানাম্নী এক পত্নী ছিল। সেই মুরার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। মুরার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নামে খ্যাত হন। চন্দ্রগুপ্তই মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

(খ) দাক্ষিণাত্যের কোন ত্রৈলঙ্গ গ্রন্থে লিখিত আছে, নন্দবংশে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামে এক রাজার জন্ম হয়। উক্ত রাজার দুই পত্নী ছিল। প্রথম পত্নীর নাম সুনন্দা ও দ্বিতীয় পত্নীর নাম মুরা। কোন সিদ্ধ পুরুষের পাদোদক পান করিয়া উভয় পত্নীরই গর্ভের সঞ্চার হয়। সুনন্দার গর্ভে নয়টী ও মুরার গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। সুনন্দার গর্ভজাত সন্তানগণ নবনন্দ নামে খ্যাত হন এবং মুরার গর্ভজাত সন্তান মৌর্য্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতার আদেশে নবনন্দ মগধে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন, আর মৌর্য্য সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হন। মৌর্য্যের একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নবনন্দকে নিহত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য প্রাপ্তির সম্বন্ধে স্লেচ্ছাধিপ পর্ব্বতেন্দ্র * যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। মুরার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নামে পরিচিত হন।

পালি মত।

মহাবংশ সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ পালি ইতিহাস। ইহার অনেক পালি টীকা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে অনুরাধপুরের উত্তর বিহারে রক্ষিত টীকাই সমধিক প্রাচীন ও প্রামাণিক। এই টীকার পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় শাক্যবংশীয় কোন রাজা বিধুধব নামক কোন অধিরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হিমবৎ প্রদেশে (হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দিকে) পলায়ন করেন। সেখানে তিনি ময়ূরের আকারে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা ময়ূর সকল কেকা ধ্বনি উচ্চারণ করিত। ময়ূরের নাম অনুসারে ঐ নগর ময়ূর নগর নামে খ্যাতিলাভ করে। পালি ভাষায় ময়ূরকে মোর বলে। এইহেতু পালি গ্রন্থকারগণ ঐ নগরকে মোর নগর নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে শাক্যরাজ ঐ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ মোরিয় (মৌর্য্য) নামে প্রসিদ্ধ হন। উক্ত শাক্যরাজ ও তদীয় বংশধরগণ প্রায় দুই শত বৎসর মোর নগরে রাজত্ব করেন। পরে কোন্ প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বশেষ মোরিয়রাজ প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। উক্ত রাজপত্নী বহু কষ্টে তথা হইতে পলায়ন করিয়া মগধে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে ধননন্দকে নিহত

---

* পর্ব্বতেন্দ্র — পর্ব্বত + ইন্দ্র — শৈলক + ঈশ — শৈলকেশ — সেলুকস্ Seleucus the Greek ruler of Syria and Bactria.

করিয়া মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মোরিয় নগর হইতে চন্দ্রগুপ্তের মাতা এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ মোরিয় (মৌর্য্য) নামে পরিচিত হন।

বিনয় পিটকের বুদ্ধ ঘোষ প্রণীত টীকার নাম সমন্তপসাদিকা। উক্ত টীকায় মোরিয় রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা মহাবংশ টীকায় উদ্ধৃত ংশের অনুরূপ।

গ্রীক মত।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান্ ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতনতর।

ডাই ডোরস্ সিকুলস্ * লিখিয়াছেনঃ—

"আলেক্জান্দর পঞ্জাবরাজ পোরসের মুখে শুনিয়াছিলেন, চন্দ্রগুপ্ত কোন নীচ-বংশোদ্ভব নাপিতের পুত্র। উক্ত নাপিত অতিশয় রূপবান্ ছিল। (নন্দবংশীয় শেষ) রাণী তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হন। পরে উহারা নন্দরাজ ও তাঁহার ঔরস্ পুত্রগণকে নিহত করিয়া ফেলে। পূর্ব্বোক্ত নাপিতের ঔরসে ও রাণীর গর্ভে চন্দ্রমসের জন্ম হয়। চন্দ্রমসই এক্ষণে অনুগঙ্গ (মগধ) প্রদেশের রাজা।"

কুইণ্টস্ কারসিয়াস্ † প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ও চন্দ্রগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মতের সহিত জাতিবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থের মতের সৌসাদৃশ্য আছে। জাতিবিবেক মতে নাপিতের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, উহারাই মৌর্য্য।

উক্ত ত্রিবিধ মতের সমালোচনা।

চন্দ্রগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে এস্থলে যে সকল মত উদ্ধৃত হইল, উহার কোনটীই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিষ্ণুপুরাণের টীকায় বা ত্রৈলঙ্গ গ্রন্থে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মুরা শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া মৌর্য্য শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বৈয়াকরণগণ এরূপ প্রণালীতে সংস্কৃত শব্দ দূরে থাকুক অনেক হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল শব্দই ঔণাদিক প্রত্যয়ের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে। ব্যাকরণ-প্রতিপাদ্য প্রকৃতি প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। ইতিহাস ও ব্যাকরণ সম্পূর্ণ পৃথক্ শাস্ত্র। ব্যাকরণ অনুসারে মুরা হইতে

---

* He (Alexander) had learned from Phigaeus that beyond the Indus was a vast desert of 12 days journey, and at the farthest borders thereof ran the Ganges. Beyond this river dwell the Tabresians and the Gandaritæ whose king's name was Chandramas, who had an army of 20000 horse, 200000 foot, 2000 chariots, and 4000 elephants. The king could not believe this to be true, and sent for Porus, and inquired of him whether it was so or not. He told him all was certainly true, but that the present king of the Gandaritæ was but a mean and obscure extraction, accounted to be a barber's son; for his father being a very handsome man, the queen fell in love with him and murderd her husband, and so the kingdom dovolved upon the present king.— Didorus Siculus.

† He (Porus) added however, that the king was not only of low, but of extremely base orgin, for his father was a barber, whose personal merits recommended him to the queen. Being introduced by her to the king then reigning, he contrived his death, and under pretence of acting as guardian to his sons, got them into his power and put them to death. After their extermination he begot the son who was now king, and who, more worthy of his father's condition than his own, was odious and contemptible to his subject.— Quintus Curtius.

মৌর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হয় বটে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যে মুরার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রাচীন প্রমাণ এপর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নন্দরাজের মুরানাম্নী কোন ধর্ম্মপত্নী বা দাসী ছিল না।

বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মুরার গর্ভজাত বলিয়াছেন, পালিভাষার টীকাকারগণ অবিকল ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই চন্দ্রগুপ্তকে ময়ূরবংশ সম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পালিভাষায় মৌর্য্যকে মোরিয় বলে। মোরিয় শব্দ মোর শব্দের উত্তর ইয় প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। মোর শব্দের অর্থ ময়ূর। এই ময়ূরের সহ মোরিয় (মৌর্য্য) রাজবংশের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্ত পালি গ্রন্থকারগণ নানা কাল্পনিক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।

৫ গ্রীক ও রোমান্ ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রমসের (চন্দ্রগুপ্তের) জন্ম সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্থ। আলেক্জান্দর ঐ সকল বৃত্তান্ত পঞ্জাবরাজ পোরসের মুখে শুনিয়াছিলেন। পোরসের মহাশত্রু চন্দ্রগুপ্ত। এমন কি কথিত আছে, পোরসের নিধনের নিমিত্ত চন্দ্রগুপ্ত নানা ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সন্দেহ হয়, আলেকজান্দর পোরসের মুখে চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, উহার অধিকাংশই ঈর্ষ্যামূলক। চন্দ্রগুপ্ত বিগর্হিতভাবে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। অধিকন্তু আমার মতে চন্দ্রমস্ ও চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন ব্যক্তি। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ নন্দবংশে যে চন্দ্রমসের জন্ম বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি চন্দ্রগুপ্ত নহেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দের গ্রীষ্মকালে ব্যাবিলন নগরে আলেকজান্দরের মৃত্যু হয়। ঐ বৎসর শীতকালে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের হিন্দু অধিবাসিগণ আলেকজান্দরের উত্তরাধিকারীকে নিহত করিয়া যে ব্যক্তিকে পঞ্জাবের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তিনিই বোধ হয় চন্দ্রগুপ্ত। তিনিই বোধ হয় ধননন্দকে বিনাশ করিয়া, পরে মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বোধ হয় আলেকজান্দারের জীবদ্দশায় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন নাই। সুতরাং পোরস্ যে চন্দ্রমসের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি চন্দ্রগুপ্ত নহেন।

আমার মত।

সংস্কৃত, পালি ও গ্রীক এই তিন ভাষায় চন্দ্রগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে যে তিন প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের মধ্যে পালি বৃত্তান্তটী কথঞ্চিৎ সমূলক, কারণ, উহা হইতে বহু অনুসন্ধানে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিতে পারা যায়। উক্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, হিমবৎ প্রদেশ (হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান) মৌর্য্যগণের প্রাচীন বাসভূমি ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক সুঙ্ যুন্ ৫১৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতে ভ্রমণ করিতে আসিয়া মৌর্য্যবংশ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহ উদ্ধৃত পালি বৃত্তান্তের অনেক সামঞ্জস্য আছে। সুঙ্ যুন্ বলেন, শাক্য যুবকগণ কপিলবস্তু হইতে পলায়ন করিয়া উদ্যানদেশে (আফগানি স্থানে) যে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম মোরিয় (মৌর্য্য) নগর। চন্দ্রগুপ্তের মাতা এই মোরিয় নগরের সর্ব্বশেষ রাণী। পালি ও চীন এতদুভয় বৃত্তান্তের সমাবেশ করিয়া জানা যায়, মৌর্য্যগণ কার-

বহির্ভাগ হইতে এদেশে আগমন য়াছিলেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান আফগানি-নের উত্তর পশ্চিমে মেসড ও আষ্টারা-দের মধ্যবর্ত্তী হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সানুদেশই মৌর্য্য জাতির আদি বাসস্থান। সংস্কৃত গ্রন্থের মতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত হিমবৎ (হিমালয়) পর্ব্বতের একটী শাখা। হিন্দুকুশ শৈলের যে অংশে মৌর্য্যগণ বাস করিতেন, তাহার নাম মৌরু। উহা বর্ত্তমান মার্ভ (Merv) এর সন্নিহিত। গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস্ ও আরিয়ান্ ঐ স্থানকে যথাক্রমে মেরোস্ ও মেরোন্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিত সুবিস্তীর্ণ নগরের নাম নিসিবি। নিসিবি নামক স্থান হইতে যাহারা ভারতে আগমন করিয়াছিল, তাহারা এদেশে নিচ্ছিবি নামে পরিচিত হয়। পালি গ্রন্থকারগণ তাহাদিগকে লিচ্ছবি নামে অভিহিত করিয়াছেন। মেরোস্ বা মৌরু পর্ব্বত হইতে যাহারা এদেশে আসিয়াছিল, তাহারাই মৌর্য্য। লিচ্ছবি ও মৌর্য্য ইহারা উভয়েই একস্থান হইতে সমাগত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে বোধ হয় লিচ্ছবি * ও মৌর্য্য উভয়েই এদেশে নিচ্ছিবি বা লিচ্ছবি নামে পরিচিত ছিল। মনুর মতে নিচ্ছিবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। ব্রাত্য শব্দের অর্থ আচারভ্রষ্ট অর্থাৎ বিদেশীয়।

মৌর্য্যগণের ভারতে আগমন কাল।

মৌর্য্যগণ কোন্ সময়ে ভারতে সর্ব্বপ্রথমে আগমন করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কথিত আছে, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ কালে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কতিপয় মৌর্য্য (মোরিয়) গোরখপুর জেলার সন্নিধানে বাস করিত। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র নামক সূত্রপিটকান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, তাহাতে মোরিয়গণ পিপ্পলীবনে বাস করিত। এই হেতু তাহাদিগকে পিপ্পলীবনীয় মোরিয় (মৌর্য্য) বলিত। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শরীরধাতু ভাগ করিয়া লইবার জন্য নানাস্থান হইতে নানা ব্যক্তি আগমন করিয়াছিল। দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য বুদ্ধদেবের শরীর আট ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাগ লইয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করে। তদনন্তর পিপ্পলীবনীয় মোরিয়গণ আসিয়া বুদ্ধের শরীরধাতুর এক অংশ পাইবার জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। এই জন্য তাহারা বুদ্ধের দেহের ভস্মাবশেষ লইয়া ঐ ভস্মের উপর এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

মহা পরিনির্ব্বাণ সূত্রোক্ত উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হয় বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে মৌর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়াছিল। তখন তাহাদের অবস্থা সবিশেষ সমৃদ্ধ ছিল না। খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মৌর্য্যগণ ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে উহারা এত প্রবল হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত মগধ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। অশোকের সময়ে খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে মৌর্য্যগণের পূর্ণ প্রভাব। রাজচক্রবর্ত্তিপদ হইতে ভ্রষ্ট হইবার পর ও মৌর্য্যগণ ভারতের নানা স্থানে নানা ভাবে আধিপত্য করে। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে যে মোরি[illegible] জাতি

---

* স্বকীয় "প্রাচীন ভারতের লিচ্ছবিজাতি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (ভারতী ১৩০৯ সাল)।

চিতোর অধিকার করে, উহারাও বোধ হয় মৌর্য্য জাতিরই একটী শাখা। মোরিগণ রাজপুতদিগের মধ্যে সবিশেষ মাননীয় ও শ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা প্রমারবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচিত। প্রমারবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে * লিখিত আছে, অশোকের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণ অর্ব্বুদ পর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মহোমের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের বেদ মন্ত্রের প্রভাবে চতুর্ব্বিধ ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রমার ক্ষত্রিয় তাহাদের অন্যতম। ভবিষ্য পুরাণের এই কথা দ্বারা বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ শক, মৌর্য্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি জাতিকে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান পূর্ব্বক অশোকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করিয়া বৌদ্ধ, অনার্য্য ও বিদেশীয় জাতি সমূহকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মোরিগণ এই প্রণালীতেই বোধ হয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মনু যবনগণকেও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। বাক্ত্রিয় গ্রীকগণই যবন শব্দবাচ্য। সেলুকস প্রভৃতি গ্রীক রাজগণ এই যবন জাতির অন্তর্গত। যখন খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই, তখন ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি উপাধি অনেক পরিমাণে ব্যক্তিগত গুণের উপর নির্ভর করিত। এইজন্যই শৌর্য্যবীর্য্যশালী জাতিমাত্রই ক্ষত্রিয়। এই হেতুই চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসের কন্যা বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো * এই বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত পুরাণকার সেলুকস্‌কে স্থলুক্য নামে অভিহিত করিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত যে অতি প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সেলুকস্ সিন্ধুনদের পূর্ব্বভাগস্থিত সমস্তরাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিন্দুসারের সময়ে তক্ষশিলার প্রজাপুঞ্জ রাজদ্রোহ উপস্থিত করে, কিন্তু অশোকের সময়ে উহারা সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। অধিকন্তু অশোক বাক্ত্রিয় গ্রীক রাজ্যের অনেক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মৌর্য্যবংশের সময়েই ভারতে লেখন প্রণালী প্রথম প্রবেশ করে এবং কথিত আছে, এই সময়েই প্রতিমা পূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু এসকল বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য নাই।

ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে সাহাবাজগিরি নামক স্থানে যে অশোক শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উহার অক্ষর ও বাক্ত্রিয় রাজগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার অক্ষর প্রায় একই

---

* চন্দ্রগুপ্তস্তস্য সুতঃ পৌরসাধিপতেঃ সুতাম্।
সুলুক্যস্ত তথোদ্বাহ্য যবনীবৌদ্ধতৎপরঃ॥
ষষ্ঠিবর্ষং কৃতং রাজ্যং বিন্দুসারস্ততোঽভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমশোক স্তনয়োঽভবৎ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু কান্যকুব্জো দ্বিজোত্তমঃ।
অর্ব্বুদং শিখরং প্রাপ্য ব্রহ্মহোমমথাকরোৎ॥
বেদমন্ত্র প্রভাবাচ্চ জাতাশ্চত্বারি ক্ষত্রিয়াঃ।
প্রমরঃ সামবেদী চ চপহানির্যজুর্বিদঃ॥
ত্রিবেদী চ তথা শুক্লোঽথর্ব্বা স পরিহারকঃ।
ঐরাবতকুলে জাতান্ গজান্ আরুহ্য তে পৃথক্।
অশোকং স্ববশং চক্রুঃ সর্ব্বে বৌদ্ধা বিনাশিতাঃ॥
(ভবিষ্য পুরাণ।)॥

* Seleucus Nicator relinquished the country beyond the Indus to Sandracottus, receiving in its stead fifty elephants, and contracting an alliance with that prince (contracta cum eo affinitate.)—
Strabo.

প্রকার। তুরস্ক বংশীয় রাজা কনিষ্কের সময়ের শিলালিপির অক্ষর ও সাহাবাজ গিরি লিপির অক্ষর প্রায় তুল্য। এই সকল অক্ষর ভারতের উত্তরপশ্চিমে ব্যবহৃত হইত। অশোক ঐ সকল দেশ অধিকার করিয়া তদ্দেশীয় অক্ষরে স্বীয় শাসন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

উপসংহার।

অশোক যে উত্তর পশ্চিম প্রান্ত বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন, উহা অতি প্রাচীন কালে তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষগণের বাসভূমি ছিল। আমার মতে মৌর্য্যগণ প্রাচীন আর্য্য জাতির একটী শেষ শাখা। আফগানিস্থানের উত্তরপশ্চিম প্রান্ত আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসভূমি ছিল। ঐ স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। ভারতে ও তাঁহারা এক সময়ে আইসেন নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আর্য্যবংশ ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে সম্প্রদায় খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মৌর্য্যগণ তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত-বিচার

বিগত ফাল্গুন সংখ্যা নব্যভারতে "সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত" শীর্ষক আমি একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট কৃত মতের যে খণ্ডন আছে, উক্ত প্রবন্ধে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সমস্ত যুক্তি প্রমাণাদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত কি না, তাহার মীমাংসার ভার বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধে ৭টী যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শুধু পৃথিবী অচলা হইলে উল্লিখিত প্রমাণাদি অখণ্ডনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পৃথিবী শুধু স্থূল ভূভাগ মাত্র নহে, ধরণীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলীও ইহার অংশ বিশেষ। এবং পৃথিবীর স্থূল ভাগ হইতে যত ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত পার্থিব পদার্থ (matter) বর্ত্তমান আছে, ততদুর পর্য্যন্তই এই গ্রহের সীমা। এই সমস্ত বিভিন্ন অংশ যেন একই দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া প্রায় সমান গতিতে ঘুরিতেছে; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রমাণে ভাস্করাচার্য্যের অধিকাংশ যুক্তিই খণ্ডন হইয়া যায়। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে আমিও ইঙ্গিতে ইহাই ব্যক্ত করিয়া মাত্র ৭ম যুক্তি সম্বন্ধে আপত্তির কারণ প্রদর্শন করিয়াছি। গত চৈত্রের সংখ্যা নব্যভারতে "সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত প্রতিবাদ" নামধেয় ৩টী এবং বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখের সংখ্যায় "পৃথিবীর গতি" শীর্ষক একটী প্রতিবাদ-প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রতিবাদ প্রবন্ধ সকলের প্রদর্শিত যুক্তি প্রমাণাদি কতদুর সারগর্ভ, তাহার আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমতঃ ২ নং লেখকের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আমরা দুই একটী কথা বলিব।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধের যুক্তি খণ্ডন করিবার

জন্য লেখক বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ মধ্যে মধ্যে নানারূপ অপসিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপনার সাহায্য করিয়াছেন বলিতে হইবে।

আমার লিখিত মূল প্রবন্ধের প্রথম যুক্তি খণ্ডন জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিবাদ-লেখক বাষ্পীয় শকটের গতির উল্লেখ করিয়াছেন। যে বসুধা স্বীয় কল্পিত কেন্দ্র-শলাকার উপর অবস্থিত থাকিয়া রথ চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান বেগে স্বীয় পরিধি পরিবেষ্টন করে, তাহার গতির সহিত সমতল ভূমিতে সরল রেখায় গমনশীল বাষ্পীয় শকটের (রেলের চাকার নহে) গতির তুলনা অসামঞ্জস্য কি না, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে বিচার্য্য। লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, শকটের দ্রুতগতি নিবন্ধন যদি রেলের আরোহিবর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ ও স্থানভ্রষ্ট না হয়, তবে পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ অট্টালিকাদি বিচূর্ণিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা সুযোগ্য লেখককে জিজ্ঞাসা করি, রেলওয়ে লাইনের ন্যায় পৃথিবীর ভ্রমণপথ ঠিক সমতল ও ঋজু নাকি?—এবং পৃথিবী ও রেলওয়ে শকটের ন্যায় সরল গতিতে নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পরিক্রমণে সমর্থ হয় কি? পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ দৃঢ় নিবদ্ধ অট্টালিকাদি প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া কালে ভূপতিত হয়। বাষ্পীয় শকটের পৃষ্ঠ সংলগ্ন আরোহিবর্গও সেইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তে স্থানচ্যুত হইয়া ধরা বিলুণ্ঠিত হয় কি না, লেখক অতি সন্তর্পণে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদি না হয়, তবে উল্লিখিত যুক্তিটী যে নিতান্তই ভিত্তিশূন্য, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। বস্তুতঃ সম-আয়তন-বিশিষ্ট লৌহ ও তুলা উভয়ই তুল্য ভারী কি না, এ প্রশ্নটী মীমাংসা করা যত সহজ, উল্লিখিত উভয়বিধ গতির অসামঞ্জস্য’ উপলব্ধি করাও বোধ হয় তাহা অপেক্ষা গুরুতর কঠিন নহে।

এইরূপ অসার যুক্তি আরও দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমি প্রতিপন্ন করিয়াছি, "পৃথিবী সচলা হইলে বায়ু অপেক্ষা লঘুতর পদার্থপুঞ্জ পৃথিবীর গতির অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল গমনে সমর্থ হইত না।" প্রতিবাদ-লেখক এ যুক্তিটী খণ্ডন জন্যও বাষ্পীয় শকটের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বাষ্পীয় শকটারোহীর গতি এবং ধূম ও বাষ্পের গতি সমধর্ম্মী বলিয়া যিনি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার সহিত তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা! প্রতিবাদ লেখকের মতে শকটারোহী মনুষ্যও কি বায়ু অপেক্ষা লঘু পদার্থ? অন্যথা ধূম ও বাষ্পের গতি এবং চলন্ত শকটে আরূঢ় ব্যক্তির যথেচ্ছ গতি এতদুভয়ের সামঞ্জস্য কল্পনা করিতে লেখক কখনই প্রয়াসী হইতেন না। শকটগামী মনুষ্য যদি বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে ধূম ও বাষ্পের ন্যায় তাহারা বায়ু মণ্ডল ভেদ করিয়া কি ঊর্দ্ধগামী হইবে? এবং ব্যোম বিহারী খেচর সমূহের ন্যায় আকাশ-মার্গে বিচরণ করিবে না কি?

লেখক ৭ম যুক্তির আপত্তি খণ্ডন করিতে গিয়াও সেই অভাবনীয় বাষ্পীয় যানের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। বাষ্পীয় যানারোহী মনুষ্যের গতি ও শূন্যপথে ভ্রমণশীল বিহঙ্গের গতি পরস্পর বিসদৃশ ও

বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং বাহুল্যে নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীর সহিত সমগতিতে বায়ুরাশিও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইতেছে, ৩নং প্রতিবাদ-লেখক সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রদর্শিত যুক্তি খণ্ডন জন্য এইরূপ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গগনমার্গে সঞ্চারণমান বিহঙ্গ পৃথিবীর গতির অনুকূলে প্রধাবিত হইলে স্বীয় কুলায় প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু প্রতিকূল দিকে—পশ্চিমাভিমুখ গমনে তাহার শক্তি কেন প্রতিহত হইবে না, লেখক এ আপত্তি খণ্ডনে কৃতকার্য্য হন নাই। তবে চলন্ত যানের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উল্লিখিত যুক্তির অসারতা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা গিয়াছে; এস্থলে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখের সংখ্যা নব্যভারতে বাবু তারকেশ্বর রায় বি,এ,"পৃথিবীর গতি" নামীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মল্লিখিত "সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত" প্রবন্ধের প্রতিবাদ করাই তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি এই প্রবন্ধে গতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের ৭ম যুক্তির ভ্রান্তি নিরসনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলিতে পারি না। এ সম্বন্ধে ১ নং প্রতিবাদলেখক যে সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন,তাহা খণ্ডন হইলেই বর্ত্তমান লেখকের উল্লিখিত যুক্তির অসারতা প্রতিপাদিত হইবে বলিয়া পৃথক্‌ভাবে ইহার প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন ১নং প্রতিবাদ-লেখক প্রস্তাবিত প্রবন্ধের যুক্তি খণ্ডনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"বায়ুমণ্ডলও পৃথিবীর সহিত নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, এই বৃত্তান্ত মানিলে তাঁহার প্রথমোক্ত যুক্তিগুলি খণ্ডন হইয়া যায়।" প্রতিবাদ লেখক সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; এবং প্রবন্ধের মূলভিত্তি যে ৭ম যুক্তি, তাহার খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়া বক্ষ্যমান যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

"শূন্যে অবস্থিত অন্যান্য পদার্থ সকল যৎকালে বায়ুমণ্ডলের বেগদ্বারা গতিশীল হয়, পক্ষী ও তীর তৎকালে বায়ুমণ্ডলের বেগ ব্যতীত আর একটী বিপরীতগামী বেগযুক্ত থাকে, এই জন্য উহাদের উপর বায়ুমণ্ডলের যে বেগ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত কম হইয়া যায়। অন্যান্য পদার্থের গতি বুঝিতে পারা যায় না, সেইজন্য অপেক্ষাকৃত লঘুগতি-সম্পন্ন তীর ও পক্ষীর বিপরীত গতির অনুভব হয়।"

প্রতিবাদ-লেখকের এ যুক্তিটী সমীচীন হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, (পৃথিবীর গতির বেগ—পক্ষীর স্বকীয় বেগ)=এই আপেক্ষিক বেগে পশ্চিমদিক্‌গামী পক্ষী পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। এবং পূর্ব্বদিকগামী পক্ষী (পৃথিবীর গতির বেগ+পক্ষীর স্বকীয় বেগ)=এই যুক্ত বেগে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। পক্ষীর গতি ঘণ্টায় যদি ২০ মাইল ধরা যায়, তবে পশ্চিম দিকে গমনশীল পক্ষী এক ঘণ্টা সময়ে (১০০০—২০)=৯৮০ মাইল পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য স্থান হইতে পক্ষীর স্বকীয় গতি যে ২০ মাইল, ইহাই বিপরীত—অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখ গতি বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্বদিকগামী পক্ষীও তৎকালে (১০০০+২০)=১০২০ মাইল অনুকূল দিকে প্রধাবিত

হয়। অপিচ ঐ সময়ে পৃথিবীও পূর্ব্বদিকে ১০০০ মাইল অগ্রসর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পরস্পর বিপরীতদিক্‌গামী বিহঙ্গমবর্গ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠিক তুল্য পথ অতিক্রম করে। সুতরাং লক্ষ্যস্থান হইতে তাহাদের প্রত্যেকের দূরত্বও ঠিক্ তুল্য অর্থাৎ ২০ মাইল মাত্র। সোজা কথায় বলিতে গেলে পশ্চিম দিকে গমনশীল পক্ষী নির্দ্দিষ্ট সময়ে পশ্চিমাভিমুখে যতদূর যায়, লক্ষ্যস্থান হইতে পূর্ব্বদিক্‌গামী পক্ষীও পূর্ব্বদিকে ঠিক্ ততদূর অগ্রসর হইয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীর গতির অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা নিবন্ধন তাহাদের গতির কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না। এস্থলে পৃথিবীর গতি থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য হইয়া দাঁড়ায়;—অর্থাৎ পৃথিবী সচলা হইলেও যেরূপ, অচলা হইলেও পক্ষীর গতি ঠিক্ সেরূপ হইত, ইহাই প্রমাণিত হয়।

এই যুক্তি বলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, গণিতের সাহায্যে আমরা সে বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

যদি পক্ষীর বেগবল = পক্ষীর যথেচ্ছ গতি হয় (১) এবং পক্ষীর বেগবল + পৃথিবীর বেগবল = পক্ষীর যথেচ্ছগতি হয় (২)

তবে

পৃথিবীর বেগবল = ০ হইবে।

কারণ

পক্ষীর বেগবল = পক্ষীর যথেচ্ছ গতি (১)

= পক্ষীর বেগবল + পৃথিবীর বেগবল।

সুতরাং

পৃথিবীর বেগবল = ০।

প্রতিবাদ-লেখক আরও একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই ;—

পশ্চিমাভিমুখে শর সঞ্চালন করিলে (শরের গতি + পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখ গতি) শরের গতি যতদূর হওয়া সম্ভব, লক্ষ্যস্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাস্তবিক শরের গতি ততদূর হয় না। লেখক এই যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পৃথিবীর গতির প্রতিকূলে শরের গতি হওয়া একদা অসম্ভব। এস্থলে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, পৃথিবী গতিশীল এই প্রতিপাদ্য উপপত্তিটী স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইলে, লেখকের প্রদর্শিত যুক্তি প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে। অন্যথা পরীক্ষিত সত্যের বিপরীত বলিয়া উল্লিখিত যুক্তি বলেই প্রতিকূল মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। কারণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শরের গতি যে পরিমাণ হওয়া সম্ভব, লক্ষ্যস্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে শরের দূরত্বও ঠিক্ তত হয়। সুতরাং পৃথিবীর গতি-নিরপেক্ষ শরের গতিই ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে। বস্তুতঃ এ যুক্তিটী বিভিন্নভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দিকেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং লেখকের উল্লিখিত প্রমাণ বলে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

এইক্ষণ আর একটী যুক্তিদ্বারা আমরা পৃথিবীর গতিশীলতা মতের ভ্রান্তি প্রদর্শনে যত্নপর হইবে।

ভাটার সময়ে স্রোতের জলে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে একখানি নৌকা উত্তর ও একখানি নৌকা যদি দক্ষিণ দিকে ঠিক্ একই সময়ে তুল্যবেগে প্রধাবিত হয়, তবে স্রোতের অনুকূলতা বশতঃ দক্ষিণদিক্‌গামী নৌকার গতি অনুভূত হইবে না। কিন্তু উত্তরদিক্‌বাহী নৌকা, স্রোতের প্রতিকূলতা বশতঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত

ন্যূনতর বেগে ধাবমান হইবে। উভয় নৌকা হইতে নৌকার চালিত বেগ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,তাহাই স্রোতের বেগ বলিতে হইবে। কিন্তু স্রোতের অনুকূল দক্ষিণদিক্‌গামী নৌকা, ' স্রোতের প্রতিকূল উত্তরদিক্‌বাহী নৌকা হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অধিক পথ অতিক্রম করিবে। সুতরাং লক্ষ্য স্থান হইতে পরস্পরের দূরত্বের ন্যূনাধিক্য অবধারিত। কিন্তু স্রোত-বিহীন জলে ইহার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়;—অর্থাৎ একই সময়ে বিভিন্ন-দিক্‌গামী উভয় নৌকার দূরত্ব ঠিক্ তুল্য হইয়া থাকে। অপিচ প্রথমোক্ত স্থলে স্রোতের বেগ উভয় নৌকার গতির ন্যূনাধিক্যের কারণ, এবং শেষোক্ত স্থলে তদভাবেই যে গতির সমতা পরিলক্ষিত হয়, এ সম্বন্ধে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। এস্থলে স্রোতের জলকে গতিশীল পৃথিবী এবং নৌকাকে পক্ষী কল্পনা করিলে বিষয়টী সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পৃথিবী গতিশীল হইলে, একই সময়ে লক্ষ্যস্থান হইতে পৃথিবীর গতির অনুকূল ও প্রতিকূলগামী পক্ষীর গতি, স্রোতের জলে দক্ষিণ ও উত্তরদিক্‌বাহী নৌকার গতির ন্যায় পরস্পর ন্যূনাধিক্য হইত। কিন্তু পরীক্ষিত সত্য ইহার প্রতিকূল। অথচ স্রোতহীন জলে নৌকার গতি ও বায়ুসমুদ্রে ভাসমান পক্ষীর গতি অভিন্ন ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লিখিত যুক্তিবলে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়যে,—স্রোতবিহীন জলের ন্যায় পৃথিবীও গতিহীনা।

উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এইক্ষণ কোন কথা বলিতে গেলে পাশ্চাত্য মন্ত্র-মুগ্ধ সম্প্রদায় একেবারে খড়্গাহস্ত হইয়া উঠেন। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাহার অবসর আছে। প্রবন্ধ-লেখককে কেহ "পাশ্চাত্য অতুলনীয় জ্ঞানগরিমানভিজ্ঞ" প্রভৃতি সুমধুর বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়াছেন। কেহ বা "এরূপ একটা সহজ প্রশ্ন মীমাংসার জন্য মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখা ধৃষ্টতার পরিচয়" এরূপভাবে দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তবে প্রবন্ধ-লেখককে বাতুলাশ্রমে প্রেরণের ব্যবস্থা না করিয়া প্রতিবাদী সম্প্রদায় যে এত সহজে নিরস্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট উদারতা! শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ। (১)

পরাক্রমী পাঠানপুঞ্জের প্রখ্যাতি, প্রাচীনত্ব, বিভব, বীরত্ব, বিক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বজাতি-প্রেম এবং স্বদেশবৎসলতা—বিশেষতঃ তাহাদের সমগ্রজাতির স্বভাব ও চরিত্র এবং তাহাদের বিরাট প্রদেশের প্রকৃতি ও ইতিবৃত্ত—প্রকৃষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে,পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশের পশুভাষা-ভাষী পাঠান জাতির সহিত সর্ব্ব প্রথমে সহবাস করা নিতান্ত আবশ্যক। বঙ্গবাসী পাঠানদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, বিশেষতঃ ইহারা কাল প্রভাবে এরূপ অনুন্নত অবস্থায় পতিত হইয়াছে এবং ইহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব, সভ্যতা, চরিত্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি এরূপ হীন হইতে হীনতর হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাদিগের দেহস্থ ধমনীতে বিশুদ্ধ পাঠান রুধিরের অণুমাত্রও আছে

কিনা সন্দেহ। ভারতের অন্যান্য অংশেও পাঠানের সংখ্যা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যায়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মালাবার উপকূলস্থিত কালিকট প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাঠান সম্প্রদায় বাস করে,তাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও স্বধর্ম্মাচারী মুসলমান গুরুর সহবাসে বঞ্চিত থাকায়, বর্ত্তমান সময়ে এতাদৃশ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে,"পাঠান" বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার তাহাদের আছে কিনা,তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া পাঠান চরিত্র বুঝিতে হইলে, পঞ্চনদবিধৌত পঞ্জাব প্রদেশে পরিব্রজন করা নিতান্ত আবশ্যক; পঞ্জাব হইতে পথিকেরা আফগানিস্থানে আগমন করিলে পাঠান চরিত্রের সম্পূর্ণতা সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন। আমরা সুদূরবর্ত্তী আফগানিস্থানের কথা প্রবন্ধান্তরে বর্ণনা করিয়া পাঠকের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; বর্ত্তমান প্রস্তাবে পঞ্জাবীয় পাঠান প্রদেশের বিবরণে হস্তক্ষেপ করিতে আকাঙ্খা করি।

পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রখ্যাত জিলার বর্ত্তমান নাম রাওলপিণ্ডি। রাভল্ অথবা রাওয়াল্ সিংহ নামক পৌণ্ড্র জাতীয় জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুবীরকুলাগ্রগণ্য ব্যক্তির নামে রাওলপিণ্ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। * প্রকৃত প্রস্তাবে, এই জেলা হইতেই পাঠান প্রদেশের সূত্রপাত। রাওলপিণ্ডির অন্তর্গত হোসেন-আবদাল ষ্টেশন হইতে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত পদব্রজে অথবা বাষ্পীয় শকট যোগে গমন করিলে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই নিরবচ্ছিন্ন পাঠানপুঞ্জে পরিবৃত এবং সম্যকরূপে সমাচ্ছন্ন। এই সকল পাঠানেরা হিন্দি, গুরুমুখী বা উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন করেনা, ইহাদের মাতৃভাষার নাম পস্তু, ইহাই আফগানিস্থানের পাঠানের একমাত্র ভাষা। হোসেন-আবদাল ষ্টেসনের নিকটে "পনজা সাহেব" নামক শিখদিগের অতীব প্রাচীন এবং পবিত্র তীর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। এইস্থানে শিখ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ভুবন-বিখ্যাত শ্রীমৎ বাবা নানক, তপস্যা দ্বারা "সিদ্ধি" লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বাবা নানক যে পূত-কলেবর ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পরব্রহ্মের পরমারাধনায় প্রকৃষ্ট রূপে প্রশান্তমনা থাকিতেন, তাহা আজিও ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য অনন্ত আকাশের ক্রোড়ে উর্দ্ধমস্তক হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; পথিকেরা রেলওয়ে শকট হইতে শৈল-শিখা দর্শন করিবা মাত্র উন্নত মস্তকের উষ্ণীষ ও টুপি খুলিয়া আজিও সভক্তি প্রণাম করিয়া থাকে। শুনা যায়, ভক্তাধিক ভক্ত বাবা নানকের পরীক্ষার জন্য, দেবতারা "যুবতী রমণী" রূপে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; নানা প্রকার প্রলোভনেও যখন তিনি কুকর্ম্মের প্রশ্রয় দেন নাই, তখন দেবতারা তাঁহার গাত্রে ঐ পর্ব্বতটীকে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করেন। পর্ব্বতটী বক্রভাবে নানকের মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে যোগীবর নানক তাহা

* রাওলপিণ্ডি নগরে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের একটী সুন্দর কালী মন্দির, পাঠাগার (লাইব্রেরী), বালক বিদ্যালয় এবং রঙ্গালয় (থিয়েটার) আছে। লেখক।

জানিতে পারিয়া, আপনার দক্ষিণ হস্তস্থিত পাঁচটী অঙ্গুলি দ্বারা পর্ব্বতের গতিরোধ করেন; মহাযোগীর আধ্যাত্মিক তেজে হোসেন-আবদালের পর্ব্বত আজিও বক্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং বাবা নানকের পবিত্র করকমলের চিহ্ন তথায় এখনও সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। "পঞ্জা" শব্দের অর্থ হস্তের শেষ ভাগ (অঙ্গুলি), "সাহেব"শব্দের অর্থ শ্রীমৎ, পবিত্র, ইত্যাদি। আমরা যেমন কেবল গীতা বা কেবল ভাগবত না বলিয়া শ্রীমৎভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমৎভাগবত বলিয়া থাকি, কেবল পিটার না বলিয়া যেমন পিটর্ দি গ্রেট্ বলিয়া থাকি, অথবা কেবল খড়দহ না বলিয়া যেমন শ্রীপাঠ খড়দহ বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ শিখেরা পন্‌জা শব্দের সঙ্গে সাহেব শব্দ যোজনা করিয়া মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। হোসেন-আবদালের জলবায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ, পর্ব্বতের ঝরণায় বারমাস এরূপ সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর ও নির্ম্মল নীর পাওয়া যায় যে, পান বা স্নানের জন্য অন্য জলের আদৌ প্রয়োজন হয় না। হাজারা, কোহাট, কৃষ্ণ পর্ব্বত (Black Mountain), কাশ্মীর, কাবুল প্রভৃতি স্থানে, হোশেন-আবদাল হইতে সহজে গমন করা যাইতে পারে। প্রায় সার্দ্ধৈক ক্রোশ অন্তরে "বাঃ" নামে এক অতীব মনোহর গ্রাম আছে, তাহার জলবায়ুর স্বাস্থ্যকর গুণের কথা, বিশেষতঃ তথাকার প্রকৃতির শোভা এবং অধিবাসীদিগের সৌন্দর্য্য এতাদৃশ চমৎকার যে,তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। এখানকার সমীরণ কিছু দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে, মানুষের "চেহারা"র পরিবর্ত্তন হয়, এবং জল এতই স্বাস্থ্যকর যে, তাহা পাথরকেও হজম্ করিয়া দেয়। এই গ্রামে একটীও হিন্দু নাই, গ্রামের প্রান্তে এক ঘর শিখ আছে, সে ব্যক্তি একটা স্বর্ণকারের দোকানের স্বত্বাধিকারী। সম্রাট-শেখর আওরংজেব এখানে আগমন করিয়া এস্থানের জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতা, প্রাকৃতিক শোভার মহোৎকর্ষতা এবং ফল ফুলাদির সৌলভ্য ও প্রাচুর্য্য দর্শন করতঃ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন "বাঃ!!" শুনা যায়, সেই হইতে এই স্থানের নাম বাঃ (wah) হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এই গ্রাম অতীব মনোহর; প্রত্যেক চেতস্মান পথিক এই গ্রামের ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই গ্রামে একটীও কূপ বা সরোবর নাই, থাকিবার আবশ্যকতাও নাই, কারণ পর্ব্বতের প্রশস্ত শরীর হইতে অহোরাত্রি প্রচুর পরিমাণে সুশীতল ও স্বাস্থ্যকর সলিল নিঃসৃত হইয়া সমুদয় গ্রামবাসীর জলাভাব মোচন করিয়া থাকে। এখানে আঙ্গুর, দ্রাক্ষা, আক্রোট, লেবু প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সুরস ফল এত সুলভ ও প্রচুর যে, দুই পয়সার ফল ক্রয় করিলে একটা লোকের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার হইয়া থাকে। বাঃ গ্রামের জমিদার এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন অধিবাসী মহামান্য নবাব সার সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ, কে, সি, এস্, আই, মহোদয়, পঞ্জাবীয় মুসলমান সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা। বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, শিক্ষা, সভ্যতা, ধন, মান, গৌরব, সৌরভ প্রভৃতিতে পঞ্জাবে হেয়াৎ খার সমকক্ষ কোনও মুসলমান এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি অনেকদিন পর্য্যন্ত বিক্রমী বৃটীশ সরকারের অধীনে ডেপুটী কমিশনার এবং জজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া-

ছিলেন, পরিণামে পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া কাশ্মীরের মহারাজাধিরাজের মন্ত্রিত্ব করিয়া সম্প্রতি পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। পাঠান-কুলতিলক হেয়াৎ খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর সর্দ্দার :গোলাম মহম্মদ বাহাদুর পাঠান সমাজের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রান্ত প্রদেশে চিৎরালের (Chitral Frontiers) গবর্ণর (শাসন-কর্ত্তা) পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমি যখন ইহাঁকে অসংখ্যাসংখ্য প্রবল পরাক্রান্ত, দুর্দ্দমনীয়, স্বাধীনতাপ্রিয়, অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য এবং মহাহিংস্রক পার্ব্বতীয় মুসলমান ও মহাবিক্রমী হিন্দুজাতির গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত দেখিয়াছিলাম, তখন ইহাঁর বয়স ২৩ বৎসর মাত্র! অথচ অগণ্য প্রজা-পুঞ্জের মধ্যে একজনও হিন্দু অথবা একজনও মুসলমান ইহাঁর বিরুদ্ধে কদাপি একবারও অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। কাশ্মীরের মহারাজা এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উভয়েই ইহাঁকে সুদক্ষ ও সুযোগ্য পুরুষ বলিয়া ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। সর্দ্দার গোলাম মহম্মদের সন্তানের গবর্ণরী দেখিয়া অতঃপর আর কে বলিতে পারে, ভারতবর্ষীয় হিন্দু কি মুসলমান অল্প বয়সে দায়ীত্ব পুর্ণ উচ্চ পদে আরূঢ় হইয়া স্বকার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম?

হোসেন আবদালের অব্যবহিত পরেই আটক নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর দেখিবার যোগ্য। যে নদের সুন্দর, সুশীতল ও স্বচ্ছ সলিলে কত শত হিন্দুবীর স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য হাস্যমুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গিয়াছেন, যে নদের পার্শ্বস্থ প্রশস্ত পার্ব্বত্য প্রান্তরে উপবেশন করিয়া কত শত সাধ্বী হিন্দুরমণী হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য কৈলাসপতি কপিশাঞ্জনের আরাধনায় বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সহকারে অতি কাতর ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল, যে নদের তমিস্র তটদেশে বসিয়া স্বদেশবৎসল হিন্দুবীরেরা তরঙ্গতেজে একটী তরণীর জলমগ্ন-ভাব অবলোকন পূর্ব্বক ভারত-গৌরব-সাগরে হিন্দুর স্বাধীনতা-তরণীর সম্পূর্ণ বিনাশাশঙ্কা করিয়াছিলেন*, সেই ভুবনবিখ্যাত সিন্ধুনদের তটে কালামুখী আটকনগরী আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই আটকেই হিন্দুর সৌভাগ্য-সূর্য্য সর্ব্ব প্রথমে অস্তমিত হয়, এই আটকেই মুসলমান হস্তে হিন্দুর স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। কবি গাহিয়াছেন—

> "একতায় হিন্দুরাজগণ
> সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন।
> সে ভাব থাকিত যদি
> পার হোয়ে সিন্ধুনদী
> আসিতে কি পারিত যবন?"
>
> ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আটক রাওলপিণ্ডি জেলার একটী মহকুমা। এই মহকুমা হইতে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত দুই ধারেই কেবল পাঠান আর পাঠান!! বাউরী চুল, লম্ব দাড়ী ও প্রশস্ত গুম্ফ সমাযুক্ত, ঘাঘরার ন্যায় সুলম্ব পায়জামা পরিহিত, সবল ও সুন্দর দেহী পাঠান আর পাঠান ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। আটক পার্শ্বে সিন্ধুনদের প্রশস্ততায় পথিকেরা চমৎকৃত হইয়া থাকেন। ভারতে প্রবেশ করিতে হইলে এই প্রশস্ত সিন্ধুনদের তরঙ্গায়িত বক্ষে তরণী ভাসাইতে হয়, তরণী দ্বারা

---

* Read the "Mahomedan conquest of the Panjab" Part II. (Traditions), Page 168., By T. Bushanel, M.A., I. C. S.

সিন্ধু নদ পার হইয়া মুসলমানেরা সর্ব্ব প্রথমে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। আটকের পাঠানেরা প্রবল পরাক্রান্ত, ইহারা যেমন বিক্রমী, তেমনি (ইংরাজ) বিদ্বেষী। ইহাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে, বিশ্বত্রাস বৃটীশ বীরকেও সভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়। এখনকার পরাক্রমী পাঠানেরা কেবল ছলী বা বলী নহে, ইহারা ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং স্বধর্ম্মে ও স্বজাতিপ্রেমে দিবানিশি উন্মত্ত। ইংরাজ-বীর যত বড় বলীয়ান হউন, পাঠান-বীর কখনই ইংরাজকে সমকক্ষ বলিয়া সম্মান করে নাই; এই জন্য একজন দরিদ্রাদপি দরিদ্র অথবা হীনাদপি-হীন পাঠান-শিশু বৃটীশ বীর-কেশরীকে মূষিক শাবক বলিয়া এখনও উপেক্ষা করে। বাস্তবিক ইংরাজ সরকার এতদঞ্চলের পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত রাখিবার জন্য সততই সচেষ্ট, অথচ রাশি রাশি রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা জলের ন্যায় অপব্যয় করিয়াও ইংরাজ পুরুষ পাঠানের "মনের মানুষ" হইতে পারেন নাই। পাঠানদিগকে ইংরাজ বলেন "তোমরা তোমাদের আত্মমর্য্যাদা (Self-dignity) ছাড়িয়া দাও," পাঠান বলে "যেদিন আত্মগৌরব ছাড়িব, সেই দিন আমাদের পতন হইবে। মানুষ যদি আত্মমর্য্যাদা ছাড়ে, তাহা হইলে সকল কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়ে। সে মানুষ আর পাথরে কিছুই প্রভেদ থাকে না। খাইতে বা পরিতে না পাই, তবুও ভাল, তথাপি কুলগৌরব ছাড়িতে পারি না।" বাস্তবিক পাঠানের ভয়ে পরাক্রমী ইংরাজ সদাই ভীত; বাস্তবিক এদেশে ইসলামে ও ইংরাজে অহি নকুলের সম্পর্ক বিশেষরূপে বিদ্যমান। পাঠানের ভয়ে ইংরাজকে সতর্ক ও সভয় দেখিয়া আমরা ইংরাজ-পুরুষকে কাপুরুষ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না, বরং বৃটীশের বুদ্ধিমত্তা, চতুরতা, সাবধানতা ও রাজনৈতিক কুশলতার আমরা প্রকৃষ্টরূপে প্রশংসা করিয়া থাকি, কারণ "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতির অনুসারী না হইলে এদেশে বাস করা সংসারী লোকের পক্ষে সুকঠিন। পাঠানকে ভয় করিবার অনেক কারণ আছে; পাঠানেরা জীবনে মমতাশূন্য, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণাবলী হইতে বিগত-হৃদয়, স্বধর্ম্ম ও স্বকীয় স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য সর্ব্ববিধ ছলের প্রকৃষ্ট পরিপোষক, প্রতি হিংসা-পরায়ণতায় সতত প্রমত্ত, সর্ব্ব প্রকার উদার সংস্কারে অন্ধ, এবং "দেশশত্রু, ধর্ম্মবৈরী, ফিরিঙ্গির শোণিত দর্শনে স্বর্গলোকে মোক্ষলাভ হয়" এই বিশ্বাসে সর্ব্বথা অনুপ্রাণিত। তদ্ভিন্ন আর একটা বিশিষ্ট বিষয় ভাবিবার আছে। গুপ্ত শত্রু হইতে প্রকাশ্য শত্রু চিরকালই প্রশংসার পাত্র। "ঘরভেদী বিভীষণ" লঙ্কাধিপতি রাবণের যেরূপ ভীতির কারণ ছিলেন, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র সেরূপ ভীতির কারণ ছিলেন না; কারণ রাম প্রকাশ্য বৈরী কিন্তু বিভীষণ গুপ্ত শত্রু। লুপ্ত-ধর্ম্ম পাঠানেরা গুপ্ত শত্রু বলিয়া ইংরাজের এত ভয় !"

আটকের দুই পার্শ্বে, পাঠান প্রদেশের পার্ব্বত্যাংশের অনেক দূর ব্যাপিয়া, বড় বড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বৃটীশ বীর পাঠানের কোপ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছেন। বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য এইটা খুব প্রয়োজনীয় দ্বার। এই পথে পথিকদিগকে নানা প্রকার কঠিন রাজনৈতিক নিয়মের

অধীন হইয়া চলিতে হয়। সন্দেহ হইলে প্রান্তপ্রদেশস্থ কর্ম্মচারীকুল, পথিকদিগের দ্রব্যাদি অবাধে অনুসন্ধান করিতে পারেন। সন্দেহের বিশিষ্ট কারণ থাকিলে রাজবিধি মতে তাঁহারা পথিকের গতিরোধ করিতে পারেন। আটকের সেনা, সেনাধিনায়ক ও রাজনৈতিক কর্ম্মচারীগণ সততই সতর্ক থাকেন; কূটরাজনীতি-বিদ্যায় ইহাদের এক একজন দ্বিতীয় চাণক্যের সমতুল্য; কিন্তু পঞ্জাবীয় পাঠান প্রদেশে যাহাই কিছু দেখ, ইংরাজের "সরগর্ম্মী", সাবধানতা ও কীর্ত্তিমালার দিকে যতই দৃষ্টিপাত কর—আটক পার্শ্বস্থ সিন্ধু-বক্ষের সেতু সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুককর ও বিস্ময়োদ্দীপক বলিয়া বোধ হয়। আটকের সিন্ধু-সেতু বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব পদার্থ!! সিন্ধু নদের উপরে এই সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত সেতু ভারতের উত্তর প্রান্তের প্রধান দ্বার স্বরূপ। এই দ্বার রক্ষা করিতে পারিলে ভারত রক্ষা করা হয়। তৈমুরলঙ্গ, আলাউদ্দীন, মহম্মদঘোরী, সবক্তাগীন, আল্প্তাগীন, কাসিম, আলেক্জন্দর (সেকেন্দর বাদসাহ), সিলিউকশ্, দরায়ুস, প্রভৃতি এই পথ দিয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। সোলেমান ও শতাবের পর্ব্বতের মধ্যদেশে সিন্ধুবক্ষে ইংরাজ প্রভু এই মহাসেতু বন্ধন করিয়া বৃটীশ সিংহের প্রভূত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। রাউলপিণ্ডি এবং তাহার পার্শ্বে প্রায় দ্বাবিংশটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বৃটীশবীর বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতেই আবার এই সেতুর উদ্ভব!!

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য এবং প্রধান প্রধান সমাজের ও প্রসিদ্ধ মধ্য-শ্রেণীয় পণ্ডিতগণের বিবরণ।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান—এই কৌলীন্য-প্রবর্ত্তক নবগুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।(১) মহারাজ বল্লালসেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে, উক্ত নবগুণ দেখিয়া প্রথমতঃ কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের সময়ে, রাঢ়ীয় ষট্পঞ্চাশৎ গ্রামীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, মুখুটী, বন্দ্য, চট্ট, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল ও কুন্দগ্রামী (২) এই আট গাঁই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরাই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন কর্ত্তৃক, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে, প্রথম কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইবার কতিপয় শতাব্দী পরে, দেবীবর ঘটক পুনর্ব্বার তাৎকালিক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণকে মেলবদ্ধ করিয়া রাঢ়ীয়

---

(১) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।

বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার। ২য় সংস্করণ। ২০ পৃঃ।

(২) বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ।

ঐ ঐ ২১ পৃঃ

(৩) শ্যামাট ও মুয়াড় গ্রামও, কোন কোন মতে, সমাজ মধ্যে পরিগণিত।

ব্রাহ্মণসমাজে যুগান্তর উপস্থিত করেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, (প্রথম অধ্যায় দেখ), মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্য অথবা বন্দ্যঘটী, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখুটী, কাশ্যপগোত্রীয় চট্ট, বাৎস্য গোত্রীয় কাঞ্জিলাল, পূতিতুণ্ড ও ঘোষাল, এবং সাবর্ণগোত্রীয় গাঙ্গুলি গাঁই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ, উক্ত সমাজের অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, আপনাদিগকে সমধিক মর্য্যাদাপন্ন মনে করিয়া থাকেন। মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, ভেমুয়া, চাঁপাডালি, গোকুলনগর, মহারাজপুর, ভোগদণ্ড এবং পীতপুর এই কয়টী স্থান প্রধান সমাজ বলিয়া পরিগণিত (৩)। তন্মধ্যে ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের মুখুটী গাঁই ও ভরদ্বাজ গোত্র; গোকুলনগর ও মহারাজপুরের ভট্টাচার্য্যগণের চট্টগাঁই ও কাশ্যপগোত্র; চাঁপাডালি এবং ভোগদণ্ডের ভট্টাচার্য্যগণের বন্দ্যগাঁই ও শাণ্ডিল্য গোত্র শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পারিহা গাঁই বিশিষ্ট পীতপুরের ভট্টাচার্য্যগণ, আপনাদের বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য নিবন্ধন, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলের মুখুটী, বন্দ্য, চট্ট, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি ও কাঞ্জিলাল গাঁই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ, ভেমুয়া প্রভৃতি ছয় সমাজের ভাট্টাচার্য্য বংশ সম্ভূত না হইলেও, সমাজে মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায়, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজেও মুখুটি, বন্দ্য, চট্ট, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি ও কাঞ্জিলাল এই কয়েক গাঁইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত, রাঢ়ীয় কৌলীন্যের চিহ্ন অদ্যাপি মধ্য শ্রেণীয় সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু রাঢ়ীয় কৌলীন্যের অন্যান্য অধিকাংশ লক্ষণ, মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে রাঢ়ীয় কৌলীন্যের কীদৃশ রূপান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায়, মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে “আমি অমুক মেল ভুক্ত” ইত্যাকার পরিচয় দিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। দেবীবর ঘটক বিশারদের মেল বন্ধনরূপ বিষবৃক্ষ যে মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষেত্রে রোপিত হইতে পারে নাই, তাহা এই মেল বন্ধনের অবিদ্যমানতা দ্বারা সম্যক্ প্রমাণিত হইতেছে।

(২) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যের ন্যায়, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য বংশগত নহে; পরন্তু উহা ব্যক্তিগত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি “আচারো বিনয়ো বিদ্যা” প্রভৃতি নবগুণ বিশিষ্ট হইয়া অন্নদান, বিদ্যাদান, ও সৎপাত্রে কন্যাদান করেন, তিনিই মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীন বলিয়া মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ, “আচারো বিনয়ো বিদ্যা” প্রভৃতি নবধা কুললক্ষণ সংক্রান্ত শ্লোকটী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রধানতঃ সদাচার, অন্নদান, বিদ্যাদান, ও কন্যাদানকেই কৌলীন্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভেমুয়া প্রভৃতি ছয় সমাজের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর পূর্ব্ব পুরুষগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, সৎপাত্রে কন্যাদান, অকাতরে অন্নব্যয় ও বহুবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। অদ্যাপি নিজগৃহে চতুষ্পাঠী-স্থাপন করিয়া

অন্ততঃ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের অধ্যাপনা এবং যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিতে পারিলে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন। হায়! মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সেই শুভদিন অতীত হইয়াছে। এককালে প্রায় সকল মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণই অল্পবিস্তর সংস্কৃতের চর্চ্চা এবং অন্নদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেন। বোধ হয়, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের কিছুদিন পরেই মুখুটী প্রভৃতি গাঁই বিশিষ্ট না হইয়া কেবল মাত্র বিদ্যাদান, অন্নদান ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উক্ত সমাজে কুলীন বলিয়া সমাদৃত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই অবস্থা দ্বারা রাঢ়ীয় ও মধ্যশ্রেণীয় কৌলীন্যের পার্থক্য অনুমিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রাগুক্ত ছয় সমাজের মধ্যে পীতপুরের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী উল্লিখিত হইতে পারে। পীতপুরের ভট্টাচার্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যথাসম্ভব কৌলীন্যপ্রবর্ত্তক নবগুণ বিশিষ্ট হইয়া, অন্নদান, বিদ্যাদান, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথচ উঁহাদের "পারিহা" গাঁই, অর্থাৎ ভেমুয়া প্রভৃতির ভট্টাচার্য্যগণের ন্যায় মুখুটী, চট্ট প্রভৃতির একটীও নহে। কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে "পারিহা" গ্রামীণ ব্রাহ্মণেরা গোণকুলীন (৪) অথবা অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ এবং অরি (৫) বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে একবারেই বংশগত কৌলীন্য নাই, তাহা নহে। কারণ, ভেমুয়া, চাঁপাডালি, গোকুলনগর, মহারাজপুর ও ভোগদণ্ড প্রভৃতি সমাজ-সৃষ্টিই বংশগত কৌলীন্যের পরিচয় দিতেছে। বিশেষতঃ তত্তৎস্থলের বর্ত্তমান ভট্টাচার্য্যগণ আপনাদিগকে পুরুষানুক্রমে কুলীন বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। এবং উক্ত পরিচয়ের যাহাতে খর্ব্বতা না হয়, তদ্বিষয়ে অতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের বর্ত্তমান ও প্রাচীন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, উক্ত সমাজে বহুদিন হইতে, বংশগত অপেক্ষা ব্যক্তিগত কৌলীন্যের প্রতি অধিক আদর প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সকল সমাজেই প্রকৃত কৌলীন্য অপেক্ষা, কৌলীন্যাভিমানেরই অধিক আদর হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(৪) "আর দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গুড়, পিপলাই, হড়, গড়গড়ি—এই চৌদ্দ গাঁই সদাচার পরিভ্রষ্ট ছিলেন। এজন্য গোণকুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।" * * * * "এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ১ প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়; আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গোণকুলীন হইলেন। * * * * দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচার ভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।"

বহুবিবাহ, ২য় সং। ২২-২৩পৃঃ

(৫) "আর গোণকুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে, এককালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত গোণকুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন।"

"অরয়ঃ কুলনাশকাঃ।
যৎকন্যালাভমাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

বহুবিবাহ। ২য় সং। ২৩-পৃঃ।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে বংশগত কৌলীন্য-রক্ষা সম্বন্ধে ঘটক সম্প্রদায়ের সাহায্য যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা ঘটকের লক্ষণ পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। যথা—

> "বল্লাল বিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্।
> শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥
> অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
> ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্॥"

বহুবিবাহ। ২য় সং। ২৩-পৃঃ

অর্থাৎ, "কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লাল সেনের আদেশানুসারে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ, দোষ, ও কৌলীন্যমর্য্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।" ঐ ঐ

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে উপর্য্যুক্ত লক্ষণাক্রান্ত ঘটক অথবা অন্য কোন পৃথক্ সম্প্রদায় যে পূর্ব্বে ছিল না এবং অদ্যাপিও নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং উক্ত সমাজে ঘটক সম্প্রদায়ের অবিদ্যমানতা দ্বারা, বংশগত কৌলীন্য যে নাই, তাহা অনেকাংশে প্রমাণিত হইতেছে।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের কোন কুলগ্রন্থ নাই। অন্ততঃ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের কারণ কিম্বা তন্মূলক কোন ঘটনা অথবা ভেমুয়া প্রভৃতি সমাজগুলির বিবরণ কিছুমাত্র লিপিবদ্ধ নাই। বোধ হয়, ঘটকদিগের সহিত বিরোধ ও সংস্রবত্যাগ নিবন্ধন মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সামাজিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রথা প্রথম হইতেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত "মিশ্রগ্রন্থ" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলপরিচায়ক গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সামাজিক বিবরণ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা ঘটক সম্প্রদায়ের একটী মুখ্য কার্য্য ছিল। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটক সম্প্রদায়ের তিরোধান হওয়ায়, এবং ঘটকদিগের ন্যায় সামাজিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার কাহারও উক্ত সমাজে ব্যবসা না থাকায়, সম্ভবতঃ, কোন কুলগ্রন্থ রচিত হয় নাই। তাৎকালিক সমাজের শীর্ষ স্থানীয়গণও, বোধ হয়, কোন কুলগ্রন্থ রচনা করা আবশ্যকীয় কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "কুলীন" শব্দেরই সমধিক প্রচলন ও সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বংশজ, সিদ্ধ অথবা শুদ্ধ, কিম্বা কষ্টশ্রোত্রিয় প্রভৃতি কোন বিভাগই দৃষ্ট হয় নাই। তবে ক্বচিৎ কেহ রাঢ়ীয় অনুকরণে, "আমি শুদ্ধ অথবা কষ্ট শ্রোত্রিয়" এবম্বিধ পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, রাঢ়ীয় শুদ্ধশ্রোত্রিয় প্রভৃতি বিভাগ, মধ্যশ্রেণীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে ঘটক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলোপের সহিত, অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে রাঢ়ীয় শুদ্ধ ও কষ্টশ্রোত্রিয় প্রভৃতি অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভেমুয়া, চাঁপাডালি, গোকুলনগর, মহারাজপুর, ভোগদণ্ড প্রভৃতি সমাজগুলি, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের পরে, প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উহার কারণ, উক্ত সমাজগুলির বিশেষ বিবরণস্থলে, যথা সম্ভব উল্লিখিত হইতেছে।

ভেমুয়া।—ময়না রাজবাটী হইতে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে তিন ক্রোশ দূরে, ময়না পরগণায় ভেমুয়া গ্রাম অবস্থিত। ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের ভরদ্বাজগোত্র ও মুখুটী গাঁই। ইহাদের আদিপুরুষ নৃসিংহের রাম ও

দ্যাকর নামে অন্য দুই সহোদর ছিলেন। মুকুন্দ, মধুসূদন ও গঙ্গাধর নামে নৃসিংহের তিন সন্তান ছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে, গঙ্গাধর ও তাঁহার সহোদরগণের পৈতৃকবাস প্রথমতঃ কেরুড় গ্রামে ছিল, এবং তৎপরে, বোধ হয়, তাঁহারা মুয়াড় গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে, ঐসময় দেবীবর, উক্ত প্রদেশস্থ তাৎকালিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার পরিদর্শনার্থ, মেদিনীপুর অঞ্চলে আগমন করিয়া মুয়াড় গ্রামে আসিয়াছিলেন। এই সময়েই গঙ্গাধর-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবীবরের বিরোধ হওয়ায়, দেবীবর-ত্যক্ত ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাধরের নেতৃত্বে পিণ্ডরুই গ্রামে এক মহতী সভা করিয়া "মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ" সংস্থাপন করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরের জীবনী সম্বন্ধে অন্য কিছু বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না এবং জানিবারও উপায় নাই। জনশ্রুতি আছে যে, গঙ্গাধরের একটী পা'য়ে গোদ ছিল। তজ্জন্য অদ্যাপি গঙ্গাধরের সম্মানার্থ, বিবাহের পরদিবস কুশণ্ডিকার পরে, তাঁহার গোদে তৈলহরিদ্রা প্রদানের ছলে, কন্যাপক্ষ কর্ত্তৃক বরপক্ষের নিকট তৈল হরিদ্রা প্রেরণের প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অধিকাংশ মুখুটী গ্রামীণেরা আপনাদিগকে গঙ্গাধরের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। গঙ্গাধর-সহোদর মুকুন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হরেকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণদেব কণ্ঠাভরণের বামন, রাঘব, সুদর্শন, রঘুনন্দন, হৃষীকেশ, লক্ষ্মণ ও ভরত নামে সাত পুত্র ছিল। উহাঁদের গুণপরিচায়ক নিম্নলিখিত শ্লোকটী ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া যায়:—

"বামনঃ কর্ম্মকাণ্ডেষু রাঘবঃ স্মৃতিকাব্যয়োঃ।
"সুদর্শনো ব্যাকরণে কবিত্বে রঘুনন্দনঃ ॥
হৃষীকেশঃ সভায়াস্তু দেবসেবাসু লক্ষ্মণঃ।
.........................ভরতো গৃহকর্ম্মণি ॥"

ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা ময়নাগড়ের পূর্ব্বরাজগণের নিকট বিস্তর নিষ্করভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সুদর্শনের পুত্র ধর্ম্মদাস বিদ্যালঙ্কারের বংশধরগণ ময়নারাজবাটীর সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত আছেন। ধর্ম্মদাসের পৌত্র যদুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অনেক মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। ময়নাপরগণার সর্ব্বত্র শ্রাদ্ধকালে ভূমিদান হইলে, ধর্ম্মদাসের বংশীয়গণই উক্ত ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মদাস বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীকেই ভেমুয়ার "বড় বাড়ী" বলিয়া থাকে। অদ্যাপি ভেমুয়া-গ্রামে "মুকুন্দ" পুষ্করিণী নামে একটী দীর্ঘিকা আছে। সম্ভবতঃ, উহা মুকুন্দ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের গুরুকুল খানাকুল কৃষ্ণনগরের নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ এবং ইঁহারা রামোপাসক। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে যদুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বংশের সর্ব্বোচ্চ সম্মান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ভেমুয়ার রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস ন্যায়রত্ন, রামদাস তর্করত্ন ও লালমোহন তর্কবাগীশ মহাশয়গণ প্রসিদ্ধ।

চাঁপাডালি—চাঁপাডালি গ্রাম কাশীজোড়া পরগণায়। কাশীজোড়ার পূর্ব্বরাজধানী গড়সুন্দরনগরের পশ্চিম-দক্ষিণদিকে প্রায় তিনক্রোশ দূরে অবস্থিত। অত্রত্য ভট্টাচার্য্যগণের শাণ্ডিল্যগোত্র, বন্দ্য গাঁই, এবং ইঁহারা দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা দাশু বাঁড়ুয্যের (৬) সন্তান বলিয়া আপনাদের

---

(৬) "* * বন্দ্যবংশে বল্লালের নিকট যে

পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ কামদেব ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব পুরুষগণের বাস বাল্যা গ্রামে ছিল। তথা হইতে তাঁহারা খান্দার পরগণার ভদ্রকালী গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কাশীজোড়া রাজবংশের আদি পুরুষ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব গঙ্গানারায়ণ রায়, ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, কাশীজোড়া পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া, উক্ত পরগণার সুন্দর নগর গ্রামে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে, কাশীজোড়ার রাজা (৭) ভদ্রকালী গ্রাম হইতে কামদেব ভট্টাচার্য্যকে চাঁপাডালিতে আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ কাশীজোড়ার রাজপ্রদত্ত বিস্তর নিষ্করভূমি ভোগ করিতেছেন। এইরূপ কথিত আছে যে, কামদেব ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার অধস্তন বংশীয়গণ কাশীজোড়া রাজবংশের গুরু এবং গড়সুন্দর নগরের নিকটবর্ত্তী রাজবল্লভপুরের চক্রবর্ত্তিগণ উক্ত রাজবংশের পুরোহিত ছিলেন। কোনও সময়ে কাশীজোড়ার জনৈক রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় উক্ত রাজার ত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া, তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত তাঁহার পোষ্যপুত্রের অতিশয় বিরোধ উপস্থিত হয়। বঙ্গের তদানীন্তন নবাব উক্ত বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কে প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার মানসে রাজবংশের গুরু ও পুরোহিতগণকে নিজ সমীপে আহ্বান করেন। কিন্তু উক্ত গুরু ও পুরোহিত মহাশয়গণ দূর দেশে নবাব সমীপে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, উক্ত রাজ ভ্রাতা কাশীজোড়া পরগণার * * * গোঁসাইবৃন্দের কোন পূর্ব্বপুরুষকে গুরু এবং মধ্য শ্রেণীয় কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় চূড় পদবী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের কোন পূর্ব্ব পুরুষকে পুরোহিত করিয়া নবাব সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তৎপরে, শেষোক্ত গুরু ও পুরোহিতগণের সাক্ষ্যের দ্বারা রাজভ্রাতা রাজসম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্থ হইয়াছিলেন। তদবধি চাঁপাডালির ভট্টাচার্য্যগণ কাশীজোড়ার রাজবংশের গুরুতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (৮)। কামদেব ভট্টাচার্য্যের অধস্তন পুরুষ লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্য দোরোহুবনান পরগণার টাবাখালি গ্রামে, তত্রত্য গোবিন্দরাম ভট্টাচার্য্যের কন্যার পণিগ্রহণ করিয়া, বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা দোরোপরগণার স্বর্গীয় রাজা সুপ্রসিদ্ধ দাতা প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা যাদবরাম রায়ের (৯) প্রদত্ত অনেক নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছেন।

কামদেব ভট্টাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র

ছয় মহাপুরুষ পূজিত হয়েন, তন্মধ্যে মকরন্দ অন্যতম। * * সেই মকরন্দের পুত্রের নাম দাশু। ইনি কাঁটাদিয়া গ্রামে বাসনিবন্ধন কাঁটাদিয়া দাশুবাঁড়ুয্যে নামে বিশেষ বিখ্যাত।"

সম্বন্ধ-নির্ণয়। ২য় সং। ৫৫৩ পৃঃ

(৭) কাশীজোড়ার কোন্ রাজা কামদেব ভট্টাচার্য্যকে চাঁপাডালিতে বাস করাইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানেও অবগত হইতে পারি নাই।

(৮) এই কিম্বদন্তীর মূলে কিছু সত্য আছে কি না, জানি না। যথাশ্রুত প্রকটিত করিলাম।

(৯) রাজা যাদবরাম প্রদত্ত পঞ্চাশৎসহস্রাধিক বিঘা নিষ্কর ভূমি, মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বংশপরম্পরায় ভোগ করিতেছেন।

পীতাম্বর কবিপঞ্চানন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি তমোলুকের প্রসিদ্ধ বর্গ ভীমা দেবীর মন্দিরে শিবাসিদ্ধ হইয়াছিলেন। চাঁপাডালির ভট্টাচার্য্যগণ শক্তিমন্ত্রোপাসক। কামদেব ভট্টাচার্য্য কি তাঁহার অধস্তন কোন পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা "দক্ষিণাকালী" অদ্যাপি চাঁপাডালি গ্রামে বিরাজিতা আছেন। ইঁহাদের গুরুকুল খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ নারায়ণ বাঁড়ুয্যের বংশ। অদ্যাপি চাঁপাডালি গ্রামে "বামদেব" নামে এক পুষ্করিণী আছে। উক্ত পুষ্করিণীর দুই পাহাড়ে বহুদিন হইতে ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর শবদাহ হইয়া থাকে। চাঁপাডালির ভট্টাচার্য্যগণের কাহারও কাহারও মতে কামদেবের অপর নাম "বামদেব" ছিল এবং তৎকর্ত্তৃক উক্ত পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তন্নামেই উক্ত পুষ্করিণী অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অল্পদিন হইল, চাঁপাডালির ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী সম্ভূত নারায়ণদাস তর্কালঙ্কার ও রামধন শিরোমণির পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে ঐ সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়।

গোকুলনগর ও মহারাজপুর।—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল সবডিবিজনের অন্তঃপাতী বরদা পরগণায় মহারাজপুর গ্রাম, এবং চেতুয়াপরগণায় গোকুলনগর অবস্থিত। গোকুলনগর ও মহারাজপুরের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর আদি পুরুষ কালিদাস চট্টোপাধ্যায় "পাটুলি" হইতে উঠিয়া আসিয়া বরদাপরগণার রেণ্যা গ্রামে প্রথম বাস করিয়াছিলেন। কালিদাসের অধস্তন পুরুষ অর্জ্জুন পর্য্যন্ত রেণ্যায় বাস করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ জগন্মোহন, মধ্যম বাসুদেব, এবং কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। রেণ্যা হইতে এক সময়ে জগন্মোহন ও বাসুদেব মহারাজপুর গ্রামে এবং শ্রীকৃষ্ণ গোকুলনগরে আসিয়া বাস করেন। বাসুদেবের পুত্র অথবা পৌত্র পুনর্ব্বার মহারাজপুর হইতে গোকুলনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সহোদরের বংশ অদ্যাপি চন্দ্রকোণা পরগণার গোপালপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। গোকুলনগর ও মহারাজপুরের ভট্টাচার্য্যগণ "অবসথী" (১০) ও "তেকড় চাটুতির" সন্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরিচয়কালে "কালিদাসো বিদেশং গতঃ"—অর্থাৎ তেকড় চাটুতির অধস্তন পুরুষ কালিদাস এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত ঘটক-বাক্য রচিত হইয়াছিল—এবম্প্রকার নির্দ্দেশ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইঁহাদের গুরুকুল খানাকুল কৃষ্ণনগরের পণ্ডিতরত্ন প্রসিদ্ধ নারায়ণ বাঁড়ুয্যের বংশ।

বাসুদেবের বংশধর মতিরাম সিদ্ধান্ত বরদা পরগণার প্রসিদ্ধ রাজা শোভাসিংহের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজা শোভাসিংহের নিকট ছত্রদান প্রাপ্ত হয়েন। এই

---

(১০) "গাহীর পুত্র সর্ব্বেশ্বর ১০। সর্ব্বেশ্বর অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। ১১। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র—অচ্যুত, বামন, দোকড়ী, তেকড়ী, ছকড়ি ও সম্পত্তি। × × ১৩ চট্টো অবসথী তেকড়ী বংশ।" সম্বন্ধ-নির্ণয়। ২য় সং। ৪০১-৪০২ পৃঃ।

"নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥" ধ্রুবানন্দ।
ঐ ঐ।৪০৫ পৃঃ।

জন্য বরদা পরগণার সর্ব্বত্র "ছত্র-দান" হইলে, সমগ্র পরগণার অধ্যাপকগণের মধ্যে কেবল তিনিই উহা পাইতেন।(১১) গোকুলনগর ও মহারাজপুরের ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে ভৈরবীচরণ ন্যায়ালঙ্কার, সিদ্ধেশ্বর বিদ্যাভূষণ, মতিরাম সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মদাস ন্যায়রত্ন, কালিদাস তর্করত্ন, রামকমল শিরোমণি ও রামসকল তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বর্ত্তমান শেওড়াফুলির রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ মনোহর রায়, পাথরা নিবাসী মধ্য শ্রেণীয় শিবরাম সার্ব্বভৌমের বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার রাজ্যের অন্তঃপাতী গঙ্গাতীরস্থ কতিপয় গ্রামে তাঁহাকে শতাধিক বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া, বর্ত্তমান বৈদ্যবাটী গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। শিবরাম সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত গোকুলনগরের জনৈক ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হইয়াছিল। উক্ত শিবরামের দৌহিত্র ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য ছিলেন। উক্ত ত্রিলোচনের প্রপৌত্র চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য অদ্যাপি শিবরামের বাস্তুতে তাঁহার দানপ্রাপ্ত ভূমি সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতেছেন। কথিত আছে যে, শিবরাম নবদ্বীপ হইতে পাঠ সমাপ্তি করিয়া আসিবার সময়, মনোহর রায়ের শেওড়াফুলিস্থ রাজভবনে অতিথি হন। তখন কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তথায় বহু পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। শিবরাম স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। পাথরা ও তৎসন্নিহিত জাগুলগ্রামে অনেক মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস আছে। উঁহাদের মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং অদ্যাপি কয়েকজন শাস্ত্রনিপুণ অধ্যাপক আছেন।

ভোগদণ্ড।—এই গ্রাম, মেদিনাপুর জেলার অন্তর্গত কেদার পরগণায় অবস্থিত। ভোগদণ্ডের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী বন্দ্য-গ্রামীণ এবং শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভূত। ইহাঁরাও দাণ্ডবাড়ুযোর সন্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। প্রাগুক্ত বরদা-পরগণার রেণ্যা গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী মোহনপুর গ্রামে ইঁহাদের আদিপুরুষ অনুকূল ভট্টাচার্য্যের বাস ছিল। তথা হইতে তিনি ভোগদণ্ড গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি ভোগদণ্ডে "অনুকূল সাগর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে। অনুকূল অথবা তদধস্তন বংশীয়গণ বলরামপুরের রাজবংশের নিকট দানপ্রাপ্তি সূত্রে অনেক নিষ্কর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভোগদণ্ডের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী, বিদ্যা ও ব্রাহ্মণের জন্য, মধ্য-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে প্রচুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে "সতী-পুত্র" উমাপতি তর্কালঙ্কার, ও তৎপুত্র মাণিক্যরাম তর্কভূষণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভেমুয়ার যদুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ন্যায়, উমাপতি তর্কালঙ্কার ও মাণিক্যরাম তর্কভূষণের অনেক মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। ভোগদণ্ড গ্রামে পূর্ব্বে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল; কিন্তু এক্ষণে অত্রত্য ভট্টাচার্য্য বংশ প্রায় নির্ম্মূল হওয়ায় গ্রামটীর পূর্ব্ব গৌরব বিনষ্ট ও শ্রীভ্রংশ হইয়াছে।

---

(১১) বর্ত্তমান সময়ে চেতুয়া পরগণার রাজনগরের মধ্য-শ্রেণীয় পাঠক মহাশয়গণ বরদা পরগণায় পুরুষানুক্রমে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রহ্মবরণ এবং ষোড়শের বস্ত্র দান পাইয়া থাকেন। যদিও বরদা পরগণাতে অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাস আছে, কিন্তু কেবল পাঠকগণ এই রাজদত্ত সম্মান বহুকালাবধি পাইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের পূর্ব্ববাস বরদাগড় ভিতর নির্ম্মলবাজারে ছিল।

ইহাঁদের গুরুকুল খানাকুল কৃষ্ণনগরের নারায়ণ বাঁড়ুয্যের বংশ।

পীতপুর।—পীতপুর কাশীজোড়া পরগণায় অবস্থিত। পীতপুরের ভট্টাচার্য্যগণের শাণ্ডিল্যগোত্র ও পারিহা গাঁই। ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস বর্ত্তমান গঙ্গাতীরস্থ বালির সমীপবর্ত্তী কোতরঙ্গ গ্রামে ছিল। কিম্বদন্তী আছে যে, কাশীজোড়ার কোন রাজা বর্দ্ধমান রাজসভায়, ইহাঁদের আদিপুরুষ শ্রীপতি তর্ক বাচস্পতির বিচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আপন সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিয়া, পীতপুরে বাস করাইয়াছিলেন। তদবধি পীতপুরের ভট্টাচার্য্যবংশ কিছুদিন কাশীজোড়ার রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা সভা পণ্ডিতকে একশত আশী বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। ভেমুয়া প্রভৃতির ভট্টাচার্য্যগণের অপেক্ষা গাঁই অংশে ইহাঁরা নিকৃষ্ট হইলেও, আদান প্রদান, অন্নদান ও বিদ্যাদান এবং ব্রাহ্মণ্যের জন্য মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ইহাঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কালাচাঁদ তর্কভূষণ ও রামচাঁদ তর্করত্ন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত কালাচাঁদের অনেক মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। এক্ষণে পীতপুরে শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম ও সীতানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ যথাসম্ভব ইহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মণ্ডলঘাট পরগণার নারিটের ভট্টাচার্য্যবংশ ইহাদের গুরুকুল।

শ্যামাট্।—শ্যামাট্ গ্রাম নাড়াজোলের রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী। অত্রত্য ভট্টাচার্য্যগণ বাৎস্য-গোত্র-সম্ভূত এবং নাড়াজোলের রাজবংশের সভাপণ্ডিত। বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যাদির জন্য মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে, ইহাঁদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। কাহারও কাহারও মতে, পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যোপলক্ষে, মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে, ভেমুয়া, ভোগদণ্ড, চাঁপাডালি, মহারাজপুর, গোকুলনগর, পীতপুর ও শ্যামাট্ এই সপ্ত সমাজের সম্মানার্থ সাতটী 'কলসী' বিতরিত হইত। মুয়াড়ের "ভট্টমুখুজ্যে"গণ আপনাদিগকে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের গঠনকর্ত্তা গঙ্গাধরের বংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করেন। ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

হেমচন্দ্র

(১)

মাইকেল মধুসূদনের পরে তিন জন কবি বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সম্প্রতি হেমচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। এখনও তাঁহার জন্য লোকে দেখাদেখি বিলাপ করিতেছে।

আমরা কবিকে দেবদূত বলিয়া জানি। ভগবানের অবতার বলিতে সঙ্কুচিত হই না। লোককে সন্তুষ্ট করা সৎকার্য্য, কিন্তু শুঁড়ি মদ খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করে, বারবনিতা হাবভাবে সন্তুষ্ট করে। কেবল সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাঁহারা কাব্য রচনা করেন, তাঁহারা বারবনিতা জাতীয় অধম শ্রেণীর কবি। যাঁহাদের কাব্যপাঠে হৃদয় সন্তোষের সহিত পবিত্রতা ও উন্নতি লাভ করে, দেবত্ব অনুভব করে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারাই কবি, দেবজাতীয়। কবি সরস্বতীর পুরোহিত, দেহ মনে শিব, সত্য, সুন্দর। কলুষ-

কালিমার লেশমাত্র নাই, ব্রহ্মচারী, তপস্বী, যোগী। অনুভূতিতে গৃহী, ব্রতে সন্ন্যাসী। লোকরঞ্জন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যকে দেবতা করা তাঁহার ব্রত। তিনি বৌদ্ধ নহেন, হৃদয় তাঁহার বিশ্বের অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য লালায়িত। তিনি ব্রাহ্মণ—নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য তাঁহার জন্ম। শিক্ষায় দীক্ষায় বহুদিন ব্রহ্মচর্য্যপালন করিলে তাঁহার ব্রতসাধনের সক্ষমতা জন্মে। মিলটনের এই আদর্শ ছিল।

কবির হৃদয় বেণু, ভগবানের সঙ্গীত বেণু। তাঁহাদের মুখে যে সব কথা মাঝে মাঝে বাহির হয়, সে তাঁহাদের কথা নহে। তাঁহাদের শিক্ষা-সংসর্গ বা উত্তরাধিকারে তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। বুঝি বা শিক্ষায় স্বভাব বিকৃত হয়,—শিশু শৈশবে গানের সুর শুনিয়া কাঁদিয়াছে, এখন আর কাঁদে না, "বড়" হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের যত কাছে থাকে, বালসূর্য্যের কনক কিরণ ততই অনুভব করে, যত পশ্চিমে যায়, তত তাপ ও জ্যোতি হারায়। যতই 'বড়' হয়, ততই নির্ঝরের কলকল ধ্বনির শ্রুতি হারাইতে থাকে। অশিক্ষিত পঙ্কজিনী ও নগেন্দ্রবালার মুখে মাঝে মাঝে যে সব কথা শুনি, অবাক্ হই। কোথা হইতে বালিকাগুলি সে সব কথা শিখিল? সে ত কথামালায় নাই, উকিল ও মুনসেফের বাগানে ফুটে না। পূর্ব্বপুরুষে পরিচয় পাই না। তবে কি তাহারা পূর্ব্বজন্মে সে সব কথা শিখিয়াছিল? পূর্ব্ব জন্ম কি আছে? তাই ভাবি, কবির হৃদয় ভগবানের মধুর বাঁশরী। ভগবানের যন্ত্র হইতে হইলে পবিত্রতা চাই, সংযম চাই। মদমাংস ব্যভিচারের ত্রিসীমায় ভগবান আসেন না।

কবির তিনটী জিনিস আবশ্যক,—পবিত্রতা, সাধন ও সুকণ্ঠ। আমাদের আদর্শমত কবি মাইকেল, হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ, কেহই নহেন। প্রকৃত কবি এখনও বঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কয়েকটী খদ্যোতের আলোকে আমরা আলোকিত অনুভব করিতেছি। ইহাঁদিগকে কবি বলিয়া ধরিয়া লইয়া সংসার চালাইতেছি। কত "কবিবরের" ত্রিরাত্র না শেষ হইতে শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কাহারও জীবিত কালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছি।

হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর। হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রে তুলনা হয় না। রবীন্দ্রকে বাক্যকুঞ্জের কোকিল বলিলে হেমচন্দ্রকে কাব্যাকাশের সূর্য্য বলিতে হয়। সুতরাং তুলনা হয় না। উভয়ে ভিন্ন জাতীয়। হাতী ঘোড়ায় কি তুলনা হয়?

রবীন্দ্রের বিশেষত্ব সুকণ্ঠে। এমন মধুর পদাবলী আর শুনি নাই। ইংরাজের টেনিসন, বাঙ্গলার রবীন্দ্র। ললিতলবঙ্গলতার মধুর সমীর পরিশীলনে, মধুর যূথিকার মৃদুস্ফীত সুগন্ধে হৃদয়ে নেশার আবেশ হয়—রবীন্দ্রের পদাবলী হৃদয়ে শান্ত সুখ সঞ্চার করে, মোহে তন্দ্রা আসে। পাপিয়ার পিউ রবে ও কোকিলের ঝঙ্কারে কঠোরতা আছে, ভ্রমরের স্বননে বিচিত্রতা নাই, নির্ঝরের সমতান অনেকক্ষণ ভাল লাগে না। সুকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। কি গদ্যে কি পদ্যে মন্দিরার নিক্কণ তাঁহার পদাবলীর নিকট পরাজিত।

হেমচন্দ্রের কবিতার আদর্শ উচ্চ ছিল না। মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর

ভূমিকায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়।"

"কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান ও অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন।" হেমচন্দ্রের মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, অপ্রধান কবি।

হেমচন্দ্র কবি ছিলেন, সমালোচক ছিলেন না। দশবিধ ব্যাপার মনের সম্মুখে অবস্থিত করিয়া তাহাদের সমন্বয় করা সমালোচকের কার্য্য—কবির কার্য্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাম ভয় ক্রোধের উৎকর্ষ সাধন করা কবির কার্য্য হইলে কবিকে অতি নীচশ্রেণীর জীবে পরিগণিত হইতে হইত। কেবল ভাবের উদ্রেক ও উৎকর্ষণ করিয়া চিত্তবিনোদন করাও উচ্চশ্রেণীর কর্ত্তব্য নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, হেমচন্দ্র সমালোচক ছিলেন না, তাই নিজের মনের ভাব বুঝাইতে পারিতেন না। চিত্তবিনোদন কবির কর্ত্তব্য বলিয়াই সেই নিঃশ্বাসে বলিয়াছেন, লেখার চমৎকারিত্বে চিত্তবিনোদন করা অপ্রধান কবির কার্য্য এবং মাইকেলের বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাইয়াই বলিয়াছেন, যাঁহারা আদিরসের উৎকর্ষ সাধন করিতে কবিতা রচনা করেন, তাঁহারা নগণ্য কবি।

শিশু ফুল দেখিয়া মুগ্ধ হয়, কিন্তু কেন যে সে মুগ্ধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে বুঝাইতে পারিবে না। জন্মান্তরঃ প্রাপ্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাহাকে মুগ্ধ করে, অপ্রস্ফুট বুদ্ধিশক্তিতে কার্য্যকারণ সমন্বয় করিতে কুলায় না। হেমচন্দ্র কবিকর্ত্তব্যের যে সীমানির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিজে তাহার ভিতর ক্বচিৎ প্রবেশ করিয়াছিলেন। কামক্রোধভয়ের উৎকর্ষ সাধনে তিনি আপন শক্তি কখন নিয়োজিত করেন নাই। নিজের অজ্ঞাতসারে চিরদিন মানবীয় উচ্চ ভাবের উদ্দীপনা ও উৎকর্ষে মনুষ্যকে দেবত্ব দিতে দেবদূতের ন্যায় চেষ্টা করিয়াছেন। সূর্পণখার হাবভাব, তারার প্রণয়লালসা, ব্রজাঙ্গনার রতিবিলাস, প্রমীলার গিরিশৃঙ্গ সম সুউচ্চ কুচযুগের শোভা বা অধরে মধুর হাসি হেমচন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই। তাঁহার কাতর বিলাপে

এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা স্থলে।
কহিও পিতার পদে এসব বারতা
বাসন্তি! মায়েরে মোর।

—কি স্বাভাবিক! স্বামী ফুরাইলে অভাগিনী বিধবা পিতার চরণতলে ও মায়ের আদিম কোলে আবার আশ্রয় লয়—এমন কাতর বিলাপে হেমচন্দ্র একফোঁটার উপর দুফোঁটা চোখের জল ফেলিতে অবসর পান নাই। মাইকেলের কি গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—পড়িলে বুঝা যাইবে, কবির যাহা উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। "যে গ্রন্থ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ

প্রাণী ও পদার্থ সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল, বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,যাহাতে দেবদানব মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি ?”

হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি হিন্দু কলেজে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল মুনসেফি করেন, তাহার পর মুনসেফি পরিত্যাগ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে সেখানে সরকারী উকিলের পদলাভ করেন। শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া বারাণসী যাইয়া ভ্রাতা ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে জীবনপাত করিয়াছিলেন। ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার (১৩১০) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমরা রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় কাব্যকুঞ্জের কোকিল ও হেমচন্দ্রকে বঙ্গীয় কাব্যাকাশের সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, এদুটী উপমা কবি বরদাচরণ মিত্রের আবিষ্কৃত। হেমচন্দ্রের কবিতার বিশেষত্ব এই তেজ, এই উদ্দীপনা। তিনি যেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, নিদ্রিতকে জাগরিত, অলসকে শ্রম-পরায়ণ, রোগীকে সুস্থ, বৃদ্ধকে যুবা, এমন আর কেহ পারেন নাই। অন্যান্য ভাবে কেহ তাঁহার সমকক্ষ, কেহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ আছেন, কিন্তু উদ্দীপনায় তাঁহার তুল্য কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। তিনি বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেন না, আবশ্যক বুঝিয়া পিঠের উপর জোরে কশাঘাত করিতেন। কখন শ্লেষে, কখন ক্রোধে. কখন দর্পে, কখন তেজে যখন যা কিছু বলিতেন, মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিতে দেহ মন প্রাণ কাঁপাইয়া দিত। যেন মূর্ত্তিমান পবন ঝটিকাঘাতে পৃথিবী কাঁপাইতে সমুদ্যত। তাঁহার সম্বোধন তুরী ভেরীর ন্যায় কোমল নহে। জলদ গম্ভীর ভীষণতায় উচ্ছ্বসিত জলপ্রপাতের ন্যায় ভাসাইয়া লইত। তাঁহার আহ্বানে কত যুবা একদিন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, অচল দৃঢ় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কতবার বিচলিত করিয়াছিল।

কোন বন্ধুর আত্মঘাত উপলক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র বাল্য বয়সে চিন্তাতরঙ্গিনী নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, সেখানি এল-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকরূপে কিছুদিন ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার তিন বৎসর পরে তিনি বীরবাহু রচনা করেন। তখনও তাঁহাকে কবি বলিয়া কেহ চিনিতে পারে নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসঙ্গীত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই এক সঙ্গীতে সমস্ত দেশ মাতাইয়া তোলে। যেন আগ্নেয়গিরির ধাতু নিঃস্রব—যেন রাশি রাশি দ্রুত জ্বালা প্রবলবেগে ছুটিয়াছে, যেখানে পড়িতেছে, জ্বালাইয়া ডুবাইয়া চলিয়াছে। স্বদেশপ্রেম হেমচন্দ্রকে উন্মত্ত করিয়াছিল। সেই

বাল চিন্তাতরঙ্গিণীতে তাহার অঙ্কুর, বীরবাহুতে পল্লব, শেষ জীবনে তাহা বিকসিত হইয়াছিল। দেশের দোষ, জাতীয় বা ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা তিনি তীব্রশ্লেষে কশাঘাত করিয়াছেন। আশার রশ্মি গাঢ় অন্ধকারে আভাস পাইয়া ধরিতে ছুটিয়াছেন, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ং সময়ে ভ্রাতৃভগিনীগণকে কখন কাতরে, কখন তিরস্কার করিয়া ডাকিয়াছেন, "উঠ, জাগ, না হয় অধঃপাতে যাও।" কামিনীর অঞ্চল-পরায়ণ, চরণের অলক্তক-লেহী, রুগ্ন বঙ্গকবিকুলে রৌদ্ররসে উদ্দীপিত হেমচন্দ্র একমাত্র বীর কবি। বীর প্রতাপশালী বিদ্রোহী বা স্বদেশ-প্রেমিক, বৃত্র বা বীরবাহু, তাঁহার মহানুভূতি আকর্ষণ করে। বিলাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পররক্ষিত ইন্দ্রাদিকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পদাহত করিতে তাঁহার আনন্দ। তিনি ব্রাহ্মণরূপে অন্ধ অরণ্যানী মধ্যে বেদাগ্নি রক্ষা করিয়াছেন, স্কন্দরূপে পাতালগত পতিত আর্য্যগণকে চিরদিন ধিক্কার দিয়াছেন। পূর্ণস্বরে হেমচন্দ্র কখন গাহিতে পারেন নাই, তাঁহার পূর্ণশক্তির সমালোচনাও কখন হইবে না। দারিদ্র্য-পীড়িত অন্ধ হেঁমচন্দ্র ভিখারীর বেশে বাঙ্গালীর দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা হেতু সমাগত—বাঙ্গালী মুখ লুকাইয়া সরিয়া গেল। প্রতাপসিংহ বৃটিশগবর্ণমেণ্টের বৃত্তি-অন্নজলে তাঁহার প্রাণ বাঁচাইল। আজ হেমচন্দ্র নাই, নির্লজ্জ বাঙ্গালী সম্পাদক নিন্দা করিতেছেন যে, বৃটিশগবর্ণমেণ্ট পঁচিশ টাকার বেশী কেন দিল না, আর বাঙ্গালা স্কুলের ছেলেরা সভা করিয়া কাঁদিতেছে!

"গোলামের জাতি শিখেছি গোলামী"

এ দৃশ্য দেখিলে হেমচন্দ্রের অন্ধচক্ষে জলধারা বহিয়া যাইত। বুঝিতেন, তাঁহার সকল শ্রম বিফল হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

হেমচন্দ্র

(২)

"তোমারি চরণ, করিয়ে স্মরণ
চ'লেছি তোমার পথে,
তোমারি ভাবেতে হেরিব তোমায়
ধরি এই মনোরথে।" হেমচন্দ্র।

কবি-স্বর্গে আজি, আনন্দ অপার
হরষিত কবিগণ,
উৎসাহ মাধুরী মণ্ডিত বদনে
করে সবে বিচরণ।
স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত পুরী
ভাতিত অরুণ-রাগে,
কুসুম শোভায় করে ঝল-মল
ত্রি-দিবের চারিভাগে!
প্রস্ফুট প্রসূনে সজ্জিত তোরণ
মনোরম কান্তি ধরে,
স্নিগ্ধ সুবাসিত উৎস শত শত,
ক্ষীর সম নীর ক্ষরে!
মৃদুল মেদুর অনিল মধুর,
ধীরে ধীরে ধীরে ঢুলে,
অমিয় ত্রক্ষিত সুন্দর তটিনী
নাচিল তরঙ্গ তুলে।
অপূর্ব্ব দর্শন বিহঙ্গমগণ
গাইল মধুর গান
"বেণু বীণাস্রুত মধুর কাকলি
পুলকিত করে প্রাণ!"

ছাড়িয়া সংসার   অনিত্য আগার
ত্যজিয়া নশ্বর কায়,
ত্রি-দিব নিবাসে   আসিছেন "হেম"
বিমণ্ডিত প্রতিভায়।
ল'য়ে সহচরী   কবিতা সুন্দরী
আপনি ভারতী সতী,
পরাইলা গলে   যশের মালিকা
অপরূপ প্রভাবতী!
সম্ভাষি সস্নেহে   বুকে ধরি মুখ
আঘ্রানিয়া কবি-শির,
কহিলেন হাসি   "এস পুত্র মম
ভুঞ্জহ শান্তির নীর!
কবি-কুঞ্জ বাসে   লভ চির সুখ,
এস এস যশোবান,
'মধুর' সমান   সুমধুর ভাষী
সরল বিমল প্রাণ!"
তবে কতশত   কবিতা সুন্দরী
কবির চৌদিক ঘিরি,
গাইল সুস্বরে   কবি যশোগীতি
আনন্দেতে ঘুরি-ফিরি!
নিরখি সে সব   বিমোহিত কবি
চলিলেন মনোরঙ্গে,
নটন নিপুণা   কবিতা ললনা
নাচিয়া চলিলা সঙ্গে!

কত দূরে আসি   নেহারেন কবি
কুঞ্জ এক অভিনব,
অতুল শোভায়   উদ্ভাসিত হ'য়ে
উজলিছে দিক সব।
প্রাণ উন্মাদন   সুরভি-ভবন
কুসুমে রচিত কুঞ্জ,
হিরন্ময় তনু   পিক কুহরিত
গুঞ্জরিত অলিপুঞ্জ!
সমুখে সুন্দর   উৎস মনোহর
অপরূপ ভঙ্গিভরে,
বিবিধ রঙ্গিল   সুবাসিত সুধা
অবিরাম বিনিঃসরে!
কহেন ভারতী   প্রীতি ফুল্ল মনে,
"হের বৎস কীর্ত্তি তব,
কাব্য নিধুবন   কবিতার উৎস
স্নিগ্ধ মধু সু-প্রভব!"
প্রণমি বাণীর   চরণ অম্বুজে
হর্ষ বিস্ফুরিত মনে,
চাহিয়া চাহিয়া   বিমোহিত কবি
আত্ম-হারা হ'ন্ ক্ষণে!

টুটিল সহসা   ভাবের আবেশ
দেখিলা চাহিয়া কবি—
অমরা উজ্জ্বল   জ্যোতির্বিভাষিত
ভুবনমোহন ছবি—
মুকুন্দ ভারত   শ্রীমধুসূদন
ঈশ্বর বঙ্কিম আর
কাব্য-কোকনদে   প্রমত্ত মধুপ'
ভারতীর সুকুমার—
শত শত জন   আসিয়া বেড়িল
কবিরে সম্প্রীতি ভরে,
দিব্য ফুলমালা   অর্পিয়া গলায়
স্বাগত সম্ভাষ করে!
বীর রস-প্রিয়   কবি কত জন
প্রমত্ত দীপক রাগে—
সমস্বরে কিবা   "ভারত-সঙ্গীত"
গাইলেন অনুরাগে!
কল-কণ্ঠী কত   ভারতীর সখী
হৃদয়-দ্রাবক তানে
করুণার গাথা   সে "ভারত-ভিক্ষা"
গায় উচ্ছ্বসিত প্রাণে!
দেব সমরূপ   কবি কত জন
ব্যথিত ভারত-দুখে,
"ভারত বিলাপ"   গায় সকাতরে
যাতনা ব্যথিত বুকে!

বিমোহিত কবি শুনিয়া সে গীত
নয়নে প্রবাহ বয়,
শোক-রুদ্ধ স্বরে "মা" বলিয়া উচ্চে
সমাধিত হ'য়ে রয়!
পীযূষ ভাষিণী ভারতী-সঙ্গিনী
ধীরে ধীরে সাবধানে,
কুসুমে রচিত মুরলী নিক্কণে
চেতনা ফুটায় প্রাণে!

পরে কবি গুরু বাল্মিকী আসিয়া
অর্ঘ-ফুলদল করে,
কবির শিরসে করিয়া অর্পণ
আশীষিলা স্নেহভরে!
কহিলেন ধীর "হে শাস্ত্র প্রবীর
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
ভারতের প্রিয় প্রকৃষ্ট সন্তান
সকল রসের খনি!
এস ভাগ্যবান লভ শান্তি সুখ
শান্তিময় কবি-ধামে,
যত কাল ভবে র'বে আর্য্য-সুত
র'বে কীর্ত্তি তব নামে।
নগরে নগরে "ভারত-সঙ্গীত"
গাইবে ভারত-সুত,
তব মন্ত্র বলে সুষুপ্ত ভারত
হবে সঞ্জীবন-যুত।
ভারতের মুখ হইবে উজ্জ্বল
তোমারি প্রতিভা বলে,
প্রবুদ্ধ ভারতে তব যশোগীতি
গাইবে মানব দলে।
'ভারত ভিক্ষায়' ভারত-দুর্দ্দশা
নিরখি নয়ন জ'লে—
ভাসিবেক ভাবী ভারত সন্তান
মরমে মরমে জ্বলে!
সংসার যাতনা অনন্ত বেদনা
সহিয়া হ'য়েছ সারা,
ভারতের দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
হ'য়েছ নয়ন হারা!
এস এস কবি লভ শান্তি সুখ
শান্তির নিকুঞ্জ বাসে,
তব প্রভা ছটা ভাতিবে নিয়ত
ভারতের হৃদাকাশে!"

শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
"সুরসঙ্গীত"-রচয়িতা।

হেমচন্দ্র

(৩)

(১)

অভাগী জননী ওই আবার কাঁদিছে,
নয়নে গলিতধারা অবনী লুটিছে।
আলু থালু কেশপাশ,
ঘন ঘন বহে শ্বাস,
বদন কালিমা মাখা শূন্য নেহারিছে,
কোথায় আমার হেম কাতরে বলিছে।

(২)

কে হেম, কাহার হেম কোথায় গিয়েছে,
শুন তবে অভাগিনী কি বলে কাঁদিছে।
কাঁদিতেছে অভাগিনী,
শোকাতুরা বিষাদিনী,
বলিছে "আমার হেম জ্বালা জুড়ায়েছে,
মার বুকে কালানল জ্বালিয়ে গিয়েছে।

(৩)

সে আমার যতদিন মোর কাছে ছিল,
একদিনও বাছা মোর সুখে না হাসিল।
যে দিন হইল জ্ঞান,
সেই দিন মতিমান

বুঝিল আমার জ্বালা অমনি কাঁদিল,
সেই দিন হ'তে বাছা বিষাদে ভাসিল।

(৪)

পোড়াবুকে পোরা আছে কতই বেদনা,
সে আমার বুঝেছিল কত যে যাতনা,
তাই তার দিবারাতি,
ফাটিত বুকের ছাতি,
জননী দুঃখিনী তাই সুখী সে হোল না,
সে আমার ম'ল দুঃখে—ব'লনা ব'লনা।

(৫)

কেঁদে কেঁদে কেঁদে বাপ হারালি নয়ন.
কালী হ'য়ে গেল তোর সোণার বরণ,
দারুণ দারিদ্র্য জ্বালা,
তোর বুকে ছিল ঢালা,
তিলে তিলে পোড়াইল তোরে বাপধন,
কোথা চলে যাও ওরে জননী জীবন।

(৬)

এবার বুঝেছি মাগো কাহার লাগিয়া
কাঁদিছ করুণা করে অবনী লুটিয়া।
মা তোর স্নেহের পাখী,
তোরে দিয়ে গেছে ফাঁকি,
আর না কাঁদিবে তোর দুঃখেতে মজিয়া,
ললিত পঞ্চমে হেম আপনা ভুলিয়া।

(৭)

পেয়েছ অনেক জ্বালা হেম তুমি ভাই,
অভিমান ভরে আজ চলিলে কি তাই!
অভাগী মা দ্বারে দ্বারে
গিয়াছিল তব তরে,
কেঁদে কেঁদে মুষ্টি ভিক্ষা করিতে গ্রহণ,
তব তাপ-ক্লিষ্ট প্রাণ করিতে পোষণ।

(৮)

জননী তোমার তরে দ্বারে দ্বারে যায়,
তাই কি দারুণ ব্যথা পাইলে হিয়ায়!
বুঝি আত্ম গরিমায়
আঘাত লাগিল তায়,
নারিল দেখিতে দৃশ্য নয়ন তারায়,
তাই বুঝি অন্ধ হ'য়ে রহিলে ধরায়।

(৯)

জানিনা ও নামে আছে কি অভিসম্পাত,
কবি হ'লে হয় বুঝি এরূপে নিপাত,
ব্রহ্মাণ্ডের যত জ্বালা
কবি বুকে থাকে ঢালা,
কবিত্ব সংসার সুখ একত্র মিলন
হবে না এ বঙ্গে বুঝি বিধির লিখন।

(১০)

যে পথে গিয়েছ চলে ধরিলে সে পথ,
পূর্ণ যদি হয় কবি সব মনোরথ—
যাও তবে চলে যাও
কোন দিকে নাহি চাও
মিলিবে নয়ন তারা দারিদ্র্য ঘুচিবে,
দেবতায় তপ্ত হৃদি শীতল করিবে।

(১১)

বিরাজে তথায় প্রিয় শ্রীমধুসূদন,
বঙ্কিম সে দীনবন্ধু আর কত জন।
বিষাক্ত ধরণী বায়,
সেথা কভু নাহি যায়,
তাঁহাদের সাথে হবে অনন্ত মিলন,
ভুলে যাবে দুঃখময় ধরার জীবন।

(১২)

(কাঁদ কাঁদ বঙ্গবাসী কাঁদ নিশিদিন,
আর না শুনিতে পাবে সে মধুর বীণ।
কালের করাল কোলে,
সে বীণা পড়েছে ঢলে,
আজি বঙ্গদেশ হায় কবিতা বিহীন,
অনন্ত হেমের আত্মা হয়ে গেছে লীন।

(১৩)

মরে নাই হেমচন্দ্র শুনগো জননী,
অমর করেছে হেমে হেমের লেখনী,
হেমচন্দ্র বীণা করে
যে গান গিয়েছে করে,

যুগ যুগান্তর হবে তার প্রতিধ্বনি,
যতদিন এই বঙ্গে থাকিবে জীবনী।

(১৪)

জাহ্নবীর কূলে ওই শুন মহারোল,
ওই শুন শত কণ্ঠে বলে হরিবোল।
শ্মশানেতে মরি মরি,
হেমচন্দ্রে বুকে করি,
ওই যে জ্বলিছে চিতা ওই গণ্ডগোল,
গগনবিদারী ওই উঠে হরিবোল।

(১৫)

অভাগী জননী কাঁদে অবনী লুটিয়া,
ভক্ত তনয়ের তরে করুণা করিয়া।
এবার হয়েছে ছাই,
হেম ত্রিভুবনে নাই,
অথবা সে ত্রিভুবন রয়েছে জুড়িয়া,
অণু পরমাণু রূপে ভুবন ভরিয়া।

শ্রীবঙ্কিমবিহারী বসু।

হেমচন্দ্র।

(৪)

অশিব সংবাদ একি শুনিনু শ্রবণে,
কবিবর তোমার মরণ;
পেয়ে ক্লেশ ধরাবাসে, তাই বুঝি অবশেষে,
অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে করিলা শয়ন!

২

যথা নাহি দরিদ্রতা অহীর দংশন
অশেষ ব্যাধির প্রপীড়ন,
সেই সুখময় দেশে, চলিলা এবে হরষে,
আঁধারিয়া শোকতমে এবঙ্গ ভবন!

৩

হারাইলা যেই রত্ন আজি বঙ্গমাতা,
দুর্লভ অতুল এ ভুবনে,
সহস্র বৎসরে আহা, আর কি মিলিবে তাহা,
আর কি উদিবে রবি সৌভাগ্য-গগনে!

৪

আর কি লভিবে মাতা এ হেন-রতন,
হেন দিন হবে কি কখন,
বঙ্গের সাহিত্যাম্বরে, হেমচন্দ্র শশধরে,
উদিয়া করিবে শোক-তিমির হরণ!

সহস্র মিনতি কর শমনের পদে,
হেম চন্দ্র ফিরিয়া না পাবে
যদি কর প্রাণপণ, নাহি পাবে দরশন,
অলঙ্ঘ্য কাল-শাসন সদা এই ভবে।

৬

আহা কি দুর্দ্দিন আজি বঙ্গ জননীর,
কি সংবাদ নিদারুণ হায়,
কবিবর হেমচন্দ্র, বঙ্গের সাহিত্য চন্দ্র
অস্তগেলা তিমিরে আঁধারি বাঙ্গালায়।

৭

চলি গেলা হেমচন্দ্র বঙ্গ আঁধারিয়া,
শোকে মোহি বঙ্গবাসীগণ,
কি সংবাদ ভয়ঙ্কর, হৃদে বাজে গুরুতর,
হারাইলা বঙ্গমাতা অমূল্য রতন।

৮

দরিদ্রতা মহাক্লেশ কবির ভূষণ
চিরকাল খ্যাত এ সংসারে,
তাই ভব রণাঙ্গণে, করি রণ প্রাণপণে
বিরাম লভিলা শেষে বিস্মৃতির ক্রোড়ে!

সামান্য ধনের তুমি করনি আদর,
দান কৈলা তাই অকাতরে,
কি কাজ পার্থিব ধনে, যায় জীবনের সনে,
তোমার প্রদত্ত রত্ন স্থায়ী এ সংসারে।

১০

যে স্বর্গীয় ধনে তুমি ছিলা অধিকারী,
কে বুঝিল বঙ্গের সন্তানে,
অযতনে অনাদরে, দিল শমনের করে,
তোমা হেন জননীর দুর্লভ রতনে।

১১

কেবা আর মধুময় কবিত্ব ঝঙ্কারে,
বিমোহিয়া বঙ্গবাসীগণ,
নূতন নূতন তানে, অমিয় বরষি প্রাণে
করিবেক বঙ্গভাষা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

১২

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ড করিয়া মন্থন
কেবা হেন অশেষ যতনে,
ছন্দ মকরন্দ চয়ি, রচিবে অমৃতময়ী,
কাব্য-কোকনদ হেন অনিন্দ্য ভুবনে!

১৩

বহুশত বৎসরের অধীন জীবন,
দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি ভবে,
কাহার উত্তেজনায়, মৃত দেহে প্রাণ পায়,
চির ভীরু বঙ্গবাসী নববল লভে।

১৪

কাহার কবিতা হেন অতুল ভুবনে,
মনোহর লালিত্য ছটায়,
‘জয় ভারতের জয়’, বাক্য উত্তেজনাময়
প্রবাহিল উৎস-স্রোত মৃত বাঙ্গালায়!

১৫

ধন্য কবিবর তব অসীম শকতি
অতুল কবিত্ব বিরচন,
শুনাইলা নবতানে, মোহি বঙ্গবাসীগণে,
ঐন্দ্রিলার অহঙ্কার শচীর ক্রন্দন।

১৬

স্থাপিলা সুযশ স্তম্ভ আপনার গুণে
অনশ্বর নশ্বর ধরায়,
কেবা হেন ভাগ্যবান, এ ভবে তব সমান,
সমুজ্জ্বল বঙ্গভাষা তব মহিমায়।

১৭

বঙ্গের কবিতা কুঞ্জে, তুমি পিকবর,
কি মোহন তোমার কূজন!
মধুরে রচিয়া ভাষা, সঞ্জিবিলা মাতৃভাষা,
সুললিত গীতিকাব্য করিয়া রচন।

১৮

যাও তবে কবিবর কীর্ত্তি রথে চড়ি
সুখময় অমর ভুবনে,
করি রণ এ সংসারে, শ্রান্ত কলেবরে
লভহ সুশান্তি এবে অন্তিম শয়নে।

১৯

রাখিয়াছ সেই রত্ন অতুল ভুবনে
বঙ্গভাষা সাহিত্য-ভাণ্ডারে,
অশেষ আয়াসে আহা, না পায় মানবে তাহা,
সপুত্রে লভয় কেহ সাধনার জোরে।

২০

রোপিলা যে কীর্ত্তিতরু স্বীয় কীর্ত্তিবশে,
অনশ্বর অক্ষয় ভুবনে,
তার মনোহর ফল তুষিবে এ ভূমণ্ডল
হইবে বসুধা তৃপ্ত তার আস্বাদনে।

২১

ভ্রমিয়া সংসার-মরু সহি বহু ক্লেশ
নাহি কর চিন্তা তাহে মনে,
যাও চলি মহাত্মন, যথায় মধুসূদন,
বিরাজে শান্তির ক্রোড়ে উচ্চতমাসনে।

২২

গাহিবেক ইতিহাস তব কীর্ত্তিগাথা.
চিরকাল জ্বলন্ত ভাষায়,
বঙ্গবাসী সমস্বরে, তব গুণগান ক'রে,
করিবে অমর তোমা নশ্বর ধরায়।

২৩

যাও চলি কবিবর যাও শান্তিধামে,
কাল তোমা কি করিতে পারে?
যার নাহি কৃতিবল, কাল করে করতল,
কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি খ্যাত সংসারে

২৪

পঞ্চভূতাত্মক এই নশ্বর শরীর,
কাল পারে করিতে হরণ,
কিন্তু কাল নাহি পারে, হরিবারে এ সংসারে
মানবের কীর্ত্তিময় অক্ষয় জীবন।

২৫

চিরকাল পরাধীন বাঙ্গালী আমরা,
হীনবল সৃষ্টি বিধাতার,
অর্থহীন নিঃসম্বল, দুই ফোঁটা অশ্রুজল,
অন্তিমে তাঁহার চল দিই উপহার।

২৬

সাঙ্গ হ'ল ভবলীলা হরি বল সবে,
হেমচন্দ্র করিল প্রয়াণ,
শোক, তাপ, দুঃখ ভুলি, গাও সমস্বরে মিলি,
তাঁহার মঙ্গলগীতি তাঁর যশোগান।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
ভরত-বংশ-কাব্য-প্রণেতা।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (১)

১। আমরা সমাজ ও তাহার আদর্শ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেন প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ আলোচনার প্রয়োজন কি, তাহা প্রথমে আমাদের উল্লেখ করিতে হইবে। কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাহার প্রয়োজন, বিষয়, অধিকারাদি অনুবন্ধ নির্ণয় করিতে হয়। আমাদের সমাজ মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আজ আটশত বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া, আমাদের সমাজে নানাদিকে নানারূপ পরিবর্ত্তন অলক্ষ্যে সংসাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের আপাতমনোহর আহ্বানে, আমাদের সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া সংগঠিত হইতেছে। এক দিকে প্রাচীন আর্য্য সমাজের কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ, অন্যদিকে আধুনিক ইহকালে সুখসমৃদ্ধিপ্রদ পাশ্চাত্য সমাজের জড় কেন্দ্রাতীগ আকর্ষণ, এবং এই পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হেতু, আমাদের সমাজ একরূপ বক্র গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দু, ভয়ের সহিত সেই উৎকট পরিবর্ত্তন, সমাজের সেই তির্য্যক্ গতি লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। দারুণ ধর্ম্মহীন কলিযুগমাহাত্ম্যে সমাজ ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছে মনে করিয়া, তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজ-শাসন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত নেতা ছিলেন, তাঁহারা একরূপ হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতিশীল নব্যসম্প্রদায়, পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই সামাজিক পরিবর্ত্তনকে সমাজের উন্নতি ও জীবনীশক্তির লক্ষণ মনে করিয়া, আহ্লাদে ও ব্যগ্রভাবে ভবিষ্যতের পূর্ণ উন্নতির আশায় অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহা ভাবিবার বা বুঝিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছেন না। তাই এই বিষম পরিবর্ত্তনের দিনে, এই বিপ্লবের প্রাক্কালে, আমাদের ভাবিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে—আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, না উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। সমাজের লক্ষ্য কি, সমাজের আদর্শ কি, সমাজের কর্ত্তব্য কি, তাহা না জানিতে পারিলে, আমরা এই কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আমাদের আদর্শ সমাজ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

২। আর শুধু তত্ত্ব আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। আদর্শ সমাজ কাহাকে বলে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। আদর্শ সমাজ কি—তাহা স্থির করা ত প্রায় সকল জ্ঞানার্থীরই কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ শক্তির ক্রিয়ায় সমাজের কোন্ দিকে গতি হয়, কোন্ কর্ম্ম দ্বারা সমাজ উন্নতির দিকে নীত হয়, কিরূপ সমাজ আদর্শ অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে, কোন্ শক্তি বলে সমাজের অবনতি হয়,—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে তাহা জানিতে হয়। সমাজের স্ফূর্ত্তি, বিকাশ ও পরিণতির কারণ পরম্পরা কি, তাহা তাঁহাকে বুঝিতে হয়। কিন্তু এই তত্ত্ব আলোচনা যথেষ্ট নহে। যাঁহারা জ্ঞানার্থী, তাঁহারা এই তত্ত্ব আলোচনা করেন। আর

যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সমাজের উন্নতিকল্পে কর্ম্মকরেন, যাঁহারা সমাজের নেতা—তাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া, নিষ্কাম ভাবে, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে, সমাজ রক্ষার্থ ও সমাজকে উন্নতির পথে, আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাইবার জন্য আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করেন, লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করেন, 'সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠদিগের অভিমত ও আচরণ অনুসরণ করে,'* এই তত্ত্ব অনুসারে তাঁহারা স্বয়ং লোকশিক্ষার্থ কর্ম্ম করেন। তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সমাজনেতৃগণ ভবসমুদ্রে সমাজ-পোতের নাবিক স্বরূপ। সমাজের প্রকৃত লক্ষ্য কি, সমাজ সেই লক্ষ্য স্থানে যাইতেছে কি না, তাঁহারা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। প্রতিকূল শক্তি দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, তাঁহারা পুনর্ব্বার তাহার গতি লক্ষ্য অভিমুখে স্থির করিয়া দিতে যত্ন করেন। যে প্রতিকূল শক্তি সমাজের উন্নতির অন্তরায়, যাহা সমাজকে অবনতির পথে লইয়া যায়, সমাজনেতৃগণ সেই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার কার্য্য রোধ করিতে, ও তাহাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। সমাজকে আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাওয়া সকল উন্নত সমাজের সমাজনেতৃগণের কর্ত্তব্য। এইজন্য আদর্শ সমাজ কি, কি করিয়া আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় সকল সমাজনেতৃগণের জানা একান্ত প্রয়োজন। অতএব সমাজতত্ত্ব আলোচনা করা জ্ঞানার্থীর কর্ত্তব্য, সমাজতত্ত্ব প্রচার করা তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ত্তব্য, আর আদর্শ সমাজতত্ত্ব জানিয়া তদনুসারে সমাজকে আদর্শের অভিমুখে, উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সমাজনেতৃগণের কর্ত্তব্য।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ও তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা সাধারণ ভাবে আলোচ্য, সকল সমাজ-নেতৃগণের যাহা সাধারণ ভাবে কর্ত্তব্য, তাহা আমাদের সমাজে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের সমাজ মহা বিপ্লবের আবর্ত্ত মধ্যে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। এইজন্য প্রকৃত আদর্শ সমাজ কি, আমরা সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি কি না, তাহা এক্ষণে আমাদের বিশেষ রূপে জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আর সে কথা শুধু জানিলেই যথেষ্ট হইবে না। যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের সমাজ ক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আদর্শের বিপরীত দিকে অধঃপাতে যাইতেছে, তাহা হইলে সেই লক্ষ্য অভিমুখে আমাদের সমাজের গতি স্থির করিয়া দেওয়া আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য,—এ কথা বুঝিয়া তদনুসারে আমাদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

জ্ঞানীগণ যেরূপ সমাজতত্ত্ব প্রচার করেন, যেরূপ তত্ত্ব প্রমাণ করেন, ও তদনুসারে সমাজনেতৃগণ যেরূপ সমাজ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহার ফলে যে সমাজে নানা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। গত শতাব্দীতে এই কারণে ইউরোপে, বিশেষতঃ ফরাসী সমাজে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই মনে আছে। রুসো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ফরাসী দেশে যে সমাজতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে, ও তথাকার সমাজনেতৃগণের চেষ্টায়, যে দারুণ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, সে লোমহর্ষণ ব্যাপার স্মরণ করিলে এখনও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। গত শতাব্দীতে আমাদের সমাজের বিষয় ভাবিলেও আমরা এ কথা বুঝিতে পারি। বাঙ্গালায় রাজা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন—ইঁহারা স্বতঃ পরতঃ সমাজে নানা পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছেন। এক নূতন অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের সম্মিলিত আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইবার চেষ্টা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলেও এইরূপে স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণের চেষ্টায় সমাজের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। এখনও প্রতি

---

* যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
গীতা ৩। ২১।

বৎসর কংগ্রেস্ সভাস্থলে সামাজিক সভার (Social Conference) অধিবেশনে, সামাজিক রীতি নীতির প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচিত হইতেছে। পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ সভার এইরূপ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া, তাহাতে সামাজিক রীতির আলোচনা হইয়া থাকে। অতএব এই সময়ে আদর্শ সমাজতত্ত্ব চিন্তা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

৩। অনেকের ধারণা আছে, আদর্শ সমাজ আদৌ সম্ভব নহে। আদর্শ সমাজ, কবি বা কবিদার্শনিকের কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বে য়ুনানী দার্শনিক প্লেটো, তাঁহার রিপাব্লিক (Republic) আখ্যাত পুস্তকে, এইরূপ এক আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছেন। ইউটোপিয়া (Utopia) নামক গ্রন্থে, এল্ডোরেডো (Eldorado) প্রভৃতিতে এইরূপ আদর্শ সমাজের কল্পনা আছে। আরও কতরূপ আদর্শ সমাজের কল্পনা হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন আদর্শ সমাজের ধারণা যেরূপ নিরর্থক হইয়াছে, সেইরূপ সকল আদর্শ সমাজের ধারণাই নিরর্থক হইবে। সমাজ সতত পরিবর্ত্তনশীল। অবস্থা অনুসারে সমাজের পরিবর্ত্তন হয়। যে সমাজ অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে, সে সমাজ মৃতপ্রায়,তাহার জীবনীশক্তি নাই বলিলেই হয়। অতএব যখন অবস্থা বিশেষে সমাজের পরিবর্ত্তন হয়, যখন সমাজের বৃদ্ধি ক্ষয় উৎপত্তি বিনাশ আছে, তখন আদর্শ সমাজ সম্ভব নহে। সুতরাং আদর্শ সমাজের কল্পনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপ ধারণা ঠিক সঙ্গত নহে। মানুষ মাত্রেই আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হয়। আমাদের জ্ঞানে মনুষ্যত্বের বা আদর্শ মানবের যেরূপ ধারণা থাকে, আমরা জ্ঞানপরিচালিত হইয়া, সেই আদর্শ অভিমুখে যাইতে চেষ্টা করি। যখন আমরা প্রবৃত্তি বা স্বভাববশে, অথবা মানসিক শক্তির অভাবে অথবা আমাদের আদর্শ ধারণার অস্পষ্টতা হেতু, সে আদর্শ হইতে দূরে গিয়া পড়ি, বা আদর্শবিরোধী কর্ম্ম করি, তখন পাপ করিয়াছি মনে করিয়া প্রায়ই অনুতপ্ত হই। আমরা অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কখন আদর্শ পর্য্যন্ত যাইতে পারি না। আমরা যতই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হই, ততই ইন্দ্রধনুর ন্যায় আদর্শ আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের আদর্শ ধারণারও উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাই আমরা আদর্শে পঁহুছিতে পারি না। যদি কখন সাধনা বলে আমাদের আদর্শ লাভ করা সম্ভব হয়, তখন আমাদের মুক্তি হয়। কেন না, আমাদের আদর্শ লাভই মুক্তি।

ব্যক্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম, সমাজ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যাঁহারা সমাজের নেতা, যাঁহারা সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও সমাজের একটা আদর্শ ধরিয়া লয়েন, এবং সেই আদর্শ অভিমুখে সমাজকে লইয়া যাইতে যত্ন করেন। আমাদের জ্ঞানের যত উন্নতি হয়, সমাজ সম্বন্ধে আমাদের আদর্শের ধারণাও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। অসভ্য সমাজের সমাজনেতৃগণও, তাহাদের সীমাবদ্ধ অপরিস্ফুট জ্ঞানে, সমাজের একটা আদর্শ অলক্ষ্যে কল্পনা করিয়া লইয়া, সমাজকে সেই আদর্শ মত সংগঠিত করিতে চেষ্টা করে। সভ্য সমাজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সকল সমাজই, সেই সমাজের নেতৃগণের কল্পিত আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হয়। কোন সমাজই ঠিক সেই আদর্শে আসিতে পারে না। কোন কোন সময়ে সেই আদর্শের কল্পনা এত উচ্চ হয় যে, এ পৃথিবীতে কোন সমাজ কখন সে আদর্শ লাভ করিতে পারে না, মনীষিগণ এইরূপ ধারণা করেন। তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া, পরকালে বা স্বর্গে সেই আদর্শ লাভ হইবে, পরকালে মুক্ত অমরাত্মাগণের সমাজ সেইরূপ আদর্শে গঠিত আছে, এইরূপ কল্পনা করেন।*

---

* "There forms itself in the minds of men the conception of an ideal commonwealth, whose pattern, as Plato said, is stored in heaven, never itself to descend, yet visible for perpetual approxi-

যাহা হউক, আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে এই আদর্শের ধারণা আংশিক—অপূর্ণ। যদি কখন পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়, তবেই আমাদের জ্ঞানে সমাজের পূর্ণ আদর্শ ধারণা হইতে পারে। নতুবা আমাদের জ্ঞানের যে পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, আমরা তদনুসারে সমাজ সম্বন্ধে তাহার আদর্শ কল্পনা করিয়া লই। কাজেই আমাদের এই অপূর্ণ অজ্ঞানতাজড়িত জ্ঞান সমাজের যে আদর্শ স্থির করিতে সমর্থ হয়, তাহা ভ্রমপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য জ্ঞানী আপ্ত ঋষিগণ, সাধনা বলে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে যে সকল ঈঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে আদর্শ সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে,—প্রকৃত আদর্শ সমাজ কিরূপ, তাহা স্থির করিতে হইবে। এই উপায়েই প্রকৃত আদর্শ সমাজতত্ত্ব আমরা লাভ করিতে পারি। নতুবা কেবল আমাদের নিজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, সাধারণ যুক্তি পথ অবলম্বন করিয়া আদর্শ সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে, বিশেষ ফললাভ হইবে না।

৪। আমরা এক্ষণে যে সমাজতত্ত্ব ও সমাজের আদর্শ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কিরূপ যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা এ বিষয়ের সম্বন্ধ কি, উল্লিখিত কথা হইতে আমরা তাহার আভাষ পাইয়াছি। এস্থলে তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দুই পথ বা দুই উপায়। এক জ্ঞান-পথ, আর এক প্রত্যক্ষ-অনুসারী যুক্তি-পথ। জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ যে সকল সত্য লাভ হয়, বা যে তত্ত্ব-দর্শন হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি—তাহাই জ্ঞান-পথ। ইংরাজীতে ইহাকে *a priori* বা *deductive* method বলে। ইহার পূর্ণ বিকাশ—যোগ-পথ, inspiration বা illumination পথ, অথবা absolute reason পথ। ইহাই প্রজ্ঞান-পথ।* কেবল প্রমাণ অবলম্বনে দর্শনের সহায়ে যে প্রমাজ্ঞান লাভ হয়, তাহা সাধারণ বিজ্ঞান পথ। এ উভয়ই জ্ঞান-পথ। আর প্রত্যক্ষগোচর ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া, বিশেষ সত্য সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে আমরা যে সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে পারি, তাহাই সাধারণ যুক্তি-পথ। ইংরাজীতে ইহাকে *a posteriori*, বা *inductive*, কি *synthetic* method বলে। অধিকাংশ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই শেষ পথই প্রকৃত পথ, তাহাই বৈজ্ঞানিক পথ। তাহারই ফলে বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের এত অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে, মানুষ প্রাকৃতশক্তি ও জড়কে এরূপ বশীভূত করিয়া, উন্নতির পথে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু সত্য আবিষ্কার কল্পে, আমাদের এ উভয় পথই যথাসম্ভব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কেবল জ্ঞানপথ অবলম্বন করিয়া প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমবিহীন হয় নাই। কেন না, তাঁহাদের জ্ঞান সাধনাবিহীন ও সীমাবদ্ধ ছিল। কেবল প্রত্যক্ষানুযায়ী যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া হর্বার্ট স্পেন্সার-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সমাজ-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও ভ্রমশূন্য হয় নাই। আজকাল শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ, অতীত ও বর্ত্তমানের নানাদেশীয় নানাপ্রকার সভ্য ও অসভ্য সমাজের অবস্থা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া, সমাজের বৃদ্ধি ক্ষয় উন্নতি অবনতি প্রভৃতি বিষয়ে, নানা সামাজিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায় কেহই আদর্শ সমাজ

---

mation by the wise—"a kingdom of God," in which at last wrong shall wear itself out, and the energies of life shall be harmonised and its affections perfected. Under this aspect it is, that the moral evolution of society, unable to rest in the *State* aspires to transcend it to church. .."
J. Martineau.—*Types of Ethical Theory.* Vol. II. P. 405.

*"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।"
পাতঞ্জলদর্শন, ৩।৫।

সম্বন্ধে কোন বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ জন্য—প্রকৃত আদর্শ সমাজতত্ত্ব বুঝিবার জন্য, উপরোক্ত উভয় পক্ষই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানপথ অবলম্বন করিতে হইলে, কেবল আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যাঁহাদের জ্ঞান সাধনাবলে পূর্ণ বিকশিত অজ্ঞানমুক্ত, যাঁহারা আপ্ত ঋষি, যাঁহারা প্রজ্ঞার আলোক লাভ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিত, তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, এস্থলে সমাজ ও তাহার প্রকৃত আদর্শের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য যদি আমাদের এই প্রকৃত জ্ঞানপথ ও যুক্তিপথ—এ উভয় পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে এই আলোচনা অতিবিস্তার দোষে দূষিত হইবে। আর সেরূপ বিস্তারিত অবসর এস্থলে নাই। কাজেই বিভিন্ন সমাজের অবস্থা, গতি ও পরিণাম আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে তত্ত্ব আবিষ্কারের যথোচিত সুবিধা ও অবসর এস্থলে পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য আমরা প্রত্যক্ষানুযায়ী যুক্তিপথের আভাষ মাত্র দিয়া, প্রায়শঃই জ্ঞান-পথ অবলম্বন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

৫। আমরা বলিয়াছি যে, আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশেষরূপে সমাজ বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তথাপি সমাজ বিজ্ঞানের এখনও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয় নাই। সমাজ বিজ্ঞান বড় কঠিন শাস্ত্র। ইহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে, উল্লিখিত জ্ঞান-পথ ও যুক্তি-পথ—উভয় পথ অবলম্বন করিয়া সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, ইহার আনুষঙ্গিক আরও অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিতে হয়। বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য যেমন বেদাঙ্গ শাস্ত্র প্রথমে আয়ত্ত করিতে হয়, তেমনই সমাজ বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহার আনুষঙ্গিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, বিভিন্নরূপ সভ্যতার ইতিহাস, বিভিন্ন সমাজের বিবরণ, (Discriptive Sociology) সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইলে, তাহাই সমাজতত্ত্ব লাভের প্রধান উপকরণ। ধর্ম্মনীতি (Moral Philosophy), রাজনীতি (Polity বা Science of Government), ব্যবহার শাস্ত্র (Jurisprudence), এ সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক শাস্ত্র। অর্থনীতি (Political Economy) সমাজ বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রই সমাজ বিজ্ঞানের মূল! ধর্ম্মের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মই সমাজের জীবনীশক্তি, সমাজের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। আমরা পরে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মশাস্ত্র না বুঝিলে সমাজতত্ত্ব প্রকৃত রূপে বুঝা যায় না।

আমাদের দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। বেদের কল্পসূত্র মধ্যে গৃহসূত্র সমাজ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সূত্রিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহসূত্র, সামবেদের শাণ্ডিল্য গৃহসূত্র, যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত মনু, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, ভরদ্বাজ, কাত্যায়ন প্রভৃতি উক্ত গৃহসূত্র, অথর্ব্ববেদের কৌশিক ও অথর্ব্ব গৃহসূত্র—এবং এই সকল গৃহসূত্রের ভাষ্য টীকা পদ্ধতি পরিশিষ্ট প্রভৃতি শাস্ত্র অতি বিস্তৃত। ইহার পর মনু প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত বিভিন্ন স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও অনেক উপস্মৃতি আমাদের সমাজ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারি। স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়নের পরেও কত স্মার্ত্তপণ্ডিত কত স্মৃতিগ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত রঘুনন্দন সেই সকলের সার সংগ্রহ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজ শাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র ব্যতীত আমাদের পুরাণ ইতিহাসে সমাজ বিষয়ক অনেক তত্ত্বের আলোচনা আছে। আমাদের অনেক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হইতে সে কালের সমাজের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। যাহা হউক,

সমাজ বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে উল্লিখিত সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়।

৬। এই বিরাট অনুষ্ঠান করিয়া সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। সুতরাং এই আলোচনায় আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইব, জানি না। আশা করি, সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাদের এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা জ্ঞানার্থী, আদর্শ সমাজতত্ত্ব চিন্তা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের অন্য অধিকার নাই। আমরা জ্ঞানী নহি—আদর্শ সমাজ বিজ্ঞানের পুরোহিত হইয়া, সে তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করিবার শক্তি সামর্থ্য বা অধিকার আমাদের নাই। আমরা সমাজনেতা নহি, চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে, আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাইবার অধিকার নাই। অনধিকারী আমরা, আমাদের সামান্য মলাবৃত অন্তরে, ভগবানের যে জ্ঞানালোক অস্ফুটরূপে প্রতিভাত বা প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই আলোক অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত জ্ঞানীগণের পদাঙ্ক ধরিয়া, সমাজনেতৃগণকে নমস্কার পূর্ব্বক, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সামান্য চিন্তার ফল এ স্থলে প্রকাশ করিবার সাহস করিয়াছি। যদি এই আলোচনা দ্বারা কাহারও সামান্য উপকার সংসাধিত হয়, তবে আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩। **বাঙ্গালার ইতিহাস।**—অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ-প্রণীত; মূল্য কাগজে বাঁধান ৩৲, কাপড়ে ৩৷৷৹ টাকা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৩০৮ সালে প্রকাশিত। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই সুন্দর পুস্তকখানি উপহার পাইয়া একান্ত বাধিত হইয়াছি। ৫২২ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সমাপ্ত হইয়াছে। ৮খানি ছবি এবং একখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সুন্দর মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে সকলেই আনন্দিত। বিবিধ উপকরণে মহারথীগণ মাতৃদেবীর সেবায় তৎপর, ইহা ভাবিতেও সুখ, দেখিতেও সুখ। কি ছিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, ইহা জানিতে না পারিলে কখনই প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রকৃত ইতিহাস ভিন্ন কখনও জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। ইতিহাস ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হওয়াও কঠিন। ইতিহাস, জগতে কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র সকলই। মানবের উন্নতি অবনতি, সকলের মূলেই ইতিহাস। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে এতদিন বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ ছিল। বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা এবং যত্নে এতদিন পর, সে অভাব পূর্ণ হইল। কালীপ্রসন্নের জয় জয়কার হউক।

এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে কালীপ্রসন্ন বাবুকে যে কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এদেশের পুরাতন কাগজপত্র ঘাটিয়া কাঠাম প্রস্তুত করিতে তাঁহার যে কত কষ্ট হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও অবাক্ হই। নিখিলনাথের মুর্শিদাবাদ কাহিনী, অক্ষয়কুমারের সেরাজদ্দৌলা—এবং সম্প্রতি-প্রকাশিত নিখিলনাথের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস একই জাতীয় পুস্তক। কোন্ পুস্তক প্রণয়নে কোন্ গ্রন্থকার কাহার নিকট অধিকতর ঋণী, জানি না। বঙ্গদেশ এই তিন মহাত্মার নিকটই ঋণী।

এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা হওয়া উচিত, কিন্তু অবসর এবং স্থানাভাব। এক একটী অধ্যায়ের উপর অনেক কথা বলা চলে। তাহা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। আমরা সংক্ষেপ এখন এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, পুস্তক খানি মোটের উপর অতি সুন্দর হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরস, ভাব সংযত, প্রতি কথা, প্রতি সিদ্ধান্ত সত্যে

প্রতিষ্ঠিত। এই পুস্তকখানি এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আদৃত হইলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইব। এতদিন পর বাঙ্গালা ভাষা সগর্ব্বে বলিতে পারেন যে, বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস আছে। কালীপ্রসন্নের জয় জয়কার হউক।

৪। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।— প্রথম খণ্ড, শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এ প্রণীত, মূল্য ২৷৷০। কাশীমবাজারের মহারাজার অনুকম্পায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানচিত্র আছে, এবং তাহা বাদে আরও ৩৫খানি চিত্র আছে। সরফরাজখাঁ এবং মুর্শিদকুলীখাঁয়ের ছবি, উভয় পুস্তকেরই একরূপ; কালীপ্রসন্ন বাবুর মানচিত্র বড় ও বিস্তৃত।

বাবু নিখিলনাথ মুর্শিদাবাদ-কাহিনী লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ৺রামদাস সেন এদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্দিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার লাইব্রেরিতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এই লাইব্রেরী নিখিল নাথের প্রধান সহায়। আর সহায় কি? আমাদের মনে হয়, পারিবারিক সম্বন্ধ-জনিত অনুপ্রাণনে নিখিলনাথ মহাত্মা ৺রামদাস সেনের মহত্ত্বের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাহাতে ধীরতা, তাহাতে বিজ্ঞতা, তাহাতে সুশিক্ষা, তাহাতে সুবিবেচনা সম্মিলিত হইয়া নিখিলনাথকে মহত্ত্বের এক অত্যুচ্চ সোপানে উন্নীত করিয়াছে। নিখিলনাথের কৃতিত্বে আমরা গৌরবান্বিত। বোধ হয়, বাঙ্গালার অনেকেই গৌরবান্বিত।

নিখিলনাথের রচনা-পারিপাট্য অসাধারণ। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল। স্বাধীনতা এবং সংযম, নিরপেক্ষতা এবং সত্যানুরাগ তাঁহার অটল ভিত্তি। এই সকল সহায়তায় তিনি সৌভাগ্যবান। আমরা তাঁহার পুস্তক পাঠে প্রভূত উপকার পাইয়াছি।

একটী কথা বলার প্রয়োজন। এই বঙ্গপ্রদেশ সম্বন্ধে যত পুস্তক বাহির হইল, ভারত সংক্রান্ত তত হইল না, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। ভারত এখন একতার পথে অগ্রসর। এই সময়ে, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন জাতীয় ইতিহাসের একান্ত প্রয়োজন, অনুভব করিতেছি। আমরা আর কাহার নিকট আশা করিব? নিখিলনাথ, কালীপ্রসন্ন বা অক্ষয়কুমার ভিন্ন আর লোক দেখি না। বিনীত অনুরোধ, ইঁহাদের মধ্যে কেহ এই মহাকার্য্য আরম্ভ করুন।

৫। যোগ ও বিয়োগ। বরণ ও মরণ কবিতা শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ৷৷০। কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

আমরা এই পুস্তকখানি ২।৩ বার পড়িয়াছি। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থকার নূতন লেখক, কিন্তু তাঁহার রুচি-সঙ্গত সুন্দর কবিতা পাঠ করিলে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়।

কোন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, কল্পনার রথে উঠিয়া আকাশের পুষ্প-কেলী রচনা করাপেক্ষা দৈনিক জীবনের ঘটনা লইয়া যাঁহারা কবিতা লিখিয়া বিমোহিত করেন, তাঁহারাই অধিক যোগ্যতম। এদেশে গোবিন্দদাসের এই জন্য আদর।

যোগ ও বিয়োগের কবিও দৈনিক জীবনের ঘটনা লইয়া কবিতা লিখিতেছেন। এখনও তিনি তেমন কৃতিত্ব লাভ করেন নাই, কিন্তু আমাদের আশা আছে, সাধনা করিলে কালে তিনি একজন হৃদয়বান কবি হইতে পারিবেন।

* * *

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (২)

• সমাজ কাহাকে বলে ?

১। এক্ষণে সমাজ কাহাকে বলে, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজ কাহাকে বলে, তাহার অপরিস্ফুট ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু তাহার পরিষ্কার পরিস্ফুট সম্যক্ ধারণা করা, সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার করিয়া তাহার সংজ্ঞা বা লক্ষণা স্থির করা, আমাদের এস্থলে প্রথমেই কর্ত্তব্য। সমাজের ইংরেজী কথা সোসাইটী (society)। এই সমাজ ও সোসাইটী চলিত কথায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে রয়েল্ সোসাইটী, এসিয়াটিক্ সোসাইটী, পশুক্লেশ নিবারণী সোসাইটী, স্কুলবুক্ সোসাইটী, খ্রীষ্টান সোসাইটী, লণ্ডন সোসাইটী, মানব সোসাইটী প্রভৃতি স্থলে সোসাইটী নানারূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা সেইরূপ সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, সঙ্গীত সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, কলিকাতা সমাজ, হিন্দু সমাজ, মনুষ্য সমাজ, —এইরূপ স্থলে, সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একাধিক ব্যক্তি, কোন বিশেষ কারণে, বা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে, বা কোন বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য একত্র সম্মিলিত হইলে যে সভা সমিতি, বা সমাজ সংগঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক—আংশিক সমাজ। ব্যবসায় বা কৃষি কি শিল্পের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র সম্মিলিত হইলে, যে কোম্পানি যৌথকারবার বা সম্ভূয়সমুত্থান সংস্থাপিত হয়, এরূপ সম্মিলনকে—এরূপ কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব সম্প্রদায় মধ্যে দুই বা ততোধিক লোকের বিশেষ বা নৈমিত্তিক সংযোগকে সমাজ বলা যায় না। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধির জন্য, বা সাধারণ হিতকর কার্য্য করিবার জন্য জ্ঞানার্জ্জন বা আত্মোন্নতির জন্য, পরস্পরের রক্ষণ, পোষণ বা উন্নতির জন্য, যে একাধিক ব্যক্তির নৈমিত্তিক বা আংশিক সম্মিলন—তাহাকে বরং সমাজ নামে অভিহিত করিবার সার্থকতা আছে। এ সকলই প্রকৃত সমাজের বিভিন্ন অংশ মাত্র।

২। এইরূপে আমরা সাধারণতঃ বড় সঙ্কীর্ণ অর্থে ‘সমাজ’ কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের দেশে ‘সমাজ’ আর একরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহাদের মধ্যে আহার ব্যবহার প্রচলিত আছে, আমরা প্রায়ই তাহাদের এক সমাজভুক্ত মনে করি। আমরা গ্রামস্থ সমাজ বলি। কোন এক বা একাধিক গ্রামে যে কয় ঘর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বাস করেন, ক্রিয়া কর্ম্মে একত্র আহার ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে আমরা এক সমাজভুক্ত বলি। কোন ক্রিয়া কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, সেই সমাজস্থ বা দলস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এইরূপে যাহাদের মধ্যে আহার ব্যবহার সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে আমরা এক সমাজভুক্ত মনে করি। এই সমাজ মধ্যে যদি কেহ যথেচ্ছাচার করে, সমাজকে উপেক্ষা করে, বা সমাজের রীতি

নীতির অবহেলা করে, সমাজের প্রধান লোকে তাহাকে সমাজচ্যুত বা 'এক ঘরে' করেন—তাহার সহিত আহার ব্যবহার বন্ধ করেন। যে দোষে রাজা দণ্ড দেন না, বা দণ্ড দিতে পারেন না, যে দোষ. দণ্ডবিধির শাসনের আয়ত্ত নহে, ধর্ম্মশাসন দ্বারা যাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না, উপেক্ষা ঘৃণা অপমান প্রভৃতি দ্বারা সমাজ সে দোষের শাসন করেন।

এইরূপে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার প্রভৃতি প্রত্যেক 'জাতি' বিভিন্ন ক্ষুদ্র গ্রামসমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু, এবং গতায়াতের অসুবিধা স্থলে পরস্পর মধ্যে সংশ্রবের অভাব হেতু, এই সকল সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন হইয়া পড়ে। আবার এইরূপ বিভিন্ন ক্ষুদ্র সমাজ মধ্যে যে সমাজের দলপতি অধিক প্রতিপত্তিশালী হন, যে সমাজের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়, অন্য নিকটস্থ সমাজ তাহার অনুকরণ করে, তাহার অনুশাসনে পরিচালিত হয়, ও ক্রমে সেই সমাজের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে এইরূপে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নবদ্বীপ সমাজ বা বিক্রমপুর সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এবং অন্য ক্ষুদ্র সমাজ সেই সমাজের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। অন্য দিকে দেশভেদে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ, ও কায়স্থদের মধ্যে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণ এইরূপ বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল সমাজ আরও ক্ষুদ্রতর সমাজে বিভক্ত হইয়াছিল। বঙ্গজ কায়স্থগণ যশোহর চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি চারি প্রধান সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ মাইনগর প্রভৃতি ছয় সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন কালে, এ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম বাসের জন্য ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ পাইয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা ছাপ্পান্ন গাঁই বা ছাপ্পান্ন বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে আমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন সমাজের ধারণা করি। সমাজের এইরূপ সংকীর্ণ ধারণা স্থলে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করেন না। ফুলিয়া ব্রাহ্মণ খড়দহের ব্রাহ্মণের সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করেন না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থের সহিত, কি কামার কুমারের সহিত, কি অনাচরণীয় কোন শূদ্রের সহিত, কি অন্য কোন 'জাতির' সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করিতে পারেন না। আর যে দেশে এরূপ 'জাতিভেদ' নাই, সে দেশেও সমাজের ধারণা সাধারণতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণ। ইউরোপেও সোসাইটীর প্রচলিত ধারণা অনেক স্থলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ। সেখানেও এক গ্রামে বা একদেশে যে সকল লোক একত্র আহার ব্যবহার করে, তাহারা আপনাদের এক সোসাইটীভুক্ত মনে করে। যাহাদের সহিত আহার ব্যবহার সংশ্রব নাই, তাহাদের সহিত তাহারা আপনাদিগকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না, তাহাদের সহিত কোন সামাজিক সম্বন্ধ থাকা ধারণা করে না। অনেক স্থলে বড়লোক ইতরলোকের সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না। তাহাদের সহিত অনেক স্থলে আহার ব্যবহার পর্য্যন্ত করে না। এরূপ স্থলেও সমাজ বা সোসাই-

টীর ধারণা বড় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সমাজের প্রকৃত অর্থ এত সঙ্কীর্ণ নহে। কেবল আহার ব্যবহার বা বিবাহের সংশ্রব হইতেই 'সমাজ' হয় না।

৩। এই জন্য আমরা 'সমাজ' কথা ইহা অপেক্ষা আরও প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কখন আমরা এক ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধীন লোকদিগকে এক সমাজভুক্ত বলি। কখন এক দেশের লোকদের এক সমাজভুক্ত বলি। কখন এক রাজার অধীন লোকদের এক সমাজভুক্ত মনে করি। কখন যাহাদের মাতৃভাষা এক,তাহাদের এক সমাজভুক্ত ধারণা করি। কখনও এক 'জাতি'কে এক সমাজভুক্ত বলি। ইংরাজিতে যাহাকে 'জাতি' (nation)বলে,আমরা অনেক সময় সমাজকে সেই অর্থে গ্রহণ করি। এইরূপে 'সমাজ' আমরা আরও প্রশস্ত অর্থে বুঝিয়া থাকি। গত্যর্থক 'অজ' ধাতু হইতে 'সমাজ'। 'এক সঙ্গে গমন' হইতে সমাজ। যে সকল লোক একত্র সম্মিলিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সমান প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়, যাহাদের মধ্যে কোন না কোনরূপ বিশেষ সংশ্রব আছে, যাহারা পরস্পর মিলিত না হইয়া কার্য্য করিলে, পরস্পরের জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না, যাহারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া সকলে একত্র হইয়া সেই লক্ষ্য অভিমুখে গন্তব্য পথে পরস্পরের সহায়ে গমন করে, তাহারাই এক সমাজের অন্তর্গত। এইরূপে পরস্পর সম্বদ্ধ বা একত্র হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন হইতেই সমাজ।

আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের প্রয়োজন। অর্থাৎ আমাদের শরীর পোষণের জন্য অন্নের প্রয়োজন, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বস্ত্র প্রভৃতি কত কি দ্রব্যের প্রয়োজন, বহিঃ ও অন্তঃ শত্রু হইতে আমাদের রক্ষার প্রয়োজন, ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন, আত্মোন্নতির জন্য জ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেকে যদি অপরের সাহায্য বিনা এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সমাজের প্রয়োজন হইত না—সমাজ থাকিত না। কিন্তু আমরা পরস্পর সম্মিলিত থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করি। আমাদের মধ্যে কেহ সকলের অন্ন সংগ্রহের জন্য চাষ করি, কেহ গবাদি পশু পালন করি, কেহ বস্ত্র বয়ন করি, কেহ অস্ত্র প্রস্তুত করি, কেহ সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করি। আমি মসীজীবী কায়স্থ। কৃষক চাষ না করিলে আমার অন্ন সংস্থান হইবে না। বণিক সে অন্ন আমার কাছে আনিয়া না দিলে আমার অন্ন সংগ্রহ হইবে না। তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া না দিলে আমার শীত বা লজ্জা নিবারণ হইবে না। তেলি তৈল প্রস্তুত করিয়া না দিলে আমার ব্যঞ্জন তৈলহীন বিস্বাদ হইবে। কুমার হাঁড়ি গড়িয়া না দিলে আমার রন্ধন বন্ধ হইবে। রাজা ও রাজসৈন্য আমায় রক্ষা না করিলে আমার জীবন রক্ষা দুরূহ হইবে। ব্রাহ্মণ বা শিক্ষক আমায় জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ না দিলে আমার উন্নতি হইবে না, আমি ক্রমে পশু হইয়া যাইব। অতএব আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমার এ সকলের

সহিতই সংশ্রবের প্রয়োজন। আমাদের এ সকলকেই 'এক সঙ্গে গমন' বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এইরূপে এক রাজার অধীনে, এক ধর্ম্মের শাসনে, এক দেশের মধ্যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—বা তদনুরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন, বা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকারী লোক সকল সম্মিলিত হইয়া এক সমাজভুক্ত থাকে। কর্ম্ম বিভাগ হেতু বা অন্য কারণে বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকও এক সমাজভুক্ত হইতে পারে। সেই হিসাবে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানকে এক সমাজভুক্ত বলা যায়।

তবে ইহার মধ্যে কথা আছে। মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ হইতেই মানুষ সমাজ সম্বদ্ধ হয়, ও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া "একত্র গমন" বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সেই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধের বিকাশ ও পরিণতি হইতে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি হয়। আমরা এ কথা পরে বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমার সহিত যাহার যত সম্বন্ধ অধিক, যত সংশ্রব অধিক, তাহার সহিত আমার সমাজ বন্ধন তত অধিক দৃঢ়। যাহার সহিত আমার সংশ্রব বা সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, তাহার সহিত আমার সমাজ সম্বন্ধ নিত্য। এই সকল সম্বন্ধের সংখ্যা বা দৃঢ়তার তারতম্য অনুসারে, সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সমাজের প্রসর বা পরিধি যত অল্প হয়, তত সমাজ বন্ধন দৃঢ় হয়, সামাজিক সম্বন্ধের পরিমাণও অধিক থাকে। সমাজ পরিধির যত বিস্তার হয়, সমাজ বন্ধন তত শিথিল হইয়া পড়ে, সামাজিক সম্বন্ধেরও তত হ্রাস হয়। কেন্দ্র হইতে সমাজ পরিধির দূরতা অনুসারে, সামাজিক সম্বন্ধের ও তাহার দৃঢ়তা ও পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংশ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই খানেই আহার ব্যবহার প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই জন্য এই আহার ব্যবহার সম্বন্ধকে আমরা অনেক সময় সমাজের মূলসূত্র মনে করি। কিন্তু সমাজের এরূপ ধারণা সঙ্কীর্ণ, তাহা বলিয়াছি।

৪। আমরা মানব সমাজের কথা বলিতেছি। কিন্তু শুধু যে মানুষ সমাজ সম্বদ্ধ হয়, তাহা নহে। অনেক শ্রেণীর ইতর জীব মধ্যেও সমাজের আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষে আছে, "পশুনাং সমজঃ অন্যেষাং সমাজঃ।" অর্থাৎ পশুদের সমাজের আভাষকে 'সমজ' বলে, কেবল মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সম্মিলনকেই 'সমাজ' বলে। পশু মধ্যে পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, পুত্তিকা প্রভৃতি অনেক জীব এরূপ 'সমজ' সম্বদ্ধ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কাক প্রভৃতি পক্ষিদের মধ্যে সহানুভূতি বা সামাজিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পশু দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। অনেক পশুপক্ষিদের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। সে যাহা হউক, ইতর জীবসমাজ ও মানবসমাজ মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইতরজীব সহজ জ্ঞান পরিচালিত। তাহাদের সমাজের উন্নতি অবনতি বা পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবজ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত মানুষের উন্নতি হয়। মানুষের উন্নতির সহিত মানব সমাজের উন্নতি হয়। অথবা সমাজের উন্নতির সহিত মানুষের উন্নতি হয়। মানব সমাজ ক্রমবিকাশশীল—পরিবর্ত্তনশীল।

৫। আমরা বুঝিয়াছি যে, মানুষ সমান প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমাজবদ্ধ থাকে। নানাভাবে ও নানা কারণে মানুষ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হয়। মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে যে নিত্য-সম্বদ্ধ লোকসংগ্রহ তাহাই সমাজ, একথা বলিয়াছি। এই সম্বন্ধ মধ্যে কতকগুলি স্বার্থপ্রণোদিত, কতকগুলি সম্বন্ধ নিঃস্বার্থ বা পরার্থবৃত্তিজনিত। তবে আমরা সমাজ মধ্যে নিঃস্বার্থপ্রবৃত্তিজনিত সম্বন্ধ, পরস্পর মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ভাব প্রধানতঃ দেখিতে পাই। মানুষ প্রথমে, অসভ্য অবস্থায়, হয়ত পরস্পর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়, কিম্বা তাহারা কোন এক বিশেষ শক্তিশালী নেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। অনেকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজ প্রথমে যেরূপেই সম্বদ্ধ হউক, সমাজ সম্বদ্ধ হইলে পরে, ক্রমে মানুষের স্নেহ দয়া প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হয়। ক্রমে এই নিঃস্বার্থ অথবা পরার্থপ্রবৃত্তিজনিত আকর্ষণ বলে মানুষ পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া একীভূত হইলে সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়। তখন সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। তখনই সমাজ প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য এই পরার্থবৃত্তিকে, এই নিঃস্বার্থ আকার্ষণকে আমরা সমাজের মূলসূত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। আমরা যখন কোন লোককে অসামাজিক (unsocial) বলি, তখন বুঝি যে, সে লোক তত মিশুক নহে, যেন পরের জন্য তাহার সহানুভূতি নাই, যেন সে পরের সুখে সুখী, পরের দুঃখে দুঃখী হইতে জানে না, যেন সে পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। সে আপনাকে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। অতএব এই পরস্পর 'মিলা মিশা' ভাব লইতে, এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত (organised) সুবিভক্ত সংমিশ্রণ হইতে আমরা সামাজিকতার ভাব ও সমাজের স্বরূপ বুঝিতে পারি।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিঃস্বার্থ স্বাভাবিক আকর্ষণই সমাজের মূল। জড় জগতের ন্যায় জীব জগতেও আমরা দুই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। এক আকর্ষণ—আর এক বিক্ষেপ বা অপসারণ। আমাদের ভালবাসা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ সহানুভূতি অন্তঃকরণ বৃত্তি আছে। তাহা দ্বারা আমরা পরকে আকর্ষণ করি, পরকে আপনার করিতে পারি, পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সাধনাবলে এক হইয়া যাইতে পারি। সেইরূপ আমাদের দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, ক্রোধ, স্বার্থ প্রভৃতি বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা পরকে প্রত্যাখ্যান করি। আমরা বলিয়াছি যে, উল্লিখিত আকর্ষনজনিত সম্বন্ধ হইতেই সমাজ। এই আকর্ষণ জন্য সমাজের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায় মধ্যে একত্বের ভাব থাকে। বহুত্ব মধ্যে এই একত্বের ভাব—এই আকর্ষণজনিত বন্ধন হইতেই সমাজ।

৬। এই সমাজ সংগঠন কৃত্রিম নহে। ইহার সংগঠন বা বিনাশ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মানুষ বাধ্য হইয়া, স্বাভাবিক নিয়মবশে, স্বাভাবিক পরার্থপ্রবৃত্তি বলে, অথবা প্রকৃতিপ্রণোদিত

স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় সমাজসম্বদ্ধ হয়। যে আকর্ষণশক্তি বলে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়, তাহাকে 'সমাজশক্তি' বা সমাজের 'জীবনীশক্তি' বলা যাইতে পারে। জড় আকর্ষণ শক্তি বলে, এক জড়াণু অন্য জড়াণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া, জড়জগতের উৎপত্তি হয়। জৈবশক্তির আকর্ষণ বলে, প্রথমে কতকগুলি বিরোধী বা বিক্ষেপশক্তিসম্পন্ন পরমাণুপুঞ্জ তাহাদের জড়শক্তিকে সংযত ও অভিভূত করিয়া, জীবাণুর বা জীবকোষের উৎপত্তি করে। সেইরূপ উচ্চতর জৈবশক্তি বলে, এক জীবাণু অন্য জীবাণুকে আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের নিজ শক্তিকে অভিভূত করিয়া উন্নত জীবদেহ সংগঠিত করে, জীবজগতের পুষ্টি ও পরিণতি করে। মানুষও সেইরূপ উচ্চতর সমাজশক্তি বলে নিজ স্বার্থকে অভিভূত করিয়া সমাজসম্বদ্ধ হয়। পরমাণু মধ্যে বা জীবাণু মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ আপাত-দৃষ্টিতে স্বার্থপ্রণোদিত (১), স্বশক্তি বলে তাহাদের নিজ সুবিধার জন্য অভিব্যক্ত মনে হয়। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে,সেই আকর্ষণ তাহাদের স্বায়ত্ত নহে, উচ্চতর প্রাকৃতশক্তি বলে তাহারা বাধ্য হইয়া পরস্পর আকৃষ্ট হয়, ইহা বুঝা যায়। তেমনই মানুষও যে আপাততঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পর আকৃষ্ট হয়, মনে করে, সেই আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক, তাহা মানুষের নিজ আয়ত্ত নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতির নিয়মে তাহা সংসাধিত হয়। এ কথা আমরা পরে আরও বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। তবে এ স্থলে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, স্নেহ দয়া প্রভৃতি বৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক, আমাদের নিজ চেষ্টায় বা জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের উৎপত্তি হয় না। তবে আমরা জ্ঞানবলে, ও অভ্যাস বা সাধনা দ্বারা, তাহাদের উন্নতি করিতে পারি। মমতাময়ী প্রকৃতি বাধ্য করায়, জড় জড়ান্তরকে আকর্ষণ করে, জীব জীবান্তরকে আকর্ষণ করে, মানুষ অন্য মানুষকে আকর্ষণ করে, অনেক সময় স্বার্থ ভুলিয়া আপনাহারা হইয়া পরের জন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই মানুষে মানুষে আকর্ষণ—এই সমাজশক্তিও সেই প্রাকৃত জড় আকর্ষণশক্তিরই শেষ ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। যেমন জৈবশক্তি বিভিন্ন জীবাণুকে আকর্ষণ করিয়া উচ্চতর জীবদেহ সংগঠিত করে, তেমনই সমাজশক্তিও বিভিন্ন মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, একীভূত করিয়া সমাজদেহ সংগঠিত করে।

৭। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সমাজশরীরের আভাষ দিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ এই সমাজশরীরের কথা ও তাহার দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। এই সমাজশরীরের কথা,—জীবশরীরের ন্যায় সমাজশরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ নহে, সকল অঙ্গের সমান প্রয়োজন, একের কর্ম্ম বন্ধ হইলে সমস্ত শরীরের হানি হয়,—এই বৈদিককাল হইতে প্রচলিত উপাখ্যানের (২) উল্লেখ করিয়া, পুরাকালে কোন প্রসিদ্ধ বক্তা, 'শ্রেষ্ঠ' ও 'ইতর' লোকের মধ্যে (পেট্রি-

---

(১) জর্ম্মান দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সপেনহর তাঁহার 'World as Will and Idea' নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, মানুষে যে শক্তি ইচ্ছা বা বাসনারূপে বিকাশিত, তাহাই জড়ে জড়শক্তিরূপে অভিব্যক্তি। জড়ও অব্যক্ত বাসনা চালিত।

(২) ইসপের এই গল্প ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে আছে।

সিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন য়ূনানী পণ্ডিত প্লেটো (১) সক্রেটিস্ এই সমাজশরীরের আভাষ দিয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সমাজশরীর স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাতী দার্শনিক হবস্ (Hobbes) দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সমাজশরীরের কথা বলিয়াছেন (২)। ফরাসি দার্শনিক কোম্‌ত এই সমাজশরীর স্বীকার না করিলেও, তিনি প্রথমে সমাজের প্রকৃত অর্থ ধারণা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, জাতীয়তা অপেক্ষা সামাজিকতা রূপ আরও উচ্চ ভূমিতে মানবের মধ্যে একত্ব সংস্থাপনের উপায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই ইউরোপে প্রকৃত সমাজবিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ এই সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সমাজশরীর স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর (৩) ডিউক্ অব আরগাইল (১) প্রভৃতি সমাজকে Organised বা Super organic srtucture বলিয়াছেন। অতএব পণ্ডিতগণ আর এক্ষণে সমাজের সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সমাজের প্রকৃত স্বরূপ, তাঁহার মূলতত্ত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজশরীর স্বীকার করিয়া, সমাজ যে কেবল নাম, সামান্য ভাব (abstract idea) বা কল্পনা নহে, সমাজরূপ মানব সংহতির যে স্বতন্ত্র সত্বা আছে, তাহার যে জীবনীশক্তি আছে. ইহা ইঙ্গিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই সমাজশরীরতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সলাজশরীরাধিষ্ঠিত তদন্তর্গত ব্যক্তিচৈতন্যের সমষ্টি নহে,— সমাজ চুক্তিমূলক নহে।

৮। আমরা পূর্ব্বে সমাজশরীরের কথা বলিয়াছি। এই সমাজশরীর বুঝিতে হইলে

---

(২) প্লেটো বলিয়াছেন,—"The states are as men are ; they grow out of human character."

(২) হবস্ বলিয়াছেন,—"For by art is created that great levia-than called a commonwealth, or state, which is but an artificial man : though of great stature and strength than the natural, for whose protection and defence it was intented : and in which the sovereignty is an artificial soul.·········

এই সকল স্থলে সমাজ ও state প্রায় একার্থ বাচক।

(৩) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর ঠিক সমাজ শরীর স্বীকার করেন নাই। কেন না তিনি জীবশরীর ও সমাজশরীর মধ্যে সাধর্ম্ম্য অপেক্ষা বৈধর্ম্ম্য অধিক দেখিয়াছেন। তিনি এ স্থলে বলিয়াছেন,—

" * * There exist no analogies between the body politic and a living body, save those necessitated by that mutual dependence of parts which they display in common. * * The social organism discrete instead of contrete, assymmetrical instead of symmetrical, sensitive in all its units instead of having a single sensitive centre, is not comparable to any parlicular type of individual organism animal or vegital.

Principles of Sociology. Vol. I. P. 580.

হার্বার্ট স্পেন্সার যে শ্রেণীর দার্শনিক, তাঁহারা ঠিক সমাজশরীর স্বীকার করিতে পারেন না, কেন না তাঁহারা সমাজাত্মা মানেন না। তথাপি যে হার্বার্ট স্পেন্সর এটুকু স্বীকার করিয়াছেন, সেই যথেষ্ট।

(১) "Reign of Law" গ্রন্থের প্রণেতা ডিউক্ অব্ আরগাইল (Duke of Argyle) এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"Human society is indeed in the nature of an organism, in which all the several active parts have a definite function to discharge, and that the healthful condition of the whole depends on the healthful condition and working of the separate and constituent structures."

Ninteenth Century. Nov. 1894.

সমাজ কাহার শরীর, তাহা জানিতে হইবে। সমাজাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা সমাজাত্মার কথা বুঝিতে হইবে। সমাজের সহিত ব্যক্তিমানবের সম্বন্ধ কি, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। যে মহাশক্তি বলে সমাজ সম্বদ্ধ হয়, তাহার তত্ত্ব আমাদের প্রথমে ধারণা করিতে হইবে। আমরা শরীরের শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ হইতে জানিতে পারি যে, পরার্থ সংহতি জন্য—শরীর (১) আত্মার চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়—শরীর, (২) চেতনাধিষ্ঠিত, পঞ্চভূতবিকারাত্মক—শরীর, (৩) চেতনাধিষ্ঠিত, পঞ্চভূতবিবর্দ্ধিত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত—শরীর। (৪) অতএব শরীর যন্ত্র,—চৈতন্য তাহার অধিষ্ঠাতা। শরীর চৈতন্য জন্যই সংহত, চৈতন্যের চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ, পঞ্চভূত বা জড় জগতের উপাদানে সৃষ্ট, বিভিন্ন অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট কার্য্য জন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত। স্থাবর জঙ্গম সকল জীবশরীর সম্বন্ধেই এই কথা। মায়াবদ্ধ চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জন্য, সুপ্তাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থা অতিক্রম করিয়া পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসিবার জন্য, জীবাত্মা বা পুরুষ শরীর গ্রহণ করে, এবং শরীরের ক্রমবিকাশ দ্বারা, নিম্নজাতীয় জীবশরীর হইতে ক্রমশঃ আপূরণে উচ্চ জাতীয় জীবশরীর-লাভ দ্বারা, উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। (১) জীব, নিজ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুযায়ী ভবিতব্য অনুসারে, প্রকৃতিদত্ত, জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি বলে, প্রকৃতির অনুগ্রহে, নিজ প্রয়োজনোপযোগী শরীর, পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে পঞ্চভূতাত্মক জড় জগত হইতে লাভ করে। অতএব শরীর বুঝিতে হইলে, তদধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের কথা, শরীরের উপাদানের কথা, যে শক্তি বলে এই সকল উপাদান একীভূত হইয়া শরীর সংগঠন করে—তাহার কথা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহার কার্য্য বিভাগের কথা বুঝিতে হয়। বিবর্ত্তন নিয়মে কিরূপে শরীরের ক্রম পরিণতি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হয়। সমাজশরীর সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা যদি সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য লক্ষ্য করিয়া, উপমান প্রমাণ বলে, সাধারণ শরীরের সহিত তুলনা করিয়া সমাজশরীর স্বীকার করি, তবে সেই সমাজ শরীর চৈতন্যাধিষ্ঠিত, চৈতন্য জন্যই সমাজশরীর সংহত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সেই চৈতন্য নিজ শক্তি বলে, ব্যষ্টি মানবগণকে সংহত করিয়া—সমষ্টি করিয়া, আপন প্রয়োজন উপযোগী শরীর সংগঠন করিয়া লয়। সুতরাং সমাজশরীর বুঝিতে হইলে, এই সমাজশরীরাধিষ্ঠিত আত্মা কি, মানুষ কোন্ শক্তি বলে ও কিরূপে সম্মিলিত হইয়া সমাজশরীর সংগঠন করে, সমাজ-

---

(১) "সংহত পরার্থত্বাৎ।"—সাংখ্যসূত্র। ১। ১৪০।

(২) "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং।"—ন্যায় দর্শন।১।১১।

(৩) "তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকার সমুদয়াত্মকং।"— চরক সংহিতা।

(৪) "শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তঞ্চ চেতনাবস্থিতং ……স যদা হস্তপদ……অঙ্গৈরূপেতাস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে।"।
সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান। ৫।২।

(১) "অসর্ব্বগতা ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ তির্য্যগ্-যোনিমানুষদেবেষু সঞ্চরন্তি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তম্।……পঞ্চমহাভূতশরীরসমবায়ঃ পুরুষ ইতি।"
সুশ্রুত-সংহিতা, শারীর স্থান।১।১৭।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহাদের কার্য্যবিভাগ কিরূপ, বিবর্ত্তন নিয়মে সমাজের কিরূপ পরিণতি হয়, এ সকল আমাদের বুঝিতে হইবে। সমাজশরীরাধিষ্ঠিত সেই চৈতন্য কি—কে এই মানব সমাজাত্মা, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজশরীর কাহার জন্য সংহত, তাহা বুঝিয়া দেখিব।

৯। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যসমষ্টিই সমাজচৈতন্য, তাহাই সমাজাত্মা। তাঁহাদের মতে, সমাজস্থ প্রত্যেক মানবের জন্যই সে সমাজ। সমাজ তদন্তর্গত মনুষ্যের জন্যই সংহত। সমাজ মানবাতিরিক্ত কাহারও জন্য সংহত হইতে পারে না। অতএব সমাজশরীর স্বীকার করিলে, তদন্তর্গত মানবের চৈতন্যসমষ্টিই যে সেই সমাজচৈতন্য, এ কথাও স্বীকার করিতে হয়। এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষ পরস্পরের সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হয়। পরস্পরের উন্নতির জন্য, সুখের জন্য এরূপে সম্মিলিত হয়। অসভ্য মানুষ স্বাভাবিক নগ্নাবস্থায় পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে. যেরূপ যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে, পরস্পর সমাজবদ্ধ হইলে, সে তাহার সেই পূর্ব্ব স্বাধীনতা, সেই স্বেচ্ছাচারিতা সঙ্কীর্ণ করিতে বাধ্য হয় সত্য। কিন্তু মানুষ আদিম অবস্থায় যে পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করে, যে পরিমাণে কষ্ট পায়, অসহায় অবস্থায় প্রকৃতির সহিত ও অন্য নিকটস্থ ব্যক্তির সহিত তাহাকে যেরূপ সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়, যেরূপ সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিতে হয়, তাহা পরিহার জন্য, মানুষ স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করিয়াও পরস্পর মিলিত হয়, কিম্বা কোন শক্তিশালী লোকের অধীনতা স্বীকার করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া লয়। অথবা তাহার আদিম অসভ্য অবস্থায়, স্বাভাবিক সরলতাময় সহানুভূতি হেতু এবং সামাজিক বা পরার্থবৃত্তিবশে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য পরস্পর অস্পষ্ট অঙ্গীকার মূলে সমাজবদ্ধ হয়। এজন্য এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, সমাজের মূল—পরস্পরের মধ্যে অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা। মানুষ একরূপ অস্পষ্ট চুক্তিমূলেই সমাজবদ্ধ হয়। মানুষ কেবল নিজের সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজের সুখবৃদ্ধির জন্য এরূপ সমাজবদ্ধ হয়। বিলাতী দার্শনিক হব্স্ (Hobbes) সাহেব এরূপ মত প্রতিপন্ন করেন ফরাসী পণ্ডিত রুসো (J. J. Rousseau) তাঁহার Du-Contract Social এবং Emile নামক গ্রন্থে এই মত আরও বিশদরূপে সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সাম্যবাদ ও চুক্তিমূলে সমাজ সৃষ্টিবাদ প্রচারিত হইয়া ফরাসী দেশে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার এই সাম্যবাদের আপাত মনোহর প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যানে জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টও (Kant) বিচলিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনিও, চুক্তিমূলের সমাজের সৃষ্টি, এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।(১) যাহা হউক, এই

---

(১) ক্যাণ্টের কথা এই,—

"The art whereby a people constitutes itself into a state, or, we should properly say, that act the idea of which is presupposed in the state as rightfully constituted, is the original contract, by which all members of the people give up their freedom in order to take it up again as, members of a commonwealth *i. e.*, of a people regarded as a state. We are not therefore

সকল পণ্ডিতদের কথা আংশিক সত্য। তখন সমাজশরীরের ধারণা হয় নাই। তাই সমাজাধিষ্ঠিত চৈতন্যের তত্ত্ব, সমাজের প্রকৃত মূলতত্ত্ব তাঁহারা কেহ আলোচনা করেন নাই। এজন্য বলিতে বাধ্য হই যে, যে সকল পণ্ডিত কেবল স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধা জন্ত বা স্বাভাবিকবৃত্তিবশে, চুক্তিমূলে মানব সমাজ প্রথমে সম্বদ্ধ হইয়াছিল, এ কথা বলিয়াছেন—যাঁহারা এইরূপ অস্পষ্ট সর্ব্বসম্মত চুক্তিকে সমাজের মূলসূত্র ধরিয়াছেন, তাঁহারা অদূরদর্শী। (২) যৌথকারবার বা কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাপন করিতে চুক্তি করিয়া পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেমন কতকগুলি লোক সংহত হয়, সেইরূপ অঙ্গীকার বা চুক্তি (Contract) মূলে মানবসমাজ সংহত হইয়াছে, যাঁহারা এ কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের মূলতত্ত্ব ঠিক বুঝেন নাই। সমাজ প্রথম সম্বদ্ধ হইবার কথা কেহ জানেন না। তবে অনেকে কোন কোন সমাজের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন বা নূতন করিয়া সংগঠন দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে কোন সমাজ সংগঠিত হইতে কেহ কখন দেখেন নাই। যেমন কেহ প্রথম কোন ভাষাসৃষ্টি দেখেন নাই, অথচ কিরূপে ভাষা সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা নানারূপ অভিমত প্রচলিত আছে,—সেইরূপ প্রথম সমাজসৃষ্টি সম্বন্ধেও নানারূপ মত প্রচলিত আছে। তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চুক্তিমূলে সমাজসৃষ্টির কথা, হয় শুধু অনুমান, অথবা আমাদের জ্ঞানের কল্পনা মাত্র। এরূপ অনুমান বা জ্ঞানের এরূপ ধারণা সকল সময় সঙ্গত হয় না। কেন সঙ্গত হয় না, তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। (১)

১০। আমরা জানি যে কেবল আমাদের ইচ্ছায় ও জ্ঞানকৃত চেষ্টায়, আমরা আমাদের শরীর গড়িয়া লইতে পারি না। প্রকৃতি তাহা আমাদের জন্ত, আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের স্ফুটনোন্মুখ সংস্কার অনুসারে, মাতৃগর্ভ হইতে সংগঠন করেন। তেমনই আমরা প্রথমে আমাদের জ্ঞানকৃত চেষ্টায় সমাজ সংগঠন করিতে পারি না। প্রকৃতির নিয়মে আমরা সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য হই। আমরা দেখিয়াছি যে, শুধু

---

to say, that man in the state has sacrificed a *part* of his innate eternal freedom to secure an end. We are to say that he has surrendered, that whole of his wild and lawless freedom in order to find it all again undiminished in a dependence regulated by law."

Quoted in E. Caird's Critical Philosophy of Kant. Vol. II. P. 332.

(২) বিলাতী পণ্ডিত কেয়ার্ড, ক্যাণ্টের এই ধারণা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"In fact it was an illogical attempt to stretch the individualistic idea, so as to cover a social unity, which is the negation of individualism."

E. Caird's Critical Philosophy of Kant, Vol. II. P. 361.

বিলাতী দার্শনিক মার্টিনো, ও সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"The Social union is most inadequately represented as a compact or tacit bargain subsisting among separate units, agreeing to combine for specific purposes, and for limited times and then disbanding again to their several isolations. It is no such forensic abstraction.................. ,but a concrete though spiritual from of life, penetrating and partially constituting all persons belonging to it, so that only as fraction do they become human integers themselves,",

J. Martineau on Types of Ethical Theory. Vol. II. P. 403.

(১) ক্যাণ্টই বলিয়াছেন,—

"that act *the idea of which is presupposed* in the state as rightfully constituted is the original Contract......"

অতএব,—"The Social is no fact of History, but an idea of Reason......"

Caird's Kant vol. II P. 332.

স্বার্থের জন্য মানুষ কখন সমাজবদ্ধ হয় না। মানুষ স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সমাজবদ্ধ থাকে। মানুষে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ হয়। মানুষ পরার্থ কর্ম্ম করে, সমাজের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করে, সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্য এই পরার্থবৃত্তিকে মানুষের সামাজিক বৃত্তি বলা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক মানবের জন্য সমাজ, একথা যেমন আংশিক সত্য,—তেমনই সমাজের জন্য মানুষ, একথা ততোধিক সত্য।

আমরা পূর্ব্বে সমাজশরীরের কথা বলিয়াছি। আধুনিক জীববিজ্ঞানের (Biology) সিদ্ধান্ত অনুসারে, জীবশরীর সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু বা জীবকোষ দ্বারা জীবশরীর সংগঠিত হয়। কিন্তু জীবশরীর সেই সকল জীবকোষের জন্য সৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক জীবাণু তাহার অনুচৈতন্যকে অভিভূত করিয়া শরীরাধিষ্ঠিত এক চৈতন্য জন্য সংহত হয়। এই চৈতন্য ঠিক দেহস্থ জীবাণুর চৈতন্যের সমষ্টি নহে। অতএব সমাজ যদি তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সংহত হয়, যদি সমাজশরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্য সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যের সমষ্টি হয়, তবে সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। (১) তাহা হইলে সমাজশরীর বলা ঠিক সঙ্গত হয় না। কেন না, তাহা হইলে, সমাজের সহিত জীবদেহের সাধর্ম্ম্য অপেক্ষা বৈধর্ম্ম্য অধিক হইবে। কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই বিষয়ে জীবশরীরের সহিত সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য নাই। জীবশরীরের সহিত, সেই শরীরান্তর্গত জীবাণুর যে সম্বন্ধ, সমাজশরীরের সহিত সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেক মানুষেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কতকগুলি জীবাণুর সমষ্টিতে জীবশরীর, আর কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টিতে সমাজশরীর। জীবশরীরস্থ জীবাণু যেমন তাহাদের স্বার্থ সংযত করিয়া, জীবশরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্যের জন্য সংহত হয়, সমাজশরীরস্থ ব্যক্তিগণও তেমনই তাহাদের স্বার্থ সংযত করিয়া সমাজশরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্য জন্য সংহত হয়। যেমন জীবশরীর মধ্যে প্রত্যেক জীবাণু বা জীবকোষ, জীবভুক্ত খাদ্যের সহায়ে পরিপুষ্ট হইয়া, অন্য জীবকোষ উৎপাদন দ্বারা ক্রমে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, ও সেই সঙ্গে জীবশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করে, যেমন জীবশরীরস্থ জীবাণু এইরূপে আপনার পরিপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি করিয়া অজ্ঞাতসারে জীবশরীরেরই পুষ্টি করিয়া থাকে, সমাজশরীরান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিও সেইরূপে সমাজের দ্বারা

---

(১) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"Hence, then, a cardinal difference in the two kinds of organisms. In the one, consciousness is concentrated in a small part of the aggregate. In the other, it is diffused throughout the aggregate. All the units posses the capacities for hapiness and misery if not in equal degrees, still in degrees that approximate. As, then there is no social sensorium, the welfare of the aggregate, considered apart from that of the units, is not an end to be sought. The society exists for the benefit of the society. It has ever to be remembered that great as may be the efforts made for the prosperity of the body politic, yet the claims of the body politic are nothing in themselves, and become something only in so far as they embody the claims of its component individuals."

Principles of Sociology, Vol. I, P. 449.

জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর জড়বাদী—তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্ত, তাহা আমরা এ স্থলে ইঙ্গিত করিয়াছি।

বিকাশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের অঙ্গীভূত থাকিয়া সমাজেরই পুষ্টি করে। যেমন জীবশরীরস্থ জীবাণুর জীবকোষের অণুচৈতন্যের সমষ্টি জীবচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অথচ তাহার অন্তর্গত ও তাহার সহিত একীভূত, সেইরূপ সমাজশরীরস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যের সমষ্টি সমাজচৈতন্য বা সমাজাত্মা হইতে ভিন্ন, অথচ তাহার অন্তর্গত ও তাহার সহিত একীভূত। যেমন জীবশরীরস্থ চৈতন্য, তদধিষ্ঠিত শরীর হইতে পৃথক্ হইলেও, মস্তিষ্ক তাহার অধিষ্ঠানভূমি, তেমনই সমাজশরীরেও সমাজের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লোকই সেই সমাজের সমষ্টিজ্ঞানের বা সমাজচৈতন্যের আশ্রয়স্থান। যেমন জীবশরীরের মস্তক হইতে শরীরের সর্ব্বত্র জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হয়, তেমনই সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেষ্ঠ লোক হইতে সমাজের সকল লোকে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হয়। এ সকল কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

১১। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও এক কথা মনে রাখিতে হইবে। কোন সমাজ কোন বিশেষ কালের জন্য সংহত নহে। সমাজশরীর বহুকালস্থায়ী। কিন্তু তদন্তর্গত মানবগণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সমাজান্তর্গত কত লোক প্রত্যহ মরিতেছে, জন্মিতেছে, মানবপ্রবাহ নিয়ত চলিতেছে, কিন্তু সমাজশরীর একরূপ অচল অটল ভাবে বিদ্যমান আছে। আমাদের শরীর যে সকল জীবাণু দ্বারা সংগঠিত, তাহাদের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এমন কি, কথিত আছে, প্রতি সাত বৎসরে সমুদয় শরীরের অণুগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন জীবাণু দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন শরীর সংগঠিত হইয়া থাকে, অথচ আমাদের শরীরের বিশেষ পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না, শরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্যের কোন ক্ষতি হয় না। সমাজশরীর সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অতএব সমাজ কোন বিশেষ কালের লোকের জন্য সংহত হইতে পারে না। কোন বিশেষ কালে কোন সম্প্রদায় তাহাদের নিজের চেষ্টায় তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি বা সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হয় নাই। সমাজ, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালের মানবগণের স্বার্থ বা সুবিধার জন্য, তাহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সংহত। কোন বিশেষ সমাজ, কোন বিশেষ সময়ে তদন্তর্গত মানবের সমষ্টি নহে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ আমাদের সকলের সমষ্টীকৃত রূপ নহে। সমাজ এক অর্থে, সে সমাজান্তর্গত অতীত বর্ত্তমান সমুদয় মানবের সমষ্টীকৃত রূপ। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও নিজে মিলিত হইয়া নিজের সুবিধামত সমাজ নূতন করিয়া সংগঠন করিতে পারি না। আমরা সমগ্র অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে পারি না। বলিয়াছি ত, আমরা যেমন নিজে নিজের শরীর গড়িয়া লইতে পারি না, তেমনই সমাজশরীরও সংগঠন করিতে পারি না। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে সমাজশরীর সংগঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, সমাজশরীরের জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় হয়। মানুষ যদি নিজে চেষ্টা করিয়া সমাজ গড়িয়া লইতে পারিত, তবে সে আপন সুবিধামত সমাজ করিয়া লইত। মানুষ নিজের স্বার্থই বুঝে, নিজের স্বার্থ বা সুবিধার জন্যই কাজ করে। পরবর্ত্তী কালে তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশের বা সমাজের কি হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার বিশেষ স্বার্থ নাই। সুতরাং যাহাতে পর-

বর্ত্তী কালের লোকের সুবিধা হয়, তাহার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করায় তাহার প্রয়োজন নাই। কারণ, সাধারণ জ্ঞানে মানুষ পরবর্ত্তী কালের সঙ্গে আত্মীয়তা বা একত্ব ধারণা করিতে পারে না। মানুষ নিজ জ্ঞানবলে ও আপন চেষ্টায় সমাজ সংগঠন করিয়া লইতে পারিলে, 'জাতি' বা মানবপ্রবাহ রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বাধা হইত। এজন্য চুক্তিমূলে সমাজ সংগঠন হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য সমাজিধিষ্ঠিত চৈতন্য কোন বিশেষ সময়েই তদন্তর্গত মানবগণের চৈতন্যের সমষ্টি নহে। সে সমষ্টিচৈতন্য হইতে সমাজাত্মা পৃথক। সেই সমাজাত্মার জন্য ব্যক্তিমানব সমাজবদ্ধ হয়। সমাজ ব্যক্তি মানবকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয়।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

চন্দনা

(১)

কালো মেঘে আকাশ ঢেকে বর্ষা এল আষাঢ়ে।
নূতন জলে হেসে খেলে জাগ্‌ল কত আশারে।
মুসল ধারে বৃষ্টিধারা মন্‌টা দিল ভিজিয়ে;
বহুদিনের শুষ্ক স্মৃতি উঠ্‌ল আজি গজিয়ে।
ফুট্‌ল বনে ফুট্‌ল মনে কত ফুলের কলিকা;
বাল্য কথা ফুট্‌ল যথা, শুভ্র নব মল্লিকা।
ছড়িয়ে পাতা তুলে মাথা, উঠ্‌ল জেগে কল্পনা।
প্রাণের তটে এল ছুটে ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

(২)

ছোট ছোট পল্লীগুলি তীরে তীরে দুধারে
ছায়া ফেলে কালো জলে কি যে শোভা বিথারে।
স্বচ্ছনীরে ওরি তীরে, কত বছর আগে'রে!
খেলেছিনু কত খেলা;—আজো মনে জাগেরে।
উছ্‌লে যেত কূলে কূলে কত হর্ষ বাধাগো।
সেদিন বোলে মনে পড়ে বহু দিনের কথা গো।
ভেসে গেছে হর্ষটুকু, পড়ে আছে বেদনা।
যাচ্ছে বয়ে আকা বাঁকা ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

(৩)

বন্যাজলে জোছ্‌না রেতে উঠ্‌ত মেতে ধরণী।
মেঘের মত ভেসে যেত পাল খাটিয়ে তরণী।
কূলের জলে দুলে দুলে ভাসত কত বিধুরে।
বাজ্‌ত কত প্রেমের বীণা প্রাণের মাঝে মধুরে।
ছুট্‌ত কত সুখের ঢেউ; আজি কোথা চিহ্ন তার?
কোথা তন্ত্রী কোথা বীণা, পড়ে আছে ছিন্ন তার।
বর্ষাজলে বুকের তলে উঠ্‌ছে ফুলে ভাবনা।
বন্যা জলে ছুটে চলে ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

(৪)

গাঙের ঘাটে তীরের মাঠে আজি গীতি গাহে কে?
কাদের বাছা ওরা সবে কলরবে না হেরে?
আমার সখা সাথী যারা কোথা তারা মরিরে!
নূতন জলে আজি দুলে ভাসে কাদের তরী রে?
আজো ধরা হাসি ভরা! কে হাসে ঐ কূলে গো?
কেহ কি রে, আর মোরে মনে করে ভুলে গো?
কে গো স্রোতে আহ্লাদেতে অঙ্গ ঢালে অঙ্গনা?
বহে যারে প্রেমধারে ক্ষুদ্রনদী চন্দনা।

(৫)

কালো মেঘে আকাশ ঢেকে বর্ষা এল আষাঢ়ে।
মনের সুখে নদীর বুকে আজি তরী ভাসারে।
তরঙ্গেতে রঙ্গভরে নাচ্‌বি কে গো ছুটে আয়!
নদীর জলে কলকলে বন্যা আজি বহে যায়।
হেসে খেলে আয়রে শিশু, আনন্দের মূরতি;
কল্‌সী বুকে ভাস সুখে ফুল্ল যত যুবতী।
যারে ছুটে প্রাণের তরী, পা'ল তুলেছে কল্পনা।
যারে বোয়ে, বহে যথা ক্ষুদ্রনদী চন্দনা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ। (২)

ইংরাজী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধুনদের নাম ইন্‌ডশ্ বৃজ্—Indus Bridge—এই সেতুর উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে গমনাগমন নিষিদ্ধ। সেতুর দুই পার্শ্বে (অর্থাৎ প্রথম দ্বারে ও শেষ দ্বারে) শাণিত তরবারি হস্তে বৃটীশ সৈনিক পুরুষ অহোরাত্র দণ্ডায়মান থাকিয়া সেতু রক্ষা করিয়া থাকে। রেলগাড়ী চলিয়া গেলে, দ্বারদ্বয়কে বন্ধ করা হইয়া থাকে। সেতুপার হইবার পরে চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়, ঐ পর্ব্বত সমূহ একদিকে কোমলতা, অন্যদিকে কঠিনতার পরিচায়ক। একদিকে বিবিধ প্রকার প্রস্ফুটিত প্রসূনপুঞ্জের মনোহর সমাবেশ, অন্যদিকে কেবল কঠিন ও বন্ধুর প্রস্তর আর প্রস্তর! এই স্থান হইতেই সুপ্রসিদ্ধ সোলেমান, মুখর্দা, হিন্দুকুশ, হাজারা, কৃষ্ণকোহে, বাবা-এ-কোহে প্রভৃতি পাহাড়ের সূত্রপাত। সেতু পার হইবার পরে বহুদূর পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত প্রান্তর এবং পার্ব্বত্য পথ সমূহ অতিক্রম করিয়া নয়োসারা (Nowsara) প্রভৃতি স্থান সমুদয় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের রক্ষা জন্য এবং উত্তরপ্রান্তকে প্রান্তবাসী নানাবিধ দুর্দ্দান্ত মুসলমানজাতিদিগের প্রকোপ হইতে নিরাপদ করিবার জন্য ইংরাজেরা কত যে অসাধারণ আশ্চর্য্য কৌশল এবং কূট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না। এই স্থান হইতে প্রান্তপ্রদেশ (Frontier) আরম্ভ। এই সকল স্থান "পাঠান গাজী" পুঞ্জে পরিপূর্ণ। পাঠান গাজীর কথা একটু পরে বলিব। এই প্রান্তপ্রদেশের শেষ সীমা পেশোয়ার, ইহাই ভারতভূমির একদিকের শেষ সীমা, ইহার পরে আর রেল নাই। পেশোয়ার নগর, পাঠানদিগের মহা আড্ডা (Stronghold)। পেশোয়ারের পরে কাবুলের পথ, তাহা ভারতভূমির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমার বাহিরে অবস্থিত। পেশোয়ার অতি ভয়ঙ্কর স্থান। "ভয়ঙ্কর" শব্দ ব্যবহার করিবার অনেকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, এখানে শীত ঋতুতে যেমন ভয়ানক শৈত্যানুভব হয়, গ্রীষ্মকালে সেইরূপ ভয়ানক উষ্ণতানুভব হইয়া থাকে। শীত ও গ্রীষ্মের ইহাতে চরম (Extremes) আছে বলিয়া এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। গ্রীষ্মের তীব্রাদপি তীব্র রৌদ্রে, অতীব উষ্ণ বায়ুর প্রবাহে, পথস্থিত প্রস্তর খণ্ডের উষ্ণতায়, বালুকার তাপে, পর্ব্বতের উষ্ণত্বে, বিশেষতঃ "লু" নামক হুতাশন সম উষ্ণ ও ভয়ঙ্কর বায়ুর প্রকোপে, অনভ্যস্ত এবং নবাগত পথিকেরা কর্ত্তিতকণ্ঠ রোহিতের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। শীতকালে এক এক দিন এমন শীত হয় যে, ইংলণ্ডের দারুণ শৈত্য অপেক্ষা কম শৈত্য হয় বলিয়া বোধ হয় না। আমি পৃথিবীর অনেক শীতল দেশের শৈত্য সহ্য করিয়াছি, কিন্তু পেশোয়ারের শীত আমার পক্ষেও অনেক সময়ে অসহ্য হইয়াছিল। একদিন পেশোয়ারে বসিয়া শীত ঋতুতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে দক্ষিণ হস্তের

অঙ্গুলি সমূহ প্রবল শীতে এমন অসাড় হইয়া গেল যে, সম্মুখস্থিত প্রতপ্ত অঙ্গারময় লৌহ পাত্রের উপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি রাখিয়া তবে পুনরায় অঙ্গুলি প্রসারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এখানে আশ্বিন মাসের শেষে যেরূপ শীত হয়, বাঙ্গালা দেশে মাঘ মাসেও বোধ হয় সেরূপ শীত হয় না; পেশোয়ারে মাঘের শীত বাস্তবিক বাঘের বিক্রম বলিয়া বোধ হয়। পেশোয়ারের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, এবং মুসলমানদিগের মধ্যে প্রতি ৯২ জনের মধ্যে ৯১ জন পাঠান। কেবল নগরে প্রায় এক লক্ষ ২৬ হাজার পাঠান বাস করে। পথে, ঘাটে বা মাঠে অসংখ্য পাঠান পুরুষকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু একটীও পাঠান রমণীকে দেখিতে পাইবে না। কদাচিৎ যাহারা দৃষ্টিপথে পতিতা হয়, তাহাদের মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত, রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী মহাশয়ের "ঘাঘরার" ন্যায় এক অপূর্ব্ব লম্বমান "বুর্খা" পরিচ্ছদে আবৃত থাকে। কেবল চক্ষু দুইটী খোলা থাকে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; চক্ষু দুইটীও অতি সূক্ষ্ম জালদার আবরণে আবৃত। পাঠান স্ত্রীলোকেরা বলবতী, পরিশ্রম-পরায়ণা, সুন্দরী, অতিথিসৎকারিণী, পতির আজ্ঞাবাহিনী, সাহসিকা এবং স্বধর্ম্মানুরাগিণী। সন্তান ও সন্ততিদিগকে ইহারা অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করে। পেশোয়ারে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন কালী মন্দির আছে; সৌভাগ্যক্রমে মুসলমানেরা সেখানে কখনও অত্যাচার করে নাই। বহুপূর্ব্বে একটী "বঙ্গসাহিত্য সভা" এবং "বাঙ্গালী পাঠাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই

পেশোয়ারে আসাম প্রদেশের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কখনও কখনও মাসে ছয় সাত বার ভূমিকম্প হইতে দেখা গিয়াছে। এই জন্য সেখানে অধিকাংশই কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ; ইষ্টক বা প্রস্তরের বাটী প্রায়ই নাই। পেশোয়ার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম "পেশোয়ার ছাউনী" (Cantonment), অন্য ভাগের নাম "সহর" (City)। পারস্য ভাষায় পেশা শব্দের অর্থ ব্যবসা; আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, ভারতবর্ষ, মধ্য আসিয়া, প্রভৃতি নানা স্থানের মুসলমান ব্যবসাদারেরা এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া ইহার পেশোয়ার (অর্থাৎ ব্যবসায়ীদিগের আড্ডা) এইরূপ নাম হইয়াছে। পেশোয়ার ছাউনীতে (সেনা নিবাসে) ইংরাজেরা বাস করে, সহরের ভিতরে তাহাদের কেহ বাস করে না এবং করিতেও পারে না। সমুদয় সহরটী উচ্চ ও দৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইহার অনেক দ্বার আছে, কতকগুলি দ্বারের নাম লাহোর দরজা, কাবুল দরজা, দিল্লী দরজা ইত্যাদি। সহরের ভিতরে অসংখ্যাসংখ্য মুসলমানের বসতি। আমাদের গৃহের মধ্যে এক স্থানে একটু গুড় ফেলিয়া দিলে, স্বল্প কাল মধ্যে যত রাশি রাশি পিপীলিকা জমে, পেশোয়ারের এক এক পল্লীতে সেইরূপ রাশি রাশি পাঠান জমিয়া আছে। ইহারা ইংরাজের ঘোরতর বিদ্বেষী। ইংরাজ বধ করিতে পাইলে ইহারা স্বর্গবাসী হইবে, ইহাই ইহাদের ভ্রমাত্মক ধ্রুব বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে গাজী সম্প্রদায় অত্যন্ত উন্মাদভাবাপন্ন (Fanatic and Desperate) ; ইহারা যেমন বলবান, যেমন কুসংস্কারাপন্ন, তেমনি ধর্ম্মান্ধ এবং অশিক্ষিত। একটু সুবিধা পাইলেই, ইংরাজের গলায় ছুরিকা বসাইয়া দেয়। প্রতি বৎসর বহুল ইংরেজ এইরূপে ইহাদের হস্তে নিহত হইয়া থাকে। সাহেবেরা সততই পাঠানের ভয়ে সঙ্কুচিত থাকেন। বাজারে আসিলেও তাহারা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়েন। ক্যাণ্টনম্যাণ্টের ভিতরে গিয়াও গাজীরা সাহেবদিগকে সুবিধা মত বধ করে। ইংরাজ স্ত্রীলোক সহরের ভিতর প্রায়ই আসেন না। গাজীর দৌরাত্ম্যে বৃটীশবীর সততই চিন্তিত থাকেন। সম্প্রতি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর "গাজী আইন" বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহার মূল মর্ম্ম এই যে "হত্যাকারী গাজী ধরা পড়িলে প্রথমে তাহাকে নগরের প্রকাশ্য পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া সর্ব্বজন সম্মুখে বেত্রাঘাত করা হইবে, তদনন্তর প্রকাশ্য ভাবে তাহাকে ফাসি কাষ্ঠে উঠাইয়া নিহত করা হইবে।" আমার বোধ হয় না, ইহাতে গাজীর উপদ্রব কখনও কমিয়া যাইবে, বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে, "ভবি ভোলবার নয়" — গাজী কখনও ইংরাজ-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইবে না, ইহা নিশ্চয়। এক একটা গাজী এমন সুচতুর যে, সময়ে সময়ে অত্যন্ত ভদ্রতা ও সভ্যতা দেখাইয়া ইংরাজকে মহাকুহকে পাতিত করে, কিন্তু পরিণামে ইংরাজকে তাহার ভ্রমের জন্য পশ্চাত্তাপ করিতে হয়। ইংরাজ পুরুষ এখন পাঠানের ছদ্ম প্রেমের পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছেন যে—

মাছ মরেছে, বিড়াল কাঁদে,
শান্ত কোলে বকে।
ব্যাঙের শোকে, সাঁতার পাণি,
'হেরি সাপের চোখে।"

পেশোয়ারের পাঠান হস্তে সাহেবের খুন প্রায় নিত্য ঘটনা বলিলেও বলা যায়, ইহা তথাকার প্রবাদ বাক্য। রবিবার দিবসে সাহেবদিগের গির্জ্জায় নেমাজ হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে নগরের প্রায় সমুদয় ইংরাজ পুরুষ ও রমণী গির্জ্জায় একত্রিত হইয়া থাকে ; গির্জ্জাটী সহরের অভ্যন্তরে এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও পরাক্রমী পাঠানপুঞ্জের মধ্যে এই গির্জ্জা অবস্থিত ; সুতরাং পাঠানদিগের পক্ষে রবিবার "পহোবার" দিন !! ইংরাজও অসতর্ক নহেন, সেই দিন গির্জ্জার চারি পার্শ্বে ও সমুদয় পথে শাণিত তরবারী হস্তে পুলীশ প্রহরী এবং বৃটিশ সেনার ছড়াছড়ি হইয়া থাকে। তবুও সুবিধা মতে দুই একটা খুন প্রায়ই হয় !!

পেশোয়ারে মাংস যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, মূল্যেও তেমনি সস্তা। অনেক সময়ে মৎস্য আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতা বড়ই অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। বাজারে যে দিন কেহ মাছ বেচিতে আসে, সে দিন বাঙ্গালীর "পহোবারো" !! সে দিন বাঙ্গালীর মনে পরমানন্দের উদয় হয় এবং বাঙ্গালী মহলে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। কবি রূপচাঁদ পক্ষী গাহিতেন—

"কায়েৎ মরে খেয়ালে
বেনে মরে দেয়ালে,
জোলা মরে তাঁতে।
কাঙ্গালী বাঙ্গালী মরে
মাছে আর ভাতে॥" *

---

* কায়স্থের হাতে টাকা আসিলে তাহার মনে নানাবিধ খেয়ালের উৎপত্তি হয়। সোণার বেনের টাকা হইলেই সে অট্টালিকা তৈয়ার করিয়া ভাড়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে।

তিনি আর এক সময়ে গাহিয়াছিলেন—

উড়ে মজে খিঁচুড়ি,
মেড়ুয়া মজে রোটি।
বাঙ্গালী মজে মাছ ভাত,
কাঙ্গালী মজে ঘটি ॥*

আসল কথা এই, বাঙ্গালী বাবু দিল্লীতেই থাকুন, আর মক্কাতেই থাকুন, মাছ ভাত ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর নাই।

বিশিষ্ট হিন্দুর বিশ্বাস মতে, সিন্ধু নদ পার হইলেই ভারতের সীমার শেষ হয়, এজন্য পেশোয়ারকে হিন্দুরা ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া থাকে। বাস্তবিক এই নগরে অসংখ্যাসংখ্য মুসলমানের বসতি, নিত্য অসংখ্যাসংখ্য গোহত্যা, অগণ্য মস্‌জিদ্‌, দরগা, মকবরা, গোরস্থান এবং গোমাংসের দোকান দেখিয়া হিন্দুরা এই নগরকে হিন্দুস্থানের অন্তর্গত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। সহরের সর্ব্বত্রই পলাণ্ডু, রশুন ও গোমাংস পাকের গন্ধে রাস্তার ধারে হিন্দুর পক্ষে দণ্ডায়মান থাকা নিতান্তই অসুবিধাজনক। হিন্দুরা, তাহাদের বিবাহ, উপনয়ন, ব্রত প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতের সীমায় আগমন পূর্ব্বক, সম্পন্ন করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, পেশোয়ারের মধ্যে হিন্দুর মৃত্যু হইলে, মৃত হিন্দুর আত্মীয়েরা মৃতদেহকে সিন্ধুনদের পারে লইয়া আসিয়া দাহ করে এবং পারেই তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিশিষ্ট হিন্দুরা এই নিয়মের প্রায়ই ব্যতিক্রম করেন না।

পেশোয়ারের পাঠানের ভাষা পশ্‌তু। এই ভাষার একটু নমুনা দিলাম।

পুশ্‌রো লবোদে জংগীর ফেঙ্গোয়ান্‌।
উরো উরো নন্‌ লাখিয়াল্‌ লদে মংগেরে ॥ *

এই নগরে কাবুলের আমীরের একটা পোষ্টাফিশ আছে, সেই ডাকঘরে চিঠি দিলে কাবুলে তাহা প্রেরিত হইয়া থাকে। কাবুল-দরজা পার হইলে আফ্‌গানিস্থান অভিমুখে যাওয়া যাইতে পারে। এই পথ নিরাপদ নহে। যাহা হউক, পেশোয়ারে বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ফল ও সুন্দর কুসুম নিয়ত সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্‌দা নামক ফল সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর, কিন্তু ইহার মূল্য অধিক। পেশোয়ারের পাঠান "মানুষ চুরি" (Kidnapping) জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ছোট ছোট বালক ও বালিকাদিগকে চুরি করিয়া লইয়া বিক্রয় করে; এরূপ ঘটনা প্রতিদিন প্রায় দুই বেলা শুনা গিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মুসলমান দারোগা ও মুসলমান কনেষ্টবলগণের সহিত পাঠানদিগের বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকিত, পুলিশের লোকেরা পাঠানদিগের সম্বন্ধে পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতায় গোপনে গোপনে অনেক অবৈধ কার্য্য করিত, এইজন্য অধুনাতনকালে অধিকাংশ পুলিশ কর্ম্মচারী ও প্রধান অমাত্যগণ প্রায়ই হিন্দু।

লাহোরে যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন হইতেই পঞ্জাব প্রদেশে পাঠানের প্রভুত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে। বলে, বিক্রমে, সাহসে, স্বাধীনতায়, উদ্দীপনায় এবং বিশেষতঃ ব্যবসা ও বাণিজ্যলব্ধ ধনে ইহারা কোনও কালেই হিন্দু হইতে ন্যূনতর ছিল না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ইহারা কখনই হিন্দুর সম-

---

* কাঙ্গালী (ভিখারী)গণ প্রায়ই একটা ঘটি (লোটা) হাতে লইয়া ভিক্ষা করে; ভিখারীদিগের ইহা একটা ভূষণ স্বরূপ।

* "ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী" ১ম খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

কক্ষ হইতে পারে নাই; শিক্ষা, স্বভাব ও ধর্ম্মজ্ঞানে ইহারা এখনও হিন্দুর তুলনায় কোটি ক্রোশ পশ্চাতে অবস্থিত। লাহোরে শিখ রাজার শাসন সময়ে, পাঠানেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজা রণজিত সিংহের রাজত্বকালে পাঠান দলপতিরা শিখদিগের প্রভুত্বকে উপেক্ষা করিয়া ঘোরতর বিদ্রোহী হয়। বিক্রমকেশরী এবং সমরকুশল রণজিত সিংহ এজন্য বিশেষ চিন্তিত হয়েন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি যুবক হরি সিংহ (ওর্‌ফে হর্ সিং) মহাশয় অতীব বলবান ও সাহসী শিখসেনাকে সঙ্গে লইয়া খ্রীষ্টীয় ১৮১৮ অব্দে পেশোয়ারে আগমন পূর্ব্বক ক্রমাগত সপ্তমাস কাল পর্য্যন্ত অমিত সাহস, অভূতপূর্ব্ব অধ্যবসায়, বিশিষ্ট বিক্রম এবং অনন্যসাধারণ উদ্দীপনার সহিত পাঠানদিগকে যেরূপে দমন করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা। স্থূল কথা এই যে, এরূপ আশ্চর্য্য দমন ও শাসন ব্যাপার পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়। হরি সিংহ রূপ শিখ-নকুল, অহিরূপ পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহাদের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। পাঠানকে দমন করিবার জন্য শিখেরা পুনঃ পুনঃ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল; শিখকে দমন করিবার জন্য পাঠানেরাও পরিশ্রমপরায়ণতার পুনঃ পুনঃ আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে ত্রুটি করে নাই। মার্কবী নামক জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন—

"It was a regular contest between labour and genius." দম্পতিদিগকে ধৃত করিয়া একত্রে উপবিষ্ট করাইয়া তাহাদের মধ্যস্থানে একটা বৃহদাকার মৃন্ময় পাত্রে তপ্ত অঙ্গার রাখা হইত এবং সেই অঙ্গার পূর্ণ হাঁড়িতে শুষ্ক লঙ্কামরিচ নিক্ষিপ্ত হইলে, পাঠানেরা কাসিতে কাসিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। বড় বড় লম্বমান দাড়ী সমাযুক্ত পাঠানদিগের দাড়ী পরস্পরের দাড়ীর সহিত বাঁধিয়া দিয়া তাহাদের মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইত, কাহাকেও বা উন্মত্ত সারমেয় বা শৃগালের দ্বারা দংষ্ট্র করান হইত, কাহাকেও ঊর্দ্ধপদ এবং অধোশির ভাবে বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া শাণিত ছুরিকা দ্বারা তাহার গায়ের চর্ম্ম খুলিয়া ফেলা হইত। এইরূপ ব্যবহার নৃশংস জনোচিত কি না, তাহার বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু নিরপরাধী শিখ ও হিন্দু পুরুষ এবং সতী স্ত্রীলোকদিগের উপরে পাঠানেরা যে সয়তানী ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা যে কঠোর দণ্ডের উপযুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা অকারণে রাজবিদ্রোহী হইয়া সমগ্র রাজ্যের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। পেশোয়ার নগর মধ্যে একটা স্থান আছে, তাহার নাম "হরিসিংহের মাতম্", উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে সহস্র সহস্র পাঠান হরি সিংহের তরবারিতে নিহত হইয়াছিল। পাঠানেরা দুর হইতে এখনও সেই মাতম্ দর্শন করিলে ভয়ে ভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেনাপতি হরিসিংহের বয়স তখন মোটে ২৭ বৎসর! বাস্তবিক, শিখের কাছে পাঠানেরা শিষ্য মাত্র। হরি সিংহের মত কত শত বীর ভারতের ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তখন ২৭ বৎসরের যুবারা সেনাপতির পদে নিযুক্ত

হইত, এখন একটী বিলাতফেরৎ সবলদেহী সুশিক্ষিত ও সাহসী বাঙ্গালী বাবুকেও ইংরাজ প্রভু ভলণ্টিয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে নারাজ !!

পাঠানেরা সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত, ইহাদের কেহই "সিয়া" নহে। পাঠান শব্দ "পিয়াঠাম" শব্দের অপভ্রংশ, পিয়াঠাম শব্দ পিয়াথাম শব্দের বিকৃতি, এবং পিয়াথাম শব্দ সংস্কৃত প্রিয় স্থান শব্দের অপভ্রংশ। রঘু রাজার দিগ্বিজয় কালে ভারত প্রান্তে যে "প্রিয় স্থান" নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহাই এক্ষণে পাঠান মুলুক বলিয়া পরিচিত। রঘু রাজা সমগ্র পাঠান দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম ছিল না। রণজিত সিংহের শাসন কালে কাবুল শিখের করতলগত হয়। এই প্রাচীন "প্রিয় স্থানের" লোকেরা দুর্ভাগ্যক্রমে, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের দোষে, সভ্য জাতির নিকটে এক্ষণে অতীব "অপ্রিয়"বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। পাঠানের উপদ্রবে ভারতবাসীদিগকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ভারতের বহির্প্রান্তে পথিকেরা পাঠানদিগের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে। ডাক লুণ্ঠনের ত কথাই নাই; ডাকাইতি, রাহাজানী, মানুষ চুরি, ধর্ম্মনাশ, সতীত্ব নাশ প্রভৃতিতে ইহারা খুব পটু। সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের অনেক ডাকাইতি মোকর্দ্দমায় পঞ্জাবের পাঠানেরা অপরাধী বলিয়া গুরুতর দণ্ড পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি নর্ম্মান সাহেব আবদুল্লা নামক এক পাঠান-ঘাতকের শাণিত ছুরিকাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আণ্ডামান দ্বীপে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মেয়ো সের আলি নামক এক পাঠান-দস্যুর হস্তে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। ইংরাজেরা পঞ্জাবের পাঠানকে দমন করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয়, কত যত্ন স্বীকার, কত খোসামুদী, কত প্রলোভন এবং শেষে কত ভয় প্রদর্শন ও কত কূট কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু পাঠান যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে। এখনও ইহারা বলে—

জান্‌কা বদল্ মে জান্
হাতকা বদল্ মে হাত।
আওরৎ কা বদল্ মে আওরৎ
দাঁতকা বদল্ মে দাঁত॥

খ্রীষ্টানের বাইবেলে লিখিত আছে, "An eye for an eye and a tooth for a tooth" কিন্তু খ্রীষ্টীয় পাদ্রী প্রায়ই তাহা করেন না, কিন্তু এক জন পাঠান সুবিধা পাইলে, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ, স্ত্রীর পরিবর্ত্তে স্ত্রী, হাতের পরিবর্ত্তে হাত এবং দাঁতের পরিবর্ত্তে দাঁত লইতে কখনই নিরস্ত বা অস্বীকৃত হয় না। পাঠান দেশ কি ভয়ানক !!

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মনুবাক্য ও শঙ্করাচার্য্য।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি॥
মনু ২, ২১৫।

এই প্রচলিত মনু বাক্যের প্রতিবাদে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য একবার বলিয়াছিলেন, "বিদ্বাংসং নাপিকর্ষতি।" তৎপর মোহজালে বিমুগ্ধ হইয়া সে বাক্যটী রক্ষা করিতে

পারেন নাই, তিনবার বলিয়াছিলেন "*বিদ্বাংসমপিকর্ষতি।"

আমি যে শাস্ত্রীয় বাক্যের টিপ্পনী করিতে পারিব, সে ভরসা রাখি না। তবে এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহা উপলব্ধি করিতেছি যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ব বাক্যটী বজায় রাখিতে পারিতেন। মায়াময়ীর মায়ায় মুগ্ধ না হইলে কখনও তাহা পরিবর্ত্তন করিতেন না।

বিদ্বান যদি এইরূপ মায়া মোহের অধীন হইলেন, তবে "বিদ্বান" অর্থ যে "জ্ঞানী," তাহা আর থাকে না। বিদ্+শতৃ, শতৃ স্থানে বস্তু হইয়া বিদ্বান্ হইয়াছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ 'জানা'—জ্ঞাতব্য বিষয় জানা না জানা পর্য্যন্ত জানিয়াছি বলা যায় না। বিশেষরূপে জানে যে, সে জ্ঞানী বা "বিদ্বান।" শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন;—

> "ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
> ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

ইহাতে অষ্টম লক্ষণ বিদ্যা—পরমাত্ম জ্ঞান। অবিদ্যা নাশ করিয়া যে মানব বিদ্যাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই বলি বিদ্বান্। অবিদ্যা-জনিত মোহাদি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। আপন হৃদয়-সঞ্জাত, ষড়রিপুর আক্রমণে দুর্গ স্বরূপ সেই বিদ্যাই তাহার দুর্গা—জ্ঞান—চিন্ময়জ্ঞান।

"জ্ঞানেন নশ্যতেঽবিদ্যা ইন্ধনানি যথাগ্নিনা।" অগ্নি দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠ ধ্বংস হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞান (বিদ্যা) দ্বারা অবিদ্যা নাশ হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞানই চরম সাধন। আমি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহি, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে কে?—বিদ্বান্। এই বস্তু আত্মা নহে, সেই বস্তু আত্মা নহে, এইরূপ বিচার বাক্য দ্বারা পরমাত্মা অবধারিত না করিয়া অবশেষে বেদোক্ত "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মোঽস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব জ্ঞান করিতে পারেন কে? "বিদ্বান্।" বিদ্বান্ যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞানে বিভোর হইবেন, তখন অকিঞ্চিৎকর মায়া মোহে কিছুতেই মুগ্ধ হইবেন না।

বিদ্বান যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব ভাবনার চরম সীমায় পৌঁছিবেন, তখন একবার কেন শতবার বলিতে পারেন, "বিদ্বাংসং নাপিকর্ষতি।"

এইরূপ লেখার উপর অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। কালিদাস, সেক্সপিয়র, মিল্টন প্রভৃতি কাব্য-পণ্ডিতগণ, বররুচি, মিহির, নিউটন প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ, ভূতত্ত্ববিদ্ ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, অথবা চাণক্য, বিস্মার্ক, বার্ক প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ মনস্বীগণ, ইঁহারা কি বিদ্বান্ ছিলেন না? বিদ্বান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা শাস্ত্রলেখক বা প্রকাশক হইতে পারেন। যে পর্য্যন্ত আমার আমিত্ব রহিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রকারই হই, আর দার্শনিকই হই, বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। যাঁহার আমিত্ব লোপ পাইয়াছে, তিনিই বিদ্বান।

উল্লিখিত শাস্ত্রকার বা প্রকাশক বা বিজ্ঞানবিদ্‌কে এক সময় বিদ্বান্ বলা যাইতে পারে। মনে করুন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতে জগৎ সৃষ্ট। ইহাদের একটী তত্ত্বেও যদি কেহ চরম

---

* মাতা, ভগিনী বা দুহিতার সহিত নির্জ্জনে একত্র আসীন হইবে না। কারণ বলবান ইন্দ্রিয় বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে।

শক্তির সহিত চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া তন্ময়ভাব লাভ করতঃ আমিত্ব লোপ করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে বিদ্বান বলা যায়, তখন আর শাস্ত্র-প্রকাশক বা বিজ্ঞানবিদ্‌ বলা যায় না। জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া গেলে ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। সাধনার একটী মাত্র অঙ্গের সাধনা করিয়া চরম সীমায় পৌঁছিতে পারিলেও তাহা লাভ হয়। তদ্রূপ সাধককেও বিদ্বান বলা যায়। পরমাত্মায় ও তাঁহাতে পার্থক্য কিছু আর থাকে না।

"শিবোঽহং" এই একটী তত্ত্ব, দ্বিতীয় তত্ত্ব "আমার আমিত্ব লোপ," এই দুই তত্ত্বের চরম সীমায় যে সাধক পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই জ্ঞানী (বিদ্বান) অথবা ভক্ত বলি। এইরূপ সিদ্ধপুরুষকে মায়ামোহ কোন রূপেই বিমুগ্ধ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আর একটী প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতে পারে। শুকদেব, রাজর্ষি জনক, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির, ভীষ্মদেব, ভগবান শঙ্করাচার্য্য কি জ্ঞানী (বিদ্বান) ছিলেন না; ছিলেন সত্য। কিন্তু সে সত্য আমাদের মতেরই সমর্থন করিতেছে। শাস্ত্র পরম্পরায় ও পুরুষানুক্রমে যেমন শুনিয়া আসিতেছি— শুকদেব এক সময় সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়াও জ্ঞানী ছিলেন না। ব্যাসদেবের আদেশে রাজর্ষি জনকের নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভার্থ গিয়াছিলেন। তৎসময়ে রাজপুরী অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছিল। শুকদেব দেখিলেন, তাঁহার কৌপিন কমণ্ডলুও তৎসঙ্গে জ্বলিয়া যাইবে। তখন তাহা নিরাপদে রাখার জন্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুরীর যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি রাজর্ষি জনক ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, অবিচলিত মনে মহানন্দে বসিয়া কেবল পরম তত্ত্বেই মন নিমগ্ন রাখিলেন। এই দৃশ্যে শুকদেবের জ্ঞান হইল যে, অবিদ্যাস্বরূপিণী মায়া নাশে বিদ্যার উদয়। শুকদেব জ্ঞানী হইলেন। রাজর্ষির এই দৃষ্টান্তেও কি বলা যাইতে পারে না "বিদ্বাং সং নাপিকর্ম্মতি।"

প্রবাদ আছে,— একদা কোন সরোবরে কতিপয় যৌবনপ্রাপ্তা পরমসুন্দরী ললনা উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন। শুকদেব তখন তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত। তদ্দর্শনে তাহারা কিছুমাত্র লজ্জিতা বা সঙ্কুচিতা না হইয়া বরং মহানন্দে সন্তরণই করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্যে শুকদেবের চিত্তও কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

এমন সময় সেস্থলে ব্যাসদেব উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সকল ললনাই ত্রস্ত হইয়া সরোবর হইতে উঠিয়া আপন আপন বস্ত্র পরিধান করতঃ লজ্জায় আড়ষ্ট ভাবে গমনোদ্যতা হইতেছিলেন, দেখিয়া, ব্যাসদেবের মনে একটী অকিঞ্চিৎকর ভাবের উদয় হইল। ললনা সকলকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কাছে আমি তোমাদের পিতা পিতামহতুল্য বৃদ্ধ। আমাকে দেখিয়া তোমরা লজ্জায় জড়ীভূতা হইয়া ত্রস্তে ব্যস্তে অবগুণ্ঠনাদি দিয়া চলিয়া যাইতেছ; আর এই যে আমার পুত্র কার্ত্তিকেয় তুল্য যুবাপুরুষ শুকদেব দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সাক্ষাতে ত তোমরা এতক্ষণ নিতান্ত নির্লজ্জভাবে উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিলে। ইহারইবা তাৎপর্য্য কি?" তখন একজন বষিয়সী ললনা তদুত্তরে বলিলেন "ভগবন্‌, আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি বেদব্যাস অথবা বেদ-

প্রকাশক। আপনার নিকট আমরা স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ, কাজেই আপনাকে দেখিয়া আমাদের লজ্জা স্বভাবতঃ হইবেই হইবে। আপনার পুত্র শুকদেব জ্ঞানী (বিদ্বান), তাঁহার নিকট আমরা যে স্ত্রীলোক, তাহার বিচার নাই; তাঁহার নিকট স্ত্রী, পুরুষ সকলই এক। সুতরাং তাঁহার নিকট উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেইবা আমাদের লজ্জা কি? ভেদাভেদ যে করে, তাহারই নিকট লজ্জা।" অতএব বলি, এই সময়ও কি বেদব্যাস বলিতে পারিতেন না, "বিদ্বাং সং নাপিকর্ষতি।"

তৃতীয় প্রতিবাদ—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যদি জ্ঞানী বা বিদ্বান্ ছিলেন, তবে কেন "বিদ্যাং সং নাপি কর্ষতি" বলিয়া আবার তিন বার বলিয়াছিলেন—"বিদ্বাং সমপিকর্ষতি।"

ইহার মূলতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা অতি দুরূহ। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনু বাক্যের উপর টিপ্পনী করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন বলিয়াছিলেন—

"বিদ্বাং সংনাপিকর্ষতি" তখন অবিদ্যা স্বরূপিণী মহামায়ার ইচ্ছা হইয়াছিল, সন্ন্যাসীকে একবার দেখিব।

কতিপয় দিবসান্তর একদা হঠাৎ প্রবল প্রতাপে ঝটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া শিলাবৃষ্টিতে ধরণী যেন রসাতলে যাইতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে অশনি পতনে পশু পক্ষী মানব প্রভৃতির হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। হাহাকার রবে কোথাকার কে কোথায় আশ্রয় লইয়াছিল। দিগ্ভ্রমে প্রাণী মাত্রেই ব্যস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিতেছিল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এবিপদে পড়িয়াছিলেন। কোথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ভীতিবিহ্বলচিত্তে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় মণিকর্ণিকা ঘাটে বিজলী প্রবাহে একখানা কুটীর যেন দৃষ্টিগোচর হইল। প্রাণপণে সেই দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে অতি কষ্টে কুটীর সমীপে যাইয়া দেখিলেন, কপাট বন্ধ। দ্বারে করাঘাত করিয়া অতি মাত্র ব্যস্ত ও কাতর স্বরে বলিলেন "আমি এক জন বিপদগ্রস্ত পথিক। কুটীরাভ্যন্তরে আপনি যিনিই হউন, আশ্রয় দানে রক্ষা করুন।" দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; শঙ্কর চকিত দৃষ্টিপাতে দেখিলেন, কুটীরবাসিনী একজন নবযৌবনসম্পন্না, পরমলাবণ্যবতী মনমুগ্ধকারিণী ললনা—তাঁহাকে অতি মিষ্টকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিতেছিলেন। যথোপযুক্ত আসনে বিপদগ্রস্ত পথিককে লইয়া পরিচয়াদি সম্ভাষণে রমণী যেন জানিতে পারিলেন যে, বিপদ্গ্রস্ত পথিক শঙ্করাচার্য্য। এদিকে আচার্য্যের চিত্ত কুটীরবাসিনীর প্রাণতোষণ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ধর্ম্মবীর ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। অস্থির হৃদয়ে যেই শঙ্কর দুই হাত বাড়াইয়া সুন্দরীকে প্রেমালিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি রমণী অট্টহাস্যে পিছু হটিয়া গেলেন, তার পর বলিলেন—"ছি ছি। ও কর কি? তুমি না শঙ্করাচার্য্য?—বলিয়াছিলে, বিদ্বাং সং নাপি কর্ষতি।"

সুন্দরী যেই এই বাক্য প্রসারণ করিলেন, অমনি সেই ঝঞ্ঝাবৃষ্টি গর্জ্জন বা কুটীর, কিছুই রহিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলি পরিষ্কার হইয়া গেল। সুন্দরীও অন্তর্দ্ধান হইতেছেন দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অব-

নতশিরে করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন— "মাগো, এদাসের অপরাধ ক্ষমা কর মা। তোমার লীলা বুঝা ভার। তুমিইত অবিদ্যাস্বরূপিণী মায়া। তোমার মায়ায়ইত জগৎ মুগ্ধ। মাগো জানিতে পারিলাম, আমিও এখনো তোমার অধীন হইয়া তোমার কৌশলে তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছি। কাজেই দায়ে পড়িয়া বলি মা, একবার কেন, তিন বার বলি, "বিদ্বাং সমপিকর্ষতি।"

এখন কথা হইতেছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন পুনরুক্তি করিয়া তিন বার বলিয়াছিলেন "বিদ্বাং সমপিকর্ষতি।" তখন আর অন্যে পরে কা কথা।

এই তর্কের এই উত্তর হইতে পারে যে, বাস্তবিক সেই সময় পর্য্যন্ত সেই মায়াশক্তির শক্তি শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানশক্তি হইতে বলীয়ান ছিল—কাজেই তাঁহার এ পরাজয় ঘটিল অতএব এই মায়াশক্তির করতল হইতে যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হওয়া গিয়াছে, সে পর্য্যন্ত কেহই বলিতে পারেন না "বিদ্বাং সং নাপিকর্ষতি।" কিন্তু যখন সেই অবিদ্যাস্বরূপিণী মায়াকে নাশ করিয়া দিব্যজ্ঞানরূপ পুষ্প মানব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইবে, তখন কেন বলিতে পারিবেননা, 'বিদ্বাং সং নাপিকর্ষতি।' বিশেষতঃ ইহাও দেখা যায় যে, অবিদ্যার কল কৌশলে জগৎ মুগ্ধ। সেই অবিদ্যা স্বয়ং ষোলকলারূপে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে মুগ্ধ করিয়া মায়াশক্তি দেখাইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য এখন পর্য্যন্ত তাঁর অধীন, তাই তাহাকে দিয়া বলাইলেন "বিদ্বাং সমপিকর্ষতি।" এই মায়ার অধীন যে পর্য্যন্ত আছি, সকলকেই বলাইতে পারেন, তিন বার কেন শত বার বলাইতে পারেন "বিদ্বাং সমপিকর্ষতি।" কিন্তু যখন জ্ঞানী, বিদ্বান্ অথবা ভক্তের নিকট তাঁহার মায়াজাল ছিন্ন হইবে, তখন আবার তিনিই—শত বার বলিতে পারেন—"বিদ্বাং সং নাপিকর্ষতি।"

অনেক দিনের এক খানি পুস্তকের একটী সারগর্ভ গল্পের কথা আমার মনে হইতেছে। কোন দেশে এক ধর্ম্মজ্ঞ রাজ-সংসারে এক জন রাজপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র অনেক বৎসরে গীতা পাঠ সমাপ্ত করিয়া পিতা সহ ঐ রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আমি অনেক বৎসর গীতাভ্যাস করিয়া আসিয়াছি, অনুমতি করিলে পাঠ করিয়া শুনাইতে ইচ্ছা করি।" মহারাজ উত্তর করিয়াছিলেন, "আপনার গীতা অভ্যাস হয় নাই, কি শুনিব?"

মহারাজের এইরূপ উত্তরে পণ্ডিত-পুত্র গীতা-পাঠক নিজালয়ে না গিয়া ভগ্নচিত্তে দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর আবার গীতা পাঠান্তে রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ, এবার গীতায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। আজ্ঞা হয় ত শ্রবণ করাইতে বাসনা করি। রাজা এবারও মাথা নাড়িয়া বলিলেন "হুঁ হুঁ না, এখনো তোমার গীতাভ্যাস হয় নাই।" গীতা-পাঠক এরূপ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত, ভগ্নোৎসাহ ও ক্ষুব্ধ হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। এবার কোন যোগী সন্ন্যাসীর নিকট গীতাভ্যাস করিয়া কালচক্রে নিজালয়ে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবাভাব কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

একদা সেই রাজা তদীয় সেই পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ অনেক বৎসর গত হইয়া যাইতেছে, এখনও যে আপনার

পুত্র সেই গীতা-পাঠককে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি কোথায় কি করিতেছেন?" পণ্ডিত অতিশয় বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "মহারাজ, অনেক দিন হইল, আমার পুত্র গীতা পাঠ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহার গতি বিধি এখন কেহ বুঝিতে পারে নাই।" মহারাজ এই কথা শুনিবা মাত্র প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "হাঁ, এখন তাঁহার গীতাভ্যাস হইয়াছে। আমি এখনি তাঁহাকে দেখিতে যাইব।" আর কাল বিলম্ব না করিয়া রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে পদব্রজে পণ্ডিতালয়ে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত-পুত্র সেই গীতা পাঠকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া করযোড়ে স্তুতি বন্দনাদি করিতে লাগিলেন।

এখন কোথাকার কে রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী রাজা তাঁহার সমীপে করযোড়ে দাঁড়াইয়া স্তুতি বন্দনাদি করিতেছেন, কিন্তু এই বিদ্বানের তাহাতে নিমেষ মাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। যিনি জ্ঞান শক্তি বলে যে "রূপ" দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কি স্তুতি বন্দনাদি কি অন্য কোন রূপের মোহ পরাজিত করিতে পারে? বলি,—এক বার কেন শত বার বলি, জগতের অন্য আর সকল রূপ, সকল শক্তি একত্র হইয়াও সেই পরমাত্মা রূপে বিমুগ্ধ বিদ্বানকে কখনও আকর্ষণ করিতে পারিবে না। অতএব এই দৃশ্যও কি একবার বলা যাইতে পারে না "বিদ্বাং সং নাপিকর্ষতি।"

এখন একবার দেখা কর্ত্তব্য, হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্বানকে কি রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

উত্তর গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

"জ্ঞানেন দীপিতে দেহে বুদ্ধির্ব্রহ্মসমন্বিতা।
ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্নির্দ্দহেৎ কর্ম্মবন্ধনং ॥"

তত্ত্ব জ্ঞান বলে "মলিন" দেহ প্রদীপিত হইলে বুদ্ধি পরব্রহ্মে নিহিত হয়। তখন সেই বিদ্বান, (জ্ঞানী) ব্রহ্ম জ্ঞান রূপ অগ্নি দ্বারা যাবতীয় কর্ম্ম বন্ধন দগ্ধ করিয়া থাকেন। উপনিষদে ব্রহ্ম ও ভরদ্বাজ মুনির প্রশ্নোত্তর—

প্রশ্ন—বিদ্বান কে?

উত্তর—সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদরূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান। (যিনি সকলের অন্তঃকরণস্থ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে বিশেষ রূপে জানেন, তিনিই বিদ্বান।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥"২।১১

হে অর্জ্জুন, তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্য নির্গত হইয়াছে, কিন্তু তুমি অশোচ্য বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্খতা প্রদর্শন করিতেছ। পণ্ডিতগণ কি মৃত, কি জীবিত, কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪।১৯

যাঁহার সমুদায় কর্ম্ম নিষ্কাম, বুদ্ধিমানেরা তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্ম সমুদায় জ্ঞানালোকে দগ্ধ হইয়া যায়।

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫।১৮

পণ্ডিতগণ—বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডালকে তুল্য রূপে দেখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাও উক্তি করিয়াছেন।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনে যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬।৩

যে মুনি জ্ঞান যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়। আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই

তাঁহার সহায়। অতএব বলি, যখন কর্ম্ম-বন্ধন নাশ করিয়া মুনি, জ্ঞানী, পণ্ডিত কি বিদ্বান্ এসকল উপাধিতে ভূষিত হইতে হইল, তখন তাঁহাদের নিকট কর্ম্ম আর কি এবং অন্য মায়া মোহে কেনই বা তাঁহারা বিমুগ্ধ হইবেন !

আবার বলি, উপনিষদে ইহাও ব্যক্ত আছে, যখন প্রশ্ন করি—"পরমাত্মা কে ?" তাহার উত্তর—"দেহাদেঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা" দেহাদি যাবতীয় মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। সন্ন্যাসী কে ?—"স্ব স্বরূপাবস্থায়াং সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগী সন্ন্যাসীতি।"যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগী হয়েন,তিনিই সন্ন্যাসী। মূঢ় কে ?—"কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদ্যহঙ্কার ভরণারূঢ় মূঢ়ঃ।" যিনি আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা, ইত্যাদি রূপ মহা অহঙ্কার পদবিশিষ্ট হয়েন, তিনিই মূঢ়। এই সকল কারণে যে যেরূপ পদবাচ্য, যখন তাহা পূর্ব্বাপর শাস্ত্রানুসারে মীমাংসিত এবং যুক্তিতেও স্থিরীকৃত হইয়া আসিতেছে, তখন তাহার অন্য রূপ বিপর্য্যয় করা শাস্ত্রানুমোদিত কি যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে কি ? মনে করুন, সূর্য্যে উত্তাপ গুণ, চন্দ্রে শীতলতা গুণ সর্ব্বদা দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি, অতএব সূর্য্যকে শীতলতাগুণ বিশিষ্ট, চন্দ্রকে উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট বলা যেমন, বিদ্বানকে অবিদ্বানুচিত আখ্যায় ভূষিত করাও তেমন। অধিকন্তু ইহাও বলা যাইতে পারে—যেমন ব্রহ্মকে আমরা দেহধারী জীব বলিয়া কল্পনা করিতে পারিনা, তেমন বিদ্বানকে অবিদ্যায় জড়াইয়া দৃষ্টান্ত দেখান শাস্ত্র কি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যদি একান্ত পক্ষে বলেন, বিদ্বান্কে কাম রিপু আকর্ষণ করিয়া মজাইতে পারে, তবে এই কল্পিত বিদ্বান্কে বিদ্বান্ বলা যাইতে পারে না। অবিদ্যা যে নাশ করিয়াছে, তাঁহাকেই বিদ্বান্, পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্বানের আর কোনরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। ইহার বিপরীত কোন অর্থ আছে কি না, তাহাও জানি না।

বিশদরূপে বিচার করিতে হইলে, সদসৎ কয়েকটী শক্তির সমষ্টিতে আমরা মানব, আমাদের সকল বৃত্তিগুলির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। যে যে বৃত্তির যে যে কার্য্য, তাহাকে সেই সেই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া পরিজন প্রভৃতি যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও যে যে কার্য্যের যেরূপ অনুষ্ঠান করা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার বিপরীত পথাবলম্বী না হইয়া যে মানব ঐহিক কি পারত্রিকের কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে শক্তিবান্, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই বিদ্বান্।

আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রকার ঐহিক কি পারত্রিক সকল কর্ম্মই কেবল আধ্যাত্মিক ভাবে নিরূপণ করিয়াছেন। ঐহিক কর্ম্মসাধন করিতে করিতে যখন অবিদ্যা নাশ হইবে, তখনই বিদ্বান্, বিদ্বান্ (জ্ঞানী) হইবেন। ইহাই চরম সাধন।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জগৎ একই কথা। গোলোকধাম খেলার ঘরের মত তাহাতে আমরা সকলে খেলক। যেমন বহির্জগৎ কি অন্তর্জগতে গয়া, কাশী, বারাণসী, কেশীঘাট, ধ্রুবঘাট, নরক, সংসার, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ইত্যাদি, উত্তম,মধ্যম ও অধম সকলি আছে, গোলোকধাম খেলাঘরেও তাহাই আছে। খেলা খেলিতে খেলিতে কখন উর্দ্ধে, কখন নিম্নে যাতায়াত করিতে করিতে বহুকষ্টে যখন

আমরা গোলোকধামে উঠিতে পারি, তখন আর পুনঃ সংসারে আসিতে হয় না। তদ্রূপ, সংসারখেলা খেলিতে খেলিতে (কর্ম্ম করিতে করিতে) যখন অতি কষ্টে আধ্যাত্মিক গোলোকধামে পৌছিয়া গোলোকবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি, তখন আর কি কেহ আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারে? তাঁহার সেই অপরূপরূপে বিমোহিত হইয়া কেবল আনন্দে বিভোর হইয়া থাকি। চাণক্য পণ্ডিতের বচনাবলীতেও দেখিতে পাই,

> "মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ
> আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পণ্ডিত।"

যাঁহার এইরূপ জ্ঞান, তিনিই পণ্ডিত (বিদ্বান্)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, সকল যোগাপেক্ষা জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞান যোগের অধিকারী কে? "বিদ্বান্।" জ্ঞেয় এবং জ্ঞানে যখন যোগ হইবে, তখন সে জ্ঞানী (বিদ্বান্) আর কোন মতেই তাহাকে বিয়োগ করিতে পারিবে না। অতএব "বিদ্যাং সংনাপি কর্ষতি" বলা শাস্ত্র কি যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া যেন প্রতীতি হইতেছে না, ইহা আমার বিশ্বাস।

শ্রীজয়চন্দ্র দাস।

রেজ রাজত্বে ভারতের শিক্ষা। (৩)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য গুলি সংক্ষেপে বলিয়াছি। এখন সাধারণ শিক্ষা বা mass education সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সাধারণ শিক্ষা, প্রথমে নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য শ্রেণীতে শেষ করিতে হইবে। এখন যে ভাবে, অর্থাৎ বর্ত্তমান kinder garten প্রণালী অনুসারে, শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমাদের প্রস্তাবানুসারেও সেই নিয়মেই শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান Longman ও Macmillan কোম্পানীর প্রণীত পাঠ্যপুস্তক গুলির পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। এই ভাবে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সংশোধিত নিয়মে পাঠ করিয়া, মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর, ছাত্রগণ এতদিন যেমন উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ে অথবা ট্রেনিংস্কুলে প্রবেশ করিত, আমাদের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংস্কার করিলে, মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ এই সব ছাত্রগণ এখনকার মত এই সব স্কুলে (আমাদের প্রস্তাবিত কলিজিয়েট স্কুলে) ভর্ত্তি না হইয়া বর্ত্তমান উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ও ট্রেনীং স্কুল গুলির সংমিশ্রণে যে Industrial School গঠিত হইবে, তাহাতেই ভর্ত্তি হইবে। ট্রেনীং স্কুল, জেলা স্কুল ও হাই স্কুল গুলির মিশ্রণে যে নূতন স্কুল হইবে, ইহার নাম আমাদের প্রস্তাবানুসারে Industrial School করিতে হইবে। এবং প্রত্যেক বিভাগে Industrial Education Council নামক একটী কাউন্সিল বা সভা স্থাপন করিতে হইবে। যদি সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংস্কার কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন, এবং আমাদের প্রস্তাবিত দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী পৃথক করিয়া শিক্ষা-সংস্কার করেন; তবে প্রত্যেক প্রাদেশিক Industrial Education Council সভার,

প্রত্যেক বিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, বিভাগীয় কমিশনার সাহেব সভাপতি মনোনীত হইয়া কার্য্য চালাইবেন, এবং ঐ বিভাগের বিভাগীয় কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) সহকারী সভাপতি এবং কলেজের জনৈক অধ্যাপক সেক্রেটারী ও স্কুল সমূহের ইনস্পেকটার বা সহকারী ইনস্পেকটার সহকারী সেক্রেটারী রূপে কার্য্য করিয়া সভাপতির সাহায্য করিবেন। তৎপরএই কাউন্সিলে দেশী বিদেশী রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী শিক্ষিত ব্যক্তি ও বিভাগীয় কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী ও কলিজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার এবং বিভাগীয় স্কুল সমূহের ইনস্পেকটর মহোদয় প্রভৃতি ন্যূন পক্ষে চল্লিশ জন সদস্যের দ্বারা আমাদের প্রস্তাবিত এই কাউন্সিল পরিচালিত হইবে। এই কাউন্সিল পাঠ্য নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা (Diploma) প্রদান করিবেন। এই ডিপ্লোমা, এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটার বাহাদুরের দস্তখত-যুক্ত হইবে।

এখন আমরা এই শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের বিষয় নির্ব্বাচন ও পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিব। মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে যাহারা মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারাই এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সাত বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা (diploma) পাইবে। এই সাত বৎসরের মধ্যে প্রথম চারি বৎসর রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া প্রথম একটী পরীক্ষা দিতে হইবে, তৎপর আর দুই বৎসর পড়িয়া অন্য আর একটী পরীক্ষা দিতে হইবে। ছয় বৎসরে এই দুইটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর শেষ এক বৎসর ছাত্রদের অভিলাষানুযায়ী কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় বিশেষের আলোচনা করিয়া শেষ পরীক্ষা দিয়া ডিপ্লোমা পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম পরীক্ষার দুইটীর নাম, যথাক্রমে First ও Second Industrial Examination হইবে এবং শেষ পরীক্ষার নাম Industrial Mastership Examination হইবে। প্রথম দুইটী পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলির মধ্যে প্রত্যেক দফার যে কোন একটী বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে এবং পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইতে হইবে। যথা:—

১ম বিষয়—সপ্তাহে ৬ঘণ্টা। ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, পালী, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে যে কোন একটী ভাষা, অথবা এই ভাষার পরিবর্ত্তে ভাস্করকার্য্য (sculpture) অথবা লৌহ-দ্রব্য-নির্ম্মাণ (Iron works)—এই দুইটীর যে কোন একটী লইতে হইবে।

২য় বিষয়—সপ্তাহে ৫ঘণ্টা। প্রাদেশিক ভাষা, যথা—বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, আসামী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষা, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার মধ্যে যে কোন একটা ভাষা, অথবা ভাষার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠদ্রব্য তৈয়ার অথবা বিবিধ প্রকার রং প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

৩য় বিষয়---সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি অথবা স্বাস্থ্যবিদ্যা, এই বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটী বিষয়, অথবা তৎপরিবর্ত্তে চিত্রবিদ্যা লইতে হইবে।

৪র্থ বিষয়—সপ্তাহে ৬ঘন্টা। কৃষি বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, ড্রইং ও সর্ব্বেইং—এই তিনটীর যে কোন একটী বিষয় লইতে হইবে।

৫ম বিষয়—সপ্তাহে ৬ ঘন্টা। (ক) পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। (খ) উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন। (গ) প্রাণীবিদ্যা। (ঘ) খনিজবিদ্যা। এই পাঁচটী বিষয়ের যে কোন একটী বিষয় লইতে হইবে।

এইরূপ ভাবে সাত বৎসরে শিক্ষা সমাপন করিয়া, শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ছাত্রগণ আপন আপন ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে, কেহ কেহ কৃষি ও শিল্পাদির দ্বারা, কেহ বা ভাস্করকার্য্য, চিত্রকার্য্য, লৌহ ও কাষ্ঠ দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ দ্বারা, কেহ বা জমিদার ও মহাজনদের চাকুরী দ্বারা, কেহ বা নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকতা কার্য্য দ্বারা, আপন আপন দিন যাপন করিতে থাকিবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমানে ভারতের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এদেশের লোককে এইরূপ ভাবে একটা কার্য্যকরী বৃত্তিশিক্ষা দিতে না পারিলে, প্রকৃত পক্ষে দেশের কোন মঙ্গল নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মোক্তারী, ডাক্তারী ও ওকালতিতে এবং সেই সঙ্গে চাকুরীতে লোকের সংখ্যা এতই বাড়িয়াছে এবং দিন দিন এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের জীবনসংগ্রাম দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, সত্বর আমাদের শিক্ষা-সংস্কার না হইলে, দেশে একটা প্রলয় উপস্থিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বিভাগে এখন দিন দিন যেরূপ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই সঙ্গে প্রত্যেক বিভাগেই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই এখন অন্য পথের বিশেষ দরকার। অন্য পথ কি? কৃষি শিল্পাদির উৎকর্ষসাধন ভিন্ন দেশের দুঃখ, কষ্ট, হাহাকার নিবৃত্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং যাহাতে দেশের লোক দিন দিন কৃষি ও শিল্প প্রভৃতিতে জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ সব বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে এবং তাহারই দ্বারা স্বাধীন ভাবে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, এখন দেশের লোকের সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। না হইলে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। শুধু হুযুগে নাচিয়া বৎসরান্তরে দিবসত্রয় কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে, অথবা কনফারেন্সের বৈঠকে, বাক্য-স্রোত প্রবাহিত করিয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিলে, অথবা শুধু কংগ্রেসের সহিত বৎসরান্তরে একমাত্র শিল্পপ্রদর্শনী খুলিলে—দেশের কিছু মাত্র প্রকৃত উপকার হইবে না। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত হইয়া, যাহাতে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের প্রত্যেক নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে Industrial School স্থাপন করিয়া দেশের বিলুপ্তপ্রায় কৃষি ও বিবিধ শিল্পাদি শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করা যায়, সকলের তাহারই চেষ্টা করা উচিত। তাহা করিলে দিন দিন দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে এবং দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, দুই হাতে আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবেন। সত্য, আমরা বিদেশীয় ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট রাজার অধীন; কিন্তু তাহাতে আমাদের আক্ষেপ কি? এ দেশে কত বিশিষ্ট ধনী লোক আছেন, দীনহীন

আমরা—আমাদের জীবনের উন্নতির পথ তাঁহারা কেন উন্মুক্ত করিয়া দিন না। ইহাতে ইহকালে যশ, পরকালে ঈশ্বরের নিকট আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যপালন জন্য, অনন্ত আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা আমাদের দেশের আশা ভরসা স্থল। তাঁহারা যদি একবারের জন্যও আপনাদের পাড়া প্রতিবেশী দীন দরিদ্রের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত না করিবেন, তবে কে এই দীন হীন হতভাগ্য ভারতবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? কে এই চির হতভাগ্য দেশের জন্য করুণার হস্ত প্রসারণ করিবে? ইহা সকলে একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যাঁহারা সামান্য যশের প্রত্যাশায় সামান্য২ কাজে রাশি রাশি অর্থ দিবা রাত্রি ঐ শ্বেত পাদপদ্মে ঢালিতেছেন, একবার দেশের কল্যাণে, দীনহীন স্বদেশবাসীদের প্রকৃত কল্যাণ কামনায়, ঠিক তেমনি ভাবে, একবার তাঁহারা ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলে, দেখিবেন, ভগবানের কৃপায় ও দীনহীন স্বদেশবাসীদের আশীর্ব্বাদে অচিরাৎ তাঁহাদের শূন্য ভাণ্ডার আবার পূর্ণ হইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের আপামর-সাধারণের নিকট চিরদিন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কীর্ত্তি ও যশ লাভের ইহা ভিন্ন আর অন্য সহজ পথ আছে কি না,—একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কারের ভাবগতিক দেখিয়া, দেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এ দেশের লোকের চোক ফুটিয়াছে এবং সকল সময়েই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র মন্তব্য প্রকাশে গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট নানা ছলে, নানা কৌশলে উচ্চশিক্ষার পথ সংকীর্ণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের উচ্চ শিক্ষার পথ সংকীর্ণ করিয়া দেন, তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র ক্ষতি নাই, বরং বিলক্ষণ লাভই আছে। যদি সদাশয় গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার পথ সংকীর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবানুসারে দেশের লোককে কৃষি শিল্পাদি শিক্ষা দিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তবে আমরা সুখী হইব। আমাদের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংস্কার কার্য্য করিলে গবর্ণমেণ্টেরও অনেকটা লাভ আছে, কেন না, সময়ে অসময়ে, আমাদের নানা উন্মত্ত প্রলাপে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও প্রভূত মঙ্গল হইবে;—আমরা সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে, দেশের লুপ্তপ্রায় কৃষি শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, স্বচ্ছন্দে আপন আপন জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইব। গবর্ণমেণ্ট যদি উচ্চশিক্ষার পথ সংকীর্ণ করিবার অভিসন্ধিতেই এদেশের শিক্ষা-সংস্কার করিতে বসিয়া থাকেন; তবে ঠিক এমন ভাবে শিক্ষা সংস্কার না করিয়া, আমাদের প্রস্তাবানুসারে সংস্কার কার্য্য করিলে, গবর্ণমেণ্টের অভিলাষানুযায়ী উচ্চ শিক্ষার পথ আপনা আপনি কতকটা সংকীর্ণ হইয়া আসিবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার পথ, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রশস্ত করিয়া দিলে, আমাদের এই দুর্ভিক্ষাদির অনশন-ক্লিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীরও প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। সেদিন ভারত-সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লির দরবারে ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জ্জন দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনী

খুলিবার কালে দেশীয় করদ ও মিত্র রাজন্যবর্গ এবং অর্থশালী জমিদার শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া স্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদির দ্বারা আপন আপন বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখন যাহাতে সেই দেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়, যাহাতে দেশের লোকে অক্লেশে কৃষি ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিলে এবং নগরে নগরে Industrial School এবং প্রত্যেক বিভাগে বিভাগে Industrial Education Council স্থাপন করিয়া দেশের লোকের শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেশের লোককে উৎসাহিত করিলে, ভারতবর্ষে মহামতি লর্ড কার্জ্জনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমাদের বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট এই শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, বিশেষ কোন ব্যয়-বাহুল্য হইবে না। এখন গবর্ণমেণ্টের, জেলা স্কুল, ট্রেনিং স্কুলগুলি চালাইতে যে ব্যয় হইতেছে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেই ব্যয়েই আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে। নিতান্ত পক্ষে যদি তাহাতেও না চলে, তবে, যেরূপ লর্ড :কার্জ্জন আপনার মোহিনী বাক্ শক্তিতে দেশের লোককে মোহিত করিয়া, একদিনের অধিবেশনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন কামনায়, এদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ, এক্ষেত্রেও, দেশের প্রকৃত উন্নতি কল্পে, ঐ ভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিলে, এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার অবশিষ্ট অর্থ এদেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিবেন, ইহা স্থির নিশ্চয়। এই সঙ্গে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, দেশের অর্থশালী ধনকুবের ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেও, এ বিষয়ে, অগ্রসর হইয়া গবর্ণমেণ্টকে যথোচিত সাহায্য ও উৎসাহিত করিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ শিক্ষার বিষয় বিভাগ করিয়া দেখাইলাম। এখন এই পাঁচটী বিষয়ের অন্তর্গত কোন্ কোন্ বিষয় গুলিকে পুনর্বিভক্ত করিতে হইবে এবং কোথায় কোন্ ভাবে শিক্ষা দিলে আশানুরূপ ফললাভ হইতে পারিবে, তাহারই আলোচনা করিব। এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, এই ইণ্ডষ্ট্রীয়াল এডুকেশনে এক ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বিষয়—ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, কৃষি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে এবং আমাদের যতদূর বিশ্বাস, মাতৃভাষায় এই সব বিষয় শিক্ষা দিলে অল্প সময়ে বিশেষ ফললাভ হইতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে দিন দিন মাতৃভাষারও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে। এখন আমরা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয় পাঁচটীর মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি পুনরায় বিভক্ত করিতে হইবে এবং কোন্ বিষয় কিরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম বিষয়।

ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবী,পারসী প্রভৃতি বিষয় গুলির মধ্যে আর কোন বিভাগ করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে, এইমাত্র যে, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এডুকেশনের প্রথম পরীক্ষার ইংরাজি প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্য কলিজিয়েট স্কুলের প্রথম (first standard) পরীক্ষার সমান হইবে। দ্বিতীয় পরীক্ষার পাঠ্যগুলি কলিজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় (Second standard) পরীক্ষার সমান হইবে। শেষ পরীক্ষা বর্ত্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষার সমতুল্য

হইবে। যাহারা সাহিত্যাদি কোন বিষয় না লইয়া, ভাস্করাদি কার্য্য শিক্ষা করিবে, তাহাদের জন্য ভাস্করকার্য্য যথাঃ—প্রস্তরাদি খুদিয়া নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, পাথরের বিবিধ প্রকার আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন, টেবিল, চেয়ার, শ্লেট প্রভৃতি নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে। আর যাহারা সাহিত্য ও ভাস্কর-কার্য্যের পরিবর্ত্তে লৌহ-দ্রব্য (iron-work) নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা করিবেন, তাহাদিগকে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বিবিধ প্রকার লৌহ দ্রব্য নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলে নিত্য-ব্যবহার্য্য লৌহ-দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখ পানে আর চাহিতে হইবে না।

দ্বিতীয় বিষয়।

প্রাদেশিক ভাষার যে কোন একটী লইতে হইবে। ইহার পাঠ্য পুস্তকাদি মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে (এখানে শুধু বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বলিব)

১ম ও দ্বিতীয় বর্ষে,—বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস বা তৎতুল্য কোন গদ্য গ্রন্থ, কবিতা পুস্তক, বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ রচনা ইত্যাদি।

৩য় ও ৪র্থ বর্ষে,—শকুন্তলা, বাল্মীকির জয় প্রভৃতির ন্যায় কোন একখানি সুখপাঠ্য গদ্য গ্রন্থ, কবিতা পুস্তক, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনা প্রভৃতি।

৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে,—উচ্চদরের সাহিত্যগ্রন্থ, যথা কাদম্বরী, রাজকৃষ্ণের বিবিধ প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমারের ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির তুল্য গ্রন্থ, অমিতাভ, রঙ্গমতী, বৃত্রসংহার, মেঘনাদ-বধ প্রভৃতির ন্যায় উচ্চদরের কাব্য, বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা, রচনা প্রভৃতি।

৭ম বর্ষে,—বিবিধ কাব্য গ্রন্থ, গদ্য, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যের সমালোচনা রচনা প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। আর যাঁহারা প্রাদেশিক সাহিত্যের কোনটাই না লইবেন, তাহাদের জন্য কাষ্ঠ-দ্রব্য-প্রস্তুত-করণ (Wood-work) যথা, চেয়ার, টেবিল, আলমারী প্রভৃতি দেশের নিত্য-ব্যবহার্য্য কাষ্ঠ-দ্রব্য-তৈয়ার করিতে হইবে, অথবা তৎপরিবর্ত্তে রংয়ের কাজ শিক্ষা করিতে হইবে। এই রংয়ের কাজের মধ্যে লাল, নীল, সবুজ, জরদা প্রভৃতি বিবিধ পাকা রং তৈয়ার ও তদ্বারা কার্পাসসূত্র, রেশম, পশম প্রভৃতি রং করিবার কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে।

তৃতীয় বিষয়।

গণিত—এই সাত বৎসরে পাটীগণিত, বীজগণিত, শুভঙ্করী, জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রের বিলাতী ও দেশীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে। অথবা, তৎপরিবর্ত্তে, ঐ কয়েক বৎসরে ভারতের প্রাচীন বৈদিক, পৌরাণিক ও আধুনিক ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, সাধারণ ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি অথবা হিন্দু মতে আধুনিক ও বিজ্ঞান-সম্মত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ ও বস্তুবিচার, এই সবের সে কোন একটী, অথবা তৎপরিবর্ত্তে চিত্রবিদ্যা, নানা প্রকার Woodcut, half-tone, photography, oil-painting প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে।

চতুর্থ বিষয়।

কৃষিবিদ্যা, কেমন করিয়া কৃষিকার্য্য

করিলে কৃষির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়, কোন্ সময়ে কোন্ প্রকার ফসল বপন করিতে হয়, কৃষির উপযোগী দ্রব্যাদি ও পশুপালন ইত্যাদি বিষয় হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। অথবা তৎপরিবর্ত্তে ড্রইং ও সর্ব্বেইং, অথবা দুইটীর পরিবর্ত্তে শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। শিল্পবিদ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়গুলির অথবা এতদতিরিক্ত যে কোন প্রকার শিল্পবিদ্যাও হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা নিম্নে কয়েকটীর নাম উল্লেখ করিলাম,—যথা,— (১) সাবান, ও বাতি প্রস্তুত করা (২) রেশম, পোলো পোষা,পোলো হইতে,সূত্র বাহির ও রেশমের বিবিধ প্রকার বস্ত্র বয়ন করিবার প্রণালী, (৩) কার্পাস, পাট প্রভৃতি দ্রব্য হইতে সূত্র বাহির ও সেই সূত্রে কলে বিবিধ প্রকার বস্ত্র, উড়ানী, নানাবিধ ছিট প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য তৈয়ার করা, (৪) পশম ইত্যাদি হইতে সূত্র তৈয়ার ও তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার শীতবস্ত্র বয়ন প্রণালী, (৫) আসামজাত এণ্ডি ও মুগা প্রভৃতি প্রস্তুত করা, (৬) কার্পেট, গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত করা,(৭) পিতলকাঁসা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যের বিবিধ প্রকার নিত্য-ব্যবহার্য্য বাসন নির্ম্মাণ করা,(৮) সোণা রূপার অলঙ্কার ও গৃহ শয্যাদির উপকরণ নির্ম্মাণ করা, (৯) হস্তি দন্তের বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা, (১০) চন্দন কাষ্ঠের বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা, (১১) চর্ম্ম পরিষ্কার করা,ও চর্ম্মের বিবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করা, (১২) কাচ ও কাচের বিবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করা, (১৩) কাগজ ও ব্লটিং পেপার, মার্ব্বেল পেপার প্রস্তুত করণ, (১৪) আনামেল বাসন তৈয়ার করা, (১৫) দীপ-শলাকা তৈয়ার করা, (১৬) ছত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিবিধ শিল্প দ্রব্যের যে কোন একটী বিষয় শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

এই ভাবে আমাদের প্রস্তাবিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ স্কুলে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া, প্রথম দুইটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর, এক বৎসর কাল, অর্থাৎ সপ্তম বর্ষে, স্বাধীন ভাবে পূর্ব্ব পঠিত পাঁচটী বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটী বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়া অধিক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। স্বাধীন ভাবে ঐ ঐ বিষয়ের সাহায্যে বিনা ক্লেশে জীবিকা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পর, পরীক্ষান্তে, Industrial Education Council হইতে রীতিমত ডিপ্লোমা (Diploma) প্রদত্ত হইবে।

এপর্য্যন্ত আমরা সাধারণ শিক্ষার পাঠ্য বিষয় সমূহের আলোচনা করিলাম। এবার আর একটী বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিব। যাহাতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ এডুকেশনে প্রবেশার্থী ছাত্রেরা শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী না হয়, স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়েরা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। সাধারণ শিক্ষায় আমরা এইটী চাহি যে,ছাত্রগণ আপন আপন অভিলাষ ও রুচি অনুসারে শিল্প অথবা কৃষি,—এই দুইয়ের কোন একটী লইতে বাধ্য হইবেন এবং পুঁথিগত বিদ্যার সহিত ব্যবহারিক শিক্ষা যাহাতে তুল্যরূপে হয়, কর্ত্তৃপক্ষের তাহাই করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিলে, ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক চিন্তা,—উভয় চিন্তাই তুল্যরূপে স্ফুরিত হইবে। কেবল পুঁথির উপর নির্ভর

করিয়া শিক্ষা প্রদান করিলে ছাত্রদের মানসিক পরিশ্রম যথেষ্ট হইবে, অথচ শারীরিক পরিশ্রম হইবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না। কথাটা বুঝি পরিষ্কার বলিতে পারিলাম না, পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে করুন, একজন ছাত্র বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে আসিল। এখন সে ছাত্র যদি পিতামাতার উপদেশানুসারে অথবা নিজের বুঝিবার ভ্রমে, ইংরেজী, অথবা সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, গণিত অথবা ইতিহাস ভূগোল, কৃষিবিদ্যা ও বিজ্ঞান,—এই সমস্ত বিষয় লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা যেন লইতে না পারে, স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয় এইরূপ বিধান করিবেন। কারণ, এইরূপ ভাবে শিক্ষা পাইলে মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। হেড্ মাষ্টার মহাশয় আরো বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যে, শিল্পাদি শিক্ষা কালে ছাত্রদের জাতীয় ব্যবসা, যেন অক্ষুন্ন থাকে। যাহার যে পৈতৃক ব্যবসা, এই সব ইণ্ডষ্ট্রিয়াল স্কুলে যেন তাহাকে সেই পৈতৃক ব্যবসায় শিক্ষা দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করা হয়। আপন আপন জাতি ব্যবসা অক্ষুন্ন রাখিয়া আমাদের এই পরাধীন দেশের লোকগকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিলে, দেশের হাহাকার যে অনেকাংশে কমিবে এবং লোকে মানসিক পরিশ্রমের সহিত কতকাংশে শারীরিক পরিশ্রমে দিন দিন স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে, বোধ হয়, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

বারুণী-স্নান

(পাঁচ খানি প্রাচীন পুথি)

প্রতি বৎসর বারুণীর দিনে "মাধবে" বহুলোকের সমাগম হয়। শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ হইতে "মাধব" কুড়ি মাইলের অধিক নহে, আমাদের এখান হইতে দশ এগার মাইল মাত্র ব্যবধান। অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই আমরা কয়েকজন মাধব দর্শনে যাত্রা করিলাম. পদব্রজেই চলিলাম। তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, তখনও দুই একটী ঝিঁঝিঁর শব্দ শুনা যাইতেছে। প্রকৃতি প্রশান্ত—নিস্তব্ধ, অতি ধীরে ধীরে মন্দ সমীরণ বহিতেছে, দুই একটী জোনাকী রাস্তার ধারে ঘাসের মাঝে ঝলকিতেছে, দূরবর্ত্তী গ্রামে কচিৎ দুই একটী কুকুরের ডাক শুনা যাইতেছে।

এই সময়ে মনে প্রায়ই পবিত্র ভাবোদয় হয়, কিন্তু সমবয়ঃ উদ্যান্ত যুবকগণ প্রকৃতির তত ধার ধারে না; কাজেই এই গতিশীল ক্ষুদ্র দলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম বিষয় লইয়াও হাসির কল্লোল উঠিতেছিল। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে, সেই নিস্তব্ধ সময়ে, এই হাস্য পরিহাস পৈশাচিক কিলিবিলির ন্যায় বোধ হইতেছিল কি না, জানি না; আমার কাছে ইহা একটু মাত্র প্রীতিকর হয় নাই।

এই সময়ে আমরা একটী ক্ষুদ্র নদীর ধারে পৌঁছিলাম; এখানে সাধারণতঃ নদীকে "গাঙ্গ" বলে। তখন ঊষা প্রভাসিত, পূর্ব্বদিকে সমুজ্জ্বল শ্বেতাভা প্রকাশিত হইয়াছে। নদীর তীরে—দূরে, বহু যাত্রী রাত্রি যাপন করিয়াছিল, গান বাজনা

করিয়া হাসি-খুসীতে তাহারা সে রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছিল। নিতান্ত নিদ্রা-কাতর দুই একজন মাত্র খড় পাতিয়া, তাহার উপর কাপড় বিছাইয়া গাছ তলায় শয়ন করিয়াছিল। তাহারা কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া রাত্রে যে আগুন জ্বালিয়াছিল, এখনও তাহা নির্ব্বাণ করে নাই, তাহাদের গ্রাম্য গীতি এখনও চলিতেছিল। নিরাশা-দগ্ধ ব্যক্তির মুখমণ্ডলের ন্যায় সে অগ্নির দীপ্তি আর ছিল না, উৎসবান্তে পরিশ্রান্ত ভগ্নকণ্ঠ ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় সে অসাময়িক গীতও সুখশ্রাব্য ছিল না।

অদূরে ক্ষুদ্র পাহাড়-শ্রেণী আধ আধ ছায়া মাখিয়া দণ্ডায়মান, চিত্রাঙ্কিত কৃষ্ণ রেখার ন্যায় দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে; ঘুমন্ত গ্রামগুলি তাহার কোলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমরা নদী পার হইয়া, ক্রমে জঙ্গলাকীর্ণ পথে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। একটী "ঝোপ" অতিক্রম করিয়া ৫০।৬০ টী মণিপুরী স্ত্রীলোক পাইলাম, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই (১১শ হইতে ২২শ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা) অবিবাহিতা কুমারী। বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, মণিপুরীদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই। ইহাদের সঙ্গে অভিভাবক স্বরূপ ৫।৭ টী মাত্র পুরুষ দেখিতে পাইলাম, ইহারা সকলই "মাধব" যাইতেছে।

প্রকৃতি-সন্তান মণিপুরী বালারা সোৎসাহে সেই পার্ব্বত্য পথে হাঁটিয়া যাইতেছে; ইহাদের সরল স্বভাব ও পারিপাট্য-বিহীন বেশভূষাদি, তাহাদের বাহুল্য-বর্জ্জিত রূপ শোভারই ন্যায় নির্ম্মল—পবিত্র। কর্ত্তিকাগ্র কুন্তলগুলি তাহাদের ললাটে নৃত্য করিতেছিল, কবির কথায়—শুভ্র শতদল-পত্রে মধুলুব্ধ ভ্রমর-সম্পাতের সহিত ইহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। যুবতীগণের যৌবন-সুলভ অনাবৃত হাস্য লহরী, সুললিত সৌকুমার্য্যের একটী লীলাস্থল; ক্ষণে ক্ষণে তাহা পাহাড়তল কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। সেই হাস্যে কোন কাপট্য নাই—মলিন জগতের কোন ছায়া নাই, তাহাদের নগ্ন রূপ শোভারই ন্যায় শুভ্র—পবিত্র। এই প্রকৃতি-পালিতা কন্যাগণ, কোন বন্যকুসুম দেখিলে অমনি প্রধাবিতা হয়;—পাড়িয়া আনিয়া অমনি কাণে পরে; সপত্র পুষ্প ইহাদের অতি প্রিয়।

ভাব-সংগোপনই বাহ্য সভ্যতার মার্জ্জিত রুচি। ইহারা তাহা বুঝে না। যাহা মনে হয়, অসঙ্কোচে তাহা বলে, তাহাই করে,—যেন দশম বর্ষীয়া ক্রীড়াশীলা বালিকা। মণিপুরী বালারা সেই সঙ্কীর্ণ পথে দৌড়াদৌড়ি করিয়া, কখন কখন আমাদের পার্শ্ব ঘেরিয়া যাইতে লাগিল—কোন সঙ্কোচই করিল না, আমাদের কিন্তু কেমন বাঁধ বাঁধ বোধ হইতে লাগিল।

কতকদূর ইহাদের সহিত একত্রে যাওয়া হইল, কিন্তু আমাদের সকলেরই ইচ্ছা, খুব সকাল সকাল যাই, কাজেই ইহাদিগকে পাছে ফেলিয়া চলিলাম; কিন্তু পাহাড়ে উঠিতে না উঠিতেই ইহারা আমাদের সাথে পুনর্ব্বার যুটিল।

তখন কিছু বেলা হইয়াছে, আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। কখনও ৮০। ৯০ গজ উপরে উঠিতেছি, কখন বা তত নীচে নামিতেছি, কখন কখন আমাদিগকে পর্ব্বত-প্রবাহিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত (Brook) অতিক্রম করিতে হইতেছে। এই ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোত সাধারণতঃ "ছড়া" নামে অভিহিত। এইরূপ আমরা একটী অত্যুচ্চ টীলার উপর উঠিলাম, তাহার উচ্চতা ৫।৬ শত গজের উপর হইবে। এই টীলা হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বড় সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়, দূর দূরান্তরের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাবৃক্ষাকীর্ণ জঙ্গলের ন্যায় দেখায়; বোধ হয়, ভূতলে কেহ যেন সবুজ গালিচা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে।

পর্ব্বতের মধ্যপ্রদেশে—অপর দিকে—নীচে প্রকৃতি-জাত বিস্তীর্ণ বংশকানন। সেই মুষ্টি-গ্রাহ্য সরল বংশদণ্ডের নাম "মূলি-বাঁশ।'' এই বাঁশবনের শোভা অতি রমণীয়—অবর্ণনীয়। যিনি দেখেন নাই, তাঁহাকে বুঝান অসম্ভব। ঈষদ্ হরিদ্রাভ নব-নধর শ্যামল পত্রাবলী-বিশোভিত বংশাবলী সতেজতা ও সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যের জীবন্ত ছবি। ক্রোশের পর ক্রোশ,—দৃষ্টি যতদূর চলে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ, অনন্ত জলধির ন্যায় চলিয়াছে। নিবাত-নিষ্কম্প, একটী পাতা নড়িতেছে না; একটী শব্দও শুনা যাইতেছে না। দেখিতে দেখিতে দর্শকের মনে অজ্ঞাতে ভাব-তরঙ্গ সমুত্থিত হয়, দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতে তাহাকে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া তুলে; চির জীবন এই শান্তিনিকেতনে বাস করিতে ইচ্ছা হয়। বস্তুতঃ বহু উচ্চ স্থান হইতে আমরা সেই রমণীয় দৃশ্যে একবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিস্তৃত মাঠে অবিচ্ছিন্ন ধান্য তরঙ্গের শোভা মোহনীয় বটে; ইহা ততোধিক সুন্দর, ততোধিক মনোরম।

এই স্থানে কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার চলিতে লাগিলাম, সম্ভবতঃ ৭০। ৮০ হাত নীচে নামিয়াই একটী পার্ব্বত্য স্রোত (ছড়া) ধরিয়া চলিলাম। দুই দিকে উচ্চ পাহাড়, অগত্যা এই ছড়াই আমাদের "সড়ক" হইল, ছড়ার উপর দিয়াই যাইতে লাগিলাম। ছড়ায় জল বেশী নহে, গভীরতা অর্দ্ধহস্তও হইবে না। জল এত স্বচ্ছ যে নীচের প্রত্যেক বালুকণাটী পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই ছড়াটী পাহাড়ের উপরেই প্রবাহিত হইতেছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে তাহা অনেক উচ্চে।

দুই দিকে উচ্চ পাহাড়, বড় বড় বৃক্ষ, বৃক্ষ বড় বড় লতায় বেষ্টিত। আমরা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ছড়া দিয়া যাইতে যাইতে পা শীতল হইয়া গেল, তথাপি আমরা পরম উৎসাহে চলিতে লাগিলাম। এইরূপ অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিয়া আমরা অন্য পথ ধরিলাম, সেপথেও সেইরূপ ছড়ার উপর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইল। এই নূতন ছড়া পূর্ব্বাপেক্ষা গভীর হইলেও হাঁটু জলের কম জল ইহাতে আছে।

এই নূতন পথে কিছুদূর গিয়াই আমরা ঘন বন প্রদেশে উপস্থিত হইলাম, বৃক্ষের শাখায় শাখায় আকাশ একেবারে আবদ্ধ, সূর্য্যের তেজ সেখানকার ঘন পত্রাবলী ভেদ করিতে পারে না, মধ্যাহ্নেও সেখানে উষালোকের ন্যায় অস্পষ্ট শোভনশীল আলোক। এই ক্ষুদ্র স্রোতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য পাষাণ খণ্ড বুকে করিয়া অশ্রান্তগতিতে চলিতেছে। কোথাও বা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর জল আটকাইয়া রাখিতে উদ্যত; জল যথাসাধ্য বলে চিৎকার করিয়া—কাঁদিয়া সেই প্রেমবন্ধন হইতে ছুটিয়া পলাইতেছে, আপনি আপনার পথ করিয়া লইতেছে। অতিকষ্টে আমাদিগকে এই পথ অতিক্রম করিতে হইল,

প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে আঘাতে পায়ে ব্যথা হইল। যাহা হউক, কতকদূর অগ্রসর হইয়া আমরা পর্ব্বত-প্রমাণ বৃহৎ পাষাণ খণ্ড গুলি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কেহ কেহ সোৎসাহে উপরে উঠিলেন, কেহ বা উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ও পিচ্ছল শিলার উপর হইতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। আমাদের অনুসঙ্গী ভারবাহী ও পথপ্রদর্শক লোকটী এই কার্য্যে আমাদিগকে নিষেধ করিল এবং সে স্বয়ং ভক্তিভাবে পাষাণটীকে প্রণাম করিল। তাহার এই ভক্তি দেখিয়া—

যদযদ্বিভূতি মৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সম্ভবম ॥১০।৪১

গীতার এই শ্লোকটী আমার মনে পড়িল।

বৃহৎ পাষাণটী ছড়ার সমস্ত প্রস্থ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, জল এক পার্শ্ব দিয়া ভয়ে ভয়েই যেন বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে ও একেবারে সজোরে সেই প্রস্তরের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে, এইরূপে শীলা সম্মুখে এক বৃহৎ কুণ্ড—পরিসর বৃহৎ না হইলেও অতি গভীর—স্বচিক্কণ নীল সলিলে টলমল করিতেছে। আমরা সেই ছড়ার উপর ক্রমশঃ এইরূপ ছয়টী শীলা ও তন্নিম্নে ছয়টী কুণ্ড দেখিতে পাইলাম।

ছড়ার একটী বক্র (পাক) ঘুরিয়াই আমরা ৬ষ্ঠ কুণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেখান হইতে স্পষ্টরূপে সূর্য্যরশ্মি দেখা যায়। এই স্থানে আসিয়াই আমরা একটী হুঁ হুঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। মধুচক্রে আঘাত দিলে উড্ডীয়মান মক্ষিকা-ঝাঁক হইতে যেরূপ শব্দ শুনা যায়, আমরা ঐরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম।

সম্মুখেই অভীষ্ট সপ্তম কুণ্ড, এখান হইতেই তাহা দেখিতে পাইলাম। সেই পূর্ব্বোক্ত স্রোতটী প্রস্তরের উপর দিয়া চলিয়া দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া হঠাৎ উচ্চ পর্ব্বত হইতে একবারে নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গা-বাহিয়া পড়ে নাই। পাহাড়টী যেন সম্মুখে নত হইয়া ("ঝুকিয়া") রহিয়াছে। তাহার উপর হইতে জলরাশি শূন্য দিয়া সলম্ফে পড়িতেছে। ছয় সাত শত হস্ত উপর হইতে মহাশব্দে সবেগে জলরাশি নিম্নে উড়িয়া পড়িতেছে। যেস্থানে জলরাশি পতিত হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড় শ্রেণী; মধ্যদেশ একটী গুহা বিশেষ। প্রস্থ অর্দ্ধ মাইলের অধিক নহে, দীর্ঘ প্রায় এক মাইল হইবে; ইহার মধ্যে কতকটা স্থান ব্যাপিয়া একটা সুবৃহৎ কুণ্ড।

ইহারই নাম "মাধব।" ইহা একটী ক্ষুদ্রতম জলপ্রপাত ব্যতীত কিছু নহে। বারুণী দিনে সাধারণ লোকে অতি ভক্তিভাবে এখানে স্নান ধ্যান করিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করে, এই জল আকাশবাহিনী গঙ্গা,—বারুণী দিনেই মাত্র পতিত হয়। অন্য কোন দিন কেহ এই দুর্গম স্থানে যায় না, এবং বারুণী ব্যতীত অন্য দিন "গঙ্গা" "স্বর্গ হইতে পড়েন" কি না, দেখেও না; সুতরাং ঐরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের জন্মিতে পারে। কিন্তু আমরা যে পথ দিয়া, উপর হইতে সমস্ত দেখিতেছিলাম, সে পথ দিয়া আসিলে, বোধ হয়, অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরও এ বিশ্বাস, (এই স্বর্গ হইতে) পতনের বিশ্বাস) থাকে না।

আমরা উপর হইতে দেখিলাম, সে স্থানটী লোকে পরিপূর্ণ—ছিদ্র নাই। নীচে লোকের সমাবেশ হইতেছে না, কাজেই চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড়ের পার্শ্বে পার্শ্বে পিপীলিকা

শ্রেণীর ন্যায় লোক বসিয়াছে। দৃশ্য বড়ই সুন্দর—কৌতুকাবহ। উপর হইতে লোকগুলি ছোট ছোট বালক বালিকার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। দেখিলাম, স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিকাংশ, পুরুষের সংখ্যা ১/৬ হইবে কিনা সন্দেহ। আমরা যে হুঁ হুঁ শব্দ শুনিতেছিলাম, বারিপতন শব্দের সহিত লোক-কোলাহল মিশিয়া সেই অদ্ভুত শব্দ উৎপন্ন হইতেছে।

আমরা বহুকষ্টে, গাছের ডাল, লতা পাতা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। লোকের ঠেলাঠেলিতে কুণ্ডের নিকট যাওয়া কষ্টকর। আমরা "বাবুলোক"—যাইতে তত কষ্ট হইল না।

ও সব বাজে কথায় কাজ নাই। এইবার আমাদের বহুকালের সাধ মিটিল; মাধবকুণ্ডে ঝাঁপ দিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জলরাশি উপর হইতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুই দিকে পতিত হইতেছে; একটী বৃহৎ ধারা, অপরটী ক্ষুদ্রতম। ক্ষুদ্র ধারাটীর নীচে, কোন কোন ব্যক্তিকে সাঁতার কাটিয়া যাইতে দেখিলাম। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা সেখানে যাই, কিন্তু প্রতিবন্ধক এই যে, কুণ্ডটী বৃহৎ এবং জল অতি শীতল। একেত জলকণা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সে স্থানটীকে স্বভাবতই শীতল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে আবার শীতল জল; ইহা পার হইতে পারিলেই ধারা-স্নান ঘটে।

সাহস করিয়া আমরা কুণ্ডে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতার কাটিয়া কুণ্ডের মাঝামাঝি না আসিতেই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অনেকেই ততদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কিন্তু একজন অনেক দূরে চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে অতি কষ্টে ক্ষুদ্র ধারাতলে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র ধারাতলে শূন্যে—পর্ব্বতগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া, একটী প্রস্তর আছে। আমরা ছাতি জলে সেই পাথরের উপর দাঁড়াইলাম। অধিককাল দাঁড়ান অসম্ভব, সেই ক্ষুদ্রতম জলধারার পতনবেগেই বোধ হইল যে, ঘাড় শুদ্ধ মাথাটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলাম।

স্নান করিয়া এত সুখ আর পাই নাই। ইহা হইতে দীর্ঘক্ষণব্যাপী কত স্নান কতদিন করিয়াছি, কিন্তু স্থান-কাল-মহিমায় সে দিন যে সুখ পাইয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিবার নহে।

পুনর্ব্বার ঝাঁপ দিলাম, কুণ্ড পার হইলাম, আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করা গেল; তবু শীত যায় না। অল্প দূরে একটী গহ্বরের ভিতর অগ্নি শিখা দেখিয়া আমরা সেখানে গেলাম। এই গহ্বরটীকে লোকে "কাব" বলে (Cave কেভ বলিলেই শুদ্ধ হয়।) পাহাড়ের একদিক যেন মানুষে বহুযত্নে খুঁদিয়া রাখিয়াছে, যেন পাথরের একটী একচালা ঘর। বৃষ্টির সময় ২।৩ শত লোক ইহার নীচে প্রবেশ করিলেও সমাবেশ হইতে পারে।

ইতর লোকেরা স্থানে স্থানে অদ্ভুত আকৃতির নানাবিধ দেবতা বসাইয়া পয়সা ও তণ্ডুল উপার্জ্জন করিতেছে। এবং "গাজি" অভিধেয় নর্ত্তনশীল মুসলমানগণ ঐ উদ্দেশেই আসর জাঁকাইয়া তুলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আমরা পাহাড়ের ভিতর হইতে ক্রমে বাহির হইয়া পড়িলাম। একটী চা বাগানের ভিতর দিয়া আমা-

দিগকে যাইতে হইল। সুশ্রেণীবদ্ধ সতেজ চা গাছ,কলকারখানা ও কুলিনিবাস দেখিতে দেখিতে ও কুলিদের অভিশপ্ত দীন জীবন আলোচনা করিতে করিতে আমরা বারুণী-মেলার বাজারে উপস্থিত হইলাম।

একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি, যে ছড়াটী পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া "প্রপাতের" সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার নাম মাধবছড়া। ইহারই নামানুসারে বাগান, বাজার ও সেই টীলার নামও হইয়াছে।

বাজার শূন্য মাঠের মধ্যে, এই বারুণী উপলক্ষেই সকাল বেলা হইতে বসে। মাছের দোকান, তরকারির দোকান, খই চিড়া মুড়কির দোকান ইত্যাদি বিবিধ দোকান। হাড়ি পাতিল ও মৃন্ময় ঘোড়া মহিষাদি লইয়া কুম্ভকার দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার ভিড় সেখানে। স্থানান্তরে কয়েকখানি মনোহারী দোকান, যুবতীগণ সেখানে সানন্দে কাচের বেলোয়ারী চুড়ি ক্রয় করিতেছে; কেহবা সেই খানেই চুড়ি হাতে দিতে বসিয়াছে, কাহারো বা চুড়ি হাতে উঠিতেছে না, দোকানি সাগ্রহে তাহাকে চুড়ি পরাইয়া দিতেছে। প্রত্যেক দৃশ্যেই আমাদের অশেষ তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল।

এই বাজারে, সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী একটী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল, তিনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও বাড়ী লইয়া যাইতে আগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই আভরণ-শূন্য দৃশ্যাবলী ছাড়িয়া যাইতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা হইল না, কিন্তু তাঁহার বিশেষ অনুরোধে অগত্যা আমাদিগকে যাইতে হইল।

বারুণী স্নানের উপসংহার এই খানেই। যাহা হউক, আমরা সেই ভদ্রলোকের গৃহে খাওয়া দাওয়ার পর তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থগুলি দেখিলাম। তন্মধ্যে পাঁচখানি প্রাচীন পুঁথিই আমার কাছে মূল্যবান বোধ হইল।

১। কেরী সাহেব কৃত প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসই অনেকের মতে, বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী একখানি বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ পাইয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহা একখানি বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব গ্রন্থ। ১১৫০ সালের লিখিত প্রতিলিপি খানি আমরা প্রাপ্ত হই। তৎপূর্ব্বে কোন এক সময়ে যে ইহা রচিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই প্রাচীন গদ্যের নমুনা কিছু উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি। বর্ত্তমানে গ্রন্থ খানি আমার হাতে নাই। বিশ্বকোষ নামক বাঙ্গলা বৃহদভিধানের সম্পাদক মদীয় বন্ধু বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে গ্রন্থ খানি তাঁহার কাছে প্রেরিত হইয়াছে। এই অভিধানে যখন "বাঙ্গালা ভাষা" এই শব্দ আসিবে, তখন এই গ্রন্থ হইতে তাহাতে কোন কোন স্থল উদ্ধৃত হইবে।

২। দ্বিতীয় গ্রন্থ খানির নাম পদ্মপুরাণ। রচয়িতার নাম—নারায়ণ দেব। এই গ্রন্থ খানিও অতি প্রাচীন। তিনশত বর্ষের প্রাচীন প্রতিলিপি খানি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নারায়ণ দেব পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচীন কবি, নিবাস ময়মনসিংহ বোরগ্রামে। তিনি স্বীয় গ্রন্থে নিম্নোধৃত রূপে পরিচয় দিয়াছেন।—

"নারায়ণ দেবে কহে জন্ম মাগধ।
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ।
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থ ঘর।
মদগল্য গোত্র মোর গায়ন গুণাকর।

পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্ব্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর গ্রামেতে বসতি।

নারায়ণের গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই মহাগ্রন্থ তিনি অল্প বয়সে রচনা করেন। তিনি বলেন "চৌদ্দ বৎসর কালে" তিনি স্বপ্ন দেখিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। তুলনায় ইহার সমালোচনা করিবার পক্ষে স্থানাভাব।

৩। তৃতীয় গ্রন্থ খানির নাম লক্ষ্মী চরিত্র। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও বহুমূল্য। প্রণেতা গুণ রাজ খাঁন। স্কন্দ পুরাণীয় লক্ষ্মী কেশব সংবাদ অবলম্বনেই ইহা রচিত হয়।

৪। চতুর্থ গ্রন্থ রামেশ্বর নন্দী প্রণীত ক্রিয়াযুগসার। এ গ্রন্থ খানিও বৃহৎ বটে, পদ্মপুরাণ হইতে বাঙ্গলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। আমাদের প্রতিলিপির শকসংখ্যা ১৭০৮।

৫। পঞ্চম গ্রন্থ, দ্বিজ হরিহর সুত, দ্বিজ মণিরাম কৃত বৈদ্য নাথ মঙ্গল। দেওঘর-বৈদ্যনাথ তীর্থোৎপত্তি বিবরণ। শকসংখ্যা নাই। তবে গ্রন্থ খানি অতি প্রাচীন।

এই পাঁচ খানি গ্রন্থের নাম মাত্র করা গেল। সময়ান্তরে এসম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধ অযথা দীর্ঘ হইয়া যাইবে বলিয়া অদ্য এই খানেই উপসংহার করা গেল। শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

মগধেশ্বরী।

বৈশাখ সংখ্যায় মহামুনি প্রবন্ধে দুইটী কথা ভুল হইয়াছে। রাউলীরা বিবাহকার্য্যে যোগ দেন না। দ্বিতীয়, হিন্দুরা বড়ুয়াদিগকে চণ্ডাল জাতীয় বলেন না, রাজবংশী বলেন। ঐরূপ লেখাতে কোন কোন বড়ুয়া ব্যথা পাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত হইয়াছি। বড়ুয়ারা বলেন, তাঁহারা আর্য্যজাতীয়। মগধ হইতে ব্রহ্মদেশে আসিয়া অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, পালী তাঁহাদের জাতীয় ভাষা। মগধ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া মাগধ বা মগ এবং রাজবংশীয় বলিয়া লোকে রাজবংশী বলে। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা করেন, নীচজাতীয় বলিয়া নহে।

তাঁহারা আরো বলেন, মগধেশ্বরী তাঁহাদেরই নিকট হইতে হিন্দুরা লইয়াছেন। মগধেশ্বরী কি মগদেশ্বরী, দেবতা কি রাক্ষস, নামও জানি না, পরিচয়ও পাই না। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম যে ইহার ভিতর লুক্কায়িত আছে, কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন। ঈশ্বরী শব্দও ঠিক প্রযুক্ত হয় কি ইহা অন্য কোন শব্দের রূপান্তর, তাহাও বলিতে পারি না। সেদিন একজন বৌদ্ধ ও একজন হিন্দু সঙ্গে নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। চট্টগ্রামে পাথরঘাটার নিকটে পীর বদরের কবর আছে। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে। কটকে ও অন্যান্য সহরে দেখিয়াছি, পেগম্বরের পবিত্র চরণ-চিহ্ন—কদম রসুল—হিন্দু ও মুসলমানে পূজা করিয়া থাকে। যাহা হউক, পীর বদরকে বৌদ্ধবন্ধু বদর সাহেব ও হিন্দুবন্ধু বদরেশ্বর বলিয়া অভিহিত করিলেন। মগধেশ্বরী নাম এইরূপে হইয়াছে কি না, জানি না। ঈশ্বরী বলিয়া বলে, তবে তিনি পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বা নপুংসক, তাহাও জানি না। কারণ তাঁহার মূর্ত্তি কেহ কখন দেখেন

নাই, অথচ গ্রামে গ্রামে তাঁহার পূজা হয়।

মগধেশ্বরীর প্রতিমাও নাই, কোন মন্দিরও নাই। প্রত্যেক হিন্দু গ্রামের প্রান্তরে এক খণ্ড ভূমি দেখা যায়, কোথায় কোথায়ও সেখানে কয়েকটী বৃক্ষ আছে। বৃক্ষে গৃধিনী ও বনে শৃগাল বাস করে। এই স্থানটীকে "সেবাখোলা" বলে। এই সেবাখোলা মগধেশ্বরীর আস্তান। মগধেশ্বরীর নিকট সকল জাতি, হিন্দু, মুসলমান, ও বৌদ্ধ, মানত করে। সেবাখোলা ভয়ের স্থান। রাত্রিকালে সেখান দিয়া যাইতে ভয় করে, যেন কোন ডাকিনী এখানে বাস করিয়া থাকে; কাল রং, এলোচুল ও রক্তদন্ত। কৃষ্ণপক্ষে শনি মঙ্গলবারে অষ্টমী ও অমাবস্যায় মগধেশ্বরীর পূজা হয়। পূজার তন্ত্র মন্ত্র নাই। পুরোহিত ব্রাহ্মণেতর কোন নিম্ন জাতি। বলি দিয়া ভোগ দেওয়াই পূজা। কৃষ্ণবর্ণ ছাগী প্রধান বলি। কেহ একটী, কেহ দুবেলায় দুটী ছাগী মানত করে। কৃষ্ণবর্ণ না পাইলে অন্য বর্ণও চলে। কোথায়ও ছাগী না দিয়া ছাগ দেওয়া হয়, পায়রা, মুরগী ও হাঁস বলিও হয়, মুরগী ও হাঁসের ডিমও দেওয়া হয়—যাহার যেমন মানত।

বলির জন্তু এক কোপে কাটিবার নিয়ম নাই। মুসলমানদের জবাই করিবার ন্যায় উল্টা দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পেঁচাইয়া কাটিতে হয়। ভাতের ভোগ প্রশস্ত নিয়ম, কেহ কেহ চাউলের ভোগ দিয়া থাকে। জবাফুল মগধেশ্বরীর বড় প্রিয়।

দক্ষিণমুখ একটী উনুন গড়িয়া তাহাতে ভাত রাঁধিতে হয়। একটী টুকরীতে ভাতগুলি রাখিয়া বলি-জন্তুর রক্ত তাহার উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। তাহার উপর আমমাংসের কয়েক টুকরা ও কতকগুলি জবাফুল রাখিয়া একটী বাঁশের কি অন্য কোন গাছের তিনটী ডাল লইয়া একটী ত্রিপদ খাড়া করিয়া তাহার উপর সেই ভোগের টুকরীটী রাখিয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন, কোন উচ্চ স্থানে রাখিয়া দিলেই হয়। অন্যেরা বলেন, তিন পায়া মাচা নিতান্ত আবশ্যক।

আগে মগধেশ্বরীর পূজা যত হইত, এখন তত নাই। গর্ভিনী স্ত্রীলোক মাত্র মগধেশ্বরীর মানত করিত এবং হিন্দু গৃহী মাত্র নির্দ্দিষ্ট দিনে পারিবারিক প্রথা মত একটী দুইটী ছাগী লইয়া সেবাখোলায় পূজা দিতে যাইত। এখন মগধেশ্বরী আর তত জাগ্রত নহেন। ক্রমে মগধেশ্বরী হিন্দু পূজার ও কালী পূজার আকারে পরিণত হইতেছে, তবে এখনও মন্দির প্রতিমা বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োজিত হয় নাই। কোথায় কোথায়ও ব্রাহ্মণ নাকি এ ভার গ্রহণ করিয়াছে। এখনও কল্পিত ডাকিনী কল্পনা কুসুমে পূজিত।

মাচার উপরে ভোগ রাখিয়া ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতে থাকে, শৃগাল বা গৃধিনী ভক্ষণ করিল কি না। মগধেশ্বরী শৃগাল ও গৃধিনীমুখে ভোগ গ্রহণ করেন। শৃগাল ও গৃধিনী ভোগ স্পর্শ না করিলে বুঝা যায়, তিনি পূজা গ্রহণ করিলেন না।

অবশিষ্ট মাংস রন্ধন করিয়া ভক্তেরা অনতিদূরে প্রসাদ পায়। যাহাদের দুবেলা মানত থাকে, রাত্রে ভোগের টুকরীর উপর অনেকগুলি প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়।

এখন দেখা যাউক, মগধেশ্বরী কে?

ধর্ম্মপূজাকে বৌদ্ধপূজা বলিয়া প্রমাণ করিতে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মগধেশ্বরীর পূজায় সে সকলি বিদ্যমান, মন্দির নাই, প্রতিমা নাই, ব্রাহ্মণ নাই। অনাবৃত ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক তরুমূলে প্রকৃতি-সেবিত চিন্ময়ী দেবতা। ধর্ম্মপূজার ধর্ম্ম নামটী আছে। সে বৌদ্ধ "ধর্ম্ম" হইতে পারে, অন্যেরও হইতে পারে। মগধেশ্বরী যদি বৌদ্ধপূজা হয়, ঐ নামের ভিতর সে তথ্য সঙ্গোপিত হইয়াছে। মগধে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। বৌদ্ধধর্ম্ম মাগধ ধর্ম্ম। তাহার পর ঐ ত্রিপদ। উহা যে ত্রিরত্নের—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের—স্মারক নহে, কে বলিবে? তাহার পর ঐ অন্নপ্রসাদ। আমার মতে, যেমন বৌদ্ধদিগের হইতে মন্দির ও প্রতিমার সৃষ্টি হইয়াছে, তথাগতের পূর্ব্বে ভারতে মন্দির ও প্রতিমা ছিল না, তেমনি অন্নপ্রসাদ বৌদ্ধগণের সৃষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে দেবতাকে পক্ক অন্ন ভোগ দিবার প্রথা ভারতে প্রচলিত না।

মগধেশ্বরী যদি বৌদ্ধপূজা হয়, তবে যোগাচারী বৌদ্ধেরা যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে তান্ত্রিক উপাসনায় পরিণত করিয়াছিল, তখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে মগধেশ্বরীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আমার মতে ধর্ম্মপূজা বা মগধেশ্বরীর পূজা বৌদ্ধপূজা নহে। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আর্য্যদেবতার সিংহাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, অনার্য্যদেবগণ ভারতে রাজত্ব করিতেন। ভাবে দেবতার সৃষ্টি, দেবসৃষ্টি স্থান কাল সাপেক্ষ নহে। এখনও ভারতে নূতন নূতন দেবতার সৃষ্টি হইতেছে। কার্য্যকারণ-সমন্বয়-শক্তি-পরিশূন্য প্রাকৃতলোকে নূতন দেবতার সৃষ্টি করে। পূর্ব্বেও করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। ভাবের প্রকৃষ্টতা অনুসারে দেবতার উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা সাধিত হয়। উন্নত ভাব সভ্যজাতির। সভ্যজাতির দেবতা সভ্য। হাব ভাব আকৃতি, বাহন ও উপাসনার প্রকৃতি হইতে আর্য্য ও অনার্য্যদেবতার বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দয়া দাক্ষিণ্য কোমলতা সভ্যপ্রকৃতি। ভয় ক্রোধ ভীষণতা অনার্য্যপ্রকৃতি। ভীষণ আকৃতি, ভীষণ প্রকৃতি, ভীষণ অন্ধকারে বীভৎসপ্রসাদে উপসেবিত, ভীষণ অরণ্যানী মধ্যগত আকৃতিশূন্য চিন্ময়ী দেবতা অনার্য্যের। আকার কল্পনা করিতে, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে, মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিতে মানসিক ব্যাবৃত্তির প্রয়োজন।

মানব প্রকৃতির এইরূপ ব্যাবৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলে বিদ্যমান সভ্য ও অসভ্যপ্রকৃতি পরিকল্পিত দেবতাগণের উৎপত্তি কোথায়, অনুমান করা যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত সভ্যযুক্তা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সময়ে তন্ত্রধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান আমি ভ্রান্তকল্পনা বলিয়া গণ্য করি। তন্ত্রের মূল অথর্ব্ববেদে। অথর্ব্ববেদ প্রাকৃত দেবতাগণের ইতিহাস, ত্রিবিদ্যা আর্য্যদেবতাগণের ইতিহাস। প্রকৃতদেবগণ ভারতে প্রাচীনতর সম্পত্তি। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃত দেব মাত্র প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসেন নাই। প্রাকৃত ভীতিপ্রবণ-প্রকৃতি যুগে যুগে প্রাকৃত দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে ও এখনও করিতেছে।

প্রাকৃত দেবতার মন্দির নাই, প্রতিমা

নাই, মন্ত্র নাই, পূজার পদ্ধতি নাই, পূজোরী নাই। প্রাকৃত জনমাত্রেই, স্ত্রীলোক ও নিম্নবর্ণে, তাহাদের পূজা করে। তরুতলে অনাবৃত প্রাঙ্গণে তাহাদের পূজা হয়। কল্পনায় দেবতাকে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলকারক, ভয়াবহ বলিয়া কল্পিত। আশীর্ব্বাদভিক্ষা তাঁহার উপাসনার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অমঙ্গল নিবারণের চেষ্টাই তাহার উদ্দেশ্য।

আমার মতে মগধেশ্বরী এইরূপে একটী প্রাকৃত দেবতা। এইরূপ প্রাকৃত দেবতা ভারতবর্ষের নানাস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতার কেন্দ্র হইতে যতদূরে যাওয়া যায়, প্রাকৃত দেবতার দর্শন তত অধিক মিলে। সভ্য দেশে যাঁহারা এখনও আছেন, তাঁহারা অন্দরমহলে যবনিকার অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছেন।

প্রাকৃতদেবতার প্রকৃত প্রকৃতি কচিৎ দেখা যায়। সংসর্গহেতু কোথায় বা আর্য্য প্রকৃতি মিশিয়া গিয়াছে। প্রাকৃত প্রকৃতি যেমন মিশ্রিত হইতেছে, প্রাকৃত দেবতার প্রকৃতি তেমনি মিশ্রিত হইতেছে। কোন কোন প্রাকৃতদেবতা রুদ্র ও মহাকালী হিন্দুর দেবমণ্ডপে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। কতকগুলি এখনও মণ্ডপের বাহিরে ঘুরিতেছেন। বিষ্ণুধর্ম্ম, মগধেশ্বরী এখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই; সভ্যতা, শিক্ষা যথেষ্ট হয় নাই। অনেকগুলি তাড়িত, অদৃশ্য ও হত হইয়াছে। মিশ্রিত প্রকৃতিসম্পন্ন প্রাকৃত দেবতাকে চিনিয়া লইতে হইলে, মন্দির, প্রতিমা ও পুরোহিতের সন্ধান লইতে হইবে। কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রাকৃত পুরোহিতকে অপদস্থ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইয়া কোথাও মন্ত্র রচনা করিয়াছে। দেব প্রকৃতির উন্নতি ও অবনতি আছে। তবে অবনত দেবতাকে সভ্যলোকে যত উন্নতি করিয়া লইয়াছে, উন্নতি দেবতাকে অসভ্য লোকে এত অবনত করিতে পারে নাই।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

আমি কে ?

ভগবৎ কৃপায় আজ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, আমি কে ?. প্রশ্নে স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং নিজের পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক। নিজের পরিচয় নিজে চাওয়া কথাটা প্রহেলিকাবৎ। শুধু প্রশ্ন করা নহে; জিজ্ঞাস্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া প্রশ্নকর্ত্তা ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন—বুঝিতেছেন, বিষয়টা বড় দুরূহ। দুরূহ কেন? আপনার পরিচয় আপনি দিব, কি লইব—এত ব্যাকুলতার কারণ কি? সংসারে সহস্র বিষয়ের বিবরণ পরের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছি ও সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া প্রতিপদে জীবনের পথে পদবিক্ষেপ করিতেছি। আমার চক্ষু যাহা বলিতেছে, কর্ণ যাহা বলিতেছে, ত্বক্ যাহা বলিতেছে, অতি সত্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কাজ করিয়া আসিতেছি। পরের সংবাদ ত পরের মুখে শুনিয়া চিরকালই বিশ্বাস করিতেছি, তবে আত্ম সংবাদ টানিতে যাইয়া এত দুরূহ বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?

স্থূল জগতে দেখিতে পাই, যদি কোন নবজাত শিশু জনক জননী কর্ত্তৃক পরের হাতে অর্পিত হইয়া পরের দ্বারায় প্রতি-

পালিত, পরের ভাবে শিক্ষিত, পরের প্রণালীতে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সে ভ্রান্তিবশতঃ আশৈশব যাহার অন্নে প্রতিপালিত, যাহার ঘরে ও যত্নে রক্ষিত, যাহার ভাবে শিক্ষিত, তাহাকেই পিতা জ্ঞানে, আপনার জাতি বর্ণ ইত্যাদি সমস্ত তাহারই অনুযায়ী কল্পনা করিয়া লয়। কিন্তু কালক্রমে কোন সূত্রে যদি কখনও তাহার প্রাণে সন্দেহ উদ্ভূত হয় যে,তাহার প্রকৃতিগত গূঢ়ভাবগুলি যেন তাহার প্রতিপালকের প্রকৃতির সহিত মিশিতেছে না, যেন তাহার রুচির সহিত প্রতিপালকের রুচির সম্যক ঐক্য হইতেছে না, তখনই সেই আশৈশব পরান্ন প্রতিপালিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিবে—আমি কে ? যত কাল আপন জনক জননীর সন্ধান জানিতে না পারিবে, ততকাল তাহাকে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—আমি কে ?

আমারও আজ সেই দশাই ঘটিয়াছে—আমি পরের ঘরে প্রতিপালিত, জড়ের ক্রোড়ে আশৈশব রক্ষিত অজড়ের সন্তান, মৃত্যুর পথে পরিচালিত অমৃতের পুত্র,তাইত আমার মনে আজ এ সন্দেহ উদ্ভূত হইয়াছে, তাইত প্রশ্ন উদ্দীপিত হইয়াছে—আমি কে ? তাইত পিতৃক্রোড় হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত পরের প্রণালীতে শিক্ষিত আমি আজ আপন প্রকৃতির ভিতরে যেন অমৃতের প্রকৃতির আভাস পাইয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি কে ?

সম্যক অজ্ঞ যিনি, তিনি কখনও এ প্রশ্ন করিবেন না,কারণ সন্দেহই এই প্রশ্নের উদ্ভাবক, আংশিক জ্ঞান ব্যতীত সন্দেহ অসম্ভব। আবার সম্যক জ্ঞানালোকিত চিত্তেও এ প্রশ্ন স্থান পাইতে পারে না, কারণ পরিস্ফুট জ্ঞানে সন্দেহের অবসান হইয়া যায়। যদি আমি আমার পরম কারণ পিতার পরিচয় লাভ করিতে পারিতাম, তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতাম, তাঁহার সত্ত্বা সাক্ষাৎ ভাবে অনুভব করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে আর আজ এ প্রশ্নের আবশ্যকতা থাকিত না ; তাহা হইলে আর এ সহজ প্রশ্নকে এত দুরূহ জ্ঞানে ব্যাকুল হইতে হইত না ; সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হইলে আর পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারায় এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইতে হইত না। পিতৃ পরিচয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব—আমি কে ?

সাধারণতঃ ভাষায় "আমি" বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা মোটামুটি বিশ্লেষণ করিলে পঞ্চভূত অর্থাৎ চৈতন্যহীন জড়, প্রাণ শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ চলাচলের শক্তি, অনুভূতি অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, মন অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান রক্ষা করিবার অন্তরেন্দ্রিয়, বুদ্ধি অর্থাৎ বিচার শক্তি এবং অহংভাব, এই সাতটী প্রধান উপাদান ও রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, সৎ অসৎ বোধক কতকগুলি ভাব উপলব্ধ হয়। এখন প্রশ্ন এই—এই সমস্ত উপাদান গুলির সমষ্টিকেই কি "আমি" নামে লোকে অভিহিত করিয়া থাকে, না ইহাদের কোন একটীকে প্রকৃত পক্ষে "আমি" বলিয়া অন্য উপাদানগুলি মাত্র সেই "আমি" নামক পদার্থের ক্রিয়া বা গুণ বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে ?

উল্লিখিত প্রধান উপাদান গুলির প্রত্যেকটী বিশেষভাবে অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব

যে, শেষোক্ত অহংই অন্য সমস্ত উপাদানের অতীত সার সত্বা ও তাহাই প্রকৃত "আমি।"

প্রাণহীন জড় শরীর আমি নহি। যদি তাহা হইত, তবে মৃত্তিকা প্রস্তর কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রাণহীন অন্যান্য জড় পদার্থ ও জীবন্ত জীবের দেহে কোন প্রভেদ থাকিত না। মৃত মনুষ্যের শব ও জীবন্ত মানবের চৈতন্য যুক্ত শরীর, মৃত বৃক্ষের কাষ্ঠ ও জীবন্ত স্নিগ্ধ পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ, এতদুভয়ে কোন প্রভেদ লক্ষিত হইত না। জগতে মৃত্যু নামে যে সর্ব্বজন-পরিচিত ভাব জীবের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত করে, তাহা আর অনুভূত হইত না। জড় পদার্থে কোন অদৃষ্ট শক্তির সংযোগ হেতুই হউক, অথবা বিবিধ জড় পদার্থ কোন অদৃষ্ট শক্তির গুহ্য কৌশলে মিলিত হওয়া হেতুই হউক, জীবহীন জড়ের অতিরিক্ত জীবন নামে একটা শক্তি আমরা জীবন্ত জড়দেহে অনুভব করিয়া থাকি। উদ্ভিদের সূক্ষ্ম বীজের ভিতরে যে দুর্লক্ষ্য শক্তি লুক্কায়িত থাকিয়া গুহ্য প্রণালীতে বাহ্য জগৎ হইতে আহার আহরণ করত শরীর পুষ্ট করিয়া তাহাকে মহান মহীরূপে পরিণত করে, সেই শক্তিই প্রাণ। উদ্ভিদ ইত্যাদির জীবন্ত দেহে তাহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ও সেই শক্তি টুকু লুপ্ত হইলে সেই জীবন্ত পদার্থ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জড়াতীত যে প্রাণশক্তি জড় জগতে যে জীবনলীলা বিস্তার করিতেছে, আমি সে প্রাণশক্তি হইতেও উচ্চ জগতের সত্বা।

জীবনহীন জড়ের সহিত প্রাণ শক্তির যে সত্বা উপলব্ধ হয়, তাহা উদ্ভিদ রাজ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জন্ম গ্রহণ করে, আহার গ্রহণ করিয়া শরীর পোষণ করে ও ক্রমে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া মরিয়া যায়। উদ্ভিদ জীবন ধারণ প্রণালীর ব্যতিক্রমে হইলেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি জীবনহীন জড় হইতে উদ্ভিদ কেবল মাত্র প্রাণশক্তি সম্পন্ন বলিয়া একসিঁড়ি উপরে। উদ্ভিদের চলিবার শক্তি নাই এবং সৃষ্টির প্রণালী পর্য্যালোচনায় অনুমিত হয়, তাহার সুখ দুঃখ বোধশক্তিও নাই, কারণ যাহার সুখ দুঃখ বোধশক্তি আছে, তাহার সুখ আহরণে ও দুঃখ পরিহারের চেষ্টাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় উদ্ভিদে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়োপযোগী জ্ঞানের অনুভূতিও উদ্ভিদে নাই, অবশ্য বুঝিতে হইবে।

কেঁচো প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কতকগুলি জীবে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, কেবল স্থানান্তরিত হইবার শক্তি ও সুখ দুঃখ অনুভূতি মাত্র আছে বলিয়া অনুমিত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর জীবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাই বলিলেই হয়, কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবল ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মৃত জড় ও প্রাণশক্তি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযোগ দৃষ্ট হয়, সুতরাং ইহারা উদ্ভিদ হইতে এক সিঁড়ি ঊর্দ্ধস্থিত বলা যাইতে পারে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট যে সকল ইতর জীব আছে, তাহাদের স্থান কেঁচো প্রভৃতি স্থান হইতে আর এক সিঁড়ি উপরে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কারণ ইহাদের ভিতরে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিকশিত দৃষ্ট হয়। একটা কুক্কুর যেমন উদ্ভিদের ন্যায় জন্মধারণ ও শরীর পোষণ, করিয়া থাকে, কেঁচোর ন্যায় সুখে আহরণ

ও দুঃখ পরিহারের চেষ্টায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকে, তেমনি বাহ্য জগতের জ্ঞান গ্রহণে সমর্থ হয়। কুক্কুরের উন্মীলিত নয়ন-সমক্ষে যে পদার্থ পতিত হইবে, আলোকের ক্রিয়াবশতঃ তাহার চিত্র তাহার নয়ন-ফলকে পতিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের শিরার ক্রিয়া-কৌশলে সেই চিত্রের প্রতিরূপ প্রকৃত পদার্থের অস্তিত্বের জ্ঞান কুক্কুরের মনে অনুভূত হইয়া থাকে, ইহা কুক্কুরের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করিলেই প্রতীতি হয়।

কুক্কুরের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের শক্তি আছে এবং সেই জ্ঞান রক্ষিত হইবার উপযুক্ত ক্ষমতাও তাহাতে আছে। কুক্কুর, ক্ষুধিত হইয়া, প্রাণ-শক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী আপন পদ সঞ্চালনে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ হয় কি না, এই অভিপ্রায়ে স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। সহসা তাহার নয়ন-সমক্ষে মাংস-খণ্ডের চিত্র উপস্থিত হইল, সে বদন ব্যাদান করিয়া তাহা গ্রাহ্য করিল, ক্ষুধার শান্তি বোধ করিল। মাংসপিণ্ডের দৃশ্য, তাহা গ্রাস করা ও তৎসঙ্গে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি, এই জ্ঞান কুক্কুরের মনে সঞ্চিত হইল। তৎপর দিনে যখন পুনঃ তাহার ক্ষুধার সঞ্চার হইল, তখন হয়তঃ পূর্ব্বদিনের লব্ধ আমিষখণ্ডের চিত্র তাহার মনে উদিত হইল, সে সেই আমিষ খণ্ডের স্থানে ধাবিত হইল; হয়ত পরদিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় এক খণ্ড মাংস সে দেখিতে পাইল, কুক্কুর মাংস গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল; হয়তঃ মাংস-রক্ষক লগুড় উত্তোলন পূর্ব্বক কুক্কুরের পৃষ্ঠে আঘাত করিল। কুক্কুর ক্ষুধার জ্বালা অপেক্ষা লগুড়ের আঘাতে অধিক যন্ত্রণা-দায়ক অনুভব করিয়া মাংস খণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। উত্তোলিত লগুড়, পৃষ্ঠে তাহার পতন ও তৎসঙ্গে আঘাত-যন্ত্রণা কুক্কুরের জ্ঞান হইল। সেই জ্ঞান তাহার মনে সঞ্চিত হইল। এই প্রকারে বাহ্য পদার্থের জ্ঞানও তাহার মানসিক চিত্র, তাহার স্মৃতি কুক্কুরের জ্ঞান ক্রিয়ায় লক্ষিত হয়। এই প্রকার ক্রিয়া দ্বারা আমরা অনেক সময় সাধারণ জীবের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রবন্ধের প্রথমে যে বুদ্ধি বা বিচার-শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা সেই বুদ্ধি নহে, পশ্বাদির বুদ্ধি হইতে উক্ত বিচার-শক্তি অনেক বিভিন্ন।

উত্তোলিত লগুড় দর্শন মাত্র আঘাত আশঙ্কায় কুক্কুরের পলায়ন কি মাংসপিণ্ড দর্শনে তাহা গ্রাস করিতে অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি কার্য্য ভাবানুসঙ্গ জনিত জ্ঞান মাত্র। স্মৃতি এই ভাবনুসঙ্গেরই ফল এবং পশ্বাদির উপরোক্ত প্রকার বুদ্ধির মূল। জীবের মনের একটী বিশেষ প্রকৃতি এই যে, জ্ঞানের যে চিত্রগুলি পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রথমতঃ মনে অর্পিত হয়, সেই শ্রেণীর কোন একটী চিত্র পরে মনে উদিত হইবা মাত্র তাহার সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ অন্য চিত্রগুলি মনে উদিত হয়, অর্থাৎ একটী ভাব অন্য ভাবের সহিত সঙ্গবদ্ধ থাকা হেতু মনে তাহার একটী উদয় হইলে তাহার অনুসঙ্গে অপরটীও উদিত হয়। ইহাকেই দার্শনিকেরা ভাবানুসঙ্গ (association of ideas) নাম দিয়াছেন। যেমন উত্তোলিত লগুড়ের ভাবের সহিত পৃষ্ঠে পতিত লগুড়ের ভাব ও তৎসহ যন্ত্রণার ভাব পরস্পর সঙ্গবদ্ধ থাকা হেতু উত্তোলিত লগুড়ের ভাব মনে উদয় মাত্রই পৃষ্ঠে পতিত লগুড়ের ভাবের ও তৎসহ আঘাত যন্ত্রণার ভাব মনে

উদয় হয়, সুতরাং কুক্কুর পলায়ন করে। লগুড়-আহন্তার মূর্ত্তি-দর্শনেও তাহা হইতে পারে, এমন কি, যে স্থানে লগুড়াঘাত হইয়াছিল, সে স্থান দর্শনেও যন্ত্রণার ভাব মনে উদয় হইয়া কুক্কুর পলায়ন করিতে পারে।

একটী ভাব দ্বারায় অপর ভাব মনে উদয় হওয়ার নামই স্মৃতি। ইহাই কুক্কুরাদি নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বুদ্ধির মূল। এই ভাবানুসঙ্গ অতিক্রম করার শক্তি কুক্কুরের নাই। উত্তোলিত লগুড় দর্শনে কুক্কুর পলায়ন করিবেই করিবে। মাংস খণ্ড দর্শনে কুক্কুর তাহা গ্রাস করিতে প্রয়াস করিবেই এবং লগুড়-আহন্তার দর্শনে পলায়ন করিবেই। কুক্কুরের জ্ঞান ইন্দ্রিয় শক্তির অনুগামী। ইন্দ্রিয়শক্তিকে শাসন করিয়া তাহা অতিক্রম করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি কি শক্তি কুক্কুরের নাই। কুক্কুর ইন্দ্রিয় শক্তি পরিচালিত অন্ধজীব। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ভাব সঙ্গবদ্ধ থাকা হেতু কোন কোন স্থলে আমরা তাহার বুদ্ধি প্রশংসা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু একটু অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচনা করিলে তৎসমস্তই এক মাত্র ভাবানুসঙ্গ মূলক উপলব্ধি হইবে।

জীবের মনে এই ভাব সংগ্রহ-শক্তি ও ভাবানুসঙ্গই সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতার মূল উপাদান। এই ভাব সংগ্রহ জীবের মনে কি প্রকারে ঘটিয়া থাকে, তাহা অনুমান ব্যতীত যুক্তি মূলে নির্ণয় করা সম্ভবপর বোধ হয় না।

যে প্রকারেই হউক, মন ভাব গ্রহণে সমর্থ মাত্র, ভাব উদ্ভাবনে তাহার শক্তি নাই। মন কর্ত্তৃত্বহীন ধারণক্ষম যন্ত্র মাত্র (passive recipient) তাহার কর্ত্তৃত্ব শক্তি (active power) নাই। সেই জন্যই সংগৃহীত ভাবাবলী সঙ্গবদ্ধ থাকা হেতু মনে একটী উদয় হওয়া মাত্র অপরগুলি আপনি উদয় হয়; মন তাহা বারণ করিতে পারে না। এই জন্যই বলা যাইতে পারে যে, মন বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় ভাব গ্রহণে সমর্থ আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় মাত্র। এই মন আমাতেও আছে, কুক্কুরেতেও আছে।

আমি মৃৎ প্রস্তরাদির ন্যায় পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ বহন করিতেছি; তরুলতাদির ন্যায় আহার গ্রহণে শরীর পোষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি; এবং কুক্কুরাদি ইতর প্রাণিগণের ন্যায় রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ভাবানুসঙ্গ বলে অভীষ্টলাভের লোভে ফিরিতেছি। তবে আমি ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? ইতর প্রাণীতে যাহা আছে, আমাতেও ত তাহাই আছে। ইতর প্রাণীর ভিতরে কি পদার্থ নাই, যাহা আমাতে আছে বলিয়া আমি ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারি?

ইতর প্রাণী আহার আহরণ করে, আমিও তাহাই করি, কিন্তু ইতর প্রাণীর আহারে তাহার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয় না। বৃক্ষ যে স্থানে রোপিত, সেই স্থানের রস একই প্রণালীতে, একই ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রাণীও যাহার শরীর রক্ষার্থ যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। কেশ-প্রমাণও তাহা হইতে বিচলিত হইবার শক্তি তদ্দিগের আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমার আহার আমি আপন কর্ত্তৃত্ব বলে

ক্রমে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারি। বৃক্ষের ফল বল্কল ছাড়াইয়া শাঁস বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রস সংযোগ করত অগ্নি জলসংযোগে রন্ধন প্রণালী দ্বারায় কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছি। ইহাতে দেখিতে পাইতেছি যে, আমি আমার খাদ্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতে সমর্থ। এই প্রকার জীবন ধারণে অন্যান্য প্রয়োনীয় বিষয়েও আমিই আমার কর্ত্তা, কিন্তু ইতর প্রাণী স্বভাব অর্থাৎ বিধাতৃ বিহিত প্রণালীর অনুবর্ত্তী মাত্র।

ইতর প্রাণীর ন্যায় আমিও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, কিন্তু ইতর প্রণীর ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব বিষয়েও কর্ত্তৃত্বহীন নহি। যদি তাহাই হইত, তবে যাহা এক ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখ বলিয়া পরিহার করিতেছে, তাহাই অপর ব্যক্তি সাধনার সহায় বোধে তপস্যা বলিয়া আনন্দে ভোগ করিবে কেন? দুঃখের ভিতরে শ্রেষ্ঠতর সুখের স্ফুরণ না করিতে পারিলে কখনও কঠিন তপস্যার উদ্ভাবন মানবজাতির ভিতরে দৃষ্ট হইত না। ভিন্ন ভিন্ন মানব সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সুখের স্পৃহা ও দুঃখের ভীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা দ্বারায়ও আমি আমার সুখ দুঃখের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রতীত হয়।

এই প্রকার ইন্দ্রিয়-জ্ঞানেও আমার কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়া উপলব্ধি হয়। কুক্কুরের চক্ষু সমক্ষে আমিষ খণ্ড পতিত হইলে কুক্কুর তাহা দর্শন করিবেই করিবে। অর্থাৎ বাহিরের পদার্থের চিত্র কুক্কুরের নয়নে পতিত হইলে কুক্কুরের মন তাহাতে স্বতঃ আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু আমার মন তাহাতে বিধিবিহিত প্রণালীতে আকৃষ্ট হইলেও, আমাতে মনকে আবদ্ধ রাখিয়া, বাহিরের চিত্র কর্ত্তৃক মনকে বাহিরে নীত হইতে না দিবার শক্তি আমার আছে। অন্তরেন্দ্রিয় অবশ (passive) মন একদিকে যেমন বাহিরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধীন, অন্যদিকে আবার আমার কর্ত্তৃত্ব শক্তির অধীন। আমি, আমার মনকে মনোরাজ্যের চিত্রে ব্যাপৃত রাখিয়া, কর্ণগোচরে ধ্বনিত ঘটিকার ধ্বনিতে মন নিবিষ্ট না করা হেতু, সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে না পারি, কিন্তু কর্ণবিশিষ্ট অপর প্রাণী আপন কর্ণগোচরে ধ্বনিত সামান্য শব্দটুকু শ্রবণ করিবেই। সামান্য ঘটিকা-যন্ত্রের মৃদু ধ্বনি হইতে আমি আমার মনকে অবরোধ করিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু ভীষণ তোপধ্বনিতে আমার সে শক্তি কার্য্যকারিণী হইতে না পারে। কেহ কেহ বলেন, অভ্যাস বলে তাহাও সম্ভবপর হয়।

যাহা হউক, বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গ্রামের কেন্দ্র অন্তরেন্দ্রিয় মন আমাতেও আছে, ইতর প্রাণীতেও আছে। এই মনের সংযোগ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন জ্ঞানের ভাব প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। বাহিরের বিষয় ইতর প্রাণীর মন আপনি আকর্ষণ করিয়া লয়। আমার মনকেও বাহিরের বিষয় আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু বাহিরের বিষয়ের শক্তির প্রতিকূলে আমার ভিতরে অপর একটা শক্তি আছে, যাহা কখনও কখনও বাহিরের শক্তিকে পরাভূত করিয়া মনকে অবরোধ করিয়া রাখিতে পারে। এই জন্যই ইতর প্রাণী কেবল ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, কিন্তু আমি ইন্দ্রিয়বশে ঘুরিয়া ফিরিয়া

ও আপন শক্তিতে শাসন করিয়া মনকে অন্তর্মুখীন করিয়া লই। ইতর প্রাণী কেবল কলের পুতুলের মত, কিন্তু আমি মনকে ব্যাপৃত রাখিবার যোগ্য শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি।

মন ইন্দ্রিয়ের [illegible] এই টুকু মাত্র লক্ষ্য করিয়া যিনি মনঃসংযোগ কার্য্যে মনের অতীত অপর শক্তির ক্রিয়ার প্রতিপ্রণিধান না করেন, তিনিই মানবমনকে বিষয়-বাসনার হস্তে ন্যস্ত খেলানার ন্যায় মনে করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা অস্বীকার করেন। আর যিনি মনের অতীত ঐ শক্তিটুকুর অত্যন্ত অনুধাবন বশতঃ মনের উপর ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব লক্ষ্য করিতে ভুলিয়া যান, তিনিই, বোধ হয়, মানব ইচ্ছাকে স্বাধীন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মানব বাস্তবিক স্বাধীন হইলেও ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রকৃতির গুহ্য কৌশলে আবদ্ধ থাকা হেতু সেই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

মানব উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাহাকে নিম্নে টানিয়া রাখে, উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-শ্রেণী তাহার গতিরোধ করে, দক্ষিণে দিগন্ত প্রসারিত জলরাশি প্রতিবন্ধক হয়। এই প্রকারে সর্ব্ব দিকেই মানবের গতি অবরুদ্ধ। মানব আজ অসহ্য গ্রীষ্মবশতঃ বারিবর্ষণ ভোগাভিলাষে লোলুপ, প্রকৃতি আপন দুর্ব্বোধ্য অভিপ্রায় সাধন কল্পে তপনকে প্রখরতর করিয়া দেয়; মানব নির্মেঘ নীলাম্বরে একটুকু হাসিমাখা সূর্য্যরশ্মি দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সচকিত, প্রকৃতি ঘোর ঘনঘটা করিয়া ভীষণ ঝটিকা দুর্দ্দিনে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; মানব হয়ত একমাত্র স্নেহপুত্তলি সুকুমার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া হৃদয় শীতল করিতে চায়, প্রকৃতি যেন পাষাণ হইতেও কঠিনতর হইয়া তাহাকে কাড়িয়া লইয়া কালের কোলে অর্পণ করে। এই সকল কে না অনুভব করিয়াছেন? তবে মানবের স্বাধীনতা কোথায়? মানব প্রকৃতির অনন্তবিস্তৃত বিষয় রাশির প্রবাহ বক্ষে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ কণিকা মাত্র নয় কি? শত বিজ্ঞান আলোচনা কর, শত বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার কর; জন্ম মৃত্যুকে কি মানব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে? কোথায় তবে মানবের স্বাধীনতা? মানব ইচ্ছা করে হস্ত প্রসারণ করিবে, বাতব্যাধির আক্রমণে হস্ত অসাড় হইয়া গেল, মানব হস্ত উত্তোলন করিতে পারিল না। মানব ইচ্ছা করিল চক্ষু উন্মীলন করিবে, উন্মীলক পেশি শিথিল হইয়া গেল, মানব সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিল না। মানব ইচ্ছা করিল, একটুকু সুঘ্রাণ গ্রহণ-সুখ উপভোগ করিবে, শ্লেষ্মার রস নাসিকার ঘ্রাণগ্রাহী শিরার মুখ আবৃত করিয়া দিল, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মানব ইচ্ছা করিল, সুরস আহার্য্য গ্রহণে তৃপ্ত হইবে, পিত্ত রস বিকৃত হইয়া রসনার আস্বাদন শক্তি ক্ষীণ করিয়া দিল, সে সুরস উপভোগে আর সমর্থ হইল না। কোথায় তবে মানবের স্বাধীনতা? কেবল বাহিরের জড় জগৎ মানবের স্বাধীনতার বিরোধী, তাহা নহে, আপন দেহ পরিচালনেও মানব স্বাধীন নহে। স্থূল জড়রাজ্যে মানব সম্পূর্ণ পরাধীন—মানবের মনও পরাধীন।

তবে কি স্বাধীনতা জগতে আকাশ কুসুমবৎ কাল্পনিক শব্দ মাত্র? না—তাহা নহে। অভিলাষে মানবের স্বাধীনতা নাই।

প্রকৃতির বশে আহার নিদ্রাভয় ইত্যাদি দৈহিক কার্য্যানুরোধে অভিলাষ আপনি আসিয়া মনকে অভিভূত করে সত্য, কিন্তু সেই অভিলষিত বিষয়ে অগ্রসর হইব কি দূরে পলায়ন করিব, এই স্থির করা কার্য্যে মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন।

কোন কোন দার্শনিক বলেন, এই যে করিব কি না করিব, স্থির করা, ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া মাত্র। তাহাতে মানবের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। যেমন দুইটী ভিন্ন ভিন্ন শক্তি জড়জগতে ঠিক বিরুদ্ধ দিকে প্রয়োগ করিলে যে শক্তি প্রবল হয়, তাহার দিকেই শক্তি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ দিকে মনকে পরিচালন করাতে যে দিকে শক্তির আধিক্য হয়, সেই দিকেই মন অগ্রসর হয়, তাহাকেই আমরা ইচ্ছা (volition) বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বলি। কথাটা ঠিক মিথ্যা নহে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, ইন্দ্রিয় ক্রিয়াতে ইতর প্রাণীর ভিতরে বোধ হয় এই প্রকারই হইয়া থাকে। মানবের মধ্যেও অনেক ইতর প্রাণীর ন্যায় জীব আছে। কিন্তু ইতর প্রাণী ও মানবের মধ্যে একটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইতর প্রাণী অতি প্রাচীন কাল হইতেই একই চরিত্র দেখাইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ইতর প্রাণীর জীবনে একই চরিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কালেও তাহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় না। আহার ইত্যাদি প্রাকৃতিক অভিলষণীয় পদার্থে প্রলোভিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রবল শক্তি বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে ঝগড়া বিবাদ করিয়া পরাভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই প্রবৃত্তির কার্য্য হইতে ইতর প্রাণী নিরস্ত হয় না। ইহা ইতর প্রাণীর চরিত্র লক্ষ্য করিলেই দৃষ্ট হয়।

কিন্তু মানবের পক্ষে তাহা নহে। মানব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া বাহিরের কোন বাধার সহিত ঝগড়া না করিয়াই নিবৃত্তির পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে ইন্দ্রিয়াদির বিষয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই যে মানব কার্য্য অকার্য্য নির্ণয় করে, বলা যাইতে পারে না। তদতিরিক্ত একটা শক্তি আছে, প্রতীত হয়। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা বলেন, পূর্ব্ব পুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট সমাজ শাসন করিবার অভিপ্রায়ে বিহিত নিয়মই সেই শক্তি। কিন্তু প্রশ্ন উদিত হয়, সেই পূর্ব্ব পুরুষগণ যে প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া সমাজ শাসন কল্পে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন, তখন কোন্ শক্তিতে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি শক্তিকে পরাভব করিয়াছিল? এই ভাবে অনুধাবন করিলে স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, পশুপ্রবৃত্তির কার্য্য প্রণালীর নিয়ামক ইন্দ্রিয় শক্তি মাত্র, ইহা সত্য হইলেও, মানবের ভিতরে প্রবৃত্তিকে শাসন করিবার জন্য আর একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিই মানবের কার্য্য ও অকার্য্য বিচার করে ও স্থির করে। সমাজ স্থাপন ইত্যাদি যত প্রকার কার্য্য ইতর প্রাণী হইতে মানবকে উচ্চ শ্রেণীতে স্থাপন করে, তৎসমস্তই সেই শক্তিমূলক।

একত্র সংস্থান ও পরস্পর সহায়তা করিবার জন্য সমাজ স্থাপন ইত্যাদি মানব জাতির কতকগুলি বিধান উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা বলেন, তাঁহারা হস্তী, বানর প্রভৃতি ইতর প্রাণীগণের যূথবন্ধন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই বলিয়া অনুমান হয়।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে, কোন কাজ করিব কি না করিব, ইহা নির্দ্ধারণ কার্য্যে মানবের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। এই স্বাধীনতাই মানব জাতির ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের মূল, জ্ঞানোন্নতির অন্যতর কারণ ও আমি নামক পদার্থের অন্যতম পরিচায়ক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্মৃতি এবং ইতর প্রাণীতে যাহা বুদ্ধি বলিয়া পরিচিত, তাহা ভাবানুসঙ্গের ফল মাত্র। কোন স্মৃতির কার্য্য অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, পরস্পর সঙ্গবদ্ধ ভাবাবলীর এক একটী করিয়া মনে উঠিতে থাকে ও সর্ব্বশেষে গোড়ার ভাবটী উদিত হয়। মনের গতির ক্ষিপ্রতা বশতঃ অনেক সময় আমরা স্মৃতির এই প্রণালীটী লক্ষ্য করিতে সমর্থ না হইতে পারি, কিন্তু দুই একটী স্মৃতির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিষয়টী পরিষ্কার প্রতীত হইবে। সাধারণ অপেক্ষা বড় একটী গোলাপ ফুল দেখিলেই যে স্থানে পূর্ব্বে বড় বড় গোলাপ ফুল দেখিয়াছি, সেই স্থান ও তৎসঙ্গে সেই স্থানের অন্যান্য ভাবের চিত্র মনে আপনি উদিত হইতে থাকে; আমরা বলি, এই ফুলটী দেখিয়া অমুক স্থানের কথা মনে হইতেছে ও ঐ ঐ স্থানের অমুক ব্যক্তি রোজ আমাদিগকে ফুল দিতেন, তাঁহার চেহারা, তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার অন্যান্য অনেক কার্য্য, তাঁহার পারিবারিক অবস্থা, এমন কি তাহার পরিবারের অন্যান্য লোকের ও তদানুষঙ্গিক অনেক কথা একে একে মনে উঠিতেছে। এই স্মৃতির কার্য্যে মনের কোন কর্ত্তৃত্ব (activity) দৃষ্ট হয় না; কেবল আপনি চিত্র গুলি উদিত হইতে থাকে—মন তাহা অনুভব করে মাত্র। ইহাতে মনের অতীত কোন শক্তি লক্ষিত হয় না; ইহা ইতর প্রাণীতেও যেমন, আমাতেও তেমন।

কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে Recollection বলে, তাহাতে অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া বিস্মৃত বিষয় মনে করিবার কার্য্যে মানব অতীত মনের বহিঃস্থ অপর একটী শক্তির কার্য্য অনুভূত হইয়া থাকে। কোন বিস্মৃত কথা মনে করিতে মনের বহিঃস্থ অপর একটা শক্তি মনটাকে পরিচালিত করিয়া সেই ভাবানুসঙ্গের উদ্দীপনা করে। পরস্পর সঙ্গবদ্ধ ভাব শ্রেণীর কোন একটী ভাবেতে মনকে ফেলাইবার জন্য মানব বাহির হইতে একটা শক্তি যেন মনকে ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে, এই প্রকার অনুভূত হয় এবং এই প্রকার পরিচালন হেতু যদি মন সেই শ্রেণীবদ্ধ ভাবের কোন একটীতে পতিত হয়, অমনি ক্রমে সমস্ত ভাব মনে উদিত হয়। ইহাতেও মানবের মনের অতীত একটা স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট (active) শক্তির সত্তা উপলব্ধি হয়। পশ্বাদি ইতর প্রাণীর এই শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না, তাই তাহারা ভাবানুসঙ্গ বিষয় স্বতঃ স্মৃতিতে উদয় হওয়া ভিন্ন চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে পারে না। মানুষ ভাবানুসঙ্গের উদ্ভব করিতে পারে, ইতর প্রাণী তাহা পারে না।

মানুষ ভাবানুসঙ্গের উদ্ভব করিতে পারে বলিয়াই ভাষার অধিকারী হইয়াছে। ভাষা সম্পূর্ণই ভাবানুসঙ্গ-মূলক। সেই ভাবানুসঙ্গ মানুষের নিজে উদ্ভাবিত। মনে একটা ভাব হইল, মুখে একটা ধ্বনি করা হইল; এই মানসিক ভাবে ও ধ্বনিতে মানুষ একটা সঙ্গবন্ধন করিয়া লইল, ধ্বনিটী হইবা মাত্র ভাবটী তৎ সঙ্গে মনে উদিত হয়। ঐ ধ্বনি

ঐ ভাবের নাম বলিয়া কল্পিত হইল। এখানে ধ্বনির সহিত ভাবের যে সঙ্গবন্ধন, তাহা মানুষের কল্পনা মূলক। কল্পনা মাত্রই কর্তৃত্ব বিশিষ্ট শক্তির সাপেক্ষ, অবশ (Passive) মন তাহাতে অশক্ত। মন ভাব গ্রাহক মাত্র, উদ্ভাবক নহে। পূর্ব্বোক্ত ধ্বনিটীকে মসী দ্বারা কাগজে অঙ্কিত চিত্র বিশেষের সহিত ভাবানুসঙ্গে বদ্ধ করাই লিখিত ভাষার মূল। তাহাতেও মনের অতীত কর্তৃত্ব বিশিষ্ট শক্তি সম্ভূত কল্পনার ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। অতএব দেখিতে পাইতেছি যে, ভাষার বলে মানুষ শত বৎসরের ভাব সংগ্রহ করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন পূর্ব্বক ইতর প্রাণী হইতে আপনাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করিতেছে, তাহার মূলে অবশ (Passive) মনের অতীত একটী কর্তৃত্ব বিশিষ্ট (active) শক্তি রহিয়াছে।

কল্পনা মাত্রই কর্তৃত্ব বিশিষ্ট শক্তি সম্ভূত। মিথ্যা মাত্রই কল্পিত। যাহা কোথাও নাই, যে চিত্র ইন্দ্রিয় কখনও প্রাপ্ত হয় নাই, মন কখনও যাহা ইন্দ্রিয় হইতে গ্রহণ করে নাই, ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদান সংযোজনা পূর্ব্বক তাহা রচনা করাই কল্পনা। কেবল ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারায় পরিচালিত ইতর প্রাণীতে তাহা সম্ভবপর নহে। মিথ্যা আচার, .মিথ্যা ব্যবহার ইতর প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না। লোভপরবশ হইয়া অন্যের অধিকারস্থ পদার্থ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করা ও তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ক্রোধপরবশ হইয়া অপরকে উৎপীড়ন করা, প্রভৃতি অন্যায় কার্য্য ইতর প্রাণীতে দৃষ্ট হইলে ও তাহাদের আচরণে মিথ্যা ব্যবহার লক্ষিত হয় না। কোন জন্তুকে ঘন ঘন আঘাত করিলে সে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত অবস্থায় মৃতপ্রায় ভাণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হইতে আত্মরক্ষা করার উদাহরণ উপস্থিত করিয়া কেহ কেহ ইতর প্রাণীতে মিথ্যা ব্যবহার নাই, এই বাক্যের অলীকতা প্রতিপাদনে প্রয়াস করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত প্রকার ব্যবহার কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট শক্তিমূলক কল্পনা-সম্ভূত, মিথ্যাচার নহে; ভাবানুসঙ্গ-প্রসূত ইন্দ্রিয়-ব্যবহার মাত্র। পশু আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইবা মাত্র আহন্তা আহত করা হইতে নিরস্ত হন। পশু ঐ অবস্থাতেই আঘাত প্রাপ্তি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তদবস্থায় পতিত থাকে; অবস্থান্তরে সুখানুভূতি না থাকায় তাহা হইতে নিবস্ত থাকে মাত্র। ইহাতে ইতর প্রাণীর স্বভাবসিদ্ধ ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ব্যতীত অপর কোন শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হয় না।

যাহাকে ইংরাজীতে Theory বলে, তাহাও কল্পনা লব্ধ মাত্র। ব্যতিরেকী হেতুর যুক্তি প্রণালী সমস্তই কল্পনা মূলক। ইন্দ্রিয় শক্তির অতীত যত শত বিষয়ের জ্ঞান বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, তৎ সমস্তই প্রায় ব্যতিরেকী হেতুর যুক্তি মূলে সিদ্ধ। সুতরাং মানব জাতির প্রকৃত উন্নতি অধিকাংশ পক্ষেই কল্পনামূলক, অর্থাৎ কর্তৃত্ব বিশিষ্ট আত্মশক্তি সম্ভূত। ইহার অভাবই ইতর প্রাণীর হীনতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

মানব ইতর প্রাণী হইতে আর একটী উপাদান হেতু শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তাহা বুদ্ধি বা বিচার শক্তি, ইতর প্রাণীর মধ্যে কোন কোন স্থলে অধিকতর না হইলেও তুল্য শিল্প কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাবুই প্রভৃতির কুলায়-নির্ম্মাণ, বীবরের সেতু বন্ধন, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা প্রভৃতির বাসা রচনা ইত্যাদির শিল্প সকলেই অবগত আছেন। এই সকল দর্শন করিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, শিল্প নৈপুণ্য-শক্তি মানুষ অপেক্ষা অন্য জীবে অল্পতর? এক জীবকে দেখিয়া অন্য জীব অনুকরণ করিবার শক্তি ইতর প্রাণীতে নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। তোতা, ময়না প্রভৃতি পাখীকে সহজে কথা শিক্ষা করান যায়। কিন্তু ভাবানুসঙ্গ উদ্ভাবন করিবার শক্তি না থাকা হেতু, ধ্বনির সহিত অন্য ভাবের সঙ্গবন্ধনে তাহারা অসমর্থ বলিয়াই তাহাদিগকে ভাষা শিক্ষা করান যায় না এবং যে প্রাণীর যত টুকু কাজ করা স্বাভাবিক, অর্থাৎ মানব কর্ত্তৃত্ব-হীন পরিচালনে যে টুকু সে করিয়া আসিতেছে, কোটী বৎসর পরেও অবশের ন্যায় তাহাই তাহারা করিবে। তাহা অপেক্ষা অধিকও তাহারা করিতে সমর্থ হইবে না, কমও করিতে পারিবে না। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, ইতর প্রাণীর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, অর্থাৎ কোন্‌টী করা কোন্‌টী না করা, তাহা নির্ণয়ে ইতর প্রাণীর শক্তি নাই। মানুষ ইন্দ্রিয়লব্ধ ভাবগুলি কর্ত্তৃত্বহীন মনের ভিতরে গ্রহণ করিবে ও সাজাইবে ও পরস্পর তুলনা করিবে ও বিচার ক্রিয়া দ্বারা কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করিবে। এই ক্ষমতা কর্ত্তৃত্বহীন মনের নাই। মনের অতীত অন্য শক্তি কর্ত্তৃক তাহা হইয়া থাকে। যাহাকে দার্শনিকগণ Introspection বলেন, তাহা ঐ মনের অতীত শক্তির অস্তিত্ব হেতুই যুক্তিতে সম্ভবপর হয়। এই শক্তির সত্বা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই বা পণ্ডিতবর কোম্‌ত যুক্তি দ্বারায় introspection (অর্থাৎ নিজের মনের ভাবাবলী নিজের মনে অনুধাবন করা) অসম্ভব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিতবর কোম্‌তের যুক্তি কর্ত্তৃত্বহীন মন মাত্র সত্বা স্বীকার করিয়া লইলে শুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনার সহিত তাহা সম্পূর্ণ অনৈক্য হইয়া যায়। মনের অতীত জ্ঞান স্বরূপ শক্ত্যন্তরের সত্বা বুঝিয়া লইলে আর কোন গোল উপস্থিত হয় না। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, মানব জাতিতে যাহা বিচার শক্তি নামে পরিচিত, তাহাও কর্ত্তৃত্বহীন মানব অতীত কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট শক্ত্যন্তরের কার্য্য মাত্র।

আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, এই ভাবটী সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে ও ভোগে সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা যুক্তির বিষয় নহে, প্রমাণের বিষয় মাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনের কার্য্য অনুধাবন করিলেই এ বিষয়ের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। এই ভাবটী আমি নামক সত্বা হইতে উদ্ভূত। দার্শনিক ভাষায় ইহাকে অহঙ্কার বলে।

নিতান্ত প্রাকৃতিক ভাষায় যাহাকে অহঙ্কার বলে, তাহা ইতর প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না। আমি বড়, আমি কেমন প্রভুত্ব করিতেছি, কত জীব আমার পদানত হইয়া আছে, আমি কত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছি, আমি বড় বুদ্ধিমান, আমি অতি উচ্চ বিদ্যালাভ করিয়াছি, আমি কেমন ধার্ম্মিক, ভগবানের প্রিয় পাত্র, এই প্রকারের যত ভাব, তাহা কেবল মানবেই লক্ষিত হয়, অন্য জীবে দৃষ্ট হয় না। এই সকল ভাব যদিও নিতান্ত ঘৃণ্য, তথাপি ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আমি নামক একটী

সত্ত্বা আছে, তাহা ভগবান হইতে কর্তৃত্ব লাভ করিয়া প্রভুত্বপরায়ণ হইয়াছে। আপন দোষে মানব সেই ভগবৎ প্রদত্ত কর্তৃত্বের অপব্যবহার করায় তাহা বিকার প্রাপ্ত হইয়া নিকৃষ্ট অভিমানাত্মক অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানবের পঞ্চেন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান গ্রহণ করিবার জন্য একটী অন্তরেন্দ্রিয় আছে, তাহার নাম মন। মন অবশ কর্তৃত্বহীন। তাহাকে পরিচালিত করিয়া বাহ্য শক্তি বাহ্য জগতের চিত্র তৎ সমক্ষে উপস্থিত করে এবং মানবের অভ্যন্তরে অপর একটী শক্তি আছে, তাহা ভিতর হইতে মনকে পরিচালিত করিয়া বাহ্য জগতে প্রেরণ করে, অথবা বাহ্য জগতের শক্তির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তৎ কর্তৃক মনকে আকৃষ্ট হইতে না দিয়া তাহাকে ভিতরে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয়। নৌকা যেমন তৎস্থিত মাঝি ও তদ্বহিঃস্থ স্রোতঃ ও বায়ু ইত্যাদি এই দুই শক্তির মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া কখনও ইহার বলে, কখনও উহার বলে সঞ্চালিত হয়, তেমনি মানব মন কখনও অন্তঃশক্তি বলে, কখনও বা কেবল বাহ্য শক্তিবলে চালিত হইয়া থাকে। এই অন্তঃ শক্তিই প্রকৃত "আমি" বা "আত্মা"। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মনকেই মানবের মূল শক্তি বলিয়া থাকেন এবং দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কেহ মনকে স্বাধীন-শক্তি-সম্পন্ন ও কেহ কেহ বা তাহাকে জড়ের শক্তির অধীন সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় দার্শনিক মতে মন ইন্দ্রিয় মাত্র। আত্মা তদতিরিক্ত শক্তিরূপিণী সত্ত্বা। এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসরণ করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এই প্রভেদ হেতুই পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মধ্যে এই প্রকার সম্প্রদায়ভেদ সংঘটিত হইয়াছে। যাঁহারা মনকেই মাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সত্যই বলিয়াছেন যে, মানব মন স্বাধীনতাহীন অবশ। আর যাহারা অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট ভাবে হইলেও মনের সহিত আত্মশক্তির সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সেই আত্ম শক্তির স্বাধীনতা বুঝিতে পারিয়া অপর সম্প্রদায়কে নিন্দাবাদ করিয়াছেন। "কিমিয়া সাদৎ" নামক মুসলমান গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, মানবের দুইটী আত্মা আছে। বোধ হয়, তিনি মনকেই সাধারণ আত্মা ও আমি নামক প্রকৃত আত্ম-শক্তিকেই প্রধান আত্মা বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন।

দেহ যেমন দিন দিন ক্ষীণ হইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, এই "আমি-শক্তি" তেমন ক্ষীণ না হইয়া বরং পুষ্ট হয় বলিয়াই অনুমিত হয়। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মনের দুর্ব্বলতা ঘটিতে পারে, কিন্তু আত্মার প্রকৃতিগত ধারণা ও প্রেরণা শক্তির কোন প্রকার হ্রাস হয় বলিয়া বোধ হয় না। উচ্চরবে ডাকিলে, মুমূর্ষু ব্যক্তি, নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিতে শুনা যায় যে, তাহার চাহিতে কষ্ট বোধ হয়, চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই আরাম বোধ করিয়া থাকেন। মুমূর্ষুর এই চক্ষুরুন্মিলন সুখ দুঃখ প্রেরণামূলক অবশ মনের কার্য্য বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সুখবোধক নিমীলিত নয়ন অবস্থায় থাকারই সম্ভাবনা। নয়ন উন্মীলন করা হইত না। ইহাতে বোধ হয় যে "আমি" জরা-মরণ-রহিত সনাতন পদার্থ।

জরা ও মরণ জড় পদার্থের অবস্থা পরি-

বর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই "আমি" পদার্থ জড় নহে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ভেদ নাই। ইহার স্থানাবরোধকতা ও স্থানান্তরিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। ইহা বর্ণবিহীন সুতরাং আলোকের বিষয় নহে, চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। যে সকল অবস্থা জড়ে দৃষ্ট হয়, তাহা এই "আমি" পদার্থে আরোপ করিবার কোনই কারণ নাই। তাহা হইলেই আমি জরা মরণের অধীন এ কথা কেমন করিয়া বলিব। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো-
নহন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

গীতা ২য় অঃ, ২০ শ্লোক।

এই জন্যই যীশুখ্রীষ্ট প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

"Fear not them which kill the body but are not able to kill the soul.

28, X. St. Mathew.

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনের অতীত "আমি" নামক একটী সত্বা আছে। তাহা জরা মরণের অধীন নহে। তাহা অজড় ও অমর।

এই "আমি"ই জ্ঞানের মূল,ইন্দ্রিয় মনকে জ্ঞান কার্য্যে প্রেরণ ও তাহা হইতে তাহাকে প্রত্যাহার করিবার শক্তি চালনা করিয়া থাকে। মানবের প্রকৃতিতে একটা দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-পিপাসা লক্ষিত হয়। তাহাকে অনুসন্ধিৎসা বলে। মানব-শিশুর সমক্ষে যাহা উপস্থিত হইবে, ইতর প্রাণীর ন্যায় তাহাকে অনুভব করিবে, কিন্তু ইতর জন্তু যেমন তাহার সত্বা মাত্র অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত হয়, মানব-শিশু তাহা না করিয়া প্রত্যেক অনুভূতির কারণ অনুসন্ধান করিবে। বাক্‌শক্তি স্ফুরিত হইবার পরই মানব-শিশু "ইহা কি?" "উহা কি?" "ইহা কেন?" "উহা কেন?" এবম্প্রকার প্রশ্নে সঙ্গীয় বয়স্ক ব্যক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, ইহা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? এই অনুসন্ধিৎসা মানবের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল। উপস্থিত চিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, উপস্থিত সত্বার জ্ঞান অনুভব করা কর্ত্তৃত্বহীন মনের ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু উপস্থিত চিত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহার অন্তরালে কিছু আছে কি না ও কি আছে, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট শক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি পূর্ব্বোক্ত আত্ম শক্তিরই গুণ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি আমারই অন্যতম পরিচায়ক। আমি সৎস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ।

মানব প্রকৃতিতে আর একটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। তাহা ভালবাসা। ভালবাসার কতক বিকাশ ইতর জন্তুতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু একটু অনুধাবন পূর্ব্বক বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, ইতর জন্তুর ভালবাসা তাহার অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ভাবানুসঙ্গ-মূলক মাত্র। মাতৃক্রোড়ে পোষিত কুকুরশাবক ক্রোড়ের উষ্ণতার সুখানুভূতি ও তাহার স্তন্যপানের সুখানুভূতি হেতু তাহার মাতার মূর্ত্তি দর্শন মাত্র তৎপ্রতি ধাবিত হয় এবং কুকুর প্রসূতিও শারীর-রস-নিঃসারণ-জনিত সুখানুভূতি হেতু সন্তান দর্শনে তৎপ্রতি আসক্তি প্রদর্শন করে। এই সুখানুভূতিটুকু বিস্মৃত হইলেই আর তদ্রূপ সন্তানস্নেহ কি মাতৃ-বাৎসল্য লক্ষিত হয় না। মানবের প্রাণে যে কেবল

এই মাতৃভক্তি ও সন্তানস্নেহ আজীবন বর্ত্তমান থাকিয়া ইতর প্রাণী হইতে মানবকে উচ্চতর শ্রেণীর জীব বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহা নহে। পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আপন দৈহিক সুখ বিসর্জ্জন করতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য মানবাত্মা প্রয়াসী হইয়া হৃদয়-নিহিত ভালবাসার বীজ যে স্বর্গলব্ধ অধ্যাত্ম জগতের অবিনশ্বর পদার্থ, তাহা অকাট্য রূপে প্রমাণ করিয়া দেয়। সংসারের শত পদার্থের প্রতি মানবের যে প্রকার আসক্তি, আপন করে রোপিত সামান্য তৃণখণ্ডের প্রতি তাহার যেরূপ চিরন্তন স্নেহ দৃষ্ট হয়, ইতর প্রাণীতে তাহা লক্ষিত হয় না। এই আসক্তি যদিও বিষয়ের নশ্বরতা প্রযুক্ত পরিহর্ত্তব্য, তথাপি ইহার মূলে স্বাধীন আত্মশক্তির প্রেম-প্রবণতা অনুভূত হয়। আসক্তি সেই প্রেমের বিকার মাত্র। দাম্পত্য ব্যবহারেও মানব ইতর প্রাণীর ন্যায় হীন ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় পরিতৃপ্ত না হইয়া বহুবিধ প্রেমের ব্যবহার উদ্ভাবন করিয়া লয়, দেখা যায়। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি যেমন সৎস্বরূপ অর্থাৎ জরামরণ-রহিত নিত্য সত্বা এবং চিৎস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্য শক্তিরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্গের নিয়োক্তা, তেমনি প্রেমস্বরূপ অর্থাৎ পদার্থান্তরে প্রীতি স্থাপনে সর্ব্বদা উন্মুখ।

আত্মশক্তির ইয়ত্তা করা অতি দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। অনেকেই অবগত আছেন যে, ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটিবে, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শনে তাহা কখনও কখনও অবগত হওয়া যায় এবং স্বপ্নের অবস্থার সহিত পরে প্রকৃত ঘটনার সাদৃশ্য দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। বোধ হয় যেন বহির্মুখী আত্মাকে অন্তর্মুখী করিয়া মনকে অবিক্ষিপ্তভাবে রাখিতে পারিলে আত্মার জ্ঞানশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়, সুতরাং সেই শক্তির বলে ভবিষ্যৎ ঘটনা অবগত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মেসমেরিজম্ প্রভৃতি অধ্যাত্ম প্রক্রিয়া দ্বারা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা গিয়া থাকে, যাহা প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

এইরূপে আমার প্রকৃতি আমি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে গেলেই দেখিতে পাই যে, আমি আমার নিজের শক্তির সম্পূর্ণ ইয়ত্তা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি যেন একটী অনন্তের কণিকা এবং অনন্ত বিশ্বের মূল সত্বা পরমেশ্বরের অনুরাগ প্রকৃতি-বিশিষ্ট জড়ের কোলে প্রতিপালিত তাঁহারই পুত্র বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। যদি আমার পিতার সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারিতাম, যদি আমি তাঁহারই প্রেমময় প্রসারিত ক্রোড়ে আরোহণ করিতে সমর্থ হইতাম, যদি আমি তাঁহা হইতে লব্ধ আমার কর্ত্তৃত্বশক্তি তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিতে পারিতাম, যদি তাঁহারই চরণতলে অভিমান আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া আমার ইচ্ছা তাঁহারই ইচ্ছাতে নিমজ্জিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি তাঁহারই সহিত যেন মিশিয়া লীন হইয়া গিয়াছি, তাঁহার সত্বায় আমার সত্বা অন্তরিত হইয়া গিয়াছে, এই ভাবে বিহ্বল হইতে পারিতাম, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তখন আমি এক মহা আমির অপূর্ব্ব অংশ মাত্র, অনন্ত-বিস্তৃত অমৃত-সাগরের তরঙ্গ-রেখা মাত্র, এইরূপ মনে করিতাম, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়া প্রশমিত সাগর' বক্ষে লীন

তরঙ্গ-রেখার ন্যায় আমি প্রেমময় পিতার ক্রোড়ে আপনাকে বিলুপ্তপ্রায় মনে করিতাম, ইহাতে আর চমৎকৃত হইবার কি আছে? বুঝিবা এই ভাবেই মুগ্ধ হইয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন "সোহহং" "শিবোহহং" বুঝিবা, এই ভাবেই নিমগ্ন হইয়া মহাত্মা যীশু বলিয়াছিলেন "আমি ও আমার পিতা এক।" "I and my father arc;one."

শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার।

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনচরিত।

(দেশীয় রাজা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের মত)

ভারত-সাম্রাজ্যের মোগল অধীশ্বরগণের মধ্যে বাবর এবং জাহাঙ্গীর নিজের জীবন এবং তৎসাময়িক ইতিবৃত্ত অনেক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনচরিতে তাঁহার নিজের চরিত্র, রাজ্যশাসন-প্রণালী এবং প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণের অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার পিতার সময়ের ইতিবৃত্তও কিছু তিনি নিজের পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল পারস্য পুস্তক সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই, যতদূর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা হইতে কতকাংশ আজ অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, রাজা মানসিংহ এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "রাজা মান সিংহ আমার পিতার আমীরদিগের মধ্যে অত্যন্ত বিশ্বাসী ও মাননীয় ছিলেন এবং আমাদের এই উচ্চবংশের সহিত বিবাহ দ্বারায় আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতৃষ্বসাকে আমার পিতা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং আমি তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলাম। তাঁহার ভগ্নী সুলতন-উন্নেচ্ছা-বেগমের গর্ভে আমার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। আমি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব পদ সুবা বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা পদেই নিযুক্ত রাখিয়াছিলাম; এবং যদিও তিনি এরূপ কতকগুলি কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি আমার নিকট হইতে কোনও রূপ উপহার ও সম্মান প্রাপ্তির আশা করিতে পারেন না, তথাপি আমি তাঁহাকে একটী সম্মানের পোষাক, হীরা-মুক্তা-জড়িত একখানি তরবারি এবং আমার নিজের একটী অশ্ব দিয়া ও ৫০,০০০ হাজারি অশ্বের মনসবদার করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহার পিতার নাম রাজা ভগবান দাস এবং পিতামহের নাম রাজা ভারামল। রাজপুতদিগের মধ্যে আমার পিতাকে উপকার করিবার সম্মান প্রথমে রাজা ভারামলই প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার স্বজাতির মধ্যে তিনি বিশ্বস্ততায়, সততায়, এবং শক্তি ও সামর্থ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজা মান সিংহের পুত্র ভাওসিংহকে তাহার পূর্ব্ব মনসবীর সহিত দেড় হাজারী যোগ করিয়া সম্মানিত করিলাম।"

জাহাঙ্গীরকে অনেক ঐতিহাসিক নীচাশয়, অত্যাচারী, নিকৃষ্ট-স্বভাব বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানকারী এবং রাজদ্রোহী ব্যক্তিগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা পাঠ করিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি উক্ত আত্মজীবনচরিতে লিখিতেছেন,—"সাবান মাসের ২৭ তারিখে রাজা ভগবান দাসের পুত্র ও রাজা মান সিংহের পিতৃব্য আখি রাজের সন্তানগণ (অভিরাম, বাজিরাম, ও শ্যাম রাম) অন্যায়রূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। যদিও পূর্ব্বে অভিরামের ব্যবহার ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তথাপি আমি তাহার দোষগুলি উপেক্ষা করিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ তারিখে যখন জানিতে পারিলাম যে, এই হতভাগ্য আমাদের অনুমতি ব্যতীত তাহার স্ত্রী পুত্রগণকে তাহার নিজ বাটীতে প্রেরণ করিয়া বিদ্রোহী রাণার সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন আমি রামদাস এবং অন্যান্য আমীরদিগকে বলিলাম, 'যদি তোমাদের মধ্যে কেহ এই অন্যায় পথে চালিত লোকদিগের জন্য জামিন হইতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাদের মনসবী ও জায়গিরী বহাল রাখিয়া তাহাদের দোষ উপেক্ষা করতঃ তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি।' কিন্তু যখন তাহাদের বিদ্রোহ আচরণে ও অসৎ চরিত্রের জন্য কেহই তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হইল না, তখন আমি আমীর-উল-ওমরাকে বলিলাম,'এই বিদ্রোহী এবং অসৎ ব্যক্তিগণের চরিত্র-সংশোধনের জন্য যখন কেহই দায়ীত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন যে পর্য্যন্ত না সেই রূপ কোনও ব্যক্তি পাওয়া যায়, তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা রাজ সরকারের কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তির অধীনে অবস্থিতি করিবে।' আমীর-উল-ওমরা তাহাদিগকে ইব্রাহিম খাঁ কাকর ও খাতমের অধীনে অবস্থিতির আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা ঐ সকল অবিবেচক ব্যক্তিদিগকে অস্ত্রশূন্য করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা কিছুমাত্র সৌজন্যতা প্রকাশ না করিয়া বাধা প্রদান করিল। তাহাদের অনুচরবর্গও যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। এই সকল আমাকে জ্ঞাত করান হইলে,আমি এই মূর্খদিগকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। প্রথমে আমীর-উল-ওমরাকে পাঠাইয়া সেখ ফরিদকে অনুগামী হইতে বলিলাম। আমীর-উল-ওমরা উপস্থিত হইলেই দুইটী রাজপুত তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে কুতব নামীয় এক ব্যক্তি এক রাজপুতকে বাধা দেওয়ায় রাজপুত তাহাকে নিহত করিল। তখন সকলে উক্ত রাজপুতকে দ্বিখণ্ড করিল। আমীর-উল-ওমরার অন্য একজন আফগান অনুচর দ্বিতীয় রাজপুতকে নিহত করিল। দিলওয়ারখাঁ তরবারি দ্বারা অভিরামকে আক্রমণ করিল, অন্য দুই ব্যক্তি সহ অভিরাম যুদ্ধ জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। দিলওয়ারখাঁ এই তিন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইল। তখন আমীর-উল-ওমরার অনুচরবর্গ ও কতকগুলি আহাদী তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিল। এই ঘটনায় অবিবেচক ব্যক্তিগণের বিশেষ শিক্ষা হইয়াছিল।"

রাণা অমরসিংহের সহিত জাহাঙ্গীরের অনেক দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। তিনি অমরসিংহ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের জীবনীতে লিখিয়াছেন যে—"সিংহাসনে আরোহণের সময় যখন সমস্ত আমীর তাহাদিগের সৈন্যসহ রাজদরবারে উপস্থিত ছিল,' তখন এই

সকল সৈন্য সামন্তদিগকে সুলতান পরউইজের অধীনে হিন্দুস্থানের ঘোরতর ঈশ্বর অবিশ্বাসী এবং ভয়ানক অত্যাচারী রাণার (উদয়পুরের রাণা অমরসিংহ) বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রেরণ করিবার ভাব আমার মনে উদয় হইয়াছিল। আমার পিতার সময়ে পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু কোনও ক্রমেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারা যায় নাই, শুভ দিনে আমি সুলতানকে নানারূপ সম্মানের পোষাক, তরবারি ও অশ্ব ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাহাকে এই কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিলাম। প্রায় বিংশ সহস্র অশ্বারোহী প্রকৃতরূপে অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ সজ্জিত হইয়া আমীর ও প্রধান প্রধান সামন্তদিগের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।"

"যে সমস্ত মন সবদার এবং আমীরগণ এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রকৃত বর্ণনা দিতে হইলে অনেক লিখিতে হইবে; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক আমীর, খাঁ, এবং প্রধান প্রধান রাজপুত এই কার্য্যের জন্য নিজের ইচ্ছা অনুসারে গমন করিয়াছিল।"

"পরউইজকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার কালীন আমি তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, 'যদি রাণা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র করণের সহিত উপস্থিত হইয়া তোমার নিকট আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অধীনতা এবং বশ্যতা স্বীকার করে, তাহা হইলে তুমি তাহার বিরুদ্ধ আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইও।' এইরূপ উপদেশ দেওয়ার দুইটী কারণ ছিল। প্রথম আমার পিতা আক্সাস নদীর অপর পার জয় করিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু যখনই তিনি এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারেই কোনও না কোনও বাধা বিপত্তিতে তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। যদি রাণার সহিত এই গোলযোগ সহজে পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে পরউইজকে ভারতবর্ষে রাখিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে আমার পৈত্রিক দেশ জয় করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারি। বিশেষতঃ এই সময়ে সে স্থানে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির অভাব। আবদুল্লা খাঁ এবং তাঁহার পুত্র আবদুল মুমিন খাঁর পরে বকি খাঁ যে অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে; এবং তাহার ভ্রাতা ওয়ালী মহম্মদ এখনও রাজত্ব মধ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ আমার পিতার রাজত্বের সময় সেই দেশের কতক অংশ জয় করা হইয়াছিল। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিলে সমস্ত দেশই আমার নিজের রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কথিত আছে যে, "রাজা সপ্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও নূতন অন্য রাজ্য অধিকার করিবার জন্য লালায়িত থাকে।"

নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জাহাঙ্গীরের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতামত কতকটা বুঝিতে পারা যায়। জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন "একদা কতকগুলি পণ্ডিতকে (হিন্দুদিগের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে) বলিলাম যে, যদি তাঁহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বরের দশ অবতারের বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক। কেন না, তাহা হইলে অপরিবর্ত্তনশীল ঈশ্বরকে দীর্ঘ, প্রস্থ, ইত্যাদি রূপ আকারে পরিণত হওয়ার

উপযুক্ততা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা যদি শুধু ইহাই বলেন যে, ঈশ্বরের জ্যোতি এই কয়েক মূর্ত্তিতেই দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরের জ্যোতি শুধু তাহাতেই আবদ্ধ না থাকিয়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেই দৃষ্ট হয়। যদি তাঁহারা বলেন যে, এই কয়েকটী মূর্ত্তি ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর পরিচায়ক,তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না, কেন না সর্ব্ব ধর্ম্মের লোকের মধ্যেই এরূপ লোকের অভাব ছিল না, যাহারা অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারিত না, এবং ঐ সব ব্যক্তি তাহাদের সাময়িক সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান ছিল। বহু তর্ক বিতর্কের পর পরিশেষে তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে, ঈশ্বর নিরাকার এবং তাঁহার বিষয় তাঁহারা বিশেষরূপে ধারণা করিতে সক্ষম নহেন। তাঁহারা বলিলেন যে, সেই নিরাকার এবং অনন্ত ঈশ্বর জ্ঞানের এবং বুদ্ধির অতীত, সুতরাং তাঁহার সত্বার কোনও রূপ পরিচয় পাইতে কিম্বা তাঁহার বিষয় কোনও রূপ ধারণা করিতে হইলে, এই সসীম মানবের পক্ষে, সাক্ষাৎ সাকার সম্বন্ধীয় কোনও মূর্ত্তি ব্যতীত, সেই ধারণা করা অতীব দুরূহ; এই কারণে তাঁহারা এই দশ মূর্ত্তির পূজা, সেই অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরের সত্বা উপলব্ধি করিবার এক উপায় বলিয়া গণ্য করেন। আমি তখন তাঁহাদিগকে বলিলাম, এই রূপ উপায় দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না।"

জাহাঙ্গীর অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন, এক দিন কোনও কারণে আমীর-উল-ওমরা নিম্নলিখিত কথা বলায় আমি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, সরলতা এবং ক্রূরতা কোনও টাকা বা জিনিষ বিশেষে আবদ্ধ নহে, প্রকৃত পক্ষে রাজার বন্ধুদিগের গুণাবলী প্রদর্শন করাই সরলতা, অপরিচিত ব্যক্তিদিগের গুণাবলী গোপন করাই ক্রূরতা।' বাস্তবিকই একথাটী অতি সুন্দর। দরবারের লোক কর্ত্তৃক বন্ধু এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে যেরূপ ব্যক্তি, তাহাকে সেই রূপ ভাবে প্রদর্শন করাই উচিত। তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা উচিত নয়।"

শ্রীঅনঙ্গ মোহন লাহিড়ী।

নবযুগ।

বিধাতা পুরুষের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে সময়ের স্রোত সমান ভাবে চলিয়াছে। কে উহার আদি এবং শেষ নিরূপণ করিতে পারিবে? মানব জাতি কত কাল হইল সৃষ্ট হইয়াছে এবং কত কাল তাহা এই ধরণী পৃষ্ঠে অধিবাস করিবে, তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া মানব প্রতি পদ-বিক্ষেপে হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়াছে, "প্রভো, বুঝিতে পারিলাম না এই অসীম সৃষ্টির মহিমা।" কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই পৃথিবীর বয়স এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হইতে পারিল না। ভূতত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিতেরা সে বিষয়ে যতই চিন্তা করিতেছেন, ততই তাঁহারা আপনাদিগের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিতে পারিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছেন। ক্ষুদ্র মানব এপর্য্যন্ত অনন্ত কালের যে সূক্ষ্মতম বিভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা পল, লিত্যা, বিলিত্যা নহে—

তাহা ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড নহে—তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ইহা হইতে সূক্ষ্মতর বিভাগ আর হয় নাই।

ইতিহাস ভূতকালের একটা হিসাব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। সে অনুমান করিয়াছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর বয়স ছয় সহস্র বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু তাহার এই অনুমানকে অদ্যাবধি কেহ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে যাহা হউক, এই ছয় সহস্র বৎসরের মধ্যে গত উনবিংশ শতাব্দী যে ইতিহাসের পৃষ্ঠার অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে, উহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব কাল হইতে উক্ত উনবিংশ শতাব্দীর শত বৎসর গণিত হইতেছে, তাঁহার প্রভাব আজ জগন্ময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর কোটী কোটী নর নারী আজ তাঁহার পদ তলে নত-মস্তক। সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত কাল বিভাগও যে তাহাদের উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? উনবিংশ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে আপনার পদচিহ্ন রাখিয়া অনন্তকালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এখন ঐ শতাব্দী সম্বন্ধে মহামহা পণ্ডিতেরা নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন। মানুষের স্বভাব এই, সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, যাহা অধ্যয়ন করে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তৎ সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাতে অযৌক্তিকতা কিছুই নাই। যাহা সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত—যাহা আজ কেবল তিন বৎসরের শিশু মাত্র—তৎ সম্বন্ধে—সেই বিংশ শতাব্দীর সম্বন্ধে, কোন কথা ব্যক্ত করিতে যাওয়া এই ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে অসীম সাহসিকতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমাদের—এই ধরণীর মুখ কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা কল্পনা করিতে চেষ্টা করা কি সামান্য ব্যাপার? সামান্য কেন, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসম্ভব হইলেও, মানুষের স্বভাব এই যে, সে ভবিষ্যতের অনন্ত ও তমসাবৃত গর্ভের মধ্যে একটু উঁকি মারিয়া দেখিতে ছাড়ে না। এ বিষয়ে তার যে কৌতূহল জন্মে, উহা একেবারেই অগম্য এবং তার মূলে সেই স্বর্গীয়া কল্পনাসুন্দরী বিরাজিত। আমরা আজ এই কল্পনাসুন্দরীর সাহায্যে এই নবযুগ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রধান কথা স্পর্শ করিয়া যাইব মাত্র। স্পর্শ করিয়া যাইব বলিলাম, কারণ এই নব যুগের সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করা এই দুর্ব্বল তুলিকার ক্ষমতাতীত। উহা কেবল ক্ষমতাশালী তুলিকার সাধ্যায়ত্ত। আমরা আশা করি, পাঠকদিগের মধ্য হইতে কোন ক্ষমতাশালী চিত্রকর এ বিষয়ে তুলিকা চালনা করিয়া যশস্বী হইবেন।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই গত শতাব্দীর প্রধান উন্নতি। সমস্ত পৃথিবী এবং সমস্ত মানব জাতির উপরে উহা যে প্রকার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ কেবল মানব জাতির এই বাহ্য উন্নতি সাধনে ব্যয়িত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল পার্থিব উন্নতি লইয়া মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আত্মার কল্যাণ সাধন তাহার চরম লক্ষ্য। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ মানব জাতির

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ব্যয়িত হইয়াছিল বলিলে কোন ক্ষতি হয় না। এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশে মহাত্মা কারলাইল, মরিস, রস্কিন প্রভৃতি মহাজনগণ এবং আমাদিগের প্রিয় জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়, কেশব চন্দ্র প্রভৃতি মহাজনেরা আবির্ভূত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রণী স্বরূপ কার্য্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির জন্য যেমন বর্ত্তমান সময়ে বেরিং প্রণালী দিয়া ছয় মাসে বিলাতে পৌঁছিতে হইতেছে না, তেমনি গুরু, মধ্যবর্ত্তী বা অভ্রান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে স্বর্গ রূপ বিলাতে যাইতে হইতেছে না। সুয়েজ খাল যেমন ছয় মাসের পথকে এক পক্ষের পথে পরিণত করিয়াছে, প্রোক্ত মহাত্মাদিগের প্রবর্ত্তিত "ব্যাকুল প্রার্থনা" রূপ আধ্যাত্মিক খাল তেমনি ধর্ম্ম জগতের দূরত্বকে হ্রাস করিয়াছে। বিংশ শতাব্দী বহু পরিমাণে মানব জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

মানুষের কার্য্যক্ষেত্রের সকল বিভাগে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। নূতন শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্যজগতের চতুর্দ্দিকে এই আবশ্যকতা প্রচুর পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। ইহা সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিক গগনে কয়েক খণ্ড ঘন মেঘ দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেই সকল যে অতি শীঘ্র বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে। চীন যুদ্ধের রাজনৈতিক কূটচক্রের ভিতরে যাইতে আমেরিকা সন্দিগ্ধ। ইংলণ্ড জাপান প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্যও এই অন্তর্ব্বিবাদের ঘোর অপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে তাহার সম্পূর্ণ তিরোধানের বিষয়ে আশান্বিত হইতে না পারিলেও, তাহার পরিমাণ যে নবশতাব্দীতে অনেক লাঘব হইবে, সে বিষয় আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। আমরা আশা করি, বিংশশতাব্দী সমস্ত মানব জাতিকে হিংসা, দ্বেষ, ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে বিশুদ্ধ প্রেমডোরে বাঁধিতে সমর্থ হইবে। আমরা উৎকর্ণ হইলে শুনিতে পাই যে, নব শতাব্দী যেন গম্ভীর স্বরে এই আশার বাণী উচ্চারণ করিতেছে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই শতাব্দীতে একখানি সাধারণ আন্তর্জ্জাতীয় দণ্ডবিধি ও একখানি সত্ত্ববিধি প্রণীত এবং একটী সাধারণ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, আশা করি।

আন্তর্জাতিক বিবাদের তিরোধান সম্বন্ধে আমরা বিংশ শতাব্দীর নিকট হইতে যে আশার বাণী শুনিলাম, উহা আমাদিগকে আর এক বিষম সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহা ধন ও জনের (Labour and capital) বিবাদ। বাণিজ্যক্ষেত্রে এ দুইটী নিতান্ত আবশ্যক। অর্থাগমের ইহারা প্রধান সহায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও ইহাদের মধ্যে শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইল না। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ধন জনের উপর অযথা প্রাধান্য করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশীয় হিলট্ (Helots) দাস এবং আধুনিককালের আমেরিকা দেশীয় কাফ্রি দাসদিগের উপর ধনীদিগের কিরূপ অন্যায় প্রভুত্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই উত্তমরূপে অবগত আছেন। আমা-

দের দেশে বর্ত্তমানকালে আসাম প্রদেশের চা বাগানের অধ্যক্ষ এবং কুলিদিগের সম্বন্ধও অনেক পরিমাণে তদ্রূপ। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ধনাদিগের প্রাণান্ত চেষ্টা এই যে, তাঁহারা সকলের ধন হস্তগত করিয়া দেশের আপামর-সাধারণকে কেবল শ্রমজীবী দলে পরিণত করিবেন এবং তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ ধনরাশি দ্বারা আপনাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবেন। এই সামাজিক অসমতায় ফল স্বরূপ আমরা বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে ধন এবং জনের মধ্যে অনেক খণ্ডযুদ্ধ দেখিয়াছি। ঐ সকল খণ্ডযুদ্ধ ধর্ম্মঘট নামে অভিহিত। আমাদের দেশেও ঐ সকল ধর্ম্মঘটের একান্ত অভাব নাই। এই সামাজিক বৈষম্যমূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য বিগত শতাব্দীতে স্বাধীনতা-প্রিয় জন্মভূমি ফ্রান্সদেশে একদল বিপ্লবকারীর অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহাদিগকে সোসিয়ালিষ্ট বলা যায়। অবশ্য, তাহাদিগের অবলম্বিত সকল প্রণালীর সহিত আমাদিগের সহানুভূতি নাই। কিন্তু, তথাপি, ইহা নিঃসন্দেহ যে, নব শতাব্দীতে এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দলের দ্বারা মানব জাতির, মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। আমরা আজ নব শতাব্দীর প্রথম অঙ্কে থাকিয়া আশা করিতেছি যে, শতাব্দীর শেষ বৎসরে ধন এবং জনের মধ্যে বহু পরিমাণে সদ্ভাব স্থাপিত হইবে এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বিংশ শতাব্দীতে আর একটী মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তাহা স্ত্রীজাতির উদ্ধার সাধন এবং উন্নতি বিধান। উনবিংশ শতাব্দীর নিকট হইতে এ বিষয়ে যতদূর আশা করা গিয়াছিল, তাহা হইতে পারে নাই। পৃথিবীর সভ্যতম দেশ সকলে নারী জাতির অবস্থা এই নব শতাব্দীর প্রারম্ভে অত্যন্ত শোচনীয়। তত্তৎদেশ সকলের চিন্তাশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পুরুষেরা অবলা জাতিকে অতি ন্যায্য কতকগুলি অধিকার প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিছেন। ভারতের ত কথাই নাই। ভারতীয় নারী জাতির দুরবস্থার কথা ভাবিলে আমাদিগের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। নব শতাব্দীতে তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ উন্নতি লাভ করিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। বাস্তবিক মানব জাতির প্রসূতিদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত না হইলে, মানব জাতির প্রকৃত উন্নতি সুদূরপরাহত। বিংশ শতাব্দী কি এ বিষয়ে আমাদিগকে অভিলষিত ফল প্রদান করিবে না?

এখন আমরা নূতন শতাব্দীতে ভারতের ভাবী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিব। গত শতাব্দীতে কেবল ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুপ্তোত্থিত শিশু যেমন চারিদিকে তাকাইয়া ক্ষণকালের জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায়. আমাদিগের ভারত-মাতাও তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন, "আহা! আমি নিদ্রিত থাকিবার সময় আমার কন্যাগণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন!" মা, আর তোমার ঘুমাইবার অবসর নাই। এই নূতন শতাব্দীর শতবৎসর তোমাকে জাগ্রত থাকিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যে অন্তর্ব্বিবাদের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, উহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ, তুমি বর্ত্তমান ব্রিটিস-সিংহের পতাকার অধীনে থাকিয়া সম্পূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছ।

ধন এবং জনের বিবাদও তোমাকে ব্যস্ত করিতেছে না। কারণ, তোমার বাণিজ্য ব্যবসায় সমস্ত বিদেশীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত। সে বিষয়ে নূতন শতাব্দীতে যে তোমাকে কিছু করিতে হইবে না, আমরা তাহা বলিতেছি না। সে সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু নূতন যুগে তোমার প্রধান কার্য্য হইবে, দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর সহিত ঘোর সংগ্রাম। বিগত শতাব্দীতে তাহা তোমার বহু সন্তানকে গ্রাস করিয়াছে। তাহাকে কি প্রকারে দেশ হইতে তাড়িত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এবং আরো অনেক উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে তোমাকে সে সকলের মীমাংসা করিতে হইবে। পার্থিব দুর্ভিক্ষ ছাড়া মানুষের এক প্রকার আধ্যাত্মিক দুর্ভিক্ষও আছে। মা, নব শতাব্দীর প্রারম্ভে তোমার সন্তানেরা উভয় প্রকার দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণাতে ক্লিষ্ট হইতেছে। পার্থিব দুর্ভিক্ষের ভীষণতা অনেক পরিমাণে উপশমিত হইয়া থাকিলেও, একেবারে দেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আধ্যাত্মিক দুর্ভিক্ষ কি? তাহা এই। পাশ্চাত্য সভ্যতালোক আমাদিগের দেশে প্রবেশ লাভ করিয়া আমাদিগের কার্য্যক্ষেত্রের সকল বিভাগে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। নব্যভারত পাশ্চাত্য জগতের উচ্চভাব সকলকে গ্রহণ করাতে প্রাচীন ভারত হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকে আর আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছে না। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান ইয়ুরোপ—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের নিকট বন্ধুতা ও আত্মীয়তার জন্য ভিখারী বেশে দণ্ডায়মান। ইংলণ্ড কি আমাদিগকে উক্ত স্পৃহনীয় বন্ধুতা বা আত্মীয়তা উপযুক্ত মাত্রায় দিয়াছে? উহা দেওয়া দূরে থাকুক, এখনও সে আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একথা ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। বর্ত্তমানে আমরা ইংলণ্ডের সুখ দুঃখে আমাদিগের সুখ দুঃখ পর্য্যবসিত জানিয়া এবং আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া আমাদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য উহার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছি। ইহাই আমাদিগের কথিত আধ্যাত্মিক দুর্ভিক্ষ। এ বিষয়ে আমাদিগের দেশে একজন খ্যাতনামা মহাত্মা সম্প্রতি একখানি ইংরাজি পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কতকস্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন ;—

"There is such a thing as the famine of the soul -- the hunger and thirst for human fellowship and compassion. The modern educated Indian, separated by his advanced ideas from his own people, is a lonely being. The great masses of his countrymen look askance at him. The great community of Europeans look suspiciously at him............The Indian feells that he too is a child of the Empire, the glory of England reflects lustre upon him, England's heroes are his heroes, England's future is his future......Yet he cannot forget the previous history of his great land and people ; he feels, like St. Paul, that he is a citizen of no mean city ; he therefore makes his appeal for consideration and help to Englishmen in England, the home of truth and freedom and christian excellence."

বিংশ শতাব্দী কি এই ঘৃণ্য অসমতার বিলোপ সাধন করিবে না? বিংশ শতাব্দীতে এই দুই মহাজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কি দৃঢ়তর হইবে না? খ্যাতিমঞ্চের ক্রমোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হইলে নব শতাব্দীকে অবশ্য তাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

ধর্ম্মধন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধন। যদি

কোন বিষয়ে অন্য দেশের উপর ইহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম বিষয়ে। বিংশ শতাব্দীতে আমরা ভারতের এই শ্রেষ্ঠ ধনকে চক্র বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখিতে আশা করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে, উনবিংশ শতাব্দীতে, এবিষয়ে ভারত যাহা করিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। আমরা বর্ত্তমানেও বেরিংপ্রণালী দিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতেছি। ধর্ম্মরাজ্যে এখনও সুয়েজ খাল খাত হয় নাই, কেবল তাহার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কি ভারতের সমস্ত নর নারী ঐ সংক্ষিপ্ত ও সোজা পথ দিয়া স্বর্গ-বিলাতে যাইতে পারিবে না?

ব্রিটিস সুশাসনের ছায়াতলে থাকিয়া আমরা সকল প্রকার শান্তি উপভোগ করিতেছি। কোন প্রকার উপদ্রব আমাদিগকে ত্যক্ত করিতেছে না। এক কথায় আমরা রাম রাজ্যে বাস করিতেছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ব্রিটিসশাসন নীতির নিয়মানুসারে রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদিগকে অতি অল্প কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু সামাজিক ও ধর্ম্মনীতি ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছি। তাহা হইলেও কি আমরা গত শতাব্দীতে সেই দুর্মূল্য স্বাধীনতার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছি? সত্য কথা, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ বীরপুরুষেরা সে বিষয়ে আমাদিগের চক্ষে শীতল অঞ্জন লাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহাও কি ঠিক সমানরূপে সত্য নহে যে, আমরা সেই পবিত্র অঞ্জনের প্রখরতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই? ইহা অপেক্ষা ঘোর লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? পাঠক! তুমি কি দেখিতেছ না যে, আমাদিগের প্রিয় জন্মভূমি উপধর্ম্মের অত্যাচারে কিরূপ জর্জ্জরিত! আমাদিগের সমাজ কতই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন! বিংশ শতাব্দীতে একথা ভাবিলে কি বাস্তবিক্ হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে না? ব্রহ্মাণ্ডপতি কি প্রকৃতই আমাদিগের প্রতি বিমুখ? আমাদিগের ভবিষ্যৎ কি তবে ঘোর তমসাচ্ছন্ন? না, পাঠক! উন্নততম যুগের উষাকালে আর আমরা এ প্রকার নিরাশার বাণী উচ্চারণ করিব না। এস, আমরা একবার বিদ্য চক্ষু মেলিয়া ভবিষ্যৎ গর্ভে ভারতের দিব্য শোভা দেখিয়া নয়ন মন কৃতার্থ করি। পৌরাণিক সত্যযুগে কেবল ঈশ্বরের বরপুত্র আর্য্য মহর্ষিদিগের হৃদয়ে দেবাবতরণ হইয়াছিল। তাঁহারা কেবল গিরিবর হিমালয়, বিন্ধ্য প্রভৃতি কতক পর্ব্বতের কন্দর ও গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি স্রোতস্বতী বেদধ্বনিতে ঝঙ্কারিত করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু নবযুগের ভবিষ্যৎ গর্ভে অবস্থিত ভারতে আমরা কি দেখিতে পাই? তাহাতে আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা বাস্তবিক আশাপ্রদ এবং ঐ মনোহর দৃশ্য দেখিতে বাস্তবিক আমাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা নির্ম্মল দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেছি, ভারত এই নব সত্য যুগে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে। তাহার প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে দেবাবতরণ হইয়া উহার প্রত্যেক গিরি কন্দর, প্রত্যেক নদী তট, প্রত্যেক অরণ্যানি, এমন কি, প্রত্যেক কুটীর জগদীশ্বরের মহামন্ত্র ধ্বনিতে প্রকম্পিত হইবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা ভারত ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে উচ্চতর আসন গ্রহণ করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে

প্রতিষ্ঠিত হইবে। পাঠক, তুমি কি ভাবিতেছ, ইহা কেবল স্বপ্ন মাত্র,—অসম্ভব ব্যাপার? যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মালোক ভারত সন্তানদিগের হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কি আর কদাপি মেঘাচ্ছন্ন হইবে? কদাপি না। হে ভারতসন্তান, আর তোমার আলস্যের দিন নাই। তোমার সম্মুখে ঘোর সংগ্রাম-ক্ষেত্র বিস্তৃত। তোমাকে কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গোত্তোলন করিতে হইবে। ওঠ, সজ্জিত হও। তুমি সমাজের শত্রু নও, পরম মিত্র। সমাজ আর তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইবে না। সে দিন নিকটবর্ত্তী, যে দিন সে তোমাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিবে। প্রভু জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, নবযুগে ভারতবর্ষ হইতে সকল জড়তা অপসারিত হউক এবং তাহার সন্তানেরা ধর্ম্মসেনারূপে সত্যের পতাকা হস্তে ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ুক। ভারত আবার পূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হউক। ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী।

উপনিষদের উপদেশ। (৫)

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

মহর্ষি আরুণি আর একদিন শ্বেতকেতুকে নিকটে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "পুত্র, পৃথিবীস্থ বাহ্যিক বস্তু সকল প্রত্যেকেই যে তেজ, জল ও পৃথিবী-পরমাণু,—এই ত্রিবিধ উপাদান হইতে জাত, একথা সেদিন তোমায় বলিয়াছি। কেবল বাহ্যিক পদার্থ বলিয়া নহে, মানসিক বৃত্তিগুলিরও বাস্তবিক পক্ষে উহারাই উপাদান। বাহ্যিক বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি, একই উপাদান হইতে জন্মিয়াছে। কেবল সংস্থান ভেদ বশতঃ উহাদের নাম ও কার্য্যের ভেদ হইয়াছে। মন প্রভৃতি আন্তরিক ও বৃত্তিগুলির কিরূপে সেই তেজ প্রভৃতিই উপাদান, অদ্য সেই তত্ত্ব তোমায় বলিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বাহ্যিকই বল, আর আন্তরিকই বল,—যাবতীয় পদার্থই যে সেই "ত্রিবৃৎকরণের" ই ফল মাত্র, অদ্য তাহাই দেখাইতেছি, শুনিয়া যাও

প্রাণী যে ভুক্তদ্রব্য (অন্ন) গ্রহণ করে, তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া, তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতম অংশটী পুরীষরূপে পরিণত হয়, অন্নের যেটী মধ্যমাংশ, সেটী রসাদিরূপে বিকৃত হইয়া, পরিশেষে শরীরের মাংসরূপে পরিণত হয়; ভুক্তদ্রব্যের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা হৃদয়ে যাইয়া, রাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহের অবস্থিতির কারণীভূত মন রূপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা মনরূপে পরিণত হইয়া, ক্রমে সেই মনেরই উপচয় বা পুষ্টি সম্পাদন করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, জড়াণুজাত বলিয়া মন ভৌতিক দ্রব্য মাত্র; বৈশেষিকের ন্যায় মন নিত্য ও নিরবয়ব পদার্থ নহে। ইহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, সূক্ষ্ম, স্থূল, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট যাবতীয় পদার্থকেই ব্যাপ্ত করিতে সক্ষম। এইরূপে, প্রাণী দ্বারা পীত জলও শরীরের মধ্যে তিন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। স্থূলতম অংশ হইতে মূত্র, মধ্যমাংশ

হইতে শোণিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতমাংশ হইতে প্রাণের উপচয় ও পুষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে তৈল, ঘৃতাদি তৈজসদ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাও তিন অংশে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ভাগ দ্বারা অস্থি, মধ্যম ভাগ দ্বারা মজ্জা এবং সূক্ষ্মাংশ দ্বারা বাক্যের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। তৈল ঘৃতাদি তৈজস পরমাণু ভুক্ত হয়, বলিয়াই মনুষ্য বাক্য বলিতে পারে। অতএব বুঝা যাই যে, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, এবং বাক্য তেজোময় পদার্থ মাত্র। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আখু (ইন্দুর) প্রভৃতি প্রাণীরা ত কেবল মাত্র অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগকেও ত কিছুপরিমাণে বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট ও প্রাণবান্ বলিয়া দেখা যায়, সমুদ্র মধ্যস্থ মীন মকর প্রভৃতি ত জল মাত্র পান করিয়া থাকে, তাহাদেরও ত মন ও বাক্‌শক্তি আছে; তবে আর কেমন করিয়া বলা যায় যে, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, ও বাক্য তেজোময়? একথার উত্তর এই যে, কেহই ত আর অবিমিশ্র অন্ন জলাদি আহার করে না; সকলেই ত্রিবৃৎকৃত অন্নজলাদিই আহার করিয়া থাকে। সুতরাং আখু প্রভৃতি প্রাণীরও যে প্রাণাদি থাকিবে, ইহাতে আর অসঙ্গতি কোথায়?"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিতঃ, অন্নাদি সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যই ত একত্র মিশ্রিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে মন ত এই সমুদয় ভুক্তেরই সূক্ষ্মাংশ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা অনুমান করাই ত স্বাভাবিক, তবে আপনি কিরূপে বলিতেছেন যে, কেবল অন্নেরই সূক্ষ্মাংশ দ্বারা মন গঠিত হয়?" আরুণি উত্তর দিলেন যে—"পুত্র? কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমায় বুঝাইতেছি,মনোযোগ দেও।"

"দধিকে মন্থন-দণ্ড দ্বারা মথিত করিলে যেমন তাহার সূক্ষ্মাংশ নবনীত রূপে উপরে উঠিয়া যায়, তাহাই ঘৃতরূপে পরিণত হয়। এই রূপ, অন্নাদি দ্রব্য ভক্ষিত হইবার পর, বায়ুর সহিত জঠরাগ্নি দ্বারা মথিত হইয়া, সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, মন রূপে পরিণত হয়। সেই সূক্ষ্মাংশগুলি মনের অবয়বের সহিত মিলিত হইয়া মনের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। এইরূপে জল ও তেজের সূক্ষ্মাংশ হইতে যথাক্রমে প্রাণ ও বাক্যের পুষ্টি হইয়া থাকে।"

শ্বেতকেতু পিতার এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা তত পরিস্ফুট রূপে বুঝিতে পারিল না। আরুণি তাহা দেখিতে পাইলেন। এবং এই তত্বটী অন্যরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"ভুক্ত অন্ন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া, মনের শক্তি উৎপাদন করে, সেই শক্তি অন্নরস হইতেই জাত। অন্নরস হইতে জাত সেই শক্তি ষোড়শ অংশে পরিণত হয়। মনের এই ষোড়শ শক্তি থাকাতেই মনকে বা জীবকে "ষোড়শ কলাত্মক" বলা হইয়া থাকে। অন্নরস-জনিত মানসিক শক্তি বিশিষ্ট পুরুষেরই নানাবিধ সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। জীব যে দ্রষ্টা, শ্রোতা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা এবং সর্ব্বক্রিয়াসমর্থ—তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তি পুরুষ অন্নরস (ভুক্তদ্রব্য) হইতেই সংগ্রহ করিয়া লয়। অন্নরসাদি না পাইলে ঐ সমস্ত শক্তিও ক্ষয়িত হইতে আরম্ভ করে। অতএব মনের বীর্য্য ও সামর্থ্য সেই ভুক্ত দ্রব্য হইতেই গৃহীত।

সৌম্য! পুরুষের মানসিক শক্তি নিচয় যে অন্নরস হইতেই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, যদি

একথার প্রামাণ্য দেখিতে চাও, তবে আজ হইতে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত তুমি অন্নাহার করিও না, কেবল মাত্র ইচ্ছামত কিঞ্চিৎ জল মাত্র পান করিও, কেন না প্রাণ জলময় বলিয়া যদি জল পানও বন্ধ করিয়া দেও, তবে তোমার প্রাণ-ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যাইবে। যে হেতু কারণের বিনাশে,কার্য্যের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।

শ্বেতকেতু পিতার এই আদেশে শুনিয়া "মন যে অন্নময়" ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইল এবং পঞ্চদশ দিবস কিছুই অন্নাদি গ্রহণ করিল না। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইলে ষোড়শ দিবসে শ্বেতকেতু পিতার নিকটে উপস্থিত হইল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস ? তুমি আমার নিকট ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়া মুখস্থ করিয়াছিলে, তাহারই কোন অংশ আমাকে শুনাও।" পুত্র ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল—"ভগবন্ ? ঋগ্বেদাদি কিছুই আজ আমার মনে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। চেষ্টা করিয়াও আমি তাহার কিছুই মনে আনিতে পারিতেছি না।" পিতা, পুত্রের এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বৎস ? কতকগুলি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলে যখন সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইয়া নিভিয়া যায়, এবং একটী মাত্র খদ্যোত প্রমাণ জ্বলদঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তদ্দারা যেমন আর দাহক্রিয়া সম্ভাবিত হইতে পারে না, সেইরূপ অন্নদ্বারা পরিপুষ্ট তোমার মনেরও একটী মাত্র কলা বা অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে মাত্র। এইজন্যই তোমার মনে ঋগ্বেদের স্মৃতি উদিত হইতেছে না। এখন কিছু অন্ন গ্রহণ কর।" পুত্র অন্ন ভক্ষণ করিয়া, পুনরায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইল এবং এখন তাহার মনে ঋগ্বেদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল এবং পিতাকে তাহার অংশ বিশেষ শুনাইয়া দিল। পিতা তখন পুনরায় শ্বেতকেতুকে বলিতে লাগিলেন:—

"পুত্র! পূর্ব্বে যে অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম, সেই খদ্যোত প্রমাণ, স্ফুলিঙ্গ মাত্রাবশিষ্ট অগ্নিকণার সহিত যদি এখন কতকগুলি শুষ্ক তৃণ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা যেমন সেই অগ্নিকণার সহিত যুক্ত হইয়া, পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং প্রজ্বলিত এই অগ্নিদ্বারা এখন বৃহৎ বৃহৎ পদার্থকেও ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া যায়, সেইরূপ, কলা মাত্রাবশিষ্ট তোমার মনের যে একটী মাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল, সেই ক্ষীণ কলাটী অদ্য আবার অন্নরস দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে; সেই জন্যই আজ্ পঞ্চদশ দিনের পরে, পুনরায় তোমার মনে বেদের লুপ্ত স্মৃতি জাগরুক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইলে যে, মন অন্নরসাত্মক। অন্নরস হইতেই মনের সমুদয় শক্তির পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে, প্রাণ ও বাক্যও যে, যথাক্রমে অপ্ ও তেজোময়, তাহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। তবেই দেখ, বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রত্যেক পদার্থই "ত্রিবৃৎকৃত" হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে এবং ত্রিবৃৎকৃত হইয়াই পরিপুষ্ট হইতেছে। অতএব বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদয় পদার্থই, সেই তেজ, অপ্ ও অন্নের উপাদান দ্বারাই গঠিত। বিশ্লেষণ করিলে, সেই ত্রিবিধ মূল তত্ত্বেই পৌছান যায় এবং ঐ ত্রিবিধ মূল তত্ত্বই কেবল অবশিষ্ট থাকে।"

শ্বেতকেতু, পিতার এই উপদেশ গুলি

শুনিয়া যথাযথ রূপে চিন্তা ও আন্দোলন করতঃ এখন বুঝিতে পারিলেন যে, মন প্রভৃতি শক্তি বা পদার্থ বাস্তবিক পক্ষে অন্নাদি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার ঐ তিনটী তত্ত্ব কার্য্যকারণ সম্বন্ধে গ্রথিত হইয়া, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পদার্থমাত্রেই, এইরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিজাত হইয়া, ব্রহ্মেই লীন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু শ্বেতকেতুর মনে তথাপি সন্দেহ একেবারে অপগত হইল না। এখনও এই কঠিন তত্ত্বটী তত সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি স্থির করিলেন যে, এ বিষয়ে পিতার নিকট হইতে আরো উপদেশ লইতে হইবে। কিন্তু সে উপদেশের কথা আমরা আর এক দিন পাঠককে শুনাইব। ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

স্বাধ্বী শবরী।

প্রাচীন ভারত রত্নপ্রসূ, ইহা মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করেন। আর কোন জাতি এরূপ উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মজগতে ভারত যেস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা তুলনা-রহিত। সেই অতীত গৌরব-স্মৃতি এখনও ভারতকে জগৎপূজ্য করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর কুসুমিত উদ্যান শ্মশানে পরিণত, কিন্তু সেই শ্মশানভূমিতে এখনও দিক্ আলো করিয়া সময় সময় পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সে দিবস পার্লামেণ্টের মেম্বর ডিগ্‌বি সাহেব, পরমহংস রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কোন্ ভারত-সন্তানের প্রাণে আশার সঞ্চার না হয়? ডিগ্‌বি সাহেব বলেন, "বর্ত্তমান শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রধান লোক রবার্ট ব্রাউনিঙ ও জন রাসকিন, কিন্তু ইঁহারাও নিরক্ষর রামকৃষ্ণের সহিত তুলনায় অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছেন।"

যে দেশে নরনারী ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিত, যে দেশের রমণীগণ সন্তানের হাতে অসি দিয়া বলিতে পারিত, হয় রণবিজয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইও, নচেৎ সমরাঙ্গণে ধরাশায়ী হইও; যে দেশের জহুরোৎসব জগৎকে এখনও স্তম্ভিত করিতেছে; সে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন? রজনীর অন্ধকার বিগত হইলে আলোক অরুণাচল উদ্ভাসিত করিয়া দর্শন দেন, ঊষা সিন্দুর কিরীট শিরে ধারণ করিয়া মোহিনী হাসিচ্ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে পূর্ব্ব গগনে উদয় হইয়া থাকেন। বিচ্ছেদের পর মিলন অবশ্যম্ভাবী, সেই আশা হৃদয়কে এখনও আশ্বস্ত করে।

অনাথিনী চণ্ডালকন্যা শবরী পঞ্চবটী বনে বাস করিতেন। তাঁহার কেহই ছিল না। মাতা, পিতা, ভাই বন্ধু, এ জগতে আপনার বলিবার কেহই ছিল না। তপস্বিনীর ন্যায় গহন বনে ঋষিদিগের সান্নিধ্যে বাস করিতেন। তপস্বিনীর ন্যায় ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। বনস্পতি রাজি ও তরু-সুশোভন পুষ্পিত লতা বল্লরীচয় তাঁহার সখা ও সখি স্থানীয়

ছিল। বিহঙ্গমকুলের প্রভাতীয় বৈতালিক গানে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কলনাদিনী স্রোতস্বতীকূলে আগমন করিয়া প্রাতঃস্নান পূজা বন্দনাদি সমাপনান্তর গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। এবং দিননাথ অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলে, যখন বিহগকুল নীড়াভিমুখে ধাবিত হইত, তখন বৃক্ষতল-নিপতিত ফল আহরণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। অবশিষ্ট সময় কেবল ভগবন্নাম কীর্ত্তনে যাপন করিতেন। ভগবানে যাঁহার দৃঢ় ভক্তি,তিনি জগৎপূজ্য। শবরী ভগবানে চিত্ত সমাধান করিয়া জীবন কাটাইতে শিখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কাজের অভাব ছিল না। সংসারে এরূপ লোক বিরল নহে, যাঁহারা সময় কি প্রকারে অতিবাহিত করিবেন, অন্বেষণ করিয়া পান না। বিশেষতঃ হতভাগিনী বঙ্গবাসিনী বিধবামণ্ডলী। তাঁহাদের দুঃখের জীবন যেন অবসান হইতে চায় না। একদা শান্তির প্রিয় নিকেতন বঙ্গগৃহ, এখন বিধবার উষ্ণ নিশ্বাসে অশান্তির আবাস বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল মন প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়া গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অস্মদ্দেশীয় বিধবা রমণীগণ শিক্ষিতা হন নাই বলিয়া যে এরূপ ঘটিতেছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ বঙ্গ বিধবার পন্থা আজ কুসুমাকীর্ণ না হইয়া কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। ইহার কারণ বহুদূরে খুঁজিতে হইবে না। জীবন শান্তিপূর্ণ না হইয়া আজ এরূপ অশান্তির আকর কেন হইল ?

শবরী গহন বিপিনে ভক্ত মুনিগণের সেবা করিয়া জীবন কাটাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। তাপসদিগের অভাব কোথায় ? যাঁহারা সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গহন বনে ভগবানের চরণ ধ্যান করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের অভাব কিছুই নাই। শবরী দেখিলেন, তাপসেরা প্রত্যূষে আশ্রম ত্যাগ করিয়া নদী তীরে গমন করেন,তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্তব পাঠ করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগত হন।

পূতসলিলা স্রোতস্বতী তটে গমনের পন্থা অতি কণ্টকাকীর্ণ। শবরী সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া এই রাস্তা পরিষ্কার করিতেন। কণ্টক কঙ্কর প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিতেন এবং যাহাতে তাপসেরা অক্লেশে গতিবিধি করিতে পারেন,তদ্রূপ পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেন। নিশীথে তাপসের আশ্রম অভ্যন্তরে থাকিয়া ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেন। শবরী বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণে রাখিয়া যাইতেন। রজনীর ভয়ঙ্কর শীত হইতে শবরী-আহৃত ইন্ধন জ্বালিয়া মুনিগণ দেহ রক্ষা করিতেন। এবং শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিতে পারিতেন। ঋষিগণ ভাবিতে লাগিলেন, কে রাস্তা পরিষ্কার করে, কেইবা ইন্ধন আহরণ করিয়া রজনীতে আশ্রমে রাখিয়া যায় ?

শিষ্যমণ্ডলী স্থির করিলেন, রজনীতে নিদ্রা না যাইয়া, কে এই ইন্ধন রাখিয়া যায়, দেখিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া এক রাত্রে জাগিয়া রহিলেন। নিশাদেবী ধীরে ধীরে বন প্রান্তর করাল অন্ধকার দ্বারায় ব্যাপ্ত করিলেন। ধীরে ধীরে পক্ষীগণ নীড়াভিমুখে গমন করিল। গহন কানন শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। এদিকে শবরীও আহৃত ইন্ধন বন্ধন করিয়া তাপসদিগের আশ্রমাভিমুখে মন্থর গমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেন কোন কুকর্ম্ম করিতেছেন, পাছে কেহ তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে দেখে, এই ভয়ে

রমণী ভীতা। বাস্তবিক যাহারা গোপনে সৎকার্য্য করেন, তাঁহারা এই রূপ এক ভাবে অধীর হয়েন। বর্ত্তমান কালে সৎকার্য্য জয়ঢক্কা রবে নিনাদিত না হইলে অনুষ্ঠাতা সম্পূর্ণ সুখী হন না।

শবরী ইন্ধন মস্তকে বহন করিয়া ঋষিদিগের আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। রমণী মরমে মরিয়া গেলেন, মাথা হেঁট করিয়া বায়ু সঞ্চালিত বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তাপসেরা আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, দেখিলেন,শিষ্যমণ্ডলী একটী রমণীকে ঘেরিয়া গোলমাল করিতেছে। রমণীর মস্তক হইতে ইন্ধন-ভার ভূপতিত হইয়াছে এবং সে ভীত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া কাঁপিতেছে।

এক পরম পণ্ডিত ভক্তপ্রবর তাপস শবরীর অবস্থা মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন এবং সাধু-সেবায় তাহার মন প্রাণ মত্ত হইয়াছে,দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। অতি যত্নে রাম নাম কর্ণে প্রদান করিলেন। অন্যান্য তাপসেরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, কেন না শবরী নীচ জাতীয়া। তাঁহাকে শিষ্যা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বিজ্ঞবর তাপস ইহাতে কিছু মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না, তিনি ধীরে ধীরে অন্যান্য তাপসদিগকে বলিলেন।

"চণ্ডালহপি মুনিশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ
হরিভক্তি-বিহীনশ্চ দ্বিজহপি শ্বপচাধমঃ।"

হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডাল ঋষি শ্রেষ্ঠ, হরিভক্তি-বিহীন দ্বিজ কিরাতাধম। শবরী ব্রাহ্মণী হইতেও উচ্চপদ পাইবার অধিকারিণী, কেন না তিনি হরিভক্তি ধনে ধনী।

তাপস তৎপর শবরীকে বলিলেন, তুমি ভাগ্যবতী। শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখিতে পাইবে। আমার সময় হইয়া আসিয়াছে, ধরাধাম ত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম। ভগবান্ রামচন্দ্রের লীলা বিষয়ক সকল কথা শবরীকে জ্ঞাত করাইয়া মুনিবর দেহ ত্যাগ করিলেন। শবরী গুরুর শোকে অধীরা হইলেন। গুরুদত্ত ধন হৃদয়ে স্থাপন করিয়া রামচন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষায় পঞ্চবটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস প্রত্যূষে তপস্বীরা নদীতে স্নান করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন; শবরীও স্নান করিবার মানসে সেই সময়ে নদীতে আগত। ভয়ে ভয়ে নদীর সৈকতে অবতরণ করিলেন। অতি ধীর পদ বিক্ষেপে তাপসদিগের নিকট হইতে বহু দূরে নদী জলে অবগাহন করিলেন। জপ তপ করিলেই সাধু হয় না। ভস্ম মাখিলেই সন্ন্যাসী হয় না। কেহ কেহ শবরীর এই ব্যবহারে বিরক্ত এবং রাগান্বিত হইলেন এবং কটু কথা বলিতেও ত্রুটী করিলেন না। চণ্ডালিনী তাঁহাদের ঘাটে স্নান করিবে, এও কি সহ্য হয়?

ভক্তের অশ্রুজলে ভগবানের সিংহাসন টলিল। কি জানি কেন, নদী জল রক্তময় হইল। কৃমি কীট্ ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাপসেরা ইহা দেখিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতেও মুনিগণের চক্ষু উন্মীলিত হইল না, বুঝিলেন না যে, অকস্মাৎ কেন এরূপ হইল।

অরণ্য মধ্যে তৃণ-নির্ম্মিত এক কুটীরে শবরী বাস করিতেন। তৃষিত চাতক যে রূপ মেঘ পানে অনিমেষে চাহিয়া থাকে, শবরীও রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তদ্রূপ দিবস

অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দিনান্তে একবার মাত্র পর্ণকুটীর হইতে বহির্গত হইয়া ফল মূলান্বেষণ করিতেন। যেরূপ জননী কোন সুমিষ্ট সামগ্রী পাইলে সন্তানের জন্য রাখিয়া দেন, কখন্ সন্তান আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে, তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, শবরী শ্রীরামচন্দ্রের জন্য, সেইরূপ, যে ফল খাইতে মিষ্ট লাগিত, তাহা আহার না করিয়া রাখিয়া দিতেন।

কিয়দ্দিনান্তর শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা সহ পঞ্চবটী বনে পিতৃসত্য পালনার্থে আগমন করিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে "আমার শবরী কোথায়" "আমার শবরী কোথায়" বলিয়া শবরীকে আহ্বান করিলেন। সেই অমৃত-নিন্দিত আহ্বান শবরীর কর্ণে প্রবেশ করিল। স্নেহের সহিত যে আহ্বান, তাহা সুধা হইতেও সুধা। সেই মধুর ডাক শবরীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। যাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় এতদিন কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া পথ পানে চাতকিনীর ন্যায় অনিমেষে চাহিয়াছিলেন, সেই সুন্দর সুঠাম শ্যাম মূর্ত্তি শবরীর সম্মুখে, "আমার শবরী, আমার শবরী" বলিয়া আহ্বান করিতেছে। শবরী স্থির দৃষ্টে উন্মত্ত পাগলিনী প্রায় এক স্থানে দণ্ডায়মানা রহিলেন। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে পলক নাই, যেন একটী চিত্রিত পুত্তলিকা। দয়াময় রামচন্দ্র শবরীর এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। শবরীর দেহে রোমাঞ্চাদি অষ্টবিধ সাত্বিক ভাব প্রকাশ পাইল। এই প্রেমাবেশ দর্শনে প্রবল বেগে প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

শবরী সেই উচ্ছিষ্ট ফলমূল শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। ভক্ত মৃৎ পাত্রে জল আনিলেন এবং পত্রাসন রচনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বসিতে দিলেন। রামচন্দ্র সেই ফলে অমৃতের সাধ প্রাপ্ত হইলেন। এমন উপাদেয় বস্তু বোধ হয় কখনও ভক্ষণ করেন নাই। তখন অপ্সরাগণ বিমানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির নিক্বণে সেই বন প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; এবং গগন হইতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দয়াল হরির একি ব্যবহার! হায়! চণ্ডালিনীকে এত সমাদর, এত ভক্তি!!

রামচন্দ্র নদীর তীরে গমন করিলেন, দেখিলেন, স্রোতস্বতীর বারি শোণিতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। কৃমি কীট সলিলে অবাধে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ কেন হইল, নির্ম্মল জল রক্তময় হইবার কারণ কি? মুনিগণ বলিলেন, অকস্মাৎ এইরূপ হইয়াছে। তিনি সকলই জানিতেন, বলিলেন, "শবরীকে অবহেলা করায় এইরূপ হইয়াছে। শবরীর পদতল জলে স্পর্শ করাইলে জল নির্ম্মল হইবে।" তাপসেরা তখন শবরীকে ধরিয়া নদীতে অবতরণ করাইলেন। নদী জল তখনই নির্ম্মল হইল। কৃমি কীট অন্তর্হিত হইল। তদবধি সেই স্থান এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। প্রভুর ইচ্ছায় শবরী বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন।

ভারত-রমণী সেবা ব্রতে ব্রতী হইলে ভবার্ণব তরিবার ভেলা অনায়াসে লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ইহকাল পরকাল উভয় কালের কাজ হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। মানব-সেবা ভগবানে পৌঁছে,

একথা অতি সত্য। সেবা রূপ মহাব্রতে নর নারী সকলেরই এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। পাত্রাপাত্র, দেশ কাল ভেদ না করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইলে সেই ভবার্ণবের কর্ণধার ভগবান আমাদের সহায় হইবেন।

অধুনা ইয়ুরোপে মহিলাগণ অবিবাহিত থাকিয়া দেশ দেশান্তর গমনান্তর রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষায় মন প্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। বঙ্গমহিলাদিগের নিকট হইতে সেই রূপ সেবা ব্রত আকাঙ্ক্ষা করার সময় আজও আইসে নাই। কিন্তু তাঁহারা স্বস্ব প্রতিবেশীমণ্ডলী মধ্যে সেবাব্রতে ব্রতী হইতে পারেন, তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। বঙ্গে বালবিধবার অভাব নাই। তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম না থাকায়, সময় অলস ভাবে কর্ত্তন করিতে হয় এবং আলস্য যে অনেক সময় অসৎ চিন্তা প্রভৃতির জনক, তাহাও বোধ হয় স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। অলসতা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহারা সেবা কার্য্যে মন প্রাণ উৎসর্গ করিলে ইহকাল আনন্দে কর্ত্তন এবং পুণ্য অর্জ্জন করিয়া পরকালে আপনাদের পথ সুপ্রশস্ত করিতে পারিবেন। বনবাসিনী চণ্ডাল-কন্যা শবরীর আখ্যান চিন্তা করিলে ভগিনীগণ বুঝিতে পারিবেন যে,সেবাব্রতের পন্থা অতি প্রশস্ত এবং সহজসাধ্য। জগজ্জননী দয়া করিয়া আমাদের ভগিনী এবং জননীদিগকে সুমতি প্রদান করুন।

যাঁহার অর্থ আছে, তিনি অর্থদানে, যাঁহার অর্থ নাই, তিনি শারীরিক পরিশ্রমে, এবং যে ব্যক্তি তাহাতেও অক্ষম, তিনি অশ্রুজল দ্বারাও মানবের উপকার সাধন করিতে পারেন। ভীষণ দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, ইহা কয়জন ভাবিয়া থাকেন? ভাবিলে বা কয়জন প্রতীকার করিতে সচেষ্ট? যদি পরস্পর সকলেই আমরা সেবা-ব্রত গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই মানবমণ্ডলীর ভয়ানক শত্রু অনেক পরিমাণে দমন থাকিবে।

আইস দেবি! আইস এই মর্ত্ত্যধামে, এই জরাজীর্ণ তাপদগ্ধ মর্ত্ত্য ধামে আগমন কর। তোমায় আমরা আর একবার প্রাণ ভরিয়া দর্শন করি। দারিদ্র্য দুঃখ-পূর্ণ অশ্রুপ্লাবিত ভারতে কি পুনরায় তোমার শুভাগমন হইবে? আবার কি তুমি এই লোকালয়ে মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে তোমার দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখাইবে? আবার কি আমরা দেবতা জ্ঞানে ভক্তদিগকে পূজা করিতে শিখিব? আবার কি ভক্তের আবির্ভাবে ধরাধাম পবিত্র হইবে? ভগবানই জানেন! শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

হেমচন্দ্র শ্মশানে।

তোল তোল তোল শব,—
একি একি মৃদু নাদে,
বিনায়ে করুণ-ছাঁদে,
বলিতেছ হরি বোল রব?
এ শব কাহার শব জেনেছ কি মনে?
বুঝেছ দহিতে আজি এসেছ কি ধনে?
এ নয় মরার মড়া ভীরু অনার্য্যের,
এ মড়া বীরের মড়া পবিত্র আর্য্যের
বীর উন্মাদনা তানে
প্রতাপের বীর প্রাণে
বরষিত অগ্নি কণা যে কবির দল,
প্রবাহিত ধমনীতে তরল অনল;

যাহাদের উদ্দীপনে,
জ্বলিত জড়ের মনে
সিন্ধু শোষী ভয়ঙ্কর বাড়ব অনল,
গিরি দ্রুম বিদারণ ভীম দাবানল ;—
অন্তঃসারে তাঁহাদের
যে মহান মানবের
বিরচিত অন্তঃস্থল পবিত্র উজ্জ্বল,—
হোমানল বাল্মীকির
দ্বৈপায়ন তপস্বীর
জ্বলিত যা পুণ্যাশ্রমে পূর্ব্বে বহুদিন.
আলোকিয়া ধীরোদাত্ত ভারত প্রাচীন,—
নির্ব্বাপিত প্রায় সেই অঙ্গার মলিন—
করিতে উদ্দীপ্ত ভারতে আবার,
যেজন তাহায় দিলেন ফুৎকার,
ভস্ম আবরণ সরায়ে যতনে—
পবিত্র হোমাগ্নি মাতৃ আরাধনে,
হৃদয় মন্দিরে রাখিল জ্বালিয়া,
অশ্রু হবির্ধারা সঘনে ঢালিয়া ;—
তাঁহারি পবিত্র শব নেহার নয়নে,
আহা কি প্রশান্ত ভাব নিদ্রিত বদনে!
কাঁদিয়া বিনায়ে বঙ্গ গুন্ গুন্ স্বনে,
ইষতুষ্ণ অশ্রুধারা বহায়ে বদনে
তুলোনা বীরের শব ;—
ত্রিংশ কোটী আর্য্যবর
পার যদি তুলিবারে কাঁপায়ে গগন,
পার যদি কাঁদিবারে বিরাট ক্রন্দন,
ষষ্ঠী কোটী অশ্রুধারে প্রকাণ্ড প্লাবনে
পার যদি ভাসাইতে ভারত ভুবনে,
মহা হরিনাম বোল
শোক ইরম্মদ রোল
বিন্ধ্যাদ্রি শিখর হতে কাঞ্চন জঙ্ঘায়,
পার যদি ছুটাইতে অন্তর্বেদনায় ;
তোল তবে ওই শব
পবিত্র আর্য্যের ;
নতুবা করোনা স্পর্শ
স্পর্শে অনার্য্যের !
যাও দূরে সরে যাও—হে বঙ্গ তোমার
ও শব স্পর্শনে নাহি কোন অধিকার !
ভবিষ্য ভারতে যারা হবে অবতার,
ফেলিবে তোমার তরে দীপ্ত অশ্রুধার,
তাহাদের পরমাত্মা
পবিত্র স্বাধীন চেতা,
পূর্ব্ব হতে সৃষ্ট যদি থাক কোন থানে,
বিশাল এ ব্রহ্মাণ্ডের কোন দীপ্ত স্থানে ;
প্রজ্জ্বলিত প্রভাকরে,
সমুজ্জ্বল শশধরে,
কিম্বা সে দ্যুলোকে দূর দীপ্ত ছায়াপথে—
ভ্রম যদি আত্মাকুল তারা রশ্মি রথে,
কিম্বা বিশ্ব বিরাটের
মহা পান্থ অনন্তের,
ধূমকেতু পুচ্ছ পরে বস যদি সবে ;—
ত্বরায় নামিয়া এস এ ভারতে তবে !
লক্ষৈক তারকা মত খসি একত্তরে,
আঁকিয়া জ্যোতির রেখা নীলাকাশ স্তরে,
এস শূন্য আলো করি—
তোল সবে ধরাধরি
হেমচন্দ্র-শব !
ভবিষ্যত্ কোটী কোটী ভারতবাসীর
আত্মার সে হাহাকার—শোক পয়োধির
সহ ঘোর ঘনচ্ছ্বাস,
বিদীর্ণ প্রাণের ভাষ,
তোল সবে ধরাধরি
হেমচন্দ্র-শব !
বলি উচ্চে হরি হরি—
শোয়াও চিতার পরি,
হেমচন্দ্র-শব !

ধূধূ্ ধূধূ্ জ্বল চিতা—
দগ্ধ করি ভারতের বুক !
ধূধূ্ ধূধূ্ জ্বল চিতা—
ভস্ম করি ভারতের সুখ !
জ্বলেছিলে যথা তুমি
জ্বালাইয়া আর্য্যভূমি,
বীরের শ্মশান ঘোরে
কুরুক্ষেত্রে হুহুঙ্কারে,
লক্ষ সান্ধ্য রবি বর্ণে
দগ্ধ করি দ্রোণ কর্ণে,
ভস্ম করি অভিমন্যু
মহাবীর ভীষ্ম তনু,
তেমতি রে জ্বল চিতা জ্বল আরবার—
জ্বালাইতে বীর কবি দীন বাঙ্গালার !
ঢাল ঢাল হুতাশন হেমচন্দ্র মুখে,
হান হান দীপ্ত শূল ভারতের বুকে !

চিতারূপী মহাকাল,
ভ্রূকুটী ভঙ্গে করাল,
হান হান শিখা শূল জননীর বুকে !
জ্বল জ্বল চিতানল ভারতের বুকে !
দগ্ধ করি বীর কবি
ভস্ম করি হেম ছবি !
জ্বল জ্বল চিতানল
ভস্মি হৃদয়ের বল—
জ্বলেছিলে যথা তুমি কুরুক্ষেত্র বুকে !

জ্বলিলে জ্বালালে যদি ভারতের সার—
জ্বল আরো মহাতেজে মিনতি আমার !
ধর ধর মহারুদ্র মূরতি সংহার
বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত কর ভারত সংসার !
চতুর্দ্দিকে জ্বেলে দাও ভারত প্রাকার
করুক হিমাদ্রি বিন্ধ্য অনল উদ্গার !
দ্রবীভূত ধাতুস্রাব গঙ্গা যমুনায়
সিন্ধু গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র নর্ম্মদায়,
হ'ক প্রবাহিত
ধূম উচ্ছ্বসিত !
বিকাশিয়া ধক্ ধক্ দশন অঙ্গার,
অট্ট অট্ট হেসে ওঠ কাল অবতার।
জ্বলিলে জ্বালালে যদি ভারতের সার—
আস্ফালি প্রলয় শূল হাঁকরে সংহার,
তাণ্ডবে ভারতবর্ষ কর চূরমার !
হর হর ব্যোম ব্যোম সংহার সংহার,
প্রেত ভূত রুদ্র দূত করুক চীৎকার !
চির অবসাদময়,
বুভুক্ষার প্রেতালয়,
লণ্ড ভণ্ড করে ফেল ভেবনাক আর
জ্বলিলে জ্বালালে যদি ভারতের সার !
সিন্ধুরে ডাকিয়া দিয়া যেও হে সংহার !
প্রলয়ের সে অঙ্গার
ধুয়ে দেবে পারাবার,
পড়ে রবে এ ভারত প্রকাণ্ড শ্মশান,
কৃতান্তের রঙ্গভূমি কালের নিশান !

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শকুন্তলার উপদেশ

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, লোকদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শনের জন্যই কাব্যের প্রণয়ন। ফলতঃ কাব্য অতি সুললিত ভাষায়, জগতের সু এবং কু, এই উভয় দিক অঙ্কিত করিয়া লোক-সমাজে উপস্থিত করে। এই জগৎ অতীব বিচিত্র, ভেদ-সঙ্কুল। আকার-ভেদ, রুচি-ভেদ, অবস্থা-ভেদ, প্রভৃতি অনন্ত ভেদে জগৎ পরিপূর্ণ। সাধু, অসাধু, পাপী, পুণ্যবান প্রভৃতি অনন্ত প্রকার লোক লইয়া সমাজ। সমাজে অনন্ত প্রকার লোকের কার্য্য এবং সেই কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফলও অনন্ত। অনন্ত বিচিত্রতা-পূর্ণ জগতের কার্য্য এবং তাহার পরিণাম-ফল প্রতিফলিত রূপে প্রদর্শন করাই কাব্যের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য।

কাব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; শ্রব্য এবং দৃশ্য কাব্য। নিজে পাঠ করিয়া অথবা লোকের মুখে শুনিয়া যাহার অর্থ অবগত হইতে পারা যায়, তাহা শ্রব্য কাব্য ; যথা, রঘুবংশ। আর যাহার অর্থ কেবল মাত্র পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, অর্থাবগতির জন্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অঙ্গ চালনাদির দর্শন আবশ্যক হয়, তাহা দৃশ্য কাব্য। যথা, শকুন্তলা। দৃশ্যকাব্যের অন্য নাম অভিনেয়। অভিনয় অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তির দ্বারা ইহার মূল ঘটনা প্রদর্শিত হয়, এই জন্যই দৃশ্য কাব্য অভিনেয় এই অভিধানে অভিহিত হইয়া থাকে।

দৃশ্য কাব্যকে আমরা চলিত কথায় নাটক নাম দিয়া থাকি। যে কোনও বিষয় অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই

আমরা নাটক বলি। পাশ্চাত্য কবি সেক্ষপিয়রের রচিত দৃশ্যকাব্যগুলি আমাদের নিকট নাটক, সংস্কৃত শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটক, আবার বর্ত্তমান থিয়েটারওয়ালারা যে সমুদয় অভিনয় করে, সেগুলিও নাটক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অভিনয় মাত্রই নাটক আখ্যা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় নাটকের বিশেষ কয়েকটী লক্ষণ বর্ণিত আছে, সেই লক্ষণযুক্ত না হইলে কোনও অভিনয় নাটক নাম প্রাপ্ত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ, নাটক কোনও ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইবে। নাটকের লিখিত বিষয় যে কোনও ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, নাটকের নায়ক কোনও প্রখ্যাত বংশীয় ধীরোদাত্ত লক্ষণাক্রান্ত রাজর্ষি হইবেন। যে কোনও ব্যক্তি নাটকের নায়ক হইতে পারে না। "তুমি আমি", "রামা শ্যামা"র ন্যায় ব্যক্তি নাটকের নায়ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, নাটকে শৃঙ্গার অথবা বীর রস প্রধান থাকিবে, অন্য রস সমুদয় তাহার অঙ্গ স্বরূপ কার্য্য করিবে। চতুর্থতঃ, নাটকে পাঁচ হইতে দশ সংখ্যক অঙ্ক থাকিবে। এই নিয়মানুসারে অনেক দৃশ্যকাব্যই নাটক নামের যোগ্যতা প্রাপ্তিতে বঞ্চিত। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি অভিনয় প্রকরণ মাত্র, নাটক নহে। বর্ত্তমান থিয়েটারে অভিনীত বিষয়গুলির অনেকই অভিনয় প্রকরণ অথবা প্রহসন মাত্র।

অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রকৃত পক্ষে নাটক। ইহার নায়ক হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দুষ্যন্ত। মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনীর মুখ হইতে এই নাটক বিনিঃসৃত। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এবং পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে যে শকুন্তলা-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তদবলম্বনে কবি এই নাটক রচনা করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে, পদ্মপুরাণে বর্ণিত শকুন্তলা-বৃত্তান্ত অবলম্বনে কালিদাস এই নাটক রচনা করেন নাই; পরন্তু কালিদাসের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতেই পদ্মপুরাণের শকুন্তলা-বৃত্তান্তের অভ্যুদয় হইয়াছে। যাহা হউক, কালিদাস যে কোনও ঘটনাবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করুন না কেন, তিনি যে মূল ঘটনায় এক অদ্ভুত কৌশল এবং অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলে মহাকবি কালিদাসের চমৎকারিণী রচনা শক্তি এবং কল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাব্য জগতের বিচিত্রতা চিত্রিত করিয়া জনসমাজে উপস্থিত করে। শ্রব্য কাব্যের দ্বারা এই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না বলিয়াই দৃশ্য কাব্যের প্রয়োজন এবং অভ্যুদয়। দৃশ্যকাব্য শারীরিক, মানসিক, বাচিক, এবং বৈশিক, এই চারি বিভাগে সমাজের কার্য্য এবং তাহার ফল চিত্রিত করে। দৃশ্যকাব্যের এই চতুর্বিভাগীয় অভিনয় দর্শনে জন সমাজের কি বিশিষ্ট উপকার সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না। ইংরাজীতে চলিত কথায় বলিয়া থাকে, "Example is better than precepts" উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল। বাস্তবিক, কোনও কার্য্যের ফলাফল-লাভ স্বচক্ষে দর্শন করাই সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কোনও

প্রকাশিত সদ্‌গ্রন্থের সমালোচনা সহকারে পাঠ অতি বিরল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের যেরূপ সমালোচনা করিয়া পাঠ করেন, আমাদের দেশে সেরূপ প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান সমাজে অনেকে ঐ প্রথা অবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্তু পুরাতন নাটকাদির প্রকৃত সমালোচনা এখনও বাহির হইতেছে না। নাটকে সমাজের নানা বিচিত্রতা অঙ্কিত থাকে বটে, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ সহকারে সেগুলি বাহির করিয়া প্রণিধান করিতে না পারিলে পুস্তকে এবং অভিনয়েই পর্য্যবসিত থাকিয়া যায়। পুস্তক পাঠে এবং অভিনয় দর্শনে যদি তাহার সারগর্ভ উপদেশের ভাগ উদ্ধার করিতে পারা না যায়, তবে সে পাঠ এবং সে অভিনয় দর্শন বৃথা।

অস্মদ্দেশীয় নাটকাদির প্রকৃত সমালোচনা প্রকাশিত না হইলেও, সৌভাগ্যক্রমে কোনও সমালোচক অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক বিশেষ সমালোচনার সহিত পাঠ করিয়া ইহা হইতে কয়েকটী শিক্ষণীয় বিষয় সাধারণ লোক সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে পঠিত না হইলে জন সমাজে সৎ-গ্রন্থেরও বিশেষরূপ আদর হয় না। সৎগ্রন্থ বিশেষ সমালোচনার সহিত পঠিত হইলে তাহার শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ লোকের সম্মুখে সহজে প্রতিভাত হয় এবং এইরূপে সেই পুস্তকের বিশিষ্ট আদর হইয়া থাকে। অন্যথা পুস্তক যতই ভাল হউক না কেন, যতই শিক্ষাপ্রদ হউক না কেন, ইহা লোকের মন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষা জীবনহীন। এই ভাষার পুস্তকাদির অভিনিবিষ্ট পাঠ তত আশা করা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু পুরাতন গ্রন্থ সমূহ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পঠিত হইলে সে গুলি যে আমাদের জ্ঞান বিস্তারের পথে সমধিক সহায় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় উত্তেজিত হইয়া সংস্কৃত ভাষাকে নিতান্ত অপদার্থ অস্পষ্ট ভাষা বলিয়া জ্ঞান করি। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই জ্ঞানে সংস্কৃত ভাষাকে অতি তুচ্ছ মনে করি। সংস্কৃত ভাষা দ্বারা রাজ কার্য্যাদিতে কোনও ফল প্রাপ্তি না ঘটিতে পারে, কিন্তু এই ভাষার আলোচনা যে জ্ঞান-মার্গের একটী প্রধান সহায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমুলর একস্থলে বলিয়াছেন—“There are chronicles below her; there are sermons in every word.” যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা মৃত অথবা জীবিত হউক, পুরাতন মহাকবিদিগের কাব্যাদি-প্রদত্ত উপদেশ সমুদয় যে আমাদের বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রোক্ত সমালোচক যে সমুদয় শিক্ষণীয় বিষয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সে গুলি এই,— প্রথমতঃ, শকুন্তলা নাটক এই শিক্ষা দিতেছে যে, সমাজের সুখ দুঃখ প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কার্য্যের উপর নির্ভর করে। সমাজের কোন লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোনও কার্য্য করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল সমাজকেই বহন করিতে হইবে। সমুদয় কার্য্যের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারের সহিত সমাজ সমধিক সম্বন্ধ। বিবাহ ব্যাপারটী কেবল মাত্র সেই বিবাহিত দম্পতির সুখ দুঃখের হেতু নহে, অধিকন্তু এই ব্যাপার

সমাজের সুখ দুঃখেরও হেতু। দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরিণয় ব্যাপার এই শিক্ষা প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ, দাম্পত্য প্রেমকে এরূপে বর্দ্ধিত করিতে হইবে যে, সে প্রেম সামাজিক প্রেমকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিতে না পারে। দাম্পত্য প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া দম্পতি, সামাজিক প্রেম বিস্মৃত হইলে, দাম্পত্য প্রেম পরিণামে বিষময় ফল আনয়ন করে। শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। তৃতীয়তঃ,বিবাহ কার্য্য গোপনে সম্পন্ন না হইয়া যথাসম্ভব লোক সম্মুখে সম্পন্ন হইবে। চতুর্থতঃ, লোক যতই শিক্ষিত, জ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে, সে লোকের পতন নিশ্চিত। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র লোকের জ্ঞান অতি উচ্চ হইলেও, তাহাকে পতনের পথ হইতে তুলিতে পারে না।

অভিজ্ঞানশকুন্তল বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের বিরোধী উপদেশ এবং শিক্ষা দিতেছে। বেদান্তের শিক্ষা এই যে, এই বিশ্ব কিছুই নহে, ইহা ব্রহ্মের ছায়া মাত্র। জীবাত্মাকে এই ছায়াবাজীবং প্রকৃতি অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু কালিদাস উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, প্রকৃতি ছায়া নহে, ইহাও পুরুষের ন্যায় সত্য; পুরুষ প্রকৃতি চ্যুত হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। পুরুষ এবং প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

মান—অপমান।

তুমি দিয়াছিলে মান তুমি নিলে ফিরে—
আমার কি ক্ষোভ তাহে আছে গো জননি ?
তোমার এ রঙ্গভূমে যা সাজাবে মোরে
অম্লান বদনে তাই সাজিব তখনি।

আজনম রব রাজা হব না ভিখারী—
একি অপরূপ সাধ ! একি আবদার !
তুমি যার কেনা দাসী এ দাবী তাহারি,
আমি কে যে হেন সাধ খাটিবে আমার ?

সব হবে সেনাপতি কেহ নহে সেনা,
তোমার জগতে নহে এমন নিয়ম—
তোমার কথায় কথা আমার সহেনা—
আবদার দেখে মোর উপজে সরম।

তাইত তোমার পায় দিয়াছি অঞ্জলি,
আমার যা-কিছু আছে মান অপমান—
যা করাবে হাসিমুখে করিব সকলি—
কখনো সাজিব রাম কভু হনুমান।

শ্রীবিজয়কুমার সেন।

অদৃষ্ট

কোন্ গগনের তলে কোন্ মরু মাঝে
এ জীবন হ'য়ে যাবে শেষ ?
কোন্ পথে যেতে হবে পথিকের সাজে,
যেতে হবে কোন্ দূর দেশ ?
শ্রান্ত অবসন্ন দেহে, কার মুখ চাহি,
কার দ্বারে হইব অতিথি ?
নিরাশার অশ্রু রাশি—দুখে অবগাহি
কে মোর মুছাবে নিতি নিতি ?
অদৃষ্টের অন্ধলিপি খুঁজিয়া খুঁজিয়া
যদি পাই একতিল আশা ;
কেমনে বুঝিব এল কোন দিক দিয়া
কোথা হ'তে কার ভালবাসা।
সারা পথ চলি শেষে তপ্ত মরু মাঝে
যদি পাই বিন্দু বারিকণা ;
কার পানে চাহি যা'ব সাঙ্গ করি কাজে
ভুলি মোর সকল যাতনা ?

শ্রীসর্ব্বানন্দ।

সাধনা।

(১)
কত সুখ দিতে চাহ তুমি আর,
সুখের যা কিছু দিয়েছ,
একে একে, প্রভো, তোমার মানবে
সুখের পুতলি গড়েছ!

(২)
বাসনা পূরিতে প্রণয় দিয়েছ,
পিয়াসা পূরিতে মাধুরী,
যাতনার কথা শুনিতে রেখেছ
তোমা—তব স্নেহলহরী!

(৩)
চাঁদের জ্যোছনা দিয়েছ স্বামিন্,
আকাশ ভরিয়া তারকা,
জুড়াতে অবশ পরাণ রেখেছ
কাননে কুসুম মালিকা!

(৪)
মলয়ার বায় গড়িয়া রেখেছ
মানবে ব্যজন করিতে,
কোকিলার তানে অমিয় স'পেছ
মানবের কাণে ঢালিতে!

(৫)
তোমারি তপন নিতি নিতি উঠি
সুখের আলোক বরিষে,
তোমারি কৃপায় লভি নব সুখ
নিতি নিতি আছি হরিষে!

(৬)
সুখে থাকিবারে ভাই বোন মাতা
সকলি দিয়েছ গড়িয়া,
তোমারি জগতে আছি সুখে, নাথ,
তোমারি আশীষ লভিয়া!

(৭)
উষার আলোকে প্রশান্ত গভীর
তোমার মূরতি ফুটিছে,
পিক কলকণ্ঠে তোমাতে মিশাতে
তোমারি মহিমা গাইছে!

(৮)
জগতের নাথ! জগতের পিতা!
তোমাতে হইতে লগনা,
মোর গানে দাও সে মধুর স্বর,
সে লহরী, সেই সাধনা!'

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

যাও কবিবর!

(মহাকবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে)

স্বার্থপর আত্মগর্ব্বী পতিত ভারতে
কাজ নেই থেকে আর,—যাও কবিবর!
যাও দ্রুত শূন্যভেদি' দূর পুণ্য পথে,
ব্যাস, দত্ত আদি যথা মিণ্টন, পিণ্ডার!
কি কাজ রহিয়া হেথা তোমার সুধীর!
কি কর্ম্ম সাধিবে বল পরাধীন দেশে?
"চির-ম্লেচ্ছ-পদানত" ক্রোরপতি বীর
অস্ত্র ত্যজি তোষামোদী শিখিয়াছে শেষে!
তোমার ভেরীর রব, বীণার ঝঙ্কার,
সঙ্গীতের উন্মাদক ক্ষমতা মহান্
পারেনি' জাগাতে নিদ্রা হীন ভারতের,—
বধির শ্রবণে তান পশেনি' এখন!

দারুণ সংসার চক্রে ভ্রমিয়া অশেষ,
সুখ-শৃঙ্গ হ'তে শেষে পড়িলে সাগরে!
করিয়া গ্রহণ হায়! দীন হীন বেশ
গিয়াছিলে ভিক্ষা-আশে রাজার দুয়ারে!
কে খণ্ডাবে কার সাধ্য নির্ব্বন্ধ বিধির?
দারুণ বন্ধন বল কে পারে নাশিতে?
দীন অন্ধ হ'য়ে শেষ, ভিক্ষা পৃথিবীর
হইল সহায় তব জীবন রক্ষিতে!
বঙ্গীয় ব্রিটন-সেবী মহা ধনবান
বিচলিত তব দৈন্যে হয়নি' যাহারা,
আজি সবে স্মৃতি সভা করিছে স্থাপন,
আড়ম্বরে তোমা' লাগি' কাঁদিছে তাহারা!

বাঙ্গালীর চিররীতি কি না জান দেব ?
তোমার অজ্ঞাত নয় বঙ্গীয় ব্যাভার !
জীবিতের তোষামোদ থাকিলে বিভব,—
দেবত্ব, পশুত্ব তার করে না বিচার ।
ভুলিয়াছে বঙ্গদেশ গুণীর সম্মান !
ভুলিয়াছে বঙ্গ কেন এ ভারতভূমি !
শিখেছে করিতে বৈরি-পাদুকা বহন,
"গোলামের জাতি সব শিখেছে গোলামি !"
স্বার্থপর, আত্মগর্ব্বী পতিত ভারতে
কাজ নেই থেকে আর, যাও কবিবর !
যাও দ্রুত শূন্যভেদি' দূর পুণ্য পথে,—
বঙ্কিম, ঈশ্বর যথা বাল্মীকি হোমার !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় ।

ভিখারী ।

দর্প গর্ব্ব অভিমান ফেলিয়াছি দূরে,
বিরাট দীনতা আজ উঠেছে জাগিয়া ;—
কলঙ্কের বিন্দু এক অনন্ত সাগরে,
অভিমান গর্ব্ব তার কিসের লাগিয়া ?
কাতর নয়নে আজ, হে দীন ভিখারি,
সঙ্কোচে অভয়ে আর যেয়োনাকো সরে,
ঘৃণায় ফিরাত আঁখি যে তোমারে হেরি,
সেই ডাকে আজ মুক্ত আলিঙ্গন তরে ।
শত গ্রন্থি-বিজড়িত ক্ষীণ তনু মাঝে
লুক্কায়িত শুধু ও যে শেফালির হাসি,
সুচিকণ শুভ্র বাসে ঢাকা শুধু এযে
অবিশ্বাস, দ্বেষ, হিংসা কলঙ্কের রাশি ;—
অনন্ত-নির্ভর তব বক্ষ আলিঙ্গিয়া
দীনতার পূর্ণ দীক্ষা লইব মাগিয়া ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

৬ । **তত্ত্ব-প্রসূন ।** শ্রীকৃষ্ণচরণ তত্ত্বনিধি প্রণীত, মূল্য ॥০ । আত্মতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, সমন্বয়, একমেবাদ্বিতীয়ম, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরকাল, জীবতত্ত্ব, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, মুক্তিবাদ, যোগ, আর্যতত্ত্ব ও ওম্, এই কয়েকটী বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থকার একজন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, এই গ্রন্থ পড়িয়া তাহা বুঝিলাম । গ্রন্থকারের বাঙ্গালা লিখিবার সুন্দর ক্ষমতা আছে । পুস্তক খানি মোটের উপর বেশ হইয়াছে ।

৭ । Annual Report of the Raj-Kumari Leper Asylum for the year 1903. আমরা এই রিপোর্ট খানি পড়িয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম । ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ৩০ জন রোগী ছিল, গত বৎসর ২৯ জন নূতন ভর্ত্তি হয় । ১১ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ৫ জন কতক আরোগ্য হইয়া আশ্রম পরিত্যাগ করে, ১ জনের মৃত্যু হয় । বর্ত্তমান সম্পাদক বাবু বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় এই আশ্রমের দিন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইতেছি । ৺ রাজনারায়ণ বসু এবং বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ইহা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ।

৮ । Report of the Chaitannya Library. সম্পাদক বাবু গৌরহরি সেনের যত্নে এই লাইব্রেরির দিন দিন উন্নতি হইতেছে । লাইব্রেরির সভ্য সংখ্যা ৩৫৯ জন, পুস্তক সংখ্যা ৫৪১৭, বাঙ্গলা ৩৩৬১, ইংরাজি ২০৫৬ । ১৯০০ বর্ষে—১২৯১৯ পুস্তক, ১৯০১ বর্ষে—১৪৭৬৩ এবং ১৯০২ বর্ষে ১২১২১ পুস্তক পঠিত হইয়াছে । ১৯০২ বর্ষের আয়—৫৪১৮৲, ব্যয় ১৩৮৬৶১০ ।

৯ । **প্রদক্ষিণ ।** শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ১৲ । এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে বারাণসী, কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্র নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, কতক ভারতীতে, আর কিছু নবজীবনে ও দাসী ও সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৮ বৎসরে ৪ বারে গ্রন্থকার ভ্রমণ শেষ করেন । অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ভাষা প্রাঞ্জল ।

১০ । **দশ-অবতার-কাব্য ।** শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ।৵০ ।

নামেতেই পুস্তকের ভাব ব্যক্ত। লেখা মন্দ নয়, তবে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষত্ব নাই।

১১। রাধিকা। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲। অভিসার হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ময়ত্বে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। সকলই রাধিকার উক্তি। লেখকের কবিতা লিখিবার বেশ ক্ষমতা আছে। অনুশীলন করিলে কালে ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

১২। সহমরণ। শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত, মূল্য ১৲। তৃতীয় সংস্করণ। এই উপন্যাসের ভূমিকায় আছে—"এক সময়ে এই পথে সতীত্ব-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া ভারত স্বর্গ প্রকাশিত করিয়াছিল। আমরা হিন্দু—রমণীদিগকে আবার সেই প্রাচীন চির-সরস পথে লইয়া যাইব। ইহাতেই আমাদের জাতীয় উত্থান হইবে, অন্য পথে হইবে না।" সত্য বাবু একজন ধর্ম্ম-প্রচারক। পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম প্রচার—ভূমিকাতেই তাহা সরল ভাবে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। কথাটা না লিখিলেই ভাল হইত। উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রাখাই ভাল। প্রচারকের কাজ খাটিয়া যাওয়া, ফলাফল বিধাতার হাতে। আবার পূর্ব্বের অবস্থা আসিবে, ইহা কবির কল্পনা; দর্শন বিজ্ঞান ইহার বিরোধী। আশার স্বপ্নে এরূপ প্রতারিত হওয়া প্রচারকের পক্ষে ভাল নয়। সত্য বাবুকে সম্মান করি; তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, কামনা করি; তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হউক, প্রার্থনা করি। তাঁহার উপরোক্ত মতের সহিত এক হইতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত।

সত্য বাবু একজন সামান্য লেখক নহেন, তাঁহার লেখা সরস এবং সরল; তিনি সুশিক্ষিত। কাদম্বিনীর চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে।

১৩। শঙ্করাচার্য্য-চরিত। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১।০। শঙ্করাচার্য্যের একখানি সুন্দরচিত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রামাণ্য প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে; ছবিতে প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

শাস্ত্রী মহাশয় এই মহৎ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। তিনি একজন দরিদ্র ব্যক্তি। এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যে যত্ন, চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় হয়, এদেশে তাহার প্রতিদানের আশা নাই। তবুও পণ্ডিত মহাশয় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুদিনের চেষ্টায় তাহার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয়ে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। এই রূপে চেষ্টা না করিলে কি কখনও এ দেশের এবং বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে?

আমরা অতি মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। মহাত্মা শঙ্করের অলৌকিক শক্তির পরিচয়ে যেমন মোহিত হইয়াছি, তৎ সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থকারের জ্ঞানপিপাসা, অনুসন্ধিৎসা এবং সহৃদয়তার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাষায়, সুন্দর ভাবে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা আশা করি, যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই মোহিত হইবেন।

গ্রন্থকার একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন, এই রূপ পুস্তকের এ দেশে আদর হয় না। শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। যদি তাহা সত্য হয়, তবে এদেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত। আমরা আশা-হীন নহি। আমরা আশা করিতেছি, এই গ্রন্থ এদেশের ঘরে ঘরে আদৃত হইবে।

সমাজ ও তাহার আদর্শ।(৩)

সমাজের সহিত মানুষের সম্বন্ধ,—সমাজ মানুষ
গড়িয়া লয়,—এ কথার আপত্য—ও মীমাংসা।

১২। ব্যক্তিমানবের সহিত সমাজের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে সমাজান্তর্গত ব্যক্তিচৈতন্যের সমষ্টি হইতে সমাজচৈতন্য পৃথক্, মানুষ পরস্পর মিলিয়া যুক্তি করিয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সমাজ সৃষ্টি করে না, একথা আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিব। মানুষের সহিত সমাজের সম্বন্ধ আলোচনা করিবার প্রথমেই আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ সমাজ গড়ে না, সমাজই মানুষ গড়িয়া লয়, সমাজের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। সমাজ না থাকিলে মানুষ পশুত্ব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিত না। সমাজের প্রথম সৃষ্টিতে মানুষের কতদূর কর্তৃত্ব ছিল, তাহা আমরা স্থির জানি না। জ্ঞান বা অনুমানের দ্বারা বিচার করিয়া সে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার এ স্থলে প্রয়োজন নাই। তবে চুক্তিমূলে যে সমাজ সৃষ্টি হইতে পারে না, সমাজের মূল যে চুক্তি নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এক্ষণে মানুষের সহিত সমাজের যে সম্বন্ধ স্থির বুঝিতে পারি, তাহারই কথা বলিতেছি। মানুষ এখন সমাজ মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। সমাজের দ্বারাই মানুষ লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। সমাজ মানুষকে যেরূপ শিক্ষা দেয়, মানুষ সেইরূপেই শিক্ষিত হয়। তাহার পরে মানুষ বড় হইয়া, নিজের জ্ঞান ও শক্তি বলে, কখন কখন সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নত কি অবনত, কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বটে, কিন্তু সে সমাজ গড়িয়া লইতে পারে না। সংসারে সর্ব্বত্রই ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ম। সুতরাং সমাজ মানুষের উপর যেরূপ ক্রিয়া করে, মানুষকে যেরূপে সংগঠিত করে, সেইরূপ মানুষও সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া করে,—সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু এস্থলে, সে প্রতিক্রিয়ার কথা, মানুষ কিরূপে সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহার কথা আলোচ্য নহে। সমাজ কিরূপে মানুষ গড়িয়া লয়, সমাজ কিরূপে মানুষকে মানুষ করে, সমাজে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহাই এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে, ইহার সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে, এ সম্বন্ধে যে সকল আপত্য হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব, তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। এজন্য অনেক অবান্তর বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন, ও অনেক কূট দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। আশা করি, ইহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণের ধৈর্যাচ্যুতি হইবে না।

১৩। সমাজ বা বাহ্যপ্রকৃতি মানুষকে যে কোনরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, ইহা কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করেন না। ইঁহাদের কথা সত্য হইলে, মানবশিশু যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেই শক্তিবলেই তাহার বিকাশ

ও পরিণতি হয়, তাহার বিকাশের জন্য সে বাহ্যশক্তি বা অনুকূল কি প্রতিকূল কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না, মানবশিশুর উপর বাহ্যবিষয়ের কোন কর্তৃত্ব নাই, সমাজ যাহাই হউক, তাহা মানুষের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, সমাজ মানুষ গড়িতে পারে না,—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে সকল ধর্ম্মে পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম স্বীকৃত হয় নাই, সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণের মতে, মানবমাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণেই মানবাত্মা জন্মগ্রহণ করে। তৎপূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্মগ্রহণ কালে সকল মানবাত্মাই একস্বভাব ও একধর্ম্মযুক্ত থাকে। তখন ইহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকে না। তাহার পর বিভিন্ন মাতৃগর্ভে, বিভিন্নরূপে পরিপুষ্ট হইবার সময় মানবশিশু মধ্যে বাহ্য বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পরে সংসারে বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের বিভিন্ন দিকে গতি হয় সত্য, কিন্তু তাহারা, তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাবলে বা স্বাধীন ইচ্ছা (free will) বশে, বাহ্যপ্রভাব অতিক্রম করিয়া, বাহ্য অবস্থাকে আয়ত্ত করিয়া, নিজের গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে পারে। ইহাই মানবাত্মার বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতে মানবাতিরিক্ত জীবের আত্মা নাই। কেবল মানুষেরই আত্মা আছে। আত্মা স্বাধীনস্বভাব। এজন্য মানুষ ইচ্ছা করিলে ভাল হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মন্দ হইতে পারে। এজন্য সে তাহার কৃত পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের জন্য দায়ী। এবং এজন্য, পরকালে তাহার পুণ্য বা পাপের ফলভোগ জন্য স্বর্গ বা নরকের ব্যবস্থা আছে।

১৪। ইহা ব্যতীত কোন কোন শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মানুষের উপর সমাজের বাহ্যবিষয়ের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইহার মধ্যে প্রধান কয়েক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের কথা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব। এই পণ্ডিতদের মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিকগণকে 'আমি-সর্ব্বস্ববাদী' বলা যাইতে পারে। ইহারা 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া জগৎ বুঝিতে চেষ্টা করেন, 'আমি' রূপ কষ্টি পাথরের দ্বারা অন্য তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষা করেন। ইহারা সকল তত্ত্বে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস-সাগরে ডুব দিয়া সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের আশ্রয় স্বরূপ 'আমি'কে বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিযুক্ত অহঙ্কারকে মহাসত্যরত্ন রূপে উদ্ধার করেন, (১) অথবা কোন সত্যরত্নই উদ্ধার করিতে পরেন না। ইহারা এই 'আমি'র বাহিরে গিয়া সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া—সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, এ কথা বলিতে পারেন না। এই 'আমি'-সর্ব্বস্ববাদের' ফলে পাশ্চাত্য দেশে আমিত্বের প্রসার বড় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আত্মাভিমান ফলে, ইঁহারা আপনাদিগকে সমাজের অঙ্গ মনে করেন না, বা সমাজ কর্তৃক মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। এই আত্মবাদের শেষ পরিণাম এক দিকে মায়াবাদ, আর এক দিকে জড়বাদ।

যাঁহারা মায়াবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, যাঁহারা এ জগৎকে মায়াময়, স্বপ্নময় বা

---

(১) বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের মূল—ফরাসি-পণ্ডিত দেঃ কার্তের, মহাবাক্য 'Cogito Ergo Sum' ইহা হইতে জ্ঞানক্রিয়ার বা চিন্তার আধার বা কর্ত্তা 'আমি'র অস্তিত্ব প্রথমে সিদ্ধ করিয়া, তাহার উপর অন্য তত্ত্বের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া তত্ত্বানুসন্ধানই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মূল লক্ষ্য।

কল্পনাজাত ও বাস্তবিক অসত্য, এইরূপ ধারণা করেন,দর্শনের ভাষায় যাঁহারা 'ইদং' কে 'অহং'প্রসূত, 'অহঙ্কারেই' 'ইদং' আরোপিত (১), অর্থাৎ আপনার জ্ঞানে অথবা কল্পনায় জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন, যাঁহারা ব্রহ্ম বা পরমপুরুষের জ্ঞানে ও শক্তিতে জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত না করিয়া, ব্যষ্টি সীমাবদ্ধ অজ্ঞানজড়িত মানবজ্ঞানে জগতের কাল্পনিক অস্তিত্ব ধারণা করেন, যাঁহারা অজ্ঞানকে বা মায়াকে, নিত্য অব্যয় ব্রহ্মরূপ আমাতে, জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাণ্ডিত্য-মূর্খতা পশুত্বদেবত্ব প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম্মের আরোপের কারণ মনে করেন, তাঁহারা মানবের বিকাশ ও পরিণতি স্বীকার করেন না, বা তাহার জন্য সমাজের কোন কর্ত্তৃত্ব আরোপ করেন না।

১৫। আর যাঁহারা জ্ঞানবাদী, জ্ঞানকে আত্মার স্বরূপ, জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মানবের জ্ঞানশক্তির ক্রমবিকাশ, এবং তাহাতে সমাজের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে জ্ঞান—এক অনন্ত অপৌরুষেয়, জ্ঞান—ব্রহ্ম। অথবা জ্ঞান চৈতন্য বা চিৎ—ব্রহ্মস্বরূপ। (২) মানবজ্ঞান তাহার নিজস্ব নহে, তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানের আংশিক অভিব্যক্তি বা প্রতিবিম্ব মাত্র। এই সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় আমাদের সামাজিক বৃত্তি বা সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান, সমাজের লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা উচিত, সেই ধর্ম্মজ্ঞানও আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। তাহা সমাজ হইতে আমরা লাভ করি না। তোমার জ্ঞান, আমার জ্ঞান, রামের জ্ঞান, শ্যামের জ্ঞান মূলতঃ এক—অখণ্ড। তবে সকলের জ্ঞানের অভিব্যক্তি সমান নহে। আমাদের অন্তঃকরণের মলিনতাই তাহার কারণ। মানুষের নানারূপ 'অশক্তি' হেতু, তাহাদের জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত—অজ্ঞানজড়িত। এজন্য আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারিক জ্ঞান পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান যাহাই হউক, মূল জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয় না,—এই কথা জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ প্রায়ই সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহাদের মতে, জ্ঞানে যে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিকাশ হয়, বা যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহা মূলতঃ আমাদের সকলেরই এক। আমাদের সাধারণ পাপ-পুণ্য জ্ঞান, ভালমন্দ জ্ঞান, হিতাহিত জ্ঞান, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য জ্ঞান, সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য জ্ঞান, প্রভৃতি মূলতঃ এক। তবে বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ব্যবহার স্থলে তাহার ব্যবহারিক পার্থক্য থাকে মাত্র। যেমন, আমাদের কাজের মধ্যে কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ, কতকগুলি কর্ত্তব্য, কতকগুলি অকর্ত্তব্য, এইরূপ সাধারণ দ্বন্দ্বজ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে। তবে কোন্ বিশেষ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, কোন্ কাজ কর্ত্তব্য, বা কোন্ কাজ অকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমাদের ধারণার পার্থক্য থাকিতে পারে, এবং সেই বিশেষ জ্ঞানের ক্রমবিকাশও হইতে পারে। এই কথা সত্য হইলে, সমাজ বা বাহ্যবিষয় হইতে আমরা মূলজ্ঞান বা চিৎশক্তি লাভ

---

(১) বৌদ্ধ দার্শনিকের বিজ্ঞানবাদ, ও জর্ম্মাণ দার্শনিক সেলিং ও ফিক্তের 'অহঙ্কার' বাদ এইরূপ।

(২) বিলাতী দার্শনিকের কথায়,—জ্ঞান Universal (Cousin), Absolute (Hegel) ও Transcendental (Kant).

করিতে পারি না বটে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ (intuitional) একথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যে বিশেষ জ্ঞান প্রমাণজনিত, যাহাকে প্রমাজ্ঞান বলে, যাহা বিষয়বিষয়ীর সহযোগে উৎপন্ন হয়, যাহা বাহ্যজগত হইতে বা বিষয় হইতে আমরা লাভ করি, সমাজ সেই জ্ঞানবিকাশে সহায়তা করে, একথাও বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। আমাদের মূল জ্ঞানশক্তির বা চৈতন্তের ক্রমবিকাশ না হইলেও, যে অজ্ঞান জ্ঞানকে আবরিত করিয়া রাখে, তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে পারে, এবং সেই ক্রমাপসারণের দ্বারা ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়, এবং সমাজ সেই অজ্ঞানের ক্রমাপসারণে, বা ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিতে পারে, একথা জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণের স্বীকার করিতে কোন বাধা হয় না, তাহা বলিতে পারা যায়।

১৬। তাহা হইলেও, সমাজ যে মানুষ গড়িয়া লয়, একথা এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বরং সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষই সমাজ গড়িয়া লয় (১)। তাঁহারা যদি আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের পার্থক্য, অপূর্ণত্ব ও ক্রমবিকাশশীলত্ব স্মরণ করিতেন, তাহা হইলে একথা বলিতেন না। পারমার্থিক ভাবে জ্ঞান —এক অখণ্ড অবিভক্ত বটে, এজন্ত পারমার্থিক ভাবে এই জ্ঞানের সমষ্টি হইতে পারে না। অন্যদিকে ব্যক্তিমানবের ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানজড়িত, অপূর্ণ ও ক্রমবিকাশশীল বলিয়া, তাহার সমষ্টিতে কখন 'সমাজজ্ঞান' কি পূর্ণ অনন্তজ্ঞান হইতে পারে না। তাহাও অপূর্ণ থাকিবে। মূলজ্ঞান বা চৈতন্য এক অবিভক্ত। জীবচৈতন্যরূপে তাহারই অপূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ হয়। সমাজচৈতন্যরূপে তাহারই অপেক্ষাকৃত পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে। এজন্য কখন সমাজচৈতন্যকে, সেই সমাজস্থ ব্যক্তিমানবের চৈতন্যের বা জ্ঞানের সমষ্টি বলা যাইতে পারে না। অপূর্ণত্বের সমষ্টিতে প্রকৃত পূর্ণত্বের ধারণা হয় না। আবার ব্যবহারিক ভাবে 'ব্যক্তিজ্ঞান' ও 'সমাজজ্ঞান' প্রত্যেকের পৃথক্। 'ব্যক্তিজ্ঞান' নিজের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে। 'সমাজজ্ঞান' সমাজের জন্য বা পরার্থে কর্ত্তব্যকর্ম্মে আমাদের নিয়োজিত করে। আমাদের এই সমাজজ্ঞান—এই সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান ('I ought' জ্ঞান) একস্বভাব হইলেও, আমাদের সকলের মধ্যে তাহা সমানরূপে বিকাশিত বা পরিস্ফুট হয় না। আর তাহার বিশেষ বিকাশস্থলেও, কোন্ কাজ কর্ত্তব্য, কোন্ কাজ অকর্ত্তব্য, সে জ্ঞান আমাদের সকলের সমান নহে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের সংস্কার, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা এবং অতীতের ও সমাজের প্রভাব অনুসারে তাহার প্রভেদ হইয়া থাকে। অতএব আমরা সকলে মিলিয়া কোন্ কাজ কর্ত্তব্য, কোন্ কাজ অকর্ত্তব্য, কিসে সমাজের উন্নতি হয়, কিসে বা অবনতি হয়, তাহা একমত হইয়া অথবা অধিকাংশ লোকের অভিমত লইয়া কোন সময়ে স্থির করিতে পারি না। কেবল যে সকল

---

(১) এই জন্ত চুক্তিমূলে সমাজ, একথা জ্ঞানবাদী জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, আমাদের এই মূল "I ought" জ্ঞান বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যখন সকলের সমান, তখন আমরা সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই সমাজ সংগঠন করিতে পারি।

লোকের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত, স্বার্থ বা বাসনা-বিবর্জ্জিত, যাঁহারা 'আপ্ত', তাঁহারাই এই সকল ব্যবহারিক কর্ত্তব্য', দেশ কাল পাত্র অনুসারে স্থির করিতে পারেন। (১) তাঁহাদের এই জ্ঞানের সিদ্ধান্ত, অতি ধীরে ধীরে কালবশে ও সেই সকল অসাধারণ লোকের প্রভাব অনুসারে, সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া সমাজকে উন্নত করে। অতএব আমরা কখন সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া সমাজ গড়িতে পারি না। মানুষ সমাজ গড়ে না। আমাদের সকলের ব্যবহারিক জ্ঞান (২) একরূপ হইলে বরং একথা সম্ভব হইত।

১৭। এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের কথা এস্থলে আর বিশেষ করিয়া বুঝিবার আবশ্যক নাই। এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের ন্যায় আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা, এই মূলজ্ঞানের ন্যায় আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত করেন। মানুষ কেবল জ্ঞাতা নহে। মানুষ—জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা। আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও সুখদুঃখানুভূতিবৃত্তি আছে। এই কর্ম্মবৃত্তি ও সুখদুঃখানুভূতিবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিজ। কেহ কেহ (Schopenheaur প্রভৃতি) আরও বলেন যে, আমাদের বাসনাজাত প্রকৃতিই এই ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিই আমাদের স্বরূপ। জ্ঞান প্রথমে এই ইচ্ছাশক্তি হইতে, এই ইচ্ছাশক্তির অধীনে, কেবল তাহারই বশে পরিচালিত হইবার জন্য, বিশেষ অবস্থায় অভিব্যক্ত হয় মাত্র। তবে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে সেই জ্ঞানে এই ইচ্ছাবৃত্তির লয় হইয়া যায়—বাসনাবীজ নষ্ট হয়। আমাদের স্বরূপ—এই ইচ্ছাশক্তি হইতে, আমাদের এই স্বাভাবিক চরিত্রের (Intrinsic character) বা স্বরূপস্বভাবের পবিবর্ত্তন হয় না। কেবল বাহ্য বা ব্যবহারিক চরিত্রের (Empiric character) পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। (১) মানুষ তাহার আত্মশক্তি বলে এই স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে। তাহা এ জীবনে শিক্ষা বা অন্য অবস্থার দ্বারা সংগঠিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না। যে স্বভাবতঃ সৎ বা সাধুপ্রকৃতি, সে সংসারের শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও ভাল থাকে। সে যে অবস্থায় পড়ুক,—সে রাজা হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, সে 'বড় লোক' হউক, বা 'ইতর লোক' হউক, সে নিরন্তর সুখের ক্রোড়ে লালিত হউক, বা উৎকট দুঃখ ও ক্লেশের সংঘর্ষে অনবরত নিষ্পেষিত হইতে থাকুক, তাহার সে স্বাভাবিক চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না। সে বরাবর সৎ থাকে। আর যে স্বভাবতঃ অসৎ, সে যে অবস্থাতেই পড়ুক, বরাবর অসৎ থাকিবে। অতএব বাহ্যবিষয় বা সমাজ কখন আমাদের এই স্বভাবিক চরিত্রকে সংগঠিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। একথা কতদূর সত্য,

---

(১) এই জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপাত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥
গীতা, ৪। ১৬—১৭।

(২) শঙ্করাচার্য্যের উল্লিখিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও ক্যাণ্টের উল্লিখিত practical roason—প্রায় একার্থবাচক, এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

(১) জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট (Kant) সপেনহর (Schopenheaur) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞান আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হউক, কিম্বা এই বাসনাজ প্রকৃতি আমাদের মূলসত্ত্বা হউক, জ্ঞানস্বরূপ আমাদের অজ্ঞানাবরণের ক্রমাপসারণে এই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হউক, অথবা প্রকৃতির আপূরণে আমাদের মূলস্বরূপ—জগতের মূলসত্ত্বাস্বরূপ—বাসনা বা ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া পরিণামে আমাদের বাসনাজাত প্রকৃতি জ্ঞানের পূর্ণবিকাশিত অবস্থায় সেই জ্ঞানেই প্রবিলীন হউক, আমাদের মূলস্বরূপ যাহাই হউক, আমাদের এই জ্ঞানের বা প্রকৃতির যে ক্রমবিকাশ হয়, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের ন্যায় ব্যবহারিক চরিত্র যে সমাজের সহায়তায় বিকাশ হইতে পারে, তাহা আমাদের কাহারও স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্য হইতে পারে না। (১)

১৮। আধুনিক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ও তাহার মীমাংসায়, আর্য্যঋষিগণ বহু পূর্ব্বে উপনীত হইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে জীবের জন্মান্তরবাদ ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। এই পূর্ব্বজন্মে স্বীকার না করিলে, জ্ঞানতত্ত্ব ও উল্লিখিত স্বাভাবিক চরিত্রের (বা intrinsic character এর) প্রকৃত তত্ত্বও বুঝা যায় না। আমাদের শাস্ত্র মতে, মানুষ জ্ঞাতা বটে, জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ বটে। কিন্তু মানুষে এই জ্ঞান তাহার বাসনাজাত অজ্ঞানজড়িত ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতসংস্কারবদ্ধ। তাহা দ্বারাই জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত হয় এই প্রাক্তন সংস্কার মধ্যে যে গুলি স্ফুটনোন্মুখ হয়, তাহা হইতেই মানুষ তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে। মানবাত্মা এই স্বভাব লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। বাহ্যপ্রকৃতি দৈব বা পুরুষকার এই স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তাহারা এই স্বভাবের বিকাশে সহায়তা করে মাত্র। এই স্বভাবই মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি। তাহার প্রভাব বড় অধিক। আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক শক্তিতে সেই জন্য তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সামান্য। যেমন কোন বৃহৎ জড়খণ্ডকে কোন ক্ষুদ্র জড়খণ্ড আকর্ষণ করিলে, প্রাকৃত নিয়মে, সেই বৃহৎ জড়খণ্ডের সামান্য মাত্র গতি লক্ষিত হয়, তেমনই বাহ্যপ্রকৃতি বা সমাজের দ্বারা মানবের সেই স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনই তাহার ভবিষ্যৎ জীবন, তাহার পরজন্ম নিয়মিত করে। নতুবা যদি মানুষের ইহজন্মের সুখ দুঃখ, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বা শক্তির বিকাশ প্রভৃতি সমুদায়ই তাহার অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল হইত, যদি তাহা কেবল তাহার পুরুষকার বা আত্মশক্তির উপর নির্ভর

---

(১) ফরাসি দার্শনিক রুসো মানুষের এই স্বাভাবিক চরিত্র স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, সমাজের দ্বারা তাহার উন্নতি হয় না, তবে অবনতি হয়—একথা সত্য। তাঁহার মতে মানুষ স্বভাবতঃই সরলপ্রকৃতি নির্ম্মলচরিত্র। আদিম অবস্থায় মানুষ এইরূপ সরলপ্রকৃতিযুক্ত থাকে। পরে সমাজ তাহাকে নষ্ট করে। সমাজের কল্যাণে সে মিথ্যাকথা, জাল, জুয়াচুরি শিক্ষা করে, সে দস্যু বা রাক্ষসপ্রকৃতি হইয়া পড়ে। সমাজ হইতেই তাহার স্বাভাবিক নির্ম্মল স্বভাবের এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। সমাজ তাহাকে দেব গড়িতে বানর গড়ে। রুসো ক্রমোন্নতিবাদের পরিবর্ত্তে কতকটা ক্রমাবনতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যঋষিগণ উভয়বাদই স্বীকার করিতেন।

করিত, যদি তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট ও পুরুষকারের দ্বারা নিয়মিত হইত, এবং অন্য কিছুর উপর নির্ভর না করিত, যদি তাহার অদৃষ্ট বা স্বভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মার্জ্জিত হইলেও এ জন্মে সেই অর্জ্জনে তাহার কোনরূপ হাত না থাকিত, যদি ইহাই আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় হইত, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইত যে, তদনুসারে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা একথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১৯। আমরা এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের কথা উল্লেখ করিব মাত্র। ইহাঁরা শক্তিবাদী বা প্রকৃতিবাদী। ইহাঁদের মতে, প্রকৃতি চৈতন্যরূপিণী, প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। এই প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। মানবের প্রকৃতিও এই মহাশক্তির বিশেষ বিকাশ মাত্র। যেমন ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান—এক অখণ্ড, মানবে সেই জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি হয়, তেমনই শক্তিরূপা ব্রহ্মপ্রকৃতিও—এক অখণ্ড, মানবে সেই প্রকৃতিই মানবের প্রকৃতিরূপে, তাহার স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপে অভিব্যক্ত হয়। মানবের চৈতন্য, বুদ্ধি, ধৃতি, প্রীতি, দয়া, মোহ, ক্ষুধা, নিদ্রা (১) প্রভৃতি সমুদায়ই এই মহাপ্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত। মানবের বাসনা, তাহার কর্ম্মবৃত্তি, কর্ম্মজ সংস্কার, সেই সংস্কার অনুসারে তাহার জন্মান্তর, ও প্রতিজন্মে সেই সংস্কারের বিশেষ বিকাশ, সমুদায়ই সেই মমতাময়ী মহাপ্রকৃতি দ্বারা নিয়মিত, সেই এক মহাশক্তিপরিচালিত। সেই প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানকে আবরিত করিয়া, তাহার অর্জ্জিত সংস্কার বা বাসনাজাত প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে পরিচালিত করেন। সেই প্রকৃতি প্রসন্না হইলেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, মুক্তি অভিমুখে মানবের গতি হয়। (১) জগৎরূপিণী—জগতের শক্তিরূপিণী এই মহাপ্রকৃতি জগতের ক্রমবিকাশ করেন, সমাজের ও মানবের আসুরী ও রাক্ষস প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে অভিভূত করিয়া তাহাদের সত্ত্বশক্তি বা তাহাদের দৈবপ্রকৃতির বিকাশ করেন,—সমাজের ও মানবের ক্রমোন্নতি করেন। এই মহামমতাময়ী প্রকৃতি যেমন একদিকে মানবপ্রকৃতিবীজরূপে বা মানবের শক্তিরূপে মানবে অধিষ্ঠিত, তেমনই সেই প্রকৃতিই বাহ্যপ্রকৃতিরূপে, সমাজরূপে বা সমাজশক্তিরূপে, মানবের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়রূপে, অর্থাৎ তাহার অনুকূল বাহ্য অবস্থারূপে অভিব্যক্ত। সুতরাং এই শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে, মানবের আত্মশক্তি বলে এবং সমাজ ও বাহ্যপ্রকৃতি সহায়ে মানবের ক্রমবিকাশ স্বীকৃত। এ তত্ত্ব মধ্যে যে মহাসত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

---

(১) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা .. চৈতন্যেত্যভিধীয়তে,......বুদ্ধি...নিদ্রা... ক্ষুধা · শক্তি ...তৃষ্ণা,...ক্ষান্তি···জাতি... লজ্জা... শান্তি...শ্রদ্ধা... ...কান্তি...লক্ষ্মী...বৃত্তি ··স্মৃতি...দয়া...তুষ্টি...মাতৃ... চিতি...ভ্রান্তিরূপেণসংস্থিতা।"

চণ্ডী, ৫।১৬ –৭৬...মন্ত্র।

সেই শক্তির মহাতত্ত্ব আমরা এই মার্কণ্ডেয়চণ্ডী হইতেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারি। এই চণ্ডীই শক্তিবাদী পণ্ডিতদিগের মূলগ্রন্থ।

(১) ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ। —চণ্ডী,১১।৫।

২০। এই সকল কূট দার্শনিকতত্ত্ব আমাদের আর অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে যে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিতগণের অভিমত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা অনেক দার্শনিক পণ্ডিত সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। মানবাত্মা যে আত্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সে সেই শক্তি দ্বারাই নিয়মিত হয়, সমাজ বা কোনরূপ বাহ্যশক্তি দ্বারা সে বিশেষরূপে পরিচালিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না—ইহাই ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। পক্ষান্তরে অন্য কয়েক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা আদৌ এই আত্মশক্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং বাহ্যবিষয় ও সমাজের দ্বারাই যে মানুষ গঠিত হয়, ইহাই ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহাদের মধ্যে জড়বাদী পণ্ডিতগণ প্রধান। ইঁহারা জন্মান্তর মানেন না, আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহারা আত্মাকে 'মদশক্তি'র ন্যায় জড়পরমাণু বিশেষের সংযোগফল সিদ্ধান্ত করেন। আর এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা পরকাল স্বীকার করেন বটে, কিন্তু আত্মার স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করেন না। ইঁহারা মনাত্মবাদী—মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহাদের মতে জন্মকালে জীবাত্মার কোন বিশেষ শক্তি থাকে না, তাহার মন মোমের মত কোমল থাকে, বাহ্যবিষয় তাহার উপর ছাপ দিয়া তাহাকে যেরূপ করিয়া গড়িয়া লয়, সে সেইরূপই গঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আত্মার জ্ঞানশক্তিও স্বীকার করেন না। ইঁহারা আত্মাকে জড়স্বভাব বলেন। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হেতু আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান আত্মার আগন্তুক ধর্ম্ম—ইহারা একথা বলেন। ইহা আমাদের দেশের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের এবং মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রভাকরের মত। এই সকল শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মধ্যে আধুনিক বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতের স্থান। ইঁহারা মানবজাতির ক্রমবিকাশের সহিত ব্যক্তিমানবের ক্রমপরিণতি স্বীকার করেন, এবং বাহ্যবিষয়কে সেই ক্রমপরিণতির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সর-প্রমুখ পণ্ডিতগণ ব্যক্তিমানবের ক্রমপরিণতিতে পিতৃমাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পান। তাঁহারা এই পিতৃমাতৃশক্তিকে heridity বলিয়াছেন। এই পিতৃমাতৃশক্তির কথা পরে উল্লিখিত হইবে। এই পণ্ডিতগণের মতে মানবের কোন 'আত্মশক্তি' নাই। সে কোন আত্মশক্তি বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তাহার যদি কোন আত্মশক্তি থাকে, তবে তাহা এই ঘনীভূত পিতৃমাতৃশক্তি। বীজের মধ্যে যে বৃক্ষত্ব থাকে, বীজ যেমন সে বৃক্ষত্ব মূলবৃক্ষ হইতে লাভ করে, তেমনই মানুষও পিতামাতা হইতে তাহার দেহ ও অন্তঃকরণ গঠনোপযোগী শক্তি ও উপকরণ লাভ করে। ইহাই কেবল মানুষের নিজস্ব। তাহার আর কোন নিজস্ব থাকা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহাদের কথায় 'বীজ আগে না বৃক্ষ আগে হইয়াছে,'—এই প্রাচীন তর্কের বিষয় মনে পড়ে। ইহাতে আরও অনেকরূপ আপত্য হইতে পারে। তাহা আর এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। এই সকল জড়বাদী পণ্ডিতের কথা, আর আলোচনারও প্রয়োজন নাই।

২১। আমরা এ পর্য্যন্ত যতদূর বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতে বলিতে পারি যে, সাধারণ ভাবে এ সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত মানবের উপর বাহ্যজগতের প্রভাব স্বীকার করেন না, স্বাভাবিক শক্তিবলেই মানবাত্মার বিকাশ হয়, তাহার ব্যবহারিক উন্নতি অবনতি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত, মানবের এই স্বাভাবিক শক্তি আদৌ স্বীকার করেন না, কেবল বাহ্যজগতই তাহার উন্নতি বা অবনতির কারণ, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে,—সমাজ মানুষ গড়িতে পারে না, মানুষই সমাজ গড়িয়া লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সমাজের স্বতন্ত্র সত্বা স্বীকার করেন না—সমাজশরীর বা সমাজাত্মা স্বীকার করেন না। তাহা না স্বীকার করিলেও, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা তাঁহারা বলিতে পারেন। মানুষ চুক্তি করিয়া সমাজ গড়ে, ও পরে সেই সমাজের দ্বারা নিয়মিত হয়, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন।

যাঁহারা আত্মবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, যাঁহারা মানবের নিজ শক্তি বলে অন্য শক্তির সহায়তা বিনা মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা বলেন, অথবা যাঁহারা মানবের আত্মশক্তি বাদ দিয়া কেবল বাহ্যবিষয়ের দ্বারা বা আনুষঙ্গিক অবস্থার দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মত আংশিক সত্য। এই বাদ প্রতিবাদের সামঞ্জস্য করিয়া উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ কবিতে না পারিলে, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু কিরূপে এই সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা এস্থলে বুঝিবার স্থান নাই—প্রয়োজনও নাই। তবে এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অন্যের সহায়তা বিনা, কাহারও নিজশক্তি না থাকিলে, তাহার বিকাশ হইতে পারে না। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কখন হইতে পারে না। অন্যের সমবায়ে তাহাতে নূতন সত্বার বা নূতন শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। তাহার শক্তিক্রিয়ার বা গুণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। অন্যের সমবায়ে বা অনুকূল অবস্থার সহায়ে, কেবল যাহাতে যাহা আছে, তাহারই বিকাশ হয়। আর সে সহায়তা না পাইলে তাহারও বিকাশ হইতে পারে না। আমাদের দেশের দার্শনিকগণের 'শশবিষাণের' দৃষ্টান্তের ন্যায় আমরা বলিতে পারি যে, আমাতে যদি শৃঙ্গ উৎপাদন করিবার শক্তি অন্তর্নিহিত না থাকে, তবে কোনরূপ অবস্থাতেই আমার শৃঙ্গ হইতে পারে না। তেমনই আমাতে হস্তপদাদি অঙ্গবিকাশের শক্তি থাকিলেও যদি অনুকূল অবস্থার সাহায্য না পায়, তবে আমাদের হস্তপদাদি অঙ্গের বিকাশও হইবে না। আমাদের জ্ঞানশক্তি আছে বটে, কিন্তু বাহ্যবিষয়ের সহায়তা ব্যতীত সে জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। দর্শনের ভাষায়, কোন 'ভাব'পদার্থই সহকারী কারণ বা নিমিত্ত কারণ ব্যতীত বিকাশিত হইতে পারে না, কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা সমবায়ী কারণ, তাহাতে নিমিত্ত কারণের সংযোগ হইলে তবে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ক্রিয়ায় সমবায়ী কারণেরই প্রাধান্য থাকে, তাহারই বিকাশ হয়। আমরা

সর্ব্বত্র এই নিয়ম বুঝিতে পারি। অতএব দর্শনের ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ ভাবপদার্থ। তাহার বিকাশে তাহার আত্মশক্তি সমবায়ী কারণ। আর অনুকূল বাহ্য-অবস্থা সেই বিকাশের সহায় বা নিমিত্ত কারণ মাত্র।

ইহা ব্যতীত আমাদের আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। সংসারে কিছুই স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। অন্যের সহিত সম্বন্ধ বা সংশ্রব বিনা কাহারই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অথবা যদি থাকে, তবে তাহার কোন বিকাশ বা পরিণতি হয় না। কোন বস্তুই তাহার সংসৃষ্ট অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত বুঝা যায় না। বাহ্য বিষয়ের সহিত অসম্বদ্ধভাবে আমরা মানুষকেও বুঝিতে পারি না। বাহ্যবিষয় মানুষকে নিয়মিত করে, মানুষও বাহ্য-বিষয়কে নিয়মিত করে। বলিয়াছি ত, ঘাত-প্রতিঘাতই সংসারের নিয়ম। সেই জন্য বাহ্যবিষয় বাদ দিলে মানুষের কিছুই বুঝা যায় না। আবার জ্ঞাতা আমাকে বাদ দিলে জ্ঞেয় বাহ্যবিষয়ও বুঝা যায় না। ইহা বড় জটিল দার্শনিক তত্ত্ব। আমরা দর্শনের ভাষায় বলিতে পারি যে, কোন 'এক'কে তাহার সংসৃষ্ট 'অন্য' ব্যতীত ধারণা করা যায় না। শুধু তাহাই নহে। সেই 'এক' তাহার সংসৃষ্ট 'অন্যের' সমষ্টির সমান। অথবা সেই 'এক'ও তাহার সংসৃষ্ট 'অন্যের' সমবায়েই তাহার পূর্ণ একত্ব। এই যে 'আমি'—আমাকে, আমার 'ইদং' বা আমার সংসৃষ্ট বাহ্যবিষয়ের সহিত মিলাইয়া বা একীভূত করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারিব না। জ্ঞানে—'অহং ও ইদং' বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ইহাদের মিলনেই আমার জ্ঞান, আমার পূর্ণ ব্যবহারিক আমিত্ব। আমার জ্ঞানে এই 'ইদং' বা এই বাহ্যবিষয় বাদ দিলে আমার জ্ঞান থাকে না, এ আমি থাকি না। আমার জ্ঞানে, এই 'ইদং'জ্ঞান, এই জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, আমার 'আমিত্বের' বিকাশ তত অধিক হইবে। জ্ঞানে—আমার জ্ঞেয় 'ইদং' এর বিকাশের, সহিত, আমার 'অহং'এর বিকাশ হইবে। সেইরূপ কর্ম্ম বাদ দিলে কর্ত্তা থাকে না। কর্ম্মের পরিসর বৃদ্ধি হইলে, কর্ত্তার পরিসর বা বিকাশ বৃদ্ধি হয়। আবার 'ভোগ্য'বিষয় বাদ দিলে 'ভোক্তা' থাকে না। এক কথায়, 'বিষয়' বাদ দিলে 'বিষয়ী' থাকিতে পারে না। আমরা মূল সম্বন্ধবিহীন 'অহং'কে বা 'ইদং'কে জানিতে পারি না। এই 'অহং' ও 'ইদং'এর সমবায়ে বা সম্বন্ধ হইতে যে ব্যবহারিক 'অহং', বা ব্যবহারিক 'ইদং', তাহাই কেবল আমাদের এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়।

দর্শনের এই জটিল দুর্ব্বোধ্য ভাষা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ এবং তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংসৃষ্ট বিষয় (environs) ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতেই ব্যবহারিক মানুষের বিকাশ হয়;—তাহার জ্ঞানবৃত্তি চিত্তবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ ও পরিণতি হয়। মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই শক্তির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, ঘাত-প্রতিঘাত হয়। এই সম্বন্ধ বা ঘাতপ্রতিঘাত না থাকিলে, মানুষের বিকাশ আদৌ কল্পনা করা যায় না। শুধু মানুষ বলিয়া নহে, জগতের সর্ব্বত্র এই নিয়ম। সর্ব্বত্রই বিষয়ের সহিত বিষয়ান্তরের সম্বন্ধ ও

ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই সেই বিষয়ের পরিবর্ত্তন বা পরিণতি হয়, জগতের পরিণতি হয়। যদি এক পরমাণুর সহিত অন্য পরমাণুর সম্বন্ধ বা ঘাতপ্রতিঘাত না হইত, যদি জড়পদার্থ মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ-বিক্ষেপক্রিয়া না থাকিত, তবে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জড়জগতের পরিণতি হইত না, জড়জগত পুঞ্জীকৃত অবিশেষ পরমাণু অবস্থা বা সূক্ষ্ম ভৌতিক অবস্থা (nebulous state) বা মূল প্রকৃতির অধিকৃত অবস্থা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে পারিত না। যদি জৈবশক্তি বা প্রাণশক্তি বলে পরমাণু বিশেষ একীভূত হইয়া জীবকোষ উৎপাদন না করিত, তবে জীবজগতের বিকাশ হইত না। যদি জীবাণুর সহিত বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ ও প্রতিঘাত না হইত, তবে ক্রম আপূরণে জীবজাতির পরিবর্ত্তন বা পরিণতি হইত না। এক’ হইতে ‘বহু’র বিকাশ, ও এই বহুর মধ্যে প্রত্যেক একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতই জগতের বিবর্ত্তনের বা পরিণতির কারণ।

২২। বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মানুষে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়,—এ কথা, বীজ হইতে কিরূপে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। আমাদের শাস্ত্রমতে আব্রহ্মতৃণ—সমুদায়ই জীব। সকলেরই বিকাশ সম্বন্ধে একই নিয়ম। বৃক্ষবীজের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজে অশ্বত্থবৃক্ষ বিকাশের শক্তি অন্তর্নিহিত আছে—অশ্বত্থবৃক্ষের সূক্ষ্মাবস্থা বা সংস্কারাবস্থা নিহিত আছে, তাহা আমরা বলিতে বাধ্য হই। আধুনিক জীববিজ্ঞান শাস্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সমস্ত বীজ ব্যাপিয়া এই বৃক্ষউৎপাদিকাশক্তি থাকে না। তাহার মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম কোষবিশেষে, অথবা সেই কোষান্তর্গত তরল অংশে, এই শক্তি নিহিত থাকে। বীজের অবশিষ্ট অংশ সেই জীবকোষের আহার ও রক্ষার জন্য থাকে। কোন দ্বিদল বীজ হইতে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তখন বীজের এই দুই দলের মধ্যস্থিত বিন্দুপরিমিত স্থান হইতে অঙ্কুর বাহির হয়—দুইটী দলই থাকিয়া যায়, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। ডিম্ব হইতে শাবক উৎপত্তিরও এই নিয়ম। যাহা হউক, এইরূপ বীজে বা ডিম্বে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে। সেই শক্তি থাকাতেই অশ্বত্থ বীজ হইতে কেবল অশ্বত্থবৃক্ষই উৎপন্ন হইতে পারে, হংসডিম্ব হইতে কেবল হংসই উৎপন্ন হয়। বাহ্যবিষয় বা আনুসঙ্গিক অবস্থা বীজের স্বরূপকে কখন পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, তবে কখন কখন বাহ্যপরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, এই মাত্র। অবস্থা অনুসারে কখন কখন সুমিষ্ট আম্রের বীজ হইতে অম্লরসযুক্ত বা বিস্বাদ আম্রের বৃক্ষ জন্মিতে পারে বটে, অথবা বিস্বাদ বা অম্লরসযুক্ত আম্রের বীজ হইতে সুস্বাদ মধুর আম্রের বৃক্ষ জন্মিতে পারে বটে, কমলালেবুর বীজ স্থানচ্যুত হইয়া রোপিত হইলে গোঁড়া লেবুর বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু উভয় স্থলেই সে আম্র বা লেবুর পরিবর্ত্তে অন্য ফলের বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই যে, বাহ্যবিষয় বা আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা বিনা, অশ্বত্থবীজ কখন অশ্বত্থবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না—আম্রবীজ কখন আম্রবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। বীজ

বৃক্ষে পরিণত হইতে হইলে তাহার কতকগুলি আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা প্রয়োজন হয়, নতুবা তাহার পরিণতি সম্ভব হয় না। প্রথমে তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন। তাহার পর তাহার অনুকূল জল বায়ুর প্রয়োজন। তাহার পর অত্যন্ত তাপ বা অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা হইতে, 'আওতা' বা পশু পক্ষী হইতে তাহাকে রক্ষার প্রয়োজন। তবে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে। তবে বীজ তাহার অন্তর্নিহিত উচ্চতর জৈবশক্তি বলে, বাহিরের জড় ও জীবাণুদের আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করতঃ নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, নিজের শরীর বিকাশ করিতে পারে। যে বৃক্ষ কেবল শীতপ্রধান দেশেই বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার বীজ সহজে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। তেমনই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কোন প্রাণীকে সহজে শীতপ্রধান দেশে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। সর্ব্বত্র এই নিয়ম। অনুকূল অবস্থার সহায়তা ও প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব হইতে অব্যাহতি ব্যতীত, কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না। সুতরাং কেবল বীজের অন্তর্নিহিত শক্তিই কোন জীবের বিকাশ ও পরিণতি পক্ষে যথেষ্ট নহে। মানবের বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম।

২৩। অতএব মানবের পরিণতি ও বিকাশের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, মানব যে তাহার নিজস্ব কিছু বা আত্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। মানব ব্রহ্ম হউক, ব্রহ্মস্বভাব হউক, জ্ঞানরূপ হউক, বা ঈশ্বরসৃষ্ট হউক, কি প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে জড় হইতে পরিণত হউক, তাহা আমরা জানি না। মানবের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমরা এই অজ্ঞানজড়িত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে জানিতে পারি না। বিশেষ সাধনাবলে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে, "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" লাভ না হইলে, আমরা কাহারও স্বরূপ জানিতে পারি না। আমরা কেবল ব্যবহারিক আত্মার কথা জানিতে পারি—এস্থলে সেই ব্যবহারিক আত্মার কথা, (empiric self, phenomenal egoর কথা) বলিতেছি, স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরাভিমানী আত্মার কথা বলিতেছি। আমরা এই মায়াবদ্ধ জ্ঞানে আমাদের যাহা স্বরূপ (true self, absolute self, বা transcendental self) আমাদের যাহা স্বভাব (intrinsic character) যাহা আমাদের মূলসত্ত্বা (being-in-itself) তাহা জানিতে পারি না। তবে মানবের যে নিজস্ব কিছু আছে, ইহা না স্বীকার করিলে চলে না, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই নিজস্ব কিছু তাহার আত্মশক্তি, অথবা আত্মশক্তি ও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার। এই নিজশক্তি বলেই মানুষ মানুষ হইতে পারে। অশ্বত্থবীজ হইতে যেমন অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মে, অন্য বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তেমনই মানুষ তাহার এই নিজস্ব শক্তিবলে মানুষই হইতে পারে, অন্য কিছু হইতে পারে না। কিন্তু তাহার এই মনুষ্য হইতে হইলে, আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা আবশ্যক করে। তাহাকে পিতৃশক্তি বলে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, পিতৃমাতৃশক্তি বলে শরীর গ্রহণ করিতে হয়, পরে সমাজসহায়ে তাঁহাকে বর্দ্ধিত হইতে হয়।

তাহা না হইলে, তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। অনুকূল অবস্থায় তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশে সুবিধা হয়, প্রতিকূল অবস্থায় সেই বিকাশে বিঘ্ন হয়।

সর্ব্বত্র এই নিয়ম। তবে এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। মানুষকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। কোন কোন লোকের উল্লিখিত আধ্যাত্মিক শক্তি বড় অধিক। সে শক্তিবলে তাহারা অনুকূল বাহ্যবিষয় লাভ করে, সুতরাং বাহ্যবিষয় তাহাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, বাহ্যঅবস্থা তাহাদের বিকাশে সহায় হয় মাত্র। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বড় ক্ষীণ। বাহ্যবিষয় তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করে। তাহাদের উপর বাহ্যাবস্থার প্রভাব বড় অধিক। সাধারণ লোক সকলেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহা হইলেও, সকল মানব সম্বন্ধেই বলিতে পারা যায় যে, তাহারা নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বাহ্য অবস্থার সহায়ে তাহার বিকাশ হয়।

আমরা যদি কেবল এই নিজস্ব শক্তির কথা মনে রাখি, ও বাহ্য অবস্থার কথা উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের কথা ভাবি, তবে আমরা বলিয়া থাকি যে, মানুষ তাহার আত্মশক্তিবলেই মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই শক্তিবলেই তাহার ক্রমোন্নতি হয়, ও মুক্তির দিকে তাহার গতি হয়। অন্যদিকে যদি আমরা কেবল বাহ্যবিষয়ের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা মনে রাখি—ও তাহার আত্মশক্তি উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ লোকের কথা ভাবি, তবে বলিতে পারি যে, কেবল বাহ্যশক্তিবলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এ উভয় মত যে আংশিক সত্য, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মনুষ্যত্ববিকাশকল্পে একদিকে তাহার আত্মশক্তি ও সংস্কার, এবং অন্যদিকে তাহার পিতৃমাতৃশক্তি, সমাজ ও বাহ্যবিষয়। মানুষ আপনাকে আপনি গড়িয়া লয়, এক অর্থে যেমন একথা সত্য, তেমনই মানুষকে সমাজ ও বাহ্যবিষয় গড়িয়া লয়, সমাজ মানুষকে যেরূপ গড়ে মানুষ সেইরূপ হয়, একথা আর এক অর্থে সত্য। মানবের এই আত্মশক্তি থাকা স্বত্বেও, সমাজ কেমন করিয়া তাহার সেই আত্মশক্তি অনুসারে তাহার বিকাশের সহায় হইয়া তাহাকে গড়িয়া লয়, তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, অদৃষ্ট ও দৈববশে, মাতৃগর্ভে মানবের বিকাশ।

২৪। পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে ও সংস্কারবশে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ আরম্ভ হয়, কিরূপে মানুষ পিতৃমাতৃজ শরীর লাভ করে, তাহা আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার উপর কিরূপে ক্রিয়া করে, কিরূপে তাহার স্থূলশরীর লাভ হয়, আমরা জীবশরীরবিজ্ঞান সহায়ে এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। অন্য জীববীজের ন্যায় মানুষের বীজও প্রথমে পিতার শরীর মধ্যে ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে অবস্থান (spermatozoon) করে। (১) শুক্র মধ্যে এরূপ অসংখ্য জীবাণু

(১) আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের কর্ম্মবিপাকে

থাকে। বোধ হয়, ইহার প্রত্যেক জীবাণু এক এক জীবাত্মার আধার বা স্থূলশরীর-বীজ। তবে ইহার মধ্যে যে মানবজীবাণু মাতৃগর্ভে গিয়া জরায়ু মধ্যে শোণিতস্থ অণ্ডে বা কোষে (sperm cell) আশ্রয় গ্রহণ করিতে পায়, সেই কেবল অবস্থানুসারে মানবশরীর গ্রহণ করে। মাতৃগর্ভে, পিতৃশক্তি বলে ও মাতৃশক্তি সহায়ে পরিপুষ্ট হইয়া, মানবজীবাণুর শরীর ক্রমবিকাশিত হইতে থাকে। এবং সেই মানবজীবাণুর স্ফুটনোন্মুখ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বা সূক্ষ্মশরীরশক্তি যেরূপ, তদনুসারে,'সেই সূক্ষ্মশরীরের অনুরূপ, তাহার স্থূলশরীরের বিকাশ হয়। যেমন কোন স্ফাটিকের (crystal) আকার তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে সংগঠিত হয়, মানুষের বাহ্যশরীরও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, মাতৃগর্ভে বিকাশিত হইতে থাকে।

হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ আধুনিক বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ কেবল এই পিতৃ মাতৃশক্তি (heredity) স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই শক্তিবলে মাতৃগর্ভে মানবশরীরের বিকাশের কথা বুঝাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব এস্থলে আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। এই পিতৃমাতৃশক্তিতত্ত্ব অনুসারে, অন্য জীবাণুর ন্যায় মানবজীবাণু পিতৃশরীর মধ্যে অবস্থান কালে, অথবা পিতার শরীর হইতে মাতৃগর্ভে প্রবেশের কালে সন্তানউৎপাদনক্রিয়ায় পিতামাতার পবিত্রতা ও একাগ্রতা অনুসারে, পিতা হইতে তাহার শক্তি লাভ করে। এই শক্তিবলেই সে পিতার অনুরূপ শরীর লাভ করিতে পারে। পিতার শরীরের বিশেষত্ব, তাহার শারীরিক বিকার বৈকল্য বা ব্যাধি—ইহার অধিকাংশই ভ্রূণে সংক্রামিত হয়। এমন কি, কোন কোন স্থলে পিতৃদেহের স্থানবিশেষের তিলটী পর্য্যন্ত পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হয়। এই ত গেল স্থূলশরীরের কথা। ইহা ব্যতীত মানসিক অনেক বৃত্তিবীজ মানবশিশু এইরূপে পিতা হইতে লাভ করে। কাজেই সে অনেক সময় স্বভাব বা প্রকৃতি সম্বন্ধে পিতার অনুরূপ হয়। এজন্য সন্তানকে আত্মজ বলা যায়। তাহার পর, মানবশিশু শুধু পিতার শারীরিক ও মানসিক শক্তি এরূপে লাভ করে না। মাতৃগর্ভে থাকার সময়, মাতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিও সে কতক পরিমাণে লাভ করে। মানবভ্রূণ সে পিতৃমাতৃশক্তিবলেই বর্দ্ধিত হয়। এজন্য, অর্থাৎ গর্ভে একই রূপ পিতৃমাতৃশক্তি লাভ করায় ও একই রূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায়, আমরা অনেক সময় যমজ ভ্রাতাদের একরূপ আকৃতি ও কতকটা একরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাই। সন্তানে এইরূপে পিতৃমাতৃশক্তির

এ পৃথিবীতে তাহার পুনর্জ্জন্মলাভ চেষ্টা হইলে, সে সূক্ষ্মশরীর লইয়া ক্রমে ভূবায়ুতে আসিয়া বিচরণ করে। বায়বীয় পরমাণু বোধ হয় তখন তাহার সেই শক্তির আধার হয়। পরে তাহা যজ্ঞোত্থিত হবিঃ-বাষ্পের সহিত বৃষ্টিমুখে ভূমিতে পতিত হইয়া শস্য মধ্যে প্রবেশ করে। সেই শস্য অন্নরূপে যে মানব গ্রহণ করে, তাহার শুক্র মধ্যে সে অনুপ্রবিষ্ট হয়। মনুসংহিতায় আছে,—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্ট স্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি ॥ ১।৫৬।

অন্যত্র আছে,—

"আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।"

শ্রুতিতে আছে,—

অন্নং বৈ প্রজাপতি স্ততো হবৈ তদ্রেত
স্তস্মাদিমাং প্রজা প্রজায়ন্ত ইতি।' প্রশ্নোপনিষদ্।১২।

সঞ্চার হয়, ও এইরূপে আকৃতির ও প্রকৃতির বিশেষত্ব অনেকস্থলে বংশপরম্পরা ক্রমে সংক্রামিত হইয়া সেই বংশগত পার্থক্য রক্ষা করে।

২৫.। পাশ্চাত্য মত এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে এই পিতৃমাতৃজ শরীরের কথা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্তু আমাদের শাস্ত্রে আর এক শক্তির কথা আছে, তাহা বলিয়াছি। তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার। তাহাকে ধর্ম্ম, অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব বলা হয়। কেবল পিতৃমাতৃশক্তি স্বীকার করিলে সকল কথার মীমাংসা হয় না। এক পিতামাতা হইতে নিতান্ত বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি ও শক্তিসম্পন্ন সন্তান, এমন কি বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতিসম্পন্ন যমজ সন্তান জন্মিতে দেখা যায়। এক পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক প্রকার শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া, প্রায় একই অবস্থায় লালিত পালিত হইয়া, ভাই ভাই সম্পূর্ণ বিভিন্নচরিত্র হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রবৃত্তি প্রকৃতি গতি পরিণাম সকলই পৃথক্ হয়, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের কারণ নির্দ্দেশ জন্য অনেক পণ্ডিত আমাদের স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য ক্যাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক চরিত্র (intrinsic character) স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং এজন্য আর্য্যঋষিগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারতত্ব বুঝাইয়াছেন। (১) কেবল আত্মশক্তি, বা স্বাভাবিক চরিত্র স্বীকার করিয়া, সেই শক্তির বা চরিত্রের বৈষম্যের কারণ, প্রতি মানুষে তাহার পার্থক্যের কারণ, পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার স্বীকার না করিলে বুঝা যায় না। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ (বিশেষতঃ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ) আরও বলেন যে, মানবশিশু ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই যে অনুকূল বিষয় পাইলে ও প্রতিকূল বিষয় দূর হইলে আহ্লাদসূচক হাস্য করে, এবং তদ্বিপরীতে যে দুঃখসূচক ক্রন্দন করে বা মুখ বিকৃত করে, (২) ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে স্বভাবতঃ স্তন্য পানের চেষ্টা করে (৩), যে মরণের ভয় করে, বা জীবন রক্ষার জন্য অজ্ঞাত আগ্রহ দেখায়,—এ সকল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার স্বীকার না করিয়া, কেবল পিতৃমাতৃজ সংস্কার দ্বারা বুঝা যায় না।

ইহা ব্যতীত, 'কৃতনাশ' ও 'অকৃত অভ্যাগম' দোষ নিবারণ জন্য আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তর ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার স্বীকৃত হইয়াছে। কৃত' বা যাহা করা যায়, তাহা নষ্ট হয় না;—ও 'অকৃত' বা যাহা করা হয় না, তাহাও আসিতে পারে না। সৎ—অসৎ হয় না, অসৎ—সৎ হয় না। কর্ম্মের কখন অত্যন্ত লয় হয় না। তাহা শক্তিরূপে আবার সঞ্চিত হয়। জগতের শক্তি (Energy) এক, অনন্ত, নিত্য। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সৃষ্টি নাশ নাই। তবে তাহার কার্য্য (kinetic) অবস্থা—ও শক্তি (potential) অবস্থা আছে। কার্য্য অবস্থায় যে শক্তি ব্যয় হয় বা ক্ষয় হয়, তাহাই অন্যত্র শক্তি অবস্থায় সঞ্চিত হয়। ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানাবিষ্কৃত শক্তির নিত্যত্ববাদ

---

(১) "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ।"
ন্যায়দর্শন, ৩।২।৬৪, ও ৪।১।৪১।

(২) "পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ।" ন্যায়দর্শন, ২।৩।১৯।

(৩) "প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ।"
ন্যায়দর্শন, ২।৩।৩২।

(Law of Conservation of Energy) এই তত্ত্ব আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে, আমরা যখন যে কর্ম্ম করি, যে চিন্তা করি, তাহা সূক্ষ্ম শক্তিরূপে, প্রতিঘাত (reaction) বলে, আমাদের অন্তরে (বা সূক্ষ্মশরীরে) সঞ্চিত হয়। ইহাই আমাদের সংস্কার। আমাদের মৃত্যুতে ইহার ধ্বংস হয় না। কেন না, শক্তির কখন ধ্বংস নাই। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা ব্যায়াম করিয়া শক্তি ব্যয় করিলেও, তাহাতে আমাদের কর্ম্মশক্তি ও দৈহিক বলের বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ আমরা একাগ্রভাবে বা ধারাবাহিকরূপে চিন্তা করিলে, সেই জ্ঞানক্রিয়ার সহিত আমাদের জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধি হয়। সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই এই নিয়ম। এইরূপে আমরা কর্ম্ম দ্বারা সংস্কার বা শক্তি অর্জ্জনের কথা বুঝিতে পারি।

এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারতত্ত্ব সম্বন্ধে এক আপত্তি আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। জড়জগতে জড়শক্তি নিত্য, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। এ কথা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য বটে। কিন্তু চৈতন্যজগৎ স্বীকার করিলেও, চৈতন্যশক্তি যে নিত্য, জড়কর্ম্মশক্তি যে চৈতন্য হইতে অভিব্যক্ত, অথবা উভয় শক্তিই যে এক মহাশক্তির বিশেষ বিকাশ, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা মন বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে জড় বলেন, মানসশক্তিকে বা সংস্কারকে জড়শক্তি বলেন, তাঁহারাও সাধারণ জড়শক্তিকে মানসশক্তিতে পরিণত হইবার কথা প্রায়ই স্বীকার করেন না। কেন না, উভয় শক্তিই বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক। সুতরাং জড়শক্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম মানসশক্তি বা চৈতন্যশক্তি সম্বন্ধে যে সেই নিয়ম হইবে, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অতএব, দেহনাশে দেহের সঞ্চিত জড়শক্তি নষ্ট হয় না,—কেবল রূপান্তরিক হয় বা কার্য্যাবস্থায় পরিণত হয় বটে, কিন্তু দেহনাশে মন বা তাহার সঙ্গে কোন জন্মার্জ্জিত সংস্কার থাকিয়া যায় না। তাহা হয় একবারে ধ্বংস হইয়া যায়, অথবা জড়শক্তিতে পরিণত হয়। আর আত্মা বা চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত থাকা স্বীকার করিলেও, উচ্চতর মানসশক্তি বা সংস্কার যে মৃত্যুকালে নিম্নতর জড়শক্তিতে পরিণত হইতে পারিবে না, এরূপ কোন নিয়ম কেহ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাঁদের কথা অনুসারে, মানবের জন্মগত বৈষম্যের কারণ পূর্ব্বে ছিল না, জন্মের সহিত সে বৈষম্য হইয়া থাকে, সেই বৈষম্যসৃষ্টিতে মানুষের নিজের হাত নাই, কেন না তাহার স্বাধীন ;শক্তি বা ইচ্ছা থাকিলেও, তখন তাহার সেই শক্তি বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য কবিবার কোন অবসর ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ রাজা বা ধনীর ঘরে জন্মিয়া আজন্ম স্বচ্ছন্দে থাকে। কেহ বা কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়া চিরদিন কষ্ট পায়। কেহ সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার উন্নত মনুষ্যত্ব বিকাশের সুবিধা পায়। কেহ অসভ্য রাক্ষস বা দস্যুর ঘরে জন্মিয়া অশিক্ষিত ও পাপরত হইয়া পড়ে। কাজেই যদি পূর্ব্বজন্মজ সংস্কার বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে বৈষম্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তবে এই বৈষম্য ও মানবের এই দুঃখক্লেশ সমুদায় আকস্মিক্ বা ঈশ্বরসৃষ্ট, ইহা বলিতে

হয়। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, তাঁহারা এই জন্মগত বৈষম্য ও এই দুঃখক্লেশ ঈশ্বরসৃষ্ট, একথা বলিতে বাধ্য। ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া কাহাকে সুখী বা দুঃখী করেন, মানুষের প্রতি অতি নির্দ্দয় প্রভুর ন্যায় ব্যবহার করেন, অথবা পিতামাতার পাপে পুত্র অযথা কষ্ট পায়, বাধ্য হইয়া একথা বলিতে হয়।(১) কিন্তু কর্ম্মফল স্বীকার করিলে একথা বলিতে হয় না। জগত সর্ব্বত্র নিয়মের অধীন—সর্ব্বত্র নিয়মের রাজ্য (reign of law) ঈশ্বর সেই নিয়মের নিয়ন্তা। এজন্য তিনি কর্ম্মফলদাতা মাত্র। এজন্য জড়জগতের ন্যায় চৈতন্যের রাজ্যেও শক্তির নিত্যত্ব নিয়ম একই, এ কথা স্বীকার করিতে হয় (২)। সুতরাং জগতের মূল নিয়ম সর্ব্বত্র এক, এই (Law of continuity) অনুসারে এক জন্মের কর্ম্মফল অন্য জন্মে ভোগ করিতে হয়, এ কথায় কোন বিজ্ঞানসম্মত আপত্তি হইতে পারে না। আর এ কথা স্বীকার করিলে উল্লিখিত বৈষম্যের কারণও সহজে বুঝা যায়।

এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি আছে। আমাদের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কোন স্মৃতি নাই, সুতরাং পূর্ব্বজন্মও নাই। কিন্তু আমাদের শৈশবের প্রথম তিন চারি বৎসরের কোন কথা স্মরণ নাই, অথচ তখন যে আমি ছিলাম না, এ কথা কখন মনে হয় না। আর আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সাধনাবলে যোগীগণ পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে পারেন, জাতিস্মর হন। বিশেষ অবস্থায়ও কদাচিৎ কাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনা বিশেষের স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং এ আপত্তি তত সঙ্গত নহে। অতএব এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারশক্তি স্বীকার করিয়া, গর্ভ হইতে মানবে কিরূপে সেই শক্তির ক্রিয়া হয়, কিরূপে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, সেই সংস্কারের বিকাশ হয়, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

২৬। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। জীবের জন্মান্তর স্বীকার করিলে, প্রত্যেক জীবের বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্ম গ্রহণও স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতির আপূরণে জীবের জাত্যন্তর হইয়া ক্রমে জীব মানবজন্ম লাভ করে, এ কথা বলিতে হয়। জগতে ক্রমোন্নতিই সাধারণ নিয়ম,—জীবের ক্রমবিকাশই জগতের মহাতত্ত্ব। যেমন প্রকৃতির আপূরণে প্রত্যেক জাতির জাত্যন্তরপরিণাম—আধুনিক বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক জীবকেও ক্ষুদ্র জীবাণু (amœba প্রভৃতি) বা ভ্রূণ অবস্থা হইতে মানুষ অবস্থায় আসিতে, নানাজাতীয় জীবজন্ম অতিক্রম করিতে হয়, ইহা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। সকল জন্মের সংস্কারই সূক্ষ্ম শক্তিরূপে প্রতেক জীবে থাকিয়া যায়। তাহার পূর্ব্বগৃহীত বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ বা পশু জন্মের সঞ্চিত সংস্কার সকলই তাহাতে

---

(১) "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ," ।—বেদান্ত দর্শন, (২ । ১ । ৪)।

এই সূত্রে ও তাহার শাঙ্করভাষ্যে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে এই কথা বুঝান হইয়াছে,—

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"—গীতা, ৫। ১৫।

(২) বিলাতী পণ্ডিত ড্রামণ্ড (Drummond) সাহেব সম্প্রতি তাঁহার "Natural Law in the Spiritual World," পুস্তকে এই কথা বুঝাইয়াছেন।

থাকিয়া যায়। তবে প্রকৃতির ক্রমআপূরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিম্নজাতীয় জীবজন্মের নিম্নশ্রেণীর সংস্কার সকল, পর পর উচ্চতর জন্মের উচ্চশ্রেণীর সংস্কারগুলি দ্বারা অভিভূত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে। তাই এই অসংখ্য সংস্কাররাশির মধ্যে যাহাদের দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উন্নত জন্ম লাভ হইতে পারে, আমাদের এই জন্মকালে, সেই সংস্কারগুলিই সাধারণতঃ আমাদের বাসনাবলে ও প্রকৃতির সহায়ে, বিশেষ শক্তিযুক্ত হইয়া স্ফুটনোন্মুখ হয়। বর্ত্তমান জন্মে, ইহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের সংস্কারই বিশেষ কার্য্যকরী হয়। পূর্ব্বজন্মে আমাদের উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকিলে, সেই উন্নত বা অবনত সংস্কার মধ্যে, যেগুলি পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুকালে বিশেষরূপে 'প্রদ্যোতিত' হইয়াছিল, তদনুসারে সাধারণতঃ আমাদের এজন্ম নিয়মিত হইয়া আমাদিগকে উন্নত বা অবনত করিতে পারে। তবে ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম, ক্রমাবনতি বিশেষ নিয়ম—একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আমাদের জন্মগ্রহণকালে আমাদের অসখ্য সংস্কার মধ্যে যেগুলি স্ফুটনোন্মুখ হয়, তাহার মধ্যে আবার যে গুলি দৈবানুগ্রহে অনুকূল অবস্থার সহায়তা পায়, কেবল সেইগুলির বিকাশ হয়। অন্য স্ফুটনোন্মুখ সংস্কারগুলি বীজ অবস্থায় বা অঙ্কুর অবস্থার থাকিয়া যায়। যেমন এক ক্ষেত্রে বহুজাতীয় উদ্ভিদের বহুবীজ রোপণ করিলে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হইতে পার না, অনেকগুলি অঙ্কুরিত হইয়াও 'আওতায়, বা প্রতিকূল অবস্থাবশে নষ্ট হইয়া যায়, কেবল সামান্য কয়েকটী বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে পায়, —আমাদের অসংখ্য সংস্কারবীজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানবের জন্মকালে তাহার পিতৃমাতৃশক্তি তাহার যে সকল স্ফুটনোন্মুখ সংস্কারের বিকাশ পক্ষে অনুকূল, হয়, সাধারণতঃ তাহার সেই সংস্কারগুলিই বিকাশিত হইয়া থাকে। সেই গুলিই কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট সংস্কার বীজঅবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

২৭। এই বিকাশোন্মুখ সংস্কার শক্তি বা প্রকৃতি লইয়া মানবজীবাত্ম, পিতা হইতে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হয়। গর্ভে, পিতৃমাতৃশক্তিসহায়ে, তাহার সংস্কার বিশেষ শক্তিযুক্ত হওয়ায়, প্রকৃতির অনুগ্রহে তাহার স্থূলশরীরের বিকাশ হয়। এইজন্য এই স্থূলশরীরকে পিতৃমাতৃজ শরীর বলে। এই পিতৃমাতৃশক্তি দ্বারা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী ভাব, মানসিকবৃত্তি প্রকৃতি প্রভৃতিও নিয়মিত হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রমতে,"ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ ভূতাত্মার সহিত ও সত্বরজতমোগুণের সহিত এবং দেবাসুরলভ্য অন্যান্য ভাবের সহিত গর্ভে অবস্থিতি করে।" (১) "তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যাদৃশ ভবিতব্যতা, সে দৈবযোগে" তাদৃশ মাতাপিতা ও অন্যান্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (২) এজন্য পিতৃমাতৃস্বভাব দ্বারা তাহার প্রাক্তন কর্ম্মজ অদৃষ্ট বা সংস্কার উপযোগী স্বভাবের বিকাশ হয়। তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"স্ত্রীপুরুষেরা যাদৃশ আহার, আচার ও চেষ্টা

---

(১) সুশ্রুতসংহিতা,—শারীরস্থান,—৩। ৩।

(২) "কর্ম্মণা চোদিতং জন্তোর্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ।
যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহৃদং জনয়েদ্ধি॥"
সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান,—৩।১৫।

সমন্বিত হয়, তাহাদের সহযোগে তাদৃশ পুত্রই জন্মিয়া থাকে।"(১) যাহা হউক, এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। (২)

এস্থলে যতদূর উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের শাস্ত্রে প্রাক্তনসংস্কারশক্তি বা সূক্ষ্মশরীর ও পিতৃমাতৃজশক্তি সহায়ে তাহার স্থূলবিকাশ,—এই তত্ত্ব বুঝান আছে। শাস্ত্রে এই উভয়শক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই উভয় শক্তিক্রিয়ার সুন্দর সামঞ্জস্য করা আছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহার বিকাশ হইতে পারে না। আর যাহাতে যাহা আছে, তাহারও, অনুকূল অবস্থার সাহায্য ব্যতীত, স্বতঃবিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। এই পিতৃমাতৃজ শক্তি—আমাদের অনুকূল অবস্থা মাত্র। ইহাকে কখন আমাদের মূল স্বাভাবিক শক্তি বলা যাইতে পারে না। এজন্য আমাদের মধ্যে যে শক্তি নাই,—প্রাক্তনজন্মজ যে সংস্কারবীজ বা ধর্ম্ম নাই, তাহা আমাদের পিতৃমাতৃজ শক্তি বা কোন শক্তি সহায়েই বিকাশিত হইতে পারে না। আর যে সংস্কার এ জীবনে স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে, তাহাও পিতৃমাতৃজ শক্তির সহায়তা বিনা বিকাশিত হইতে পারে না। এই উভয়ের মধ্যে সহায়তা বা সংযোগকে আমাদের শাস্ত্রে দৈবসংযোগ বলে। ইহাই আধিদৈবিকশক্তি। আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তি দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি ফলোন্মুখ হইলে, বিধাতা বা মহাপ্রকৃতি তাহার বিকাশ জন্য অনুকূল অবস্থার সংযোগ করিয়া দেন। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকেই আমাদের কর্ম্মফলদাতা বলা হইয়া থাকে। বলিয়াছি ত, সমুদায় জগৎটা এক অখণ্ড সনাতন নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান তাহার নিয়ন্তা। সমস্ত জগৎই এক সুরে বাঁধা। সর্ব্বত্র এক মহাসঙ্গীতের মহাবিকাশ। এই বহুত্ব মধ্যে সর্ব্বত্র সেই মহা একত্বের লীলা। এজন্য ভগবানের অনুগ্রহে, বা তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তি সহায়ে, আমাদের সংস্কারানুযায়ী বিকাশের জন্য অনুকূল অবস্থার সংযোগ সর্ব্বত্রই সম্ভব। আমাদের অদৃষ্ট অনুকূল হইলে, আমাদের উপর সুদূর গ্রহগণের বা জড়জগতের যে ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহাও অনুকূল হয়। কিন্তু সে সকল অবান্তর কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, দৈব অনুগ্রহে, অনুকূল পিতৃমাতৃশক্তি ও অন্যান্য অনুকূল অবস্থার সহায়ে, আমাদের স্ফুটনোন্মুখ পূর্ব্বসংস্কার বা অদৃষ্টের অনুরূপ শরীরাদি বিকাশিত হয়। (৩)

মানবজীবাত্মা যখন এই পূর্ব্বসংস্কার অনু-

---

(১) "আহারাচার চেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রী পুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি
তাদৃশঃ॥"

সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান,—২।৪৬।

(২) স্থূলশরীর সম্বন্ধে সুশ্রুত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, "গর্ভে যে শরীর বিকাশ হয়, তাহা পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বজ ও সাত্ম্যজ। ইহার মধ্যে কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির অঙ্গ সকল পিতৃজ। আর মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র প্রভৃতি মৃদু অঙ্গসকল মাতৃজ।

সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থান,—৩।১৯।

(৩) আমাদের শাস্ত্রে আছে,—
"জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তদেবাভ্যসতে নরঃ।

সারে মানবজন্ম লাভ করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা যখন তাহার সেই সংস্কার তাহাকে উপযুক্ত মানবজন্ম লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে, তখন সে অন্য জাতীয় জীব শরীরে থাকিয়া, বা তথা হইতে সেই জাতীয় জীবমাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াও, সে জাতীয় জীবশরীর গ্রহণ করিবে না। যতদিন সে মানবপিতার শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে, মানবপিতা হইতে মানবমাতৃগর্ভে গিয়া মাতৃশোণিতস্থ অণ্ডে প্রবেশ করিতে না পায়, ততদিন তাহার স্থূলশরীর গ্রহণ সম্ভব হইবে না। শুধু তাহাই নহে। যে মানবজীবাত্মা তাহার স্ফুটনোন্মুখ শ্রেষ্ঠ সংস্কার বলে শ্রেষ্ঠবর্ণের মানবগৃহে জন্মিবার অধিকারী, সে যতদিন সেই শ্রেষ্ঠবর্ণের পিতারশরীরে প্রবেশ করিতে না পায়, ততদিন তাহার জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। তেমনই যে বীজ হইতে শৃগাল বা কুক্কুর শাবক জন্মিতে পারে, মানবমাতৃগর্ভে স্থান পাইলেও তাহার শরীরগ্রহণ সম্ভব হইবে না। অতএব অনুকূল অবস্থা ও উপযুক্ত পিতামাতা লাভ করিতে না পারিলে, মানবজীবাত্মা শরীরগ্রহণ করিতে পারে না, ইহা আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যদি বাহ্য ঘটনাস্রোতের উপর বা আকস্মিক্ সংযোগের (বা chance এর) উপর এই ব্যাপার নির্ভর করিত, তবে বুঝি অধিকাংশ মানবজীবাত্মা আর জন্মগ্রহণ করিতে পাইত না। এইজন্য দৈব অনুগ্রহে, যথাসময়ে, অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার স্ফুটনোন্মুখ হইয়া শরীরগ্রহণের জন্য স্বাভাবিক অন্ধ চেষ্টার সময়ে, মানবজীবাত্মা অনুকূল পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, একথা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। (১)

২৮। এইরূপে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে মানবজীবাত্মা শরীর গ্রহণ করে। পিতামাতার দেহ যত পরিপুষ্ট হয়, যত ব্যাধিহীন, সবল ও কান্তিমান হয়, সন্তানের, শরীরও, সেইরূপ পরিপুষ্ট নীরোগ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। পিতামাতার মনোবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি বা চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি যত পরিণত হয়, সন্তানেরও এই সকল অন্তঃকরণ বৃত্তির ততদূর পরিণতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি পিতামাতার শরীর রুগ্ন, ক্ষীণ, দুর্ব্বল বা অল্পায়ু হয়, সন্তানও সেইরূপ রুগ্ন, জীর্ণ ও বলহীন হয়। পিতামাতার মনোবৃত্তি অপরিণত হইলে, সন্তানের মনোবৃত্তিও অপরিণত হইয়া থাকে। যে পিতামাতা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহার সন্তানের সাত্ত্বিকস্বভাব হইতে পারে। আর যে পিতামাতা তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত, তাহার সন্তানও তামসিক প্রকৃতিযুক্ত হইয়া থাকে। যে পিতামাতার ধর্ম্মে মতি থাকে, ও জ্ঞানচর্চ্চায় প্রবৃত্তি থাকে, তাহার সন্তানেরও মতিগতি ও প্রবৃত্তি কতকটা সেইরূপ হইতে পারে। আর যে পিতামাতা স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব, তাহার সন্তানও প্রায় সেইরূপ আত্মসর্ব্বস্ব হইবার প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জন্মের প্রাক্কালে মানুষের সংস্কার

(১) আমরা তায় পাইয়াছি যে, এজন্মে যে যোগভ্রষ্ট হয়, সে পরজন্মে শুচী শ্রীমানের গৃহে অথবা যোগীদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদৈহিক বুদ্ধি লাভ করে। গীতার শ্লোক এই,—

> "প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
> অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
>
> * * * *
>
> তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।"
>
> গীতা, ৬।৪১—৩।

স্ফুটনোন্মুখ হয়,—যেরূপ স্বভাব বিকাশের উপযোগী হয়, দৈবানুগ্রহে মানুষ সেইরূপ স্বভাবসম্পন্ন পিতামাতা পাইয়া থাকে। অন্যদিক্ হইতে দেখিলে আমরা একথাও বলিতে পারি যে, যখন মানুষে মানুষে পশুত্ব ও মানবত্ব উভয়বীজই নিহিত আছে, মানবে সাধারণ জীবভাব আছে, নানাজাতীয় জীবজন্মের সংস্কারবীজ নিহিত আছে,—তখন তাহার পিতামাতা পাশবপ্রকৃতি হইলে, তাহারও প্রায় সেইরূপ হেয় পাশব সংস্কারের বিকাশ হয়, পিতামাতা, সাধুপ্রকৃতি হইলে, তাহারও প্রায়ই উন্নত সংস্কারের বিকাশ হইয়া থাকে। আর তাহার অন্য সংস্কারগুলি পিতৃমাতৃশক্তিসহায়ে বিকাশের সুবিধা না পাইয়া বীজ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

অতএব মানুষ সাধারণতঃ পিতামাতার অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, একথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, মনুষ্যত্বের উপযুক্ত বিকাশের জন্য মানুষের উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতার প্রয়োজন। সমাজসহায়েই আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়,—আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। একথা সত্য হইলে, সমাজসহায়েই আমাদের পিতামাতার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ যত উন্নত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে মনুষ্যত্বের উচ্চ বিকাশ হইতে পারে,—আমরাও সেই পরিমাণে উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতা লাভ করিতে পারি। অসভ্য রাক্ষসপ্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্যমাংসভুক্ লোকের সমাজে, মানুষ এইরূপ রাক্ষস-প্রকৃতি-সম্পন্ন পিতামাতাই পাইয়া থাকে। কাজেই সেখানে মানবশিশু এই রাক্ষস-প্রকৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের জন্মগ্রহণ সময়, আমাদের স্ফুটনোন্মুখ সংস্কার বিকাশের অনুকূল পিতামাতা দিয়া, সমাজ আমাদের গড়িয়া লয়। অথবা সমাজ আমাদের যেরূপ পিতামাতা দেয়, আমাদের সেই পিতামাতার অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতিরই বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে, প্রথমে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতে, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে সমাজ আমাদের সহায়তা করে।

হিতৈষীদল—টাকা ও যশ মানের কুহকে !

দশ বৎসর পূর্ব্বে পলাশী এবং মুর্সিদাবাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। মুর্সিদাবাদের নবাববাড়ী বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিস। রাণী ভবানীর বড়নগর এবং আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে জৈনদিগের নানা কীর্ত্তিও দেখিবার জিনিস। মুর্সিদাবাদের নবাব বাড়ীর দরবার-গৃহ অতি সুন্দর। এই স্থানে পূর্ব্বে খেলাত প্রদত্ত হইত;—গবর্ণমেণ্টের আমলেও এই স্থান হইতে নানা উপাধি প্রদত্ত হইত। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মুর্সিদাবাদ যাইয়া এই গৃহে দরবার করিয়া খেলাত দিয়া আসিতেন। কালপ্রভাবে মুর্সিদাবাদের পতিতপাবনী গঙ্গা সেটদিগের কীর্ত্তিরাশি উদরস্থ করিয়া যেমন এত পাপ হজম করিতে না পারিয়া ক্ষীণ-কলেবরা, শুষ্কদেহা হইতেছেন, তেমনি, বঙ্গের পূর্ব্ব গৌরব

"সহর"নামধেয় রাজধানী, মিরণ এবং মিরজাফরের পাপপূর্ণ দেহাস্থি সকল উদরস্থ করিয়া হজম করিতে না পারিয়া, মলিন, নিষ্প্রভ, জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া মানব-বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। জীবনী-শক্তি বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া বহরমপুর হইতে সৈন্য-নিবাস যেমন গবর্ণমেণ্ট তুলিয়া আনিয়াছেন, তেমনি, দরবার গৃহ ইত্যাদি হইতেও উপাধি-প্রদানের অধিকার তুলিয়া আনিয়াছেন এবং নবাবের বংশানুক্রমিক উপাধি খর্ব্ব করিয়া, পরিচয়ের অযোগ্য করিয়া, আমবাগানের প্রভূত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। হায়রে কাল! পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এইরূপেই পৃথিবীতে হয়!!

নবাব-বাড়ীর দরবার-গৃহে দাঁড়াইয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম। অসার উপাধির জন্য পৃথিবীর লোক এত লালায়িত কেন, ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। কি এক মোহময় কুহক!

পূর্ব্বে ভাবিতাম, উপাধি ও সম্মানের জন্য প্রকৃত বড় লোকেরা লালায়িত হন না। পাশ্চাত্য জগতের মহামতি গ্লাডোষ্টোন, ব্রাইট প্রভৃতি এবং আমাদের দেশের ঋষিপ্রতিম বিদ্যাসাগর, রামতনু প্রভৃতি লালায়িত হইতেন না। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। সম্প্রতি একখানি পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, পাসমোর এড্ওয়ার্ড নামক মহাত্মাকে আমাদের সম্রাট উপাধি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। কৃতজ্ঞতা সহকারে সম্রাটকে জানাইয়াছেন, "আপনার জননীও আমাকে উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে তাহাও গ্রহণ করি নাই, আপনার এই অযাচিত কৃপার দানও গ্রহণ করিতে পারিলাম না।" এই মহাত্মার কথা ভাবিতেছিলাম, আর আমাদের দেশের উপাধিলোলুপ মহাপুরুষদের কথা ভাবিতেছিলাম! কি ভেল্কির উপর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে চায় রে!

সম্মান-পিপাসা এ দেশের লোকের মধ্যে দিন দিন এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, প্রকৃত মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পূজা অর্চ্চনা, দান ধ্যান, ধর্ম্ম কর্ম্ম, পুণ্য প্রতিষ্ঠা, সব এখন ঐশ্বর্য্য ও সম্মান-দেবীর শ্রীচরণে উৎসৃষ্ট! হায়রে কুহক!

মহাত্মা ব্রাড্ল সাহেব লাট সভার প্রতিনিধি-প্রয়োগ আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আইনে পরিণত হইল না যখন এবং যখন লর্ড ক্রসের প্রতিনিধি আইনের খসরা প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন এ দেশের কত কত হিতৈষী ও সম্পাদক তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা রুটী চাহিয়াছিলাম, ইষ্টক-টুকরা পাইলাম!" আজ কাল সেই ইষ্টক-টুকরা লইয়া কত মারামারি ও কাড়াকাড়ি চলিয়াছে, দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইতেছি। "হায় রে হিতৈষণা!"

মহাত্মা গ্লাডোষ্টোন সাহেব যখন আয়রলণ্ডের হোমরুল দিতে সমর্থ হন নাই, তখন আমাদের মধ্যে যত বড় বিজ্ঞ এবং কৃতী ব্যক্তিই থাকুন না কেন, কাহারও কথায় গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিবেন না, ইহা নিশ্চয়। এ কথা কে না বুঝিতেছেন? লাট-সভার প্রতিনিধির সংখ্যা যেরূপ সংখ্যানুপাতে নির্দ্ধারিত হয়, কোন কালে কোন সৎপ্রস্তাব গৃহীত হইবে না। এই কয়েক বৎসরের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, তাহা

হয়ও নাই। তবুও লাট-সভায় যাইবার জন্য এত উল্লাস কেন? ইহা হিতৈষণার উত্তেজনা নহে; কেন না, সেখানে হিতসাধনের সম্ভাবনা নাই। তবে কেন এত মাতামাতি, মারামারি, কাড়াকাড়ি? সম্মানের প্রত্যাশা ভিন্ন আর কিছু আছে কি? কেহ কেহ বলেন, পবিত্র দেশসেবা ব্রতই এস্থলে পরিচালক। দেশসেবার অনেক উপায় আছে, এখানে সে সম্ভাবনা নাই, কেন না, গবর্ণমেণ্ট কাহারও কথা শুনিবেন না। ইম্পিরিয়ালিজমের প্রাবল্যে সব আশা নির্ব্বাণ। টাকা রোজগারের কথা কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিকট এত অভিযোগ তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শুনিতেছি, মিউনিসিপাল কমিসনারি, অনারেরি-ম্যাজেষ্ট্রেটের ও বোর্ডের সভ্যের এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতির পদ এখন নাকি অর্থাগমের সুন্দর পন্থা রূপে পরিগণিত হইয়াছে! তবুও ইহা ভাবিতে কষ্ট হয় যে, আমাদের দেশের শিরোভূষণ যাঁহারা, তাঁহাদের মতিগতি এত নীচগামী! গঙ্গেশ বাবু লিখিয়াছিলেন—"এ দেশের হিতৈষীর মূল্য পাঁচ টাকা।" কালে সেই কথাই কি সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে?

এ দেশের অনেক দোষী এবং অপরাধী ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সম্মান দ্বারা জীবনের ক্লেদ-রাশি, ভস্মাবৃত মলের ন্যায়, ঢাকিতে চেষ্টা করিতেন। "সমাজ, তুমি আমার দুষ্কৃতির জন্য কি ভয় দেখাও, আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়া সম্মান-গঙ্গা আনিয়া বংশের সমস্ত ক্লেদ ধৌত করিব।"—এইরূপ আস্পর্দ্ধার কথা কত স্থানে শুনিতাম! শুনিয়াছি, কত কত সতীত্ব নাশ, কত কত নরহত্যা, কত কত মহারথী টাকার দ্বারা উড়াইয়া দিয়া, কত কত উপাধি পাইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া ফিরিতেছেন। টাকায় সকলের মুখ বন্ধ, গবর্ণমেণ্টও নীরব। বুঝিবা ক্রমে ক্রমে দেখিতে হইবে, উপাধিগুলা দস্যু, লম্পট, ব্যভিচারী, নরহন্তাদিগেরও শিরোভূষণ হইবে। বুঝিবা, দুষ্কৃতি ঢাকিবার একটা মহা পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে! আর তোমার স্বায়ত্ত-শাসনের সম্মানগুলি? নেমকহারামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিতেছে। ভাবিতে, বলিতে, লিখিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়!!

পার্ণেল সাহেবের যখন মহাপতন হইল, তখন গ্লাডোষ্টোন সাহেব তাঁহার সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। মিসর সমরের দুর্নীতি স্মরণ করিয়া মহাত্মা ব্রাইট, বিংশ বৎসরব্যাপী বন্ধুত্ব-মায়া তুচ্ছ করিয়া, গ্লাডোষ্টোনের মন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর আমাদের দেশের বড় বড় কীর্ত্তিধ্বজী প্রচারকও, ধনী ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী ও কত কত ধনী দুর্জ্জনের সঙ্গ-লাভ প্রয়াসী। কেহ কেহ বলেন, প্রচারকগণ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের বন্ধুত্ব-ভিখারী। বাস্তবিক তাহা সত্য হইলে ধনী দরিদ্র সকল অনমুতপ্ত অপরাধীর বাড়ীতেই তাঁহাদের গতিবিধি হইত, দরিদ্র অপরাধীদিগের জন্য তাঁহাদের এত তীব্র শাসন, এত ঘৃণা দেখা যাইত না,—তাঁহারা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেখান হইতে দূরে পলায়ন করিতেন না। অনুতাপ ভিন্ন কাহারও উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক যখন মহাত্মা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বা শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দিগকে চরিত্রহীন অনমুতপ্ত ধনীর পদলেহন করিতে দেখি, তখন লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা

হয়। অতি কষ্টে এ সব কথা লিখিতেছি। টাকা ও যশের স্পৃহায় সকল বিশুদ্ধ মত, সকল সাধন, সকল পুণ্য বিলোপ করিয়া ফেলিতেছে। ঘটনায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া, উপদেষ্টার সকল মৌখিক উপদেশ লোকেরা ভুলিয়া যাইতেছে।

ধর্ম্মরাজ্যে যেরূপ প্রতাপচন্দ্র ও শিবনাথ, জ্ঞানবিজ্ঞান রাজ্যে তেমনি নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। প্রতাপচন্দ্র এবং শিবনাথের উপদেশে মোহিত হয় না, এমন লোক বিরল; তেমনি, নগেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও মন্তব্য পাঠে চমকিত হয় না, এমন লোক বুঝিবা আরও বিরল। মনে করিতাম, ইঁহারা যশ, সম্মান, টাকার মায়া অম্লানচিত্তে ধর্ম্মভাব এবং জ্ঞান প্রভাবে তুচ্ছ করিতে পারেন। কিন্তু হায়! পরীক্ষায় কি দেখিতেছি? শ্যামা রমা, আমি, তুমি যে কাজে ব্রতী হইতে চাই, ইঁহারাও তাহারই জন্য লোলুপ। যশ সম্মানের কুহকে ভুলিবার কত অগণ্য লোক রহিয়াছে, তাহারা ভুলুক; সদস্য পদের ভিখারী যে-সে-হয় হউক;—উপাধীর কাঙ্গাল যে-সে-হয় হউক, মানুষের মত লোক কেন এদিকে নজর রাখিবেন। উঁহাদিগকে আমরা সাধারণের উপরে উঠিতে দেখিতে চাই। কিন্তু হায়, এদেশে আর তাহা হওয়ার উপায় নাই। মাটীর দোষ কি না, কে জানে? ধর্ম্ম, তুমি কোথায়? মহাজ্ঞান, তুমি কোন্ অন্ধকারে লুক্কায়িত হইলে? তোমার সেবকদিগকে যশ, মানের বাজারে বিক্রীত হইতে আজ ছাড়িয়া দিয়া তোমরা কোথায় লুকাইলে?

না—আদর্শ দেখিবার চেষ্টা এই বঙ্গে বৃথা। বিদ্যাসাগর, রামতনু যখন গিয়াছেন, তখন আর এদেশে মহত্বানুপ্রাণিত স্বাধীন জীব দেখিবার আশা করা বৃথা। উত্তাল তরঙ্গাকারে যশ মানের কুহক, টাকার প্রলোভন, উপাধির আকর্ষণ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গের সকল কৃতিত্ব, সকল মহত্ব, সকল জ্ঞানগরিমা, সকল পুণ্যপ্রতিষ্ঠা, সকল ধর্ম্মচরিত্র প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, কালে আরো ফেলিবে! স্বাধীনতা ও মহত্বের বাতি জ্বালাইতে ভারতবংশে বুঝিবা কেহই থাকিবে না!

বাস্তবিক আমরা যাহা কখনও ভাবি নাই, তাহাই দেখিয়া দেখিয়া মরিয়া যাইতেছি। বাঁচিয়া থাকিলে আরো কত যে কি দেখিতে হইবে, কে জানে?

উপনিষদের উপদেশ। (৬)

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মই যে বিশ্বের একমাত্র কারণ, ইহা বুঝাইবার জন্য অন্য একরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধ্যাদিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই "জীব" ব্যবহার। যতদিন এই বুদ্ধি বা মন আছে ততদিন জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্ন অবস্থা অনুভূত হইয়া থাকে। এই মন বিলীন হইলেই মানুষের সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হয়। এই সুষুপ্তির অবস্থা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থার সহিত একরূপ। ব্রহ্ম হইতেই যখন মন, বুদ্ধ্যাদি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; মন যখন ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মায় লীন হইয়া গেল, তখন জীবও

ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেই। কেন না, এই মনই ব্রহ্মচৈতন্যের "জীবত্ব" প্রাপ্তির হেতুভূত। জীবের এই সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি বুঝাইবার জন্য, আরুণি শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেনঃ—

"পুত্র? দর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ার পরে, যদি সেইস্থান হইতে দর্পণটীকে সরাইয়া লওয়া যায়, তখন যেমন আর সে প্রতিবিম্ব থাকে না, প্রতিবিম্বটি যেমন তখন পুরুষকেই পুনঃ প্রাপ্ত হইল বলিয়া বলা যাইতে পারে; সেইরূপ মনের যখন উপরম হয়, তখন মনে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও, জীব-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করতঃ আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকে। জীব নিদ্রাবস্থায় যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তাহাতে সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে। সুখ-দুঃখাদি, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফল মাত্র। সুতরাং সে অবস্থায়, অবিদ্যার কার্য্যের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকে; তাই, তখন বাসনা ও সুখ-দুঃখাদির অনুভূতিও হইতে থাকে। অতএব এই স্বপ্নাবস্থাকে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির অবস্থা বলা যাইতে পারে না; কেন না, সে অবস্থায় মনের প্রায় সমস্ত বৃত্তিগুলিই জাগরূক থাকিয়া যায়। গাঢ় সুষুপ্তি কালে, এরূপ সুখ-দুঃখাদির কোন অনুভূতি থাকে না; তখন জীব আত্মস্বরূপে একতাপ্রাপ্ত হয়; তখন তাহার মন বুদ্ধি প্রভৃতির সংসর্গকৃত যে জীবাবস্থা, তাহা আর থাকে না। জাগ্রদবস্থায়, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম হেতু সুখ-দুঃখাদি নানাবিধ বিষয়বাসনাক্রান্ত হওয়াতে, নানাবিধ ব্যাপারে অবিরত নিযুক্ত থাকে বলিয়া, যখন উহারা অতীব পরিশ্রান্ত হয়, তখন উহারা স্ব স্ব ব্যাপার হইতে উপরত হয়। তখন বাক্য, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি উপরত হইয়া, প্রাণে বিলীন হয়। একমাত্র প্রাণশক্তি তখন দেহে জাগরূক থাকে। এইরূপে যখন ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি শ্রান্ত হয়, তখনই কেবল জীব শ্রমাপনোদনের জন্য, উপরত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করে।

যেমন ব্যাধের হস্তস্থিত সূত্রের অগ্রদেশে একটী পক্ষী আবদ্ধ থাকিলে, সেই পক্ষীটী বন্ধন হইতে বিমোচিত হইবার আশায়, চারিদিকে নিয়ত উড়িতে থাকে; এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে সেই বন্ধন স্থানেই বিশ্রামের জন্য পুনরাপতিত হয়; —সেইরূপ এই বিষয়বাসনাক্রান্ত জীব,—এই অন্নরসাদিদ্বারা পরিপুষ্ট-মনঃ-প্রতিবিম্বিত জীব—জাগৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সুখদুঃখাদি নানা প্রকার বিষয়ে অবিরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, পরিশ্রান্ত হইলে, নিজের বন্ধন স্থান স্বরূপ প্রাণশক্তিরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে,—আসিয়া পুনরাপতিত হয়।

জীবদ্বারা ভুক্ত কঠিন দ্রব্য, পীত জল রসাদি দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া যায়। গোপালক যেমন গাভীগুলিকে চালিত করে, সেনাপতি যেমন নিজ সেনাগণকে নিয়োজিত করে; সেইরূপ জলও, অন্নকে চালিত ও রসাদিরূপে পরিণত করাইয়া দেয়। বটকণিকা হইতে যেমন ক্রমে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই অন্নরসাদি হইতেই এই শরীরের উৎপত্তি হইতে থাকে। ভুক্ত অন্ন, জল দ্বারা দ্রবীভূত হইলে, তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া রসাদির আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি, হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র উদ্ভূত হয়। এইরূপে স্ত্রীজাতি দ্বারা ভুক্ত অন্নও ক্রমে শোণিতে পরিণত হয়। অন্নের বিকার স্বরূপ সেই শুক্র ও শোণিতযোগে এই শরীর উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ বিলোম প্রণালীতে, যেমন দেহের মূল অন্ন; সেই রূপ অন্নের মূল জল, জলের মূল তেজ; (তেজের মূল বায়ু, এবং বায়ুর মূল আকাশ) এবং ইহার মূল সেই একমাত্র সৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু। তাহাই একমাত্র সত্য; আর সমুদয়ই বিকার বলিয়া মিথ্যা। অতএব এই বিশ্বের মূলে সেই একমাত্র সৎ বিদ্যমান আছেন; বিশ্বের এই বিকারময় স্থিতি কালেও, সেই একমাত্র সৎকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে। মৃৎ ব্যতিরেকে যেমন ঘটের পৃথক স্বাধীন সত্বা অসম্ভব, সেইরূপ এই ব্রহ্মসত্বাকে বাদ দিলেও এ জগতের স্বাধীন সত্বা থাকিতে পারে না। প্রলয়েও এজগৎ সেই সদ্বস্তুতেই বিলীন হইয়া অবস্থিত রহিবে।

এই ভুক্ত অন্নজলাদি হইতে কিরূপে মন, বাক্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিবরণ তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি; এস্থলে আজ তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়ো-

জন। এই দেহ যখন বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন প্রাণাদি শক্তিও কিরূপে অন্তর্হিত হয়, তাহাও তোমায় বলিয়া দিতেছি। জীবের মৃত্যুর সময়ে বাক্য মনে লীন হয়, কেন না, মনের দ্বারাই বাক্য উচ্চারিত হয়; তখন মৃতের জ্ঞাতিরা বলিতে থাকে যে, "হায়! এ আর কথা বলিতে পারিতেছে না"! এইরূপে বাক্য উপসংহৃত হইবার পর, কেবল মনের ক্রিয়া মাত্র জাগরূক থাকে। এই মনন ক্রিয়াও পরে প্রাণে বিলীন হয়, তখন পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে থাকে যে—"হায়! এ আর কিছুই জানিতে পারিতেছি না" তৎপর এই প্রাণশক্তি হস্তপদাদির বিক্ষেপ জন্মাইয়া সমুদয় মর্ম্মস্থান (Vital portions) গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া তেজঃশক্তিতে বিলীন হয়; তখন মুমূর্ষুর জ্ঞাতিবর্গ বলিয়া উঠে যে,—"এই যে, ইহার স্পন্দন শক্তিও রহিত হইল"। তখন দেহে কেবল উষ্ণতা মাত্র অনুভূত হয়। তৎপরে, এই তেজ উপসংহৃত হইয়া আত্মায় বিলীন হইয়া যায়। যাহারা অজ্ঞানা,—অর্থাৎ যাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণরূপে জন্মে নাই, এরূপ জীব মৃত্যুর পর তথা হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া অন্য দেহ আশ্রয় করে। অতএব সৌম্য, এখন ত বুঝিলে যে, একমাত্র সদ্বস্তুই জগতের কারণ, এবং জীব তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। জগতের মূল এই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং এ জগৎও সেই সূক্ষ্ম সদাত্মক। উহা নিত্য, সত্যরূপে বর্ত্তমান। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক নহ"।

প্রিয় পাঠক, মৃত্যুকালে জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় কিরূপে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, একথা আরুণির মুখে শুনিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলের বিবরণটী আরও বিস্তৃত এবং তাহাতে আরো নূতন কিছু কথা আছে। বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া এবং প্রাচীন কালে এবিষয়ে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য, আমরা এস্থলে, বৃহদারণ্যক হইতে সেই অংশটীও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

আদিত্য ও চক্ষুরিন্দ্রিয় একই উপাদান হইতে গঠিত; একই তৈজস উপাদান হইতে উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে। জীব যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন একজাতীয় উপাদান হইতে জাত বলিয়া, আদিত্য এই চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। কেন না, রূপদর্শন আলোক-সাপেক্ষ। এইরূপ অগ্নি ও বাক্য একজাতীয় পরমাণু হইতে উৎপন্ন; উভয়ই তৈজস। প্রাণ ও বায়ু একজাতীয় পরমাণু হইতে জাত; উভয়ই বায়বীয়, ক্রিয়াত্মক। সেই জন্য জীবিতাবস্থায়, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যকারীরূপে বর্ত্তমান থাকে। একের কার্য্য, অপরের কার্য্যের উপরে নির্ভর করে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, সূর্য্যকিরণের ক্রিয়া (action) চক্ষুর উপরে পড়িয়া, চক্ষু হইতে যে প্রতিক্রিয়া (reaction) উপস্থিত করে, তাহাতেই দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইরূপ, বাক্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। মৃত্যুর সময়ে, সজাতীয় বৃহৎ বস্তু বলিয়া, এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি, সূর্য্যাদিতে প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ একজাতীয় পরমাণু, সজাতীয় পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া লয়। পুনর্দ্দেহ গ্রহণকালে, জীব সূর্য্যাদি হইতে পুনরায় এই ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। ইন্দ্রিয়গুলি যে জাতীয় অণুদ্বারা নির্ম্মিত, তাহা উপরে, মৃত্যুকালে, সেই সেই জাতীয় বাহ্যিক অণু সকল যখন আর ক্রিয়া উপস্থিত করে না, তখন ঐ ঐ ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি, লিঙ্গাত্মার সঙ্গে এক হইয়া যায়—মিশিয়া যায়। আদিত্যের কার্য্য যখন চক্ষুর উপরে নিবৃত্ত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়শক্তি লিঙ্গাত্মায় লীন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ক্রমে এইরূপ

হইলে, লোকে বলে যে, 'এই মুমূর্ষু আর দেখিতেছেনা, শুনিতেছেনা' ইত্যাদি। এই রূপে ক্রমশঃ বাহ্যক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি বুদ্ধিতে লীন হইয়া যায়। এইরূপে আত্মায় লীন ভাবে স্থিত ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধিশক্তি লইয়া, আত্মা শরীরত্যাগ করে। সূক্ষ্মকর্ম্মসংস্কার ও বাসনাবিশিষ্ট ও এই ইন্দ্রিয়সমষ্টি ও বুদ্ধি লইয়াই লিঙ্গদেহ"। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মসংস্কার এই দেহে লীন থাকে। তাহার বশেই জীবকে টানিয়া লইয়া গিয়া যথোপযুক্ত স্থানে উপস্থিত করে। বাসনা ব্যতিরেকে কাহারও কোন কর্ম্ম করিতে বা ফলভোগ করিতে দেখা যায় না। অনভ্যস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয় না। পূর্ব্বানুভূত বাসনা বা প্রবৃত্তি দ্বারাই ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই দেখা যায় যে, বিনা অভ্যাসেও কাহার কাহার কোন বিষয় বিশেষে আপনা আপনি কৌশল প্রকাশ পায়। আবার অতি সহজ কার্য্যেও কাহার কাহার নিপুণতা দৃষ্ট হয় না। এগুলি সমস্তই পূর্ব্ব-বাসনা বশতঃই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান, কর্ম্ম ও বাসনা,—এই তিনটী সঙ্গে যায়।

আধিদৈবিক ভাবে ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন হইলেও, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকরূপে, ইহারা পরিচ্ছিন্ন ও সান্ত। অতএব ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি বিশ্বব্যাপক হইলেও, জীবের স্ব স্ব কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনানুসারে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির প্রকাশ ও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। (আধিদৈবিক —পরমাণুরূপে; আধিভৌতিক—সূর্য্য, অগ্নি জল, বায়ুরূপে আধ্যাত্মিক—চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতিরূপে)। অন্য দেহ আরম্ভ হইবার সময়ে, জীবের কর্ম্ম—বাসননাবলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি,—যাহা সূক্ষ্ম ভাবে লীন ছিল এবং যাহা লইয়া জীবের গতি হইয়াছে,—স্বীয় স্বীয় বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে। এইরূপে স্থূল দেহে সূক্ষ্মদেহের অভিব্যক্তি নিষ্পন্ন হয়। স্থূলদেহে, সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির এইরূপে অভিব্যক্তি হইলেই, আদিত্যাদিও উহাদের সহায়রূপে উপস্থিত হয়।

এসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের অন্যস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে, উপরি উক্ত বিষয়টী আরো পরিষ্কার হইবে বলিয়া, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত— এই দ্বিবিধ রূপ বা প্রকাশ। পৃথিবী, জল, তেজ, এই তিনটী মূর্ত্ত, এবং ইহাদের পরস্পরের অণু পরস্পরে প্রবিষ্ট আছে। ইহারা ঘনীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, ইহারা পরিচ্ছিন্ন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহারা যথাক্রমে, কৃষ্ণ, শুক্ল ও লোহিত গুণবিশিষ্ট। সূর্য্যমণ্ডলই এই তিন ভূতের সারভূত শ্রেষ্ঠ অংশ। (এই ভূতত্রয় পরস্পর মিলিয়া, গুণপ্রধানভাবে যে সকল আধিদৈবিক বাহ্য স্থূলকার্য্য উৎপন্ন করিয়াছে, তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল প্রধান বলিয়া, শ্রুতি, অন্য দৃশ্য পৃথিবী, দৃশ্য জল প্রভৃতির কথা না বলিয়া, কেবল সূর্য্যমণ্ডলের কথাই বলিয়াছেন)। অবশিষ্ট সূক্ষ্ম বায়ু ও আকাশ ভূত,—ইহারা অমূর্ত্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং ইহারা বিভাগানর্হ। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম আধিদৈবিক ইন্দ্রিয়শক্তিই, এই ভূতদ্বয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। ইহারা সকলেই অচেতন; ইহারা ব্রহ্মের অধিদৈবত রূপ। বোধ হয়, শ্রুত্যুক্ত এই বিবরণের ভাবার্থ এই যে, সূর্য্য হইতেই যখন প্রাণী ও উদ্ভিদাদি বাঁচিয়া থাকে এবং

সূর্য্যই যখন প্রথম অভিব্যক্তি, সুতরাং পরে যথাযোগ্য স্থলে অভিব্যক্ত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই বীজভাবে সূর্য্যেই অবস্থিত ছিল। যাহা সূর্য্যে বীজভাবে ছিল, (In the form of possibilities) তাহাই প্রাণীদেহে ইন্দ্রিয়রূপে দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির উপাদান, প্রথম-সৃষ্ট সূর্য্যও অগ্ন্যাদিতেই নিহিত ছিল। এই জন্যই বোধ হয়, জীবের মৃত্যুকালে, চক্ষুরিন্দ্রিয় সূর্য্যে, বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে জিহ্বা জলেতে লীন হইবে বলিয়া, শ্রুতিতে উপদেশ আছে। নতুবা এই স্থলগুলির তাৎপর্য্য ভাল বুঝিতে পারা যায় না। আর একটী তত্ত্বও এতদ্দারা বুঝা যাইতেছে, সূর্য্য, পৃথিবী, জল, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় বাহ্য পদার্থে, বীজভাবে ইন্দ্রিয়শক্তি লীন আছে। কেহই ইন্দ্রিয়শক্তি বিবর্জ্জিত নহে। তবে প্রাণীদেহেও তাহা স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় এইমাত্র।

আধিদৈবিকরূপ বলিয়া, এখন শ্রুতি অধ্যাত্মরূপের কথা বলিতেছেন। পৃথিবী ও জলাদি ভূত তিনটী, শরীরাবয়ব নির্ম্মাণের হেতুভূত অর্থাৎ উহারা পরস্পর মিলিয়া, গুণপ্রধান ভাবে, শরীরের যে সকল অবয়ব নির্ম্মাণ করিয়াছে, তন্মধ্যে চক্ষুই শ্রেষ্ঠ এবং প্রথমে উৎপন্ন হয়;—সুতরাং চক্ষুই সারাংশ। যেমন আধিদৈবিকরূপে ভূতত্রয়ের সূর্য্যই সারাংশ, দেহরাজ্যেও তদ্রূপ চক্ষুই সারাংশ। সর্ব্বত্র তেজ থাকিলেও, চক্ষুতেই তেজের অধিক অধিষ্ঠান। দেহে চক্ষুই প্রধান বলিয়া, ইহাকেই সার বলা হইয়াছে। দেহস্থ প্রাণ ও বুদ্ধি ইহারাই দেহের অমূর্ত্ত ভূত। দেহমধ্যস্থ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গুলিই, এই অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের সারাংশ। রাগাদিবাসনা এই অন্তঃকরণেরই রূপ। হরিদ্রাসংযোগে বস্ত্রের যেমন হরিদ্রাবর্ণ হয়; তদ্রূপ বিষয়সযোগে অন্তঃকরণও, বাসনাত্মক রাগ প্রাপ্ত হয়। কখন চিত্তবৃত্তির ভেদবশতঃ, কখন ও বা বিষয়ের ভেদে, বাসনা নানা প্রকার হইয়া থাকে।

আমরা এস্থলে শ্রুতির ও শঙ্করের যেরূপ তাৎপর্য্য দিলাম, বোধ হয়, শ্রুতির ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। ঐতরেয় উপনিষদের মূলশ্রুতি ও শঙ্করভাষ্য দেখিলেও ইহাই প্রতীত হয়। ঐতরেয় উপনিষদে আছে যে, ঈশ্বর প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের গোলক (অধিষ্ঠান স্থান) নির্ম্মাণ করিলেন। এখনও ব্যষ্টিদেহ সৃষ্ট হয় নাই, এখনও মনুষ্য পশ্বাদি নির্ম্মিত হয় নাই; কেবল সূর্য্যাদি ও তন্মধ্যস্থ বীজ ভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়াদি মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। একথার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, ইন্দ্রিয়বর্গের উপাদান সৃষ্টি হইল। তারপরে, ঐতরেয় উপনিষদে এই রূপ কথা আছে যে, অগ্নি বাক্‌রূপে ব্যষ্টিদেহে প্রবেশ করিল; * সূর্য্য চক্ষুরূপে; বায়ু নাসিকারূপে; দিক্‌সকল কর্ণরূপে; চন্দ্রমা হৃদয় (অন্তঃকরণ) রূপে; জল জননেন্দ্রিয় রূপে;—ব্যষ্টিদেহে প্রবেশ করিল। টীকাকার এস্থলে বলেন যে,"যদ্যপি বাগভিমানী অগ্নির্নতু বাগেব তথাপি তস্য বাচং বিনা প্রত্যক্ষ মনুপলব্ধে স্তস্যাঅপি

---

* সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতিকে আধিদৈবিক সৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে আধ্যাত্মিক সৃষ্টি বলে। উভয়েই সূক্ষ্ম। উহারাই ক্রমে স্থূল একটা আবরণ ধারণ করে।

দেবতাং বিনা (অগ্নিং বিনা) স্ববিষয় গ্রহণ সামর্থাভবেৎ তয়ো রেকলোলীভাবেন অভেদোক্তিঃ”। ভাব এই যে, রূপ, শব্দ, স্পর্শাদি—সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিরই গুণ। এই গুলিই ইন্দ্রিয়ের “বিষয়” (objects of senses) চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় না হইলে, সেগুলির উপলব্ধি (Perception) হইতে পারেনা। অতএব, সূর্য্য—বায়ু—অগ্ন্যাদিতে যে সমস্ত শব্দস্পর্শাদি গুণ নিহিত ছিল, সেই গুলিই ইন্দ্রিয়বর্গেরও উপাদান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি ও সূক্ষ্ম ভাবে অর্থাৎ(Potenital) রূপে উহাদের মধ্যে নিহিত ছিল। সেই উপাদান হইতেই উহাদের গ্রাহকরূপে ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইল। অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে একদিকে যেমন শব্দস্পর্শাদির অভিব্যক্তি (objective side) অন্য দিকে সেই শব্দস্পর্শাদি উপাদান হইতেই তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি (subjective side) উভয়েরই উপাদান একই বস্তু। স্থূল চক্ষুরাদি. সূক্ষ্ম—চক্ষুরাদি শক্তির গোলক —অধিষ্ঠান মাত্র। টীকাকারও তাহাই বলেন—“যদ্যপি বাগাদিকরণজাতমপঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যং, ন মুখাদি গোলককার্য্যং, তথাপি মুখাদ্যাশ্রয়ে তদভিব্যক্তেঃ মুখাদ্বাগিত্যুক্তং; এবং প্রাণশব্দেন প্রাণবৃত্তি সহিতং ঘ্রাণেন্দ্রিয় মুচ্যতে”। অতএব, এইরূপে সূর্য্যাদি দেবতা, চক্ষুরাদি করণ এবং চক্ষুরাদির অধিষ্ঠান (গোলক) প্রাদুর্ভূত হইল। অতএব “সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইলেন”—এইরূপ যে, বহুস্থানে শ্রুতিবাক্য দেখা যায়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, উভয়েই উভয়ের উপকার্য্য ও উপকারকরূপে সম্বন্ধবিশিষ্ট। ইন্দ্রিয় ভিন্ন শব্দস্পর্শাদির স্থিতি অসম্ভব, তেমনি শব্দস্পর্শাদি ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়বর্গেরও স্থিতি সম্ভব নহে। টীকাকারও এই রূপ তাৎপর্য্যই বুঝিয়াছেনঃ—“করণৈর্বিনা তাসাং দেবতানাং অদনাদি ভোগাসম্ভবত স্তাসাং প্রবেশ অর্থাৎ চোদিত এব”। উৎপত্তিকাল হইতেই, করণ বা ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়তৃষ্ণা বিশিষ্ট। যে নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের যে নির্দ্দিষ্ট বিষয় গ্রহণের শক্তি আছে, তাহা উৎপত্তি হইতেই সূচিত হয়। সায়নদীপিকায় আছে, —“অশনাপিপাসাশব্দেন ইন্দ্রিয়ানাং স্ববিষয়গোচরৌ তৃষ্ণা কামৌ উচ্যেতে”। অত[illegible] রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ হইলেই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইয়া থাকে। অনেক স্থলে, আদিত্য-বায়ু প্রভৃতিকে “আধিদৈবিক দেবতা” এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে “আধ্যাত্মিকদেবতা” বলা হইয়াছে। Subjective এবং Objective বস্তুগুলি যে একই উপাদান হইতে গঠিত এবং পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, ইহা প্রদর্শন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়; কেবল স্থানভেদে নামভেদ মাত্র। সমষ্টিভাবে কার্য্যব্রহ্মের দুই অবস্থা। সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের মিলনে ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে সূক্ষ্ম, এবং তাহাই আবার পঞ্চীকরণ প্রণালীতে মিশ্রিত হইয়া স্থূলদেহ ও দেহাবয়বরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্য্য (Effect) সকল যখন অব্যাকৃত ভাবে “কারণ”রূপে ব্রহ্মে লীন থাকে, তখন ব্রহ্মের কারণ-রূপ; ব্রহ্ম তখন “ঈশ্বর।”

আমারা আরুণির উপদেশ বুঝিতে গিয়া বৃহদারণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষদের কথাও উপরে বলিয়া পাঠককে বোধ হয় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছি। এই বিষয়টী এত বিস্তৃতভাবে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার দ্বারা শ্রুতির সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিপ্রায়

কি, তাহা বুঝা যাইতেছে। এবিষয়ে সকল উপনিষদেরই মত একই। সেই অতি প্রাচীনকালে, বাহ্য বিষয় এবং সূর্য্য-চন্দ্রাদি, ও আন্তরিক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি যে একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এতত্ত্ব ঋষিরা প্রজ্ঞানেত্রে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে। ঋষিগণ এইরূপ কার্য্য-কারণের প্রণালী দ্বারা সেই অদ্বিতীয়, অদ্বৈতমার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই জন্যই আমরা শ্রুতির অভিপ্রায় বিস্তৃতভাবে দেখাইলাম। শ্বেতকেতুও, পিতা আরুণির উপদেশে এইরূপেই অদ্বৈততত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

জুতা আর গুঁতা

প্রথম প্রস্তাব।

"সম্ভবত্যে বাক্যত্বে বাক্যভেদো ন জায়তে"।

(বৈশেষিক দর্শন) জৈমিনী।

আমার বিবেচনায়, আরশুল্লা যদি কখনও পক্ষী হয়, চৌকিদার যদি কখনও হাকিম হয়, গরু যদি কখনও গুরু হয়, মুড়ো ঝাঁটা (সম্মার্জ্জনী) যদি কখনও নারিকেল বৃক্ষ হয়, অথবা আমড়া যদি কখনও মালদহের আম হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী আবার "মানুষ''—বাঙ্গালী আবার একটা "জাতি"—আবার একটা "শক্তি'' (Power) বলিয়া প্রখ্যাত ও পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু "সাত মণ 'তেলও পুড়্‌বে না আর রাধাও নাচ্‌বে না'' ! আমড়া কখনও আম হয় না, গরুও কখনও গুরু হয় না। তোমরা বলিতে পার, বাঙ্গালী মেয়েরা কি বক্তৃতা করিতে অথবা বাইশিকেল হাঁকাইতে শিখে নাই, বিলাতে গিয়া বাবুরা কি ইংরাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই, আমেরিকায় গিয়া বাঙ্গালী বীর কি স্পেনের যুদ্ধে সৈনিক পুরুষরূপে প্রেরিত হয় নাই এবং সাহিত্যে ও বিজ্ঞানতত্ত্বে কি গৌড়বাসীর গৌরব ও সৌরভ বাড়ে নাই? ভাই! তোমাদের কথা শুনিয়া আমার হাসি পায়; তোমাদের কথা শুনিয়া বহু পূর্ব্বকালের যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর সেই পুরাতন গানটা এতদিনে আবার স্মরণ হইল ;—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ।
নইলে শুধুই মদন ॥

ভাই! তোমরা যে এখন কেবল "শুধুই মদন" হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তাহা কি একবার চিন্তা করিবার অবসর পাও? তোমাদের কার্য্যক্ষেত্ররূপ ব্রজধামে তোমরা "কৃষ্ণ" রূপে বর্ত্তমান আছ বটে, তাহা জানি, কিন্তু যতক্ষণ ফিরিঙ্গি-রাধা তোমাদের সঙ্গে, ততক্ষণই তোমরা "মদনমোহন," নতুবা গজভুক্ত কপিত্থবৎ "শুধুই মদন'' !! এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? পথে পথে ট্রাম, ট্রলি ও রেলওয়ে চলিতেছে বটে, গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজ খুলিয়াছে বটে; ছেলে, মেয়ে, মা, ভগ্নী, পিসী, মাসি, বন্ধু ও বৈবাহিককে পর্য্যন্ত শাসন করিবার জন্য "স্বায়ত্তশাসন" আইনের সৃষ্টি হইয়াছে বটে; পুকুরের বাঁশ গাছ, দিঘির পুঁটি মাছ, ঘরের জানালা অথবা ক্ষেতের মূলো কলা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইবার জন্য কিম্বা মেথরের মুখে গালি শুনাইবার জন্য মিউ-

নিসিপালিটির সৃষ্টি হইয়াছে বটে, নগরে নগরে গ্যাস, ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠন, কেরোশীন তৈল এবং ফুলমালার ন্যায় দীপমালা জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু ;—

"পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

অনেক ফেরিওয়ালা রায় বাহাদুর, অনেক কলাওয়ালা কৈশর-এ-হিন্দ্‌, অনেক "কুয়োর ঘটিতোলা" রাজা বাহাদুর, অনেক কশাই ভায়া খাঁ বাহাদুর এবং অনেক পাঠশালার গুরুমহাশয় মহা মহোপাধ্যায় হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধির নাম আর কিছুই নহে কেবল "ছি-এ ছাই" !! (C. S. I.) নিত্য নিত্য চাঁদার জুলুমে, নাচ গান তামাসা "বল্‌" ডিনার মিটিং স্কেটিং পবলিক স্পিরিট আর উহঁাদের হোটেল সম্বন্ধীয় ডিনারের স্পিরিটের "বিলে" এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, এ সকলই ছি-এ ছাই !! তোমরা এ দেশের বার্ষিক শাসন বিজ্ঞাপনীতে Administration Report কোটি কোটি টাকার আমদানির কথা পাঠ কর, রেলওয়ে হইতে কোটি কোটি টাকা লাভের কথা শুনিয়া থাক, প্রতি বৎসর জাহাজের সংখ্যা ছারপোকার ন্যায় বাড়িয়া উঠিতেছে, কত সোণার খনি ও কত রূপার আকরের আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু সে সকল শুনিতে ও পড়িতেই ভাল। "বেল পাকিলে তাহাতে কাকের কিছু লাভ হয় না।" এখনও বুঝিলে না—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ।
নইলে শুধুই মদন॥

এখন ঐ পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিই। এখন আসল কথা এই যে, জুতা ও লাথি দ্বারা নিত্য প্রহারিত হইয়াও যে জাতির চৈতন্য হয় না, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সম্মার্জ্জনীর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও যে জাতির মনে মানহীনতার ধারণা আইসে না, অসংখ্যাসংখ্য নিরপরাধিনী কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট হইতে দেখিয়াও যাহাদের ধমনীস্থ শোণিত একটুও তীব্রতা বা উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় না, যাহাদের কাণমলায় কলঙ্ক অথবা অবিচার বা অত্যাচারে অপমান বোধ হয় না, সংক্ষেপতঃ যাহাদের পাপের প্রতি ঘৃণা, সত্যের প্রতি ভক্তি, ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, সরলতার প্রতি স্নেহ, অত্যাচার ও অবিচারের প্রতি বিদ্বেষ কিম্বা যথেচ্ছাচারীতার দিকে অশ্রদ্ধার উদ্ভব হয় না, তাহাদের কি কখনও জাতীয় জীবন—জাতীয় উন্নতি—জাতীয় চরিত্র সম্বর্দ্ধিত বা সংরক্ষিত হইতে পারে? আমি যাহা লিখিলাম, তাহা বাস্তবিক নিতান্তই কঠোর নিঠুর এবং দুঃশ্রাব্য, কিন্তু আমিও বাঙ্গালী।. "বাঙ্গালী" বলিয়াই এত কাঁদি এবং সেই কারণেই আজি মনের দুঃখে দুটো কথা লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি।

প্রতি সপ্তাহে সমাচার পত্রে পড়িতেছি, প্রতিস্থানেই গল্প শুনিয়া আসিতেছি ; অমুক দিন, অমুক ফিরিঙ্গির হাতে একটা কাল আদ্‌মির প্রাণ গেল ; অমুক দিন একটা গৌরবর্ণ গোরার পদাঘাতে একটা কাল রংএর নেটিব নিগরের প্লীহা ফাটিয়া গেল, অমুক দিন রেলওয়ের সীমানায় বা চা-বাগিচার মোহানায় একটা স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হইল। কোথায় গুলির আঘাতে—কোথায় বা চপেটাঘাতে—কোথাও বা ঘুশির প্রবলতায়—সংক্ষেপতঃ সর্ব্বত্রই জুতা আর

গুতোর ব্যবহারে ভারতবাসীর ভবপারের ভাবনা ঘুচিয়া যায় !! আবার সেই সম্বাদপত্রেই পড়িলাম, "অপরাধীগণ গ্রেপ্তার হইয়া বিচারাধীন আছে ; বিচারের ফলাফল সত্বরে পাঠকবর্গকে সবিস্তারে জ্ঞাত করা যাইবে।"কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে শুনা গেল, "আসামীগণকে পুলিশের প্রভু ডাকাইয়া আনিয়া অশ্বযানযোগে অমুক রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌছিয়া দিয়াছিলেন ; তদন্তর দ্বিতীয় শ্রেণীর বাস্পীয়শকটে বসাইয়া দিয়া অমুক স্থানে আনয়ন করেন। বিচারপতি অত টাকায় জামিনে আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পথে আসামীর কোনও কষ্ট হয় নাই—তাহার হাতে হাতকড়িও ছিল না, পুলিশের সহিত নিরীহ সাহেবের কোনও বিবাদ হয় নাই ; আসামী এক্ষণে বাঙ্গ্‌লাতে ফিরিয়া আসিয়াছে, মোকর্দ্দমার দিনে তাঁহার বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিবেন। শুনা গেল, আসামীকে রেলওয়ের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং ষ্টিমার যোগে আনিবার জন্য, আর তাঁহার খানার খরচ, পথশ্রম শান্তি জন্য বিলাতী পাণি প্রভৃতিতে এত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আসামের আর এক সাহেব কুলীহত্যায় একমাস কাল বিনা পরিশ্রম সহ দণ্ডিত হইয়াছেন, কিন্তু আসামের জেলে ইউরোপীয় কয়েদীর থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকায়, আসামীকে আপাততঃ বিলাতী হোটেলে রাখা হইয়াছে, বোধ হয়, সত্বরে কলিকাতায় সে ব্যক্তি আনীত হইবে।" ইত্যাদি "ইত্যাদি। অনেক কাঠ পোড়াইয়া, অনেক বৈদান্তিক কচ্‌কচি এবং নৈয়ায়িক খচ্‌খচির শ্রাদ্ধ করিয়া, সাতটা আইনসাগর এবং তেরটা যুক্তিনদী পার হইয়া, শেষে দয়ারসাগর, বুদ্ধির নাগর, ন্যায়ের আকর এবং ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহামহিমান্বিত বিচারপতি মহাশয়েরা বিশিষ্ট অনুগ্রহ সহকারে যেরূপ রায় দেন, তাহার দুই একটা নমুনা দিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

১নং—নেটিবকে একেবারেই মারিয়া ফেলিবার জন্য, শ্বেতদ্বীপবাসী শ্রীমান্ শড্‌রু সাহেব, আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নেটিব বাবাজীর ম্যালেরিয়া আক্রান্ত পল্লীতে জন্ম হওয়ায় তাহার উদর মধ্যে একটা বিলাতী কুষ্মাণ্ডের ন্যায় সুবৃহৎ প্লীহা থাকা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়, ডাক্তারের সাক্ষ্য দ্বারা ও সেকথা প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব শ্বেতদ্বীপবাসী শ্রীমান্ শড্‌রুকে ১২০ ঘণ্টার জন্য অর্থাৎ ৫টা সম্পূর্ণ দিবসের জন্য বিনা পরিশ্রমে শ্রীঘরে যাপন করিবার জন্য প্রেরণ করিবার আদেশ দেওয়া গেল।

২নং—যেহেতু পাখী শিকার করিবার জন্য এবং বিশেষতঃ আগামী যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইবার জন্য, শ্রীমান্ গোমীজ সাহেব শকুনি বা খ্যাঁকশিয়ালী ভ্রমে গুয়েরাম গুঁই এবং ফটিকচাঁদ বক্সীকে হত্যা করিয়াছে, ইহাতে আসামীকে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী করা অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। জুরীরাও সে কথা বলেন। শিকারের স্থানে পাগলী খ্যাঁকশিয়ালী দলে দলে বিচরণ করে, ইহারা দংশন করিলে মানুষ পাগল হইয়া যায়, সুতরাং প্যারীশ নগরের পেষ্টর্ ইনিষ্টিউটে চিকিৎসা জন্য পাঠাইতে হয়। এরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক

ছোড়া এবং সেই বন্দুক কর্ত্তৃক নেটীবের প্রাণনাশ হওয়া বিশেষ একটা অপরাধ নহে। যাহা হউক, হত্যাপরাধ হইতে আসামীকে মুক্ত করা গেল। তদ্ভিন্ন আর এক কথা। হোশেনমোল্লা ও হয়দর্ সেথ প্রভৃতি গ্রামীয় লোকেরা আসামীকে একাকী দেখিয়া গ্রেপ্তার করিতে আসায়,সাহেব আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে গুরুতররূপে জখম করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমরা সাহেবকে এই বলিয়া অপরাধী স্থির করিলাম যে, আত্মরক্ষার জন্য এতটা করা আসামীর পক্ষে শোভা পায় নাই। যাহাহউক, আসামীকে অপরাধী স্থির করিয়া পঞ্চদশ মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল। ইতি।

৩ নং। কৃপাময়ী দাসীকে এবং তাহার শিশুপুত্রকে আসামী ওয়াল্‌টর, ভালুক ভ্রমে বন্দুক ছুড়িয়া, পরলোকে প্রেরণ করিয়াছে, অতএব কৃপাময়ী দাসীকে ৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়া ওয়াল্‌টার রাজীনামা লিখাইয়া লইবে এইরূপ আদেশ করা গেল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়, সুতরাং ওয়াল্‌টরের জন্য বিশেষ বিচারের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

আর একটা নমুনা দিতে ইচ্ছা করি, ইহা নম্বর ৪।

"বর্ত্তমান সময়ে ফিরিঙ্গিগণ কর্ত্তৃক নেটিব স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার এবং কালা আদ্‌মীর প্রাণনাশ প্রভৃতির কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে, অতএব এইরূপ ঘটনার দমন করিবার জন্য আমরা আসামীদিগকে এবম্প্রকার দণ্ড দেওয়া উচিত বিবেচনা করি, যেন সেই দণ্ডে তাহাদের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আসামী (সাহেব), একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ এবং তাহার পরে মূল্যবান অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। যে সকল হিন্দু ও মুসলমান ইহাকে ধরিতে আসিয়াছিল এবং পুলীশের যে সকল আইনানভিজ্ঞ লোক ইহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল, আসামী তাহাদিগকে ভয়ানকরূপে জখম করিয়াছে, ইতিমধ্যে একজন জখমী মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জুরীরা আসামীকে নির্দ্দোষী স্থির করিতেছেন, আমারও তাহাই মত। সাক্ষীদিগের জবানবন্দী কেবল বিষম মিথ্যায় পরিপূর্ণ, অতএব আসামী খালাস পাইল; আদালত হইতে আসামী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বাহিরে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবার অধিকারী—The accused is honorably aquitted, without a least stain on his character. আসামীর সঙ্গে কয়েকজন দুষ্ট চরিত্রের বাঙ্গালী ছিল—ইহাদের একজনের নাম খয়রু হাজী, একজনের নাম গদাধর গোয়ালা এবং আর একজনের নাম গোবর্দ্ধন মাঝি। অতি সুস্পষ্ট, অকাট্য, অখণ্ডনীয় এবং আইনসঙ্গত প্রমাণাবলী দ্বারা বুঝা গেল, ইহাদের দ্বারাই এ সমুদয় মহাপাপজনিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং জুরীগণ ইহাদিগকে অপরাধী স্থির করিয়াছেন, আমারও তাহাই মত। আমার বিবেচনায় এই মোকদ্দমায় আসামীদিগের Exemplary punishment দেওয়া আবশ্যক। অতএব গোবর্দ্ধন মাঝির জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস এবং গদাধর গোয়ালার জন্য ১৪ বৎসরের কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে। 'খয়রুহাজী

নিশ্চয়ই স্বহস্তে মৃতা স্ত্রীলোকের প্রাণসংহার করিয়াছিল, অতএব তাহার সম্বন্ধে এই হুকুম দেওয়া গেল যে, যাবৎ তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার শরীরটাকে দড়ী দ্বারা ঝোলাইয়া রাখা হইবে—"To be hanged by the neck till he is dead." Section 368 C. P. Code." ইতি শ্রী— হাকিম।

আর নমুনা দিব না, ইহাই যথেষ্ট। এখন বুঝিলাম, কালো নিগরের প্রাণের মূল্য পাঁচ কড়া কড়ি এবং তাহার মা, মেয়ে, ভগ্নী ভাগ্নীর সতীত্বের মূল্য এক কড়া কাণা কড়িরও সমতুল্য নয়। কি জানি, কোন্ দেবতার কৃপায়, অনেক বর্ষ হইল, (বোধ হয় সত্যযুগে) একটা ইংরাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু সে লোকটা কালা নেটিবকে মারে নাই,—মারিয়াছিল, একটা শ্বেতদ্বীপবাসী শ্বেতপ্রভুকে!! তাহার পরে য়োহারা (O'Hara) নামে দম্‌দমার একটা গোরার ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, কিন্তু হাইকোর্ট হইতে যেদিন এই হুকুম জারী হয়, তাহার পরদিন পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে না ডুবিতে ডুবিতে সাদা চামড়ার সমুদয় ব্যারিষ্টার ধর্ম্মঘট করিয়া আইনের সাতটা সমুদ্র ও তেরটা তটিনী তৈয়ার করিয়া জজদিগকে তাহাতে ডুবাইয়া দিলেন এবং জোর করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমরা য়োহারা সাহেবকে ছাড়ান্ দেও।" জজেরা আইন-সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া দিশাহারা হইয়া গেলেন, সুতরাং আদেশ করিলেন," নিরপরাধী য়োহারা মুক্ত হইল।* কেবল তাহাই নহে; য়োহারাকে লইয়া সাহেবেরা আনন্দে খানা দিল, নাচ গান করিল এবং রাশি রাশি টাকা চাঁদা তুলিয়া জাহাজ ভাড়া করিয়া সসম্ভ্রমে বিলাত পাঠাইয়া দিল। এদিকে কালা আদ্‌মীর প্রাণের জন্ত, স্ত্রীলোকের সতীত্ব জন্ত, পাপের প্রশ্রয় জন্ত, একটা লোকও একবিন্দু অশ্রু ফেলিল না। এই ঘটনা কি নিত্য নিত্য দেখিতে, পড়িতে ও শুনিতে পাইতেছি না? পৃথিবীর আর কোনও দেশে কি এরূপ ঘটিতে পারে? এরূপ অমানুষিক, এরূপ অসহনীয়, এরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য অত্যাচার এবং ন্যায়ের অপব্যবহার পৃথিবীর আর কোনও জাতিতে কি সম্ভব? কালা আদ্‌মীর হত্যার জন্য ইউরোপীয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা কখনও শুনিতে পাও কি? প্রাণদণ্ড দূরে থাকুক, গুরুতর কারাবাস দণ্ডের কথা কখনও কাণে উঠে কি? গুরুতর দণ্ডের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয় আসামীকে "কালা আদ্‌মীর" ন্যায় কখনও হাজতে আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়াছ কি? তাহাতেই বলিতেছি, নেটিবের জন্ম কেবল জুতা আর গুঁতা খাইবার জন্য। বোম্বাই হাইকোর্টের মহামান্য জজ সৈয়দ বদ্‌রুদ্দীন তায়েব্‌জি বাহাদুরের সন্তান, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, সেদিন বোম্বায়ের রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে জাহাজের একটা ইউরোপীয় খালাসীর তুল্য লোক রক্তাক্ত করিয়া মারপিট করিয়া গেল এবং "শুয়র" "শালা" প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছিল। অথচ পুলিশের লোক তাহাকে ধরিতে অস্বীকার করে, অনেক টাকা ব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে তার পাঠাইয়া তবে সাহেবের নাম পাওয়া যায়। তাহাতেই বলিতেছি, নেটিবের জন্ম জুতা আর গুঁতার চরিতার্থতা সম্পাদন

জন্য। বর্ষায় পতঙ্গ জন্মে লণ্ঠনের আলোকের তাপে পুড়িয়া করিতে; ছারপোকা জন্মে মেয়েদের অঙ্গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে; আর নেটীব নিগার জন্মে ইংরাজ প্রভুর শ্বেতশতদলসমতুল্য সুকোমল করকমলের সুখ সম্পাদনে!!

তাঁতীর শোভা তাঁতখানা,
দর্জ্জির শোভা সুতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে,
জুতো আর গুঁতো॥

বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, বৈষ্ণবের প্রেম "নিতুই নব"; সেই নব নব প্রেমের আর ভাটা বা বিরাম নাই। সম্বাদ-পত্র পাঠ করিয়া নিত্যই দেখিতেছি, সাহেবের হাতে নেটীবের প্রহারের বন্দোবস্তটা বাস্তবিকই "নিতুই নব," অথচ সকল ঘটনা সমাচার পত্রে প্রকাশ পায় না। যেখানে সম্বাদদাতা আছে, যেখানে খবরের কাগজ লিখিবার লোক আছে, যেখানে টাকা বা সাহস আছে, সেখানকার ঘটনার মধ্যে দুই একটা ঘটনা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, নতুবা অধিকাংশ ঘটনাই গুপ্ত ও লুপ্ত হইয়া যায়। কাহাকেও বেত্রাঘাতে, কাহাকেও চপেটাঘাতে, কাহাকে ঘুশি বা কিলের আঘাতে, কাহাকে বন্দুক বা জুতার সহযোগে, কাহাকেও বা লাঠি বা গুঁতার ব্যবহারে সাহেবেরা "প্রাণান্ত" অথবা জখম করিতেছে। কোথাও কুলীহত্যা, কোথাও বাবুহত্যা, কোথাও কেরাণী হত্যা, কোথাও স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ, কোথাও জমিদারের সর্ব্বনাশ, কোথাও বা কেরাণী বা গোমস্তার গলায় জুতার মালা পরাইয়া সাহেবেরা ঘুরাইতেছে, কেবল যে রেলওয়ের বা সৈনিক বিভাগের কিম্বা চা বাগানের নিম্ন শ্রেণীর সাহেবেরা এরূপ করিতেছে, তাহা নহে, এক একটা মাজিষ্ট্রেট এবং এক একটা পুলিশ সাহেবের জুলুম ও জবরদস্তীতেও বাঙ্গালীরা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে। জাহাজের ইংরাজ খালাশীই বল, আর কয়লার কারখানার মেটে ফিরিঙ্গিই বল, নেটিবকে জুতা আর গুঁতায় দোরস্ত করিতে কেহই বাকি রাখিতেছেনা। অথচ আমরা একটা "জাতি" বলিয়া বৃথা অহঙ্কার করি, সেই বৃথা অহঙ্কারে আকাশের দিকে মাথা তুলি এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করি! ভায়া! তোমাদের দুঃখে শৃগাল কুকুর কাঁদিতেছে, অথচ তোমাদের মনে একটুও ঘৃণা নাই, একটুও ক্ষোভ নাই এবং একটুও মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব নাই। জ্ঞানের আলোক, বিজ্ঞানের আলোক, রাজনীতির আলোক, গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক্ লণ্ঠনের আলোক, এ সমুদয়ই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার!!

"পর দীপমালা নগরে নগরে।
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

জিজ্ঞাসা করি, তোমারা কি পরমহংস? আমি জানি, পাথরের মানাপমান জ্ঞান নাই আর পরমহংসের মানাপমান জ্ঞান নাই; তোমরা নিশ্চয়ই এই দুয়ের মধ্যে একটা। যদি পাথর হও, তাহা হইলে আবার দশরথের জন্ম হওয়া আবশ্যক, আবার কৈকেয়ি কর্ত্তৃক রামের বনগমনের আবশ্যক, কারণ আবার রাম বনে না গেলে অহল্যা পাথরের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। যদি পরমহংস হও, তাহা হইলে পরমহংসত্বেরও একটা সীমা আছে,——"যোগবাশিষ্ঠ" এ বিষয়ে কি বলেন, শ্রবণ কর——"যতি, যোগী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও পরমহংস, ইহারা সকলেই নিয়মের অধীন।" মুসল-

মানের শাস্ত্রেও সেই কথা লিখিত আছে, খৃষ্টানের শাস্ত্রেও তাই। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাও সহিষ্ণুতার একটা সীমা দেখাইয়াছিলেন; দধিচি মুনি হইয়াও "অতি সহিষ্ণুতার" প্রতিবাদ পূর্ব্বক স্বীয় শরীর হইতে অস্থি নির্গত করিয়া দিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, কোমল প্রকৃতি সম্পন্না এবং সহজেই কাতরা, কিন্তু তাহারাও মাথার চুল কাটিয়া দিয়া, তরবারী ধারণ করিয়া, অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, অত্যাচারের প্রতীকারে সাহায্য করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে, সহিষ্ণুতা গুণ খুব ভাল হইলেও ইহার একটা সীমা আছে; চিরখল সর্পজাতি অতীব ভয়ানক বিষধর হইলেও সাধারণতঃ সহিষ্ণু, কিন্তু ইহারাও সহিষ্ণুতার সীমা দেখায়। সুতরাং ভায়া! তোমরা পরমহংস হইলেও পরমহংসত্বের একটা সীমা আছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং তীব্র বৈরাগ্যে যে ব্যক্তি পরমহংস বৃত্তির বশীভূত হয়, আমি সেই মহাপুরুষের পদতলে আমার মস্তক রাখিতে প্রস্তুত, কিন্তু আলস্য, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা,জাতিবৈরীতা, নির্ব্বুদ্ধিতা অথবা চরিত্রহীনতার জন্য যে ব্যক্তি কৃত্রিম পরমহংসত্বের ভাণ করে এবং সেই ভাণের উপরে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ, ধন, মান চরিত্র, দেশ, সমাজ ও জাতিকে পরপদে অর্পণ করিয়া বলে, "আমরা পরমহংস এবং সেই জন্যই সহিষ্ণু" অথবা "আমরা সহিষ্ণু, সেই জন্যই জুতা ও গুঁতায় অপমান অনুভব করি না।" সেই মহাপাপীর গলায় সাতশত মণ ওজনের একটা পাথর বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলেও বোধ হয় পাপ হয় না।

আসল কথা এই, যতই পুণ্য কর, যতই সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, পুণ্যের, ধর্ম্মের এবং সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দানের তুল্য ধর্ম্ম নাই, কিন্তু "অতি দানে" বলী রাজার বন্ধন হয় নাই কি? মানটা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু 'অতি মানে' কৌরবকুলের দুর্গতিটা মনে পড়ে কি? সুতরাং সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে, সেই সীমার মধ্যে না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের মহত্ত্ব, একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

তোমরা নিত্য নিত্য বৃকতাড়িত মেষশিশুর ন্যায় তাড়িত হইতেছ, কাণমলার কলঙ্কে কালোমুখ আরও কালো করিতেছ, জুতার চোটে জব্দ হইতেছ, কটাক্ষেতে কাবু হইয়া যাইতেছ, বেত্রাঘাতে বিকল হইতেছ, এবং কটু বাক্যে কাঁপিয়া উঠিতেছ,অধিক কি, পাঠশালার "পোড়ো"র ন্যায় তোমাদিগকে "নাড়ু গোপালের" প্রথানুসারে কাণ ধরিয়া তোমাদের প্রভুরা তোমাদিগকে উঠাইতেছে ও বসাইতেছে, তবুও তোমাদের মনে একটুও ঘৃণা একটুও আত্মমর্য্যাদা অথবা একটুও মহত্ত্ব দেখিতে পাই না। তোমরা কি একেবারেই পাথর হইয়া গিয়াছ? বোধ হয়, রোটী, গোস্ৎ, ডাল বা চপ্ খাইবার জন্য কোন্ দিন তোমাদিগকে লইয়া তাহারা বাটী, ঘটি, গেলাশ, পেয়ালা বা ডিস্ করিয়া তুলিবে। পাথরের Dish মন্দ হয় না!! বাস্তবিকই অতি দুঃখের সহিত, কবির ভাষায় বলিতে হয়—

"রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে আলিয়া মোমের বাতি।
অতি উচ্চ রবে, যারে তারে কবে,
ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি।"

আবার বলি, যে জাতির প্রাণের মূল্য

পাঁচ পয়সা, যে জাতির অলঙ্কারের নাম জুতা আর গুঁতা, যে জাতির সম্ভাষণের নাম ব্ল্যাগার্ড্ বা শূওর, যে জাতির মা, মেয়ে, ভগ্নী বা ভগ্নীর মর্য্যাদার মূল্য একটা কাণা কড়ি, যে জাতির কাণগুলা কেবল ফিরিঙ্গির হাতের খেলনা এবং পিঠটা কেবল শ্বেতহস্তের বেত্র পরীক্ষার "চাঁদমারি", সে জাতির "জাতি" বলিয়া গর্ব্ব করিবার কিছু আর আছে কি? কেবল তাহাই নহে, অন্যদিকেও একবার চাহিয়া দেখ। ঘরের একটা কোণে গুড় পড়িলে যত পিপীলিকা জমে, অথবা পল্লীগ্রামে প্রদীপের আলোকের পার্শ্বে বর্ষাকালের রাত্রে যত লোক মরে, গত ২৫ বৎসর মধ্যে এদেশের জেলায় জেলায় প্রতি সপ্তাহে তত লোক অনাহারে (দুর্ভিক্ষে) মরিয়া গিয়াছে, অথচ তোমার আমার কথাটী কহিবার ক্ষমতা নাই। এদেশের বার্ষিক আয় ৮৬ কোটী টাকা অর্থাৎ কিছু কম এক পদ্ম টাকা!! কিন্তু "বেল পাকিলে কাকের তাহাতে কি?" যার টাকা তার টাকা, তুমি আমি কে? এ কি ইংলণ্ড, এ কি রুসিয়া, এ কি আমেরিকা বা ফ্রান্স যে, প্রজা-সাধারণের কথা চলিতে পারে? তুমি যতই সম্বাদপত্র লেখ, যতই বক্তৃতা কর, যত বড়ই উচ্চ পদে আসীন হও, তোমার ভাগ্যে জুতো আর গুঁতো!!

"তাঁতীর শোভা তাঁতখানা।
দর্জ্জীর শোভা সূতো॥
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে,
জুতো আর গুঁতো॥

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কাল মধ্যে সাহেবের হাতে কত 'নেটিব নিগার' নিহত হইয়াছে, কত নেটিব নিগর আহত হইয়াছে, কত লোক অপমানিত হইয়াছে, কত লোকের অকারণে জাতি,কুল, মান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেহ কি তাহার সংখ্যা করিতে পারে? কিন্তু যাত্রার দলে পুরুষেরা সং সাজিয়া স্ত্রীলোকের বেশে যতটুকু কৃত্রিম ক্রন্দনে আসরকে শোকাপ্লুত করে, এদেশের একটা লোকও ততটুকু কাঁদে নাই এবং কাঁদিতে শিখে নাই। কেবল তাহাই নহে, তোমাদের ঘরের অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। এখনও তোমাদের ছুঁচটি এবং আলপিনটি বিলাত হইতে আইসে, তোমাদের লিখিবার কলম, পরিবার কাপড়, পায়ের জুতা, মাথার ছাতা এবং চোখের চশ্‌মা পর্য্যন্ত সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আইসে এবং (ইদানীন্তন দেখিতেছি) "মেম" স্ত্রী পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আসিতেছে। সুতরাং বাহাদুরীর আর বড় বাকী নাই, অতএব তোমারা নিশ্চয়ই হিমালয় হইতেও একটা বড়—খুব বড়—জাতি; "অত্র বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।"

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে; মুনিরও মৌনের সীমা আছে, যোগীরও যোগের নিয়ম আছে এবং ধার্ম্মিকেরও ধর্ম্মপথের একটা সীমা আছে। পাপে ঘৃণা করিতে, অসত্য দমন করিতে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে, অত্যাচারের প্রতীকার করিতে, অরাজকত্বের প্রভাব নষ্ট করিতে এবং অবিচারের মূলোৎপাটন জন্য সাহস অবলম্বন করিতে যদি সহিষ্ণুতা নষ্ট করিতে হয়, তাহা অপরাধ বা অপকর্ম্ম নহে, তাহা নিশ্চয়ই সুকর্ম্ম এবং সেই সুকর্ম্মই ধর্ম্ম। শাস্ত্রও তাহাই বলে, যুক্তিও তাহাই সমর্থন করে। যে ছেলেটা খুব

চালাক, খুব তেজী, খুব স্বাধীন প্রকৃতিক এবং খুব সত্যপরায়ণ, সেই ছেলেটা মিথ্যাবাদী বাপের নিকট চিরদিনই ভয়ের কারণ; যে ছেলেগুলা মার খাইয়া কেবল কাঁদে, আর কিছু কহেনা বা করে না, যে ছেলেগুলা কথায় কথায় গোলামী করে এবং পরাধীনত্ব, পরপদলেহনত্ব, আলস্যসঞ্জাত কাপুরুষত্ব বা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ নিরীহত্ব দেখায়, সেই ছেলেগুলার উপরেই বাপ মায়ের জুলুম, জবরদস্তী, অত্যাচার, উপদ্রব ও গোলযোগ!! শক্ত ছেলের কাছে বাবা আর অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ "শক্তের তিনকুল মুক্ত!!" শক্ত ছেলের কাছে তাহার বাপ মা ভয়ে জড়সড়, কিন্তু শান্ত ছেলেকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়েও ঘুম ভাঙ্গাইয়া বাবা বলে, "বাছা! কল্‌কেটায় একবার তামাক সেজে দাওত।" ছেলে যদি তাহা করিল, অমনি বাবা আবার বলিল "বাছা! আমার চা খাবার জন্য একটু জল গরম করে দাওত?" কিন্তু শক্তের তিন কুল মুক্ত!! 'দুষ্ট ছেলে' হয় ত এ সময়ে খুব মজায় নাক ডাকাইয়া শয়ন করিয়া সুনিদ্রায় সুখ-সম্ভোগ করিতেছে, কিন্তু 'শান্ত ছেলে' বাবার তামাকু সাজিতে, বড় দাদার গামোছা কাচিতে, মায়ের চা খাবার জল গরম করিতে, বড় দিদির বিছানার মশা মাছি তাড়াইতে অথবা কাহারও গা টিপিতে টিপিতে রাত্রি কাটাইয়া দিতেছে। যে শক্ত তার তিন কুল মুক্ত!! আর একটা দৃষ্টান্ত দেখ। বাবুদের আস্তাবলে যে ঘোড়াটা খুব বলবান এবং খুব দুষ্ট, সে ঘোড়াটাকে গাড়িতে যুতিতে গেলে অমনি লাথি মারে এবং লাফাইয়া উঠে, হয়তঃ কাহাকে জখম করে। সেই ঘোড়াটার দিকেই বাবুর এবং বাবুর সহিসের খুব যত্ন এবং খুব দৃষ্টি থাকে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গাড়ী যুতিতে হইলে অথবা রাত্রি দুইটার সময় কাহারও পীড়ার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকিতে হইলে, গাড়ী যুতিবার সময় বাবু বলিয়া দেন, "দেখ সহিস্! ঐ দুষ্ট ঘোড়াটাকে যুতিও না, কি জানি, অন্ধকার রাত্রে কোথায় গর্ত্তের মধ্যে বদ্‌মায়েস ঘোড়া গাড়ীখানা ফেলিয়া দিবে; তুমি ঐ সাদা রংয়ের শান্ত সুধীর ঘোড়াটাকে যুতিয়া লও।" আমরা দেখিতে পাই, বলবান্ ঘোড়াগুলা প্রায়ই বিশ্রাম পায়, সহিসও তাহাকে ভয় করে, কিন্তু শান্ত ঘোড়াগুলা ট্যাং ট্যাং কোরে সমস্ত দিন এবং প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া মরে, আর দুইশত বার চাবুক খায়। ভায়া! এতক্ষণ বুঝিলে কি, সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে—একটা ধারণা ও একটা রকম আছে। "অতি দানে" বলী রাজার বন্ধনের ন্যায় "অতি সহিষ্ণুতা" ও আমাদের বন্ধনের কারণ, ইহাই আমাদের অবনতির উপাদান। কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে কি? বুঝিতে পারিলে তোমাদের এরূপ অধোগতি হইত না। ক্রমাগত মলমূত্রের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন মেথরের মনে মল বা মূত্রের মলিনতায় বা দুর্গন্ধে ঘৃণা বোধ হয় না, ক্রমাগত লাথি, জুতা, গুঁতা, ঘুঁশি, কিল প্রভৃতির আঘাতে এবং গালি ও কটুকাটব্য শ্রবণে তোমরা একেবারেই এমনই অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছ যে, এগুলি তোমাদের দেহের ও মনের এক প্রকার শোভাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অপরূপ অলঙ্কার, এই অপূর্ব্ব শোভা তোমরা কি আর পরিত্যাগ

করিতে পার? যাহা হাড়ে হাড়ে মিশিয়াছে, তাহা কি আর ছাড়া যায়? এই শোভার বাহার কত দেখ দেখি!! সুরসিক দাশরথী রায় বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত গাহিত,—

নিশির শোভা শশী যেমন,
শশীর শোভা তারা।
ঐরাবতের ইন্দ্রসভা,
জরার শোভা মরা॥
শিখের শোভা তরবারী,
পাঠান শোভা ছোরা।
সাহেব-শোভা সারমেয়,
কেল্লার শোভা গোরা॥
নদের শোভা রাইকিশোরী,
ব্রজের শোভা শ্যাম।
ঢাকার শোভা "পাৎক্ষীর",
সরযূর শোভা শ্যাম॥
অধ্যাপকের টিকি শোভা;
মেকি শোভা টাকশাল।
ফাঁকির শোভা বিজ্ঞাপনে,
বাকীর শোভা 'কাল॥'
তাঁতীর শোভা তাঁতখানা,
দর্জ্জীর শোভা সুতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে,
জুতো আর গুঁতো।

এই জুতো আর গুঁতো যতদিন পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটে মধু হইতে মধুরতর বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে, ততদিন তোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে," এবম্প্রকার দুর্ব্বিসহ দুরবস্থা হইতে তোমাদের পরিত্রাণ হইবে না, ইহা নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

মায়াবাদপরীক্ষা। (২)

জ্ঞানব্যতিরেকে কিছু নাই। জগতে যাহা কিছু 'আছে', সব জ্ঞানেই 'আছে'। জ্ঞানছাড়া কি না জ্ঞানে নাই অথচ 'আছে', এমত বস্তু অসম্ভব। এ সিদ্ধান্ত বেদান্তেরও মেরুদণ্ড। এ সিদ্ধান্তে যে দর্শন আসিয়া পৌঁছে নাই, সে তো দর্শনই নহে। এ দেশে কথাটা বহুসহস্র বৎসরের পরিচিত। হয়ত পৃথিবীতে এই দেশই কথাটা প্রথম শুনিয়াছিল। ঋগ্বেদের নাসদীয়সূক্তে আছে—

তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস। (১)

তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই হয় নাই। মোক্ষমূলর এই ঋকে অদ্বৈতবাদের আদিবীজ দেখিয়া গিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণেরও এক শ্রুতি এইরূপ—

ব্রহ্মন্ হ বিশ্বা ভূতানি। নাবীবান্তঃসমাহিতা। (২)

'ব্রহ্মন্' সপ্তম্যন্ত। নৌকার অভ্যন্তরে যেমন লোক থাকে, বিশ্ব জগৎ সেইরূপ ব্রহ্মে সমাহিত আছে।

মন্ত্রব্রাহ্মণে যাহা আভাসমাত্র, উপনিষদে তাহা পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার। উপনিষদের অনেক শ্রুতি সীতানাথ বাবু তুলিয়া দেখাইয়াছেন। সে সকলের পুনরুদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটী শ্রুতি তিনি তুলেন নাই। সে শ্রুতি বৃহদারণ্যকের—

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ।………সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। (৩)

সূত্রভাষ্যে আচার্য্য এই শ্রুতি বুঝাইতেছেন—

---

(১) ১০।১২৯।২।

(২) ২।৮।৮।

(৩) ২।৪।৬।

যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতীতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্যেদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্যাঽঽত্মাব্যতিরেকমবতারয়তি। (১)

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিরূপী জগৎকে আত্মার সহিত সম্পর্কশূন্য স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত দেখে, সেই মিথ্যাদর্শী ব্যক্তিকে ঐ প্রকার মিথ্যাদৃষ্ট জগৎ পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে। এই রূপে ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া "এই সমস্ত যে, ইহা আত্মা" এই বাক্যে শ্রুতি আত্মা হইতে সকল বস্তুর অপৃথগ্‌ভাব দেখাইতেছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সপ্তমাধিকরণে এই সিদ্ধান্তই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেখানে ভাষ্য আরও উজ্জ্বল—

সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাঽভিব্যক্তিঃ সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা। যথা সূর্য্যজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্যাভিব্যক্তিস্তদ্বৎ।.. যদুপলভ্যতে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতিষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্বাদ্‌ যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে। (২)

সূর্য্যের জ্যোতিঃসত্তায় যেমন সর্ব্ববিধ রূপের অভিব্যক্তি সাধিত হয়, ব্রহ্মের জ্যোতিঃসত্তায়ও তেমনই নামরূপাদিময় নিখিল জগৎ অভিব্যক্ত হইতেছে। যে কিছুর উপলব্ধি হয়, সে সমস্তই ব্রহ্মরূপ জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম অন্য জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধ হয়েন না যে সূর্য্যাদি তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে। ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ। ব্রহ্ম অন্যকে ব্যক্ত করেন, কিন্তু ব্রহ্ম অন্যের দ্বারা ব্যক্ত হয়েন না। একটা জড়ের উপমায় ভাষ্য কিছু আচ্ছন্ন। শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রে পরিষ্কার—

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থগং ভাসতে।

স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশ। যাঁর সৎস্বরূপ প্রকাশেই অসৎকল্প জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। অসৎকল্প, কেন না জ্ঞানসত্তাব্যতীত জগতের সত্তা অসিদ্ধ। ভাষ্যকারের প্রধান শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য এই স্তোত্রেরও বার্ত্তিককার। বার্ত্তিকের নাম মানসোল্লাস। ইহা সুরেশ্বরকৃত পঞ্চবার্ত্তিকের অন্যতম। মানসোল্লাসে সুরেশ্বর খুলিয়া বলিয়াছেন—

আত্মসত্তৈব সত্তৈষাং ভাবানাং ন ততোঽধিকা।
তথৈব স্ফুরণং চৈষাং নাত্মস্ফুরণতোঽধিকম্॥ (৩)

ন ততোঽধিকা, অর্থাৎ আত্মসত্তাব্যতীত জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ভাষ্যবার্ত্তিকের তাৎপর্য্য এই। ব্রহ্ম বা আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জগতের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ এই জ্ঞানাধীন। জ্ঞান ছাড়া আবার প্রকাশ কি? আবার সত্তা প্রকাশ একই বস্তু। জ্ঞানে যাহা প্রকাশিত, তাই সৎ—তাই 'আছে'।

বুদ্ধির্হি নঃ প্রমাণং সদসতোর্যাথাত্ম্যাবগমে। (৪)

জ্ঞানই অস্তি নাস্তির কষ্টিপাথর। জগৎ 'আছে', কেন না জগৎ জ্ঞানে প্রকাশিত। সত্তা বা অস্তিত্বের আর কোনও অর্থ নাই।

জগৎ জ্ঞানাধীন। জ্ঞানসত্তাব্যতিরেকে স্বতন্ত্র কিছু নাই। যার সত্তাব্যতিরেকে অপর যার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সেই প্রথম বস্তুকে সেই দ্বিতীয় বস্তুর কারণ (৫) এবং

---

(১) ১।৪।১৯।

(২) ১।৩।২২।

(৩) ৩।৩।

(৪) কঠভাষ্য, ৬।১২।

(৫) ভাষ্যকার বলেন, উপাদানকারণ। "উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য। নিমিত্তকারণাব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি লোকে তক্ষঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ।" সূত্রভাষ্য, ১।৪।২৩ আমি ঐ লক্ষণে

সেই দ্বিতীয় বস্তুকে সেই প্রথম বস্তুর কার্য্য বলিয়া থাকি। মৃত্তিকাদি ছাড়া মৃন্ময় ঘট হয় না, তাই মৃত্তিকাদি মৃন্ময় ঘটের কারণ। জ্ঞান ছাড়াও জগৎ নাই। তাই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের কারণ। কারণসত্তাব্যতিরেকে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার কার্য্যসত্তাব্যতিরেকেও কারণত্ব অসম্ভব। ঘটাদিরূপ বা জগদ্রূপ কার্য্য না থাকিলে মৃত্তিকাদি বা ব্রহ্মেরও কারণত্ব থাকে না। কার্য্য কারণ পরস্পরসাপেক্ষ। অতএব যখনই কোনও কিছুকে কারণ বলিয়া জানিয়াছ, তখনই আর একটা কিছু তার কার্য্যও আছে। কার্য্য হইতে পারে বা হইবে নহে, কার্য্য আছে। অন্যথা সে কিছুরও কারণত্ব থাকে না। (১) উৎপত্তির পূর্ব্বেও তাই কার্য্য সৎ অর্থাৎ আছে। ব্যক্ত রূপে নাই বটে, কিন্তু অব্যক্ত শক্তিরূপে আছে। (২) সে শক্তি কার্য্য হইতে ভিন্ন নয়। ভিন্ন হইলে কারণ অসিদ্ধই রহিয়া যায়, কেন না কারণত্ব কার্য্যসত্তাসাপেক্ষ। আবার, অভিন্নও নয়। কার্য্য ব্যক্ত, শক্তি অব্যক্ত। শক্তি প্রাচীন, ব্যক্ত কার্য্য তার পরভাবী। ভেদে-অভেদ। ভেদ থাকিলেই অভেদ ঘুচিয়া যায় না—

নচ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। নহি দেবদত্তঃ সংকোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোহপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। (৩)

পক্ষান্তরে, কার্য্যেরই রূপান্তর বলিয়া শক্তিও কারণসাপেক্ষ।

যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সদেবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। ন হীদানীমপি কার্য্যং কারণাত্মানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি। (৪)

কার্য্যকালেও যেমন কারণসত্তাব্যতিরেকে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কার্য্যাভিব্যক্তির পূর্ব্বেও তেমনই শক্তিরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কারণত্ব থাকিলেই শক্তিও থাকে, না থাকিলে থাকে না। কারণত্বের উপলব্ধি হইলেই শক্তিরও উপলব্ধি হয়, না হইলে হয় না। অতএব কারণ হইতে শক্তি ভিন্ন নয়। (৫) আবার, অভিন্নও নয়। দেখিয়াছি, শক্তি হইতে কার্য্য ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। এখন শক্তিও যদি কারণ হইতে অভিন্ন হয়, তবে সুতরাং কার্য্যও কারণ হইতে অভিন্ন হইয়া দাড়ায়। তাহা ব্যবহারবিরুদ্ধ—

ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। (৬)

বিশেষ না থাকিলে এটা কার্য্য, ওটা কারণ এরূপ অনুভব হয় না। অতএব শক্তি কারণ হইতে অভিন্নও নয়। ভেদে-অভেদ। শক্তি কার্য্যেও তাই দেখিয়াছি। ফলে তবে এই দাঁড়াইল যে—

উপাদান নিমিত্ত দুইই বুঝাইতে চাই। ভাষ্যকারেরও এমত অভিপ্রায় নয় যে, রাজমিস্ত্রী ছাড়াও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে বা রাজমিস্ত্রীর সত্তাব্যতিরেকেও প্রাসাদের সত্তা সিদ্ধ হয়। তবে প্রাসাদ এবং তার উপাদান ইষ্টকাদি একই 'দেশে' ব্যাপ্ত, নিমিত্ত রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি সেরূপ নয়। ভাষ্যে অব্যতিরেকের অর্থ তাই।

(১) দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য। সূত্রভাষ্য, ২।২।১৭। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্বা। ঐ, ২।১।১৮।

(২) Cf. T. H. Green, *Prolegomena to Ethics*, § 76.

(৩) সূত্রভাষ্য, ২।১।১৮।

(৪) ঐ, ২।১।৭।

(৫) যিমতং কারণানতিরিক্তং তদ্ভাবভাননিয়তভাবভানত্বাৎ তৎস্বরূপবৎ। আনন্দজ্ঞান, সূত্রভাষ্যটীকা, ২।১।১৫।

(৬) সূত্রভাষ্য, ২।২।৪৫।

কারণস্যাঽঽত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাঽঽত্মভূতং কার্য্যম্। (১)

শক্তি কারণের আত্মভূত, কার্য্য শক্তির আত্মভূত। অতএব কার্য্যও কারণেরই আত্মভূত। ভাষ্যকার স্পষ্ট বলিতেছেন—

নহি কার্য্যকারণয়োর্ভেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগম্যতে কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিত্যভ্যুপগমাৎ। (২)

কার্য্য কারণেরই সংস্থানমাত্র, কারণ হইতে ভিন্ন নয়। আবার, অভিন্নও নয়। অভিন্ন হইলে কার্য্য কারণে প্রভেদ দেখিব কেন? ভেদে-অভেদ। আত্মভূত বা সংস্থানমাত্র, এ সকল কথারও ভঙ্গী সেই। আনন্দজ্ঞান ইঙ্গিত করিতেছেন—

রজ্জুরিব ভুজঙ্গস্য কারণমেব কার্য্যস্য তত্ত্বমতোঽনির্বাচ্যং কার্য্যরূপং ভিন্নমিব চাভিন্নমিব চ ভাতি।(৩)

সন্ন্যাসীরা অনেক ভয় দেখায়। রজ্জু ভুজঙ্গে পাঠক ভয় পাইবেন না। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। এখন এইটুকুমাত্র বুঝিয়া রাখি। ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তি জগৎ পরস্পর ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। বেদান্তেও Dialectic আছে।

জগৎ জ্ঞানাধীন। দেশ কালও তাই। জগৎ দেশকালেরই ফ্রেমে বাঁধা। কতকটা শুধু কালের, কতকটা দেশকাল দুয়ের, ফ্রেমে বাঁধা। এমনই ফ্রেমে বাঁধা জগচ্ছবি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে উদ্ভাসিত আছে। জ্ঞানব্যতিরেকে দেশ কালও নাই, জগৎও নাই। বিয়দধিকরণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

এতেন দিক্কালমনঃপরমাণ্বাদীনাং কার্য্যত্বং ব্যাখ্যাতম্। (৪)

দেশ কালও কার্য্য, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কারণ। কারণসত্তাব্যতিরেকে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কিন্তু যে জ্ঞানস্বরূপে দেশ কাল প্রকাশিত, তিনি স্বয়ং দেশকালাতীত। দেশেও নহেন, কালেও নহেন। বৃহদারণ্যকে আছে—

তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ। (১)

এই ব্রহ্মস্বরূপে ‘পূর্ব্ব’ ‘পশ্চিম’ বা ‘ভিতর’ ‘বাহির’ নাই। ইনি আত্মা, সমস্ত পদার্থের অনুভাবক। অনুভাবক যাহা অনুভব করেন, তাহা আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। অনুভব বা জ্ঞানের স্বভাবই এই। পূর্ব্ব পশ্চিম ভিতর বাহির প্রভৃতি দেশসম্বন্ধ যিনি অনুভব করেন, তিনিও জানেন, “এ সকল আমি নহি”। তিনি দেশাতীত। তিনি কালেরও অতীত। ভাষ্যকার বলেন—

অতীতানাগতবর্ত্তমানভাবেনান্যথা ভবত্যপি জ্ঞাতব্যে ন জ্ঞাতুরন্যথাভাবোঽস্তি সর্ব্বদাবর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ। (২)

জ্ঞেয় বস্তু কখনও অতীত, কখনও অনাগত, কখনও বা বর্ত্তমান। কিন্তু যিনি অতীত বা অনাগত বা বর্ত্তমান বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তিনি জানেন, “এ সকল আমি নহি”। তিনি অতীতও না, অনাগতও না, বর্ত্তমানও না। তিনি ত্রিকালাতীত। অথবা তিনি সর্ব্বদাবর্ত্তমান। গ্রীন্ কেয়ার্ড্ প্রভৃতির গ্রন্থে কথাটা পুনঃ পুনঃ বুঝান আছে। সীতানাথ বাবু আবার বুঝাইয়াছেন।

জ্ঞান ছাড়া কিছু নাই। তবু এই বিশ্ব জগৎটা ‘বাহিরে’ আছে ভাবি! জ্ঞানের ‘বাহিরে’ কিছু নাই—

---

(১) ঐ, ২।১।১৮।

(২) ঐ, ২।২।১৭।

(৩) সূত্রভাষ্যটীকা, ২।১।১৮।

(৪) সূত্রভাষ্য, ২।৩।৭।

(১) ২।৫।১৯।

(২) সূত্রভাষ্য, ২।৩।৭।

অন্তরস্মিন্নিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ।
বহির্বন্মায়য়া ভাতি দর্পণে প্রতিবিম্বিতম্ ॥ (১)

এ মায়াটুকু সীতানাথ বাবুও স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু "ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে," এই কথাটায় আপত্তি হইতে পারে। জগৎ জ্ঞানাধীন, জ্ঞানপ্রকাশ্য, জ্ঞেয়। কিন্তু জ্ঞেয় হইলেই তার একজন জ্ঞাতাও আছে। 'ইহা' জানিতেছি, অর্থাৎ 'আমি' 'ইহা' জানিতেছি। অহম্ ছাড়া ইদম্ নাই—

অহমিত্যনুসন্ধাতা জানামীতি ন চেৎ স্ফুরেৎ।
কস্য কো বা প্রকাশেত জগচ্চ স্যাৎ সুষুপ্তবৎ ॥(২)

'আমি' রূপে যদি জ্ঞাতা 'জানিতেছি' রূপে প্রকাশিত না হয়েন, তবে কার কাছে কি প্রকাশিত হইবে? ব্রহ্ম সেই জ্ঞাতা, জগৎ তাঁর জ্ঞেয়। কিন্তু এই জ্ঞাতৃজ্ঞান ছাড়া যেমন তন্নিরপেক্ষ জগৎ অসম্ভব, এই জ্ঞেয়জগৎ ছাড়াও তেমনই তন্নিরপেক্ষ ঐ জ্ঞাতৃজ্ঞান অসম্ভব। অহম্ ছাড়া ইদম্ নাই, আবার ইদম্ ছাড়াও অহম্ নাই। অতএব জগতের অভিব্যক্তি যদি ব্রহ্মসাপেক্ষ হয়, তবে ব্রহ্মস্বরূপের অভিব্যক্তিও জগৎসাপেক্ষ। কেন না, জগৎপ্রকাশকরূপেই ব্রহ্মস্বরূপের সিদ্ধি। (৩) উদ্ধৃত ভাষ্যে যে ব্রহ্মের কথা হইতেছে, তিনি জ্ঞেয়জ্ঞাতৃরূপদ্বৈতাতীত নির্গুণ ব্রহ্মও নহেন। নির্গুণ ব্রহ্ম জগদ্ব্যঞ্জকও হইতে পারেন না। অতএব ব্রহ্ম অন্যের দ্বারা ব্যক্ত হয়েন না, এ প্রতিজ্ঞা অমূলক।

জ্ঞেয় জ্ঞাতার এই পরস্পরাপেক্ষিতা ভাষ্যকারও না বুঝিয়াছিলেন, এমত নহে। সূত্রভাষ্যেই তার প্রমাণ আছে। বেদান্তমতে অপরব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিত্য সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে তো জ্ঞেয় কিছুই ছিল না। তবে তাঁর নিত্যজ্ঞান সিদ্ধ হয় কই? সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞেয় কিছু না থাকিলেও ঈশ্বর তখনও জ্ঞানময়, প্রথমে আচার্য্য এইরূপ একটু জবরদস্তী করিয়াছিলেন। কিন্তু অব্যবহিত পরেই স্বীকার করিতেছেন, নিত্য সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঈশ্বরের জ্ঞেয় কিছু থাকা আবশ্যক।

কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়োভবতীতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ। (১)

সে জ্ঞেয় কি? না, জগদ্বীজভূত নামরূপ। যাহা এখনও ব্যাকৃত হয় নাই, কিন্তু ব্যাকৃত করিব বলিয়া ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন। যাহা ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়, অনির্ব্বচনীয়। এই অনির্ব্বচনীয়ে আমার বড় প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। দেখিয়াছি, জ্ঞেয় জ্ঞাতার মত শক্তি শক্ত বা কার্য্য কারণও পরস্পরসাপেক্ষ। ভাষ্যকার বলেন—

পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যাভ্যুপগন্তব্যা। অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি। শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। (২)

'অবশ্য' শব্দটার প্রতি পাঠক মনো-

---

(১) মানসোল্লাস, ১। ৮।

(২) ঐ, ৪। ২।

(৩) T. H. Green, *Prolegomena*, §75: "Apart from the unifying principle the manifold world would be nothing at all, and in its self-distinction from that world the unifying principle takes its character from it; or, rather, it is in distinguishing itself from the world that it gives itself its character which therefore but for the world it would not have." Again, §76: "There is nothing to qualify the determined world *as a whole* but that inner determination of all contained in it by mutual relation, which is due to the action of the unifying principle; nor anything to qualify the unifying principle but this very action, with the self-distinction necessary to it."

(১) সূত্রভাষ্য ১। ১। ৫।

(২) ঐ, ১। ৪। ৩।

যোগ করিবেন। জগতের ঐ অব্যাকৃত-নামরূপাত্মক প্রাগবস্থা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সে অবস্থা ঈশ্বরাধীন, সন্দেহ নাই। কেন না, অবস্থার অর্থ সত্তা। সত্তা জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবজ্ঞান অনভিব্যক্ত। সৃষ্টির অর্থই জীবজ্ঞানের প্রথম (১) অভিব্যক্তি, অথবা—একই কথা—জীবজ্ঞানে নামরূপের প্রথম অভিব্যক্তি। তারই নাম বেদান্তে নামরূপব্যাকরণ। সে শ্রুতি সকলেই জানেন—

অনেন জীবেনাহহত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। (২)

অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে, অর্থাৎ জীবজ্ঞান অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, জগৎ অথবা জগতের ঐ প্রাগবস্থা ঈশ্বরজ্ঞানেই ভাসমান ছিল। তাই উহা ঈশ্বরাধীন। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরও ঐ প্রাগবস্থার অপেক্ষা রাখেন। তা ছাড়া তাঁর সর্ব্বজ্ঞত্ব অসিদ্ধ, দেখিয়াছি। তা ছাড়া তাঁর স্রষ্টৃত্বও অসিদ্ধ। সৃষ্টির অর্থ—কেবল ঈশ্বরজ্ঞানে ভাসমান নামরূপের জীবজ্ঞানেও অভিব্যক্তি। অতএব অব্যাকৃত নামরূপ না থাকিলে জীবজ্ঞানে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইবে কি? এই অব্যাকৃত নামরূপই ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি, ব্যাকৃত জগতের বীজ বা Potentiality. তদনন্যত্বসূত্রভাষ্যেও (৩) সেই কথা। এক অদ্বিতীয় স্বগতভেদশূন্য কূটস্থ ব্রহ্মই যদি অবশিষ্ট রহিল, তবে যে সকল শ্রুতি বা যে ব্রহ্মসূত্র ঈশ্বরকে জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, তাদের দশা কি হইবে? ঈশিতব্য না থাকিলে ঈশ্বরত্ব থাকিবে কি লইয়া? অতএব ঐরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতিন্যায়বিরুদ্ধ। ভাষ্যকার বলেন—

ন। অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য।

না, ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নামরূপব্যাকরণসাপেক্ষ। তবে নামরূপ জিনিসটাই অবিদ্যার খেলা বটে। অবিদ্যার উল্লেখে প্রসঙ্গের হানি হয় নাই। যতদিন জগৎ বা ঈশ্বর মানিবে, ততদিন ঈশ্বর বা জগৎও মানিতে হইবে। এক ছাড়িয়া আর নাই। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই। জ্ঞেয় জ্ঞাতা বা কার্য্য কারণের একে অন্যের অপেক্ষা রাখে। একের অভাবে অন্যের স্বরূপ অসিদ্ধ।

তবে "ন তু ব্রহ্মানোন ব্যজ্যতে," এ ভাষ্যের অর্থ কি? আনন্দজ্ঞান বলেন—

স্বপ্রকাশস্য প্রকাশ্যত্বাদর্শনাদশেষপ্রকাশকং ব্রহ্ম নান্যপ্রকাশ্যমিত্যর্থঃ।

উহার অর্থ এই যে, স্বপ্রকাশ সূর্য্যাদি যেমন অন্য বিবিধ বস্তু প্রকাশিত করে কিন্তু নিজে অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, নিখিলবস্তুপ্রকাশক ব্রহ্মও সেইরূপ অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না। যাহা ভাঙ্গিয়াছি, এখন তাহা যুড়িয়া দেখাই। সর্ব্ব জগৎ জ্ঞেয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জ্ঞাতা। জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞেয় নাই, জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতা নাই। 'শুধু' জ্ঞেয়ও নাই, 'শুধু' জ্ঞাতাও নাই। আছে এক জ্ঞেয়-জ্ঞাতা। একই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম এই নিত্য-সংশ্লিষ্ট-জ্ঞেয়জ্ঞাতৃমিথুন-রূপে প্রকাশিত আছেন। ইনিই হেগেলের Absolute, শঙ্করের সর্ব্বেশ্বর। সব তাঁর কুক্ষিস্থ—

---

(১) এরূপ 'প্রথম' অবশ্য অনেক আছে, কেন না। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি।

(২) ছান্দোগ্য, ৬।৩।২।

(৩) ২।১।১৪।

তিনি ছাড়া কিছু নাই। তবে আর অন্যে তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে কিরূপে? 'অন্য' আছে কই? ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ভানক্তি—ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশিত করেন। অন্যকে, কিনা জগৎকে। কিন্তু সেও তো 'অন্য' নয়। তাঁর সত্তা ছাড়া জগতের সত্তা নাই। স্বস্বরূপে জগৎ লইয়া তিনিই প্রকাশিত। এড্‌বার্ড্ কেয়ার্ড্ এক সুন্দর উপমা দিয়াছেন—

> "But as it is the light which reveals both itself and the darkness, so it is self-consciousness through which we know both itself and all other things."(১)

ব্যবহারদশায় শঙ্করে আর হেগেলে আমি তো বড় একটা প্রভেদ দেখি না।

তুমি আমিও তিনি ছাড়া নহি। যে নিত্যসর্ব্বজ্ঞস্বরূপ জগদস্তিত্বে ভাসমান, তিনিই শরীরেন্দ্রিয়াদিসাধনাপেক্ষী হইয়া জীবরূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন। ইহাই নামরূপব্যাকরণ। যে নামরূপাত্মক জগৎ ঈশ্বরজ্ঞানে নিত্য উদ্ভাসিত, জীবজ্ঞানে তাহারই অনিত্য অপূর্ণ স্ফুরণমাত্র। পরিমিতশক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদির অধীন বলিয়া জীবজ্ঞানে সমস্ত নামরূপ সর্ব্বদা প্রকাশিত নহে। কখন কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় মাত্র। যেটুকু হয়, তাহাতে যে জ্ঞানস্বরূপ ভাসমান, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। সেই একই জ্ঞেয়-জ্ঞাতা জীবজ্ঞানেও বিরাজিত। ভাষ্য শোন—

> ন চ গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষ্বনীশ্বরস্য জীবস্য ব্যাকরণসামর্থ্যমস্তি। যেষ্বপি চাস্তি সামর্থ্যং তেষ্বপি পরমেশ্বরায়ত্তমেব তৎ। ন চ জীবো নাম পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্নশ্চার ইব রাজ্ঞ আত্মনেতি বিশেষণাৎ। উপাধিমাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ জীবভাবস্য। তেন তৎকৃতমপি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বরকৃতমেব ভবতি। (২)

জীব পরমেশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নয়। জীব শরীরেন্দ্রিয়প্রভৃতি উপাধির অধীন, প্রভেদ এইমাত্র। তাই জীবের নামরূপজ্ঞানও পরমেশ্বরেরই জ্ঞান। সীতানাথ বাবু সত্য বলিয়াছেন, বেদান্ত Absolute Idealism.

আবার তুমি আমি যতটুকুর খবর রাখি, গিরিনদীসমুদ্রাদিসঙ্কুল জগৎ তার চেয়ে অনেক বড়। তোমার আমার জ্ঞানে যতটুকু আছে, জগৎটা ততটুকুমাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নাই, এমত নহে। ততটুকুও তুমি আমি যতক্ষণ জানি, ততক্ষণই থাকে, তার আগেও ছিল না, বা পরেও থাকে না, এমতও নহে। জগৎটা তোমার আমার হুকুমে উঠে বসে না। অথচ জগৎ জ্ঞানাধীন। তাই বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

> প্রাগূর্দ্ধং চ সতাং সত্ত্বং বর্ত্তমানেঽপি ন স্বতঃ।
> তস্মাদীশে স্থিতং সত্ত্বং প্রাগূর্দ্ধত্ববিবর্জ্জিতে ॥(১)

পূর্ব্বে হউক, পরে হউক, বা বর্ত্তমানে হউক, বস্তুর সত্তা স্বতঃসিদ্ধ নয়। সত্তা জ্ঞানাধীন। কিন্তু কোনও বস্তুবিষয়ে তোমার আমার জ্ঞান হয়ত পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে থাকে না। সে বস্তুও কি তবে পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে আর থাকে না? রুদ্ধদ্বার নির্জ্জন ঘরে বিছানার উপরে একখানা পুস্তক রাখিয়া ঘুমাইলাম। জাগিয়া দেখি, পুস্তকখানা তেমনই রহিয়াছে। মাঝামাঝি সময়টা কি পুস্তকখানা ছিল না? ছিল বই কি। যে জ্ঞানে 'পূর্ব্বে' বা 'পরে' নাই, যে জ্ঞান নিত্যবর্ত্তমান, সেই ঈশ্বরজ্ঞানেই নিখিল জগৎ চিরদিন অবস্থিত আছে। তোমার আমার জ্ঞানে তাহাই কখন কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় মাত্র। বেদান্ত-

---

(১) *Hegel*, P. 147.

(২) ২।৪।২০।

(১) মানসোল্লাস, ৪।৩।

বাদ Subjective Gorgonization নহে

জীবেশ্বরে এক প্রভেদ দেখিলাম। ঈশ্বর নিত্যবুদ্ধ, জীবের জ্ঞান শরীরেন্দ্রিয়াদি সাধনের অপেক্ষা রাখে। ভাষ্যে আছে—

> সবিতৃপ্রকাশবদ্ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বে জ্ঞানসাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপি চাবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যান্ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতস্যেশ্বরস্য। (১)

জীবের জ্ঞান শরীরাদিসাপেক্ষ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাই বুঝাইয়াছি। জ্ঞানই যে সকলকে গড়িয়া তুলিয়াছে, জ্ঞান ছাড়া যাদের সত্তা নাই, অতএব জ্ঞানই যাদের কারণ, সেই সকলই জীবে আবার জ্ঞানোৎপত্তিরই কারণ হইতেছে। কেন এমন হয়? গ্রীন্ বলেন, Equally unable to avoid asking and to answer. ভাষ্যকার বলেন, অবিদ্যায়। অবিদ্যা কি, আর এক বারে দেখিব।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

◆

সন্ন্যাসী।

"কেন সখে, নবীন বয়সে
সাজিলে এ 'নিমাই' সন্ন্যাসী?
পুনঃ কি 'ভারতী' কেহ, করিয়া করুণা স্নেহ,
দিল দীক্ষা হরি-প্রেমে
হ'তে বনবাসী?

২

"তাই বুঝি ত্যজিয়া সুবেশ
পরিলে এ গৈরিক-বসন,
চন্দন চর্চ্চিত-অঙ্গে, বিভূতি মাখিলে রঙ্গে,
পরিলে বৈরাগ্য বেশ
এত আয়োজন!

৩

"একি সখে, ঝরিছে নয়ন,
বহিছে বিষাক্ত ঘন শ্বাস,
শোকের নীরব ঝড়ে, হিয়া যেন ভেঙে পড়ে,
বসুধা ভরিয়া যেন
নিঠুর হতাশ!

৪

"কেন সখে, কি অভাব তব,
কি বেদনা হেন বিশ্বগ্রাসী?—
আছে তো সাধের গেহ, আছে সেথা প্রীতিস্নেহ,
রোগে সেবা, দুখে অশ্রু,
সুখ-ভরা হাসি!

৫

"তাই সাধি চল সখে ফিরে,
কত আঁখি আছে পথ চেয়ে!—
সেথা কত দীর্ঘ শ্বাস, বাড়াইছে হাহুতাশ,
কত অরুন্তুদ অশ্রু
পড়িতেছে বেয়ে!"

৬

"না না সখে, মিছা ডাক মোরে,
সংসারের আমি নাহি আর—
থাক্ সে সুখের ধাম, মুছিয়া আমারি নাম,
চাহি না আদর হাসি,
তপ্ত অশ্রু তার!

৭

"নাহি মোর কেশব ভারতী,
নহি আমি নিমাই সন্ন্যাসী,
হা মোর পাষাণ চিত্ত, আজি করি প্রায়শ্চিত্ত,
ফলিয়াছে কর্ম্মফল!
কহিব প্রকাশি।

---

(১) সূত্রভাষ্য, ১।১।৫।

"একদিন—নিদাঘের শেষে
নি'ভ নি'ভ সায়াহ্ন তপন,
বসিনু বিটপীমূলে, সোণালী তটিনী-কূলে,
নয়নে জাগিতেছিল
সোণার স্বপন।

৯

"ধীরে ধীরে বহিল সমীর,
তর তর অলস লহরী,
দোয়েলের মৃদুতান বিভল করিছে প্রাণ,
যমুনা-পুলিনে বাজে
শ্যামের বাঁশরী!

১০

"বিধুমুখী গ্রাম্যবধূ যত,
ঘরে যায় কলস ভরিয়া,
পিছনে দুরন্ত ছেলে ছোটে কাঁটা বন ঠেলে,
নিবারে নীরবে মাতা
আঁখি রাঙ্গাইয়া!

১১

"তারি মাঝে দেখিলাম কারে,
রুক্ষ কেশ, মলিন বসনা,
সোণার শরীর কার, হয়েছে কঙ্কালসার,
নয়নে উদাসমাখা
আনত আননা!

১২

"হায়! আমি কিশোর বয়সে
একদিন কয়েছিনু তারে,
'অভাগার মন প্রাণ, ও চরণে দিবে দান,
লহ গো করুণাময়ি,
খুলি কৃপাদ্বারে।'

১৩

"সে যেন লভিল রত্ন, মণি,
দুরাধমে করিল বিশ্বাস!—
লাজ ভয় টুটাইয়া, কহিল করিবে বিয়া,
বহিল সরল বুকে
অমিয় উচ্ছ্বাস!

১৪

মনে মনে আমারে গড়িয়া
ফুলবনে—শারদী সন্ধ্যায়,
সরলা সে দেববালা, গলে দি'ত বরমালা,
বাসর জাগিত কভু
বরষা নিশায়!

১৫

"আমি কোথা?—অদৃষ্ট ছলনা
পাপী আমি কোন্ দূর দেশে?—
সে আমার কোন্ খানে, তার কথা কেবা জানে,
আমি বাঁধিয়াছি ঘর
কত সুখাবেশে!

১৬

"কে চিনিত রমণী-হৃদয়,
একটী মুখের কথা তরে,
আর সে চাহেনি বর, আর সে বাঁধেনি ঘর,
আপনা ঢালিয়া দেছে
মরণের করে!

১৭

"পুনঃ তারে দেখিনু যখন,
বুঝিলাম কি অধম আমি,
কোথায় পামর-চিত, প্রেমে হয় বিগলিত,
পিশাচ কোথায় কবে
সুরবালা স্বামী?

১৮

"এই পাপ দেহ দিয়ে আর
দেবীরে কি পরশিতে পারি?—
এ ম্লান পঙ্কিল প্রাণ, পারি কি করিতে দান
এ বুকে রাখিব কোথা
প্রতিমা তাহারি?

১৯

"তাই সখে, হইনু সন্ন্যাসী,
সাধিব এ মহতী সাধনা,
কেবলি আকাঙ্ক্ষা মম, হইয়া পবিত্রতম,
মরমে পূজিব সেই
অমর-বাসনা।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (১২)

প্রাচীন আচার ব্যবহার।

সতীদাহের আমরা অনেকগুলি গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু ইংরাজেরা যে সমস্ত গল্প সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যেন অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। কেবল এক মাত্র হালিডে সাহেব, যিনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলার ছোট লাট হইয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনায় সতীর প্রতি কোন অত্যাচারের উল্লেখ নাই। সাহেবেরা লিখিয়াছেন, পুরুষেরা আপনাদিগের বংশ-গৌরব বৃদ্ধি, ধনলোভ প্রভৃতির জন্য বিধবাদিগকে মৃত পতির সহিত মরিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে উত্তেজিত করিত, ভয় দেখাইত, পুণ্য ও স্বর্গবাসের লাভ এবং পূর্ব্ব মহিলাদিগের দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়া যাহাতে সে মরিতে সংকল্প করে, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিত। প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্কা যুবতী বা বালিকাদিগকে মারিবার জন্যই অধিক চেষ্টা হইত। "ভগবান নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধি করিবেন" বলিয়া অপর্য্যাপ্ত সিদ্ধি সেবন করান হইত। সাহেবদের এই সকল কথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহাও বলা যায় না। লোকে বিধবার সুখ্যাতি, ব্রহ্মচর্য্য ও পারিবারিক সেবার কথা উল্লেখ করিয়া যতই কেন গৌরব প্রকাশ করুক না, বালবিধবা বা অল্পবয়স্কা বিধবা যে পরিবারের কণ্টক ও চক্ষুশূল, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? সহমরণের নিষ্ঠুরতা ছাড়িয়া দিলেও এ কথা কি মিথ্যা যে, উক্তবিধ মহিলার মৃত্যুতে লোকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে? আমরা একটী যুবতী বিধবাকে মৃত্যুশয্যায় তাহার রোরুদ্যমানা সধবা জননীকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে শুনিয়াছি যে, "মা তুমি যে কি আরাম পাইতেছ, তাহা কি আমি বুঝিয়া যাইতেছি না।" সত্য কথা বলিতে কি, যে জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, সে জাতিতে সতীদাহ প্রচলিত থাকাই যেন উচিত। চিরজীবন তুষানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা বিধবা হওয়া মাত্র স্বামী সহ চিতায় দগ্ধ হওয়া যেন ভাল বোধ হয়। প্রচীন আর্য্যেরাও এই কারণে সতীদাহ বিধি প্রচার করিয়া থাকিবেন। রামায়ণে সতীদাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, মহাভারতে মাদ্রী দেবী পাণ্ডুরাজের মৃত দেহের সহিত দগ্ধ হইয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

সতীদাহ দ্বিবিধ, সহমরণ ও অনুমরণ। স্বামীর দেহ সহ দগ্ধ হওয়া সহমরণ, আর দূর দেশে মৃত স্বামীর দেহাভাবে তাঁহার কোন ব্যবহার্য্য বস্তু লইয়া চুল্লী শয়ন করিয়া দগ্ধ হওয়াকে অনুমরণ বলিত। এই অনুমরণ প্রথা ব্রাহ্মণীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। গর্ভবতী স্ত্রীদিগেরও সহমরণে অধিকার ছিল না, শূদ্রাণী হইলে প্রসবান্তে অনুগমন করিতে পারিতেন।

সতীদাহের দৃশ্য।—স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী সহগমন করিবেন, তিনি একটী আম্রপল্লব ভাঙ্গিয়া ধরিয়া থাকিতেন। নব বিধবাকে আম্রপল্লবধারিণী দেখিলেই সকলে বুঝিয়া লইতেন, ইনি সহগমনে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছেন। (আজিও ঝি বউ কঠিন আবদার ধরিলে গৃহিণীরা বলিয়া থাকেন, "মেয়ে যেন আমের ডাল ভেঙ্গেছেন।") আত্মীয়েরা বিধবাকে ক্ষান্ত করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রবোধ দিতেন, কিন্তু যতই প্রতিরোধ হইত, ততই ব্যাকুলতার সহিত প্রতিজ্ঞাকারিণী এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন যে, শেষে বুক চাপড়াইয়া, মাথা কুটিয়া ইতঃস্তত ছুটাছুটী করিতেন, আপনার কেশগুচ্ছ উৎপাটন করিতেন। তখন তাঁহার ব্যবহার এমন প্রবল উন্মত্তের ন্যায় দেখা যাইত যে, আজিও স্ত্রীলোকেরা ক্রোধে উন্মত্ত নারীকে "আগুণ খাকীর" দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে। দীপ-শিখায় অঙ্গুলি জ্বালাইয়া পরীক্ষা দানের কথা অনেক স্থানে শুনা গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকিলে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইত। সকলেই সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, কিন্তু একাধিক বিধবার সহমরণ নিষিদ্ধ (১) বলিয়া গুরু পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজন মধ্যস্থ হইয়া একজনকেই নির্ব্বাচন করিতেন। সতী রক্তবস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইতেন, তাঁহার ললাট পূর্ণ করিয়া সিন্দুর লেপিত হইত, তাঁহার চক্ষু হইতে একবিন্দু শোকাশ্রুপাত হইত না, স্বামীসহ স্বর্গধামে যাইতেছেন, এই বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ থাকিত। যাত্রাকালের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। অগ্রে পতির শবদেহ, তৎপশ্চাৎ প্রফুল্লমুখী সতী সেই আম্রপল্লব হস্তে লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে চলিয়াছেন; তাঁহার পশ্চাতে আত্মীয় আত্মীয়া, প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীরা তাঁহাকে অন্তিম বিদায় দিবার জন্য দলে দলে বিলাপ করিতে করিতে যাইতেছেন, মৃদঙ্গ করতাল, ঢাক ঢোলের শব্দের সহিত হরিবোলধ্বনি পল্লী হইতে পল্লী প্রতিধ্বনিত করিত। পথ লোকে লোকারণ্য হইত। পার্শ্বস্থ বাটীর মহিলারা গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সতীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইতেন; প্রণাম করিতেন, আগ্রহ সহকারে তাঁহার সিন্দুর ভিক্ষা করিয়া লইতেন। সতীর সিন্দুর অতি আদরের সহিত রক্ষিত হইত। অনেক প্রাচীন পরিবারে আজিও তাহা লক্ষ্মীর কৌটার ন্যায় সযত্নে সঞ্চিত আছে। তাঁহার পদাঙ্ক হইতে ধূলি তুলিয়া লইতেন। সতীও সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

শ্মশানে চিতা এইরূপ সজ্জিত হইত:—দুই হাত প্রস্থ, তিন হাত দীর্ঘ ও তিন হাত উচ্চ কাষ্ঠরাশির মধ্যে ও উপরে পাটকাটী দ্বারা পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ঘৃত ও ধুনা ঢালিয়া দেওয়া হইত। এই ভাবে চিতা সজ্জিত হইলে, সতী জ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম এবং প্রণত কনিষ্ঠদিগকে আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন করিয়া, আপনার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া, প্রিয়তমাদিগকে উপহার দিয়া, উপস্থিত নরনারীদিগকে সাদরে বিদায় দান করিতেন। অনন্তর সজ্জিত চিতাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতেন। স্বামীর দিকে পার্শ্ব ফিরিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শয়ন করিলে, চারিদিকে বাদ্যভাণ্ডের সহিত হরিধ্বনি ও সতীর নামে জয়ধ্বনি বার বার প্রবল বেগে উত্থিত

---

(২) নেপালরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার জং বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার একাধিক পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

হইত। আত্মীয়েরা এই সময় গুরুভার কাষ্ঠ দ্বারা মৃত ও জীবিত দেহদ্বয়কে উচ্চ করিয়া আচ্ছাদন করিত, রাশি রাশি খড়ে চিতার উপর ও চারিদিক ঢাকিয়া বাঁশ দিয়া দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলে পুত্র অগ্নি হস্তে লইয়া তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পিতৃমুখে অগ্নি স্পর্শ করাইলে চিতা প্রজ্বলিত করা হইত। এই সময় বাদ্য সহ জয়ধ্বনি অধিকতর প্রবল বেগে উত্থিত হইত। স্ত্রী যতক্ষণ না চিতা স্পর্শ করিতেন, ততক্ষণ তাঁহার ফিরিবার উপায় থাকিত, চিতারোহণের পর ফিরিলে, নিজের গৃহত দূরের কথা, মুর্দ্দফরাসের আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোথাও স্থান হইত না। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। আমার মাতামহী, বাগবাজারের হরলাল মিত্রের বাটীর কোন মহিলার সহমরণের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিতেন, উক্ত সতী চিতার ভিতর হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আপনার পুত্রদ্বয়ের নামোচ্চারণ করিয়া "জয় হউক, জয় হউক," বলিয়া বার বার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

কাশীপুর, চিৎপুর, কাশীমিত্রের ঘাট এবং কালীঘাটের কেওড়া তলার ঘাটগুলিতে যে কত শত অবলার জীবন্ত দেহ ভস্মসাৎ হইয়াছে,তাহার সংখ্যা নাই। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের আদেশে কলিকাতার সীমার মধ্যে সতীদাহ হয় নাই। উত্তরে চিৎপুর আর দক্ষিণে কেওড়াতলার ঘাট তখন সতীদিগের মরিবার ক্ষেত্র হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু 'হিন্দু কুলবালার প্রতি অত্যাচারের ত্রুটী হয় নাই। তাঁহারা সতীদাহের উপর কখন হস্তক্ষেপ বা সতীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। সম্রাট আকবরসাহ সতীদাহ নিবারণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিন্দু অমাত্যবর্গের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। নবাবী আমলে যতক্ষণ থানাদারের লিখিত অনুমতি না আসিত, ততক্ষণ কোন সতী চিতারোহণ করিতে পাইতেন না।

ধন্য ইংরাজরাজ, যাঁহাদের কৃপায় আমাদের জননী, ভগিনী ও কন্যাগণ বিনা ব্যাধিতে মৃত্যুকবলিতা হইতেছেন না। অবলাকুলের এই নির্ব্বাক আশীর্ব্বাদেই ইংরাজ রাজত্ব ভারতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সন্দেহ নাই। সহৃদয় লর্ড ওয়েলেস্‌লি গঙ্গাসাগরে পুত্র বিসর্জ্জন প্রথা রহিত করিয়া বিধবা অবলাদিগের রক্ষার জন্য ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সদর আপীল আদালতের জজদিগকে সতীদাহ নিবারণ করিতে যুক্তি প্রদানের আদেশ করিয়াছিলেন। উক্ত রিপোর্ট প্রস্তুত হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে লাটসাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন, ব্যাপারটীও চাপা পড়িয়া রহিল। ১৮১২ সালে পুনরায় উহার আন্দোলন উপস্থিত হইলে তর্ক উপস্থিত হয় যে,এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রবল হস্তে নিবারণ করা উচিত, কি চড়ক ও গঙ্গাযাত্রা প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা যেমন সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত উঠিয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহাকেও সেইভাবে রাখা হইবে। মন্ত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রজা সাধারণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ উৎপাদিত হইবে ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে

প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া মফস্বলে মাজিষ্ট্রেট ও মিশনরিদিগকে হত্যা করিবে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় সকল জ্বালাইয়া দিয়া ধনাগার লুণ্ঠন করিবে। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া, অল্পে অল্পে কার্য্য করা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। পূর্ব্বে সতীদাহ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন হয়, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের বিশেষ সতর্কতায় ও সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামত যদি কোন স্ত্রীলোক সহমরণে যাইতে সংকল্প করিত সেই যাইতে পারিত অপরের সাধ্য হইত না। ১৫ বৎসর কাল এইরূপ কার্য্য করায় সতীদাহের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া আসিল, তখন প্রজা সাধারণের মধ্যে কোন অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউসে এই প্রথা রহিত করিবার জন্য অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, তদনুসারে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুর তাঁহার ১৮ মাস শাসনকালে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর, উক্ত সনের ৮ আইন অনুসারে সতীদাহ নিবারণ করেন। সমস্ত হিন্দু প্রজা একবাক্যে গবর্ণমেণ্টের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছিল। কেবল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার অল্প সংখ্যক সহযোগীর সহানুভূতি ও রাজার শাস্ত্রোক্ত যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট হিন্দু সাধারণের আপত্তি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও সহমরণের ন্যায় ধর্ম্মমূলক উচ্চভাব পৃথিবীর কোথাও নাই, তত্রাচ ইহা যে নিতান্ত নৃশংস ও বর্ব্বরের ন্যায় কার্য্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা রহিত করিয়া আমাদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত লোকে ধন্যবাদ প্রদান করে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুর এই মহৎ সৎকার্য্যের জন্য চিরদিন ভারত-ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার পূজা প্রাপ্ত হইবেন।

পূর্ব্বে স্নান আহ্নিকের কথা বলিয়াছি। আহ্নিকের পর আবার গৃহদেবতাকে প্রণাম করিতে হইত। স্নানান্তে গৃহস্থ—বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বালক বালিকা, দাস দাসীকে পর্য্যন্ত তুলসী বৃক্ষে জল সেচন করিয়া প্রণাম করিতে হইত। যাহারা শাস্ত্রীয় মন্ত্র না জানিত, তাহারা "তুলসী তুলসী নারায়ণ, তুমি তুলসী বৃন্দাবন, তোমার মাথায় ঢালি জল, অন্তকালে দিও স্থল," এই মন্ত্র পাঠ করিত। এখনও অনেক পরিবারে এ নিয়ম প্রচলিত আছে, কিন্তু যে ভাবে হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে বুঝা যায়, আর কিছুকাল পরে উহা থাকিবে না। চিকিৎসকেরা বলেন, তুলসী বায়ুপরিষ্কারক। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম স্বাস্থ্যরক্ষার সকল উপায়গুলিকে ধর্ম্মে জড়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা দেহকে ভগবানের মন্দির ও লীলাক্ষেত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তুলসীর বায়ুশোধক গুণ থাকায় উহা গুল্ম হইলেও বৃক্ষ নামে সম্মানিত ও নারায়ণ ভাবে পূজিত হইয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে উচ্চমঞ্চ করিয়া সাদরে তুলসী বৃক্ষ অবশ্য রক্ষণীয় ছিল। প্রাতঃকালে দুর্গানাম লিখিতে হইত। বৈষ্ণবেরা হরিনাম বা রাধাকৃষ্ণ নাম লিখিতেন। কেহ কেহ এক সহস্র নাম লিখিয়া উঠিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আহার অতি সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন হইত। কারণ তাঁহারা ইহাকে "প্রাণযজ্ঞ" বলিতেন। সেই জন্য

ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভোজন করিতেননা। প্রসাদান্ন পুনর্নিবেদিত হইত না বটে, কিন্তু প্রণাম করিয়া ভোজন করা হইত। কার্য্যস্থানে গমনের সময় গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া দুর্গা নাম উচ্চারণ করিয়া বাহির হইতেন। গৃহের বাহিরে যাইতে হইলেই দুর্গানাম উচ্চারণ করিতেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ভগবানকে প্রণাম করিতেন, সামান্য দুই ছত্র লিখিতে হইলেও উপরে ইষ্টদেবের নাম লিখিয়া প্রণামান্তে প্রয়োজনীয় লিপি আরম্ভ করিতেন। কার্য্যান্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহদেবতাকে প্রণাম করিতেন। সন্ধ্যাকালে যাঁহারা গৃহে থাকেন, তাঁহারা তাঁহার আরতি দর্শন করিতেন, গৃহের বাহিরে থাকিলে নিকটস্থ দেবালয়ে শংখ ঘণ্টা ধ্বনি শ্রবণ মাত্র তথায় উপস্থিত হইতেন। আরতী দর্শন একটী অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। শয়নকালে ইষ্টদেব গুরু ও অপরাপর দেবদেবীকে প্রণাম করিয়া "পদ্মনাভ" উচ্চারণান্তর চক্ষু মুদ্রিত করিতেন।

প্রত্যেক হিন্দুগৃহে রন্ধনশালার ন্যায় পারিবারিক দেবালয় স্থাপিত ছিল। যাঁহার অদৃষ্টে বিগ্রহ বা শালগ্রামশীলা প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই, তিনি গৃহের একটী পরিচ্ছন্ন ঘরে হয় একটী শিবলিঙ্গ, না হয় ক্ষুদ্র পিত্তলের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি একখানি ক্ষুদ্র সিংহাসনে রাখিয়া ব্রাহ্মণ নিয়োগের সংস্থান না থাকিলে বাটীর কর্ত্তা বা গৃহিণী নিজেই পূজা করিতেন। ইতর লোকেরা গৃহমধ্যস্থ তুলসীকেই গৃহদেবতারূপে ভক্তি করিত। ধনিদিগের স্বতন্ত্র ঠাকুর বাটী থাকিলেও বাসগৃহে একটী গৃহদেবতা অবশ্য পূজনীয়। প্রত্যেক গৃহে গোশালা থাকিত তাহাও দেবালয়ের ন্যায় পবিত্র স্থান বলিয়া পরিচিত হইত। এমন কি, যে জাতির গৃহে ব্রাহ্মণ জল স্পর্শ করিলে অপবিত্র হয়, তাহার গোশালায় বসিয়া অন্ন পাক করিয়া খাইলেও ধর্ম্মহানি হইত না। গাভী ভগবতী, ষণ্ড মহাদেব বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, এখনকার মত বিশ্বাস নহে, আন্তরিক বিশ্বাস। একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী লিখিয়াছিলেন, "আমি জনৈক মাজিষ্ট্রেটের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। একদিন গরু আসিয়া তাঁহার ফুলবাগানটীর সর্ব্বনাশ করিতেছে দেখিয়া, তিনি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বন্দুক লইয়া গরুটাকে মারিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার হিন্দু চাপরাসী বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, আমাকে না মারিলে তুমি গরুকে মারিতে পারিবে না। অগত্যা সাহেব নিরস্ত হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গরুটী কি ইহারই, সাহেব বলিলেন, তাহা নহে, এই মূর্খেরা সমস্ত গরুগুলাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে।" সে কালে গোসেবা অতি পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল, এবং গরুর পূজা হইত; অবশ্য এ প্রথা একেবারে উঠিয়া যায় নাই।

সেবা। সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। দেবসেবা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু সন্ন্যাসী, অতিথি, আত্মীয় কুটুম্ব, দরিদ্র ও রোগীদিগের সেবা করা যেন স্বাভাবিক প্রকৃতির ন্যায় ছিল। গো-সেবা,—পশু পক্ষী, এমন কি বৃক্ষলতার সেবাও ধর্ম্মকার্য্য ও অবশ্য পালনীয় ব্রতরূপে নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইত। অতিথিকে নারায়ণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল এবং তদ্রূপ ভক্তির সহিত সেবা করা হইত। গৃহস্থদিগের আহারের পূর্ব্বে কোন অতিথি আসিলে যতক্ষণ না তাহার ভোজন হইত,

ততক্ষণ গৃহস্থ ভোজন করিতে পাইতেন না। অতিথি সেবা না লইয়া বিমুখ হইলে সে দিন গৃহস্থ সপরিবারে উপবাসী থাকিতেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শিক্ষক রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ সেবা না লইয়া প্রস্থান করায় রঘুদেব সে দিন সপরিবারে ও সশিষ্য সম্প্রদায় উপবাসী ছিলেন।

তাঁহারা উপাধি বা রাজ সম্মানের জন্য লালায়িত ছিলেন না। কোম্পানির প্রাচীন ও প্রধান বেনিয়া (১) লক্ষ্মীকান্ত ধরকে (নকু ধর) লর্ড ক্লাইব বাদসাহের নিকট হইতে মহারাজা উপাধি আনিয়া প্রদান করিতে চাহিলে, তিনি নিজে না লইয়া আপনার এক মাত্র দৌহিত্র সুখময় রায়কে দিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণপান্তিকেও রাজা উপাধি প্রদান করিতে চাহিলে তিনি জিব কাটিয়া বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ নগরের রাজা আমার রাজা, আমি তাঁহার প্রজা হইয়া রাজা উপাধি কিরূপে লইব?" ইহাতে কোম্পানি তাঁহাকে রাজোপাধির উপযুক্ত নহবতাদি খেলাতের সহিত পাল চৌধুরী উপাধি দিয়াছিলেন। এমন কি, এখন প্রত্যেকের নামের সহিত সংযুক্ত "বাবু" পদ পূর্ব্বে কাহারও ব্যবহার করিবার অধিকার ছিল না, ইহা নবাব প্রদত্ত একটী উপাধি ছিল। সম্মানিত ধনাঢ্য ব্যক্তি ভিন্ন নবাবেরা অপর কাহাকেও উহা দিতেন না। চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ বহু সম্মানাস্পদ প্রাচীন বলভদ্র সোমের অধঃস্তন পুরুষ শ্যামরাম সোমকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা হুগলীতে আসিয়া অতি সমাদরের সহিত বিবিধ খেলাত সহ "বাবু" উপাধি দান করিয়াছিলেন।

দান, সেবা ও ক্রিয়া-কলাপে সে কালের বাঙ্গালীরা যশস্বী হইতে চেষ্টা করিতেন। ধনবানেরা ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, দেবালয়, জলাশয়, অতিথিশালা ও গোচারণ ক্ষেত্রাদি দান করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কবি, গায়ক, বাদক, শিল্পী প্রভৃতিকে প্রচুর পুরস্কার ও বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করিতেন। চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মাদ্রাসা, চিকিৎসালয়, সঙ্গীতের আখড়া, সাধারণের আমোদ প্রমোদের জন্য উদ্যানসহ বায়দ্বারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা প্রাচীন অধিবাসিদিগের যে সকল বংশ ও ক্রিয়া বর্ণন করিয়াছি, তাহাতে উপরোক্ত সৎকার্য্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। দরিদ্র প্রতিবাসী বা আত্মীয় অনুগতদিগকে ঘৃণা করা ত দূরের কথা, প্রাতঃকালে উহাদের সংবাদ লওয়া তাঁহাদের একটী দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। যিনি প্রধান বলিয়া পরিচিত হইতেন, তিনি সকলের রোগ শোক,বিপদে সম্পদে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইতেন। আহা বড়লোকের এই সহানুভূতিতে দরিদ্রের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইত ও সাহস বাড়িত, তাহা গরিব লোকেই বুঝিতে পারে। "কর্ত্তা আসিয়াছেন আর ভাবনা কি" বলিয়া সে নিশ্চিন্ত হইত। কর্ত্তা যথাকর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া গৃহে ফিরিতেন। দরিদ্রের সহিত বন্ধুতা রাখিতে বা মিশিতে তাঁহারা তিলার্দ্ধ কুণ্ঠিত হইতেন না। মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী গল্প

---

(১) সুবর্ণ বণিকেরা কোম্পানি ও ইংরাজ সওদাগরদিগের প্রয়োজন মত অর্থ কর্জ্জ দিতেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহারা বেনিয়া বলিয়া কথিত হইতেন। "বেনিয়ান" শব্দ বেনিয়া শব্দেরই অপভ্রংশ।

আছে। তিনি যে কেবল একজন প্রধান ধনী ছিলেন তাহা নহে, সে সময় কি ইংরাজ, কি দেশীয় সর্ব্বত্রই তাঁহার সম্মান সর্ব্বপ্রধান ছিল। চিৎপুর রোড হইতে নিমতলা ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া উত্তরদিকে বসু মহাশয়দিগের যে পুরাতন বাটী দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বাংশের বাটীতে অভয়চরণ মিত্র নামে একজন ভদ্রলোক থাকিতেন। তিনি মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের বাল্যকালের সহপাঠি ছিলেন। একদিন তিনি বাটীর দ্বারে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, সেই সময় দ্বারিকানাথ বাবু সেই পথ দিয়া জুড়ী গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন। গাড়ী হইতে বাল্যবন্ধুকে দেখিবামাত্র নামিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলে মিত্রজ মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসন আনিতে যাইতেছিলেন। দ্বারিকানাথ বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন, আপনিও তাঁহার পার্শ্বে রোয়াকে বসিলেন। বন্ধু ব্রাহ্মণের হুকা আনিতে চাহিলে তাহাতেও বাধা দিয়া বলিলেন, কেন ভাই, আমি চলিয়া গেলেই ত তুমি হু কাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, আমার কি সে আক্কেল নাই, একটু কলাপাত আন। পরে কলাপাতার ঠোঙায় তামাক খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা ও গল্প-গুজব হইয়াছিল। পথের লোকে দেখিয়া যাইতেছে, কিন্তু তখন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না, সুতরাং কেহই আশ্চর্য্য হয় নাই। আমরা এখন ঐ সম্মিলনকে পৌরাণিক আখ্যায়িকার ন্যায় মনে করিতেছি।

কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত কেহই একাকী আহার করিতে ভালবাসিতেন না। স্বজাতীয় অনুগত বা আত্মীয়-স্বজন অনেককে লইয়া আহার করিতেন। অনেক ধনী লোকের গৃহে নিত্য রীতিমত ভোজ হইত। হাটখোলার মাণিক বসু যখন ঢাকার দেওয়ান ছিলেন, তখন তাঁহার দ্বারে একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান থাকিত, আহারে বসিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ উহা বাজান হইত, অভুক্ত কায়স্থ-সন্তান ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া যতই আসুক, তিনি তাহাদিগকে লইয়া একত্র আহার করিতেন। হরিঘোষের গোয়ালের গল্প পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল ভোজে কর্ত্তার ন্যায় সমান ভোজ্য সকলকেই দেওয়া হইত। যদি কোন গৃহে কিছুমাত্র তারতম্য করা হইত, তাহা হইলে কর্ত্তার নিন্দা রাখিবার আর স্থান থাকিত না।

কেবল যে পুরুষেরাই দরিদ্রের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন, তাহা নহে, গৃহিণীরাও মেয়েমহলে ঠিক এই রকম ছিলেন। বাল্যরোগের চিকিৎসায় অনেক গৃহিণী বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। দরজীপাড়ায় যদুর মা বলিয়া এক কায়স্থ বিধবা ছিলেন, তিনি কেবল বাল্য চিকিৎসায় পটু ছিলেন না, রীতিমত কবিরাজী করিতেন। তিনি কলিকাতায় অতি উচ্চ ঘরের বধূ ছিলেন। গত পৌষ মাসের নব্যভারতের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় আমরা বলিয়াছি, বর্গীর হাঙ্গামায় আন্দুলের দত্ত চৌধুরীরা কলিকাতায় পলাইয়া আসেন, তন্মধ্যে বিনোদবিহারী দত্ত কোম্পানীর চাকুরী পাইয়া এখানে রহিয়া গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীচরণ দত্ত মহাশয় সে সময়ের পবলিক ওয়ার্কের প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারী অর্থাৎ দেওয়ান ছিলেন। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম

দুর্গ হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত অনেক গৃহ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার আটটী পুত্র। যদুর মা চতুর্থ পুত্র কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। তাঁহার স্বামী কাশীধামে এক অবধূতের নিকট বহুপ্রকার উৎকট রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং এখানে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। ঔষধগুলির গুহ্য প্রকরণ কেবল আপনার পত্নীকে শিখাইয়াছিলেন। যদুর মা কতকগুলি নাবালক পুত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইলে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বনে সংসার প্রতিপালন করিতেন। তদ্ভিন্ন দুর্গোৎসব হইতে রথ পর্য্যন্ত বার মাসে তের পার্ব্বণ, গৃহে বিগ্রহ সেবা, অতিথি সেবা, এবং তীর্থদর্শন প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বেশ সচ্ছলভাবে সংসার চালাইতেন। আত্মীয়, প্রতিবাসী ও দরিদ্রদিগের নিকট অর্থ লইতেন না। কলিকাতায় অনেক ধনবান লোকের বাটীর নিয়মিত চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় কলিকাতায় ২।৪ জন মাত্র ইংরাজ ডাক্তার ছিলেন। মেডিকেল কলেজ তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী ডাক্তার একেবারে ছিল না, জনকয়েক মাত্র কবিরাজ ছিলেন। ইংরাজ ডাক্তারেরা তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসানৈপুণ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। কবিরাজেরা রোগনির্ণয়ে অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ক্ষয়কাশ রোগে তাঁহার সোণাজারা অব্যর্থ মহৌষধ ছিল। নাড়ী পরীক্ষায় এমন চমৎকার ক্ষমতা ছিল যে,বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগের গঙ্গাযাত্রার সময় তাঁহাকে দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করা হইত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার "প্রভাকর" পত্রে এক সময় যদুর মা'র চিকিৎসার বিস্তর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

> "ডাক্তার কবিরাজ রণে যারে হারে।
> যদুর জননী গিয়া জয় করে তারে।"

অনেক গৃহিণী ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষ পটু ছিলেন। কেবল আত্মীয় স্থানে নহে, জাতি নির্ব্বিশেষে প্রতিবাসিদিগের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া অকাতরে উৎকট অবস্থায় ধাত্রীকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেন। তখন ফোড়া, অস্ত্র প্রভৃতি কাটাকুটী কার্য্য নাপিত ও নাপিতানীরা সম্পন্ন করিত, উক্ত বিদ্যাতেও এক একজন নাপিত এমন দক্ষ ছিল যে, তাহারা কেবল উক্ত কার্য্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে রাজুর মা নাপিতানী অস্ত্রবিদ্যায় এমন দক্ষ ছিলেন যে, পুত্র রাজনারায়ণকে নব প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে পড়াইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

মনুষ্য—পরলোকে।*

পরলোকে আলোচনা করিলে আমরা অবগত হই যে,সকল ব্যক্তিকে প্রেতলোকে (astral plane) আসিতে হইবে। মৃত্যুর পর কেহ স্বর্গে যাইবে, কেহ প্রেতলোকে যাইবে, এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত আলোচনা হইতে

---

* এই প্রসঙ্গে মদীয় "মনুষ্য-ইহলোকে" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (সাহিত্য-সংহিতা, আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩১০)

প্রবন্ধলেখক।

আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রথমতঃ সকল ব্যক্তিকে প্রেতলোকে যাইতে হইবে, পরে সকলেই আবার স্বর্গলোকে যাইতে হইবে। মৃত্যুর পর, সকল ব্যক্তিরই কিছু দিনের জন্য সংজ্ঞা লোপ হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তিদের সংজ্ঞা শীঘ্র লাভ হইয়া থাকে, তাহারা প্রেতজগতের নিম্নভূমিতে জাগ্রত হইয়া উঠে। প্রেতজগতের নিম্নভূমিতে জাগ্রত হওয়া মানে আর কিছুই নহে, কেবল যন্ত্রণা ভোগ করা। সুতরাং যাহারা কর্ম্মফলে শীঘ্র জাগ্রত হন, তাহারা কষ্টভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহারা পার্থিব জীবনের সদ্ব্যবহার করেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের অজ্ঞানের অবস্থা কিছু বেশী দিন থাকে। তখন ঐ অবস্থা সুখের স্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া যায়। তাঁহারা যখন জাগ্রত হন, তখন তাঁহারা নিজদিগকে প্রেতলোকের উচ্চতর ভূমিতে দেখিতে পান। সুতরাং তাঁহারা আর প্রেতলোকের কষ্ট ভোগ করেন না। মনুষ্য যদি বিশেষ উন্নত হন, তাহা হইলে মৃত্যুর পর যখন তাঁহার সংজ্ঞালাভ হয়, তখন তিনি নিজেকে স্বর্গলোকে দেখিতে পান।

প্রেতলোকের পর মনুষ্যের যে লোক লাভ হয়, তাহাকে স্বর্গলোক বলে। সমুদয় ধর্ম্মে স্বর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ধর্ম্মপথে থাকিয়া পার্থিব জীবন কাটাইলেই স্বর্গভোগ করা যায়। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদিগের মতে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই, তিনি পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গ-সুখ দিয়া থাকেন; কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মের মতে মনুষ্য নিজেই সুকর্ম্মের ফলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যদিও সমুদয় ধর্ম্মে অনন্ত অক্ষরে স্বর্গীয় জীবনের বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু কোন বর্ণনাই লোকের মনে স্বর্গের সত্যতা সম্বন্ধে যথার্থ ভাব আনয়ন করিতে পারে নাই। ঐ সকল বর্ণনা অদ্ভুত এবং সময় সময় আমাদিগের নিকট কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া বোধ হয়। খ্রীষ্টানেরা, হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের স্বর্গের বর্ণনা,—যেমন স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মণিমুক্তা বিভূষিত বন-উপবন প্রভৃতি,—শ্রবণ করিয়া যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গের বর্ণনা,—যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত রাজপথ এবং মণিমাণিক্য জড়িত গৃহাদি,—শ্রবণ করিয়া তেমনি আশ্চর্য্যান্বিত হন। সমুদয় ধর্ম্মে স্বর্গের এইরূপ হাস্যস্কর অদ্ভুত বর্ণনা কেন করা হইয়াছে? এই সকল বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে বর্ণে বর্ণে আলোচনা করিতে গেলে হাস্যস্কর বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যখন আমরা স্বর্গের শোভা অবর্ণনীয় বলিয়া জানিব, তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, সমুদয় ধর্ম্ম সেই অবর্ণনীয় শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া কেন হাস্যস্পদ হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীদের জাঁকজমকের যেরূপ ধারণা আছে, সেই ধারণা অনুসারে তাহারা স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছে। কেহ বন উপবনের দ্বারা এবং কেহ বা অট্টালিকা ও রাজপথের দ্বারা স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু সমুন্নত আধ্যাত্মতত্ত্ববিদের ভিতরে, যাঁহারা সেই স্বর্গরাজত্ব দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই রাজত্ব স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা মণি-মাণিক্য গঠিত বলিয়া বর্ণনা করেন না। সূর্য্যাস্তের সময় যে সকল মনোহর বর্ণ দৃষ্ট হয়, সেই সকল বর্ণের দ্বারা তাঁহারা স্বর্গের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন।

স্বর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই ইহা বুঝিতে হইবে যে, স্বর্গ রূপক কথা নহে, ইহা সত্য। ইহা স্থান-

বিশেষ নহে, আমাদের সংবিতের (Consciousness) অবস্থাবিশেষ মাত্র। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে,—স্বর্গ কোথায়? তাহার উত্তরে বলিব যে, ইহা এই স্থানেই রহিয়াছে—এই মুহূর্ত্তেই আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে বায়ু গ্রহণ করিতেছি, সেই বায়ু যেমন আমাদের নিকট রহিয়াছে, স্বর্গও সেইরূপ আমাদের নিকট রহিয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে,"আলোক তোমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, যদি তোমরা তোমাদের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিতে পার, তাহা হইলে সেই আলোক দেখিতে পাইবে।" চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিতে হইলে আমাদের সংবিতকে উচ্চভূমিতে প্রেরণ করিতে হইবে ও সূক্ষ্মতম পদার্থ নির্ম্মিত পাত্রের উপরে আমাদের সংবিতকে একত্রীকৃত(focus)করিতে হইবে। যেমন প্রেত-শরীরে (astral body) সংবিতকে একত্রীকৃত করিলে,প্রেতলোক দেখিতে পাওয়া যায় ; সেইরূপ সংবিতকে যদি আরও একটু উর্দ্ধে লইয়া যাওয়া যায় অর্থাৎ যদি মানসশরীরে (mental body) আমাদের সংবিতকে একত্রীকৃত করা হয়, তাহা হইলে স্বর্গভূমির স্পন্দন সকল আমাদের মানসশরীর গ্রহণ করিবে এবং তখন আমরা স্থূলশরীর বিশিষ্ট হইয়াও স্বর্গের অতুল সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। এইরূপ উচ্চ অবস্থা পাইলে মনুষ্য আর নিম্নতম ভূমি অর্থাৎ এই পার্থিব লোকে ংবিতকে আনিতে চাহিবে না।

সাধারণ মনুষ্য মৃত্যুর পরে—মৃত্যুর ব্যবহিত পরে নহে, কিছুকাল পরে,—এই খের অবস্থায় উপনীত হয়। মৃত্যুর পর ঃখের সংহরণ (withdrawal) চলিতে থাকে। সমুদয় প্রেত-জীবন ধরিয়া এই সঙ্কোচন চলিয়া থাকে। পরে মনুষ্য যখন প্রেতভূমির প্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন, পার্থিবলোকে তাহার যেরূপ মৃত্যু হইয়াছিল, প্রেতলোকেও সেইরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে অর্থাৎ মনুষ্য তখন প্রেতলোকীয় শরীর ত্যাগ করিয়া থাকে এবং উচ্চতর এবং পরিপূর্ণ জীবন গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় মৃত্যুর পর,মনুষ্যকে কোন কষ্ট কিম্বা দুঃখ অনুসরণ করে না, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এই মৃত্যুর পরও, মনুষ্য কিছুকালের জন্য অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য এই অজ্ঞান অবস্থা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে।

এই স্বর্গীয় রাজত্বকে চিন্তার রাজত্বও বলা হয়। এই ভূমিতে মনুষ্য যাহা চিন্তা করে, সেই চিন্তা জীবন্ত ও বাস্তবরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। আমরা পার্থিব বস্তুসকলকে সত্য বলিয়া অবগত আছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহারা সত্য নহে; যাহা যথার্থ বস্তু, তাহা পার্থিব বস্তুর ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেই জন্য উচ্চভূমি হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা যে সকল বিষয়কে যথার্থ বলিতেছি, তাহা যথার্থ নহে। এই হেতু যখনই আমরা চিন্তার রাজত্ব বলি, তখনই পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ আমাদের মনে উদয় হয় যে,এই রাজত্ব নিশ্চয় অলীক, কিন্তু আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, মনুষ্য যখন তাহার ভৌতিক শরীর ত্যাগ করিয়া প্রেতলোকীয় সংবিৎ গ্রহণ করিয়া থাকে, তখন তাহার প্রথমেই এই অনুভূতি হয় যে, 'এই প্রেতরাজত্ব অতি সত্য।' তখন সে ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করে যে, 'আমি এই প্রথম বুঝিতে পারিতেছি যে, যথার্থ জীবন

কাহাকে বলে।' কিন্তু প্রেতজীবন ত্যাগ করিয়া সে যখন উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার পূর্ব্বের ন্যায় জীবনের সম্বন্ধে অনুভূতি হইয়া থাকে, কারণ প্রেতজীবন হইতে এই জীবন এমন বিস্তৃত এবং এমন বাস্তব যে,ইহার আর তুলনা চলে না। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও একটী জীবন আছে, যাহার নিকট এই জীবন সূর্য্যের কিরণের নিকট খদ্যোতজ্যোতিঃবৎ প্রতীয়মান হয়।

ভৌতিক রাজত্ব অপেক্ষা চিন্তার রাজত্ব যে সত্য,ইহা অনেকের নিকট হাস্যাস্কর বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হউক, মনুষ্যের এই জীবন অপেক্ষা যখন উচ্চতর জীবন লাভ হইবে, তখন সে সহস্র যুক্তির পরিবর্ত্তে এক মুহূর্ত্তে এই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিবে।

স্বর্লোকে বা স্বর্গভূমিতে ঐশ্বরিক মনের (Divine mind) অসীম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি মনুষ্য তাহার নির্দ্দিষ্ট ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ করিয়া থাকে, যদি সে তাহার আত্মদেবকে হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং অভিব্যক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে স্বর্গলোকের সমুদয় সৌন্দর্য্য তাহার আয়ত্তাধীন হইবে, কিন্তু আমাদের ভিতর কেহই সেইরূপ করেন নাই। কেহই সেইরূপ পূর্ণ নহেন। সকলেই সেই মহৎ পথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন মাত্র, সুতরাং কেহই স্বর্গলোকের সমুদয় সৌন্দর্য্য আয়ত্তাধীন করিতে পারেন না। মনুষ্য পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা নিজকে যেরূপ গঠিত করিয়াছে, সেই অনুসারে তাহার স্বর্গ সুখ ভোগ হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির স্বর্গ বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি স্বর্গলোকে বিভিন্ন প্রকার ধারণক্ষম পাত্র লইয়া উপস্থিত হয়,—কাহারও বৃহৎ এবং কাহারও বা ক্ষুদ্র পাত্র,—কিন্তু সকল ব্যক্তি তাহাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া সুখ লইয়া যায়। মনুষ্য তাহার কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্মের উপর তাহার স্বর্গজীবনের সময় এবং তারতম্য নির্ভর করিতেছে। মনুষ্য যে প্রকার উপযুক্ত হয়, সেই প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। সকলের ধারণার ক্ষমতা সমান নয়, সুতরাং ভোগের সময় ও বিষয়ের তারতম্য সকলের সমান হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মফল অনুসারে কেহ অল্পকাল, কেহ বা বহুকাল ধরিয়া সুখভোগ করে এবং কেহ বা এক প্রকারের এবং কেহ বা অপর প্রকারের সুখ ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং সকলের স্বর্গভোগ সমান নহে।

মনুষ্য পার্থিব জীবনে তাহার বাসনা ও কামনার দ্বারা প্রেতশরীর গঠন করিয়া থাকে এবং যতদিন প্রেতলোকে বাস করে, ততদিন প্রেতশরীরে অবস্থিতি করে। প্রেতশরীরের উপাদানের উপর তাহার প্রেতলোকের অবস্থিতির কাল নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু সে যখন মানসজগতে আসিয়া থাকে, তখন তাহার নরক (purgatory) বাসের কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়; তখন তাহার নীচ স্বভাব পুড়িয়া ক্ষয় হইয়া যায়। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যে সকল উচ্চতর এবং শুভচিন্তা ও মহৎ এবং স্বার্থশূন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল,এক্ষণে কেবল তাহাদেরই অস্তিত্ব থাকে। মনুষ্য যখন প্রেতভূমি ত্যাগ করে, তখন ইহারা আসিয়া তাহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে এক প্রকার আবরণ বা কোষ (shell) প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই আবরণের মধ্য দিয়া

মনুষ্য স্বর্গলোকের সূক্ষ্ম স্পন্দনসকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। যে সকল সুচিন্তা তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাদের ক্ষমতার প্রভাবে তিনি স্বর্গলোকের রত্নরাজি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। পার্থিব এবং প্রেতলোকে মনুষ্য যে সকল চিন্তা এবং উচ্চাশা সৃজন করিয়াছে, সেই সকল চিন্তা ও উচ্চাশার ক্ষমতার দ্বারা মনুষ্য স্বর্গসুখ আকর্ষণ করিয়া থাকে। মানসশরীর ঐ সকল সুখের ভাণ্ডার গৃহরূপে বিরাজ করিতে থাকে। মনুষ্যের ভালবাসার এবং ভক্তির উচ্চতম অংশ সকল এক্ষণে ফল উৎপন্ন করিতে থাকে; স্বার্থের যাহা কিছু লেশ মাত্র ছিল, তাহা কামনা বা প্রেতজগতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পৃথিবীতে দুই প্রকার ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার ভালবাসা আছে, তাহাকে যথার্থ ভালবাসা বলা যাইতে পারে না—ইহা স্বার্থ জড়িত। যাহারা সেইরূপ ভালবাসে, তাহারা ভালবাসার প্রতিদান চাহিয়া থাকে। তাহাদের মনে সদা সর্ব্বদা হিংসা ও সন্দেহ বিরাজ করে এইরূপ ভালবাসা সন্দেহ এবং কষ্টজড়িত হওয়াতে, কামনাময় ভূমিতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু আর এক প্রকারের ভালবাসা আছে, যাহার জন্য মনুষ্য, ভালবাসার-পাত্র বিনিময়ে তাহাকে ভালবাসিতেছে কিনা তাহা ফিরিয়া দেখে না। মনুষ্য এই স্বার্থশূন্য ভালবাসার জন্য, তাহার ভালবাসার পাত্রের পদতলে অকপটে কেবল ভালবাসাই উপহার দিতে থাকে। যে ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেই ভালবাসা, সে কার্য্যে কিরূপে প্রকাশ করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে থাকে। স্বার্থের লেশ মাত্র থাকে না বলিয়া এবং প্রতিদান পাইবার আশা না থাকাতে, এই ভালবাসাকে সসীম বা সান্ত বলা যায় না। এই ভালবাসা অসীম ও অনন্ত; ইহার বেগ প্রেতলৌকিক পদার্থের দ্বারা প্রকাশিত হয় না; প্রেতভূমি ইহাকে ধারণা করিতে পারে না। উচ্চতর ভূমির সূক্ষ্মতম পদার্থ ও বিস্তৃত স্থানের দ্বারাই ইহার উপযুক্ত প্রকাশ হইয়া থাকে। ভালবাসার ন্যায় ভগবানের প্রতি ভক্তিও দুই প্রকারের,—এক প্রকার স্বার্থ জড়িত, যেমন প্রার্থনার বিনিময়ে ভগবানের নিকট সুখ স্বচ্ছন্দাদির কামনা করা; এবং আর প্রকার হইতেছে ভগবদ্‌প্রেমে আত্মহারা হওয়া।

মনুষ্যের যখন ভগবদ্ভক্তির জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা হয়, তখন তাহার ব্যাকুলতা যেন তৃপ্ত হয় না, উত্তরোত্তর উহা আরও যেন বর্দ্ধিত হয়; যখন মনুষ্য নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে থাকে, তখন তাহার মনে এমন ভাবের উদয় হয় যে, তাহা এই পার্থিব ভূমিতে ব্যক্ত করা যায় না; উচ্চ ধরণের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে মনুষ্যের মনে যে ভাবের বিকাশ হয়, তাহা এই জগতে প্রকাশ করা যায় না। এইরূপ কেন হয়? পূর্ব্বোক্ত ব্যাকুলতার,ভালবাসার এবং ভাবের ক্ষমতা অসীম, কোন না কোন প্রকারে এবং কোন না কোন স্থানে উহাদের ফল ফলিবেই। এই পৃথিবীতে যেমন শক্তির অনপচয়ের (conservation of energy) নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, উচ্চতর ভূমিতেও ঐ নিয়ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পার্থিব ভূমি সঙ্কীর্ণ বলিয়া ঐ সকল শক্তি এখানে প্রকাশিত হয় না, উহারা সঞ্চিত থাকে মাত্র। মনুষ্য যখন তাহার সংবিতকে পার্থিব কিম্বা প্রেতভূমিতে একত্রীকৃত করিয়া থাকে,

তখন ঐ সকল শক্তির কার্য্য হয় না, কিন্তু মনুষ্য যখন মানসভূমিতে তাহার সংবিতকে একত্রীকৃত করিয়া থাকে, তখন ঐ সকল শক্তির কার্য্য হইয়া থাকে। তখন এইরূপ ন্যায় বিচার হয় যে, কিছুই এড়াইয়া যায় না। আমরা পার্থিব জগতে যাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়াছিলাম, তাহার ফল এখানে ফলিতে দেখা যায়।

স্বর্গলোকের ধারণা করিতে হইলে আমাদের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, প্রত্যেক মনুষ্য কর্ম্মফলে তাহার নিজ নিজ স্বর্গ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই স্বর্গীয় ঐশ্বরিক ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য ও মহিমার বিকাশ যতদূর কল্পনা করা যাইতে পারে, ততদূর বিকাশ হইয়াছে। মনুষ্য ঠিক যেন নিজ নিজ গবাক্ষ প্রস্তুত করিতেছে। উহার ভিতর দিয়া স্বর্গের অসীম সৌন্দর্য্য ও মহিমার যতটুকু অংশ দেখা সম্ভবপর হয়, মনুষ্য ততটুকু অংশ দেখিতে পায়। তাহার চিন্তা সমূহের প্রত্যেক আকৃতি, একটী গবাক্ষ মাত্র। ইহাদের দ্বারাই বহিঃস্থ শক্তি সকলের প্রতিসংবেদন (response) পাওয়া যায়। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যদি কেবল মাত্র ভৌতিক বিষয় লইয়াই সময় কাটাইয়া থাকে, তাহা হইলে উচ্চতর ভূমির সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিবার জন্য সে অতি অল্প সংখ্যক গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছে। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যদি আর কিছু না করিয়া কেবল একবার মাত্র পবিত্র ও স্বার্থশূন্য ভাবনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার ফলে স্বর্গীয় লোকে কেবল একটী মাত্র গবাক্ষ গঠিত হইবে। অসভ্য, আদিম ও বর্ব্বর জাতি ব্যতীত, সকল মনুষ্যই এই সুখের জীবনের কিছু না কিছু অনুভব করিতে পারিবে। মৃত্যুর পর কেহ নরকে যাইবে কিম্বা কেহ স্বর্গে যাইবে না বলিয়া এইরূপ বলিলে সঙ্গত হইবে যে, সকল মনুষ্যকেই উভয় প্রকার অবস্থা ভোগ করিতে হইবে—তবে ভোগের তারতম্য হইবে।

আমাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ মনুষ্যের আত্মার (soul) অতি অল্পই পুষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য তাহার সংবিতের ভৌতিক পাত্রকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু সে প্রেতশরীরের কার্য্যের স্মৃতি সকল সময় স্থূল মস্তিষ্কে আনয়ন করিতে না পারিলেও, সে ব্যক্তি কতক পরিমাণে তাহার প্রেতশরীরে কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু তাহার মানসশরীরকে সংবিত বহনের আধার বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহার পার্থিব ও প্রেত-শরীর দুইটীর মতন, মনুষ্য এই শরীরে স্বতন্ত্র কার্য্য করিতে পারে না।

মানসভূমিতে বা স্বর্গলোকে আসিয়া যিনি পূর্ণ ক্ষমতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তখন আর মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। আমরা স্থূলশরীরকে এক্ষণে যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, তিনি তাঁহার মানসশরীরকে তখন সেইরূপ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তখন তিনি পূর্ণ সংবিতের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির ঐরূপ হয় না, সংবিতের বাধ হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি স্বর্গলোকে জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য যেন এক একটী গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল গবাক্ষের ভিতর দিয়া যতটুকু দেখা সম্ভব, তিনি স্বর্গলোকের ততটুকু দেখিতে পান। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি তৎসদৃশ স্বর্গ প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রত্যেক

ব্যক্তির কি প্রকারের স্বর্গ হয়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের দুইটী বিষয়ের আলোচনা করা উচিত; প্রথমতঃ মানসভূমির সহিত তাহার কি সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয়ত; তাহার চিন্তার দ্বারা ঐ ভূমির পদার্থ সমূহের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার (aspiration) দ্বারা ঐ ভূমিতে কিরূপ শক্তি সকল সমুদ্ভূত হয়, তাহা বুঝা উচিত। মনুষ্য কি প্রকারে চিন্তার আকৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভূমি চিন্তার আবাসস্থল। এই ভূমিতে মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে জীবন্ত শক্তি সমূহ অবস্থান করে,—ইহারাই এই ভূমির স্বর্গীয় অধিবাসী; ইহাদের ভিতর কতকগুলি মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার (aspiration) দ্বারা স্পন্দিত হইয়া থাকে। এই ভূমিতে মনুষ্য যে সকল চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা পার্থিব ধরণের চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা মাত্র। কিন্তু ইহা স্বতঃই সকলের মনে উদয় হইতে পারে যে, যখন মনুষ্য এইরূপ তেজ ও জীবনী-শক্তি পূর্ণ ক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখন পার্থিব ধরণের পরিবর্ত্তে, স্বর্গীয় ধরণের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না; কারণ, অপর দুইটী শরীরের ন্যায় তাহার মানসশরীর তখন একেবারে গঠিত হয় নাই এবং ইহা তখন তাহার নিজের বশেও আইসে নাই। বহু জন্ম ধরিয়া মনুষ্য এইরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, সে কেবল পার্থিব ও প্রেত-শরীরদ্বয়ের সাহায্যেই সংস্কার ও কার্য্য করিবার উদ্দীপনা পাইয়া থাকে। মনুষ্য এ পর্য্যন্ত এমন কোন কার্য্য করে নাই, যাহার দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে তাহার মানসশরীরের দ্বারা মানসিক স্পন্দন সকল গ্রহণ করিতে পারে; সুতরাং যখন মনুষ্য স্বর্গ লোকে যায়, তখন হঠাৎ কোন মানসিক স্পন্দনকে গ্রহণ করিতে কিম্বা উহার দ্বারা স্পন্দিত হইতে পারে না। এই হেতু মনুষ্য তখন কোন নূতন ধরণের চিন্তা করিতে পারে না; সে এই নূতন রাজত্ব দেখিবার জন্য যেরূপ গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া যে সকল চিন্তা আইসে, সেইরূপ চিন্তা করিয়া থাকে।

মানসভূমিতে অর্থাৎ স্বর্গলোকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকল মনুষ্যের উপর কিরূপ প্রভাব স্থাপন করে, তাহা দেখা যাউক। উদাহরণের স্বরূপ ধরা যাউক যে, স্বর্গে মনুষ্যের যে সকল গবাক্ষ আছে, তাহার মধ্যে একটী গবাক্ষ হইতেছে সঙ্গীতের। সঙ্গীতের শক্তি অতি আশ্চর্য্য; ইহা মনুষ্যকে সময় বিশেষের জন্য নূতন রাজত্বে লইয়া গিয়া থাকে। যাঁহারা সঙ্গীতের রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, সঙ্গীতের কি অদ্ভুত শক্তি! যে মনুষ্যের প্রাণে সঙ্গীতের কোন উচ্ছ্বাস উঠে না, তাহার প্রাণে সঙ্গীতের কোন গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকে না; কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গীতের গবাক্ষ উন্মুক্ত আছে, সে ব্যক্তি তিন প্রকার বিভিন্ন সংস্কার পাইবে,—তাহার গবাক্ষে যে প্রকার কাঁচ সংলগ্ন আছে, সেই কাঁচের দ্বারা ঐ তিন প্রকার সংস্কারের পরিনমন বা রূপান্তর হইবে। সুতরাং এই কাঁচ তাহার দৃষ্টিশক্তিকে পরিচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কাঁচটী যদি রঙ্গিন হয়, তাহা হইলে কতকগুলি আলোকরশ্মি আসিতে পারিবে এবং কতক গুলি পারিবে না। কাঁচটী যদি মন্দ উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে

তাহাদিগকে বিকৃত করিবে। এক্ষণে ধরা যাউক যে, ঐ ব্যক্তির গবাক্ষ উত্তম, তাহা হইলে ইহার ভিতর দিয়া সে ব্যক্তি কি প্রকার সংস্কার গ্রহণ করিবে ?

প্রথমতঃ, ঐ উচ্চভূমিতে যে সকল শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের যে গতি রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি তাহাদের তালযুক্ত সঙ্গীত শুনিতে পাইবে ; কারণ, এই সকল উচ্চ ভূমিতে যে কোন প্রকার সঞ্চলন কিম্বা যে কোন প্রকার কার্য্য হয়, তাহারা সুন্দর শব্দ ও বর্ণের সমতা ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের নিজের কিম্বা অপরের চিন্তা সকল এই প্রকার বর্ণনাতীত সুন্দর সঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহারা এত সুমিষ্ট, যেন সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার হইতেছে। স্বর্গীয় জীবনের এই প্রকার সুমিষ্ট ও সুস্বরযুক্ত প্রকাশ অবগত হইয়া সেই ব্যক্তির অত্যন্ত আনন্দ লাভ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ভূমিতে এক প্রকার সত্তা (enteties) বাস করে,—যাহারা কেবল সঙ্গীতেরই চর্চ্চা করিয়া থাকে এবং যাহারা অন্য উপায় অপেক্ষা সঙ্গীতের দ্বারাই নিজেদের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়,—তাহাদিগকে হিন্দুশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সঙ্গীত ভালবাসে, সে স্বর্গলোকে গন্ধর্ব্বদের মনযোগ আকর্ষণ করিবে এবং তাহাদের সংসর্গে আসিয়া আনন্দের সহিত স্বর্গীয় সঙ্গীতের আলোচনা করিতে থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, স্বর্গীয় রাজত্বে যে সকল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সঙ্গীত তিনি শ্রবণ করিতে পাইবেন। তাহার পূর্ব্বে যে সকল সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি প্রস্থান করিয়াছেন,—যেমন তানসেন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি ব্যক্তি,—সকলেই সেখানে বর্ত্তমান আছেন, কেহ মৃত নহে, সকলেই উৎসাহ পরিপূর্ণ এবং সকলেই অপার্থিব সঙ্গীতের ধারা বর্ষণ করিতেছেন। ইঁহারা প্রত্যেকে যেন অদ্ভুত স্বর্গীয় সঙ্গীতের এক একটী উৎস। পার্থিব লোকের সঙ্গীতজ্ঞেরা যে সকল আকস্মিক প্রত্যাবভাস (inspirations) পাইয়া থাকেন, তাহারা বাস্তবিক ঐ সকল স্বর্গীয় সঙ্গীতের এক একটী ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। সঙ্গীতে যাহারা সুপণ্ডিত, তাহারা বলিয়া থাকেন যে, বীণাতন্ত্রীর সামান্য মাত্র একটী ধ্বনি হইতে তাঁহারা সময় সময় কত আশ্চর্য্য সঙ্গীত উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে হইলে অনেক পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। এই প্রকারে ইহলোকের সঙ্গীতের সহিত স্বর্গীয় সঙ্গীতের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেখানকার একটী সামান্য সুরকে এখানে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির গবাক্ষটী কলা (art) বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারও উক্ত প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ হইবে—তাহারও উক্ত তিন প্রকার আনন্দ লাভ হইবে। কারণ, এই ভূমির ধারাই এই প্রকার যে, এখানে যে কিছু কার্য্য হয়, তাহা শব্দ ও বর্ণের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীরা অবগত আছেন যে, দেবতাদেরও এক প্রকার ভাষা আছে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল বিশিষ্ট বর্ণ মাত্র ; সুন্দর বর্ণের ছটার দ্বারা তাহারা পরস্পরে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যে সকল চিত্রকর ছিলেন, তাহা-

দিগকেও আমরা এখানে দেখিতে পাইব। তাহাদিগকে আমরা আর তুলি কিম্বা কাগজের সাহায্যে চিত্র করিতে দেখিতে পাইব না, তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ সহজ উপায়ে অঙ্কন করিতে দেখিতে পাইব—অর্থাৎ চিন্তার প্রভাবে মানসিক পদার্থ সকল গঠিত করিতে দেখিতে পাইব। সকল চিত্রকরই অবগত আছেন যে,তাহার চিত্র অতি উত্তম হইলেও তাহার মনের মতন হয় না; কিন্তু এ ভূমিতে চিন্তা করিতে না করিতে সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট, জলন্ত ও জীবন্ত চিত্র চিত্রিত হইয়া যায়। এই ভূমিতে 'হতাশ' হওয়া কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানে না। যত প্রকার চিন্তার কার্য্য হইতে পারে, সকলেরই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে আমাদের ক্ষুদ্র মন ঐ সকল ধারণা করিতে পারে না। যখন কোন সংগীত হইয়া থাকে, তখন উহা সুন্দর বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করিয়া মানসভূমিতে বিচরণ করে। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাগ রাগিণীর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এই সকল মূর্ত্তিকে স্বর্গলোকবাসী সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি দেখিতে পান।

মনুষ্য যাহাদিগকে ভালবাসে কিম্বা যাহাদিগের জন্য তাহার ভক্তি বা শ্রদ্ধা আছে, মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের কিরূপ সম্পর্ক থাকে, তাহা দেখা যাউক। ইহা স্বতঃই সকলের মনে উদয় হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি স্বর্গে রহিয়াছে, সে তাহার ভালবাসার পাত্রদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিবে কি না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনেরা যে তথায় থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ লোকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে, স্বর্গসুখভোগ করিতে করিতে, আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা কি ইহলোকে আমাদিগকে দেখিতে পায়? কিম্বা তাহারা কি আমাদের সহিত মিলনের জন্য আশাপথ চাহিয়া থাকে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, "না"। মৃত ব্যক্তিরা যে সকল প্রিয়জনদিগকে দুঃখে ও কষ্টে কিম্বা পাপ কার্য্যে রত দেখিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে পরলোক হইতে দেখিয়া, তাঁহারা কেমন করিয়া সুখী হইতে পারিবেন? কেহ দুঃখ লইয়া স্বর্গভূমিতে থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি আমরা বলি যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়জনদিগকে দেখেন না, বরঞ্চ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন,—তাহা হইলেও তাঁহাদের কষ্টের লাঘব হইবে না, কারণ অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহাদিগকে সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান থাকিতে হইবে। সুতরাং ঐ সময় তাঁহাদিগকে দুঃখে ও উৎকণ্ঠায় কাটাইতে হইবে এবং হয়তো তাঁহার বন্ধুরা যখন স্বর্গলোকে পৌছাইবে, তখন তাহাদের এমন পরিবর্ত্তন হইবে যে, তাহাদের জন্য তখন আর তাঁহাদের সহানুভূতি থাকিবে না।

কিন্তু প্রকৃতি আমাদিগের জন্য এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে,আমাদিগকে ঐ দুইটী বিষয়ের জন্য কষ্টে পড়িতে হয় না। মনুষ্য যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসে, পরলোকে গিয়াও তাহাদিগকে হারাইয়া ফেলে না; প্রিয়তমেরা তখনও তাঁহাদিগের নিকটে থাকে, তাহাদিগের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তথায় তাহারা কিরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে অন্তরের

সহিত ভালবাসি, তখন আমরা তাহার একটী মানসচ্ছবি (Mental image) গঠিত করিয়া থাকি; তখন তিনি আমাদের মানসক্ষেত্রে বিরাজ করিতে থাকেন। আমরা যখন স্বর্গলোকে যাই,তখন আমরা আমাদের সহিত ঐ মানসচ্ছবি লইয়া যাই, কারণ, স্বর্গলোকের সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারাই মানসচ্ছবি গঠিত হইয়া থাকে, ইহা ঐ রাজত্বেরই অন্তর্গত। কিন্তু যে ভালবাসার দ্বারা ঐ ছবি গঠিত হইয়াছে, তাহা একটী অদ্ভুত শক্তি,—এই শক্তি এত বলবতী যে,ইহা ভালবাসার পাত্রের অন্তরে গিয়া আঘাত করে। ইহার ফলে তাহার আত্মা স্পন্দিত হইয়া উঠে এবং আমরা যে মানসচ্ছবি গঠন করিয়াছি, সেই মানসচ্ছবিকে উহা অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে এবং এই প্রকারেই আমাদের ভালবাসার পাত্র স্বর্গলোকে আমাদের নিকট বর্ত্তমান থাকে। আমরা মনুষ্যের আত্মাকে ভালবাসি, তাহার শরীরকে ভালবাসি না, ইহা আমাদের স্মরণ করা উচিত; এবং স্বর্গলোকে প্রিয়তমের আত্মাই (Soul) আমাদের সহিত অবস্থিতি করে। অনেকে বলিতে পারেন যে, প্রিয়তম ব্যক্তি যদি মৃত হয়, তাহা হইলে তাহার আত্মা আমাদের সহিত স্বর্গলোকে থাকিতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি জীবিত হয়, তাহা হইলে এক ব্যক্তি কিরূপে একই সময়ে দুই স্থানে থাকিবে? ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এক ব্যক্তি একই সময়ে দুই অথবা বহু স্থানে বিরাজ করিতে পারে এবং সে'জীবিত'থাকুক অথবা'মৃত'হউক,তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আত্মা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক, তাহা হইলে আমরা এ বিষয় বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারিব।

আমাদের আত্মা উচ্চতম ভূমিতে অবস্থিতি করিয়া থাকে; নিম্নতর ভূমিসকলে ইহার যে সকল বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা ইহা মহান্ ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নিম্নভূমিতে আত্মার যে সকল বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাদের দ্বারা আত্মাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। একটী অপরটী অপেক্ষা মানে (dimension) অধিক বলিয়া, যেমন অসংখ্য সরল রেখার দ্বারা একটী বর্গাকৃতিকে (Square) ব্যক্ত করা যায় না, কিম্বা অসংখ্য বর্গাকৃতির দ্বারা একটী ঘনাকৃতিকে (Cube) ব্যক্ত করা যায় না, সেইরূপ আত্মার অসংখ্য বিকাশ দ্বারা আত্মাকে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না। ভূলোকীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইবে বলিয়া আত্মা নিজের অতি অল্প অংশ স্থূলশরীরে ব্যক্ত করিয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে,এক সময়ে আত্মা একটী স্থূলশরীর গ্রহণ করিবে; আত্মা যদি সহস্র স্থূলশরীর ধারণ করিতে পারিত, তাহা হইলেও উহারা মিলিত হইয়া পূর্ণ ভাবে আত্মাকে ব্যক্ত করিতে পারিত না। মনুষ্যের একটী স্থূলশরীর থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তাহার কোন বন্ধু তাহাকে এত ভালবাসিয়া থাকে যে, তাহার জন্য মানসচ্ছবি গঠিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আত্মা এই উচ্চতর মানসভূমিতে উক্ত চিন্তামূর্ত্তিকে (thought form) অনুপ্রাণিত করিবে। কারণ এই ভূমি উচ্চতর বলিয়া, তাহার আত্মা বিশেষরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা পার্থিব ভূমিতে নিজেকে একটী স্থূলশরীরের দ্বারা অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু উচ্চতম ভূমিতে আমাদের সসীমত্বের হ্রাস হওয়াতে, আমরা বহুপ্রকারে নিজেকে

প্রকাশ করিতে পারি। সুতরাং আমরা পার্থিব লোকে একটী স্থূল শরীর ভিন্ন দুইটী স্থূল শরীর ধারণ করিতে পারি না, কিন্তু মানস-লোকে আমরা আমাদের আকৃতির অনুরূপ অসংখ্য চিন্তার আকৃতিকে অনুপ্রাণিত করিতে পারি।

একই সময়ে কি প্রকারে আত্মার দুইটী বিকাশে অর্থাৎ শরীরে বা মূর্ত্তিতে আমরা সংবিত্তের চালনা করিতে পারি, তাহা বুঝা যদি কঠিন ব্যাপার হয়, তাহা হইলে একটী সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। সকলেই অবগত আছেন যে, আমরা যখন কাষ্ঠাসনে(Chair) বসিতে যাই, তখন একই সময়ে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান হইয়া থাকে। আমরা কাষ্ঠাসন স্পর্শ করি, আমাদের পদদ্বয় ভূমিতে রক্ষিত হয়, আমরা কাষ্ঠাসনের হস্ত স্পর্শ করি, এবং হয়তো সেই সময়ে একখানি পুস্তকও ধারণ করি; কিন্তু তত্রাচ আমাদের মস্তিষ্ক এই বিভিন্ন প্রকার ধারণা করিতে কষ্ট বোধ করে না। যখন আমাদের সংবিৎবাহী সামান্য ভৌতিক মস্তিষ্ক একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্যের ধারণা করিতে পারে, তখন আমাদের আত্মা—যাহা ভৌতিক সংবিৎ হইতে কত মহান, তাহা যে একই সময়ে দুই তিন ভূমিতে কার্য্য করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একই মনুষ্য যেমন বিভিন্ন ঘাত বা সংস্পর্শ (Contacts) অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ একই মনুষ্য বিভিন্ন চিন্তার আকৃতিতে অবস্থিতি করিতে থাকে এবং সেই সমুদয় আকৃতিতে সে বাস্তব এবং জীবন্তরূপে বিরাজ করিতে পারে। স্থূলভূমিতে মনুষ্য নিজেকে যে পরিমাণে প্রকাশ করিতে পারে, এই মানস ভূমিতে মনুষ্য তাহা অপেক্ষা নিজেকে সহস্র গুণ অধিক প্রকাশ করিতে থাকে। অসাধারণ যোগীরা যে কায়ব্যূহ রচনা করিয়া অর্থাৎ বহু স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিতে পারেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপ মানসচ্ছবি গঠন করিলে আত্মীয়-স্বজনের ক্রমবিকাশের কোন ক্ষতি হয় কি না? কোন ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়া থাকে। যদি তাহার স্থূল শরীর থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পার্থিব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে; কিন্তু তুমি ইহার জন্য যে মানসিক মূর্ত্তি গঠিত করিয়াছ, তাহার সাহায্যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তি অতি শীঘ্র শীঘ্র ভালবাসার গুণ সকল পুষ্ট করিতে থাকে। সুতরাং তোমার ভালবাসা তাহার অনেক উপকার করিতে থাকে। যদি সৌভাগ্য ক্রমে আত্মার অনেক গুলি আকৃতি গঠন করা হয়, তাহা হইলে আত্মা সকল গুলিতে বিরাজ করিতে পারে। যদি আমাদের ভিতর ভালবাসার গুণ সকল থাকে, তাহা হইলে আমরা ভালবাসার দ্বারা অনেক ব্যক্তিকে আকর্ষিত করিতে পারিব। যে ব্যক্তিকে অনেক মনুষ্য ভালবাসে, তাহার বিভিন্ন অংশ একই সময় বিভিন্ন স্বর্গে থাকিতে পারিবে, সুতরাং সে ব্যক্তি অতি শীঘ্র অভিব্যক্ত হইতে পারিবে। সুতরাং মনুষ্য তখন যে কেবল মৃত অথবা জীবিত বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে ভালবাসা পাইবে, তাহা নহে, তাহার ভালবাসার গুণ সকলও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

স্বতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে যে, মনুষ্য যে এতকাল স্বর্গ সুখ

ভোগ করে, তাহাতে তাহার উন্নত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা? স্বর্গে থাকিয়াও মনুষ্য তিন প্রকারে নিজের উন্নতি সাধন করিতে পারে। প্রথমতঃ, কতকগুলি সৎগুণের দ্বারা, মনুষ্য স্বর্গে কতকগুলি গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া থাকে। বহুকাল ধরিয়া ঐ সকল সৎগুণের চালনার দ্বারা মনুষ্য ঐ সকল গুণকে পুষ্ট করিয়া থাকে; সুতরাং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার জন্য যখন সে ইহলোকে অবরোহণ করে, তখন ঐ সকল সৎগুণের সমষ্টিকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। যে মনুষ্য সহস্র বৎসর ধরিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে থাকে, সে ব্যক্তি কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা ভাল রকমই অবগত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, তাহার গবাক্ষের ভিতর দিয়া যদি সে এমন আকাঙ্ক্ষার (aspirations) প্রবাহ পাঠাইতে পারে, যাহাতে সে কোন উচ্চধরণের সত্তার সংসর্গে আসিতে পারে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে সে ব্যক্তি অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিবে। যদি সে ব্যক্তি সঙ্গীতজ্ঞ হন, তাহা হইলে স্বর্গীয় সংগীত শিক্ষা করিবে, যদি সে কলা বিদ্যা ভালবাসে, তাহা হইলে সে স্বর্গীয় কলা সমূহ শিখিবে। এই প্রকারে মনুষ্য স্বর্গলোকে অনেক বিষয় শিখিয়া থাকে, সুতরাং যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণের সমষ্টি সঙ্গে লইয়া আসিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, মনুষ্য যে সকল ব্যক্তির মানসচ্ছবি গঠিত করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তি যদি উন্নত পুরুষ হন, তাহা হইলে ঐ সকল মূর্ত্তির নিকট মনুষ্য অনেক বিষয় শিখিয়া থাকে। মনুষ্য যদি কোন মহাপুরুষের মানসমূর্ত্তি গঠিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বর্গলোকে ঐ মূর্ত্তির নিকট হইতে অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় শিখিবে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে।

স্বর্গীয় জীবনের পর মনুষ্য আরও উন্নত জীবন গ্রহণ করিয়া থাকে। সে যেমন পূর্ব্বে স্থূল দেহ ও প্রেতদেহ ত্যাগ করিয়াছে, এখনও সেইরূপ স্বর্গীয়দেহত্যাগ করে। এই সুন্দর স্বর্গীয় জীবনও শেষ হইয়া থাকে। মনুষ্য তখন কারণ শরীর গ্রহণ করে। এই নূতন জীবনে মনুষ্যের জন্য কোন গবাক্ষের প্রয়োজন হয় না, কারণ ইহাই মনুষ্যের যথার্থ আবাসগৃহ।

এই উচ্চভূমিতে অতি অল্প ব্যক্তিরই সংবিৎ বজায় থাকে; মনুষ্য সেখানে উপনীত হইলে স্বপ্নাবস্থা পাইয়া থাকে। পরিপুষ্ট হয় না বলিয়া, মনুষ্য সেখানে সংজ্ঞা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য প্রত্যেক বার যখন এই ভূমিতে উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য যত পুষ্ট হয়, তত তাহার কারণজীবন অধিক কাল স্থায়ী হয়। মনুষ্য যত উন্নত হয়, তত সে পরের উপকার করিতে থাকে। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য তখন সে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। এই উচ্চ জীবন সকলেই লাভ করিবে,—ইহাই পরাবিদ্যার বার্ত্তা। এই জীবন আমাদের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা পাইতে হইলে আমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইবে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

রাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্ররত্ন

রঙ্গপুরের নৈয়ায়িক ও দার্শনিক পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্ররত্ন মহাশয় জগতে আর নাই। বিগত ২৬শে ভাদ্র, সায়ংকালে পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এমন কিছু উৎকট রোগ হয় নাই, যাহাতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ ইঁহার দেহপাতের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ঐ দিবস দেহত্যাগের ১৫ মিনিট পূর্ব্বেও তিনি সুস্থ শরীরে ছিলেন ও অন্যান্য দিনের ন্যায় যথারীতি ছাত্রদিগের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন; দেহত্যাগের সময়েও তিনি কথা কহিতে কহিতে—ভগবানের নাম করিতে করিতে, হাস্যমুখে এই নশ্বর জীবলীলার উদ্‌যাপন করিয়াছেন। জগতে শাস্ত্ররত্নের বিধবাপত্নী, একটী অদত্তা কন্যা, ২টী দত্তা কন্যা রহিয়াছেন। তাঁহার ক্রমান্বয়ে ৩টী পুত্র জন্মিয়াছিল; ঐ বিধবা পত্নীর অবলম্বন পুত্রত্রয়ও ক্রমে মর্ত্ত্যভূমি হইতে অপসৃত হইয়াছে।

শাস্ত্ররত্নের তুল্য প্রতিভাশালী মনুষ্য, রঙ্গপুরে কেন অন্যত্রও কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার বুদ্ধি সর্ব্বতোমুখিনী ছিল। শাস্ত্ররত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশ একটী রত্নহারা হইল। দর্শন-শাস্ত্রে উত্তর দিগ্‌ আলোকিত করিয়া শাস্ত্ররত্ন অবস্থিত ছিলেন। শাস্ত্ররত্নের তিরোধানে আজ দর্শনশাস্ত্রে উত্তর দিগ্‌ গাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন!

রঙ্গপুরের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে, পণ্ডিত সমাজে নিত্যপরিচিত রুদ্রমঙ্গলও দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই; শাস্ত্ররত্নও অল্পদিন রঙ্গপুরে পাণ্ডিত্যের লীলা প্রচার করিয়া দশ বৎসর কাল বারাণসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; আবার বঙ্গদেশ পরিত্যাগের ন্যায়, পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজপ্রতিম ঐশ্বর্য্যশালী, পণ্ডিত প্রবর, ফতেপুরের ভূম্যধিকারী প্রভৃতি অনেক গণমান্য ব্যক্তির গুরুদেব, ইটাকুমারী নিবাসী ৺ হরকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উমাসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা ছিল। রাজসাহী "নৌছলা" নিবাসী ৺ ইন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী মহাশয়কে গৃহজামাতা করিয়া হরকান্ত বিদ্যাভূষণ তাঁহার হস্তে ঐ কন্যা দান করেন; সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী স্থির সম্পত্তি, একখানি বাড়ী, অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি প্রদান করেন। এই উমাসুন্দরীর গর্ভে ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়।

১২৫৬ সালের শ্রাবণ মাসের জন্মাষ্টমীর দিবস মধ্যরাত্রে শাস্ত্ররত্ন ভূমিষ্ঠ হয়েন। সে সময়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রভূত ঐশ্বর্য্য ছিল। তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের উৎসবেই প্রায় অধিকাংশ দিন অতিবাহিত হইত। তিনি পরিবারস্থ আত্মীয়স্বগণে পরিবৃত হইয়া আহার করা ভাল মনে করিতেন; সেই জন্য পল্লীস্থ ভদ্রলোকদিগকে একটা না একটা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন। আজ জন্মাষ্টমীর তিথি; তাঁহার বাটীতে বিশেষ ধুমধামের আয়োজন। ৺ রঘুনাথ বিগ্রহের পূজা ও অভিষেক প্রভৃতি কার্য্যে ঋত্বিকগণ ব্যাপৃত। বাটীস্থ, পল্লীস্থ সকলেই ভগবানের জন্মযাত্রা উপলক্ষে উপবাস করিয়া আছেন, ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া সেই

উপবাসে ক্লিষ্ট হয়েন নাই, আবার তাহার উপর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতার ১ম সন্তান হইবে বলিয়া সকলের মুখে আনন্দের রেখা উদ্ভাষিত হইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় বিনাক্লেশে উমাসুন্দরী একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন; বাড়ীতে আনন্দের কোলাহল উত্থিত হইল। মুক্তহস্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় অকাতরে মাননীয় ব্রাহ্মণ ও দীনদুঃখীদের অন্নবস্ত্র প্রভৃতি অর্থদান করিলেন। ক্রমে রাজেন্দ্রনারায়ণের জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় জীবিত থাকিতে থাকিতে সেইরূপ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে সুখ চিরদিন থাকে না; বিদ্যাভূষণ মহাশয় মর্ত্তাভূমি পরিত্যাগ করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রদত্ত যে স্থির সম্পত্তি ইন্দ্রনারায়ণের হস্তে ছিল, তাহা দ্বারা সেকালে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিষয় কর্ম্ম করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারিত, সুতরাং বাল্যকালে রাজেন্দ্রনারায়ণের কোন ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইটাকুমারীর প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, মধ্যযুগের এ প্রদেশের সমস্ত অধ্যাপকেরই ব্যাকরণের অধ্যাপক, কাকিনাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের শিক্ষক ৺ হর গোবিন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের দ্বারা পঞ্চমবর্ষ বয়সের সময় রাজেন্দ্রনারায়ণের বিদ্যারম্ভ হইল। খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়েরও সেই দিন বিদ্যারম্ভের দিন। তর্করত্ন মহাশয় সে সময়ে অত্যন্ত দুর্ম্মেধ ও উচ্চারণশক্তি শূন্য ছিলেন। শাস্ত্ররত্ন স্বাভাবিক প্রতিভাবলে অতি অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয় করিয়া লইলেন। পাঠশালায় এক দিন একটী অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালক শাস্ত্ররত্নকে কোন একটী শব্দের বর্ণবিন্যাস বলিয়া দিয়াছিল, শাস্ত্ররত্ন তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে উত্তর করিলেন, "তোমার বলিয়া দিতে হইবে না, অপেক্ষা কর, ২।৪ দিন পরে তোমাকেই আমি বর্ণবিন্যাস শিখাইব।" বস্তুতঃ তাহাই হইল, ২।৪ দিন পরে শাস্ত্ররত্ন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। শাস্ত্ররত্নের বাড়ীতে একখানি শ্রীরামপুরের মুদ্রিত কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড ছিল, সেই উত্তরাকাণ্ডই তাঁহার অক্ষর পরিচয়ের মূল। বাল্যকালে ও যৌবনকালে শাস্ত্ররত্ন প্রভূত বলশালী ছিলেন। বাল্যকালে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ অভিনয় করা তাঁহার নিত্যক্রীড়া ছিল। এই খেলা উপলক্ষে সমবয়স্ক বালকদিগকে প্রহার করিতেন। এই সময়ে নিজে কুস্তি করিতেন এবং অপরকেও কুস্তি শিক্ষা দিতেন। তাৎকালিক শিক্ষার উপযোগী শিশুবোধে তাঁহার বিদ্যা হইল; মুখে মুখে বিঘাকালি প্রভৃতি কষিতে পারিতেন; সমস্ত 'নামতা' তাঁহার মুখস্থ ছিল; হস্তাক্ষর তত উৎকৃষ্ট না হইলেও একরূপ চলনসই হইল। সেই সময়ে যে ছাঁচের অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই অক্ষরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ষষ্ঠ কি সপ্তম বর্ষ সময়ে সেই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একটী শুভদিনে তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত শাস্ত্ররত্ন মহাশয়কে কলাপ ব্যাকরণের পাঠ আরম্ভ করাইলেন। পূর্ব্ববৎ দুর্ম্মেধ তর্করত্ন 'দেবদেবং' করিতে থাকিলেন, প্রতিভাশালী শাস্ত্ররত্ন মহাশয় অল্প দিনের মধ্যে সন্ধি, শব্দ শেষ করিয়া 'কারক' আরম্ভ করিলেন।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় স্থানান্তরিত হইলেন বলিয়া এই বালকদ্বয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকগণ কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইলেন। অভিভাবকেরা ইঁহাদের ইংরাজী শিক্ষা দিবার যুক্তি করিতেছিলেন ; দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল না। যদি শাস্ত্ররত্নের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেন, তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় ইঁহারও খ্যাতি প্রতিপত্তি জগদ্ব্যাপ্ত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইটাকুমারীর উত্তরপাড়ায় শাস্ত্ররত্ন ও তর্করত্নের বাস, দক্ষিণ পাড়ায় ৺রূপেশ্বর ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রে ও অন্যান্য কার্য্যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিছুকালের জন্য শাস্ত্ররত্ন ও তর্করত্ন অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতেন। 'আধ মাইল রাস্তা মুখ বুজিয়া যাওয়া কষ্টকর, এই জন্য শাস্ত্ররত্ন মহাশয় এক নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন ;—তিনি তর্করত্নকে বলিলেন ; "তুমি পার বা না পার, আমি কিন্তু মহাভারত ও রামায়ণের গল্প লইয়া মুখে মুখে পয়ার ত্রিপদীতে বাঙ্গালা কবিতা করিতে করিতে যাইব।" যেপর্য্যন্ত রূপেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে গতায়াত করিতেন, সে পর্য্যন্ত তিনি তাহাই করিতেন। ইটাকুমারীর অনতিদূরে 'ঝাওনা' নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ; সেই গ্রামে সম্পত্তিশালী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নামে একটী অধ্যাপক অনেকগুলি ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়া প্রতিদিন চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার প্রদান করিয়া ব্যাকরণ ও স্মৃতির শিক্ষা দান করিতেন। অতঃপর সেই স্থানে স্বীয় মাতুলের (৺হরকান্ত বিদ্যাভূষণের দত্তক পুত্র মাধবেশ্বরের) সহিত শাস্ত্ররত্ন অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অল্প বয়স্ক মাধবেশ্বর অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া অল্প দিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই মাধবেশ্বরের ত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া শাস্ত্ররত্ন একটী ঘোরতর মোকদ্দমায় পতিত হয়েন। ইহার পরেই (শাস্ত্ররত্নের উপনয়ন হইবার পরেই) তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। সংসারে একমাত্র পিতৃব্য আনন্দনারায়ণ লাহিড়ী ছিলেন ; এই আনন্দনারায়ণ লাহিড়ীকে লইয়া ইনি বহু ব্যয়সাধ্য মোকদ্দমারূপ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই মোকদ্দমায় শাস্ত্ররত্ন পরাস্ত হয়েন। আবার মাধবেশ্বরের পত্নী অনঙ্গমণীর মৃত্যুর পরে, শাস্ত্ররত্ন তাঁহার গৃহীত দত্তক রঙ্গনীশ্বরকে 'রদ' করিবার জন্য মোকদ্দমাতে ব্যাপৃত হয়েন ; এ মোকদ্দমাতেও তিনি পরাস্ত হয়েন। এই দুই মোকদ্দমায় শাস্ত্ররত্নের সর্ব্বস্বান্ত হয় ; স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই থাকে না। শাস্ত্ররত্ন বগুড়া জেলার অন্তর্গত 'বার্ণা' গ্রামের ৺বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে কিছুদিন থাকিয়া কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করেন ; আবার ইটাকুমারীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, বাটীতে প্রত্যাগত হরগোবিন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে অধ্যাতের অবশিষ্টাংশ, জ্যোতিষের কিয়দংশ ও কিছু কিছু বাদার্থ গ্রন্থ এবং আনন্দলহরী প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নের সহিত সহধ্যায়ীরূপে অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্ররত্ন একবার উৎকট পীড়ার হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন ; সেই প্রতিবন্ধকতা ও দীর্ঘকাল মোকদ্দমায় জড়িত হওয়া রূপ দুরূহ প্রতিবন্ধকতায় তাহার পাঠ বন্ধ হয়। এই

অবসরে তর্করত্ন মহাশয় শাস্ত্ররত্ন মহাশয়ের তুল্য পাঠে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য এ সময়েও শাস্ত্ররত্নের বয়ঃক্রম অধিক নহে। কাকিনাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের ও কুমার স্বর্গীয় কৈলাসরঞ্জন রায় মহাশয়ের শুভবিবাহ উপলক্ষে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত এই ছাত্রদ্বয় নিমন্ত্রণে যান। বিবাহের দিন কাকিনায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশ হইতে খ্যাতনামা পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করা হয়; সেই পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপে শাস্ত্ররত্ন অত্যন্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, পণ্ডিতেরা এই বালকের সহস্র মুখে প্রশংসা করেন। শাস্ত্ররত্ন ভোজরাজের সভাসদ্ শ্রুতিধরের আখ্যায়িকা শুনিয়া একদিন তর্করত্নকে বলিলেন;—"আমরাও বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগকে তাঁহাদের মুখের শ্লোক একবার দুইবারে শিখিয়া তাঁহাদিগকে পুরাতন শ্লোক বলিয়া অপদস্থ করিব, তুমি কতবারে শিখিতে পারিবে?" তর্করত্ন উত্তরে বলেন;—"আমি ঠিক বলিতে পারি না।" পরে শাস্ত্ররত্ন এইরূপ ঘটনাসূত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন; তিনি ১ বারে শ্লোক শিখিতে পারেন। তর্করত্নকে বলিলেন, "তুমি কত বারে শিখিতে পারিবে ঠিক কর, আমি না হয় ততবার তোমার অগ্রে আবৃত্তি করিব। শাস্ত্ররত্নের সাহায্য ও চেষ্টার ফলে তর্করত্নও সে সময়ে ২।৩ বারে শ্লোক শিখিতে পারিতেন। শাস্ত্ররত্ন বৃদ্ধ পণ্ডিতদের সহিত এইরূপ আমোদ করিয়া কিছুদিন কাটাইয়াছিলেন। ইহার পরেই দ্বিতীয় মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়; সুতরাং আবার পাঠ বন্ধ হইল। এই মোকদ্দমা সমাপনের পর, কবিশ্রেষ্ঠ এবং রঙ্গপুরের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, কাকিনাধিপের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্ররত্ন কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ইহার পিতৃব্য কাশীযাত্রা করেন। শাস্ত্ররত্নও কিছুদিন পরে, অধ্যয়নের জন্য এবং স্বীয় পিতৃব্যের শুশ্রূষা করিবার জন্য ৺কাশীধামে প্রস্থিত হন। কাশীর রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ৺শীতল পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কাব্যালঙ্কার, এবং ন্যায়াদি সর্ব্বশাস্ত্রে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং তাৎকালিক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ৺কালিদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট বেদান্ত-মীমাংসা, এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ৺ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গৃহে কাব্যালঙ্কার পড়িতে আরম্ভ করেন। গুরুকুল, তাঁহার যুক্তিচাতুর্য্য ও বিচারচাতুর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। পণ্ডিতদিগের মুখে বিশেষতঃ তাঁহার অধ্যাপকদিগের মুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি। কালিদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরলোকের পরে, ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ৺বিশুদ্ধানন্দ স্বামীপাদের নিকট ইনি সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তমীমাংসা যথারীতি অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনের পর কাশী রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত রাজারাম শাস্ত্রী, বাপুরাম শাস্ত্রী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ শাস্ত্ররত্নকে পরীক্ষা করিয়া ১ খানি প্রকাণ্ড সার্টিফিকেট দেন। পিতৃব্যদেবের কাশীলাভের পর, পাঠ সমাপন করিয়া শাস্ত্ররত্ন রঙ্গপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কিছুদিন চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র অধ্যাপনা করেন।

২।৩ বার রঙ্গপুরে জিলাস্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি হয় নাই বলিয়া সে বিষয়ে আর চেষ্টা করেন নাই। কাশী হইতে প্রত্যাগত হইয়াই শাস্ত্ররত্ন বঙ্গভাষায় 'ন্যায়মুকুল' নামে সিদ্ধান্তমুক্তবলীর মত একখানি ন্যায় গ্রন্থ প্রচার করেন, তাৎকালিক সংবাদপত্রে ও পণ্ডিতদিগের মুখে সেই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

তিনি রঙ্গপুরের অন্তর্গত শিবপুরে বিবাহ করেন। বলিতে কি, শাস্ত্ররত্নের স্ত্রীভাগ্য অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। তাঁহার সেই প্রথমা স্ত্রী সুন্দরী এবং স্ত্রী জনোচিত লজ্জাশীলতা এবং গার্হস্থ্য কর্ম্মপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন।

মহাপ্রতিভাশালী ডাক্তার, কে, ডি, ঘোষ মহাশয় একবার ইটাকুমারীতে যান। সেই সময়ে শাস্ত্ররত্নের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই সাক্ষাতেই শাস্ত্ররত্নের সহিত আলাপে মুগ্ধ হয়েন। কে, ডি, ঘোষের সম্মুখে যখনই শাস্ত্ররত্নের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত, তখনই তিনি মুক্তকণ্ঠে শাস্ত্ররত্নের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের অনুরোধেই শাস্ত্ররত্ন একবার শ্রীযুক্ত গোস্বামী সুমেরুগিরী সন্ন্যাসী মহোদয়ের জমীদারীর তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু অনেক দিন সেই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে তাঁহার মনঃপ্রীতি হয় নাই বলিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া আইসেন।

শাস্ত্ররত্নের ১মা স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় এক দিন মূর্চ্ছিতা হয়েন; এই গর্ভই তাঁহার ১ম বা শেষ গর্ভ। চিকিৎসা বিষয়ে মহাপারদর্শী খ্যাতনামা ডাক্তার আর, এল, দত্ত এই সংবাদ পাইয়াই ইটাকুমারীতে উপস্থিত হয়েন। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিতে পারিলেন না, অবশেষে গর্ভস্থ পুত্রসন্তানটীকে কাটিয়া বাহির করিলেন, কিন্তু তাহাতে স্ত্রী রক্ষা পাইলেন না। স্ত্রীর বিয়োগজনিত শোক শাস্ত্ররত্নের হৃদয়ে বড়ই বেদনা জন্মাইয়াছিল। এই সময়ে স্ত্রীকে উপলক্ষ করিয়া শাস্ত্ররত্ন করুণ রসের ১ খানি কাব্য লেখেন; পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সেই কাব্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন:—"আমি বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত কবিতা লিখিতেছি; তোমার এই প্রথম রচিত শ্লোকের মত এখনও আমার শ্লোক পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত হয় নাই।"

৺ হরকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পদত্ত "মধুরাম'' নামে যে একখানি উপঢৌকি মহাল ছিল, সেই সম্পত্তি, সেই মোকদ্দমা ঘটিত ঋণে শাস্ত্ররত্নের নিলাম হইয়া যায়। পীরগাছা গ্রামের করিমুদ্দী নামে এক ধনাঢ্য মুসলমান তাহা নিলাম খরিদ করে। কাশী হইতে শাস্ত্ররত্ন প্রত্যাগত হইলে ব্রাহ্মণডাঙ্গার ভূম্যধিকারী ৺নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় অংশ মত তাঁহার জমাদারীর খাজানার জন্য করিমুদ্দীর নামে বাকী খাজানার নালীশ করেন। করিমুদ্দী "রাজা প্রজা সম্বন্ধ নাই" বলিয়া জবাব দেয়। সেই মোকদ্দমা ডিস্‌মিসের পরে জমাদার সত্ত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক উচ্ছেদ করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালীশ করেন। সেই মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি হইয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, করিমুদ্দি যে অংশ নিলাম করিয়াছে, তাহা এ 'মধুরাম' নহে, এ মধুরাম নিলাম হয় নাই, সুতরাং এ উপঢৌকীর সত্ত্ব শাস্ত্ররত্নের থাকিবে এবং খাজানা ব্রাহ্মণডাঙ্গার ভূম্যধিকারী শাস্ত্ররত্নের

নিকট হইতে পাইবেন।" এই সূত্রে আবার শাস্ত্ররত্নের সেই সম্পত্তি পুনরধিকৃত হইল।

শাস্ত্ররত্ন দিলালপুরে ২য় বিবাহ করেন; এ পত্নীও অত্যন্ত সুন্দরী, ও ইঁহার ন্যায় সুশীলা গৃহকর্ম্মদক্ষা পতিভক্তি পরায়ণা মহিলা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় ৺ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সম্প্রদায়ের মতে ইনি যোগভ্যাস করিতেন। অল্প দিন পরেই ইঁহার জিহ্বা উত্থিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইনি চতুর্থ ক্রিয়াতে অবস্থিত ছিলেন। ইঁহার উপরে লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন ও অনেক প্রক্রিয়া ও ঔষধ ইঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শাস্ত্ররত্ন, ভূমাধিকারিদিগের সাহায্য ব্যতীত টোল চালান অসম্ভব মনে করিয়া, আবার ধনিদিগের নিকটে সাহায্য গ্রহণ. করিলে, তাঁহারা মনে করিবেন যে,'এ ব্রাহ্মণ আজীবন আমার সাহায্যেই পালিত; আমার অন্নদাস', এই সকল চিন্তা করিয়া সামান্য ২।১ টী ছাত্র রাখিয়া টোল চালাইবার সংকল্প সর্ব্বথা পরিত্যাগ করেন।

শাস্ত্ররত্ন পীরগাছা নিবাসী খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ৺ জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে কিছুদিন থাকিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন। দেখিতে দেখিতে শাস্ত্ররত্ন চিকিৎসা-শাস্ত্রে ও কার্য্যে বিশেষ নিপুণ ও দক্ষ হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্ররত্ন বাড়ীতে বসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, চতুর্দ্দিগে তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ে সুযশ পরিব্যাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে তাঁহার সেই পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে ২টী কন্যা ও ১টী পুত্র হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরে সেই পুত্রের মৃত্যু হয়। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিতে আহারের পর, শাস্ত্ররত্ন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার বুকে কেমন একটা চাপা লাগে; তাহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আত্মীয়স্বজনকে আহ্বান করেন। অনেক শুশ্রূষার পর, তাঁহার সেই রোগ তিরোহিত হয়। তখনই তিনি ইটাকুমারীর বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কাশীলাভের উদ্দেশে কাশী যাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। শাস্ত্ররত্নের সংকল্পে কেহ কখনও বাধা দিতে পারে নাই; আজও আত্মীয়স্বগণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার কাশীযাত্রা বাধা প্রাপ্ত হইল না। তাহার পর দিনই তিনি কাশীযাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বৈদ্যবংশীয় শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাসকে বাড়ীটি প্রদান করিয়া কাশীযাত্রা করিলেন। তদবধি তিনি কাশীতেই ছিলেন; কেবল দুই তিন বার বিষয় কর্ম্ম ও নিমন্ত্রণের অনুরোধে কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরে আসিয়াছিলেন। কাশীতেও তিনি উৎকট নিমোনীয়া রোগের হাত হইতে অনেক দীন দুঃখী রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তেজস্বী শাস্ত্ররত্নের লোকানুগত্য কম ছিল, এই জন্য কাশীতে একজন মূর্খ চিকিৎসকের তুল্যও তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রতিপত্তি হয় নাই। কাশীতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। কাশীতে ছাত্রকে অন্ন দিতে হয় না, সুতরাং ধনীর সাহায্যের প্রয়োজন নাই; এজন্য শাস্ত্ররত্ন সেখানে মনের সুখে চতুষ্পাটী খুলিয়াছিলেন; তাঁহার চতুষ্পাটীতে ১২।১৪ টী বুদ্ধিমান ছাত্র ছিল।

শাস্ত্ররত্ন ষড়দর্শন, সাহিত্য, অলঙ্কার, ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

দর্শন শাস্ত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যের মত প্রাচীন গ্রন্থ সকল অনায়াসে শাস্ত্ররত্ন অধ্যাপনা করিতেন। সম্প্রতি তিনি সংস্কৃত ভাষায় ষড় দর্শনের সমন্বয় করিয়া একটী মহাভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই পুস্তক খানি মুদ্রিত করিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। নব্যন্যায়ের বাঙ্গালা করিবার ইচ্ছাও শাস্ত্ররত্নের ছিল, সে ইচ্ছাও ফলবতী হইল না। শাস্ত্ররত্নের সম্পর্কে একটী বিধবা ভগিনী কাশী বাস করিতেন। তাঁহার সম্পত্তিও কাশীলাভ করিবার পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্ররত্নকে উইল করিয়া দেন। সেই সম্পত্তি লইয়া কিঞ্চিৎ বিবাদ বিসম্বাদ ছিল; বাঁচিয়া থাকিলে শাস্ত্ররত্ন এই সময়ে সেই সম্পত্তি ভোগ করিতে পাইতেন, কিন্তু শাস্ত্ররত্নের ভাগ্যে তাহা হয় নাই। ফলে শাস্ত্ররত্নের অর্থভাগ্য ছিল না, তিনি জীবিত কালের মধ্যে কোন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারেন নাই।

শাস্ত্ররত্নের লেখা পড়া ভিন্ন অন্যান্য অনেক কার্য্যেও পারদর্শিতা ছিল। উকীলের মত আইনকানুন বুঝিতেন, মোসাবিদা করিতে পারিতেন, মোকদ্দমার সলা পরামর্শ দিতে সমর্থ ছিলেন। শিল্পদক্ষতা তাঁহার অভ্যস্ত ছিল; জামা ছাঁটিতে ও সেলাই করিতে পারিতেন। কৃষ্ণনগরের পাল অপেক্ষা তিনি সুন্দর প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারিতেন; স্বহস্তে দুর্গা প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া দুর্গা পূজা করিতেন।

কাশীতে থাকার সময়ে ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুই পুত্র ও যমজ কন্যা জন্মে। সেই পুত্রের মধ্যে একটীও নাই, সেই কন্যারও ১টীর মৃত্যু হইয়াছে।

শাস্ত্ররত্ন কৌলীন্য মর্য্যাদার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। যখন তাঁহার একটীও পুত্র রহিল না, তখন কৌলীন্য রক্ষা করা আবশ্যক নাই মনে করিয়া, আত্মীয় স্বজনের বাধা সত্ত্বেও পূর্ব্ব কন্যা দুইটীকে শ্রোত্রিয়ে সম্প্রদান করেন। এইক্ষণে শাস্ত্ররত্নের ১টী মাত্র অদত্তা কন্যা, আর সেই লক্ষ্মীস্বরূপা বিধবা পত্নী রহিয়াছেন। সেই বিধবার আর জগতে অবলম্বন কেহ নাই। তাঁহার কথা মনে করিলে অশ্রুজল সম্বরণ করা যায় না। সম্প্রতি রঙ্গপুরে পণ্ডিতের সংখ্যা অল্প; তাহাতে আবার শাস্ত্ররত্নের মত মহাপ্রতিভাশালী সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের অভাব হইল! যাও শাস্ত্ররত্ন! যাও! অনেক দিন তোমার অভাব আমরা ভুলিতে পারিব না; তোমার অভাব পরিপূরণ আর হইবে না। তুমি তেজস্বী পুরুষ, তুমি জীবিতকালে বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পার নাই, আজ তুমি একেবারে বিষয় উন্মুক্ত হইলে! সুখ-দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে! নির্ব্বাণভূমি বারাণসীক্ষেত্রে দেহপাত করিয়া পরম কৈবল্য লাভ করিলে!!

শ্রীঃ।—

শ্রাবণ

(১)

ঝুম্ ঝুম্ গুম্ গুম্ গুরু গরজন,
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!
নাহি পথ নাহি ঘাট,
ডুবিয়ে গিয়াছে মাঠ,
অবিরল নব জল ঘন বরষণ!
নদ নদী খালে বিলে,
সকলে গিয়াছে মিলে,
দুকূল ভাসায়ে বহে আকুল প্লাবন!

অথাই অগাধ জল,
নাহি কূল নাহি তল,
শশি রবি যত সবি তাহে নিমগন,
অতলে ডুবেছে যেন ভূতল গগন !

২

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ,
কাঁপায়ে শালুক সুঁদী,
কোড়া সে ডাকিছে কুঁদি,
ফিরিয়ে বঙ্কিম গ্রীবা—গর্ব্বে আস্ফালন,
চরণে ভাঙ্গিছে ধান,
পদ্মপাতা খান খান,
ঘূর্ণিত চূর্ণিত জলে গ্রহ তারাগণ !
কুমুদ কাননে কুড়ী
ভ্রুক্ষেপে চাহে না ছুঁড়ী,
সে যেন আরেক রাজ্যে খোজে অন্য জন !
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ !

৩

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ,
চিলাইর নীল চেলি,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঠেলি,
ছুটিয়া যাইতে লয় লুঠিয়া পবন,
কোমল কলসী হাতে
ধরে' তাই কটি পাতে,
বাঁকাল কাকালে বালা করে সম্বরণ !
শৈবালে শিঙ্গারা পাতা,
চুলে সে চিরুণী গাঁথা,
উলটিয়া পালটিয়া খেলিছে কেমন,
এলো চুলে খোপা খুলে' যেন পলায়ন !

৪

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ,
শ্যামল গ্রামের গায়,
শ্যামংজল বয়ে যায়,
ডুবাইয়া চুবাইয়া শ্যাম বীথা বন !
কয়ে যায় কত কথা,
লয়ে যায় কত ব্যথা,
ঘোমটার ঘামে মাখা কত আলাপন,
কদম্ব কুসুম সহ,
ঝরে তাহে অহরহ,
কত আশা ভালবাসা বাসি পুরাতন !
কাননে কেতকী ফুল,
কণ্টকে ঢাকিয়া কুল,
বিরলে বসিয়া আছে বিধবা যেমন,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাটে,
তারি যেন প্রাণ ফাটে !
নিয়ে সে অঞ্চলঢাকা হৃদি-বিদারণ
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ !

আসিতে বলিলে কেন—কি তোমার মন?
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ !
আমার নাহি যে তরী,
তাই যদি ডুবে মরি,
না পারি হইতে পার করি সন্তরণ,
যদি গো কুমুদদলে,
জড়াইয়া ধরে গলে,
তব করুণার হবে কোমল বন্ধন !
দ্রব মরকতে তবে,
সলিল সমাধি হবে,
অতল স্নেহের তব শীতল শয়ন,
আদর মমতা মেখে,
আমারে রাখিবে ঢেকে,
চঞ্চল অঞ্চল তব শ্যাম ধান বন !
তোমার অমৃত হাসি,
উপরে রহিবে ভাসি,
অমল বিমল বাসে, কমল কানন,
সরালী মরালী গাবে,
দিগন্ত ভাসিয়া যাবে,

সে হবে তোমার প্রেম-কল আলাপন!
বিশুভ্র মুকুতা দ্রব,
বরষিবে মেঘ নব,
তোমারি সে লাজনত প্রেমার্দ্র নয়ন,
বহিবে তোমারি শ্বাস,
কমল কদম্ববাস,
অমিয় আশ্বাস দিয়া চল সমীরণ!
চুম্বিবে প্রভাতরবি,
তোমারি অধরছবি
নিশিতে জাগিবে শিরে তব চন্দ্রানন,
ব্যাপিয়া আকাশভূমি,
ব্যাপিয়া আমারে তুমি,
ব্যাপিয়া রহিবে মম অনন্ত-স্মরণ!
আসিব সাঁতার দিয়া,
দেখো তুমি দাঁড়াইয়া,
চিলাইব নীল বুকে সে নীল শয়ন—
দেখিও কদম্বে হেলি,
পদ্মবনে প্রেমকেলি;
হেলাইয়া দোলাইয়া নীল বৃন্দাবন,
তরঙ্গ আসিয়া কূলে,
তোমার চরণমূলে,
শেষ নমস্কার মম করিবে অর্পণ!
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

ধর্ম্মজীবনগঠনে সহানুভূতিওসংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা।

জগতের সাধারণ গতি ও প্রকৃতির বিষয় একটু মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, চারিদিকেই একটা পরস্পর নির্ভরশীলতার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কি জীবজগতে, কি উদ্ভিদ-জগতে, কি অচেতনজগতে—সকল কার্য্যে, সকল বিষয়েই এই নির্ভরশীলতার ভাব নিহিত রহিয়াছে। কোনও কিছুই আপনা আপনি জন্মে না, আপনি আপনি বাড়ে না, আপনা আপনি জীবনধারণ করে না। বাস্তবিক, জগতের নিয়মই এই—প্রকৃতির প্রকৃতিই এই যে, একটা বস্তুর (এখানে বস্তু শব্দ দ্বারা চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকল প্রকার বস্তুই অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে) শক্তি, একটা বস্তুর জীবন, একটা বস্তুর বর্দ্ধন, স্বভাবতঃই আর একটা বস্তুর শক্তি, আর একটা বস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাণীজগতে বল, উদ্ভিদরাজ্যে বল, অচেতন জগতে বল, সৌরজগতে বল, এই নিয়ম সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, সর্ব্বত্র কার্য্যকারী। উদ্ভিদজগতে দেখ, একটা বৃক্ষ জন্মিবার জন্য, বর্দ্ধনের জন্য কতগুলি বস্তুর সাহায্য, কতগুলি বস্তুর শক্তি, কতগুলি বস্তুর সমবেত কার্য্যের প্রয়োজন। প্রথমতঃ বীজটী অঙ্কুরিত হইবার জন্যই ত একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলের (বা রসের) একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তেজের, উপযুক্ত মৃত্তিকার প্রয়োজন। বীজটী অঙ্কুরাবস্থায় পরিণত হইতে শুধু এই কয়টী কার্য্যের ও শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা নয়, এখানে শুধু কয়েকটী মূল ও স্থূল নিয়মের কথা বলা গেল; ইহা ছাড়া আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য শক্তিও কার্য্য করিয়া থাকে। সেই সকল শক্তির কথা আমি অবতারণা করিতে অক্ষম, একজন সুবিজ্ঞ উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদের নিকট এ সকল পরিজ্ঞাত। তাহার পর অঙ্কুরাবস্থা অতিক্রম করিয়া উহা যখন সুদীর্ঘ, সুবিস্তৃত, সুগোল,

ফলফুলশালী বৃক্ষের আকারে পৌঁছিতে থাকে, তখনও উহাকে জল, বায়ু, তেজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও সামগ্রীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঐ সকল নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলে, ঐ সকল সামগ্রীর একটার অভাব হইলে, বীজের সাধ্য কি যে, অঙ্কুরিত হয়? অঙ্কুরের সাধ্য কি যে বৃক্ষে পরিণত হয়? তখন উহার জীবন অসম্ভব, বৰ্দ্ধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। মৃত্তিকা যদি না থাকে, ও জল যদি না থাকে, বা বায়ু যদি না থাকে, তবে বীজের সাধ্য কি অঙ্কুরিত হয়? অঙ্কুরের সাধ্য কি যে দম্ভদৃপ্ত মস্তকে ঊর্দ্ধ বিমানের দিকে অগ্রসর হয়? বীজের মধ্যে এমন কোনও শক্তি অধিনিহিত নাই যে, বীজ অন্য কোনও বস্তুর সাহায্য ব্যতীত অঙ্কুরিত হইতে পারে বা বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। অন্য বস্তুর শক্তি ও সাহায্য ছাড়িয়া দিলে, বীজের কোনও অস্তিত্বই থাকে না; অন্য বস্তু ব্যতিরেকে বীজের বীজত্বই থাকে না। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে, বলা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে একটা বস্তুর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্ত্বা নাই, নিরবলম্বন ভিত্তি নাই, স্বাধীন শক্তি নাই। ইহার শুধু একটা আপেক্ষিক সত্ত্বা আছে মাত্র। অন্য বস্তুর সম্বন্ধেই ইহার অস্তিত্ব আছে, অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বাদ দিলে ইহার কোনও অর্থ বা অস্তিত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে, যেমন বৃক্ষ নিজের জীবনের জন্য, নিজের বৰ্দ্ধনের জন্য, নিজের উন্নতির জন্য মৃত্তিকার সাহায্যের ও শক্তির উপর নির্ভর করে, তেমনি আবার মৃত্তিকাও যে কিয়ৎপরিমাণে বৃক্ষের সাহায্য লাভ না করে, এমন নয়। প্রথমতঃ বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত পত্রাদি ও অপ্রয়োজনীয় অংশ শেষাবস্থায় সাররূপে মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং প্রকৃত মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া মৃত্তিকারই অঙ্গপুষ্টি করে। অতএব বৃক্ষ যেমন মৃত্তিকার সাহায্য ও উপকার লাভ করে, মৃত্তিকাও তেমনি স্বল্পাংশে বৃক্ষ কর্ত্তৃক উপকৃত হয়। বৃক্ষ যেমন এক দিকে মৃত্তিকার নিকট হইতে গ্রহণ করে, মৃত্তিকাও আবার অপর দিকে বৃক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে, এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, একটা বস্তু যেমন স্বভাবতঃই দ্বিতীয় বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া থাকে, দ্বিতীয় বস্তুটীও তেমনি প্রথম বস্তুর উপর সম্পূর্ণ ভাবে না হউক, আংশিক ভাবে নির্ভর করে। এই যে পরস্পর নির্ভরশীলতা, এই যে স্বাভাবিক নিয়ম—ইহা শুধু যে উদ্ভিদজগতে সত্য, এমন নহে; ইহা অচেতনজগতেও সত্য এবং প্রাণীজগতেও পূর্ণমাত্রায় সত্য। প্রাণীজগতে, বিশেষতঃ মানবজগতে দেখা যায় যে, এই নির্ভরশীলতার নিয়ম অতি জলন্ত ভাবে কার্য্যকারী। এখানেও পরোক্ষভাবেই হউক বা প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, প্রকাশ্য ভাবেই হউক বা প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক, মানুষ জগতের শক্তি, সাহায্য ও সহানুভূতির উপর প্রতিক্ষণে নির্ভর করিতেছে; মানুষ অশেষ বিধ দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে স্বভাবতঃই জগতের সহিত সম্বন্ধ। বৃক্ষ যেমন জলের সহিত, মৃত্তিকার সহিত বা রৌদ্রের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে না, মানুষের পক্ষেও তেমনি জগতের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করা অসম্ভব। এখানে 'জগত' বলিলে দুই প্রকার অর্থই বুঝা যাইতে পারে; প্রথম ইহার বিস্তৃত অর্থ,—অর্থাৎ চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ এই তিন জগতের সমষ্টি; দ্বিতীয় মানবমণ্ডলী। উপরোক্ত বিস্তৃত অর্থে লইতে গেলে দেখা যায়

যে, আমরা প্রথমতঃ ঐ তিন জগতের সহিত সম্বন্ধ। আমরা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অবস্থা ও কার্য্যাবলী একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নানা বিষয়ে, নানা অবস্থায়, নানা কার্য্যে আমরা ঐ তিন জগতের নিকট নানা ভাবে ঋণী ও নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ আমরা পরস্পর মানবজগতের সহিত সম্বদ্ধ। এই মানবমণ্ডলীর সহিত আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ আমাদের আলোচনার অংশীভূত। জ্ঞানী এমার্শন সত্যই বলিয়াছেন—"Man is a bundle fo relations, a knot of roots whose flower and fruitage is the world." অর্থাৎ মানুষ নানা প্রকার সম্বন্ধের সমষ্টি, নানা প্রকার মূলের সমষ্টি, আর ফলফুল হ'চ্চে এই জগত। বাস্তবিক, প্রাণীজগতে মানবের জীবন এতই জটিলতাময়, মানবের জীবন এতই বৈচিত্রযুক্ত, মানবের কর্ত্তব্যাবলী এতই সমস্যাপূর্ণ, মানবের প্রকৃতি এতই বিশেষত্বপূর্ণ যে, মানবের পক্ষে জগতের সহিত অশেষ প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই এমার্শন বলিয়াছেন,—"He can not live without a world." (মানুষ জগৎ ছাড়া থাকিতে পারে না)। মানবমণ্ডলীর মধ্যেও পরস্পর নির্ভরশীলতা কার্য্য করিতেছে; কিন্তু অনেক সময় ইহা পরোক্ষভাবে কার্য্য করে বলিয়া, ইহার কার্য্য আমাদের দৃষ্টি বা অনুভূতির বিষয় হয় না। শুধু ইহা যখন প্রত্যক্ষভাব ধারণ করে, তখনই কেবল ইহা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমার জীবনধারণ করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন; আমার জীবনের সুখ, আমার ঐহিক সুবিধা, সকলই অন্যের সাহায্যে, অন্যের পরিশ্রমে, অন্যের শক্তিতে আমার হস্তগত হইতেছে। জীবনের কোনও কার্য্যবস্তুই আমার নিজের চেষ্টায়, আমার নিজের শক্তিতে আমি লাভ করিতে পারি না; সকলটীতেই পরের পরিশ্রম, পরের সাহায্য, পরের শক্তি সংমিশ্রিত আছে। ঐ যে পুঞ্জীকৃত ধন—যাহার জোরে আজ ঐ গর্ব্বিমনা ব্যক্তি এত সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন, যাহার জোরে তিনি জগতকে তাঁহার অভাব পূরণের জন্য অনুক্ষণ অনুজ্ঞা করিতেছেন, যাহার জোরে তিনি প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, ঐ ধন কি তাঁহার একার পরিশ্রমের ফল; তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার ফল, অথবা শুধু কি তাঁহার পিতা বা পিতামহেরই যত্নে তিনি জগতে ধনের দ্বারা মান ক্রয় করিতে পারিয়াছেন? কখনই নহে। উহাতে শুধু অধিকারীর নয়, শতাধিক লোকের সমবেত পরিশ্রমের, সমবেত শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। ধনাগমের যে সকল উপায় আছে, যে সকল পথ আছে, সকলগুলিই পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, পরের শক্তি সামর্থ্য অপেক্ষা করে। পরের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেও, পরের উপর নির্ভর ছাড়িয়া দেও, দেখিবে, সকল পথই বন্ধ, সকল উপায়ই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। জ্ঞানলাভের বিষয় আলোচনা কর, সেখানেও তাহাই দেখিবে। সেখানেও একজন নয়, দুইজন নয়, সহস্র বা ততোধিক জনের সাহায্য তোমাকে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বহু লোকের পরিশ্রম, বহু লোকের যত্ন, বহু লোকের শক্তি; বহুলোকের বুদ্ধিমত্তা, বহুলোকের চিন্তা তোমাকে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, মুখ্য-

ভাবে ও গৌণভাবে, গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে বিদ্যাশিক্ষার্থীকে কত ভাবে, কত উপায়ে, কত কৌশলে তাহার নিজবাটী হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর সুদুর্গম স্থান হইতে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তাহা কে না জানেন? প্রথমতঃ পিতার সাহায্য ছাড়া, ও শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া, বালক পুস্তকের সাহায্য ও নানা প্রকার লোকের সংশ্রবে, অবিরত জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কত প্রকার বিভিন্ন বাহিরের ভাব, আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, কত প্রকার চিন্তাস্রোত আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, কত প্রকার লোকের মতামত আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতেছে, কত প্রকার অভিজ্ঞতা আমাদের চিন্তা ও ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, কত প্রকার বাহিরের সিদ্ধান্ত ও অনুমান আমাদের চিন্তা ও ভাবকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। এই সকল পরকীয় ভাব, পরকীয় মতামত, পরকীয় অভিজ্ঞতাই আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবে মিশিয়া যাইতেছে, আবার অনেক সময় এরূপ নীরব ও নিস্তব্ধভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে, আমরা যাহাকে আমাদের জ্ঞান বলি, সেই জ্ঞানের পরিপুষ্টির পক্ষে, বর্দ্ধনের পক্ষে, বিকাশের পক্ষে এমন সুবিধা ও সাহায্য করে এবং ঐ সকল বাহিরের উপকরণ, বাহিরের উপাদান, বাহিরের ধন আমাদের যাবতীয় বৃত্তিগুলির সহিত এরূপ সখ্যভাবে বাস করে যে, জ্ঞানের পরিণতাবস্থায় আমাদের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কোন্‌টা যে নিজের অংশ, কোন্‌টা যে পরের অংশ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না; সকলই নিজস্ব হইয়া যায়। এই পরকীয় উপকরণকে আমাদের নিজের করিয়া লওয়া আমাদের আত্মার একটী বিশেষ প্রকৃতি। তাই মহাত্মা এমার্শন এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"It is the nature of the soul to approprirate all things. Jesus and Shakespeare are fragments of the soul, and by love I conquer and incorporate them in my own conscious domain. His virtue,—is not that mine? His wit—if it can not be made mine, it is not wit." —অর্থাৎ সকল বিষয় অধিকার করাই আত্মার প্রকৃতি। যিশু ও সেক্ষপিয়ার আত্মার অংশ মাত্র। এবং প্রেমের দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে জ্ঞান এবং জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই। তাঁহার সততা ও সাধুতা—উহা কি আমার নিজের নয়? তাঁহার বুদ্ধিমত্তা,—তাহা যদি আমার করিয়া লইতে না পারি, তাহা হইলে উহা বুদ্ধিমত্তাই নয়।

যাহা হউক, একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে ও আমাদের জীবনের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, অপর মানবের উপরে, জগতের উপরে, আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি, আমাদের জ্ঞানের বর্দ্ধন, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ, আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ, আমাদের জ্ঞানের সংস্করণ বা পরিমার্জ্জন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। জগতকে ছাড়িয়া দিলে, দুইজন দশ জন মানবকে বাদ দিলে, আমাদের জ্ঞান সত্তাহীন নামে পর্য্যবসিত হইবে। শুধু ধন নয়, জ্ঞান নয়, আমাদের সকল প্রকার সম্পত্তিই—অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা আপনার বলিয়া থাকি, কিছুই আমাদের নিরপেক্ষ যত্নের ফল নয়, কিছুই আমাদের

স্বাধীন পরিশ্রমের ফল নয়, সকলটাই কোনও না কোনরূপে অপরের শক্তির সহিত, অপরের কার্য্যের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার জীবনধারণ করিবার জন্য প্রত্যহ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, তোমার অভাব পূরণ করিবার জন্য, তোমার যাবতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, তোমার নিজের সংসারে নড়িবার জন্য ও চলিবার জন্য, তোমার নিজের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য, কত অসংখ্য লোকের সাহায্য, শক্তি ও কার্য্যের উপরে তুমিও অজ্ঞাতসারে অনাকুলিত চিত্তে নির্ভর করিতেছ। অনেক সময় ঐ সকল সাহায্য, ঐ সকল কার্য্য, তুমি না চাহিতেই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; তাই তুমি মনে করিতেছ, তুমি স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তুমি স্বাধীন নও—পদে পদে তোমার বন্ধুর অনুগ্রহের উপর, তোমার প্রতিবাসীর সহায়তার উপর, তোমার জাতীয় ভ্রাতার শক্তির উপর, প্রতিক্ষণ তোমাকে নির্ভর করিতে হইতেছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই সুখে আহার করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছ, কিন্তু ইহাতে কি তুমি অসংখ্য লোকের সাহায্য পাইতেছ না? তুমি ইচ্ছা করিলেই কোমল পুষ্পনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া দিবাভাগোচিত শ্রান্তি ও ক্লান্তি অপনোদন করিতেছ, কিন্তু ইহাতেও কি তুমি অনেকানেক লোকের শক্তি ও সাহায্য লাভ করিতেছ না? এইরূপে একটু ভাবিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তুমি যে কোনও সুবিধা ভোগ করিতেছ, যে কোনও সুখের অধিকারী হইয়াছ, সকলই অন্যের সাহায্যে, অন্যের শক্তিতে লাভ করিতেছ। শুধু অন্য দুই জন দশ জন ব্যক্তিই তোমাকে সকল বিষয়ে সাহায্য ও উপকার করিতেছে, তাহা নহে; তুমিও অপরকে অজ্ঞাতসারে ও অনেক সময়ে অযাচিত ভাবেই সাহায্য করিয়া ও তোমার শক্তি সামর্থ নিয়োগ করিয়া উপকৃত করিতেছ। সৌরজগতে যেমন একটা গ্রহ আর একটা প্রতিবাসী গ্রহকে নিরন্তর ধরিয়া আছে ও নিয়মিত করিতেছে, তেমনি মানুষ নিজের শক্তির দ্বারা, নিজের কার্য্যের দ্বারা অপর মানুষকে অনেক সময় অজ্ঞাতসারে ও নীরব ভাবে চালাইতেছে ও ধরিয়া রাখিতেছে। মানবের মধ্যে এই স্বাভাবিক বন্ধন যদি না থাকিত, পরস্পর নির্ভরশীলতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই সুন্দর, সুবিশাল, সুগঠিত, সুনিয়মিত জগত মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রলয়ে নিক্ষিপ্ত হইত—মানবের অস্তিত্ব জগতের পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইত।

যদি মানবের মধ্যে এই স্বাভাবিক সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘোর বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করিত, তাহা হইলে মানুষ সংসারপথে, তাহার কার্য্যক্ষেত্রে একপদও অগ্রসর হইতে পারিত না,—মানুষ চারিদিকে অন্ধকার দেখিত। মানবমণ্ডলীর মধ্যে এই সাধারণ সহানুভূতির ভাব আছে বলিয়াই, মানবের মধ্যে এই স্বাভাবিক সাহায্যকারীতার ভাব বিদ্যমান বলিয়াই, মানুষের এত আশা, এত সাহস। এই নিয়ম জগতে রাজত্ব করিতেছে বলিয়াই, মানুষ অকুতোভয়ে, অকাতরে, সাগর গিরি অতিক্রম করিয়া স্বকার্য্য সাধনে ব্যাপৃত হইতেছে। বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া, কাঠিন্যকে পায়ে ঠেলিয়া, প্রকৃতির ভ্রূভঙ্গীর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, অপ্রতিহত যত্নে, অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ে, অদম্য আশায়, কর্ত্তব্যপথে পরিভ্রমণ করি-

তেছে। মানুষের মধ্যে এই বিশ্বজনীন আদান প্রদানের ভাব উজ্জ্বল ভাবে বিরাজ করিতেছে বলিয়াই জীবন সম্ভব হইয়াছে। মহামতি ইমার্শন অতি সুন্দর ভাবে জগতে এই আদান প্রদানের কথা বর্ণন করিয়াছেন; তিনি বলেন;—

> "The absolute balance of Give and Take, the doctrine that every thing has its price—and if that price is not paid, not that thing but something else is obtained, and that it is impossible to get anything without its price—is not less sublime of a ledger than in the budgets of states, in the laws of light and darkness, in all the action and reaction of nature"—

অর্থাৎ, দেওয়া ও লওয়ার যে সমতা, প্রত্যেক বস্তুরই একটা মূল্য আছে, এই যে মত,—আর যদি সে মূল্য না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে জিনিস নয়, কিন্তু আর একটা জিনিস প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর কোনও জিনিসই বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না, এই যে মত—উহা যে শুধু খতিয়ানেই সত্য, তাহা নয়, কিন্তু উহা রাজকীয় হিসাবপত্রে, আঁধার ও আলোকের নিয়মাদিতে এবং সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতেও সত্য। জগত এমনি ভাবে গঠিত, পরমেশ্বরের কৌশলময় জগতে মানুষ এমনি ভাবে অবস্থিত, যে পরস্পর সহানুভূতি, পরস্পর নির্ভরশীলতা,পরস্পর বিশ্বাসশীলতা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক, সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজনীয়; শুধু প্রয়োজনীয় কেন, সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্যবিষয়ীভূত। আর জগতের ইতিহাস হইতে, মানবমণ্ডলীর অভিজ্ঞতা হইতে, ইহাও সপ্রমাণিত হইয়াছে যে,যেখানেই পরস্পর সহানুভূতির অভাব, পরস্পর সাহায্যকারীতার অভাব, সেখানেই মহান্ অনর্থ, মহান্ বিপত্তি উপস্থিত হয়। তাই দেখা যায় যে,যেখানেই এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে, সেখানেই এই মহাসত্যের সার্থকতা লাভ হয়—"You can not do wrong without suffering wrong." (Emerson). এই জন্যই জগতের সকল মহাপ্রাণ সাধকই একবাক্যে, হিংসা দ্বেষ, বিরোধ বিপক্ষভাব প্রভৃতিকে অস্বাভাবিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই ব্রাহ্মকবি যথার্থই গাহিয়াছেন, "কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্ম বেশ, কেন এ মান অভিমান।"

যাহা হউক, উপরোক্ত মন্তব্য হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন মানুষের উন্নতি, মানুষের গঠন, মানুষের বর্দ্ধন, মানুষের জীবন অপরের শক্তি ও সাহায্যসাপেক্ষ, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, মানবজগতে সাহানুভূতি ও সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ ও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই স্বাভাবিক নিয়মের প্রয়োজনীয়তা, এই স্বাভাবিক নিয়মের প্রয়োগ আমাদের ধর্ম্মজীবনে অনেক গুণে অধিক। যেহেতু ধর্ম্ম জিনিসটাই এত জটিলতাপূর্ণ, এত বৈচিত্র সংযুক্ত, এত প্রকার কঠিন সমস্যায় বিজড়িত যে, ধর্ম্মজীবন সাধন করিতে বিভিন্ন প্রকার অভাব মোচনের, বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির, বিভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার মানবের উপর উপস্থিত হয়। তাই, সকল দেশের, সকল যুগের সাধু মহাপুরুষগণই একবাক্যে এই মহাবাণী জগতে প্রচার করিয়াছেন যে, মনুষ্যের জীবনে যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, করণীয় আছে, মানুষকে জীবনক্ষেত্রে যত প্রকার বিষয়ের সহিত, যত প্রকার সমস্যার সহিত সংশ্রবে ও সংগ্রামে আসিতে হয়, তন্মধ্যে ধর্ম্মের মহত্ব, ধর্ম্মের গুরুত্ব, ধর্ম্মের দায়ীত্ব, ধর্ম্মের কাঠিন্য সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক। সেই জন্য ধর্ম্ম যেমন একদিকে খুব সহজ ও স্বাভাবিক, আবার অপর দিকে ঘোর সমস্যাপূর্ণ, ঘোর কাঠিন্য সমাবিষ্ট, ঘোর গুরুত্ব সংযুক্ত। তাই ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যায় যে, একজন ধর্ম্মবীরকে জগতে কত প্রকার সমস্যা, কত প্রকার সংগ্রাম, কত প্রকার গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে কত প্রকার দায়ীত্ব-সূচক কার্য্যের মধ্য দিয়াই না যাইতে হইয়াছে। একজন সেণ্টপলের ন্যায়, একজন রামমোহনের ন্যায়, ধর্ম্মসাধনেচ্ছু ব্যক্তিকে এই জন্য কত প্রকার কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছে, কত প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু যে সত্য,--তাহা যেমন একটা কালেতে আবদ্ধ নাই, তেমনি আবার উহা একটা স্থানেতেও আবদ্ধ নাই। এক জন লোকের সাহায্যে আমার যে সমস্যা মীমাংসিত হয় নাই, অন্য এক জন, দুই জন বা ততোধিক জনের সাহায্যে বা শক্তিতে আমার তাহা মীমাংসিত হইবে। একজনের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সাহায্যে আমার যে অভাব পূর্ণ হইতেছে না, তাহা অপর দুই জন, দশ জনের শক্তি ও গবেষণার সাহায্যে নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। যে একটী বিশেষ কাঠিন্যে পড়িয়া আমার হৃদয় মন নিরাশায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, জগতের কয়েক জন অভিজ্ঞ সাধকের অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহা পুনরায় বলীয়ান ও সতেজ লইয়া উঠিবে। এই জন্যই জগতের সহিত, মানবের সহিত উদার সংমিশ্রণের প্রয়োজন। অনন্ত বিধাতার রাজ্য অনন্ত দেশব্যাপী; তাঁহার প্রদত্ত ধনও অনন্ত স্থানে রক্ষিত। সে ধনে সকলেরই সমান অধিকার; সে ধন কোনও একটা বিশেষ স্থানে বা দেশে গচ্ছিত নাই। প্রেমময় পরমেশ্বর অনন্ত ভাবে, অনন্ত স্থানে তাঁহার ধনরাজি উন্মুক্ত ভাবে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন; আমাদের অনন্তমুখীন অভাব, অনন্তমুখীন আকাঙ্ক্ষা ঐ সকল ধনরাজি দ্বারা পূরণ করিবার জন্য, নিবৃত্ত করিবার জন্য, আমাদিগকে কায়মনপ্রাণে প্রয়াস পাইতে হইবে। তিনি তোমার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সকলই দিয়াছেন, তোমাকে ধনী করিবার জন্য, তোমার সকল প্রকার দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, তিনি অনন্ত ধন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন; তোমাকে শুধু দেখিয়া লইতে হইবে, খুঁজিয়া লইতে হইবে। "অন্বেষণ কর পাইবে।" এক এক দেশে, এক এক যুগে, এক এক জন সাধু মহাপুরুষ ঐ সকল গচ্ছিত ধনের অংশ লাভ করিয়া ধনী হইয়া গিয়াছেন—সফলজীবন ও নিবৃত্তাভিলাষ হইয়া গিয়াছেন। তাই আমাদের অনন্ত প্রকারের অভাব মোচন করিবার জন্য, অনন্ত প্রকারের অপূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য, অনন্ত প্রকারের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য, আমাদের অনন্তমুখীন প্রকৃতির পরিপুষ্টির জন্য, আমাদিগকে সকল প্রকার দেশীয় বিদেশীয়, জাতীয় বিজাতীয় সাধু মহাপুরুষ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে হইবে। অনুদারতা কাজে কাজে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, আত্মসর্ব্বস্বতা স্বভাবতঃই অকল্যাণকর হইয়া পড়ে। এই জগতের প্রকৃতির বিষয় একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, মানবপ্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা কর, মানবের বিবিধ

অভাব ও প্রয়োজনের বিষয় একটু মনযোগের সহিত অনুধাবন করিয়া দেখ, দেখিবে যে, উদরাতা স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে, পরস্পর সাহানুভূতি সর্ব্বাংশে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে; সার্ব্বভৌমিক সংমিশ্রণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িবে।

এই সংমিশ্রণের দুইটী দিক আছে, একটা বাহ্যিক আর একটা আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক সংমিশ্রণের অর্থ মানবমণ্ডলীর সহিত মিশা, আর আভ্যন্তরীণ সংমিশ্রণের অর্থ পুস্তকের সাহায্যে জগতের মৃত ও দূরস্থিত মানবমণ্ডলীর অভিজ্ঞতা, অভিমত ও ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া। এই সংমিশ্রণ বলিলেই বিশ্বজনীন উদরাতা ও সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে। যেহেতু এই দুইটী ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই আমরা জগতের সহিত সংমিশ্রণে মানবের সহিত সখ্যতা স্থাপনে, জীবন্ত ও মৃত মানবের জীবনপুস্তক অধ্যয়নে (in studying humanity) প্রবৃত্ত হই। সেই জন্যই একদিকে যেমন যুগপৎ আমার পরিচিত, আমার মতাবলম্বী, আমার মতের সাহানুভূতিকারী লোকের সহিত উদার অন্তঃকরণে, প্রেম-প্রণোদিত চিত্তে সংশ্রবে আসিত হইবে এবং অপরিচিত, অশ্রুতপূর্ব্ব, ভিন্ন মতাবলম্বী, এমন কি বিরোধী মতাবলম্বী লোকেরও সহিত আমার উপকারের জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য মিশিতে হইবে ও তাহাদের অভিজ্ঞতা, তাহাদের জ্ঞান ও তাহাদের ভাবের সহিত পরিচিত হইতে হইবে; তেমনি আমার শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া, আমার সংকীর্ণ জ্ঞানরাজ্য অতিক্রম করিয়া, ভিন্ন দেশের, ভিন্ন যুগের সাধু মহাজনগণের উক্তি ও মতামত অধ্যয়ন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা প্রথমতঃ এই উপকার হয় যে, আমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ক্রমে বিদূরিত হইয়া, বিভিন্ন প্রকারের সত্য গ্রহণেচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে, ও তাহা ছাড়া আমার সঞ্চিত অনেক ভ্রমাত্মক মত ও অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাহা দূরীকরণার্থে মন প্রাণ উৎসুক হয়; হৃদয়ের অপবিত্রতা কাটিয়া যায় এবং আমার অভাব অসম্পূর্ণতা —যাহা হয়ত এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার দিকে আমার কোনই লক্ষ ছিল না, তাহা অতি উজ্জ্বলভাবে নিজের জ্ঞানপথবর্ত্তী হয়; আর পরিশেষে এই সংমিশ্রণের আর একটা প্রধান উপকারীতা এই যে, আত্মাভিমান, আত্মসর্ব্বস্বতা—যাহাকে সকল দেশের, সকল যুগের ধর্ম্মনেতাগণ ধর্ম্মজীবনের সর্ব্ব প্রধান অন্তরায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যায়। আমাদের দেশের ঋষিরাও সত্যগ্রহণে সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে একটী প্রবচন আছেঃ—

> "অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলোনরঃ।
> সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যঃ ইব ষট্পদঃ॥"

অর্থাৎ, মধুমক্ষিকা যেমন সকল প্রকার পুষ্প হইতেই কেবল মধু গ্রহণ করে ও অন্য অংশ বাদ দেয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল প্রকার শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন ও অসার অংশ পরিত্যাগ করিবেন। কি মহৎ উদারতা হইতেই না এ কথাটী অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহাতে কোনও দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষ, বা কাল বিশেষে আবদ্ধ না হইয়া সকল দেশের, সকল যুগের আবিষ্কৃত সত্য সংগ্রহ করিবার

জন্য ঋষিসাধারণ ভ্রান্ত মানবকে এই উদারতাপূর্ণ অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। এই উচ্চ উদারতার ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই, সত্য সংগ্রহার্থে ধর্ম্মজীবন গঠনার্থে এই বিশ্বজনীন সংমিশ্রণের (Universal intercourse) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই মহাত্মা সেণ্ট পল সুষুপ্ত জগৎকে এই মহোচ্চ সুসমাচার শুনাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:—Whatsoever things are true, whatsoever things are honest,whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things (Phil. 4. 8.) আবার সেদিন এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় ধর্ম্ম-ইতিহাসে বিখ্যাত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনও উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে, এই স্বাভাবিক সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা অতি উজ্জ্বল ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে, বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় সমাজ ন্যূনাধিক চল্লিশ সহস্র সম্প্রদায়ে সংবিভক্ত। এই সম্প্রদায় গুলির ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে এত প্রকার মতভেদ, মূল ও অবান্তর বিষয়ে এত বিস্ময়কর প্রভেদ যে, একজন ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসে মনে করিতে পারেন, বুঝি ঐ সমাজের অনেক-গুলি সম্প্রদায় উহার অন্তর্ভূত নয়। ঐ সম্প্রদায় গুলির মধ্যে এত প্রকার বিস্ময়জনক বিরোধ বর্ত্তমান থাকিলেও, নানা প্রকার ভিন্ন মতামত বিরাজ করিলেও, উদার ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রচারক কেশবচন্দ্র পরস্পরের মধ্যে গাঢ় সাহানুভূতি ও সংমিশ্রণ প্রচলনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কি উচ্চ উদারতার ভাব, কি সুন্দর বিশ্বপ্রেমের ভাব, কি মহৎ সার্ব্বভৌমিক সহানুভূতির ভাব তাঁহার উপদেশের বর্ণে বর্ণে সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে! তিনি বলিতেছেন:—“Let ministers of the various sects exchange their pulpits with each other, let the brothers and sisters of one Church now and then go into another Church and shake hands with the utmost warmth and tenderness of heart with their brothers and sistes in that church.” এইরূপে যে দেশের বা যে যুগেরই সাধু বা সাধকের নিকট যাও না কেন, যাহারই নিকটে কেন উপদেশ গ্রহণ না কর, সকলেই একবাক্যে উদারতাপূর্ণ সাহানুভূতি ও সংমিশ্রণের উপদেশ দিবেন।

এই যে পরস্পর সাহানুভূতি, পরস্পর প্রেম--যাহা আমাদিগকে জগতের সহিত সংমিশ্রণে প্রবৃত্ত করে, ইহা যে শুধু মানুষের দিক হইতেই প্রয়োজনীয় বা কর্ত্তব্য, তাহা নহে—অর্থাৎ শুধু যে জগতের দিক হইতে, আমাদের স্বার্থের বা স্বাভাবিক প্রয়োজন সিদ্ধির দিক হইতেই আমরা মানবের সহিত সহানুভূতি করিতে, মানবকে ভালবাসিতে, মানবের সহিত মিশিতে বাধ্য, তাহা নহে, আর একটী দিক হইতেও এটা আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের প্রয়োজনীয়। সেটা ঈশ্বরের দিক হইতে, সুতরাং আরো গুরুতর। ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হইতে ইহা আমাদিগকে প্রয়োজনীয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি আমাদিগের সাধারণ পিতা হন, আমরা যদি সকলে তাঁহারই সন্তান হই, তাহা হইলে কি আমরা পরস্পরকে সহানুভূতি করিতে, পরস্পরকে ভালবাসিতে বাধ্য নই ? তাই বাইবেল গ্রন্থে জন বলিয়াছেন:—

If a man say I love God and hateth his brother, he is a liar : for he that loveth not his brother when he hath seen, how can he love God whom he hath not seen ? And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also." তাই দেখা যাইতেছে যে, পরস্পর প্রেম ও সহানুভূতি, যাহা আমাদিগকে স্বভাবতঃই লোকের সহিত সংমিশ্রণে প্রণোদিত করে, তাহা মানুষের দিক হইতে ও ঈশ্বরের দিক হইতে সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক। অতএব আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, অপরের সহিত আমাদের একটা বিরোধভাব চিন্তা না করিয়া, আমাদের নিজের মঙ্গললাভের জন্য, ধর্ম্মজীবনের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য, উদারতার সহিত, প্রেমের সহিত সহানুভূতির সহিত, আমার জগতীয় ভ্রাতার সহিত সংমিশ্রণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাতন ও নূতন

কবি টেনিসন তাঁহার আর্থারের মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"The old order changeth yielding place to new." —ইহা নিরাশ-ব্যর্থ-যত্ন আর্থারের অন্তিম বাক্য। বাস্তবিক আমরাও দেখিতে পাই, তাহাই বটে ; এক কালের আচার ব্যবহার, নিয়ম পদ্ধতিগুলি দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া যায়—"নূতন" আসিয়া আবার তাহার স্থান জুড়িয়া বসে! আজ যাহা ভাল—যাহা আদরের—কাল তাহাই আবার দৃষ্টি-শূলত্ব উৎপাদ করে। এ পরিবর্ত্তন কেন? বুঝিলাম—যিনি এ রাজ্যের নিয়ন্তা, এ তাঁহারই ইচ্ছা, কিন্তু তাহা হইলেও—ইহার ভিতর একটা কথা আছে—যাহা আমরা সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

"নূতন" যদি "পুরাতন" অপেক্ষা সুন্দর হয়, তবেই আমরা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারি ; নতুবা আমরা তাহাকে আমাদেরই সেই প্রিয় 'পুরাতনের' মত করিয়া গড়িব না কি? "নূতনের" বিভীষিকা কেন সহিতে যাইব?

পক্ককেশ, কুঞ্চিত-কপোল বৃদ্ধ তাঁহার জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া যখন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন—তাঁহারাই সেই 'সেকালের' কথা চিন্তা করেন, তখনই যেন তাঁহার নিকট হইতে আমরা একটা দীর্ঘশ্বাস অনুভব করিতে, তাঁহার শুষ্ক আঁখিতে বিষাদের অশ্রুকণা দেখিতে পাই!

কেন? যাহা প্রিয়, তাহারই বিচ্ছেদে মানুষকে কাতর হইতে দেখি, তবে "পুরাতনই" কি নূতন অপেক্ষা সুন্দর?

তাই বলিতেছিলাম, এই কথাটুকু বুঝিতে গেলে আমাদিগকে একটু গোলে পড়িতে হয়।

ভারতবর্ষ যদি আজ তাহার 'পুরাতন' ও 'নূতনে' তুলনা করিতে বসে, তবে কি সে বলিবে না যে, তাহার 'পুরাতনই ভাল ছিল?

তারপর, শুধু বৈচিত্র্য সম্পাদনই কি জগতের এই বিশাল পরিবর্ত্তন স্রোতের উদ্দেশ্য? যদি তাহাই হয়, যদি উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে ইহার শক্তি বড় ক্ষীণ হয়, তবে তাহারই গতির উপর নির্ভর করিয়া আমরা শান্তি পাইতে পারি কি? রাজ-

নৈতিক গবেষণা ভুলিয়া গিয়া, একথা ভাবিতে গেলে যেন, আমরা দুর্ব্বলচেতা মিষ্টিক্‌দের মত (Mystics) কি একটা বিষম নিরাশার অন্ধকারময় রাজ্যে আসিয়া পড়ি, ভ্রমের কুহেলিকায় পড়িয়া বিধাতার মঙ্গল-ইচ্ছায় সন্দিহান হইয়া পড়ি—তখনই যেন,

"মেঘ আসে হৃদয় আকাশে"

যাঁহার আলোকে জগত ভরা, তাঁহাকেই দেখিতে পাই না! বুঝি না, আমাদিগকে অবনতির পথে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় তাঁহার কি মঙ্গল-ইচ্ছা আছে?

আজ আমরা দেখিতে চাহিতেছি—শত সহস্র বৎসর, যুগযুগান্তর এই পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া ভারতবর্ষ এখন যে রাজ্যে পৌছিয়াছে, তাহা স্বর্গের আলোকে উদ্ভাসিত অত্যুন্নত নন্দন, কি অন্ধকারময় সুনিম্ন পর্ব্বতগহ্বর? তাই আমাদের "অতীত" ও "বর্ত্তমান" তুলনা করিয়া দু'টী কথা বলাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যত ঝঞ্ঝাবায়ু ভারতবর্ষের উপর দিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশের অদৃষ্টে বোধ হয় এরূপ ঘটে নাই। কালের শত স্তর অতিক্রম করিয়া একবার ভারতবর্ষের সুদুর অতীতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, যে দিনের চিত্র আসিয়া আমাদের নয়ন সমক্ষে পৌছিবে, বোধ হয়, এমন কেহ নাই—যিনি বর্ত্তমানের সহিত তাহার তুলনা করিয়া শিহরিয়া উঠিবেন না!

সেই যে দিন হোমধুমের অন্তরালে সৌম-শান্ত ঋষিগণের সুগম্ভীর বেদগানে আর্য্যাবর্ত্ত মুখরিত হইত, ভারতবর্ষীয় হিন্দু-ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইত,—সুনীতির শুভ্র বৈজয়ন্তী ভারতবর্ষের অলঙ্কার ছিল,—তারপর, যে দিন 'সুজলা সুফলা," ভারতভূমির অর্থগৌরবে শত বিজাতীয়ের লালসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে দিনের তুলনায় আজ কি?

মনে করিয়া দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষেই ব্যাস, কপিল, কণাদ ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহার পর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম, অর্জ্জুনও ভারতবর্ষেই!

আজ নাকি যাহারা বড় উন্নত, সভ্যতায় জগতের শ্রেষ্ঠ—বলিতে কি, সে সব জাতি যখন অস্ফুট বন্যভাষায়ও মনোভাব ব্যক্ত করিতে শিখে নাই—ভারতের কাব্য-কাননে তখন বসন্ত বিরাজমান—কোকিলের সপ্তম তান! আজ যে ইউরোপ জগতে বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ্কতত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন বলিয়া বড় গর্ব্বিত, বোধ হয়, তাঁহার সে শাস্ত্রে বর্ণপরিচয় আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বেই হিন্দু ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনেক মহানতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছিল। হিন্দু ঋষির মুখ হইতেই প্রথম বাহির হইয়াছিল—"চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি?"

যাহা হউক, এসব সুদূর অতীতের কথা—শত শত বৎসরের দুর্ভেদ্য আবরণ আসিয়া এখন তাহার উপর পড়িয়াছে, তাই এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাই না—এখন একবার "নূতনের" একটু পরিচয় লইতে চাই।

হিন্দুর ভারতবর্ষ হিন্দুর হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। সে আজ অনেক কাল—তারপর সুদীর্ঘকাল মুসলমানের হাতে হিন্দুর অদৃষ্টচক্র নিয়োজিত ছিল; সে মুসলমানও আজ অনন্তকালের বিশাল পরিবর্ত্তনস্রোত বহিয়া অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে! এখন সাত সমুদ্রের অপরপারবাসী ইংরেজ আমাদের ভাগ্য-বিধাতা।

"শস্যশ্যামলা রত্নপ্রসবিনী" ভারতভূমির অর্থ আজ দিগন্তবিস্তৃত আটলাণ্টিকের পরপারে চলিয়া যাইতেছে—আর ভারতবর্ষ সেই কাঞ্চন বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করিতেছে! বহুদিন হইতে যে হাহাকার স্রোত ভারতবর্ষের বক্ষে বহিয়া যাইতেছে, তাহার চঞ্চল গতির সংযম কবে হইবে, কে বলিতে পারে?

এখন আর্থিক কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান ভারতের নৈতিক অবস্থা একটু বিবেচনা করা যাক্। এ সম্বন্ধে বড় একটা সমস্যা উপস্থিত, কারণ কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের মত, পাশ্চাত্য সংঘর্ষ ভারতের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেছে। আমরা কিন্তু ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে নাপারিয়াই যত গোলমালে পড়িয়াছি। আমরা যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, পাশ্চাত্য স্রোত এদেশের সম্মুখে ইউরোপের সুবিশাল বিলাসিতা-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বহুকাল হইতে সুনীতি-সংযমের যে পবিত্র মন্দাকিনী ভারতবর্ষের গাত্র ব্যাপিয়া বহিতেছিল, এখন তাহা অতীতের গর্ভে বিলীনা ফল্গু। আমরা সেই ইউরোপীয় বিলাসিতার দাস হইয়া দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের অভাব আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছি। ভারতবর্ষের একদিন ছিল—যেদিন ভারতের লোক পার্থিব অভাবকে তৃণবৎ জ্ঞান করিত না—যে দিন "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তম্" ভারতবর্ষের প্রিয় বাক্য ছিল,—কিন্তু আজ হ্যাট্, কোট, ধড়া চূড়া কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না;—চোখে চসমা আঁটিয়া, মুখে সিগারেটের ধূম উড়াইয়া, আমরা সভ্যতা ঘোষণা করি—ইহাই নাকি এ যুগের সভ্যতার 'বেবেল'!! জানি না, কবে এই দুষ্পূরণীয় বিলাস-তৃষার শান্তি হইবে?

যে ভারত সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, খনার জন্মভূমি—ভারতের কথা বলিতে গিয়া একদিন আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারিতাম—

"ঘরে ঘরে আছে সীতা ভারতের আদি মাতা।"

আজ কি ঠিক সেইরূপ ভাবেই কথা বলিতে পারি? আপনা আপনি একটা দ্বিধা আসিয়া পড়ে না কি?

যে প্রণালীতে উচ্চ অঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার স্রোত বহিতেছে, মনে হয়, তাহার চঞ্চল গতির আরও একটু সংযম আবশ্যক—নতুবা অচিরেই দেশের গৃহে গৃহে শুধু "সোহাগের স্বেচ্ছাচারিণী" বিলাসিতার প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতে থাকিবে। যুক্তি, তর্ক, প্রমাণ করিয়া কোন বিষয় প্রমাণ করিতে যাওয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু একথার যাথার্থ্য বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলন আজকাল বেশ করা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার সুফল খুব কমই দেখা যাইতেছে—ইহাই দুঃখের বিষয়! বিধাতা যাঁহাদিগের হস্তে ভারতের অদৃষ্টচক্র সমর্পণ করিয়াছেন, তাহারা সভ্যজাতি, তাই আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতি পদে সভ্যোচিত ন্যায় বিচারই আশা করিতে পারি। কিন্তু কখনও কখনও ইহার অন্যরূপ হইতে দেখিয়াই আমরা বড় ভয় পাই!

আমাদের সভা-সমিতিই বল, আর কংগ্রেস-কনফারেন্সই বল, তাহার উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা, সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে আমাদের অভাব, দুঃখ জ্ঞাপনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সন্দেহ

নাই। কিন্তু যাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনা, তাঁহারা যদি স্বেচ্ছায় রুদ্ধকর্ণ হইয়া বসেন, তবে আমাদের আর কোন হাত আছে কি?

বড় বেশী দিন নয়, এইতো সে দিন দিল্লী-দরবারের শেষ যবনিকা পড়িয়াছে। দরিদ্র ভারতকে শতগুণ দরিদ্র করিয়া, সেই মহাব্যাপারের অভিনয় শেষ হইয়াছে! সুচতুর রাজপ্রতিনিধির অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভারতের রাজন্যবর্গ তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া আসিয়াছেন!

ভয়-বিভীষিকা যেন পদে পদে। দেখিলাম, সে দিন নিজামের কম্পিত হস্ত হইতে কিরূপে তাহার শেষ সম্বল বেরার রাজ্য খসিয়া পড়িল—আবার হয়ত শীঘ্রই দেখিব, হিমালয়ের প্রান্তস্থিত সেই হাস্যময়ী উপত্যকা, প্রকৃতির চির অম্লান উপবন কাশ্মীর রাজ্য—কাশ্মীররাজের ক্ষীণ হস্ত হইতে চলিয়া যাইবে—কাশ্মীর-কুসুমের পরিবর্ত্তে হয় ত তাহা ইংলণ্ডীয় কুসুমের বিহারভূমি হইবে!

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, আর একবার বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের পররাজ্য সংহারিণী নীতির এইরূপই খেলা দেখা গিয়াছিল বটে; তাই বলিতেছিলাম, আমাদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন যেন কতকটা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়!

আমরা বলিতে চাহি না, রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের মতবিরুদ্ধ। কিন্তু এইটুকু বলিতে চাই, ধর্ম্মনীতির কথা কখনও ভুলিও না। শিথিল ভিত্তির উপর তোমরা প্রাসাদ দাঁড় করাইতে পারিবে না, যেন মনে থাকে। ধর্ম্মই কি জাতীয় জীবনের একমাত্র ভিত্তি নহে? "পুরাতনের" কথা ভাবিয়া দেখ তো, চরিত্রবলই কি হিন্দুর জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ ছিল না? চরিত্রবলে শিথিল হইলে শারীরিক বলে দৃঢ় হইতে পারিবে না—পূর্ব্বে চরিত্র বল লাভের চেষ্টা দেখ। আমরা এখন আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের একরূপ উপসংহারে আসিয়া পৌছিয়াছি,—পাশ্চাত্য স্রোত যে আমাদিগকে দিন দিন গরলের পথ হইতে অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাইতেছে,—আমরা তাহা মনে করিতে পারি কি? আজ নগরে "নগরে পর দীপমালা" শ্রেণী শোভা পায় বটে, কিন্তু সুদীর্ঘ কাল হইতে ভারত-আকাশ যে "তিমিরে" ঢাকা পড়িয়া আছে, তাহার গভীরতার কিছু লাঘব হইয়াছে কি?

এ অন্ধকার দূর করিতে হইলে বিজাতীয় আলোকের অপেক্ষায় দাঁড়াইলে চলিবে না; একটুকু জাতীয় অগ্নির প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ক্ষুধা দূর করিতে হইলে বিজাতীয়ের পদলেহন করিলে চলিবে না—আমাদের দ্রুম-দল-শোভিনী—মাতৃভূমি-জাত একটু সঞ্জীবনী সুধা চাই! যে "দাসত্ব-শৃঙ্খল" একবার পায়ে পরিয়াছ, তাহা সহজে ঠেলিবার যো নাই—সে দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়াই কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—হৃদয়ের বল চাই! তাহারই মন্ত্র-স্বরূপ ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বলিতে হইবে—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"

কংগ্রেস্ কনফারেন্স কর— ভারতবর্ষের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা তাহার সহিত করিও। হিন্দুর সন্তান হইয়া তোমাদের পুরাতনকে তোমরা অবজ্ঞা করিও না—"নূতন" অপেক্ষা তাহাই তোমাদের আদর্শ হউক। দেখিতে পাইবে, ভারত-কাননে সুখের বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিবে, ধর্ম্মের

পবিত্র জ্যোতিতে ভারত-আকাশ আবার হাসিবে।

আমরা ভারতবর্ষের যেরূপ উন্নতির প্রার্থী, তাহাতে আমাদের দেশের ধন-কুবের-দলের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে না—তাহাদিগকে আমরা স্বগর্ব্বে বলিতে পারিব—হে রায়বাহাদুর, তুমি তোমার রায় বাহাদুরত্ব লইয়া—হে মহারাজ বাহাদুর, তুমি তোমার ফিটন টমটম্, বাগানবাড়ী লইয়া দূরে সরিয়া পড়—ভারতবর্ষ এখন তোমার সাহায্য চাহিবে না—আমরা চাই, ঠিক সেই "পুরাতনে"র কৌপীন-ধারী ভাগ্যবান পুরুষের কৃপা।

বিজাতীয় ভাবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পুরাতন ভারতবর্ষের সুনীতির পথে অগ্রসর হও—ভারতমাতার মস্তকে দুঃসহ কলঙ্কের পসরা চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিও না। নতুবা বলিব, বিধাতঃ! এই পূর্ব্ব-স্মৃতির সমাধি ভারতবর্ষকে আর মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা ভোগ করিতে জগতে রাখিও না—তোমার স্বর্গের বজ্রাগ্নি বর্ষণ করিয়া সব ভস্মাবশেষ করিও ফেল। আমাদেরই কবির কথায় সুর মিশাইয়া আবার বলিবঃ—

"নাহি কি সলিল হে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে? উথলিয়া রঙ্গে
কর অপহৃত এ কলঙ্করাশি
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি
ভারত ভুবন ভাসাও জলে!"

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানুভব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

বাঙ্গালা ভাষায় যাহা কিছু বিকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সৌধের যে কিছু বৈভব, তাহা প্রায় বৈষ্ণব কবিগণ হইতে ও গৌরাঙ্গ-লীলা লইয়া। বৈষ্ণব মহান্তগণের কৃপায় মহাপ্রভুর মধুর আখ্যান লইয়া, বঙ্গসাহিত্য বহু অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছেন; এজন্য সাহিত্যসমাজে বৈষ্ণব কবিগণের আসন সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। গৌরচরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে আবার যিনি সকলের অগ্রগণ্য, চৈতন্যচন্দ্রের চারু চরিত্র যখন কোন গ্রন্থে গ্রথিত হয় নাই, সেই সময় যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের দ্বারা প্রভুর লীলামাধুরী প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথম সকলের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মহানুভব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সম্বন্ধে জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? সেই আনন্দকাহিনীর দুই একটী কথাই এই প্রবন্ধে আমরা প্রকাশ করিব।

বর্দ্ধমানের শ্রীখণ্ডগ্রামে, বৈদ্যকুলে নরহরি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নারায়ণদাস সরকার। এই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যে তিনটী পুত্ররত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নরহরিই সর্ব্বকনিষ্ঠ। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি তিন জন॥"

শৈশবকাল হইতেই নরহরি নির্ম্মলচরিত্র ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বাল্যজীবনের আর সকল কথাই আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে বোধ হয়, তিনি বাল্যকালে পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী ইত্যাদিতে অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষাতে যে বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা সমূহই তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নরহরির পূর্ব্বে কোন

প্রকার পরিচয় ছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে জানা যায় যে, প্রভু গয়ধাম হইতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই সে কথা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হয়। তখন চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তগণ প্রভুর দর্শনার্থ আগমন করিতে থাকেন। নরহরিও এই সময় প্রভুর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন।—

ভকত চকোর সব আসিয়া মিলিলা।
প্রেমামৃত পান করি সবাই ভুলিলা॥
মিলালেন গদাধর পণ্ডিত গোসাই।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তাঁর ঠাই॥

প্রভুকে দর্শন করিতে যাইয়া, তৎকালে প্রভুর যে প্রেমোন্মত্ত মূর্ত্তিখানি দর্শন করিলেন, তাহা তিনি আর ভুলিতে পারিলেন না। সেই শিশিরসিক্ত কমলদলের প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়ন ও প্রস্ফুট কদম্বের ন্যায় রোমাঞ্চিত দেহের প্রেমময় ছবিখানি তাঁহার হৃদয়পটে একেবারে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিল। তখন শয়নে, স্বপনে, অন্তরে, বাহিরে, জগন্ময়ই গৌরাঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। গৌর-প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহার কি প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার রচিত এই পদ দুইটী পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়।—

"সজনি মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে দিগ নেহারিতে
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥
হৃদি-সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল
সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটী নয়নে কত বা হেরিব
লাখ আখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমেতে গৌরাঙ্গ
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ
একি মোর হৈল সখি॥
গগনে চাহিতে সেথানে গৌরাঙ্গ
গৌরাঙ্গ হেরি যে সদা।
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ চরণ
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥ (১)

"নয়নেহি গৌর গৌর গুণ শ্রবণেহি
বদনেহি গৌর কি নাম।
ভরমেহি গৌর চাঁদ বিনে লোচনে
হেরিয়ে, না হেরিএ আন॥
সজনি! গুরু গৌরব দূরে গেল।
তনু মন লোচন শ্রবণ রসায়ন
সবহুঁ গৌরময় ভেল॥
দূর সঙ্কে গৌর নাম যবে শুনিয়ে
চমকিয়ে অথিচল চিত।
না জানি একি এ অনুরাগে ঘটায়ল
গোরাচাঁদ সম্বিত।।
পতিক সোহাগ আণ সম লাগই
ধৈরজ ভেল উদাস।
নিশি দিশি গোই গোই কত রাপব
কহতহি নরহরি দাস।। (২)

প্রভুকে কি অবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহার এভাব হইয়াছিল, তাহাও তিনি একটী পদে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আরে মোর গৌর কিশোর।
নাহি জানি দিবানিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহু ভোর॥
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় ক্ষণে পহু কি সুধায়
কোথায় "আমার প্রাণনাথ"।
ক্ষণে শীতে মহাকম্প ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ
"কোথা পাই যাই কার সাথ"॥
ক্ষণে উর্দ্ধ বাহু করি নাচি বুলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ।
ক্ষণে আঁখিযুগ মুদে হা নাথ! বলিয়া কাঁদে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ।।
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌর হরি
রাধার পীরিতে হৈল হেন।

ঐ ছন ভাবিয়া চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হইনু মুই কেন ॥"

এই প্রকার তাঁহার মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত ও প্রভুকে যখন যে অবস্থায় দর্শন করিতেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-বিষয়ক পদের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রথমেই শ্রীবাসুদেব ঘোষ তাঁহার দৃষ্টান্ত-অনুসরণ করেন। এ সম্বন্ধে বাসু ঘোষ, লিখিয়াছেন—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিতে মুই ইচ্ছা কৈনু মনে ॥"

ক্রমে গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ গৌরলীলা বিষয়ক বিবিধ পদ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে যে কত অতুল রত্নরাজি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

সরকার ঠাকুর নবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর ব্রজলীলার একজন প্রধান সহায় ও প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন। প্রভুর শরীরে যখন শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণের ভাব প্রকাশ হইত, নরহরিও তখন সখীভাবে আবিষ্ট হইয়া লীলার পুষ্টি-সাধন করিতেন। এই মাধুর্য্য লীলার উল্লেখ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটী পদে লিখিয়াছেন ঃ—

"বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচী-নন্দনে
চৌদিকে রূপ পরকাশ।
বামে রহু পণ্ডিত প্রিয় গদাধর
দক্ষিণে নরহরি দাস ॥
গৌরাঙ্গ অঙ্গেতে, কণক কদম্ব জিনি,
ঐছন পুলক আভা।
আনন্দে বিভোর ঠাকুর নিত্যানন্দ
দেখিয়া গৌরাঙ্গ শোভা ॥
যাহার অনুভব সেই সমুঝই
কহনে না হয় পরকাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥"

শ্রীজগনানন্দ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—

"দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
গদাধর সঙ্গে সঙ্গে সদাই বিহরে ॥
বামে গদাধর দক্ষিণেতে নরহরি।
সুরধনী তীরে দুহ নাচে ফিরি ফিরি ॥
কিবা সে বিনোদ বেশ, বিনোদ চাতুরী।
বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী ॥
দেখিতে দেখিতে হিয়ার সাধ লাগে হেন।
নয়নে অঞ্জন করি সদা রাখি যেন ॥
কহয়ে জগদানন্দ গোরা প্রেমকথা।
সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের সুখসঙ্গ লাভ করিয়া, গৌরলীলামৃত তিনি যতই পান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সাধ হইতে লাগিল যে, এ মাধুরী জগজ্জনের মধ্যে বিতরণ করেন, প্রভুর লীলা বঙ্গভাষায় গ্রন্থকারে লিখিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেন। কিন্তু মনোসাধ পূর্ণ করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। কতদিন গৌরলীলা লিখিতে বসিয়াছেন, ভাবিতেই বিভোর হইয়া পড়েন, প্রায় কিছুই লিখিতে পারেন না। তাই একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"গৌরলীলা দরশনে বাঞ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুই অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
সে গ্রন্থ লিখিবে যে এখনও জন্মেনি সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাইবে প্রভু ॥
গৌর গদাধর-লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন ॥

কিছু কিছু পদ লিখি   যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ   ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥"

এই ভবিষ্যৎবাণী কালে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর, শ্রীঘনশ্যাম দাস ঠাকুর প্রভৃতির রচিত বিবিধ ভাষা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-মাধুর্য্যে ও কবিতা-কদম্বের সৌগন্ধে সমগ্র বঙ্গদেশ একেবারে পরিপূরিত হইয়া গেল।

ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর নিত্য নূতন খেলা, নিত্য নূতন আনন্দ। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে হঠাৎ নবদ্বীপের সে সুখের হাঠ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি পাঁচ ছয়টী কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই সঙ্গে যাইতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু প্রভু কাহারও কথা শুনিলেন না। তবে যাওয়ার সময় সকলকে এই কথা বলিয়া গেলেন যে—

"কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥"

প্রভু নীলাচল গমনান্তর দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করিয়া রথযাত্রার কিছু পূর্ব্বে পুনঃ নীলাচলে আগমন করিলে, এই সংবাদ অবগত হইয়া ভক্তগণ প্রভুর দর্শনার্থ নীলাচল গমন করিলেন। নরহরির সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস ও ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনও চলিলেন। এই দুইজন মহাত্মাও শ্রীভগবানে অচল ভক্তিপরায়ণ ও গৌরচন্দ্রের একান্ত কৃপা-পাত্র ছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"খণ্ডের মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, মুখ্য এই তিন জন॥"

রথোৎসবের পর, কিছু দিন পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া, ভক্তগণকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য বিদায়দানকালে মুকুন্দ, রঘুনন্দন ও নরহরিকে প্রভু যে কয়টী কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তাহার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণের প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥
এক দিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গীতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী।
রাজার শিরোপরি ধরে এক ভৃত্য আনি॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
রাজার জ্ঞান, রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি।
মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দের হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে॥
মুকুন্দের কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইহাঁর অন্যত্র নাহি মন॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে॥"

নরহরি বড় আশা করিয়াছিলেন যে, প্রভুর নিকট অবস্থান করিবেন; কিন্তু কি করেন, প্রভুর যে আজ্ঞা নাই; তাই নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। গৌরবিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে একবারে অসহ্য, এজন্য নিজ বাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গের দারু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় ভক্তগণ সমভিব্যহারে নীলাচল যাইয়া চারি মাস কাল প্রভুর নিকট অবস্থান করিতেন। অবশিষ্ট সময় শ্রীবিগ্রহের সেবা ও গৌরলীলা আলোচনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধানের পর যে কিছুকাল ছিলেন, সেই "গদাধরের প্রাণনাথ নরহরির জীবন" গৌরবিরহে তাঁহার যে কি প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তিনি লোকলীলা সমাপন করেন। এই তিরোভাব তিথির আরাধনা উপলক্ষে রঘুনন্দন ঠাকুরের উদ্যোগে শ্রীখণ্ড গ্রামে এক মহামহোৎসব হয়। তাৎকালিক প্রায় সমস্ত মহান্ত উপস্থিত হইয়া এই উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গ-লীলা বিষয়ে পদলেখকগণের মধ্যে নরহরিই আদি প্রবর্ত্তক ও সকলের পথপ্রদর্শক। নরহরির পদগুলি মাধুর্য্য-রসের আকর বলিয়া, কি বৈষ্ণব মহান্ত, কি সাহিত্যসেবী সকলের নিকটই পরমাদরনীয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়ার নরহরির আগ্রহও একটী প্রধান কারণ। নরহরি হইতেই শ্রীলোচনদাসকে ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ পাইয়াছি। গ্রন্থ সম্পাদনে, সরকার ঠাকুরের নিকট যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, একথা লোচনদাস চৈতন্য মঙ্গলে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

"তাঁর পদ পরসাদে এ পথের প্রতি আশ।
গৌর গুণ কহিবারে করোঁ অভিলাষ॥
* * * * *
তাঁহার প্রসাদে যে বা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥"

সাহিত্য-সমাজে নরহরির অতুল প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব মহান্তগণের মধ্যেও উচ্চ সম্মান। শ্রীব্রজধামের মধুমতী সখী বলিয়া ভাগবত-মণ্ডলীর নিকট তিনি পূজিত হইয়াছিলেন। যথা শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—

"পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত পদ্যে—

"শ্রীবৃন্দাবনবাসিনে রসবতী রাধা ঘনশ্যাময়ো
রাসোল্লাস রসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যাপুরা।
সেয়ং শ্রীসরকার ঠকুর ইহ প্রেমার্থিতঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দ মহোদধি বিজয়তে শ্রীখণ্ড ভূখণ্ডকে॥"

সরকার ঠাকুর বিবাহ করেন নাই। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর হইতেই তাঁহার বংশ রক্ষা হয়। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি শ্রীখণ্ড গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

ভালবাসা।

কি বলিলে ?—ভালবাস মোরে ?
—ছি ছি দেবি ! বল'না ব'লনা!
ভালবাসা স্বরগের সুধা—
তার মাঝে নাহিত কামনা !

দেবতার অমূল্য প্রসাদে
ধন্য যদি তোমার জীবন ;
তবে কেন সংসারের হাটে
খুঁজিতেছ অসার মিলন ?

মুখে মোরা বলি "ভালবাসি,"—
পূজি মনে বাসনার ছবি,—
নদীজলে মিছা ছায়া হেরে,
ভাবি তারে আকাশের রবি।

সত্য যদি তবে ভালবাস,
যোগ্য দাস নহেত তোমার ;
ক্ষীণ প্রাণ—দুর্ব্বল হৃদয়
পাপে ম্লান জীবন অসার ;

সামান্য মলয়-বায়ু কোপে
এ লতা যে লুটায় ভূমিতে ;
ঝঞ্ঝাবাত—বজ্রাঘাত প্রভা
এ কি কভু পারে গো সহিতে ?

পায় ধরি যাও দেবি, ফিরে—
প্রলোভনে ফেল না আমায় ;
নন্দনের পারিজাত তব—
দাও তুলে দেবরাজ পায়।

শ্রীবিজয়কুমার সেন।

আসিয়ো *

নিদাঘে হইয়ো তুমি যুথিকার পরিমল,
বরষায় হইয়ো জলধার ;
শরতে হইয়ো ফুল্ল প্রস্ফুটিত শতদল
চন্দ্রমল্লি হায়ণে আবার।
শীতে কুন্দ হয়ে এসো শুভ্র হৃদিখানি লয়ে,
বসন্তে হইয়ো কুহুস্বর,
প্রভাতে আসিয়ো কবি উষার মাধুরী হয়ে,
নিশিতে হইয়ো সুধাকর।
জীবনে হইয়ো তুমি প্রেমমাখা হরিনাম,
মরণেতে জাহ্নবীর জল ;
ধরার সুষমা যত ধুয়ে দেবে আঁখি-লোর
মিশে রবে তোমাতে কেবল।
স্বজনের পর পারে যাইব সকলে যবে—
দেবগীতি হয়ো তুমি ভাই,
জনমে জনমে যেন স্বরগে মরতে আসি
কবিবর, তব দেখা পাই।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আবাহন।

তুমি কোথা হে, তুমি কোথা হে—
পরাণ বঁধুয়া আমারি ?
তুমি কবে চলে গেছ,
কবে কোন্ কালে,
জানি না জগতবিহারি !
কবে কোন্ রাসকালে,
খেলিতে খেলিতে,
হয়েছিল কোন্ অপরাধ,

---

* সুকবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের "আসিব" নামক সুন্দর কবিতার উত্তরে।

তাই জনমে জনমে
লইতেছে শোধ
মিটাতেছ প্রিয়, মনোসাধ।
তাই লুকায়ে লুকায়ে
হৃদয়-কাননে,
বাজাও কখন বাঁশরী,
আর তোলপাড় করি
প্রতিধ্বনি উঠে,
কাঁদে এ পরাণ ফুকরি।
কভু নাচ গো মধুর,
বাজে গো নুপুর ;
রাতুল চরণ-চালনে।
আর আশা যমুনায়
ঢেউ বেড়ে যায়—
পাবন পরশ স্মরণে।
ছোটে ইন্দ্রিয়-গোপিনী
দলে দলে দলে,
নগন মগন হরষে,
কোথা কোন্ কুঞ্জতলে
ভেটিবে তোমায়
কোন্ বকুলের পারশে।
কিন্তু বিরহ-বিধুরা
ভকতি রাধার
উঠিতে শকতি নাই গো,
সে যে ধুলায় লুটায়ে
কাঁদিছে কেবলি
‘কোথায় কেমনে পাই গো’!
সে যে মরণ-দুয়ারে
তোমারে ভাবিয়া,
ভাবিয়া তোমারি চরণে,
যদি তুমি দয়া ক’রে
নাই দেখা দেও,
বাঁচিবে সে বল কেমনে?
তাই ওগো শ্যামরায়,
জীবন-বেলায়
দাঁড়াও বারেক আসিয়া,
এই মরিতে মরিতে
তোমারে হেরিতে
উঠুক সে পুন বাঁচিয়া।
পুন আকুল পুলকে
বিথারিয়া বাহু
ধরুক রাধিকা তোমারে ;
দুয়ে হও এক মিশি
জলবিন্দু লয়,
হ’ক, দেখি পুন পাথারে।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

নিত্যকৃষ্ণ। *

সাহিত্য-কাননে বেড়াতে বেড়াতে
শোভাময়ী উষাকালে,
বিরহী সাজিয়া বসিতে তোমায়
দেখেছি মাধবীতলে ;
বীণাটী লইয়া ক্ষীণ মৃদু স্বরে
গাহিতে বিষাদ গান,
“হোক উদ্‌যাপন জীবনে মরণ ব্রত”
উঠিত বীণায় তান।
‘মোহ-তাপহরা” রজত যামিনী
দেখাতে তোমার ছবি ;
‘ভুল” উন্মাদিনী ঘোষিতে তোমায়
চিনেছি তোমায় কবি!
মাধবীর তলে শূন্য সে আসন,
নাহিকো বীণাটী আর ;—

---

* কোন্নগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সাহিত্য, প্রদীপ ও নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকার সুলেখক বাবু নিত্যকৃষ্ণ বসু এম,এ, ২৯শে আষাঢ়, ১৩০৭ স্বর্গলোকে মন করিয়াছেন।

ঝঙ্কার তাহার দিক্‌দিগান্তরে
দিতেছে প্রেমের হার।
স্মৃতি-স্তম্ভ তব রহিল দেবতা
সাহিত্য-কানন মাঝে,
ত্রিদিবে গিয়াছ, মিলে সাথী সব
পূজিছ ত্রিদিবরাজে;
আবেগ লেখনী হৃদয়ের কথা
লিখিয়াছ কত কবি,
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে বিতরিছে জ্যোতি
তোমার প্রতিভা-রবি।
শূন্য করি বঙ্গ-কবিতা-কানন
চলে গেছ কবি! এই—
নয়’নেতে জল ঝরিছে নীরবে,
দীর্ঘশ্বাস উঠে তাই।
“সাহিত্য,” “প্রদীপ,” প্রদীপ হারালো
জ্বলে না এ দীপ আর,
কি দিব তোমায় শুধু অশ্রুধার
লও দেব, উপহার।

শ্রীগয়াপ্রসাদ গিরি।

মাদ্রী।

(১)

রজনী আমার আঁধার নিত্য,
নিয়ত পোহায় রোদনে;
সুখের শয়নে যৌবনে আমি মলিনা।
প্রেমভরা এহি বক্ষের তুঙ্গিমা
সোহাগ রঙ্গিমা বদনে,
আপনা বিষাদে হবে কি বিজনে বিলীনা?

(২)

রঞ্জিতে আঁখি রঞ্জনে যত
অঞ্জন পরি নয়নে,
অশ্রু-সলিলে কপোলে ঢালে সে কালিমা।
গন্ধ-সলিল-সিক্ত কবরী
এলাইয়া পড়ে শয়নে,
বিরাজে শুধুই কুন্তল-তলে নীলিমা।

(৩)

গন্ধরঙ্গ যত মাখিগো হরষে
উরসে কপোলে যতনে,
লুণ্ঠিত মম অঞ্চলে যায় পুঁছিয়া।
তাম্বুলরাগ মিলায় অধরে,
সীধুর সুরভি বদনে;
যায় রে রজনী বৃথা প্রসাধন রচিয়া।

(৪)

তৃষিত কণ্ঠে প্রেম পিপাসায়,
শোভে সরোবর অদূরে,
বাড়ায়ে স্নিগ্ধ সলিল-দৃশ্যে যাতনা।
অঙ্গ পরশি উড়িছে ভৃঙ্গ,
নাহি করে পান মধুরে;
গুঞ্জরে শুধু জাগায়ে কুসুমে চেতনা।

(৫)

মন্থন করি জীবনসিন্ধু
উঠে যে প্রেমের অমৃত,
কেবা নাহি চায় করিবারে পান ভুবনে?
নবীন যৌবনে পতি হে আমার
প্রেমে উদাসীন সতত!
মন্মথসাজে তেয়াগী কুসুম-কাননে।

(৬)

নব মধুমাসে জীবন-কুঞ্জে
যৌবন উঠি ফুটিয়া
আপনা গন্ধে আপনি অন্ধ হইল।
উছলি সিন্ধু অকূলে ক্ষুব্ধ—
বেলাভূমে পড়ে লুটিয়া;
লহরী-ভঙ্গিমা লহরী-লীলায় ফুরাল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৪। বৈশ্য। শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সম্পাদিত, মূল্য ১৲। তাম্বূল বণিক বা বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস। ১৩০৪ সালে "বাঙ্গালী বৈশ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে মহাজন-বন্ধুর অতিরিক্ত সংখ্যায় "তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুই প্রবন্ধ একত্র করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাম্বূলী বৈশ্যদিগের অনেক জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৫। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু-প্রণীত, মূল্য ১।০। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এরূপ প্রমাণ পুস্তক অনেক আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের আর নাই। হিন্দুধর্ম্মের গ্রন্থ সমূহ বিশাল সমুদ্র বিশেষ; সমস্ত শাস্ত্র একজনের পড়িয়া উঠা কঠিন। আমরা জানি না, পূর্ণবাবু তাহা পারিয়াছেন কি না। পূর্ণ বাবু একজন চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং বলা বাহুল্য যে, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেক বাক্য বাগীশ প্রচারক অপেক্ষা পূর্ণবাবুর দ্বারা এদেশের অনেক মঙ্গল হইতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকখানি তাঁহার প্রভূত চিন্তা ও গবেষণার ফল। আমরা আশা করি, এ গ্রন্থের এ দেশে বিশেষ আদর হইবে।

১৬। পুরী যাইবার পথে। ডাক্তার রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, এম, বি, এফ, সি-এস সঙ্কলিত। পুস্তকখানি সরল এবং সুললিত ভাষায় লিখিত। পড়িয়া সুখী হইলাম।

১৭। বেদ-সংহিতা। শ্রীমধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত। মূল ও টীকাসহ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"মহানুভব শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, তদীয় হিন্দুশাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, বেদের সংহিতা ভাগ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অথর্ব্ববেদীয় অংশ ভিন্ন অন্য সকল অংশই আমি পয়ারাদি প্রচলিত ছন্দে অনূদিত করিয়াছি। তদ্ভিন্ন ঋগ্বেদ হইতে আরও ১০টী সূক্ত গ্রহণ করিয়া ঋগ্বেদীয় ভাগে ৫০টী সূক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছি। শুক্ল যজুর্ব্বেদ হইতেও রুদ্রাধ্যায়ের ১৬টী মন্ত্র অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের ৫টী সূক্তের Griffith's অনুবাদ আমাকে রমেশ বাবু ইংলণ্ড হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা আমি এখানে মূলের সহিত ঐক্য করিয়া পদ্যে পরিণত করিয়া এই গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়াছি।"

বেদ-সংহিতার কঠোর ভাষাকে সুললিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকার সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এজন্য মধুসূদন বাবুকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতের শিক্ষা। (৪)

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখন কোন্ ভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—পূর্ব্ব দুই প্রস্তাবে তাহারই বিষয় যথাযথ আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, যখন আমাদিগকে অর্থকরি বিদ্যাই শিখিতে হইবে,—অর্থকরি বিদ্যাশিক্ষা না করিলে আমাদের ন্যায় পরাধীন দরিদ্র দেশবাসীর মঙ্গল নাই, তখন বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে ভাবে সেই অর্থকরি বিদ্যা শিখিতেছি, এ ভাবে শিক্ষা না করিয়া, আমাদের প্রস্তাবানুসারে দেশের শিক্ষা সংস্কার করিয়া সাহিত্যাদি সুকুমার বিষয় বিশেষের সহিত বিবিধ প্রকার শিল্প ও কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিলে, এই হতভাগ্য দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। বর্ত্তমান কালে দেশের যে দুরবস্থা,—হা অন্ন, হা অন্ন রবে দেশে যে হাহাকার উঠিয়াছে, শৈশব হইতে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে দেশের লোকের যে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, তাহাতে শিল্প ও কৃষির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে আমাদের এই পতিত ভারতের এবং ভারতবাসীর আর মঙ্গল নাই। আমাদের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংস্কার করিলে একদিকে শৈশব হইতে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গের হাত হইতে স্বদেশবাসীরা রক্ষা পাইবেন, এবং কৃষি শিল্পাদি প্রচুর পরিমাণে শিক্ষার দরুণ কতকটা শারীরিক পরিশ্রমে নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হইবে—সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। আবার অন্য দিকে আমরা বৎসর বৎসর বিবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পাদি দ্রব্যের জন্য যে বিপুল অর্থ বিদেশীয় বণিকদিগের চরণতলে উৎসর্গ করিয়া আসিতেছি, দেশের লোকদিগকে শিল্পাদি বিদ্যায় শিক্ষিত করিলে, আমাদের সে অর্থটা সমস্ত না হউক, কতকাংশ যে বিদেশীয় বণিকদিগের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতি বৎসর বিদেশীয় শিল্প দ্রব্যাদির জন্য আমাদের ব্যয়িত অর্থের যতটা আমরা দেশে রাখিতে পারিতাম, আমাদের হাহাকার—আমাদের নিত্য অন্নকষ্ট ততটা কমিত,—ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। আমি এই সব বিবেচনা করিয়া দেশে যাহাতে কৃষি ও শিল্পের আলোচনা ও শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে হয়, তাহার জন্য স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মানসে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। এখন আশা করি, স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যার সম্যক্ আলোচনা করিয়া যাহাতে এ দেশের শিক্ষা-সংস্কার হয়, তাহার বিধিমত যত্ন ও চেষ্টা করিয়া হতভাগ্য স্বদেশবাসীর মঙ্গল সাধন করিবেন।

আমরা কোন্ ভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কার করা কর্ত্তব্য, তাহারই সম্যক্ আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাযথ আলোচনা করিয়া আমাদের এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদের আলোচ্য বিষয় কয়টীর মধ্যে :—

প্রথমতঃ—আমাদের প্রস্তাবানুসারে

শিক্ষা-সংস্কার করিতে হইলে কোন প্রকার ব্যয় বৃদ্ধি হইবে কি না? যদি ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তবে কোন্ পথাবলম্বন করিয়া সেই বর্দ্ধিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে?

দ্বিতীয়তঃ—আমাদের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা-সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে আমাদের বর্ত্তমান সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোন্ ক্ষতির কারণ আছে কি না? এবং প্রজা ও রাজ্য রক্ষার জন্য রাজার সে ক্ষতি স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি না?

তৃতীয়ত ঃ—যদি প্রস্তাবিত শিক্ষা সংস্কার কার্য্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হন, তবে আমাদের দেশের লোকের কি করা কর্ত্তব্য?

চতুর্থত ঃ—আমাদের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংস্কার করিয়া, এদেশীয়দিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার পর, আমাদের দেশীয় ধনশালীদের কর্ত্তব্য কার্য্য কি?

পঞ্চমত ঃ—বিদ্যা শিক্ষার সময় নিরূপণ, শিক্ষকাদি নিয়োগ এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য এবং পারিশ্রমিক ইত্যাদি বিষয় এবং পরিদর্শক কর্ম্মচারী সম্বন্ধে গোটাকত কথা।

ষষ্ঠত ঃ—উপসংহার।

এখন এই আলোচ্য বিষয় ছয়টীর মধ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা প্রথমটী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমাদের প্রস্তাবানুসারে এদেশের শিক্ষা সংস্কার করিলে, বর্ত্তমান কালাপেক্ষা ব্যয়াধিক্য হইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংস্কার করিলে বিশেষ ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে একটা জেলাস্কুল চালাইতে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়েই আমাদের প্রস্তাবিত একটা District Industrial school সুন্দররূপে পরিচালিত হইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সুসংস্কৃত শিক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকে মূলে পাঁচটী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু আমি মূল পাঁচটীকে আবার কতিপয় শাখায় বিভক্ত করিয়াছি। প্রস্তাবিতরূপে শিক্ষা সংস্কার করিলে, প্রত্যেক বিদ্যালয়েই যে সকলগুলি শাখা বিষয়ের অধ্যাপনা করাইতে হইবে,—এমন কোন কথা নাই। অনেকটা স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া, কতকটা বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। মনে করুন, আমি সাধারণতঃ শিল্প-শিক্ষা ষোড়শটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছি। এখন যে প্রদেশ যে প্রকার শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবার সম্যক্ উপযুক্ত, সেই প্রদেশে সেই প্রদেশের উপযোগী শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বলিতে পারি যে, বঙ্গদেশে রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা রেশমের জন্য চিরবিখ্যাত, সুতরাং ঐ তিন জেলায় শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবার সময় অন্যান্য শিল্প শিক্ষার পরিবর্ত্তে রেশম-পোলো পোষা, পোলো হইতে সূত্র বাহির এবং তদ্দ্বারা রেশমের বিবিধ প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করার কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে, পাবনা, ঢাকা ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি স্থান কার্পাস বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত, সুতরাং ঐ সব জেলায় কার্পাস, পাট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য হইতে সূত্র বাহির এবং তাহার দ্বারায় আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্ত্র ও উড়ানী প্রভৃতির নির্ম্মাণ কৌশল হাতে ও কলে

শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। পঞ্জাবপ্রদেশ পশম ও পশমী বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত, সুতরাং ঐ প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে আমাদের এই ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় শীতবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য পশম হইতে সূত্র বাহির করা এবং সেই সূত্রে নানা প্রকার শাল, আলোয়ান, জামিয়ার, লুই, চুসা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শীতবস্ত্র বুনন প্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আসাম প্রদেশ এণ্ডি ও মুগার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ,—সুতরাং আসাম প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে শিল্প শিক্ষা দিবার কালে এণ্ডি ও মুগার উৎকর্ষ সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঠিক এইরূপে, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিল্পবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; আর বিদ্যালয়ের আয় এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত একই বিদ্যালয়ে দুই তিন বা ততোধিক বিষয়ের শিল্পবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করায়ও কোন হানি নাই। আমরা শিল্পবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে যে পথ অবলম্বন করিতে বলিলাম, অন্যান্য শাখা বিষয় সম্বন্ধেও ঠিক সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে করুন, একটা জেলায় আটটা বা দশটা বিদ্যালয় আছে,—ইহার কোনটাতে ইংরেজী, বাঙ্গালা, চিত্রবিদ্যা, কোনটায় বা সংস্কৃত, কাষ্ঠ দ্রব্য তৈয়ার এবং গণিত বা ইতিহাস ভূগোল, অপরে ভাস্কর-কার্য্য (Sculpture) অথবা লৌহ-দ্রব্য (Iron works), বাঙ্গালা বা বিবিধ প্রকার রং প্রস্তুত প্রণালী, গণিত বা চিত্রবিদ্যা, ড্রইং, সর্ব্বেইং বা কৃষিবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ভাবে এক এক বিদ্যালয়ে এক এক বিষয়ের শিক্ষা-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব কম। তবে এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, যে স্থানে Industrial Education Council নামে সভা স্থাপিত হইবে, সেখানকার প্রধান বিদ্যালয়ে, সেই প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনার ব্যবস্থা রহিবে, সহরের এই প্রধান বিদ্যালয়েও ঠিক ততগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে পরীক্ষাদি গ্রহণ কার্য্য সুবিধাজনক হইবে—পরীক্ষা গ্রহণ কালে কোন প্রকার গোজালত বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

অতঃপর আমাদের প্রস্তাবানুসারে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান প্রথা অবলম্বিত হইলেও যদি বর্ত্তমান শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট ব্যয়াপেক্ষা ব্যয়াধিক্য হয়, তবে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া সেই বর্দ্ধিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে,—এখন তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রকৃতই যদি বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কার করিলে ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বর্দ্ধিত ব্যয়ের বহনভার, দেশ ও দেশের প্রজা রক্ষার জন্য, ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে, রাজারই বহন করা কর্ত্তব্য। ইংরেজরাজ আজ ভারতের অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত, রাজার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে রাজ্য এবং রাজ্যের প্রজা রক্ষা করা রাজার সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য এবং সেজন্য দীন হীন ভারতবাসী প্রজাদের উন্নতিকল্পে শিক্ষা সংস্কারের ব্যয় ভার বহন করাও রাজারই কর্ত্তব্য। তবে ভারতের রাজা বিদেশীয় লোক—বণিক প্রকৃতিক, সুতরাং রাজা নিজ হইতে এই বর্দ্ধিত ব্যয়ভার বহন না করিলে, রাজাকে এই ব্যয়ভার বহন

করাইতে বাধ্য করিবার শক্তি আমাদের নাই। আজ যদি দেশের লোক রাজা হইতেন, তবে বোধ হয়, এত দুঃখের কান্না আমাদিগকে কাঁদিতে হইত না। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে এখন আমরা পরাধীন, সুতরাং আমাদের দেশের সুখ দুঃখ, অভাব অনাটন প্রভৃতির অপনোদন করিতে হইলে একমাত্র ইংরেজ রাজের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; বরং রাজার উপর সম্যক্ নির্ভর না করিয়া স্বাবলম্বন দ্বারায় আমাদেরই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমূহ কর্ত্তব্য এবং এজন্য যদি কোন ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তবে স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমাদেরই তাহা বহন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি দেশের বর্ত্তমান সদাশয় ইংরেজ রাজ, রাজ্য ও প্রজারক্ষার জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষা কার্য্যের বর্দ্ধিত ব্যয়ভার প্রসন্ন চিত্তে বহন করিতে সম্মত হন, সেটা উত্তম কথা,—রাজার প্রশংসনীয় কর্ত্তব্য কাজ। আর যদি দরিদ্র ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদেশীয় ইংরেজ রাজ এই ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ অথবা অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে ব্যয়ভার বহনে অশক্ত বা অসম্মত বলিয়া, এই শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপে বিরত না হইয়া, যাহাতে এদেশ হইতে বর্দ্ধিত ব্যয়ের অর্থ সংগৃহীত হইয়া দেশের শিক্ষা-সংস্কার হয়, প্রবল প্রতাপ ইংরেজ রাজের তাহাই করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের লোকের বর্ত্তমানে যে শোচনীয় দুরবস্থা, দেশের লোকের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি ও একতার যে সম্যক্ অভাব—উদ্যমশীলতার সে অল্পতা, তাহাতে এই প্রভূত কল্যাণকর শিক্ষা-সংস্কার-কার্য্যের ভার আপাততঃ দেশের লোকের উপর না দিয়া যাহাতে রাজার হাতে থাকে—ইহাই সমধিক বাঞ্ছনীয়। তবে নিতান্তই যদি ইংরেজ-রাজ এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে না করেন, তখন অগত্যা দেশের কল্যাণার্থে কংগ্রেসেরই এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। এই কথা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

এখন দেশের লোকই হউন, আর স্বয়ং রাজাই হউন, যিনিই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন না কেন,কোথা হইতে এই অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ হইবে,—ইহারই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মতে দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-সংস্কার করিতে হইলে, বর্ত্তমান রাজনির্দ্ধারিত যে অর্থ ভারতের শিক্ষার্থে ব্যয় হইয়া থাকে, তদতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের দেশীয় জমিদার শ্রেণীর উপর "শিক্ষা-কর" বলিয়া একটা কর সংস্থাপন করিয়া, সেই অর্থে শিক্ষা-সংস্কার করা মন্দ নয়। দেশে যেমন পথকর, পূর্ত্তকর প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের কর আছে, সেইরূপ ভাবে দেশের লোককে দেশের বিলুপ্ত প্রায় শিল্পাদি বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা দিবার জন্য "শিক্ষা-কর" বলিয়া একটা কর সংস্থাপন করিয়া, তদ্দ্বারায়ই এই অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা মন্দের ভাল। তবে এই 'শিক্ষা-কর' সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে একটা কাজ করিতে হইবে। দেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান কালে এদেশের অধিকাংশ জমিদার অমিতাচারী। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কর ছাড়া, অধিকাংশ জমিদার আপনাদের পাপ বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য এবং নানা প্রকার পাপ কার্য্য সাধনোদ্দেশে অহরহ দীন হীন প্রজাদের হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিতেছেন,— নানা প্রকার আবওয়াবের

জ্বালায় দীন হীন প্রজাবর্গ এক প্রকার অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় নূতন কর স্থাপনের কথা মুখে আনিতেও ভয় হয়,—পাছে আমাদের ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই সাধিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের যে দুরবস্থা, দেশে শিল্পাদি লোপের সহিত সতত যে হা অন্ন, হা অন্ন, রব উঠিয়াছে, তাহাও নিবারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য,—এইসব কারণে বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কার করিয়া প্রচুর পরিমাণে শিল্পাদি শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচার করা বড়ই আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই শিক্ষা সংস্কার জন্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অগত্যা পক্ষে 'শিক্ষাকর'সংস্থাপনও যে কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই,প্রকাশ্যে না হউক,অন্তরে অন্তরে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বিশেষ প্রয়োজনীয় "শিক্ষাকর'' সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের দুইটী বিষয়ে বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, যে ব্যক্তির জমিদারীর মুনাফা (অবশ্য শুধু রাজস্ব বাদ) বার্ষিক পাঁচ শত টাকার ন্যূন, তাঁহাকে এই শিক্ষাকর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ,—এই কর এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে, এই কর একমাত্র জমিদারেরাই আপন আপন মুনাফার (অবশ্য শুধু রাজস্ব বাদ) উপর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট হারে দিতে বাধ্য হইবেন। এবং করদাতা জমিদার তাঁহার দেয় এই শিক্ষা-করের কোন অংশ কোন প্রকারে দরিদ্র প্রজার উপর জোর জুলুম করিয়া আদায় করিতে না পারেন, সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং মহল বিশেষে কোথায়ও ইহার নিয়ম ভঙ্গ হইলে তাহার সমুচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের এই প্রস্তাবটা শুনিয়া হয়তঃ অনেক জমিদার-শ্রেণী আমাদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিবেন, কিন্তু স্থির ও ধীর চিত্তে একবার ভাবিয়া দেখিলে আমাদের উপর রাগ করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাইবেন না। কেন না, লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মহিমায় দরিদ্র প্রজার কোন হিত না হইলেও, বাঙ্গালার জমিদার শ্রেণীর যে প্রভূত উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দেশের এমন জমিদারের অভাব নাই যে, যাঁহারা সামান্য রাজস্ব দিয়া, প্রচুর অর্থ উপভোগ করিতেছেন। তারপর নানা প্রকারে ছলে বলে দরিদ্র প্রজার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। এমন অবস্থায়, দরিদ্র দেশের দরিদ্র প্রজার সুশিক্ষার জন্য, দেশের অধিকাংশ দীন হীন প্রজার হাহাকার নিবারণ জন্য দেশীয় জমিদার শ্রেণীর উপর "শিক্ষাকর" স্থাপন করিলে, ইংরেজ রাজের কোন নিন্দার কারণ নাই, বরং এই কর হইতে জমিদারের দীন হীন প্রজাদিগকে অব্যাহতি দান করিলে অনন্ত যশ ও অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয়েরই কারণ হইবে,—ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের দেশের অর্থশালী ব্যক্তিরা আপন ইচ্ছায় দেশের কোন মহৎ কার্য্যে কখনই হস্তক্ষেপ করিবেন না,—ইহা স্থির নিশ্চয়; যদি করিতেন, তবে এ দেশে কখনই এত হাহাকার উঠিত না,—দেশের এতদূর অধঃপতন হইত না। তাই দেশের মঙ্গলার্থে এই মহৎ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দরিদ্র ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ

করিয়া, যদি দেশের শিক্ষার আমূল সংস্কার করেন,—দেশের লোককে দেশের রীতি নীতি অনুসারে বিবিধ প্রকার শিল্প ও প্রচুর পরিমাণে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা দেন, তাহা হইলে দেশে যে একটা ঘোর হাহাকার উঠিয়াছে,—অচিরেই এই হাহাকারের শেষ হইবে। এই যে শস্য-শ্যামলী ভারতভূমি বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া দেশকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ, দেশে শিল্প শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব; এবং যতদূর বুঝিতেছি, ভারতের বিলুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে,—দেশের এই নিত্য দুর্ভিক্ষ, নিত্য হাহাকার, নিত্য লোক-ক্ষয়ের কোনই প্রতিকার হইবে না। ক্রমশঃ। শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড কি প্রক্ষিপ্ত ?

এই প্রশ্নের উত্তর রামায়ণ হইতেই পাওয়া যায়। লঙ্কাকাণ্ডের শেষাংশ পাঠ করিলেই উত্তরাকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে কাহারও মনে অনুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালে কাব্যাদি গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্ব্বে তৎগ্রন্থ পাঠের ফল ও উপকারিতা বর্ণন করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। লঙ্কাকাণ্ডের শেষ অধ্যায়ের শেষ ভাগে রামায়ণ পাঠের মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। যদি লঙ্কাকাণ্ডই রামায়ণের শেষ না হইত, তবে উহার শেষ ভাগে উক্ত কাব্য পাঠজনিত ফলের আলোচনা কখনও দৃষ্টিগোচর হইত না।

বাল্মীকির রচনা-কৌশলের প্রতি অনুধাবনা করিলে লঙ্কাকাণ্ডেই রামায়ণ কাব্য শেষ হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে। মহাকাব্য-প্রণেতা কখনও আদর্শ নায়ক ও নায়িকাদিগের কার্য্যকলাপের ধারাবাহিক দৈনন্দিন-লিপি লিখিয়া কুতুহলী পাঠকের পাঠ-কণ্ডূয়ন চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না, "তাহার পর কি হইল" এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কি কোন কালে কেহ কোন গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন? তিনি দেশ কাল বিবেচনা করিয়া লঙ্কাকাণ্ডেই তাঁহার অমৃতময় আদি কাব্য শেষ করিয়াছেন। রাবণ বধের পর রামের সস্ত্রীক অযোধ্যা গমন, তথায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক এবং তদনন্তর বহুকাল পর্য্যন্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে রাজ্যপালন ইত্যাদি যেরূপ ভাবে লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ অপরিসমাপ্তি দোষ পরিলক্ষিত হয় না।

উত্তরাকাণ্ডের শেষেও রামায়ণ পাঠের ফল বিশেষভাবে লিখিত আছে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে উভয় ফল বর্ণনার মধ্যে একটী গুরুতর পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। লঙ্কাকাণ্ডের শেষ অধ্যায়ের শেষ ভাগে একটী শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "ক্ষত্রিয়গণ অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে ঐশ্বর্য্য ও পুত্র লাভ করিবে।" উক্ত অধ্যায়ের অন্যান্য শ্লোকেও স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রামায়ণ অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার নিজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু উহার কোনও শ্লোকে উত্তরাকাণ্ডের ন্যায় ভূমি, সুবর্ণ, ধেনু,

বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ, শয্যা, আসন প্রভৃতি দান করিবার ও চব্য চূষ্য দ্বারা ষোড়শোপচারে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয় নাই। লঙ্কাকাণ্ড যৎকালে রচিত হইয়াছিল, তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রালোচনা, জপ, তপ, হোমাদি ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য ছিল না। তখন তাঁহারা আধ্যাত্মিক গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বিষয়-সুখ অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিতেন, বনের ফল মূল ভোজনে নানা ঐহিক কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিয়া তপোবনে মহা সন্তোষে অবস্থান করিতেন, তাঁহাদিগের বিশাল ও প্রশান্ত অন্তঃকরণে আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন ঐহিক সুখের কামনা স্থান পাইত না। পক্ষান্তরে উত্তরাকাণ্ডের রচনার সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ক্রমশঃ অধঃপতন হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্ম জগতের চক্রবর্ত্তীত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্থিব রাজত্বের প্রতি অধিকতর স্পৃহাবান হইয়া ভূমি সম্পদ লাভের জন্য যেমন প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাই উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও শয্যা লাভের জন্য যেমন লালায়িত হইতেন, তেমনি মহামূল্য ভক্ষ্য ও ভোজ্যের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয় সময়ের অবস্থা তুলনা করিলে কোন লুব্ধ ব্রাহ্মণ কবি দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধঃপতনের সময় উত্তরাকাণ্ড পরিশিষ্টাকারে রচিত হওয়াই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে।

উত্তরাকাণ্ডের রামায়ণে শ্রবণবিধি নামক অধ্যায়ে লিখিত আছে যে "সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ করিলে যে ফললাভ হয়, রামায়ণের এক অধ্যায় পাঠ করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গাদি সরিৎ ও প্রয়াগাদি তীর্থে স্নান, নৈমিষাদি অরণ্য ও কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ কারণে যে ফল হয়, রামায়ণ শ্রবণেও সেই ফললাভ হইয়া থাকে।"

এই শ্লোক বাক্য দ্বারা রামায়ণ কাব্যের গৌরব যতদূর বৃদ্ধি না হউক, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ সাধারণের অর্থাগমের যে একটী অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত অধ্যায়ে দুইবার কুরুক্ষেত্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ শব্দের উল্লেখ দ্বারাও উহার প্রক্ষিপ্ততা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। হিন্দু সাধারণের প্রচলিত মতানুসারে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাই উহাতে কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ থাকা অসম্ভব।

উত্তরাকাণ্ডের বর্ণিত বিষয় দ্বারা রামায়ণের গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই, বরং উহা দ্বারা মহাকাব্যের মাহাত্ম্যের হ্রাস হইয়াছে। রাম যেরূপ প্রজারঞ্জন-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনাথা সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজারঞ্জন-স্পৃহা দ্বারা উত্তরকালে প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধিত না হইয়া তাহাদের অহিত সাধিত হইয়া থাকে। এরূপ প্রজারঞ্জন-স্পৃহা সভ্যসমাজ কখনও অনুমোদন করিবেন না। উত্তরাকাণ্ডের বর্ণিত রাবণ কর্ত্তৃক রম্ভাধর্ষণ ও তাহার প্রতি নলকুবেরের অভিশাপ গল্পের দ্বারা সীতার স্বাভাবিক সতীত্ব তেজের প্রভাব অনেকটা লাঘব হইয়াছে বলিয়া চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এই উত্তরাকাণ্ড শ্রীরামকে যেরূপভাবে বিষ্ণুর অবতার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং যেরূপভাবে তিনি লক্ষ্মণ বর্জ্জন করিয়া স্বয়ং বানর, ভল্লুকাদিসহ সরযূ জলে নিমজ্জিত হইয়া আত্মহত্যা

করিলেন, তাহা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া কখনও পরিগৃহীত হইবে না।

এই সমুদায় ও অন্যান্য গল্পের অংশ পর্য্যালোচনা করিলে রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পাঠক সাধারণের প্রতীতি জন্মিবে। পুরাকালে অজ্ঞাতনামা কবিগণ আপনাপন রচনা কোন উৎকৃষ্ট কাব্যে সংযুক্ত করিয়া দিতে ভালবাসিতেন। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবেই উহা সহজে সম্পন্ন হইত। এইরূপে ষড়কাণ্ডযুক্ত রামায়ণ মহাকাব্যের নানা স্থান প্রক্ষিপ্ততা দোষে দুষ্ট হইয়াছে। যবদ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেস্থানের রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডের অস্তিত্ব নাই, ইহা দ্বারাও উহার প্রক্ষিপ্ততা সুন্দররূপে প্রমাণিত হয়। শ্রীকুমুদকান্ত বসু।

মুন্সেফ, পটুয়াপালি।

দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তা।

দর্শন চিন্তার মূলে প্রকৃত সত্য কি ?—চিৎ বা চৈতন্য। * যাহাকে তত্ত্ববিৎ ঋষিরা চিচ্ছক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাই "অহং ব্রহ্ম-অদ্বৈতবাদ তত্ত্বের বীজ। অসীমে-সসীমে অভেদ ভাব ধরিয়া যে অদ্বৈতবাদ—বস্তুতঃ তাহাতে সবিরোধী মতই প্রবল করে। কেননা, শৈত্য ও উত্তাপে সম্মিলন যেমন বিভীষিকাময়, তেমনি নিরাকারে সাকারের মিশ্রণে অদ্বৈতবাদও বিষম ভয়াবহ। শাস্ত্রের বিচার-বিভাগের যে অংশেই উপনীত হউন না কেন, একদিকে দেখিবেন, চিন্ময় শক্তিই সর্ব্বাধারে অভেদাত্মা নিত্য, অপর দিকে বুঝিবেন, ঐ অভেদাত্মাই আবার প্রত্যেক শরীরাধারে খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সুতরাং স্থূল ও চৈতন্যের সমদৃষ্টির সামঞ্জস্য হওয়া অতীব অসম্ভব। এ জন্যই সাম্যবাদীরা বলেন, আধ্যাত্মিক চক্ষুর দৃষ্টিতে কখনই জড় ও চিৎতত্ত্বের সহিত সাম্য দৃষ্টি হয় না। নিরাকার আত্মাই যখন জীবভাবে অভিহিত, তখন জড় ও জীবে দর্শন-বিপ্লব ত হইবেই হইবে। এইরূপ অসামঞ্জস্য বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া বিড়ম্বিত হওয়া উচিত হয় কি ? স্থূল ও নিরাকারে যে পৌরাণিক বিরাটাদ্বৈতবাদ হয়, উহা ত যোগীর যোগের উপযোগী নহে। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের মতে স্থূলের অস্তিত্বই অসম্ভব। একমাত্র অনাদী নিত্য মহাশক্তিই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, এমত স্থলে স্থূল সংযোগে ব্রহ্ম নিরূপণ করা বস্তুতঃই সরল সত্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। উহাকে প্রকৃত জ্ঞানের মীমাংসাও বলা যাইতে পারে না। অসীম মহাশক্তির প্রকাশের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিই যোগ-বিভ্রাট।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এরূপ অকাট্য মীমাংসার স্থলে উপাস্য উপাসকভাবে দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তা, ইহা আবার কোথা হইতে আসিল ? নিরাকারেও যে ঐরূপ বৈষম্যের ব্যবস্থা দেখা যায়। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ মধ্যে দ্বৈতবাদটী কিরূপে আসিবে, এটীও যে একটী আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

---

* এক চৈতন্যই জ্ঞান বা জ্ঞাতৃরূপী ব্রহ্ম। ঋষিরা ঐ চৈতন্যকেই প্রকার ভেদে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চিৎশক্তিই আত্মা বা জ্ঞান—শরীরাধারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রভৃতির অনুভব করেন। জড়ীয় দেহপাত হইয়া গেলেও ঐ অনন্ত জ্ঞানই পূর্ণ থাকেন।

বর্ত্তমানে ঐ উভয় তত্ত্বের বিচার বিভ্রাট মিটাইবার নিমিত্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণ যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার ভিতরে ত কোন কথাই চলে না! যাহা হউক, একটুকু দেখাই কেন যাউক না, দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের সামঞ্জস্য আছে কি না? পঞ্চদশী বলিতেছেন।

> "মায়াখ্যায়া কামধেনু জীব বৎসেশ্বর বুভৌ
> যথেষ্ট পিবতাং দ্বৈতং অদ্বৈততত্ত্বমেবহি।"

হে দ্বৈতবাদী! মায়ারূপ কামধেনু, যাহার দুইটী বৎস একটী জীব ও একটী ঈশ্বর। তুমি ঐ গাভীর দুগ্ধ পান কর, কিন্তু অদ্বৈতবাদী অদ্বৈত তত্ত্বই ভোগ করেন।

তবে দেখুন, অদ্বৈতবাদী অদ্বৈততত্ত্বই ভোগ করেন। ইহাতে কি বুঝিব না যে, ঐ "ভোগ" কথাটীই ত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করিল। কারণ "ভোগ" শব্দের অর্থ, একটী অপরটীর ভাবে বা দর্শনে তৃপ্তি লাভ করে। দ্বৈতাদ্বৈতের কথাটা এখানে ঐরূপে মীমাংসিত হইলেও কিন্তু একটী আপত্তির কথা আছে, জীবের সৃষ্টত্ব ক্ষুদ্রত্ব ভাবের দ্বৈতভাবটীই পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তির বিশ্বাস ও মত। ইহা যদি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে পঞ্চদশীর "ভোগবাদ" হইতে যে দ্বৈত সমুদিত হইল, তাহা কি খণ্ড বুঝিব? না, তাহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? উহাকে অখণ্ড দ্বৈতবাদ রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদকে চৈতন্যাদ্বৈতবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা, চৈতন্যই "সোহহং" অথবা "ব্রহ্মাহং একমেবাদ্বিতীয়ং।" সেই পূর্ণ চৈতন্যাদ্বৈত হইতে দ্বৈততত্ত্বের বিধান যে কেন প্রকাশ পাইল, এ বিষয় মানব বুদ্ধির অতীত হইলেও, একটুকু চিন্তা করা প্রয়োজন হইতেছে। দ্বৈততত্ত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—একটী নিরাকার জীব ভাবে অখণ্ড দ্বৈত, যাহা প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। অপরটী স্থূল দ্বৈত। এই উভয়বিধ দ্বৈত তত্ত্বের মূলে, চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, উহাও মহাশক্তিরই অচিন্ত্য বিশ্বলীলার ব্যাপার। তবে জগতে যে বিভিন্ন দেহীর বিবিধ ভাবের ঘটনা সকল দৃষ্ট হয়, উহা কেবল ভ্রান্তিমোহাদি বিকার তত্ত্বের দ্বারা মানবের পরীক্ষা। স্থূল দ্বৈতভাবে নিরাকার অখণ্ড জীবদ্বৈত প্রচ্ছন্ন থাকাতে সাম্যভাব বিকাশ পায় না। কেন না, নিরাকার জীবদ্বৈতের অখণ্ড জ্ঞানটী স্থূল দ্বৈততত্ত্বের আবরণে তাহার স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রভা পরিস্ফুট হয় না। যেমন শ্বেতবর্ণের বস্ত্রখণ্ড নীলবর্ণে নিমজ্জিত হইলে উহার প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ পায় না, তাহার মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে, তেমনই স্থূল দ্বৈতের বিকার দোষে অখণ্ড জীবদ্বৈতকেও প্রত্যক্ষ করা সহজ নহে। ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা স্থলে অনেকে বলিতেও পারেন যে, দ্বৈত ভাবের স্বভাবই যখন ভেদ চিন্তায় গঠিত, তখন নিরাকার অখণ্ড জীব দ্বৈত ও স্থূল দ্বৈতের বিভিন্নতা ধরিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দ্বৈত তত্ত্বের অসীম বিচারের জন্য এত মাথা ঘুরাইবার প্রয়োজন কি? দ্বৈত শব্দইত ভেদ ভাবের কথা।

বাস্তবিক, ইহার মূলে একটুকু গভীর চিন্তারই প্রয়োজন। দ্বৈততত্ত্ব ভেদবাচ্য হইলেও, তাহার সম্বন্ধে অসাম্য ভাববিরুদ্ধ কোন কথা নাই। ব্রহ্ম ও জীব, এই নাম-ভেদ-জনিত কি কখন নিরাকার তত্ত্বের ব্যত্যয় হইতে পারে? চিৎ ও জ্ঞান, নামের ভিন্নতা সত্ত্বেওত মূল চৈতন্যের কোন বিন্ন

হওয়া দেখিতে পাই না! স্বরূপ ও ভাবের প্রকার ভেদেও ত দ্বৈতাদ্বৈতের কোন আপত্তি বিবেচনা হয় না। মানবীয় ভাবের উত্তেজনায় নিরাকার অখণ্ড জীব চৈতন্যকে যে দেহীর পার্থক্য নিবন্ধন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই মনে করেন না। বস্তুতঃই যে স্থূল দ্বৈতবাদের আবরণে মহাজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্তিমিত ভাবে দেখা যায়,কেহ ভুলেও তাহা স্মরণ করেননা, বরং পরিষ্কার সরল পথকে বন্ধুর বলিয়া মনে করেন। আহা! নিরাকার অখণ্ড জীব-দ্বৈতের মধুর লীলারস-মাহাত্ম্য যোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, অন্ধ জ্ঞানের শাসনেই সংসার সাম্যবিরোধী হইয়াছে। বাস্তবিক উহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, একমাত্র ভেদবিধায়িনী চিন্তা-প্রসূত ঐ নিরেট স্থূল দ্বৈতবাদই অধিদেবতারূপ অধিষ্ঠিত। উহা হইতেই নিরাকার ব্রহ্মচৈতন্য সাকাররূপী ব্রহ্ম হইয়া বহু দেববাদে আবদ্ধ আছেন এবং খণ্ড বিখণ্ড নানাপ্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি কল্পনায় পরিণত হইয়াছেন। তবেই দেখা যায়, ঈদৃশ বিপজ্জনক বিষয় মধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, স্থূল দ্বৈতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া অসাম্য ভাবে রাখিতেছে, কিন্তু অখণ্ড জীব-দ্বৈত-ভাবে তাহা কখনই সম্ভবে না। এ জন্য জীব-ভাবের নাম-ভেদাত্মক দ্বৈত-জ্ঞানকে স্থূল দ্বৈতের তুলনায় গ্রহণকরা হইতেই পারে না। অবশ্য, স্থূল দ্বৈততত্ত্বে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সম্বন্ধ আছে সত্য, ফলতঃ, তাহা মোহ বাসনাদির আবরণে আবৃত, সুতরাং উজ্জ্বল প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন সত্ত্বে কেবল বৈচিত্র্য তৃপ্তিরই আপাত মধুর লালসা-বৃদ্ধি হইতে থাকে।

একটুকু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, পরিমিত স্থূলতত্ত্বের আচ্ছাদনে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা পরিস্ফুট হইতে পারে না। উহা দ্বারা ভ্রান্তিভাব সমূহ বিকাশ হইতে থাকে। যেমন হিমাদ্রি-প্রস্থিতা গঙ্গার বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল স্থানবিশেষের মৃৎপদার্থের সংমিশ্রণে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, তেমনই ঐ উজ্জ্বল প্রজ্ঞাও বিকারতত্ত্বের সংস্পর্শে অন্ধতায় প্রচ্ছন্ন হয়। উহাকেই অনেকে অন্ধজ্ঞান বলিয়া থাকেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থার কোন ব্যত্যয় হয় না। গঙ্গার নির্ম্মল জলের ভাব সমভাবেই থাকে, কেবল মৃৎপদার্থের দূষিত পরমাণুই অস্বাস্থ্যের কারণরূপে পরিণত, ইহাকে কি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মনে করা যায় না? যাহা হউক, ইহা প্রকৃত মীমাংসা হইলেও বলিবার কথা আছে। পশু, পক্ষী, মানবাদির শরীরাধারে যে আত্মা বা চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছে, এ সকলও ত পৃথক্— পৃথিবী ইহাও ত বলিতেছে, এটী পশু-আত্মা, ওটী মানবাত্মা, ঐ কেমন সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাত্মা গুলি চলিয়া বেড়াইতেছে! ইহার উত্তরে স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, স্থূলভাবের প্রভাবেই তত্ত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং উহাতেই অন্ধতার পরিচয় দিতেছে। মানুষ, শরীরের আশ্রয় ধরিয়া আত্মার অখণ্ড শক্তিকেও খণ্ড করিতে ক্ষান্ত নহে। এস্থলে স্থূল দ্বৈততত্ত্বের ভ্রমপ্রমাদময় কার্য্যসমূহ সহজেই বুঝুন, ঐ স্থূল, দ্বৈত বা ভেদ ভাবের দুর্জ্জয় প্রভাবেই জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ক্রিয়াভেদ, এমন কি, ঈশ্বরকেও খণ্ড বিখণ্ডে প্রভেদ থাকিতে হইয়াছে। স্থূল দ্বৈতভাবেই পৃথিবীতে পুতুলপূজা নরমেধাদি যজ্ঞের ব্যবস্থা সকল প্রকাশ পায় এবং বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মও সংসারে জীবিত রহিয়াছে। এক একটী জাতি মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য ঈশ্বর-ঈশ্বরী আসিয়া স্তব-পূজায় তৃপ্ত হইতেছেন। সাঁওতাল জাতির মধ্যে বুঙ্গা-বুঙ্গি ইত্যাদি, সম্প্রদায় বিশেষের ভিতরে তেত্রিশ কোটী! যাহা হউক, স্থূল দ্বৈততত্ত্বের বিষয় আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এখন একবার অখণ্ড জীব দ্বৈততত্ত্বেরই চিন্তা করা প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে "অদ্বৈততত্ত্বমেবহি" অদ্বৈতবাদী অদ্বৈততত্ত্বই ভোগ করেন। এই যে পঞ্চদশী মতের "ভোগবাদ'' প্রকাশ হইতেছে, ইহাতে কি বুঝিব না যে, ব্রহ্মই ব্রহ্মকে ভোগ করেন। সূক্ষ্ম চিন্তার ভিতরে একবার প্রবেশ করিয়া দেখুন ত? "ভোগ" শব্দটী দ্বৈতভাবে আসিতেছে কি না? ইহা যদি স্থির হইল, তবে অখণ্ড দ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। নিরাকার নিত্যতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যত্ব ভাব যখন কিছুতেই প্রমাণসিদ্ধ নহে, তখন বস্তুপরম্পরার মধ্যে অসীমাত্মাকে সসীম ভাবে দ্বৈত ভাবিয়া বিশ্বাস করা নিতান্ত বুঝিবার ভুল। সংসারে বস্তুর প্রকার ভেদে শক্তির পার্থক্য পরিচালন ভাব যাহা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই স্থূল দৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যতীত নহে। ঐশীশক্তি যে পদার্থ সকলকে ভেদ করিয়া অসীমভাবেই স্থিতি করিতেছে! নিরাকার দ্বৈতভাবেও সেইরূপ বুঝিবেন। ঐ দেখুন, দুগ্ধ আর জল, সমভাবযুক্ত হইয়া কেমন একত্বতা দেখাইতেছে। সূক্ষ্মচিন্তার মূলে বুঝিলে ঐ দুগ্ধ ও জল সমভাব একত্বতা সত্বেও পৃথক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আরও বুঝুন, ঐ কাগজ খণ্ডের এ পৃষ্ঠাও পৃষ্ঠা উভয়েই সমান আয়তন। উহার দুইটী পৃষ্ঠা সম প্রকৃতিতেই উভয়ে উভয়কে স্পর্শ করিয়া আছে। এখন মনে করুন, এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা, এই ভেদ সূত্রে কি দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব বিকাশ পাইল না? এ পৃষ্ঠা অদ্বৈত ব্রহ্ম, ও পৃষ্ঠা দ্বৈত বা জীব, ইহাতে কি এ পৃষ্ঠাকে অদ্বৈত অনাদি নিত্য ভাবিতে হইবে না? আবার ও পৃষ্ঠাকে কি অখণ্ড বলিয়া বুঝিব না? আচ্ছা, তাই যেন হইল, যদি অদ্বৈতই দ্বৈত হইয়া স্তুতি বন্দনাদি দ্বারা পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন, তবে অতি দীন হীন কাঙ্গালের মত প্রেম, শান্তি, দয়ার ভিখারী হন কেন? তাঁহাতে ত পূর্ণ ভাবে সকল তত্ত্বই রহিয়াছে—চুপ করিয়া থাকিলে কি চলিত না?

এই প্রশ্নের সন্দেহ সহজেই মিটিতে পারে। ঐ যে নাটক-রচয়িতা ব্যক্তিটীর একই মনের দ্বারা যখন দুই সতীনের ঝগড়ার বাদপ্রতিবাদের উত্তর প্রত্যুত্তর অনায়াসে চলিল, তখন অদ্বৈত নিত্য চৈতন্য কি দ্বৈতভাবটা ধরিয়া দীনতার অমিয়ভাবে প্রার্থনা বন্দনাদি এবং প্রেম, শান্তি, আনন্দের উদ্যাপন করিতে পারেন না? আহা, দীনতার ভিতরে যে শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব নিহিত আছে—ইহা যোগীরাই যোগচক্ষে দেখিতে পান। মানবের জ্যোতিশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি না ফুটিলে, কখনই সঙ্কীর্ণতার অন্ধকার এড়াইতে স্পৃহা জন্মে না। অসার তর্ক যুক্তির উত্তেজনায় সতত প্রতারিত হয় এবং বাগাড়ম্বরে পৃথিবীকে কাঁপাইতে থাকে। প্রকৃত তত্ত্ববস্তু পরিত্যাগ করতঃ স্বার্থের পুষ্টি সাধনেই প্রযত্নপরায়ণ হয়। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতের গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণা করিতে উদাসীন।

এখন দেখা যাক্—নিরাকার দ্বৈততত্ত্ব যে

মোহের আচ্ছাদনে একবারে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া হায় হায় করে, ইহার মূল কারণটা কি? ভাল, এটা কি সম্ভব হয় না যে, মানবের মানবীয় ভাবের ক্ষুৎপিপাসা মেটে না, আসক্তির বিবিধ প্রলোভন বাড়িতে থাকে, সার্ব্বভৌমিক উদার ব্রহ্মভাব পলকার্দ্ধকালের জন্যও স্ফূর্ত্তি পায় না। ইহাতে অখণ্ড নিরাকার দ্বৈততত্ত্ব কিরূপে প্রাণে পোষণ করিতে সক্ষম হইবে? বরঞ্চ ঐ মানবীয় মোহ-প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনার সহিত দূরদূরান্তরে ফেলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতের মধুরভাব হইতে বঞ্চিত করে! নিশ্চয়ই জানিবেন, নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিরাই স্থূলের বিচিত্রতার ভিতরে ভ্রমণ করিয়া ভ্রমের অতলতলে প্রবেশ করিতেছে। এমন সাধ্য হয় না যে, উহাকে ঠেলিয়া একটুকু উপরে উঠিতে পারে। কেমন করিয়া বলিব—পাংশুনির্ম্মুক্ত মণির ন্যায় ঐ নিরাকার দ্বৈততত্ত্বের অদ্বৈত মহামিলনের অখণ্ড নিত্যভাব বুঝিবার শক্তি জন্মিবে!

বাস্তবিক, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া না বলিলে প্রকৃত সত্যও কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। স্বার্থের অনুকূল প্রক্ষিপ্ত প্রমাণগুলিই কি ব্রহ্ম জ্ঞানের বীজ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে? সত্য যে অনন্ত—অনন্ত কাল অনন্ত ভাবেই প্রকাশ আছেন। যোগী ঋষিগণ যতটুকু ধরিয়াছেন, ততটুকুই বস্তুতঃ আদরের বস্তু। তাই বলিয়া কি প্রক্ষিপ্ত কথা গুলিকেও সার সত্য ভাবিয়া হৃদয়-দর্শনের মত ধরিব না, পুরাণাদির মতে আত্মা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাই কি চির চর্ব্বণ করিতে হইবে? সসীম-অসীমের একত্বতাবাদী তার্কিকের কুটীল ভ্রুকুটীতে নিরস্ত থাকিতে হইবে? স্বাধীন বলে সাধন দ্বারা যে কিছু তত্ত্ব লাভ হয়, তজ্জন্য একটুকু চিন্তা করিতে হইবে না? অবশ্য, প্রাণে বলধারণোপযোগী ঋষি-চিন্তা-লব্ধ মহত্ত্বগুলি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে সঞ্চয় রাখিব—আবার নির্জ্জনে চিন্তা করিয়াও দেখিব—পরপিণ্ড প্রত্যাশী হইয়া স্বাধীন চিন্তাটীকে কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইব কেন? নিরাকার অখণ্ড দ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি যাহাই কেন বলুন না, তজ্জন্য কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু বজ্রনিনাদে একথা অবশ্যই বলিব, "একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম অখণ্ড দ্বৈতভাবে মধুর ভাবে বিহার করিতেছেন।"

এখানে পরিমিত স্থূলভাবের কোন কথা নাই, নিরাকার অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতেরই মহালীলার ব্যাপার! যাহা যোগী ঋষিগণ সমাধি যোগে বুঝিয়া মানবকে একাত্মময় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রদান করেন। বস্তুতঃ মানব তাহা ধরিল না, জগতের বিচিত্র ভাব-তরঙ্গে পড়িয়া স্থূল ভাবে অসীম অমিয় তত্ত্বটী গ্রহণ করিল না, এবং নানাবিধ তর্ক যুক্তির আড়ম্বরে পৃথিবীকেও প্রকৃতিস্থ হইতে দিল না। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ব বস্তু হৃদয়ে ধারণা না করিয়া অসারতার ভিতরে বদ্ধ রহিবে, তাহার সন্দেহ কি? পরিশেষে এই ঘটিল, কেহবা নিরীশ্বরবাদকে আশ্রয় করিতেছেন, কেহবা জড়বাদে কূপমগ্ন মণ্ডুকের ন্যায় অল্পস্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। নির্ভীকান্তঃকরণে বলিতে পারা যায়, যতক্ষণ স্বাভাবিক ব্রহ্ম জ্ঞান বিকাশ হইয়া হৃদয়ভেদী দর্শন শাস্ত্রের তত্ত্ব সমূহ প্রাণে না আইসে, ততক্ষণ নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের প্রকৃত ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করাও অসম্ভব। পশু পক্ষী মানবাদির

একাত্মময় ভাব। ইহাইত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা।

যাক্, এখন আর এ বিষয় অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সূত্রে বাদী-প্রতিবাদীর অভিযোগ বিচারটী দেখিলেই বোধ হয় ইহার মীমাংসা কিছু বুঝা যাইবে।

বিচারপতি ব্রহ্মজ্ঞানের সমীপে মোকর্দ্দমা উপস্থিত।

বাদী	প্রতিবাদী
আমি	তুমি

মোকর্দ্দমা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

বাদীর আরজি ও বিবাদীর বর্ণনা পত্র * দৃষ্টে বিচারপতি ব্রহ্মজ্ঞান যে তিনিটী ইস্থ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

১। নিরাকার ও সাকারে সম্মিলন হইতে পারে কি না?

২। অদ্বৈতবাদে দ্বৈতবাদ ইহা কি সম্ভব হইতে পারে?

৩। দ্বৈতাদ্বৈতের অখণ্ড ভাবের মিলন হয় কি?

নিরাকারবাদী—বাদীর উকিল প্রথমতঃ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—আমার মক্কেলের আরজিতে বর্ণিত আছে যে, বেদব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শন শাস্ত্রে আত্মাকে অখণ্ড অনাদি নিত্য বলিয়াই প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ বেদান্তদর্শন স্পষ্টই বলিতেছেন, আমি ব্রহ্ম। মহা জ্ঞানী শঙ্করও তাঁহার ভাষ্যে ঐ কথাটীরই পোষকতায় সাক্ষ্য দিয়াছেন "অহং ব্রহ্ম।" নিরাকার আত্মা খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত হয় না, আত্মাই "আমি"—ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সাকার স্থূল জগত সমুদয় ভ্রমাত্মক অর্থাৎ কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রেও আত্মার অখণ্ডত্বই প্রমাণ করিতেছেন, সুতরাং একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি আছে? তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিব, অদ্বৈত ব্রহ্ম চৈতন্য অনন্ত সত্ত্বাধিকারে স্বরূপ, ভাব, ইচ্ছাযোগে জীবভাব অবলম্বন করিয়া অখণ্ড দ্বৈতলীলা করেন। সাধক গাইয়াছেন—

"হরিহে আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে"

বিশেষতঃ যখন সেব্য সেবকের নাশ হইবে না, এটী সাধকের গভীর চিন্তালব্ধ কথা, তখন ঐরূপ দ্বৈতভাব গ্রহণ করিতে আমার মক্কেল রাজী। প্রতিবাদী যে অখণ্ড ব্যাপী আত্মাকে সৃষ্ট ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া দ্বৈত তত্ত্বকে প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বাদী কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না। আত্মা জড় ভাবাপন্ন কখনই নহে, ইহা উচ্চশ্রেণী যোগী, ভক্ত, সাধক সকলেরই শোণিতগত বিশ্বাস। নিরাকার যে কোন তত্ত্বই হউক না কেন, খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত হইতে পারে না। এমন কি, আমিত্ব তত্ত্বও অখণ্ড ভাবে অসংখ্য অসংখ্য নরনারীকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ঐ আমিত্ব স্থূলের প্রতারণায় প্রতারিত হইলে অহম্ভাবের আচ্ছাদনে অহমিকামিত্বভাবে অশেষ যন্ত্রণাপ্রদ হয়। আবার ঐ অহমিকামিত্বই "পাকা" অর্থাৎ জীব সংস্পর্শী সিদ্ধামিত্ব উপাসক হইয়া উপাস্য দেবতার মহামিলনে পরমানন্দ ভোগ করে। ইহা সিদ্ধ সাধকগণের পরীক্ষিত কথা। তবে কেনইবা বলিব না যে, অখণ্ড ভাবে দ্বৈতাদ্বৈতের মিলন সম্ভবে না।

---

* এই কথাগুলির বিশেষ ভাবে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাকারবাদ—প্রতিবাদীর উকিল স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন, বাদীর উকিলের ঐ সকল কথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক,—কারণ, নিরাকার ও সাকার একই মহা শক্তির অঙ্গীভূত। অবশ্য, জগত ও অনন্তকে একত্রীভূত করিতে হইলে সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিপর্য্যয় ঘটে বটে, কিন্তু ঐ জগত তত্ত্বের-ব্যাপারে যে সকল দর্শন হইতেছে, ইহা কি ব্রহ্মশক্তির বহির্ভূত? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চবিধ তত্ত্বের অনুভব কর্ত্তা কে? আমি বলি, একই জড় চৈতন্য। অতএব জড় ও চৈতন্য কখনই পৃথক্ নহে। বাদীর উকিল যে আত্মার সৃষ্টিভাব উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, বোধ হয় তিনি ভক্তিশাস্ত্র ও পুরাণাদি কিছুই দেখেন নাই। নিরাকার মহাশক্তি যে খণ্ড হয় না, একথা কে অস্বীকার করিবে? —উহাকেইত জগত ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে। অথচ ঐ মহাশক্তিরই বহুভাব সত্ত্বা হইতে বহু জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং স্থাবর জঙ্গম নদ নদী পর্ব্বতাদিময় জগত সমূহও সৃষ্টির অধিকারে অবস্থিত। যদি আত্মার ক্ষুদ্রত্ব সৃষ্টত্ব ভাব না থাকিত, তবে পৃথিবী আর কখনই 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলিয়া মরিত না? মহাভক্ত রামানুজ আত্মা ও জগতের সম্মিলন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে অতি বিশদরূপে সাক্ষ্য দিয়াছেন। অসংখ্য অসংখ্য পুরাণ সকলও বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিতেছে। অতঃপর সাকার এবং সৃষ্টিভাবে স্বীকার না করিলে, নিরাকারের অস্তিত্বই থাকে না, এমত স্থলে বাদী স্থূল দ্বৈতবাদ ও সৃষ্ট বস্তুকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। বলিবার আরও অনেক কথা।

হাকিম বলিলেন, উহাতেই হইয়াছে।

বিচারপতি ব্রহ্মজ্ঞানের রায়—এই মোকর্দ্দমার যে তিনটী ইস্যু উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধের অনেক স্থানে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এখানে সংক্ষেপরূপেই বলা প্রয়োজন। নিরাকার অনন্ত শক্তি মধ্যে জগত সমূহ বিম্ববৎ ভাসিতেছে। পরিমিত সাকার বস্তুতে মহাশক্তির প্রচ্ছন্নতা প্রযুক্ত সাম্য দৃষ্টি কিছুতেই সম্ভবেনা, সুতরাং অসীমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে সসীম টেঁকে না। সসীমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে অসীমও থাকেনা। যাহা হউক, যোগীর যোগ শরীরে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—ঐ যোগাবিষ্ট শরীরে শত শত অস্ত্রাঘাত হইলেও নিরাকার ব্রহ্ম চৈতন্য ও জীব চৈতন্যের মহা মিলন বিনাশ হয় না। তবেই বলিতে হয়, সাকারতত্ত্ব সীমাবদ্ধ ভাবে চিরস্থিতি সত্ত্বেও ব্রহ্মের অনন্ত সত্তাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না।

আমার কর্ত্তাকে—"তুমি," প্রত্যেক দেহীর মধ্যই "তুমি"। তোমার কর্ত্তাকে—"আমি" জীবন্ত জন্তুর ভিতরেই "আমি"। দেখিতে হইবে। আমার ও তোমার মধ্যে যে আমি তুমি, সকল প্রকার শরীরাধারেও উহাই বর্ত্তমান আছে। উহার কোন প্রকার বর্ণ বা অবয়ব ভেদ কিছু নাই। তবেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এক অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতেই নাম-ভেদে দ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশ পাইল, উহাকে নিরাকার অখণ্ড ভিন্ন পরিমিত ভাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ, স্থূল জ্ঞানেই আত্মার সৃষ্টত্ব ও দ্বৈত তত্ত্বের লঘুত্ব বিশ্বাস করিয়া বিভ্রমে নিপীড়িত হইতে হয়। নিরাকারে সাকার বস্তু সকল বিশ্বলীলার উপাদান ব্যতীত কিছুই নহে।

বাদীর প্রদত্ত নজীরটী অবশ্যই গ্রহণ যোগ্য।" "হরিহে আপনি নাচ আপনি গাও" ইত্যাদি কথা সাধকের তন্ময় যোগের অবস্থায় ব্যক্ত। সঙ্গীতটীতে নিরাকার দ্বৈতাদ্বৈতের মিলন ভাবের বিষয় স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। প্রতিবাদীর উকিল যে "মহাশক্তির বহুভাবসত্বা হইতে বহু জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে" বলিয়াছেন, এটী সম্পূর্ণ কাঁচা কথা। নিরাকার অনন্ত শক্তি কেমন করিয়া এক দুই ভাবে সংখ্যায় সৃষ্ট ও বহুত্বে আনিতে পারে? যাহা হউক, বাদীর ঐ সঙ্গীত নজীরে যে অদ্বৈত ব্রহ্ম হইয়া গাহিতেছেন, অখণ্ড জীবভাবে দ্বৈত হইয়া বাজাইতে লাগিলেন, এ কথা পাকা ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, আত্মা, স্মৃতি, মন, একই মহাশক্তি চিৎ। শরীরাধারে যে কার্য্যের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, উহা ভ্রান্তির বিকাশ ভাব। ভাবিয়া দেখিলে, মানুষ যে পর্য্যন্ত ভ্রান্তি মোহাদির অনুসরণ-প্রিয় হইয়া থাকে, সে পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে হাবুডুবু খাইবেই ত? মহাজ্ঞানের দিকে চক্ষু পড়িলে, আর সঙ্কীর্ণ ভাব থাকে না। জড়বাদী ভক্ত মাত্রই ভক্তির তরঙ্গে সৃষ্টাদির ভাব ধরিয়া দূরে অবস্থিতি করেন। এবং ভেদভাবের মধ্যে বিচরণ করিয়া আপাত মধুরভাবে সন্তুষ্ট থাকেন।

হুকুম হইল যে—

এক মহাচৈতন্যই যখন দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন তখন অদ্বৈতবাদ মধ্যে জীবভাবের অখণ্ড দ্বৈতবাদের চিরস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। আমি তুমি ইহা কেবল নামভেদ মাত্র। অতঃপর দ্বৈতাদ্বৈত ভাবেও উভয়েই উভয়ের অমিয় ভাবের অধিকারী।

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (৪)

সমাজ সহায়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ।

২৯। দৈবযোগে, উপযুক্ত পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, স্ফুটনোন্মুখ প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে, মাতৃগর্ভে মানবের বিকাশের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, সমাজসহায়ে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। এক অর্থে মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই সমাজগর্ভে প্রবেশ করে, ও সমাজশরীর দ্বারা ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। মানবশিশু বড় নিরাশ্রয়। অন্য জীবশাবক পূর্ণবিকাশিত সহজাতসংস্কার লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করে, ও পরে মাতাপিতার বিনা সাহায্যে বা সামান্য মাত্র সাহায্যে, সেই সহজজ্ঞান বশে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মানবশিশু সম্বন্ধে নিয়ম সেরূপ নহে। নিরাশ্রয় মানবশিশু, পিতামাতা ও সমাজের সহায়তা বিনা, স্বাবলম্বন শক্তির অভাবে, আদৌ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এজন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, সমাজশরীরান্তর্গত পিতামাতা বা আত্মীয়দের দ্বারা, পরিবার মধ্যে, তাহাকে লালিত পালিত হইতে হয়। সেই পিতামাতা ও পরিবার, এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমাজ ও বাহ্যপ্রকৃতির সহায়ে তাহার বিকাশ হইতে থাকে। এই শৈশবকালে তাহার বিকাশের সময়েই সমাজ তাহাকে গড়িয়া লয়। সেই সময়েই সমাজ, তাহাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া,—নির্জ্জীব করিয়া

লইয়া, তাহাকে সমাজের সেই অঙ্গের বিশেষত্ব অনুসারে সেই জাতীয় চরিত্রের ছাঁচে ফেলিয়া, তাহার তদনুরূপ সংস্কারের বিকাশ করিয়া লইয়া, একরূপ 'হল্ মার্কা' দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে সমাজসহায়ে শৈশবকাল হইতেই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে। সমাজ না থাকিলে, মানবশিশুর কোন উন্নতির সম্ভাবনা, বা তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকিত না। মানবশিশু যদি সমাজ মধ্যে মাতাপিতা ও পরিবারস্থ আত্মীয়গণের দ্বারা লালিত পালিত হইতে না পাইত, সমাজ যদি তাহাকে না গড়িয়া লইত, তবে তাহার জীবিত থাকার বড় সম্ভাবনা ছিল না। আর জীবিত থাকিলেও, তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া গিয়া কখন মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারিত না। সমাজ না থাকিলে, মানুষে পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। আমরা প্রথমে দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৩০। আমরা অনেক সময় ইতর পশু দ্বারা মানবশিশুর লালনপালনের কথা শুনিয়া থাকি। অবস্থা বশে মানবশিশু পিতামাতা বা আত্মীয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে, কোন কোন সময় হিংস্র জন্তুও তাহাকে লালনপালন করিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু মানবশিশুকে খাদ্যের জন্য হরণ করিয়া লইয়া, পরে মায়াবশে তাহাকে আর ভক্ষণ করে না। সে তাহাকে নিজের সন্তানদের সঙ্গে লালনপালন করে, তাহার নিজের সন্তানদের সঙ্গী করিয়া দেয়। রোম্ নগরের প্রতিষ্ঠাতা রমুলাস্ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক ব্যাঘ্রী তাহাকে স্তন্যদুগ্ধ দিয়া জীবিত রাখিয়াছিল। এই জনশ্রুতি সত্য কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না, এবং এই ঘটনা হইতে রমুলাসের চরিত্রের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু অনেক পর্যাটকের বিবরণ হইতে হিংস্র পশু দ্বারা মানব-শিশুর প্রতিপালনের কথা, ও তাহার ফলে মানব-শিশুর পশুত্বে পরিণত হইবার কথা পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। প্রথম দৃষ্টান্ত, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"অনেকেই জানেন, কয়েক বৎসর অতীত হইল, বৃকের (নেকড়ে বাঘের) গহ্বরে দুইটী ১৫।১৬ বৎসরের মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল, ও পরিদর্শনার্থ তাহারা প্রয়োগে আনীত হইয়াছিল। বৃকেরা যে সমস্ত মনুষ্য অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধন করে না, কোন কোনটীকে বা আহারাদির দ্বারা পালন করে। সেই দুইটী মনুষ্য এইরূপে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বৃক দ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও দুই পদে পশুর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য লোম অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ হইয়াছিল, এবং তাহাদের দন্ত সকল ঈষৎ সূক্ষ্মাগ্র (সূচল) হইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহবাসে পশুকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল, এবং জন্মাবধি মনুষ্যবৃত্তির পরিচালনা করে নাই, তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, মনুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিতে মনুষ্যোচিত আকারেরও অবনতি হয়।"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—সে দিনের কথা। আজ পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইল, জলপাইগুড়িতে কোন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ভালুকের গহ্বরে এক সাত বৎসরের মানব শিশুকে পাইয়াছিলেন। সে আশৈশব সেই ভালুকের দ্বারাই লালিত পালিত হইয়াছিল। সে ভালুকের অনু-

করণ করিয়া শব্দ করিত, দুই হাতে দুই পায়ে চতুষ্পদের ন্যায় গমন করিত, আম মাংস ভোজন করিত। সে ভালুকের ন্যায় ক্রূরস্বভাব হইয়াছিল। মানুষ কাছে যাইলে সে তাহাকে কামড়াইতে আসিত। পরে এই পশুপালিত মানবশিশুকে কলিকাতার অনাথাশ্রমে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহাকে কথা কহিতে বা দুই পায়ে ঋজু হইয়া হাঁটিতে কি কাপড় পরিতে শিখান যায় নাই। সে সিদ্ধ মাংস অপেক্ষা আম মাংস ভালবাসিত। তাহার শৈশবকালে বিকাশিত সেই ভালুকোচিত সংস্কার এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় নাই। অবশেষে তাহাকে 'মানুষ করিবার' চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইলে, প্রায় এক বৎসর মধ্যেই সে মারা গিয়াছিল। এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ সেই সময়ের প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই, বিশেষতঃ দাসী নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, পশু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলে, মানবশিশু ক্রমে পশুস্বভাব প্রাপ্ত হয়।

তাহার পর অসভ্য সমাজ মধ্যে সভ্য সমাজের মানবশিশুর প্রতিপালনের কথা মনে করিতে হইবে। অনেক সভ্য সমাজের শিশু, 'জাহাজ ডুবি' প্রভৃতি দৈবঘটনাক্রমে অসভ্য সমাজে পরিত্যক্ত হইলে, সেই সমাজের দ্বারাই লালিত পালিত হয়। অনেক স্থলে অসভ্য সমাজের লোক সভ্য সমাজ হইতে শিশু হরণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রতিপালন করে। বেদিয়া বা জিপ্সিগণ অনেক সভ্য সমাজের শিশু চুরি করিয়া লইয়া গিয়া লালন পালন করিয়া থাকে—তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উন্নত সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, উন্নত বা সাধু-প্রকৃতি সম্পন্ন পিতামাতা হইতে শক্তি লাভ করিয়া, মানবশিশুর উন্নত শুভ সংস্কার স্ফুটনোন্মুখ হইলেও, সে যদি অসভ্য সমাজ-শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সমাজের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তবে আর তাহার সে উন্নত সংস্কারের বিকাশ হইতে পারে না। সে প্রায়ই সেই অসভ্য সমাজের লোক সাধারণের প্রকৃতি লাভ করে।

৩১। অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই যে, বন্যপশুও গৃহপালিত হইলে, তাহার প্রকৃতি অনেকটা শান্ত, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি অনেকটা মার্জ্জিত হয়। বন্য বিড়াল অপেক্ষা গৃহপালিত বিড়াল শান্ত ও বুদ্ধিমান। যে গৃহস্থের আদরের বিড়াল কেবল 'দুধে ভাতে' প্রতিপালিত হয়, সে অনেক স্থলে মৎস্য মাংস পর্য্যন্ত খাইতে ভুলিয়া যায়, অনেকটা নিরীহ হয়। কোন কোন লোক ব্যাঘ্র-শিশুকেও এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন যে, তাহার জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজনা অভাবে অনেকটা লোপ হইয়া যায়, সে অনেক সময় কুক্কুরের মত প্রভুর অনুগামী হইয়া থাকে। এইরূপে পশুদের উপরও মনুষ্য সমাজের প্রভাব লক্ষিত হয়। আবার অসভ্য মানবশিশু শৈশবকাল হইতে সভ্য সমাজে উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পরিবার মধ্যে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইলে, তাহার স্বভাব অনেক পরিমাণে সেই পরিবারের অনুরূপ হইয়া থাকে। এক সমাজের শিশু অন্য সমাজে প্রতিপালিত হইলে, সে শিশুও পরিণামে সেই পরবর্ত্তী সমাজের লোকের স্বভাব ও আচরণ প্রভৃতি লাভ করে। বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান আশৈশব

বিলাতি সমাজে প্রতিপালিত হইলে, যে 'সাহেব' হইয়া যায়। অসভ্য অশিক্ষিত শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়ের ঘরে শৈশবকাল হইতে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হয়, তবে সেও অনেকটা সেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পরিবারের প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। এইরূপে সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হয়। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়। সমাজ না থাকিলে মানুষ পশু হয়। যে সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব ততদূর বিকাশিত হইতে পারে। যে সমাজ যেরূপ, মানবশিশু সে সমাজের যে অঙ্গে লালিত হয়, মানুষও তদনুরূপ হয়। আমরা একথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৩২। মানবশিশু সমাজ মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। প্রথম হইতেই পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় ও পরিবারবর্গের সহিত তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই মানবশিশু পিতামাতা ও আত্মীয়গণের দ্বারা শিক্ষিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতেই মাতাপিতা প্রভৃতির স্বভাব ও কার্য্য সে অজ্ঞাতে অনুকরণ করিতে থাকে। এই অনুকরণবৃত্তি বলে, আনুষঙ্গিক অবস্থা ও দৃষ্টান্ত প্রভাবে, মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তদভিমুখী হইয়া তদনুরূপ ভাবে বিকাশিত হইতে থাকে। তখন আমাদের স্বাভাবিক বিকাশশক্তি বড় প্রবল থাকে। সে প্রকৃতিজ শক্তি আমাদের জ্ঞান পরিচালিত নহে। আমাদের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে তাহা কার্য্য করিতে থাকে। তখন বাহিরের যে সকল অবস্থা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, অথবা দর্শনের কথায় তখন 'বিষয়ী' আমরা যে 'বিষয়' পাই, সেই বিকাশশক্তি বলে তাহাই গ্রহণ করিয়া তাহারই সহায়ে, এই 'বিষয়-বিষয়ীর' সম্মিলনে, বা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে। তখন বাছিয়া বাছিয়া, আমাদের স্ফুটনোন্মুখ পূর্ব্বজন্মজ সংস্কার অনুযায়ী, আমাদের অনুকূলবেদনীয় বা সুখজ বিষয় গ্রহণ, ও প্রতিকূলবেদনীয় বা দুঃখজ বিষয় পরিহার করিবার শক্তি বড় অধিক বিকাশিত হয় না, এবং সে শক্তি তখন আমাদের জ্ঞানবলে পরিচালিত হয় না। কিন্তু তখন আমাদের অজ্ঞাতে, আমাদের এই সাধারণ বিষয়গ্রহণ শক্তির প্রভাবে এই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসরেই আমাদের মনুষ্যত্বের যেরূপ বিকাশ হয়, ব্যবহারিক চরিত্রের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বড় বদ্ধমূল হইয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে তাহার বড় অধিক পরিবর্ত্তন হয় না। শৈশবকালে চারি পাঁচ বৎসরে আমরা যাহা শিক্ষা করি, পরবর্ত্তী কালে কুড়ি পঁচিশ বৎসরেও বোধ হয় তত অধিক শিক্ষা করিতে পারি না। সেই প্রথম চারি পাঁচ বৎসর বয়স মধ্যে আমাদের যে ব্যবহারিক চরিত্রের বিকাশ হয়, অজ্ঞাত অভ্যাসবলে যাহা শিক্ষা হয়, তাহা পরবর্ত্তী জীবনে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয় না।

শৈশবকালে বালক মাতৃক্রোড়ে মাতৃস্তন্যের সহিত কত ভাব, কত চিন্তা, কত সংস্কার অলক্ষ্যে গ্রহণ করে। তাহার দুই কি তিন বৎসর বয়স হইতে না হইতে, সে মাতৃভাষা অনায়াসে আয়ত্ত করে—বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। আমরা বড় হইয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে কত বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করি,

তথাপি সে ভাষা বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। কিন্তু আমরা অতি শৈশবে পরিবার মধ্যে মাতার নিকট হইতে মাতৃভাষা সহজে লাভ করি। শুধু তাহাই নহে। সেই ভাষা কত যুগযুগান্তরের কত লোক দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণাবয়বযুক্ত হইয়াছে। তাহার কত জটিলতা, তাহার ব্যাকরণ কত কঠিন, তাহার শব্দভাণ্ডার কিরূপ পরিপূর্ণ! সেই জটিল মাতৃভাষা আমরা কত সহজে কত অল্পদিনে বিনা আয়াসে বিনা চেষ্টায় শিক্ষা করিয়া ফেলি। মাতার নিকট হইতে, পরিবারের নিকট হইতে বা সমাজের নিকট হইতে, যদি এই ভাষা অলক্ষ্যে শিক্ষা করিতে না পাইতাম, যদি কোন ভাষা শিক্ষা করিতে আমরা সমাজের সাহায্য না পাইতাম, যদি আমাদের নিজের চেষ্টায়, অন্যের সহিত সমাজবদ্ধ হইবার জন্য, আমাদের ভাষা গড়িয়া লইতে হইত, তবে আমাদের ভাষা আদৌ লাভ হইত না। আমাদের ভাষা শিক্ষার শক্তি আছে বটে, আমাদের বাক্‌যন্ত্র ইতর জীব অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট বটে, কিন্তু পিতামাতা ও সমাজ আমাদের ভাষা শিক্ষা না দিলে, আমরা প্রকৃত ভাষা লাভ করিতে পারিতাম না। অসভ্য সমাজেও পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য সামান্য কয়েকটী কথা বা শব্দ মাত্র সংগৃহীত হইয়া একরূপ নামমাত্র প্রচলিত থাকে। আর কতকগুলি ভাব অসভ্য সমাজের লোক সঙ্কেতের দ্বারা প্রকাশ করে। এই অস্পষ্ট বা অস্ফুট ও সাঙ্কেতিক ভাষাও সেই অসভ্য সমাজে কত কালে কত পুরুষের চেষ্টায় সংগৃহীত, অথবা দৈবঅনুগ্রহে বিকাশিত। অতএব মানুষ সমাজ বা পরিবার মধ্যে শিক্ষা না পাইলে তাহার কোন ভাষাই লাভ হইত না,—পূর্ণ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ভাষা ত দূরের কথা। আর সমাজ সহায়ে মানুষ ভাষা শিক্ষা করিতে না পারিলে, মানুষে মানুষে পরস্পরের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিলে, মানুষে ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

এইরূপে শৈশবে আমাদের অলক্ষ্যে, আমাদের অজ্ঞাত চেষ্টায়, মাতাপিতা ও সমাজের সহায়ে আমরা ভাষা লাভ করি। আর শুধু কি ভাষা! এই শৈশবেই মাতৃস্তন্যের সহিত আমরা কত ভাব, কত চিন্তা, কত সংস্কার, কত বিষয় অলক্ষ্যে আয়ত্ত করিয়া লই। কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, কোন্‌টী কর্ত্তব্য কোনটী অকর্ত্তব্য—তাহাও মানবশিশু অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে মাতাপিতার কাছে শিক্ষা করে, পরিবারের মধ্যে শিক্ষা করে। শিশুর পিতামাতা যে কাজ ভাল মনে করে, শিশুও সেই কাজ ভাল ভাবিতে শিক্ষা করে। আমাদের স্বভাবতঃ ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি বা সংস্কার থাকিতে পারে, এবং স্বভাবতঃ আমরা ভাল কাজও করিতে পারি। কিন্তু সমাজ যদি নরহত্যা ভাল কাজ, বা চুরি করা ভাল কাজ বলিয়া আমাদের শিক্ষা দেয়, তবে আমি ভাল কাজ, মনে করিয়াই নরহত্যা করিব বা চুরি করিব। অতএব আমাদের স্বাভাবিক সাধারণ ভালমন্দ জ্ঞান ও ভাল কাজে প্রবৃত্তি থাকিলেও, ব্যবহারিক ভাল মন্দ জ্ঞান, আমরা পিতামাতা ও সমাজ হইতে লাভ করি। সে জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। সমাজ উন্নত যত হয়, সে জ্ঞানের তত বিকাশ হইতে থাকে। একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) আর মান-

---

(১) বাকল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, আমা

বের মধ্যে পাশবপ্রকৃতিবীজ, মানবপ্রকৃতিবীজ ও দেবপ্রকৃতিবীজ—এ সকলই প্রাক্তন সংস্কার হেতু নিহিত থাকিতে পারে। কেহ কেহ এই সংস্কারবীজকেই মানুষের পুরুষকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (২) এই সংস্কার মধ্যে জন্মকালে যে গুলি বিকাশোন্মুখ হয়,তাহার কতগুলি মাতৃগর্ভে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে বিকাশিত হইতে থাকে। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব শিশু, পিতামাতা ও তৎসংসৃষ্ট পরিবারমধ্যে সাধারণতঃ যেরূপ আচার ব্যবহার, যেরূপ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য, যেরূপ ভাব লক্ষ্য করে, সে শিশুর স্ফুটনোন্মুখ সংস্কারবশে তাহার তদনুরূপ আচার ব্যবহার প্রবৃত্তি প্রকৃতি প্রভৃতিরই বিকাশ হইতে থাকে। পিতা মিথ্যাবাদী হইলে, স্বার্থপর হইলে, সন্তানও মিথ্যা কথা কহিতে শিখে, সে স্বার্থপর হয়। পিতা মদ্যপ হইলে, সন্তানের মদ্যপানপ্রবৃত্তি অলক্ষ্যে বিকাশিত হইতেথাকে, মদ্যপান যে দূষণীয় বা ঘৃণার্হ—তাহা তাহার বড় ধারণা হয় না। চোর বা দস্যুপিতামাতার গৃহে পালিত শিশুও সেই জন্য প্রায়ই চোর বা দস্যু হইয়া থাকে। (৩) অতএব পিতার ও পরে মাতার শরীর মধ্যে অবস্থান হইতে —শৈশবকাল পর্য্যন্ত বরাবর মানব শিশু—পিতামাতার অনুরূপ প্রবৃত্তি বিকাশের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তৎবিপরীত প্রবৃত্তিবীজ বিকাশ সম্বন্ধে প্রতিকূল, অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিশুর সৎপ্রবৃত্তিবীজ বা সুসংস্কার স্বভাবতঃ প্রবল থাকিলেও, সে যদি সেই বীজের বিকাশের অনুকূল অবস্থা না প্রাপ্ত হয়, তবে দৃষ্টান্ত বা উত্তেজনা অভাবে, তাহার সেই সৎপ্রবৃত্তিবীজ আর বিকাশিত হইতে পারে না। আর তাহার অসৎপ্রবৃত্তিবীজ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকিলেও, যদি তাহার পিতামাতা অসৎপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়, তবে অনবরত দৃষ্টান্ত ও উত্তেজনার মধ্যে থাকিয়া স্বাভাবিক অনুকরণশক্তি বলে মানব শিশু পিতামাতার সেই অসৎ প্রবৃত্তিই প্রায় লাভ করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

৩৪। এইরূপে শৈশবে পিতামাতা ও পরিবারবর্গের দ্বারা অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে বিনা চেষ্টায় আমাদের বিকাশ হইতে থাকে। এইরূপে আমাদের ব্যবহারিক চরিত্র(habit) সংগঠিত হয়। আমরা তাহা জানিতেও পারি না। বড় হইলে, এই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসরের কথা আমাদের প্রায় কিছুই মনে থাকে না। এখন বিশেষ চেষ্টা করিয়া তখনকার দুই এক কথা মনে আনিতে পারি মাত্র। তখন যে বিশেষ ঘটনাগুলি বড় জোরে আমাদের প্রাণে আঘাত করিয়াছিল, যাহার সহিত আমাদের মনের বিশেষ সংযোগ হইয়া মনকে বড় জোরে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি কখন আমাদের মনে উত্তেজনা বলে জাগিয়া উঠে—এই মাত্র। আমরা তখনকার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বটে, তখনকার মনকে অলিখিত

দের এই ব্যবহারিক জ্ঞানের ও ধর্ম্মনীতির ক্রমবিকাশশীলত্ব দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(২) দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্ ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—১। ৩৪৯।

(৩) ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইল:—

"The Jukes family, starting from a drunkard, produced in 75 years, 200 thieves and assassins, 248 invalids, and 90 prostitutes."

The Criminal—by Havelock Ellis.

Quoted by Guyan in his work on 'Education and Heredity.'

পুস্তকের মত মনে হয় বটে, যে স্মৃতির সূত্র ধরিয়া আমাদের বর্ত্তমান 'আমি'কে বা আমাদের সূত্রাত্মকে অতীতে লইয়া গিয়া আমাদের অতীত শৈশব কালের 'আমি'র সহিত বাঁধিয়া দিয়া সেই শৈশবের 'আমি'র সঙ্গে বর্ত্তমানের 'আমি'র একত্ব অনুভব করিতে পারি—আমাদের শৈশবের প্রথম চারি পাঁচ বৎসর আমার সেই স্মৃতির সূত্রকে,—আমার সেই 'আমি'কে খুঁজিয়া পাই না বটে, সেই শৈশব কালের কথা মনে আনিতে আমাদের সেই ধারাবাহিক 'আমি'র মালা ছিঁড়িয়া যায় বটে, সেখানে গিয়া আমার আমিত্বের ধারা ফল্গু নদীর ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া যায় বটে, তখন যে আমি ছিলাম, আমি কিছু করিয়াছিলাম, তাহা বড় মনে হয় না বটে,—কিন্তু সেই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসর আমার অজ্ঞাতে আমার অলক্ষ্যে আমার আমিত্বের বিকাশ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারি না। শৈশবে পিতা মাতা ও পরিবার-প্রমুখ সমাজ আমাদের গড়িয়া লয়—একথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

৩৫। বীজের বিকাশের পক্ষে যেমন ক্ষেত্র, এক অর্থে, আমাদের বিকাশের পক্ষেও তেমনই সমাজ। কেবল সমাজক্ষেত্রেই মানববীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না—অথচ দুই তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উৎপাদিকা নষ্ট হয় না, মানববীজও সেইরূপ উপযুক্ত পিতামাতা ও সমাজ না পাইলে বিকাশিত হইতে পায় না, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তবে বৃক্ষবীজে ও মানববীজে প্রভেদ আছে। ক্ষেত্রের প্রভেদে বীজে যে বৃক্ষত্ব থাকে, তাহার বিকাশে বিশেষ প্রভেদ হয় না,—কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশ পক্ষে পিতামাতা ও সমাজের প্রভেদে অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। পিতামাতা ও সমাজের সহায়তা ব্যতীত আদৌ আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। আর তাঁহারা আমাদের যেরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করেন, আমাদেরও সেইরূপ মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হইয়া থাকে। এক অর্থে, সমাজ আমাদের মাতাপিতা। কেননা, সমাজই আমাদের মাতাপিতা গড়িয়া দেন, আমাদের মাতাপিতার মধ্যে যেরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ করেন, আমাদের মাতাপিতাকে যেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন করেন, আমাদেরও সাধারণতঃ তদনুরূপ মনুষ্যত্বের ও তদনুরূপ প্রকৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। মাতাপিতা কেবল আমাদের জন্ম দেন না, কেবল আমাদের স্থূলশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করেন না। মাতাপিতাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে অনেকটা তাঁহাদের অনুরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশের মূল কারণ। তাঁহাদের হইতে আমরা ভাষা লাভ করি, ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, ব্যবহারিক হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি প্রথমে লাভ করি। আমরা এ সকল বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তাহার পর সেই শৈশবের 'অল্পবিষয়ামতি' আমাদের শুভাদৃষ্টবশে, মাতাপিতার পর পরিবারস্থ আত্মীয়, পরিবারের সংসৃষ্ট ব্যক্তির পর গ্রাম, তাহার পর দেশ, তাহার পর সমাজ, তাহার পর সমগ্র মানবজাতির সহিত সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে যত বিস্তার হইয়া পড়ে, ততই আমাদের বিষয়জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া আমাদের আমিত্বের বিকাশ হইতে

থাকে। এইরূপে পিতামাতা, স্বজন, স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বসমাজ, সমগ্র মানবজাতি ক্রমে ক্রমে আমাদের শিক্ষক জ্ঞানদাতা হইয়া, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাঁহাদের জন্য সহানুভূতি বা আত্মীয়তা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্য আমাদের কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ করিয়া দিয়া, আমাদের পরার্থ কর্ম্মচেষ্টা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের সহায় হন। (১) যাঁহারা পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবে সেই গ্রামে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন দ্বারা লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া, ক্রমে নগরে আসিয়া নিজের যত্নে সুশিক্ষা লাভ করিয়া পরে সমগ্র দেশকে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইয়াছেন, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই মহানুভব ব্যক্তিগণ একথা সহজে হৃদয়ঙ্গম করেন।

সমাজ আমাদের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন সমাজে বা স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া, বা তাঁহার পূর্ণমনুষ্যত্বকল্পনা মায়াশক্তিবলে শরীরী হইয়া, তাঁহার অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে সেই সমাজের উন্নতির উপযোগী জ্ঞানরত্ন আনিয়া তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (Revelation)। কোন সময়ে সাধনাসিদ্ধ নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণের অন্তরে মহাজ্ঞানজ্যোতি বিকীরিত হইয়া, তাহা সমাজ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কোথাও বা মহাপুরুষগণ সাধনাবলে কত অমূল্য সত্য লাভ করিয়া তাহা সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে বিভিন্ন সমাজে কত যুগযুগান্তর হইতে কত অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে। সমাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্রমে শিক্ষিত করিয়া, আমাদের জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি হইলে, আমাদের হাতে সেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি দিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন। আমরা ক্রমে সমগ্র মানবসমাজের বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়া—উন্নতির পথে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে, আত্মসম্প্রসারণের পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হইতে থাকি। (২) সুতরাং সমাজই

---

(১) এ সম্বন্ধে মার্টিনো যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"But the internal history, which brings fresh instincts into operation and enlarges our psychological view, itself depends upon the play of new influences upon us from the external scene: as the relation of the family, the village, the clan, the state and at last the *genus humanum*, become included within the circle of cognisance, corresponding affections wake into life and enrich the personality with motive energies unfelt and unappreciated before ;.........And this process so implicate together the agent and his fellows, that we can scarce divide the causal factors into individual and social, inner and outer : *bodily* to doubt, he stands there by himslf, while his family are grouped separately round him : but *spiritually* he is not *himself* without them, and the major part of his individuality is relative to them as theirs is relative to him."

J. Martineau's Types of Ethical Theory. Vol. II. P. 402,

(২) এ সম্বন্ধে ইটালীর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ম্যাটসিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইলঃ...

"God has Placed beside you a Being, whose life is continuous, whose faculties are the results and sum of all the individual faculties that have existed for perhaps four hundred ages ;......This Being is Humanity. A thinker of the past century has described Humanity as *a man that lives and learns for ever.* Individuals die but the amount of truth they have thought and the sum of good they have done, dies not with them.........

Each of us is born today in an atmosphere of ideas and beliefs, which has been elaborated by all anterior Humanity.

We pass along, the voyages of a day, destined to complete our individual education elsewhere, but the education of Hu-

আমাদের জ্ঞানলাভের, আমাদের আত্মসম্প্রসারণ শিক্ষার, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃত ভূমি। সমাজই আমাদের কর্ম্মপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, পরার্থবৃত্তিসাধনার উপায় করিয়া দিয়া, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত, সমাজের সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি হইতে আমাদের কর্ম্মশক্তি বিকাশের সুবিধা হয়। সমাজের সমষ্টি চেষ্টা হইতে, সেই 'কার্য্যসাধিকা সংহতি'র যত্নে আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টায় যাহা দূর করা অসাধ্য, এরূপ আত্মসংকোচকারী বিভিন্ন রূপে দুঃখের হ্রাস হইয়া গিয়া, আমাদের আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। আমরা সাধারণতঃ সমাজের শ্রেষ্ঠ লোককে আদর্শ ধরিয়া তাঁহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি। এইরূপে আজীবন সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হন।

৩৬। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সমাজ ব্যতীত মানুষ পশুর অধিক কিছুই নহে। সমাজের সহায়তা ব্যতীত মানুষ নিরাশ্রয়। সমাজই মানুষকে মানুষ করে, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাই মানুষ, মানুষ হয়। আবার, যে সমাজ যতদূর উন্নত, সে সমাজে ততদূর উন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। সমাজে আমরা যেরূপ পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পাই, সমাজের যে অঙ্গের সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয়, সেই পরিমাণে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, পশুপালিত মানবশিশু, তাহার প্রাক্তণ মানবোচিত সংস্কার বিকাশোন্মুখ হইলেও, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সে ক্রমে পশু হইয়া যায়। অসভ্য সমাজে প্রতিপালিত মানবশিশু, সেই সমাজে যতটুকু মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব, তাহার অধিক, বা তাহা অপেক্ষা অধিক বিকাশিত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজান্তর্গত ব্যক্তির সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকে। অসভ্য নগ্নদেহ আমমাংসভোজী আণ্ডামানবাসী বা অষ্ট্রেলেসিয়ার আদিনিবাসী লোকসমাজ মধ্যে সেইরূপ অসভ্য মানুষই জন্মিয়া থাকে, কেবল সেইরূপ হেয় মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ অসভ্য সমাজের শিশু, সেই সমাজে বাল্যকালে লালিত পালিত হইয়া, পরে সভ্য সমাজ মধ্যে তাহাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলেও—সে তাহার স্বাভাবিক বা সহজাত ও বাল্যকালে অঙ্কুরিত সেই অসভ্য সমাজের লোকের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না,—ইহার যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

অতএব আমরা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে শৈশবকালে পিতামাতা বা আত্মীয়ের নিকট শিক্ষিত হই, আমাদের চরিত্র সেই সমাজের অনুরূপ হয়। সে সমাজে যে পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব—তাহার অধিক আর আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। অসভ্য সমাজে, কালিদাস ভবভূতি সেক্ষপীয়র কি মিলটনের মত কবি, শঙ্কর কি ক্যাণ্টের ন্যায় পণ্ডিত জন্মিতে পারেন না। আর যদি দৈববিপাকে, কোন অসভ্য

---

manity ..… is progressively and continuously evolved through Humanity…..."

J. Mazzini—'On the Duties of Man.'

সমাজের পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেক্ষপীয়র কি গেটির প্রেতাত্মার, সেই অসভ্য সমাজে প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে আর তাঁহাদের সেক্ষপীয়র কি গেটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাঁহাদিগকে সেই অসভ্য সমাজে অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিতে হয়, বড় জোর তাঁহারা গ্রাম্যকবি রূপে সেই অসভ্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। আর যদি তাঁহারা নিতান্ত অসভ্য আণ্ডামানবাসীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেরূপ গ্রাম্য কবি হওয়াও আর সম্ভব হয় না। তবে হয়ত তাঁহারা কখন কখন পশু শিকার কালে, প্রাক্তন সংস্কার বশে, প্রকৃতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই প্রকৃতি পূর্ণশোভার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে মহিমাময়ী লীলাবিলাসে আকৃষ্ট হইয়া, মুহূর্ত্ত জন্য প্রাণের একরূপ অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট আবেগ বলে বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া যাইবেন। বিশেষ উন্নত সমাজ ব্যতীত সে সমাজে ব্যাস বাল্মিকী বা শঙ্কর ক্যাণ্টের জন্ম হইতে পারে না। যেমন ফল হইতে বৃক্ষকে জানা যায়, তেমনই কোন্ সমাজ কত উন্নত, কোন্ সমাজ কতদূর আদর্শের অভিমুখে যাইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা সেই সমাজের প্রকৃত 'বড় লোক' বা মহাপুরুষদের কথা হইতে জানিতে পারি। যে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব শ্রীরাম চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে সমাজে ব্যাস বাল্মিকী, কপিল, বশিষ্ট বিশ্বামিত্র, ভীষ্ম যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুন, সীতা সাবিত্রী, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন, সে সমাজে যে কত উন্নত হইয়াছিল, তাহা যে কতদূর আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আমরা ইহা হইতে সহজে অনুমান করিতে পারি।

৩৭। সে যাহা হউক, এই মহাপুরুষ প্রসঙ্গে আমাদের আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ লোকের কথা হইতে ইঁহাদের কথা ভিন্ন। ইঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার। কোন সমাজে সহস্র কি দশসহস্র লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত শক্তিধর বা প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিতে পারেন। আর কোন সমাজে কদাচিৎ কোন কালে, লক্ষ বা কোটী লোকের মধ্যে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম,—তাঁহার রাজ্যে অপব্যয় বা অপব্যবহার নিতান্ত অল্প। এজন্য প্রকৃতির অনুগ্রহে, বা ভগবৎকৃপায়, এই সকল শক্তিধারী লোক বা মহাপুরুষগণ জন্ম হইতেই তাঁহাদের প্রকৃত বিকাশের উপযোগী অবসর ও অনুকূল অবস্থার সহায়তা প্রাপ্ত হন। সাধারণ লোক অপেক্ষা, ইঁহাদের জীবনে এই ভগবদনুগ্রহের বা অনুকূল অবস্থা সংযোগের অনেক অধিক চিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, সাধারণ লোক অপেক্ষা এই সকল মহাজন বা শক্তিশালী পুরুষদের আধ্যাত্মিক শক্তি অত্যন্ত অধিক। তাঁহাদের সংস্কারবীজের বিকাশশক্তি অত্যন্ত বেগবতী। এজন্য সাধারণ প্রতিকূল অবস্থায়ও তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে নিয়মিত বা পরিচালিত কি কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারে না। তাঁহারা অতি শৈশব হইতেই এই বিশেষত্বের পরিচয় দেন। তখন হইতেই, তাঁহারা বাহ্যবিষয় দ্বারা বিশেষ অভিভূত হন না। তাঁহারা অসত্য ও অকল্যাণের মধ্যে থাকিয়াও সত্যপথ বা কল্যাণপথ বাছিয়া লন।

এই সকল মহাপুরুষদের স্বাভাবিক

জ্ঞানশক্তি, তাঁহাদের স্বাভাবিক চরিত্রের (intrinsic character এর) বল বড় অধিক, ও বড় পরিস্ফুট। ইহাঁদের লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক চরিত্রবল ও আমাদের অন্তরে অনন্ত অপৌরুষেয় জ্ঞানশক্তি ও তাহার বিশেষ বিকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁদের অন্তরেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশ হয়, জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি বা আনন্দবৃত্তির বিশেষ পরিণতি হয়,—মনুষ্যত্বের মহা আদর্শ ইহাঁদের অন্তরে প্রকাশিত হয়। ইহাঁদের নির্ম্মল অন্তরে, ইহাঁদের সমাজের উন্নতি ও রক্ষার উপযোগী ভগবানের যে জ্ঞানালোকের কয়েকটী রশ্মি প্রতিফলিত হয়—পরমপুরুষের অন্তরস্থ যে সকল মহাভাবের (বা Idea র) বিকাশ হয়,—তাহা সমগ্র সমাজ মধ্যে বিকীর্ণ বা প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র সমাজকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে, আদর্শের পথে লইয়া যাইতে থাকে। ইহাঁরা সমাজের নেতা—সমাজের মস্তক।

বলিয়াছিত, এই মহাপুরুষদের কথা স্বতন্ত্র। 'ক্ষুদ্রসত্ত্ব' সাধারণ লোকের সহিত ইহাঁদের তুলনা হয় না। সাধারণ লোকদের সংস্কারশক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। সেইজন্য তাহাদের উপর বাহ্য অবস্থার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। সেইজন্য তাহাদের পিতৃমাতৃশক্তি, তাহাদের সমাজ—তাহাদের যে যে সংস্কারবীজের বিকাশ সম্বন্ধে সহায় হয়—বা অনুকূল হয়, কেবল সেই সেই সংস্কারবীজই বিকাশিত হইয়া তাহাদের চরিত্র সংগঠন করে। এজন্য সাধারণ মানুষকে সমাজ গড়িয়া লয়, একথা বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে। আর উল্লিখিত শক্তিশালী মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও একথা প্রযুজ্য। তাঁহারাও দৈবানুগ্রহে অনুকূল পিতামাতা বা অনুকূল সমাজ প্রথমে না পাইলে, তাঁহাদের বিকাশের সম্ভাবনা থাকিত না, একথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব মানুষ সমাজবৃক্ষের ফল, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা সর্ব্বথা বলা যাইতে পারে।

৩৮। অতএব সমাজ যেরূপই হউক, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি যতই অধিক হউক, সমাজ যে তাহার নিজের উপযোগী মানুষ গড়িয়া লয়, একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। সমাজ ছাড়িয়া, সমাজের সহায়তা বিনা, কেহ কখন মানুষ হইতে পারে নাই। তুমি গর্ব্ব করিতেছ, মনে করিতেছ, তুমি নিজশক্তি বলে নিজ প্রভাবে আজ বড় হইয়াছ—বুঝি সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছ। তাই তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিতেছ। হয়ত তোমার সমাজ নানা কারণে শক্তিহীন হইয়াছে, সমাজ আর তোমাকে শাসন করিতে পারে না। তাই তুমি সমাজকে অবজ্ঞা করিতেছ—সমাজশাসন উপেক্ষা করিতেছ। তাই তুমি যথেচ্ছাচার করিতেছ,—যাহাতে আপনার সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আচরণ করিতেছ। সমাজের প্রতি একবার লক্ষ্য করিতেছ না, তোমার কাজে সমাজের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা একবার দেখিতেছ না। সমাজের আর দশ জন লোক তোমার অনুকরণ করিয়া, সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, সে দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছ না। মূর্খ তুমি, তুমি জান না—সমাজ তোমার পিতামাতা, অথবা পিতামাতা অপেক্ষাও বুঝি বড়। তুমি পণ্ডিত, বিদ্বান হইয়াছ,—তুমি অর্থো-

পার্জ্জন করিয়া ‘বড়লোক’ হইয়াছ,—তুমি জান না যে তুমি সেই সমাজবৃক্ষেরই ফল। তুমি সমাজের শিশু। সমাজ পিতামাতা হইয়া তোমাকে যেরূপ গড়িয়াছে, তুমি তেমনই হইয়াছ। সমাজ তোমাকে মানুষ করিয়াছে—তাই তুমি মানুষ হইয়াছ। না হইলে—তুমি পশুর অধিক কিছুই নহ। তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিলে পিতামাতাকে উপেক্ষা করা অপেক্ষা অধিক অন্যায় করিবে,—তুমি সমাজদ্রোহী হইলে পিতৃমাতৃদ্রোহী অপেক্ষাও অধিক দুষ্কৃতভাগী হইবে,—তুমি তোমার স্বার্থপর আচরণ দ্বারা সমাজঘাতী হইলে পিতৃমাতৃহন্তার ন্যায় পাতকগ্রস্ত হইবে। সমাজ হইতে তুমি তোমার মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, তোমার সবই তুমি সমাজ হইতে পাইয়াছ। তুমি ‘বড়লোক’ হইয়াছ, জ্ঞানী হইয়াছ,—উত্তম। যাহার জন্য তুমি ‘বড়লোক,’ শক্তি থাকে, তুমি তাহার সেবা কর। মনে রাখিও, যে ‘বহু’র আশ্রয়, তাহারই জীবন সার্থক। (১) কিন্তু তুমি যদি সমাজের উন্নতি ও রক্ষার জন্য কর্ম্ম না কর, যদি নিজের স্বার্থ বা সুবিধার জন্য সমাজকে উপেক্ষা কর, যদি ভ্রান্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেও সমাজের ক্ষতি কর, বা সমাজকে ত্যাগ কর, তবে তুমি নিতান্ত পাপী। (২) তুমি যে হও, ভগবানের যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমার নিজের যাহাই যাহাই থাকুক, তুমি ভগবানের কার্য্য করিতে, তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র হইতে সংসারে আসিয়াছ। ভগবানের কার্য্য করিবার উপযোগী হইবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতি তোমাকে সমাজ সহায়ে গড়িয়া লইয়াছেন। জগন্নাথের রথের ন্যায় ভগবানের এই সমাজরথ—এই সমগ্র সংসার-রথ, তুমি আমি সকলে মিলিয়া জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ভগবানের যন্ত্র স্বরূপে টানিয়া লইয়া চলিয়াছি। তাই সংসাররথের চক্র নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালবশে অগ্রসর হইতেছে। যে সে রথের মহাডোর ধরিয়া না টানিতে চাহে—যে একপার্শ্বে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে চাহে, তাহার জীবন বৃথা,—সে একদিন না একদিন সেই মহা রথের মহা গতিতে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। (১)

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত মানবের স্বরূপ ও তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশতত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কেন না, একথা না বুঝিলে সমাজের সহিত মানবের সম্বন্ধ বুঝা যায় না। এই আলোচনা হইতে আমরা ইহা আরও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সমাজ কখনই আমাদের উপেক্ষণীয় নহে। সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়। সমাজই আমাদের গড়িয়া লইয়াছেন, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সমাজশরীর বা সমাজাত্মা কাল্পনিক কথা—আমরা ইহাও বলিতে পারি না। মানুষ পরস্পর নিজের সুবিধার জন্য মিলিত হইয়া চুক্তি করিয়া সমাজ গড়িয়া লয়, বা

---

(১) দক্ষ সংহিতায় আছে :—
“স জীবতি য এবৈকো বহুভিশ্চোপজীব্যতে।
জীবন্তোমৃতকাশ্চান্যে য আত্মম্ভরয়ো নরাঃ।
বহ্বার্থে জীব্যতে কশ্চিৎ কুটুম্বার্থে তথাহপরৈঃ।”৩৩

(২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে :—
“তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন
এস সঃ।” ৩।১২।
‘ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।’ ৩।১৩।

ব্যতীত আর কিছুই নহ। তোমার নিজস্ব

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে :—
“এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।” ৩।১৬

সমাজের পরিবর্ত্তন করে, এবং সমাজের ব্যক্তিমানবদের চৈতন্যসমষ্টিই সমাজচৈতন্য বা সমাজাত্মা, আমরা একথা আর স্বীকার করিতে পারি না। যখন মানুষকেই সমাজ গড়িয়া লইয়া আপনার উপযোগী করিয়া আপন অঙ্গীভূত করিয়া লয়, তখন সেই মানব-চৈতন্য সমষ্টি সে সমাজ সমাজচৈতন্য হইতে পারে না,সমাজাত্মা সেই ব্যক্তিচৈতন্য সমষ্টি হইতে পৃথক্,—আমরা একথা বলিতে বাধ্য হই। এই সমাজাত্মা কে, তাহা এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই সমাজাত্মা কে—তাহা জানিতে পারিলে, মানবের সহিত সমাজের সম্বন্ধ আমরা আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিব।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

ত্রিকলিঙ্গ

প্রাচীন ভারতের রাজ্য সংস্থানের একটা নক্‌সা না দিতে পারিলে বক্তব্য কথাগুলি পরিষ্কার হইবে না। অন্ততঃ পক্ষে যদি পাঠকগণ একখানি এ কালের ম্যাপ অবলম্বনে বর্ণিত প্রদেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা হইতে পারে।

মধ্যপ্রদেশের যে বিভাগ এখন ছত্তিশগড় নামে আখ্যাত, উহার বিলাসপুর জেলার অধিকাংশ, রায়পুরের পূর্ব্ব সীমার কিয়দংশ, এবং সম্বলপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমার অত্যল্প অংশ, দক্ষিণ কোশল বা মহাকোশল নামে পরিচিত ছিল। কোশল দেশ যে আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ সীমায় বিন্ধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ছিল, এ কথা খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পাণিনিতেও আছে। (পাণিনি ৪-১-১৭১)। কোশল রাজ্যের বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিতির কথা, মার্কণ্ডেয় এবং মৎস্যপুরাণেও পাওয়া যায়। হৈহয় রাজাদিগের একটী বংশ যে পৌরাণিক যুগে কোশলে রাজত্ব করিতেন, তাহা অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে। এ কালের বিলাসপুর জেলার রতনপুরে, এবং তাহার অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে, এই প্রদেশের রাজাদিগের যে সকল তাম্রলিপি পাওয়া যায়, তাহাতে এই রাজাদিগকে হৈহয় বংশোদ্ভব বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়।

পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদের কৃপায়, হরিচন্দ্রবিরচিত ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয় নামক একখানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। এই কাব্যে কোশলপতি ধর্ম্মশর্ম্মার অভ্যুদয় বর্ণিত। রত্নপুরে যে ইহাদের রাজধানী ছিল, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, তবে কাব্যের ভাষার গৌরবের জন্য, কোথাও বা এই নগরটীকে "মুক্তাময় বিগ্রহপুর" বলা হইয়াছে। এই কাব্যে কোশলদেশের যে বর্ণনা আছে, এবং রত্নপুর হইতে বিদর্ভ পর্য্যন্ত গমনের যে পথের বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে এই কোশলটী বিলাস্থর বলিয়া প্রতীত হয়। ২১ সর্গের ১৮৪ শ্লোকে আছে :—

তত্রাসাদ্য সিতাং শুভোগ সুভগাং চৈত্রে চতুর্থীং তিথিং,
যামিস্থাং স নবোত্তরৈর্যমবতাং সাকং শতৈরষ্টভিঃ।

ইত্যাদি।

এই চৈত্র শুক্ল চতুর্থী ৮০৯ শক সংবৎসর হইতে, গ্রন্থখানি যে ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, তাহা জানিতে পারা যায়। নাটককার রাজশেখরের অভ্যুদয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে

বলিয়া নির্ণীত। তিনি তাঁহার কর্পূরমঞ্জরী নাটকে এই হরিচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া, হরিচন্দ্রের এই সময় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। নবম শতাব্দীতে যে রাজ্য কোশল বলিয়া কথিত, তাহাই যে প্রাচীন কোশল দেশ, তাহা পূর্ব্বকালের বর্ণনার সহিত মিলাইলেই সুস্পষ্ট হয়।

শিবগুপ্ত ও ভবগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন রাজা এই দেশে এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা মেকল (কোশলের দক্ষিণ পশ্চিম ভূভাগ) কোশল এবং উৎকলের রাজা বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন, এবং ঐ তিনটী প্রদেশকে সমবেত ভাবে ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা হরিচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী, তাহা সহজে নির্ণীত হওয়া দুঃসাধ্য। হরিচন্দ্রের সময়ে যে কোশলের রাজারা হিন্দুয়ানি মিশ্রিত একটা অদ্ভুত রকমের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয় তাহার নিঃসংশয় সাক্ষী। শিবগুপ্ত ভবগুপ্ত প্রভৃতি যে শৈব ছিলেন, তাহাও তাঁহাদের প্লেটে সুস্পষ্ট লিখিত আছে। শিবগুপ্ত প্রভৃতি আপনাদিগকে সোমকুলতিলক বলিয়াছেন, কিন্তু হরিচন্দ্র, কোশল রাজাদিগকে ঈক্ষাকুবংশীয় বলিয়াছেন। ইঁহারা যে বিভিন্ন বংশীয় এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা জানিতে পারা যায়। সপ্তম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, যখন হুয়েন সাং এই মহা কোশল দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই স্থানের রাজাদিগকে ক্ষত্রিয় এবং বৌদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন জাজল্লদেব রত্নপুরের রাজা, তখন এই দেশের রাজারা আর বৌদ্ধ নহেন। এই জাজল্লদেব আপনাকে চেদীশ্বর, দক্ষিণ কোশলপতি এবং কার্ত্তবীর্য্য হৈহয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দক্ষিণ কোশলের যে অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু শিবগুপ্ত প্রভৃতি ঠিক এখানকার রাজা ছিলেন কি না, তাহা দেখিতে হইতেছে। ইন্দ্রবল, নন্নদেব এবং তিবরদেব যে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মেকলের অধীশ্বর হইয়া রাজিমে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। এই তিবরদেব যখন হিন্দু বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত নাম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন কোশলে স্বতন্ত্র রাজা ছিল। হয় ত ইনি প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন বলিয়া নাম মাত্রে সকল দেশের রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন।

কানিংহাম বলিতে চাহেন যে, শিবগুপ্ত, ভবগুপ্ত এবং দ্বিতীয় শিবগুপ্ত এই তিবরদেবের বংশধর। উঁহারা পরবর্ত্তী বলিয়াই যে তিবরের বংশধর, এ কথা বলা যায় না। শিবগুপ্তাদির প্লেটে কোথাও তিবরের নাম নাই; কিন্তু 'গুপ্ত' পদবী দেখিয়া তিবরের দ্বিতীয় নামের (চন্দ্রগুপ্ত) সহিত হয়ত এই বংশাবলী গ্রথিত করিয়াছেন। তিবরের বংশাবলী হইতেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। তিবরদেব বা চন্দ্রগুপ্ত নন্নদেবের পোষ্যপুত্র এবং নন্নদেবের পিতার নাম ইন্দ্রবল। তিবর, আপনাকে পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া শিরপুর প্লেটে বর্ণনা করিয়াছেন। বেগ্লার সাহেবের শিরপুর প্লেটে আবার দেখা যায়, যে ইন্দ্রবলের পিতার নাম উদয়ন; এবং এই উদয়ন শবর বংশীয়। শবরেরা যে মেকল হইতে উৎকল পর্য্যন্ত সমগ্র রাজ্যের রাজা হইয়াছিল, তাহা পুরাণেও পাওয়া

যায়। শিবগুপ্তাদি যখন সোমকুলতিলক, তখন উঁহাদিগকে তিবরের বংশোদ্ভব বলিতে পারা যায় না। অন্যদিকে আবার পল্লবমল্ল নন্দীবর্ম্মা যে প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উদ্দয়নাক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাও জানা গিয়াছে। (Ind. Ant. vol III

শিবগুপ্তাদির সকলের প্লেটেই একজন জনমেজয়ের বিজয় রাজ্যের সংবৎসর প্রদত্ত হইয়াছে। উৎকলের যযাতিও এই জনমেজয়ের নাম করিয়াছেন, এবং আপনাকে শিবগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়াছেন।

এই জনমেজয় কে, এবং কোথাকার রাজা ছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। শিবগুপ্তাদি যখন ইঁহার নামের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তখন, ইনি হয়ত উৎকল মেকল, বা কোশল, বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজা ছিলেন। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোরির ৪র্থ ভাগে, একজন জনমেজয়ের একখানি প্লেট মুদ্রিত আছে। ইনি যে কোন বনিয়াদি রাজ বংশের লোক নহেন, এবং আপনার ক্ষমতাতেই রাজা হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই যে, ইনি আপনাকে একেবারে যুধিষ্ঠিরাদির বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাচীন খোদিত লিপির সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, রাজাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব রাজাদিগের নাম কীর্ত্তন করা, একটা নিয়মের মধ্যে ছিল। কেবল যাঁহারা নিজে রাজা হইয়া উঠিতেন, তাঁহারাই এই প্রথা অবলম্বন করিতেন না। জনমেজয় বলিতেছেন যে, ইনি কিস্কিন্ধার রাজা। সে কথা ভাল। এই প্লেটখানি যে কদাপি ৮ম্ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, তাহা ঐ লিপি হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায়। প্লেটের তারিখ দিয়াছেন, "যুধিষ্ঠিরশকে প্লবঙ্গ ক্ষয়ে কোন নবতি বৎসরে (৮৯), সহস্যমাসি অমাবস্যায়ং সোমবাসরে।" তারিখটাও বাঁদুরে বটে। সহস্য মাসের অর্থ পৌষ মাস; প্লবঙ্গ বলিতে বাঁদরও বুঝায়, এবং বৃহস্পতির ষাট বৎসরের যুগের ১৫ বৎসরও বুঝায়। দেখা যাউক, এই কথাগুলি ধরিলে, একটা তারিখ পাওয়া যায় কিনা। যুধিষ্ঠিরকে প্রপিতামহ বলিয়া, জনমেজয় কিস্কিন্ধার লোককে বোকা বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু পণ্ডিত ও সভাসদদিগের কাছে যে চালাকি করেন নাই, তাহা নিশ্চিত। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, যুধিষ্ঠিরের নাম রাখিয়া, সত্য তারিখটাও দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রাজতরঙ্গিণীর হিসাবে (এই হিসাবটাই পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল),

শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণাম ভূবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

কলির আরম্ভের পর ৬৫৩ বর্ষে যুধিষ্ঠির শক আরব্ধ। এখন ঐ শকের ৮৯ বর্ষে, অর্থাৎ ৭৪২ যুধিষ্ঠির শকে ইহার রাজত্ব। তাহার উপর আবার "বঙ্গাখ্য" ধরিতে হইবে। এখানে যে বৃহস্পতি যুগ গণনা করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে নক্ষত্রাদির কথা থাকিত। সোজা সুজি ঐ তারিখের সঙ্গে ১৫ বৎসর মিলাইয়া লইবার সঙ্কেত মাত্র পাওয়া যায়। এ গণনায় ৭৫৭ শক পাওয়া গেল। এই শকটা দক্ষিণ দেশ প্রচলিত শক সংবৎসর। কেবল যুধিষ্ঠিরের নামাদি দ্বারা ঐটীর গৌরব বাড়ান হইয়াছে; অথবা চালাকি খেলা হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের নাম লইয়া যখন ইনি অনেক চালাকি করিয়াছেন, তখন এই অনুমান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এ হিসাবে এই জনমেজয় ৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া পড়িতেছেন। প্লেট

খানির অক্ষর এবং অবস্থার সহিত যে এই তারিখের বিরোধ নাই, বরং মিল আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই প্লেটে লিখিত আছে যে, জনমেজয় তুঙ্গভদ্রা স্নানের পর এই দান লিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তুঙ্গভদ্রা যে ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে তীর্থ হয় নাই, তাহা এখানে বিস্তৃত ভাবে বলিবার সুবিধা হইতেছে না। অতদূর দক্ষিণ প্রদেশে যে ঐ সময়ের পূর্ব্বে আর্য্যেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসবাস করেন নাই, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

এখন দেখা যাউক, এই জনমেজয়ের সহিত শিবগুপ্তাদির সম্পর্ক থাকিতে পারে কি না। প্রথম কথা এই যে, ইহার রাজত্ব স্থল কিষ্কিন্ধ্যা কোথায়? উৎকল যে কিষ্কিন্ধ্যা নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, রামায়ণে যখন কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদিগকে চারিদিকে যাইবার কথা হইল, তখন উৎকলের নামও হইয়াছিল। কিষ্কিন্ধ্যা যে বহু দক্ষিণবর্ত্তী দেশ নহে, বরং আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ সীমা প্রদেশস্থ দেশ, তাহা পতঞ্জলির মহাভাষ্যে পাইতেছি। মহাভাষ্যের ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১ম আহ্নিকে, যেখানে প্রতিজ্ঞা করা হইল, যে আর্য্যাবর্ত্তবাসী দ্বিজেতর বর্ণই শূদ্র; সেখানে এই প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে "কিষ্কিন্ধ" (দক্ষিণ দেশীয়), "শকযবন' (আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যস্থ পশ্চিম দেশবাসী), প্রভৃতিকে শূদ্র বলিতে হয়। তাহার পর অন্ত সংজ্ঞা দ্বারা উহাদিগকে অনার্য্য করা হইল; এবং শূদ্রত্বের গৌরবদান করা হইল না। মহাভাষ্যের এই সূত্রেই যখন বিন্ধ্য প্রদেশকেই আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ বলা হইয়াছে, তখন চেদি হইতে আরম্ভ করিয়া কোশল পর্য্যন্ত যে ভূভাগ বিস্তৃত, কিষ্কিন্ধ্যা অবশ্যই তাহার কোন অংশের নিকটবর্ত্তী। রামায়ণে আছে যে, কিষ্কিন্ধ্যাদেশ, শবরীপুর ও পম্পার পূর্ব্বদিকে, ও অনতিদূরে অবস্থিত। শবরীপুর যে রাজিম, অর্থাৎ কোশলের দক্ষিণে রায়পুর জেলার নগর, তাহা এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন উহার পূর্ব্বভাগে সম্বলপুরের অরণ্য পরিব্যাপ্ত প্রদেশ পাওয়া যায়। এই দেশটীকে কিষ্কিন্ধ্যা বলিয়া ধরিলে রামায়ণের কোন বর্ণনার সহিত অমিল হয় না।

সম্বলপুর জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমে, পাটনায় এবং সোনপুরে, শিবগুপ্ত এবং ভবগুপ্তদিগের অনেক প্লেট পাওয়া গিয়াছে। সকল প্লেটেই ইঁহারা "জনমেজয়স্য বিজয়রাজ্যে সংবৎসরে" ইত্যাদি বলিয়া, দানপত্রের তারিখ দিয়াছেন। প্রথম শিবগুপ্তের একখানি প্লেটের তারিখ "জনমেজয়স্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎসরে তৃতীয়ে" পাইয়াছি। ইহাতে জানা যায় যে, এই শিবগুপ্ত, জনমেজয়ের সহিত যে সম্পর্কেই সম্পর্কিত হউন, জনমেজয়ের বিজয়ের অল্প পরেই ইনি রাজা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় শিবগুপ্তের একখানি প্লেটে ঐ সংবৎসরের ৩১, এবং তদীয় পিতা ভবগুপ্তের প্লেটে ১৫ পাইয়াছি। এই রাজারা যে সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন নাই, তাহাও ধরিতে পারা যাইতেছে। বলিয়া রাখি যে, শিবগুপ্তেরা যে তিবরের পরবর্ত্তী, তাহা নিশ্চিত।

সম্বলপুর অঞ্চলে যাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে মেকল, কোশল ও উৎকলের অধীশ্বর হইবার গৌরব হইতে পারে। শিবগুপ্ত যখন তিবরদেবের নাম করেন নাই, তখন মনে করা যাইতে পারে

যে, তিবরের পর শিবগুপ্তাদি রাজিম ও উৎকল দখল করিয়াছিলেন, এবং হীনবল বলিয়া কোশল রাজকেও অধীনস্থ রাজা করিয়া লইয়াছিলেন। এরূপ হইলে, দ্বিতীয় শিবগুপ্ত ৮৫০ হইতে ৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ধরিতে পারা যায়; কারণ তাঁহার একখানি প্লেটে জনমেজয়ের বিজয়ের ৩১ সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে।

যযাতি যখন শিবগুপ্তের সমসাময়িক, এবং শিবগুপ্তের পর জনমেজয়ের বংশধররূপে উৎকল অধিকার করেন, তখন এই যযাতি একেবারে নবম শতাব্দীর শেষভাগে পড়েন। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, যযাতি ৮১১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। ফ্লিট সাহেবের সুতীক্ষ্ণ গণনায় তিবরদেব নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। উদয়নের শেষ সময় প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইলে তদীয় প্রপৌত্র তীবরদেবের সময়, প্রায় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পড়ে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, ঐ গণনায় শিবগুপ্ত এবং যযাতি, নবম শতাব্দীর শেষভাগের রাজা। যযাতি যদি জনমেজয়ের অব্যবহিত পরে প্রথম শিবগুপ্তেরও সমসাময়িক হয়েন, তাহা হইলেও ৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার রাজত্ব আরব্ধ হইতে পারে না। কারণ জনমেজয়ের সময়ও ৮৩৫ বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। কাজেই এই কিষ্কিন্ধ্যাবাসী জনমেজয়কেই শিবগুপ্ত এবং যযাতির জনমেজয় বলিয়া অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয়। তাহা না হইলেও যে সময়ের সম্বন্ধে কোন গোল হয় না, তাহা স্মরণ রাখা ভাল।

হইতে পারে যে, ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি হইবার পর, শিবগুপ্ত কটক অঞ্চলে রাজধানী করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা যে সম্বলপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অনেক প্লেটেই তাহা পাওয়া যায়। যযাতি হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকলের শেষ রাজা পর্য্যন্ত, কেহই সম্বলপুর অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন নাই; কালাহাণ্ডি হইতে সম্বলপুর পর্য্যন্ত ভূভাগে যে সকল রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, বা করিতেছেন, তাঁহারা কেহই উৎকল প্রদেশ হইতে আগত নহেন; অথচ এই প্রদেশের ভাষা উড়িয়া। শিবগুপ্তাদির প্লেটের অক্ষর এবং যযাতির প্লেটের অক্ষর হইতে যে ক্রমবিকাশে উড়িয়া অক্ষরের উৎপত্তি, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে প্রাকৃত ভাষা শিবগুপ্ত এবং যযাতির সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহারই ক্রম বিকাশে যে উৎকল ভাষা, তাহাও উদাদের প্লেটের অনেক শব্দ হইতে অনুমিত হয়। সোনপুরের একটী প্রস্তর (স্তম্ভ) লিপিতে আছে;—"যে দান হরই তাহার মুণ্ডরে ব্রহ্মতাল রুদ্রতাল * * পড়ই"। এই প্রস্তর লিপি, ভবগুপ্তের সময়ের অত্যল্প পরবর্ত্তী। পরবর্ত্তী সময়ে যখন সম্বলপুর অঞ্চল উৎকলের শাসনের বহির্ভাগে ছিল, তখন যযাতি প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে যে মূল উৎকল ভাষা সম্বলপুর প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা স্বীকার না করিলে, তৎপ্রদেশীয় অনার্য্যদিগের মধ্যেও উৎকল ভাষার প্রভাব, বুঝিতে পারা যায় না।

আর্য্য প্রভাবের পূর্ব্বে, যে অনার্য্য জাতির "উৎ—কল" (চিৎকার শব্দ) হইতে দেশের নামকরণ হইয়াছিল, তাহারা এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে, কে জানে? কিন্তু নূতন ওড়িয়া ভাষার মূল পত্তন যে, যযাতি প্রভৃতির সময় হইতে, তাহাতে

সন্দেহ হয় না। যযাতির সময়ের প্রায় ১০০ বৎসরের পরেই, সম্বলপুর, সোনপুর এবং পাটনা, পাটনার রাজার রাজ্য বলিয়া পাওয়া যায়। এই পাটনার রাজা যে উৎকল দেশীয় নহেন, তাহা ঐ রাজবংশের ঐতিহ্য হইতেই জানা যায়। যে শিবগুপ্তাদির বংশের এবং যযাতি-বংশের প্রভাবে উৎকল ভাষা, এবং হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রভাবে সম্বলপুর অঞ্চলে দশম শতাব্দীর পূর্ব্বেই ঐ ভাষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জন্য উৎকলের সহিত সম্পর্ক রহিত এবং বিদেশগত হইয়াও, রাজারা দেশ প্রতিষ্ঠিত ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাজেই মনে করা যাইতে পারে যে, শিবগুপ্তই হউন, আর যযাতিই হউন, সকলেই মেকল এবং কোশলের পূর্ব্বভাগ হইতেই উৎকল প্রদেশে গিয়াছিলেন। কটক অঞ্চলে যদি উঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বা উৎপত্তি স্থান হইত, তাহা হইলে কেবল মাত্র দেশ জয় করিয়া, বা কর আদায় করিয়া, কালাহাণ্ডি হইতে সম্বলপুর পর্য্যন্ত, উড়িয়া ভাষা চালাইতে পারিতেন না। শিবগুপ্ত এবং যযাতির পূর্ব্বে যখন উৎকল দেশ যবন পরিবৃত বা শবরাধিকৃত ছিল, তখন যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। শিবগুপ্তাদির সময় হইতে সম্বলপুর অঞ্চলে যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের গুণে ক্রিয়াকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, আধুনিক রাজার উৎকল দেশ হইতে নূতন ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। সে খুব অল্পদিনের কথা। এই নূতন উৎকলীয় ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ঝাড়ুয়া বা আরণ্যক নাম দিয়াছেন। সংখ্যায় এই ঝাড়ুয়াগণ সম্বলপুর প্রদেশে, উৎকল ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অনেক অধিক। এই ঝাড়ুয়া ব্রাহ্মণগণের বিস্তৃতি, সম্বলপুর বিভাগের বাহিরে অতি অল্প পরিমাণে, বৌধ আটমল্লিক প্রভৃতি গড়জাতেই আছে, আর নাই। ইহার অর্থ এই, যে যাহারা সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধে উৎকলের রাজাদিগের অধীনে ছিল, তাহারা ঝাড়ুয়া হইয়া যায় নাই, নচেৎ সকলেই এক ব্রাহ্মণ।

যযাতির পর হইতেই ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের নাম লুপ্ত হইয়াছে, এবং উৎকলের একটা স্বতন্ত্র রাজ্য বা স্বাতন্ত্র্য স্থাপিত হইয়াছে। যে হিসাবেই হউক, এই সময়টা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। উৎকল যখন কলিঙ্গের অধীনে ছিল, অথবা পরে তখন যবনদিগের (বৌদ্ধ শবরজাতির) অধীনে ছিল, তখন ঐ দেশের প্রান্তভাগ ভিন্ন অন্য কোথাও আর্য্য নিবাস স্থাপিত হয় নাই। কাজেই আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত নূতন উৎকল দেশের ইতিহাস নবম শতাব্দী হইতে আরব্ধ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মহাভারতীয় "জুতা ও গুতা।"

"নির্লজ্জের নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।"

বিগত পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যক নব্যভারতে শ্রীমদ্ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী আমাদিগকে যে বেশ ঘা-কতক জুতা মারিয়াছেন, তাহা ফিরিঙ্গীর জুতা ও গুতা অপেক্ষা বড় কম নয়। লোকে মনে করিতে পারে, ওরূপ

সহস্র প্রহারেও আমাদের চৈতন্যোদয় হওয়া অসম্ভব, কারণ আমরা নিতান্ত নির্লজ্জ বেহায়া। এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে, ওরূপ প্রহারে আমাদের অসাড়তা অপসারিত হইবে না, ইহা সত্য হইলেও তাহার হেতু নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। স্থূলদর্শী লোকেরা সকল বিষয়ের উপরটা মাত্র দেখিয়া একটা যেমন-তেমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, এবং তাহাকে খুব ঠিক বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু যাঁহারা তলাইয়া দেখেন, তাঁহারা রহস্যভেদে সমর্থ হন। আমাদের ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঔদাসীন্যের মূলীভূত কারণ কি, দেখা যাউক। চিত্তের ঐকান্তিক গতি এক দিকে থাকিলে অন্যান্য দিকের গুরুতর ব্যাপার সমূহ সম্বন্ধেও উদাসীন থাকা স্বাভাবিক। মহাভারতী ঠাকুর নিজে যোগী, সুতরাং বেশ জানেন যে, অন্যান্য বিষয়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করতঃ ভগবানের দিকে একাগ্র হওয়া হেতুই যোগী সাংসারিক সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগীর সম্মুখে বিষম ব্যাপার নিচয় সংঘটিত হইলেও তাঁহারা তাহার কোন খবর লইতে সক্ষম হন নাই। প্রাচীন সংবাদে যদি কাহারও অনাস্থা হয়, পাশ্চাত্য-জগতের একটী আধুনিক ঘটনা দ্বারা সত্যটী পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইতেছি। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে মহাবীর নেপোলিয়ন সুবিখ্যাত জেনার[*] যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ প্রুশিয়া-রাজ্য অধীনস্থ করেন। সেই দিন সেখানে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোরেক্টারের[†] গৃহে বসিয়া প্রথিতনামা জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল[‡] শান্ত-সমাহিতভাবে তাঁহার একখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রণয়নকার্য্য সমাধা করেন। যে তুমুল যুদ্ধে প্রুশিয়ারাজ্যের প্রাচীন সিংহাসন বিধ্বস্ত হইল, তাহার কোলাহলে যোগী হেগেলের যোগে কোন প্রকার বাধা জন্মিল না। এমন নয় যে হেগেল যুদ্ধ বিষয়ে অনবগত ছিলেন; তৎপূর্ব্ব দিবস কোন বন্ধুকে উহার পরিণাম আলোচনা করিয়া পত্র লিখেন, এবং ফরাসী সৈন্যগণ তাঁহার বাসায় আসিয়া উৎপাত করাতে গ্রন্থের হস্তলিপি পকেটে লইয়া উক্ত ব্যক্তির ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, যোগীর যোগভঙ্গ করা কত কঠিন।

দেখা গেল যে, ঈশ্বর-ধ্যাননিরত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যোগযুক্ত মহাত্মাগণেতেও যোগীর সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ হিসাবে কাহার সাধ্য আমাদিগকে যোগী না বলে? আমরাও এক রকম মহাযোগ অবলম্বন করিয়াছি, যাহাতে মানাপমান সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এখন দেখিতে হইবে, আমরা কি প্রকার যোগে নিমগ্ন আছি। মোটামুটী তিন শ্রেণীর যোগী আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। একদল মাগ্‌মাছের ঝোল—কোম্পানির কাগজ ধ্যানে জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছেন; অপর শ্বেতাঙ্গ-চরণ-লেহন—পদোন্নতি-ধনসঞ্চয় ভাবনায় আত্মহারা হইয়া কলের মত নিষ্কামভাবে

---

[*] Jena জর্ম্মণির অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ নগর।

[†] Pro-rector.

[‡] Georg Wilhelm Friedrich Hegel. (1970-1831)

§ Phaenomenolgie des Geistes—"the most difficult and the most brilliant of Hegel's works."

সংসারে বিচরণ করিতেছেন; তৃতীয় জমিদারী—প্রজাপীড়ন-রাজসম্মান চিন্তায় দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকে আপনাপন আরাধ্য ইষ্টদেবকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বোধে মনোমন্দিরে চব্বিশ ঘণ্টা পূজা করিতেছেন;—ত্রিমূর্ত্তির ধ্যানে বিভোর। এতদ্ভিন্ন খুচ্‌রা যোগী বিস্তর আছেন; তন্মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন খেতাব-যোগী, মোক্ষপ্রদ 'অনারারি-পদ-যোগী ও হুজুগ-যোগী উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি লোকের ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে, উদরান্নের জন্য কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে হয় না, নিরুদ্বেগে অতীব সচ্ছলতার সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যায়, পায়ের উপর পা দিয়া দিন কাটাইবার সমস্ত উপকরণ করতলস্থ; বিদ্যাবুদ্ধির বড় ধার ধারেন না, জ্ঞানধর্ম্মের ত কথাই নাই; টাকার দরুণ দরিদ্রগণ ভাগ্যবান বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়া থাকে,—কাহাকেও কোনরূপ সাহায্য করুন বা না করুন, কেবল কি জানি যদি কখন সাহায্য আবশ্যক হয়,—সম্মুখে কেহ কেহ "জ্ঞানবান" "গুণবান" "বৃহস্পতির ন্যায় ধীমান" "কন্দর্পতুল্য রূপবান" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আড়ালে "মূর্খ" "নির্ব্বোধ" "অপদার্থ" ইত্যাকার শব্দাদিসহ যশোঘোষণা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত; এরূপ সুখের অবস্থায় বেশ আনন্দেই কালক্ষেপণ হয়। কিন্তু কি করেন! যোগীর জাতি মধ্যে জন্ম লইয়াছেন, জনক যাজ্ঞবল্ক্যাদির দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কোন একটা গুরুতর বিষয়ে যোগাবলম্বন না করিলে মান থাকে না, তাই কেবলমাত্র বিশুদ্ধ উপাধি-কামনায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কতকগুলির বিদ্যাবুদ্ধি বিলক্ষণ আছে—জ্ঞানধর্ম্ম থাকুক না থাকুক; উচ্চ শ্রেণীর দেশহিতৈষী "পেট্রিয়ট" বলিয়া দশজনে ডাকে,—মানুক না মানুক; প্রতিভার কুদ্‌রৎ-কর্‌তবে বেশ দশ টাকা রোজগারও হয়, এবং অজাতশ্মশ্রু যুবকবৃন্দের কাছে একটা ভারি নামও হাসিল করা হইয়াছে, সুপড়্‌তাই বলিতে হইবে,—মনে সুখশান্তি থাকুক না থাকুক। যদিও ইঁহারা বিলক্ষণ জানেন এবং বুঝেন যে, "অনারারি" পদগুলিতে "অনারের' আশা করা বৃথা, কারণ গৌরবধ্বংসকারী, মর্য্যাদানাশক বলিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ উঁহাদিগকে"অনার-অরি" নাম প্রদান করিয়াছে, তত্রাচ

"কেবল ভারতেরি তরে,
"ভারতের দুঃখ দেখিতে না পারি,
"পাছে ভারতবাসী কষ্ট পায়,
"ইহা ভাবি ইষ্ট নষ্ট করি,
"শুধু কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধে,
"সহি অপমান, লাঞ্ছনা ভুগিয়া

বিষকে অমৃততুল্য জ্ঞান করতঃ বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদের ন্যায় এই "অনরারি" ঐশ্বর্য্যের ধ্যানে অন্তঃপ্রবিষ্ট, উদ্গাঢ় কামনা যেন রাজসভায় বসিতে একখানা চৌকি পান, অন্ততঃ একটা মোড়া, নিতান্তপক্ষে একখানি বালান্দে মাদুর হইলেও চলিবে। ইহারই নিমিত্ত ইচ্ছাশক্তির তীব্র একাগ্রতা, এই মহীয়সী সিদ্ধির উদ্দেশে এরূপ বলবতী সাধনা। আবার বলি,—

"নিজের জন্য নয়,
শুধু ভারতের তরে"

ইঁহাদিগকে আমরা আসঙ্গরহিত পরহিত ব্রতে জীবনোৎসর্গকারী মহাত্যাগী পুরুষ বলিয়া ইঁহাদের চরণে সর্ব্বদা সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকি;—চাণক্য

পণ্ডিতের শ্লোক মনে পড়িলে কিন্তু দূর হইতে কাজটা সারিয়া অপযান করি। হুজুগ্-যোগীগণ হুজুগের ফলার ব্যতীত ইহ-পরলোকে আর কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না; ইঁহারাও অনাসক্ত জীব সন্দেহ নাই। হুজুগ্ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ইঁহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই; দুনিয়া ডুবিলে ইঁহাদের এক-হাঁটু-জল।

হরেক-রকমের এতগুলি যোগীর মাঝখানে বসতি, কাজেই যাঁহারা একেবারেই যোগবিহীন, তাঁহারাও

আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ

সংক্রামিত হইয়া যোগানিদ্রাভিভূত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন; সুতরাং বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা বশতঃ কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহার খবর রাখিতে পারেন না; জোর করিয়া কোন কথা কর্ণকুহরে পঁহুছিলে উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। যদি কখন বিদ্যুতরেখার ন্যায় কোন প্রকার গ্লানিজনক বিষয়ের আভাস হৃদয়াকাশে প্রতিফলিত হয়, চতুর্দ্দিকস্থ মহাযোগী সমূহের সহিষ্ণুতার তেজে তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া ব্যোমরাজ্যে মিলাইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে তাঁহাদেরও মনে উন্নতি-অবনতি-মানাপমানাদি-সম্বন্ধ-তুল্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে। ঘৃণা-পিত্ত-লজ্জাভিমান জলাঞ্জলি না দিলে ত যোগের কাছে যাওয়া যায় না; সাধুরা বলিয়াছেন;—

"মান লজ্জা ভয়,
তিন থাকিতে নয়।"

হয় ত মহাভারতী মহাশয় এখনও বলিবেন যে, ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্রতর কীটাদিও পদদলিত হইয়া প্রাণ দিবার পূর্ব্বে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পায়; নিরীহ কপোতও শাবকগণের রক্ষা হেতু আততায়ীকে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতে যায়।[*] আমরা কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ হইতেও অধম অপদার্থ? ইহার একমাত্র উত্তর যাহা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে:—আমরা মুক্তসঙ্গ পুরুষ! যোগী! মহাযোগী! জীবন্মুক্তির পথে ধাবমান! কর্ম্মভূমি ভারতক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করা হইয়াছে কেবল মাত্র নিঃসঙ্গভাবে পূর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় করিবার জন্য, নূতন কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি করিতে আসি নাই!!! যিনি আমাদের যোগভঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইবেন, তিনি নিশ্চয় মহাপাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন।

এই ত গেল আমাদের কৈফিয়ত্। এখন অপর পক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। যে গৌরাঙ্গ মহাপুরুষগণ করুণারসার্দ্রচিত্তে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া নানাবিধ-সুখ স্বচ্ছন্দতা-ভোগবিলাসের বিচিত্র লীলাক্ষেত্র স্নিগ্ধ সুশীতল সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে এই দুরন্ত তন্দুরসম-উষ্ণ দগ্ধ ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন, শুধু আমাদের উদ্ধারের জন্য, তাঁহারাও মহাযোগে যোগী, অত্র সন্দেহ নাস্তি। ইঁহারা আমাদের মত শিবতুল্য নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই বটে, প্রকাশ্যতঃ ঘোর বিষয়াসক্তের ন্যায় কর্ম্মী বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেন, তত্রাচ তাঁহারা যোগী, যোগাচার্য্যের প্রকৃত শিষ্য, ফলাভিসন্ধান বিবর্জ্জিত হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন মাত্র। তবে, যুগমাহাত্ম্যে তান্ত্রিক যোগের দিকে বেশী ঝোঁক দৃষ্ট হয়, ইঁহারা নির্ব্বাণ-মুক্তি-হেতু-

---

[*] লোকশিক্ষক সেক্সপীর বলিয়াছেন,
"The smallest worm will turn, being trodden on.,
"And doves will peck in safeguard of their brood."

পঞ্চমকারের উপাসক বীরাচারীর ভাবে ভাবুক হইয়া টর্পিডো-ডিনামাইট, কামান-বন্দুক, বল্লম-তলোয়ার, ছোরা-ছুরি, চাবুক-লাঠি, জুতা-গুতা, ঘুসা-লাথি, কাণমলা-গলাধাক্কা, চড়-চাপড়, এই নবোপকরণের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত, যদ্দ্বারা সময়ে সময়ে বহু সংসারতাপসন্তপ্যমান জীবের ভববন্ধন ত্বরিত মোচন হইতেছে। ঈদৃশ ব্যাপার সন্দর্শনে অবিদ্যাচ্ছন্ন মর্ম্মানভিজ্ঞ পাষণ্ডদিগের সহসা ভ্রম জন্মিতে পারে যে, ইঁহারা প্রবৃত্তিপন্থার পথিক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, যাঁহারা মোহের ঠুলি খুলিয়া অবলোকন করিবার শক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্ট অনুভব করেন যে, দেহেন্দ্রিয় ব্যাপাররূপ কর্ম্ম সমুদ্রে নিমজ্জমান থাকিয়াও এই যোগারূঢ় নরপুঙ্গবেরা নিষ্কামভাবে নিবৃত্তিপথে গমনোদ্যুক্ত, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহাদের মহাসমারোহ-আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মরাশি যোগবলে নিষ্কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইতেছে। পাঠক দেখিতেছেন কি! পুণ্যভূমি গীতা পাতঞ্জলাদির ভারতে আজ যোগের হাট বসিয়া গিয়াছে, রাজা প্রজা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া যোগবর্ত্মে সবেগে প্রধাবিত। এমন দেবদুর্লভ দৃশ্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবার জন্য শিব শুক নারদাদি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ঐ শুনুন! এই বিপুল সংখ্যক যোগীর ভাবাবেশ-সম্ভূত তাণ্ডব-কুর্দ্দনে উল্লসিত হইয়া সুরলোকে অমরবৃন্দ দুন্দুভিধ্বনিসহ অভিনন্দন করিতেছেন! যদি বেয়ারিং-পোষ্টে সশরীরে স্বর্গলাভের কামনা রাখেন, এমন অবকাশ ছাড়িবেন না, পোঁটলা-পাঁটুলি লইয়া শীঘ্র আসুন, ইঁহাদের লম্বমান-চরমাংশাবলম্বনে অনায়াসে বৈতরণী পার হওত ত্রিদশালয়ে গিয়া আড্ডা জমাইতে পারিবেন। ধন্য আমরা! ধন্য আমাদের পিতৃ পিতামহাদি চৌদ্দপুরুষ যে আমরা এরূপ সময়ে এমন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যেখানে—

"দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান,
"এহেন যোগধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ।"

শুভ্রকায় আগমবাগীশ যোগীরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—দক্ষিণমার্গী ও বামমার্গী। আমাদের ভাগ্য-সঞ্চিত পুণ্যফলে দ্বিতীয় দল বিলক্ষণ পুষ্ট, উহাতে পোনে-ষোল-আনারও বেশী লোক; বাকী এক-পাইয়েরও কম প্রথম দলে। উভয়ের বীজমন্ত্র এক, তবে সাম্প্রদায়িক গুরুভেদে দীক্ষামন্ত্রের প্রভেদ দেখা যায়। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের দীক্ষামন্ত্র "ভারত ভারতবাসীর জন্য।"* মন্ত্রটী হঠাৎ শুনিতে "হ্রীং হ্রাং ফটাদি" কৌলবীজের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য বা অর্থহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, যে হেতুক ভারতবর্ষ যাহাদের মাতৃভূমি, তাহাদের জন্য হইবে না ত কাহাদের জন্য হইবে? তুর্কী, জাপানী বা অপর কোন দেশীয়ের জন্য ভারতবর্ষ হইতে পারে না, তাঁহাদের নিজের নিজের দেশ আছে, ভারতে তাঁহাদের প্রয়োজন অসম্ভব। ওরূপ মানে নয়, গুপ্তবীজের ন্যায় কথাটীর নিগূঢ় অর্থ আছে, ঐ তিন শব্দাত্মক বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা এই;—কারুণ্য রসাভিভূতচিত্তে কেবলমাত্র বিবেকানুমোদিত পবিত্র পরার্থপরতার অনুরোধে সর্ব্ববিধ কামনা-পরিশূন্য হইয়া অধঃপতিত, অজ্ঞান-তিমিরান্ধ, দারিদ্র্যদুঃখ-পীড়িত, অসভ্য বর্ব্বর, ধর্ম্মকর্ম্মহীন হিদেন ভারতবাসীকে সমুন্নত, বিজ্ঞান-দৃষ্টি-সম্পন্ন,

---

* India for the indians"

বিত্তবশালী, সভ্য, ভব্য, ধার্ম্মিক, খ্রীষ্টান করতঃ গোলোকমার্গের আলোকময় সোপান উন্নয়ন করিবার উদ্দেশে যখন ভারত রক্ষার বিপুল ভার গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন উহার সংরক্ষণ প্রণালী এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে ভারতবাসীর কল্যাণ হয়। এরূপ গুরুতর ব্রত অবলম্বন করিয়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অকর্ত্তব্য। পিতৃমাতৃ-হীন অপোগণ্ডের শরীর ও সম্পত্তি যেমন উইলের একজিকিউটরগণ বা নাবালকী কোর্ট * অভিভাবকরূপে সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন, এ স্থলেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা বিধেয়। ইঁহারা ইংরেজ জাতিকে ভারতবর্ষের ট্রষ্টী-মাত্র বলিতে চাহেন। পাঠক বৃন্দের কৌতুহল নিবৃত্তি জন্য ইঁহাদের কয়েক জনের গুটিকতক মতামত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"We should look upon India not as a temporary possession, but as one which is to be maintained permanently until the Native shall in some future age have abandoned most of their superstitions and prejudices, and become sufficiently enlightened to frame a regular Goverment for themselves, and to conduct and persevere it. Whenever such a time shall arrive it will probably be best for both countries that theBritish control over India should be gradually withdrawn."--Sir Thomas Munro.

"মন্তব্য এই যে ভারতে ইংরাজের একপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিলেই চলে, অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী অন্ধবিশ্বাস-সম্ভূত উপধর্ম্ম কুসংস্কারাদি পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া সুশাসন প্রণালী দ্বারা আপনার ঘর সামলাইতে সমর্থ না হইবে ততদিন ইংরাজকে ভারতবর্ষ রাখিতেই হইবে। ভারতবাসী যদি কোন সুদূর ভবিষ্যতে ঐরূপ উন্নত হয়, তখন বৃটন ও ভারত উভয়রাজ্যের হিতার্থ ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে ক্রমে অপসৃত করা কর্ত্তব্য হইবে। এই মন্তব্যে সাহেব বিগত শতাব্দীর প্রথমাংশে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গবর্ণরী পদে অভিষিক্ত ছিলেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাঙ্গালার প্রথম ছোটলাট হালিডে সাহেব একদা প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

"I believe that our mission in India is to qualify the Natives for governing themselves." Sir Fred: Halliday (Deputy Governor, Bengal (1853-58)

ভারতবাসীদিগকে স্বদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য রাজজাতি ভারতে নিয়োজিত, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

বিখ্যাত সিপাহী যুদ্ধের সময় দেশের নিরীহ প্রজাবর্গের প্রতি "অযথা পক্ষপাত" হেতু প্রতিহিংসাগরল-জর্জ্জরিত বিদ্বেষোন্মত্ত ভারতের সাধারণ সাহেবদের সহিত বড় বড় রাজপুরুষগণও সদাশয় উন্নতমনা বড়লাট ক্যানিঙের প্রতি খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য মর্ম্মাহত হইয়া সে কথা বৃটনেশ্বরীকে পর্য্যন্ত জানাইতে বাধ্য হন। সে এক বিষম গোলোযোগের ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তদবধি ভারত-সংসৃষ্ট উভয় দেশস্থ ইংরাজ পুঙ্গবগণ বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহাকে "ক্লেমেন্‌সি" (দয়াল) ক্যানিং বলিয়া ডাকিতেন। বিদ্রোহশান্তির অল্পদিন পরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে ক্যানিং মহোদয় কর্ত্তৃক রাজমহল পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হয় ; সেই সূত্রে তিনি তথায় এক বক্তৃতা করেন,

---

* লণ্ডনস্থ কোন ইংরাজবন্ধু এক দিবস কথায় কথায় বলিয়াছিলেন ;—"কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমরা সেখানে গিয়া ছুতা-নাতা ধরিয়া ছলে-বলে-কৌশলে পরের রাজ্য কবলিত করিব, আর পৃথিবীকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইব, অক্ষমতাবশতঃ নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হওয়ায় আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছি ; যেন আমরা সমগ্র ভূমণ্ডলের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডস্ (Court of Wards) নিযুক্ত হইয়াছি। এরূপ প্রচ্ছন্ন লোলুপতার বশবর্ত্তী হইয়া পররাষ্ট্র আত্মসাৎ করিতে যাওয়া (land-grabbing) ভাল নয়।" অথচ গোঁড়া রক্ষণশীল (staunch conservative).

তন্মধ্যে ভারতের ইংরাজ প্রভুদিগকে লক্ষ্য করিয়া সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"Gentlemen, it is of no use to deny or conceal it, for it is known to all the world, we Englishmen with all our great national characteristics, are not, as a people, conciliatory or attractive. God forbid that any of us should feel ashamed of his national character or wish it to be other than it is. But none amongst us will deny that the very virtues of that character are not seldom exaggerated into faults. We are powerful in body and mind, and we are proud of that power. We are self-reliant and justly so, and we like to show our self-reliance. We are conscious of our high purposes and enlightenment, and we are apt to look down upon those, whose motives we believe to be less worthy than our own, or whom we regard as debased in ignorance, and we do not care to conceal our feelings. These feelings are not inconsistent with our national greatness. In the days of slavery, Englishmen were among the hardest taskmasters that the African ever had, but England did not hesitate to spend her gold and her blood lavishly for the suppression of the slave Trade, and we poured our twenty millions like water, when we found that it was the only means by which to rid ourselves of the curse of slavery. But Gentlemen, no people whatever their condition, will patiently bear to be treated by their rulers as though they were less than men, less rational, less capable of right feeling than those who rule them. If we attempt individually or collectively to do this, if we neglect to win the heart of those over whom Providence has placed us, if instead of seeking to inspire them with confidence, we take for our maxim that the people of India should be governed as a conquered people—which, as I understand it, means that they should be governed by sheer force,—if in our pride or impatience we refuse to show for-bearance or indulgence to the weakness and short-comings which attend us, we shall not worthily represent Egland in the great work which lies before her, and we shall assuredly fail to accomplish it."

অর্থাৎ—"পৃথিবীর সবাই জানে, সুতরাং অস্বীকার বা গোপন করিবার প্রয়োজন দেখি না যে, ইংরাজ জাতির প্রকৃতিতে কোন প্রকার প্রীতিদায়িনী বা আকর্ষণী শক্তি নাই ; আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির তজ্জন্য লজ্জা বোধ করা উচিত নয়। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের জাতীয় গুণগুলি অনেক সময়ে দোষে পরিণত হইয়া থাকে! শারীরিক ও মানসিক বল আমাদের বিপুল, সেটা আমাদের গৌরবের বিষয়। আমাদের স্বাবলম্বন আছে, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে যত্ন পাই। আমাদের যে উচ্চ অভিপ্রায় এবং উন্নত শিক্ষা, তাহা আমরা বেশ অনুভব করি, সেই হেতু হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখি ; সে ঘৃণা আমরা গোপন করিতে চাহি না। এই ত্রুটি সমূহে জাতীয় মহত্ত্বের অসামঞ্জস্য দেখি না। যখন আমেরিকায় গোলামী প্রচলিত ছিল, কাফ্রী কৃতদাসদিগের প্রতি আমরা কম কঠোর ব্যবহার করি নাই, কিন্তু আবার সেই গোলামী-প্রথার উচ্ছেদকল্পে আমরাই অকাতরে অর্থ ও শোণিত ঢালিতে প্রবৃত্ত হই, এবং জলের মত দুই কোটী পাউণ্ড ব্যয় করিলাম, যখন দেখা গেল যে, তদ্ভিন্ন উক্ত মহাপাপের আর কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নাই। পরন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, জেতৃজাতি যদি অধীনস্থ জেতাদিগকে বিবেকহীন জড়বুদ্ধি বলিয়া মনুষ্যাপেক্ষা-নীচ জীব বোধে তাহাদের প্রতি কুব্যবহার করেন, হাজার নিকৃষ্ট প্রকৃতি হইলেও তাহা অবাধে সহ্য করিয়া চলা তহাদের পক্ষে কঠিন। যদি আমরা ব্যক্তিগত বা জাতীয় ভাবে উক্তরূপ আচরণ করি, প্রেমের দ্বারা তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতে যত্ন না পাই, উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে প্রয়াসী না হই, জিত বলিয়া কেবলমাত্র পাশববলে দাবাইয়া শাসন করি, এবং ঐশ্বর্য্য-মদবিহ্বল হইয়া অসহিষ্ণুতা বশতঃ তাহাদের ত্রুটি-দুর্ব্বলতা উপেক্ষা না করি, তাহা হইলে ভারতের কল্যাণ কামনায় ইংলণ্ড যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, আমাদের দ্বারা তাহার পালন অসম্ভব।"

অনেকেই জানেন, জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মবীর খার্ত্তুম-মণি গর্ডন-পাশা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট রিপণের প্রাইবেট সেক্রেটারির পদ স্বীকার করতঃ ভারতে আসিয়াছিলেন ; বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়া দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে এমন এক বিকার উপস্থিত হইল, যাহাতে তিনি বাধ্য হইয়া পদত্যাগান্তে প্রস্থান করেন। তৎসম্বন্ধে

জীবনচরিত লেখক বাট্‌লার সাহেব বলিয়াছেন :—

"General Gordon would no more have joined with the official view of India and its people than he could join with the foreign element in Cairo against the peopl of Egypt. "When oil mixes with water, we will mix together." He had written a short time earlier of one of the mos successful Indian officials of our time. He was not content to take the accepted reasons of things. He looked below the surface. The men who make real history know best fo all the worthless nature o thething we call current history. To tell him that debt and famine and war were the natural results of India under a really wise and just system of government was not to convince him that it was true. He had a fatal tendency to go to the root of matters and to ask himself, for instance if debt and famine and war were the natural consequences of life in India, had not the fact of millions sterling in the shape of pay for the English Employees, pensions cost of foreign troops, and of unprofitable store etc, annually taken out of the country, something to say to this triple conglomerate of misery. It was only a year before this date, 1880, that a military officer of high rank and deep insight into Indian affairs had said that "there never could be another rebellion in India, because the people were too weak from want of food to fight." That one fact would have sufficed for Gordon. Statecraft, official tradition, the policy of predecessors, all would have gone before the simple reality of the first village he came to being in want of bread, while the vessels at the nearest port were shipping wheat to England or sending rice to China."

--Sir William Butler (Colonel)

তাৎপর্য্য এই—"ভারতবর্ষ ও তথাকার অধিবাসীগণ সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের যে মত, তাহাতে গর্ডন সায় দিতে পারেন নাই। উঁহাদের মধ্যে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করেন যে, "তেলে জলে যে দিন মিশিবে, সেই দিন আমরা উভয়ে মিশ খাইব।" ঋণ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, এই তিন ভারতের নিরন্তর ব্যাধি, অথচ সকলে বলে, সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী অত্যুৎকৃষ্ট; মহাত্মা গর্ডন তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, যেহেতু ইংরাজ কর্ম্মচারী ও পল্টনের বেতন, পেন্সন এবং অন্যান্য আড়ম্বরে যে কোটী কোটী মুদ্রা প্রতি বৎসর ব্যয়িত হয়, তাহা ত ভারতীয় প্রকৃতিবর্গ হইতেই সংগৃহীত; সুতরাং ঐ বার্ষিক শোষণই উক্ত ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ, উহার অন্যত্র অন্বেষণ অনাবশ্যক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ জনৈক উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "'দেশের লোক অন্নাভাবে এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতে আর কখন বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাই।" দেশে অকাল অথচ ইংলণ্ডে গোধূম-প্রেরণ জন্য, চীনে চাউল-রপ্তানি হেতু বন্দরে বন্দরে জাহাজ বোঝাই হইতেছে, গর্ডনের বিবেচনায় শুধু এই একটী বিসদৃশ ব্যাপারের নিকট সর্ব্বপ্রকার রাজ-নৈতিক কলকৌশল নজীরাদি পরাস্ত।"

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতীয় একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় আলান সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন :—

"India has been for a hundred years a millstone hung round the neck of England's conscience perpetually dragging it downward, and preventing it from attaining that full and free development which industrialism fosters. It has been a constant field for the display of aggressive instincts, a school of militarism, of predatory tastes, of organized brutality. We have only to contrast the moral and political tone of the average old Anglo Indian with that of the Canadian, or the average Birmingham artizan, to see the difference between the effects produced by contact of almost irresponsible ruling classes with an inferior race, and by free intercourse of equals in an industrial world. The one is almost the apologist of every kind of aggressive or class legislation, the other as a healthy horror of injustice, and a healthy natural tone for equitable laws.

* * * *

But the mass of Christian and hard-working Englishmen are convinced, that it is nobler thing to eat one's own bread by one's own toil, and to labour for the

> comfort, the beautifying and the ennobling of the world, than to massacre naked Zulus and unoffending Afghans, or to rob starving Bengali peasants, without a political voice, of their hard-earned salt, in order to pay the expences of a showy and meaningless Imperial policy :—Grant Allan (Contemporary Review, october, 1880)

ইহার সারাংশ এই :—বিগত শতবর্ষ কাল ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের গলদেশে প্রকাণ্ড গুরুভার প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় সংযুক্ত থাকিয়া শ্রমশীলতা দ্বারা যে উন্নতি সম্ভব, তাহার পথ অবরোধ করতঃ ইংরাজ জাতির ধর্ম্মবুদ্ধিকে ক্রমাগত অপকৃষ্টতার দিকে নামাইতেছে। উক্ত দেশ আমাদের আক্রমণলালসা, সংগ্রামশীলতা, লুণ্ঠনস্পৃহা, নৃশংসতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সমূহের শিক্ষালয় ও লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। কানাডাবাসী বা বৃটীশ শিল্পীর সহিত প্রবীণ ভারত-ফেরত ইংরাজের তুলনা করিলে বেশ দেখা যায়, সদসৎবিবেক এবং রাজনৈতিক মত বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে কিরূপ তারতম্য। দায়িত্বহীন শাসক-সম্প্রদায় হীনতর জাতির উপর অবাধ প্রভুত্ব চালাইবার অবকাশ পাইলে যেরূপ ন্যায়পথচ্যুত হয়, প্রথমোক্ত তাহারই নমুনা; আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সমভাবাপন্ন শ্রমোপজীবীদের সহবাসে সাম্যবাদ ও ন্যায়ের পক্ষপাতী, অসমতা ও অন্যায়ের ঘোর বিরোধী। ইংলণ্ডের ধর্ম্মনিষ্ঠ অকাতর-পরিশ্রমী প্রকৃতিবর্গের ধারণা এই যে, দূরদেশে গিয়া নগ্নকায় জুলু এবং নিরীহ আফগান হত্যা বা অসার সাম্রাজ্য মর্য্যাদা রক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানার্থ নিরন্ন বাঙ্গালী কৃষকের কষ্টোপার্জ্জিত বিত্তাপহরণ অপেক্ষা ঘরে বসিয়া নিজশ্রমলব্ধ খাদ্যোপভোগ এবং সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি ও উন্নতির চেষ্টাও অনেক গুণে মহত্তর।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান-সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট সাহেব বেশী দিন ভারত পরিত্যাগ করেন নাই। কুপারস্-হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ আগমনোন্মুখ ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে এই কয়টী কথা ছিল :—

> "I advise you who are going out to India to treat the natives as you would your own countrymen, and you will find that the people of India are a very charming people. Personally I am deeply grateful for all that the natives of India have done for me. "—Sir Donald Stewart. (Field Marshal)

অর্থাৎ :—তোমরা এখানে তোমাদের স্বদেশীয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ভারতবর্ষে গিয়া তদ্দেশবাসীর প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিও; দেখিবে তাহারা অতি সুন্দর প্রকৃতির লোক। আমি নিজে তাহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ; তাহারা আমার অনেক করিয়াছে।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ব্রাইট ও ফসেট আজীবন দীন দুঃখী, অসহায়, মূকপ্রকৃতি ভারতীয় প্রজাবর্গের জন্য করুণস্বরে চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তারিখে লণ্ডনের উইলিস্ রুমে শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতার পর সভাপতির আসন হইতে ব্রাইট সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেন' তন্মধ্যে ইংলণ্ডের বাঙ্‌নিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃটীশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, উপযুক্ত হইলে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্ববিধ প্রজা উচ্চ নীচ সকল প্রকার রাজপদ পাইতে পারিবে।* উহা লক্ষ্য করিয়া কোম্পানি

---

* "No Native of the said territories, nor any natural-born subject of His Majesty

বাহাদুরের লণ্ডনস্থ বড় কর্ত্তারা এদেশের বড়লাটকে লিখিয়া পাঠান, "অতঃপর ভারতে শাসক-সম্প্রদায় বলিয়া কোন বিশেষ শ্রেণীর লোক থাকিবে না। উচ্চ রাজপদ সমূহে সকল জাতীয় প্রজার সমান দাবী স্বীকার করিতে হইবে।"* তদনন্তর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভিক্টোরিয়া-ঘোষণাপত্রে পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ কার্য্যে অতি সামান্য যাহা হইয়াছে, তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; একথা লর্ড লিটনের বক্তৃতাতেও স্বীকৃত। এতদ্বিষয় সম্বন্ধে ব্রাইট্ মহোদয় ইহাও ব্যক্ত করেন যে, আইন কানুন ঘোষণা পত্রে কি হইবে? ভিতরে ভিতরে এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, আসলে কিছুই হইবার যো নাই। † সত্যসন্ধ বৃটীশ জাতির প্রতিজ্ঞা-পালন সম্বন্ধে ব্রাইট্ সাহেব আর একটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লাট্ লিটন ভারতে পঁহুছিয়া দেশের নিরন্তর দুর্ভিক্ষব্যাধি দূরীকরণ জন্য অর্থ সংগ্রহহেতু নূতন কর স্থাপন করতঃ বাক্‌বদ্ধ হন যে, ঐ অর্থ হইতে এক পয়সাও অন্য কোন প্রকার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না। * অবশেষে কিন্তু তাহার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত সংগ্রামক্ষেত্রে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে।

ব্রাইট্ মহাত্মা সেদিন এই কয়টী গভীর মর্ম্মকথা দ্বারা বক্তব্য শেষ করেন;—"বল প্রয়োগ সহকারে ইংলণ্ড অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে ন্যায় ও ধর্ম্ম-নীতি অবলম্বনের সময় উপস্থিত; তদভাবে ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে দুঃখ বিপদ বই আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ইংরাজজাতি এই বেলা প্রতিকারে মনোযোগী না হন, ভারতের ভবিষ্যত ঘোর তমসাচ্ছন্ন ও আপদসঙ্কুল বলিয়া মনে হইতেছে।" †

---

resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them be disabled from holding any place, office, or employment under the said Company." 3 and 4 William IV Cap 85, sec 87.

* "The court of Directors conceive this section to mean that there shall be no governing caste in British India, that, whatever other tests of qualification may be adopted, no subjects of the king, whether of Indian, or British, or mixed descent, shall be excluded from the post usually conferred on our uncovenanted subjects in India, or from the covenanted service itself, provided that they be otherwise eligible."

"It is our further wish that, so far as may be, all our subjects, of whatever race or creed be fairly and impartially admitted to all offices or services the duties of which they may be qualified by their education, ability and integrity duly to discharge."

† "I say that arrangements have been made by somebody and somehow, and by some influence, to keep as far as possible all these promotions, salaries, patronage, and pension in the hands of Englishmen who shall go out to India."

* "The sole justification for the increased taxation which has been imposed upon the people of India for the purpose of insuring this Empire against the worst calamities of future famine, so far as such an insurance can now be practically provided, is the pledge that we have given that a sum not less than one million and a half sterling, which exceeds the amount of the additional contributions obtained from the people for this purpose, shall be annually applied to it. We have *explained to the people* of this country that the additional revenue raised by the new taxes is required *not for the luxuries* but for the *necessities* of the State; not for general purpose but for the construction of a particular class of public works: and we have pledged ourselves not to spend *one rupee* of the special resources thus created upon works of a different character." Lord Lytton. 18 march. 1876.

† "England has done much by force. Now is the time for the policy of wisdom and justice. If these great qualities are wanting—and I confess I have not observed them lately in our Indian Administration—I say if these great qualities are wanting, I see before me little but calamity and humiliation in connection with our Indian Empire. If English opinion

পাঠক মহোদয়! ক্ষমা করিবেন। বড় সুখে ভাসিতেছি, এ সুখসন্তরণে আপনাদিগকে অংশী না করিয়া থাকিতে পারা এক প্রকার অসম্ভব। অপরকে নিজ সুখের অংশ না দিতে পারিলে সুখসম্ভোগ নিতান্ত অপূর্ণ থাকিয়া যায়; কাজেই আপনাদিগকে শীঘ্র ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাহা হউক, এখন বামমার্গী গৌরাঙ্গ যোগীগণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব মনে করিয়াছি।

বামমার্গীদের মধ্যে আবার দুই দল দেখা যায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন মহাত্মাগণের প্রচারিত কথাবার্ত্তা দক্ষিণমার্গীর ন্যায় সময়ে সময়ে বরং তাঁহাদিগকে অনেক ছাড়াইয়া উঠিয়া থাকে; তাঁহাদের বিকসিত ভাব-কুসুমশোভিতা সুমধুর শব্দবিন্যাস-সমালঙ্কৃতা অমৃতস্রাবনী বক্তৃতা দ্বারা কঠিন পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া দ্রবীভূত হয়; কিন্তু কাজের বেলায় একদম্ সাফ্ বিরুদ্ধ—এইরূপ আমাদের মনে হয়, হইতে পারে আমরা সারাসার-বোধহীন, তাই আমাদের এবম্বিধ অনুভূতি। যাহা হউক, ইঁহাদের অনুষ্ঠানে তফাৎ আছে, ইঁহারা প্রত্যক্ষ ভ্রাতাদের ন্যায় অহোরাত্রি "মারয়! মারয়!", "ঘাতয়! ঘাতয়!," "তাড়য়! তাড়য়!" রবে হুঙ্কার ছাড়েন না; অভ্যন্তরে ছয় প্রকার অভিচার পূর্ণমাত্রাতে প্রযুক্ত হইলেও বাহ্যিক প্রয়োগ কেবল সম্মোহন ও বশীকরণের দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু বাহিরে দক্ষিণাচার ভিতরে বামাচার, দুই নৌকায় পা থাকাতে মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে যোগভ্রষ্ট হইয়া শিষ্য সেবক ও সাধারণ লোকের নিকট অপদস্থ হইতে হয়।

প্রত্যক্ষ বামমার্গীগণ মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, সম্মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, এই ষড়বিধ অভিচারের কোনটীতেই ফেলা যান না, যখন যেটার প্রয়োগ আবশ্যক বোধ করেন, দ্বিধাশূন্যচিত্তে সেইটা অবলম্বনে বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। ইঁহাদের নীতি;—

"দুর্ব্বলেরে গলাধাক্কা, সবলে চুম্বন।"

দীক্ষামন্ত্র,—"ভারতবর্ষ সুযোগ্য সুসভ্য বৃটনবাসীর সম্ভোগ জন্য।"* অর্থাৎ ভারতবর্ষের ন্যায় দূরস্থ সাম্রাজ্য ইংলণ্ডকে রাখিতেই হইবে, ভারতীয় প্রকৃতিবর্গকে যজ্ঞার্থে-সৃষ্ট-ছাগমেষাদির ন্যায় প্রতিপালন করিতেই হইবে, নচেৎ বাদসাহের জাতি বৃটীশ সুরবৃন্দের হাত-পা-ছড়াইয়া ভোগবিলাসাদি চলে কি প্রকারে? শুধু ভোগবিলাস কেন? যোগচর্চ্চায় চাঁদমারী আর কোথায় বসাইতে পারা যায়, ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীতে আর এমন কোন্ উপযুক্ত স্থান আছে? সুতরাং ভারতবাসীর তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী ঐহিক হিতাহিতের দিকে দৃকপাত না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের পারলৌকিক ইষ্টের উদ্দেশে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভারত সাম্রাজ্য করতলস্থ রাখিতেই হইবে,—যেন তেন প্রকারেণ। এই সকল যোগী পুরুষের অভিচারানুষ্ঠানের ছিটা ফোঁটা

and the English conscience will seize this question boldly and deal with it there may be a remedy. If not, in my mind, the future of India and of England connected with it is full of gloom and full of peril."

এবম্প্রকারে সাধুক্তি সমূহ দ্বারা খাশ বামাচারিদের আচার ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে সুতরাং তদ্বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা অনাবশ্যক।

---

* "India for Imperial Britain."

মাল্যকে আমরা মূঢ়তাবশতঃ জুতা ও গুতা বলিয়া বোধ করিতেছি। আমাদের জানা উচিত যে, উহা ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব।

একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করত তৎসংক্রান্ত দুই একটী মন্তব্যসহ প্রবন্ধের উপসংহার করিব, পরে সম্যক আলোচনার ভার সহৃদয় পাঠকবৃন্দের হস্তে রহিল। সিপাহী যুদ্ধের অবসানে লর্ড লরেন্স্ (তখন সারজন লরেন্স) কর্ত্তৃক লাহোরে একটী আনন্দ সূচক দরবার আহুত হয়, ঐ দরবারে পাঞ্জাবের শিখ্ সর্দ্দারগণ উপস্থিত হইয়া সস্ত্রীক লরেন্স্ মহোদয়কে কুর্ণিশ করিয়া হর্ষ প্রকাশ ও প্রীতিবর্দ্ধন করেন। এই ব্যাপার দর্শনে সরলা লরেন্স্-পত্নী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন ;—"ইহারাই কি সেই সকল শিখ সর্দ্দার, যাহারা দশ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে আমাদের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল? এত অল্পদিনে ইহারা সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আমাদের এরূপ ভক্ত হইয়াছে !!!" "বাস্তবিক প্রাকৃতিক চক্ষে দেখিতে গেলে ওরূপ ব্যাপার নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু দিব্যদৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, যোগাভ্যাস দ্বারা এবম্বিধ পরিবর্ত্তন নিতান্ত সাধারণ। এখন বিবেচনা করা উচিত যে, দশ বৎসরকালব্যাপী যোগানুষ্ঠানের ফলে পাঞ্জাবীরা যদি ঐ সহিষ্ণুতালাভে সক্ষম হইয়া থাকেন, সাত শত বৎসরের কঠোর তপস্যায় আমরা ঐ পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি! সুতরাং আমরা বাঙ্গালী যোগিগণ ফিরিঙ্গীর জুতা ও গুতা এবং তৎসহ মহাভারতীর জুতা প্রহার তৃণজ্ঞানে উপেক্ষা করিতে ষোল-আনা দাবীদার।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ও বর্ত্তমান সমাজ।

"হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ"

প্রাচীন শাস্ত্র বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীত হয় যে, প্রাচীন কালে ঋষিগণ দেশ কাল পাত্র ও অভাবাদি বিচার করিয়া সমাজের হিতার্থ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করেন, উহাই বর্ত্তমান ব্যবস্থা-শাস্ত্রের মূল। ঐ সকল বিধি-বাক্য বেদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখানে একটী আপত্তির কথা আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অনেক বৈদিক ও লৌকিক গ্রন্থে বেদ নিত্য ও ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বসিতের ন্যায় প্রাদুর্ভূত, এইরূপ সকল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, বেদ নিত্য এবং ঈশ্বরের নিঃশ্বসিতের ন্যায় উৎপন্নই হউক, অথবা ঋষিপ্রণীতই হউক, ফলে বৈদিক বিধিই ব্যবস্থা-শাস্ত্রের মূল উপাদান। যখন সমাজ সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্ট ও বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিল, তখন মহর্ষি মনু প্রভৃতি বিংশতি জন ঋষি বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করেন, উহাই স্মৃতি বা বর্ত্তমান ব্যবস্থা-শাস্ত্র। বৈদিক বিধি স্মরণ করিয়া লেখেন বলিয়া উহার স্মৃতি নাম হইয়াছিল। কিন্তু স্মৃতিতে এমন অনেক বিধি আছে, যাহা বেদে নাই। "যাহা বেদে নাই, কেবল স্মৃতিতে আছে, এমন অমূলক বিধি মানিব কেন"? একথা বলিয়া পূর্ব্বে কোন কোন শাস্ত্রকার আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু স্মৃতির পক্ষসমর্থনকারীরা তাহার

উত্তরে বলেন "এখন বেদের যে সমুদয় গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহাই ত সমগ্র বেদ নয়, বেদের বহু শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত যে সকল বিধির মূল পাওয়া যায় না, সেই সকল বিলুপ্ত শাখায় উহার মূল ছিল। অতএব স্মৃতির সমুদয় বিধিই বেদমূলক। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে এমন অনেক বিধি আছে, বৈদিক কালে যে সকল বিধির একেবারেই আবশ্যক ছিল না। সুতরাং স্মৃতির সমুদয় বিধির মূল বৈদিক বিধি কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। বৈদিক কালে সমাজের যে অবস্থা ছিল, এবং সে সময়ে যত বিধির আবশ্যক ছিল, মনু-প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের সময়ে যে তদপেক্ষা সমাজে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও অধিকতর অনুশাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সেই জন্যই, স্মৃতিশাস্ত্রে অত বিধি-ব্যবস্থার আধিক্য দৃষ্ট হয়। বিংশতি স্মৃতি-সংহিতাই যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা-শাস্ত্রের প্রসূতি, তাহা নহে, গর্গ নারদ প্রভৃতি আরও অনেক ঋষিপ্রণীত গ্রন্থও ইহার পরিপুষ্ট বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে।

এখন যে স্মৃতি-সংহিতা আমরা আলোচনা করি, ইহাই যে সেই অবিকৃত প্রাচীন শাস্ত্র, সে বিষয়েও সংশয় হয়। সাধারণ সংস্কার এইরূপ যে, স্মৃতিসংহিতা বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের জন্ম গ্রহণের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন কোন সংহিতায় প্রকারান্তরে বৌদ্ধগণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া মনে হয়, ঐ সকল সংহিতা, নয় শাক্যসিংহের জন্মগ্রহণের পরে রচিত, না হয় উহাতে প্রয়োজনানুযায়ী কতকগুলি বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আর প্রচলিত মনুসংহিতা ত মনুর উক্তি নহে, উহাও ভৃগুর উক্তি। মহর্ষি মনু যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই মহর্ষি ভৃগু জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অনুশাসন প্রচার করিতে গিয়া যে মহর্ষি ভৃগু নিজের বুদ্ধির কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যয়িত করেন নাই, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? যদিই বা না করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি মনুর অপেক্ষা অর্ব্বাচীন কালে উৎপন্ন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও অন্যান্য ঋষিগণ পুরাণের প্রণেতা। পুরাণশাস্ত্র ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অন্তর্গত না হইলেও পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ জ্যোতিষ এবং পুরাণের বচনকেও ব্যবস্থা বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং উহার প্রভাব বাঙ্গালা দেশেই সমধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

হিন্দুর সামাজিক অনুশাসন-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-সমূহ শিরোধার্য্য। ঐ সকল শাস্ত্রই হিন্দুর শৈশবাবধি জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। হিন্দু মাত্রেই সংসার-পথে বিচরণকালে স্বতঃ পরতঃ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শ্রদ্ধা বা অবহেলা-সহকারেও অন্ততঃ উহার অনুশাসন মানিতে বাধ্য হন। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই কতকগুলি সামাজিক বিধি আছে, হিন্দু সমাজেও আছে। কিন্তু তুলনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে হিন্দু সমাজ সকলের অগ্রণী। একটী হিন্দুর পিতা মাতার বিবাহ হইতে মরণান্তে তাহার দেহ ভস্মীভূত হওয়া পর্য্যন্ত কেন? উহার ও বহু দিন পর পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্য বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সকল বিধির অনুষ্ঠানেই হিন্দুর নৈতিক পবিত্রতা পরিস্ফুট। বস্তুতঃ কালক্রমে শাস্ত্রবচনই প্রক্ষিপ্ত হউক, অথবা

পাঠান্তরই সংসাধিত হউক, উহার প্রয়োজনীয় প্রকৃত অনুশাসনগুলি (যাহা এখনও বিনষ্ট হয় নাই) প্রতিপালিত হইলে সমাজের অবস্থা যে, কত উন্নত হইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির অনধিগম্য নহে। কিন্তু হিন্দুসমাজ আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় শাস্ত্রীয় বিধি পরিপালনে রত নহে, হিন্দুসমাজ শাস্ত্রীয় বিধি হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় বিধিগুলির পরিণাম কি প্রকার বিড়ম্বনাময় হইয়াছে, উহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শাস্ত্রে যে সকল বিধি আছে, উহার অধিকাংশই দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য) সম্বন্ধে। শূদ্রের জন্যও শাস্ত্রে বিধানের অভাব নাই, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প। এক বিষয়ে শূদ্রের সুবিধা আছে, তাঁহাদের দেশান্তর গমন প্রভৃতি অনেক কার্য্যে দোষ নাই। জীবিকার জন্য তাঁহারা ইংলণ্ড, আমেরিকা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন। এবিষয়ে ব্রাহ্মণ-জাতির উপর কড়াকড়ি অধিক।

এ প্রবন্ধে বাঙ্গালা দেশের হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। কারণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেশান্তরের কথা বলা সম্ভব-পর নহে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে হিন্দু সমাজে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা-শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অবলম্বিত হইত, উহা ভালরূপ জানা যায় না। প্রায় চারিশত বৎসর হইল, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব স্মৃতি-সঙ্কলিত ও প্রচারিত হওয়ার পর হইতে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ স্থলে তাঁহার মতই গৃহীত হইয়া থাকে। রঘুনন্দন স্বয়ং শাস্ত্রকার নহেন, তিনি সংগ্রহকার মাত্র। প্রাক্তন মহর্ষিগণের পরস্পর-বিরোধী বাক্যের মীমাংসা ও ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা-শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রন্থেরও মতামত না আছে এমন নহে। কতকগুলি পণ্ডিত তাঁহার গ্রন্থের এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অপর সম্প্রদায় অপর প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন যে সময় তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইলেও তাহাদের কোন রূপ পদচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। রঘুনন্দন বাঙ্গালা দেশে দুইটী বর্ণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অম্বষ্ঠ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিকে শূদ্রাচার প্রতিপালন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন, "রঘুনন্দন কূটনীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ঐ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, নতুবা তিনি স্বীয় গ্রন্থে ঐ সকল জাতিকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিবেন কেন? কিন্তু আমার অন্যরূপ মনে হয়, কেন না প্রবীণ অধ্যাপকগণের মুখেও শুনিয়াছি এবং নিজেও আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝা যায়, তিনি বড় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি যদি কোন সূত্রে ঐ সকল জাতির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কদাচ ঐরূপ লিখিতেন না। চারি শত বৎসর দূরের কথা, এই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটী বক্তৃতায় শিক্ষিত যুবকগণকে (বোধ হয় শিক্ষিত শূদ্র যুবকগণকে) লক্ষ্য করিয়া যাহা বলেন, উহার মর্ম্ম এই "তোমরা যে শাস্ত্র শাস্ত্র করিতেছ, দেখ শাস্ত্রে তোমাদের কিরূপ নিগ্রহের কথা আছে।" তাহার

পর, তিনি কয়েকটী মনুসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় ত কোনরূপ উদ্দেশ্যের আরোপ করা যায় না, তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, সরলচিত্তে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমার ত বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে যে সকল বর্ণ আজ কাল উন্নতিশীল এবং শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যে মনুপ্রোক্ত শূদ্র একেবারেই আছে কিনা সন্দেহ। শাস্ত্রী মহাশয় যদি হেরোডোটাস্, টলেমি, এরিয়ান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থের সহিত সংস্কৃত পুরাণগুলি মিলাইয়া পাঠ করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, বাঙ্গালা দেশেও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিতান্ত অভাব নাই। মনুসংহিতার ও বর্ণসঙ্কর প্রকরণে জাতিমালার দ্বারা এদেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ঐ সকল কূটবুদ্ধি-পরিকল্পিত গ্রন্থগুলি এ দেশের লোকের হৃদয়ে যে কত ভ্রমাত্মক সংস্কার বদ্ধ-মূল করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজকীয় মনুষ্যগণনার মাহেন্দ্র-যোগে ঐ সকল কল্পিত বচন গুলির যে কতপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতেছে, উহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বস্তুতঃ এক বর্ণের একটী পুরুষ হইতে অপর বর্ণা রমণীতে বৈধ বা অবৈধ উপায়ে উৎপন্ন একটী সন্তান হইতে যে অসংখ্য নরনারী-বিশিষ্ট একটা বর্ণের উৎপত্তি হওয়া একান্ত অসম্ভব, এ সহজ কথাটী কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন না। আর এক জাতীয় বহু পুরুষ অপর এক জাতীয় বহু রমণীতে যে যুগপৎ আসক্ত হইবে, তাহারই সম্ভাবনা কি? মনুর বর্ণসঙ্কর প্রকরণটাই সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, বটতলার জাতিমালার কথা আর কি বলিব? সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও যে ঐ সকল গ্রন্থে আস্থা স্থাপন করেন, উহা আরও বিস্ময়কর। সৌভাগ্যক্রমে সংপ্রতি প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, সম্ভবতঃ অল্পদিনের মধ্যেই অম্বষ্ঠ, কায়স্থ, সদ্গোপ, নবশাক, সুবর্ণবণিক্, গৌড়-বণিক্ শৌণ্ডিক প্রভৃতি বর্ণের পূর্ব্বাচরিত ব্যবসায়গত ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্বনির্ণীত হইবে। এমন কি, কোন্ বর্ণ কোন্ দেশ হইতে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন্ দেশে গিয়া বসতি করিল এবং কি কারণে তাহারা ক্ষত্রিয় বৈশ্যোচিত সংস্কারহীন হইল, তাহাও অবিদিত থাকিবে না। এ দেশের লোক বড়ই জড়প্রকৃতি। তজ্জন্য সমাজ মধ্যে অনেকপ্রকার সুসংস্কার প্রবেশ করিয়া দেশের সাম্প্রদায়িক একতা ও উন্নতির প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিতেছে। যদি দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যাহার তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া স্বয়ং শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে অনেক কুসংস্কার বিদূরিত হইতে পারে।

হিন্দু জাতি অতিশয় ধর্ম্মপ্রবণ। বৈদিক কালে প্রাত্যহিক ধর্ম্ম কর্ম্মে গৃহস্বামী ও বৃহৎ যজ্ঞাদিতে বেদপারদর্শী পবিত্র-স্বভাব ঋত্বিক্‌গণ সহায় হইয়া সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। কালক্রমে গৃহস্বামীর অপারগতায় গুরু এবং পুরোহিতের সৃষ্টি হয়। যে সময় গুরু পুরোহিতের সৃষ্টি হয়, তখন গুরু পুরোহিত পরমজ্ঞানী এবং দেবতুল্য-স্বভাব ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা গৃহীর ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের যথার্থ মঙ্গল সংসাধিত হইত। এখন আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ন্যায় গুরু পুরোহিত নাই। গুরু-গিরি ও পৌরহিত্য এখন একটী লাভজনক ব্যবসায়ে

পরিণত হইয়াছে। এখন শিষ্য যথোচিত লক্ষণাক্রান্ত গুরু অনুসন্ধানের অবসর পাননা, গুরুও শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। শিষ্য ও যজমান স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গণনীয় হইয়া থাকেন। একজন গুরু বা একজন পুরোহিত, যে শিষ্য বা যজমানকে একবার আপন অধিকারে আনিতে পারিয়াছেন, সেই শিষ্য বা যজমানের বংশপরম্পরা অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই গুরু পুরোহিতের পুত্র পৌত্রাদি সন্তান পরম্পরার ভোগদখলে অবস্থান করিবে। কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। দ্বিপদ গুরুর বংশে যদি একটী চতুষ্পদ গুরু জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই শিষ্যের সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের কর্ণধার হইবেন, অন্যে সেখানে হা'ল চালাইতে সমর্থ হইবেন না। পুরোহিতের পুত্র নিরক্ষর চোর বদমায়েস যাহাই হউক, দেবতারা হাতে ভিন্ন তাহার অন্যের হাতে চাপকলা গ্রহণ করিবেন না। অনেক গুরু, শিষ্য-পত্নীর সম্পদে সম্পন্ন হইয়া সিঁতি ফিরাইয়া ফেটিং চড়িয়া বেড়াইয়া থাকেন। কত পুরোহিত-পুঙ্গব সম্পন্ন যজমানের পান-গোষ্ঠীতে বন্ধু-সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন!

যখন শৈশবে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতাম, তখন আমাদের একটী সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অনেক যজমান ছিল। বন্ধুবরের বয়স তখন পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের ন্যূন নহে। তিনি অষ্টম বৎসর বয়স হইতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে আসক্ত হইয়াছিলেন। অনেকবার তাঁহার ব্যাকরণ অদ্যোপান্ত অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি মুগ্ধ বোধের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মুগ্ধবোধও তাঁহাকে ছাড়িতে পারিতেছেন না। এইরূপে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া চতুষ্পাঠীর তামাক টীকার ধ্বংস সাধনে নিরত ছিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করিলাম,—"দাদা, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্য পড়িতে আরম্ভ করুন না কেন?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, উহাকে "মুরারিঃ" সন্ধি বিচ্ছেদ করিতে বল দেখি।" বন্ধুবর চোক্ টিপিয়া আমাদের বারণ করিলেন। বাহিরে গিয়া আমাদের বলিলেন—"ভায়া, তোমাদের বড় অন্যায় দেখিতেছি, এত কাল মুগ্ধবোধে চলিতে পারিল, এখন আর চলিবে না।" কিন্তু দাদার ব্যাকরণে সংস্কার যাহাই হউক, যাজনিক কার্য্যে কোনরূপ পটুতার অভাব ছিল না। ইঁহার পৌরহিত্যের একটী সামান্য উদাহরণ পাঠ করুন। নবদ্বীপের সন্নিহিত একটী পল্লীতে বন্ধুবর বৈশাখ মাসে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে একটী স্বস্ত্যয়ন করিতে গিয়াছেন। প্রাতঃকালে বাটী হইতেই স্নান কার্য্য সমাধা করিয়া যজমান-গৃহে উপস্থিত। যজমানবধূ সদ্গোপগৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! নারায়ণ আনিয়াছেন?" উত্তর "হঁা"। তাহার পর নূতন গৃহে আসনে উপবিষ্ট হইয়াই গৃহস্থ বালককে দোয়াত কলম আনিতে অনুমতি করিলেন। মস্যাধার আসিলে তিনি ভোজ্যপাত্র হইতে একটী গোল আলু সংগ্রহ করিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গে মসীলিপ্ত করিয়া সেপায়ার উপর তাম্রটাটে স্থাপন করিলেন। চতুর্দ্দিকে গুটীকত ফুল ছড়াইয়া রাখা হইল। পূজা আরম্ভ হইলে গৃহিণী পুত্র কন্যা সহিত আসিয়া নারায়ণকে প্রণিপাত করিলেন,

কিন্তু শিশু পুত্র কোন প্রকারেই প্রণাম করিতে চাহিল না। সে শিশু হইলেও স্বচক্ষে আলুর গাত্রে মসীলিপ্ত করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং সে কোনরূপে ঘাড় নোয়াইল না। সে বলিল, ও ঠাকুর না, আলু। শেষে গৃহিণীর আর ঘটনাটী জানিতে বাকী রহিল না। বন্ধুবর তাড়াতাড়ী স্বস্ত্যয়ন শেষ করিয়া দক্ষিণা ভোজ্য ও ঠাকুর লইবার ব্যপদেশে মসীলিপ্ত গোল আলুটী লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন সেই পল্লীর সদ্গোপ-মণ্ডলী দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত। এই ঘটনায় প্রতিবেশিনীগণ ঘোরতর অমঙ্গলের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক বুঝাইলেন, শালগ্রামও যাহা, একটী ফল বা গোল আলুও তাহাই, উহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে যতদূর ভক্তি করিবে, ভগবান্ তাহার প্রতি তত প্রসন্ন হইবেন। ঐ সকল কথায় তাহাদের সন্দেহ দূর হইল না দেখিয়া শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটা বড় রকম স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

ফরিদপুর জেলার একটী পল্লীগ্রামে কোন বারুজীবীর গৃহে এক গুরু উপস্থিত। গুরু বয়সে নবীন হইলেও গঞ্জিকা সেবনে অনেক বৃদ্ধকে পরাজিত করিতে সক্ষম। শিষ্যের পূর্ব্বেই জানা ছিল। সে পল্লীবাসী এক গঞ্জিকা-সেবীর গৃহ হইতে এক সিলিম গাঁজা আনিয়া গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত করিল এবং অতিসত্বর প্রচুর গাঁজা সংগ্রহের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেড়ক্রোশ দূরস্থিত বাজারে পাঠাইল। যখন তাহার মাতা ও ভগিনী চরণ ধৌত করিবার জন্য এক বগুনাপূর্ণ জল লইয়া আসিল, কারণ তখন চরণামৃত না সংগ্রহ করিলে পরে যখন প্রতিবেশিনীরা ঘটী বাটী লইয়া চরণোদক লইতে আসিবে, তখন কি দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিবে। আবার, বারংবার চরণামৃত চাহিলে গুরু বিরক্ত হন। গুরু বগুনার মধ্যে চরণদ্বয় নিমজ্জিত করিবার পূর্ব্বে টাকা কড়ি সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। শিষ্যের নিজের বিবাহ, ভগিনীর বিবাহ ও পিতৃশ্রাদ্ধ, এই তিন ক্রিয়ায় নগদ একশত টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দাবি করিলেন। গুরুর ন্যায় শিষ্য একেবারে অক্ষর পরিচয়-শূন্য নহে। সে মধ্যইংবিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়া শুনা করিয়াছিল, এখন পানের চাষ করে ও হাটে পান বিক্রয় করে। তাহার অবস্থানুযায়ী সে পাঁচটী টাকা ও জলদানের আসন বস্ত্র ঘড়া ছত্র পাদুকা ইত্যাদি গুরুর নিকট আনিয়া রাখিল। গুরু পাঁচটী টাকা দেখিয়াই ক্রোধে অগ্নিবৎ হইলেন। কিন্তু শিষ্য কিছুতেই থামিল না। গুরু দেখিলেন, মাইনর স্কুলের শিষ্য সহজে ঘাড় পাতিল না। তাহার পর তিনি স্নান করিয়া যথারীতি রন্ধন করিলেন এবং অন্ন পরিবেশনপূর্ব্বক আসনে বসিয়া শিষ্যকে ডাকিলেন, বলিলেন "এখানে এক শত টাকা রাখ, তাহার পর ভোজন করিব।" শিষ্য বলিল "আমি এক শত টাকা কোথায় পাইব? যাহা ছিল দিলাম।" গুরু বলিলেন "কেন? তোর ভগিনীর বিবাহে যে পণ পাইয়াছিলি, তাহা কোথায় রাখিলি?" সে বলিল "তাহা সে পিতৃশ্রাদ্ধে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে।" এইরূপে বাদানুবাদ চলিল। অনেক লোক আসিল, অনেকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু গুরু তাহাতে কর্ণ-

পাত করিলেন না। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সকলেই উপবাসী রহিল। কারণ সকলেই গুরুর অধরামৃত প্রসাদ ভোজন করিবে বলিয়া অপেক্ষা করিয়াছিল। বিশেষ গুরুর ভোজন না হইলে ত তাহারা জল গ্রহণ করিতে পারে না। গুরু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অন্ন সম্মুখে করিয়া বসিয়া রহিলেন। সায়ংকালে মাঘ মাসের শীতে কাতর হইয়া ভোজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক বনাতে গাত্র আবৃত করিয়া বারান্দায় চকীতে আসিয়া বসিলেন। রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার অন্য এক শিষ্যের গৃহে সিদ্ধপক আহার করিয়া শিষ্যানুজের আনীত গঞ্জিকা বিলক্ষণরূপে সেবন করিয়া শয়ন করিলেন এবং প্রত্যূষে উঠিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ঐ ঘটনার পর কি হইয়াছিল, বলিতে পারি না।

আমি মধ্যম শ্রেণীর দুইটী গুরু পুরোহিতের চিত্র দিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর এমন অনেক গুরু পুরোহিত আছেন, যাহাদের অনেক কার্য্য কলাপ মাসিক পত্রে প্রকাশযোগ্য নহে। যাঁহারা শূদ্রাদির গুরুগিরি বা যাজনকার্য্যে রত, তাঁহাদের অধিকাংশেরই কষ্ট—সুতরাং অনেকেরই বহু পণসাধ্য বিবাহ হয় না, শিষ্য ও যজমানের মধ্যে কোন দরিদ্র বিধবাকে সেবিকার পদে নিযুক্ত করেন। কেহ কেহবা কলিকাতা হইতে রণ্ডা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া আপন গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিষ্য যজমানের পিতৃ শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত চা'ল কলার দ্বারা তাহাদেরই দেহের চাক্‌চিক্য সম্পাদিত হয়। অনেক গুরু ধনী শিষ্যদের অন্তঃপুরে কৃষ্ণাবতার পরিগ্রহ করিয়া রাসযাত্রা বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ভাগবতোক্ত যাবতীয় লীলামাধুরী প্রকট করিয়া থাকেন।

যদিও জগতের সমুদয় সভ্য দেশেই ধর্ম্মের নামে প্রতারণা জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি সমুদয়ই সম্পন্ন হইতেছে, জগতের সমস্ত মানব যে এক সময়ে স্ব স্ব পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে, এরূপ আশা করা যায় না, কিন্তু এদেশে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা প্রভাবে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যেমন বৈষয়িক ব্যাপারের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছেন, তেমনই যত নির্ব্বোধ মূর্খ ব্যক্তির হস্তে ঐ সকল পবিত্র কার্য্যের ভার পতিত হওয়ায় ধর্ম্ম কর্ম্মের অপকর্ষ সংসাধিত হইতেছে। ধর্ম্মনীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে শাস্ত্রীয় অনুশাসন পালন করা কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, মন্ত্র যদি স্বর কিংবা বর্ণহীন হয়, তাহা হইলে তাহার কোন অর্থ হয় না, অর্থাৎ যে মন্ত্রাংশ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়া উচিত, তাহা যদি অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হয়, অথবা অনুদাত্ত স্বরে উচ্চার্য্য অংশ যদি স্বরিত স্বরে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহার কোন অর্থ হয় না, ঐ বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে হিংসা করে। সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশেষতঃ পাণিনি ব্যাকরণের স্বর প্রক্রিয়া পাঠ করিলেত উচ্চারণের কথা; এখন অনেক পুরোহিত অক্ষর পরিচয় করাও আবশ্যক মনে করেন না। হিন্দু মাত্রেই যে সকল কার্য্য ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিদান মনে করেন, এইরূপ যাহার তাহার হস্তে সেই কার্য্যের ভার দেওয়া যে একান্ত অবিধেয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক গুরু পুরোহিতদিগের মধ্যেও অনেক ঋষিতুল্য জ্ঞানী এবং চরিত্রবান্

নির্লোভ, সত্যপরায়ণ, দ্বেষ-হিংসাবর্জ্জিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বোধ হয়, আর কিছু দিন পরে ঐরূপ লোকের সম্পূর্ণ অভাব হইবে। আজ কাল সমাজ মধ্যে কেবল অমূলক অভিমান, দ্বেষ, হিংসা, কপটতা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। সমাজের যাঁহারা ধর্ম্মনীতির শিক্ষক, তাঁহাদের চরিত্র উন্নত না হইলে কালে সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। এ দেশের লোক অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেকে অনেক নীচ কল্পনার আশ্রয় করিয়া থাকে। বিচারবুদ্ধিহীন জনসমাজও তাহাদের স্বকপোলকল্পিত বাক্যগুলিও নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়া অধঃপতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি পর্য্যন্ত ক্ষণিক স্বার্থের জন্য চিরাচরিত কূটনীতির সাহায্যে সমাজ মধ্যে অনেক অনর্থপাতের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। প্রাচীন শাস্ত্র যতই আলোচনা করিয়া দেখা যায়, ততই প্রতীত হয়, হিতবাদ অথবা জগতের মঙ্গলসাধনই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের উদ্দেশ্য। যে শাস্ত্রবাক্য জনসমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক, উহা কখনই প্রকৃত শাস্ত্রবাক্য নহে, এবং ঋষি-প্রণীতও নহে, উহা কেবল স্বার্থান্বেষী নীচমনা ব্যক্তিদের স্বকপোল-কল্পিত বাক্য। এইরূপে বহুকাল হইতে কূটনৈতিক ব্যক্তিদের চেষ্টায় শাস্ত্র মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বচন প্রবেশ লাভ করিতেছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রের দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছে। আমরা বারান্তরে "শাস্ত্রবাক্য" শীর্ষক প্রবন্ধে কিরূপে শাস্ত্র মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বচন ও বচনাংশ প্রবেশ করিয়াছে, উহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

উপনিষদের উপদেশ। (৭)

আমরা এস্থলে পাঠকবর্গের আর একটু ধৈর্য্যভিক্ষা করিতেছি। যখন ইন্দ্রিয় ও ভূত সৃষ্টির কথা উঠিয়াছে, তখন এ বিষয়ে হিন্দুদর্শনের প্রকৃতমর্ম্ম কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত আবশ্যক। উপরে, আমরা পঞ্চতন্মাত্র হইতে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির যে বিবরণ দিলাম, তৎসম্বন্ধে আমাদের আরো কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; নতুবা একটা অপসিদ্ধান্তে পৌঁছিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। পাঠক জানেন যে, হিন্দুদর্শনে সাংখ্যকার কপিলের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। হিন্দুশাস্ত্র মাত্রেই, সাংখ্যদর্শনের প্রশংসা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, উপনিষদে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির যে কথা আছে, তাহাকে সাংখ্যমতের সহিত অনুগত করিয়া লইয়া বুঝা নিতান্ত আবশ্যক। যদি সাংখ্যমতের সহিত, উপনিষদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মিল না থাকে, তবে সে তত্ত্বের যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে। কেননা, হিন্দুশাস্ত্র নিজেই, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই, কপিলকেই আচার্য্যের আসন প্রদান করিয়াছেন। এখন আমরা দেখিব, উপনিষদের ইন্দ্রিয়োৎপত্তির বিবরণ ও সাংখ্যের বিবরণ এক, কি বিরোধী। উপনিষদে বা বেদান্তদর্শনে পঞ্চতন্মাত্র হইতেই ইন্দ্রিয়গুলি উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ কথা আছে। বেদান্তমতে তবে ইন্দ্রিয়গুলির উপাদান পঞ্চসূক্ষ্মভূত। সাংখ্যদর্শন কিন্তু অহঙ্কারতত্ত্বকেই, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতের উপাদানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে ইন্দ্রিয়গুলি উৎপন্ন হইয়াছে, একথা সাংখ্যে পাওয়া যায় না "সাত্ত্বিক মেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ" এবং "ভূতাদে স্তন্মাত্রঃ স তামস স্তৈজসাদুভয়ং" (সাংখ্য কারিকা ২৫)। এক অহঙ্কার নামক উপাদান হইতে, দুইদিকে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব জন্মিয়াছে;—একটী পঞ্চভূত, অপরটী ইন্দ্রিয় নিচয়। তবে ত দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্য ও উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত!! তবে কি উপনিষদ্ ভ্রান্ত?

ভিতরে প্রবেশ করিয়া না দেখিলে, উপনিষদ্‌কে ভ্রান্ত বলিতে হয় বৈ কি। কিন্তু হিন্দুদর্শন বুঝিতে হইলে, কেবল উপরে উপরে দেখিলে চলিবে না; বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। বিবেচনা করিয়া, প্রবেশ করিয়া দেখিলে, এই উভয় মতের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন বিরোধই লক্ষিত হইবে না। আমরা এ স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বাস্তবিক পক্ষে বেদান্ত-মত, সাংখ্যাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট মাত্র; কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিরোধ কিছুই নাই। পাঠক শুনিয়াছেন যে, উপনিষদ্ বা বেদান্তের মতে, পঞ্চতন্মাত্র হইতেই, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। বেদান্ত বলেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই তিনটী দ্রব্যই জগতের আদিম উপাদান। ইহারাই নানাভাবে মিলিয়া মিশিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই ত্রিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য এই যে, একটী বেশী হইলে, অন্য দুইটী তদ্দ্বারা অভিভূত থাকে। এ কথাটী ভুলিলে চলিবে না। বেদান্ত বলেন যে, যখন তমঃগুণ বৃদ্ধি পাইল, তখন সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র দেখা দিল। এই তন্মাত্র হইতেই ইন্দ্রিয় গুলি জন্মে। কিন্তু ইন্দ্রিয় জন্মিবার প্রণালী (Process) টী কিরূপ, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। বেদান্ত মতে, এই সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বাংশ বৃদ্ধি পাইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজোংশ বৃদ্ধি পাইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যাইতেছে, যখন একটী গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন অন্য গুণদ্বয় তাহার অনুগত (Subordinated) ছিল। সুতরাং, পঞ্চতন্মাত্র হইতে ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে,—এ কথায় ইহা আসিতেছে না যে, শব্দ স্পর্শাদি-তমোগুণাত্মক পদার্থই ইন্দ্রিয়ের উপাদান-কারণ। বাস্তবিক পক্ষে এস্থলে তাৎপর্য্য ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, সত্ত্ব এবং রজঃই বাস্তবিক পক্ষে, যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপাদান এবং তমোগুণই, ভূতগুলির উপাদান। "এতৈশ্চ সত্ত্বগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈর্ব্যস্তৈ র্যথাক্রমং পঞ্চেন্দ্রিয়ানি জায়ন্তে।" এতৈরেব রজোগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈর্যথাক্রমং কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি জায়ন্তে"। (বেদান্ত পরিভাষা, ৭ম পরিচ্ছেদ)।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ের উপাদান প্রধানতঃ সত্ত্ব এবং রজঃ দ্রব্য। এবং পঞ্চতন্মাত্রের উপাদান প্রধানতঃ তমো দ্রব্যই। সাংখ্যের সঙ্গে এ কথার বিরোধ হইতে পারে না। সাংখ্য মতেও, সাত্ত্বিক ও রাজসিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি; এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি। তবেই মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বৃত্তির উপাদান হইতেছে সত্ত্ব ও রজঃ; এবং পঞ্চভূতের উপাদান হইতেছে তমঃ। ইন্দ্রিয়গুলি শক্তিমাত্র। ইহারা পঞ্চভূতের সঙ্গে মিলিতরূপে অভি-

ব্যক্ত হয় বলিয়া, ইহাকে কেহ কেহ ভৌতিক বলিয়া থাকেন। নতুবা ভূত কখনই ইন্দ্রিয়ের উপাদান(material cause) হইতে পারে না। দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক উপাদান হইতে, ভূত ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের ১০৫ সূত্রে, শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু এ তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমরা উপরে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক হইতে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছি, তাহাকে সাংখ্যের সঙ্গে একমত করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা হিন্দু দর্শনের বাস্তবিক অভিপ্রায় আবিষ্কৃত হইবে না। ইন্দ্রিয়গুলি বৃত্তি বা শক্তিমাত্র। এই শক্তিগুলি, চক্ষুরাদি ভূতসংযোগে যথোপযুক্ত স্থলে অভিব্যক্ত হয়। অতএব ভূতগুলি উহাদের অভিব্যক্তির স্থান মাত্র। নতুবা ভূতগুলি ইন্দ্রিয় শক্তির উপাদান কারণ হইতে পারে না। ফলতঃ, সত্ব ও রজোদ্রব্য প্রধান হইয়া ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে এবং তমোদ্রব্য প্রধান হইয়া ভূত জন্মিয়াছে। তবে কথা এই যে, পঞ্চভূতের মিলন ব্যতিরেকে, অর্থাৎ পঞ্চভূতের অধিষ্ঠান ভিন্ন, ইন্দ্রিয়শক্তি আপনা আপনি প্রকাশ পাইতে পারে না;—এ কথাটী মনে রাখিতে হইবে। যথোপযুক্ত ভূতাত্মক অধিষ্ঠান পাইলেই, ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ হয়, নতুবা হয় না। তাই, উপনিষদে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভূতসূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে। তেজ যেমন কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নিরূপে অভিব্যক্ত হয়, সত্ত্ব দ্রব্যও (অহঙ্কার তত্ত্ব) তেম্‌নি ভূত সংযোগে (চক্ষুরাদি অধিষ্ঠানে) ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই উপনিষদের তাৎপর্য্য। সত্ত্বাদি দ্রব্য পরস্পরকে ছাড়িয়া কোথাও একাকী থাকে না; একটী প্রবল হইলে, অন্য দুইটীও তাহার সঙ্গে থাকে। সুতরাং যে সময়ে, তমোগুণ প্রধান হইয়া পঞ্চভূত জন্মিয়াছিল, সে সময়ে তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তিও লীনভাবে (potential possibility রূপে) অবস্থিত ছিল; কেবল পঞ্চভূতের যথোপযুক্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়াতেই তাহা প্রকাশ পায় নাই। পরে যখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে, পঞ্চভূত প্রাণীর দেহাকারে পরিণত হইল, তখন যথোপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া, তদন্তর্গত সুপ্ত ইন্দ্রিয় শক্তিও জাগিয়া উঠিল। "পঞ্চতন্মাত্র হইতে সত্ব ও রজঃ প্রধান হইয়া ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে"—বেদান্তদর্শন এই কথা বলিয়া, সেই তত্ত্বই পরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই উপনিষদ্‌ও বলিয়াছিলেন যে, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি ভূতে, ইন্দ্রিয়শক্তি বীজাকারে লুক্কায়িত ছিল। ইহাই বাস্তবিক তত্ত্ব। বোধ হয়, পাঠক এখন উপনিষদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি, প্রকৃতির (finer forces) মাত্র এবং তেজ, জল, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সেই প্রকৃতিরই (grosser forces) মাত্র। পূর্ব্বোক্ত শক্তিগুলি সত্ব ও রজোগুণ প্রধান; এবং দ্বিতীয়োক্ত শক্তিগুলি তমঃপ্রধান, এই মাত্র ভেদ।

আমরা আর একটী মাত্র কথা বলিয়া এই ইন্দ্রিয় সৃষ্টির কথার উপসংহার করিব। পাঠক উপরে শুনিয়াছেন যে, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিকে, ইন্দ্রিয়শক্তি সমূহের "অধিদেবতা" রূপে উপনিষদ্‌ নামকরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, সমষ্টি ইন্দ্রিয়গুলিই, ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়গুলির "দেবতা"। বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মীমাংসা বড়ই চমৎ-

কার। এটী বুঝিলে, এই ইন্দ্রিয় সৃষ্টির কথাটা আরো পরিষ্কার হইবে বলিয়া, আমরা এ কথাটাও এস্থলে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি। পাঠক বিরক্ত হইবেন না। “সমষ্টি” শব্দের অর্থ কি ? একটা দৃষ্টান্ত দিলে ইহার অর্থ বুঝা যাইবে। প্রকাণ্ড পত্র-শাখা-পুষ্পাদি বিশিষ্ট বটবৃক্ষ, তাহার বীজে সমষ্টিভাবে লুক্কায়িত ছিল। অতএব এক হিসাবে, বটের বীজকে, বটবৃক্ষের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞানভিক্ষুর সমষ্টি শব্দকে এই বীজরূপেই বুঝিতে হইবে। নতুবা সমষ্টি অর্থে “বৃক্ষের সমষ্টি যেমন বন,”—এ ভাবে বুঝিলে চলিবে না। তবেই কথা হইতেছে যে, প্রাণী সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কেবল মাত্র অগ্নি, জল, সূর্য্যাদি সূক্ষ্মভূত জন্মিয়াছিল, তখন ইন্দ্রিয় শক্তিগুলিও বীজাকারে উহাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল, বিজ্ঞানভিক্ষুর ইহাই তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে। পরে, যথোপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া সেই শক্তিগুলি ব্যষ্টি-আকারে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। আমরা “সমষ্টি” শব্দের যে অর্থ করিলাম, ইহা আমাদের নিজের মনঃকল্পিত অর্থ নহে। পাতঞ্জল দর্শনে, ব্যাসভাষ্যে এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। পাঠক সেই স্থলটী দেখিবেন কি ? “অযুত সিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যম্” (পাতঞ্জল দর্শন, ব্যাসভাষ্য, ৩।৪৪)। “উক্ত “সমূহ” দ্বিবিধ ; যুতসিদ্ধাবয়ব এবং অযুতসিদ্ধাবয়ব। যে সমূহের অবয়ব যুতসিদ্ধ (পৃথক্‌ভাবে স্থিত, অর্থাৎ পরস্পর অসংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত), তাহাকে যুতসিদ্ধাবয়ব বলে, যেমন বন, সংঘ প্রভৃতি। যাহার অবয়ব পৃথক্ ভাবে থাকে না, পরস্পর মিলিত ভাবে অবস্থান করে, তাহাকে অযুতসিদ্ধাবয়ব বলে, যেমন শরীর, বৃক্ষ, পরমাণু। পতঞ্জলি বলেন, অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদের অনুগতই দ্রব্য” (শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ কৃত অনুবাদ)। অতএব ব্যাসভাষ্যে যাহাকে “অযুতসিদ্ধাবয়ব” বলা হইয়াছে, সেই অর্থেই বিজ্ঞানভিক্ষুর “সমষ্টি” শব্দকে বুঝিতে হইবে। তবেই এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে যে, ভূতসকলের মধ্যে, ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি বীজাকারে বা সমষ্টিভাবেই অবস্থিত ছিল। পরে, তাহাই যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আর আমরা এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। উপনিষদের তাৎপর্য্য আমরা এইরূপেই বুঝিয়াছি এবং বোধ হয় ইহাই উপনিষদের প্রকৃত অভিপ্রায়। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কান্না—অভিমান।

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, চাঁদের হাসি জ্যোৎস্না রাশি দেখ্‌তে জ্বলে প্রাণ !
কদম পাতার ফাকে ফাকে,
ফুচ্‌কি দিয়ে চেয়ে থাকে,
শিরায় যেন হীরায় কাটে আঁখির বাঁকা বাণ !
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান !

আমি, হাসির চেয়ে ভলেবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, বন্‌বিলাসী পুষ্পরাশি দেখ্‌তে জ্বলে প্রাণ !
ফোটা ফুলের মোটা হাসি,
আমার বুকে সয়না আসি,
রোমে রোমে লাগ্‌ছে যেন দোমে দোমে টান !
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান।

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
আমার, কল্ কল্ কল্ খল্ খল্ খল্ হাস্যে ফাটে প্রাণ!
নদীর ঢেউয়ের হাস্য রঙ্গ,
বিলে বাজে জল তরঙ্গ,
রক্ত ফোটে টগ্‌বগিয়ে শিরায় দহ্যমান্!
আমার, কল্ কল্ কল্ খল্ খল্ খল্ হাস্যে ফাটে প্রাণ!

৪

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
তার, মলিন মুখে অশ্রুটুকে দেখ্‌তে জুড়ায় প্রাণ!
জলের ভারে চক্ষু নত,
বদ্ধ মুক্তা স্রোতের মত,
পদ্ম ভাঙ্গা মদ্য রাঙ্গা কাজল মাখা বান!
কখন পড়ে ফোটা ফোটা,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কোমল বোঁটা,
পউষ মাঘে পাতার আগে শিশির লম্বমান!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

৫

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!
যখন বসে গাল ফুলিয়ে,
শোভা আসে পাল তুলিয়ে,
যত্নে যেন উজান বেয়ে রত্ন তরীখান!
চখে মুখে চূর্ণ চুলে,—
দেখ্‌লে তারে জগৎ ভুলে,—
বক্ষে-মণি রক্ষা করে যক্ষ সাবধান!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

৬

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান;
যজ্ঞে দিলে সমিধ্ ঘৃত,
অগ্নি যেমন ধূমায়িত,
কখন জ্বলে কখন নিবে কখন লেলিহান্!
বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে,
চেয়ে দেখে যজ্ঞ ক্ষেত্রে,
অগ্নিহোত্রী প্রণয়গোত্রী আকুল যজমান!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!
অরুণ উষার তরুণ শিখা,
ঢাক্‌লে শীতের কুহেলিকা,
কাতর করুণ ফুলের কাঁদে আতর মাখা প্রাণ!
কিন্তু তার উর্দ্ধগত,
জগজ্জ্বালা রৌদ্র কত,
রুদ্ধ বলে আকাশ তলে ক্রুদ্ধ—বলবান!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

৮

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!
নীল্ নীরদের আঁচল পেতে,
শশাঙ্ক শোয় আঁধার রেতে,
তীব্র উগ্র তীক্ষ্ণ তড়িৎ চাউনি খরশাণ!
অচঞ্চল পদ্ম ফোটা,
পছন্দ নয় আমার ওটা,
বর্ষে যখন হর্ষে তখন আমার ভাসে প্রাণ!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

৯

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান,
তার, নলিন আঁখির মলিন ঠারে ঠাণ্ডা করে প্রাণ!
অভেদ নিশি অভেদ দিবা,
মেঘ মোড়ান শাওণ কিবা,
শব্দহীন জব্দ জগৎ স্তব্দ কলতান!
শাখীর জলে পাখী ভিজে,
আখির জলে ভিজিয়ে নিজে,
পরকে ভিজায়, প্রেমের কি যে পুণ্য মৌনী স্নান!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

১০

আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!
তার, নয়ন ডাগর কৃষ্ণসাগর দেখ্‌তে কাঁপে প্রাণ!
সাধ্‌তে গেলে বিষম লাগে,
না সাধ্‌লেও বিষম রাগে,
আস্‌তে কাটে যাইতে কাটে শাঁখের করাত খান!
শুনছি পদ্ম-পদাঘাতে,
মুক্তি মিলে হাতে হাতে,
লভে স্বর্গ চুতুর্ব্বর্গ কত পুণ্যবান্!
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না—অভিমান!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কপালে আগুন।

বাঙ্গালা দেশে একটা প্রাচীন ও প্রখ্যাত প্রবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এই—"যার সর্ব্বদেহে ব্যথা, তার ঔষধ দিব কোথা ?" আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক তাহাই। যদি একটা দিকে অবনতি দেখা যাইত, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করা কঠিন বলিয়া বোধ হইত না, কিন্তু সমুদয় বিষয়ে অবনতি হইলে প্রতিকারের জন্য কয়টা উপায় অবলম্বন করা যায় ? যেখানে রোগ, সেখানে তাহার ঔষধ, এ কথা সত্য ; যেখানে অবনতি, সেখানে তাহার প্রতিকার, এ কথাও সত্য ; কিন্তু সম্মুখে, এমন কি হাতের পার্শ্বে, সুন্দর উপায় বর্ত্তমান থাকিতেও, মানুষ যখন উপায়কে "উপায়" বলিয়াই গ্রাহ্য করে না, তখন আর প্রতিকারের ভরসা কোথায় ? জলপ্লাবনে সমস্ত দেশ যদি ডুবিয়া যায়, ঝড়ে যদি অর্দ্ধেক রাজ্য অদৃশ্য হয়, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বা যুদ্ধে যদি কোটি কোটি প্রাণীর বিনাশ হয়, অথবা এক একটা গোরা যদি প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে লাথি বা ঘুষি দ্বারা মারিয়া ফেলে, তথাপি এ দেশের লোক তাহার প্রতিকার জন্য সামান্য মাত্র চেষ্টা, সামান্য মাত্র সাহস অবলম্বন অথবা সামান্য মাত্র স্বার্থত্যাগ স্বীকার না করিয়া, কেবল গাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে, আকাশের দিকে চাহিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে থাকিবে "কপাল আর কপাল !!" বাল্যকাল হইতে আমরা অদৃষ্ট, ভাগ্য, নশীব, তগ্‌দীর, কপাল প্রভৃতি কথাগুলি এরূপে শিক্ষা করিয়াছি এবং এই কপালে আমাদের বিশ্বাস এমন দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের সমস্ত জাতি—সমুদয় দেশীয় নরনারী—এই কপালের দোহাই দিয়া মানুষের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বকে অগাধ জলে বিসর্জ্জন করিতে ক্ষণকালের জন্যও কুণ্ঠিত হয় না। ডাকাইতেরা আসিয়া তোমার ঘর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল, তোমার মা, মাসী, ভগ্নী, ভাগ্নীর প্রতি অযথা অত্যাচার করিল, তুমি হয়তঃ চেষ্টা করিলে ডাকাইতগণ তাড়িত হইত, কিম্বা ধৃত হইয়া গুরুতররূপে দণ্ডিত হইত, কিন্তু তুমি তাহার কিছুই না করিয়া কেবল "হায় রে কপাল ! হায় রে কপাল !" বলিয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে, দাঁতের দ্বারা নখ কাটিতে এবং হাতের দ্বারা বুক চাপড়াইতে লাগিলে। তোমাদের ঐ কপালে আগুন লাগুক ; এই কপালের বিশ্বাসই তোমাদের কাপুরুষতার প্রধান কারণ। আমি নিজে "কপাল" মানি না, তাহা নহে, আমি নিজে একজন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস হইতে আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বিজ্ঞান বা যুক্তির কথা তুলিয়া অদৃষ্টের অর্থ করা আমার উদ্দেশ্য নহে ; কপালে অযথা বিশ্বাস হেতু তোমাদের যে দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, অথবা অদৃষ্ট শব্দের অন্যায় ও অবৈজ্ঞানিক, অথবা অশাস্ত্রীয় অর্থ হেতু তোমাদের জাতির ও সমাজের যে সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, তাহাই দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের কৃপা ও শক্তি ভিন্ন আমরা কিছুই করিতে সমর্থ হই না, ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু তোমার ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের সহিত সেই

অপূর্ব্ব দৈবশক্তি ও দৈবকৃপার সম্পর্ক খুব কম। মানুষ যখন নিজের চেষ্টায়, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতার, সাহস ও অধ্যবসায়ে, কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে অক্ষম হয়, তখন অদৃষ্ট মানে, তখন নিরাশাগ্রস্ত হইয়া "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" বলিয়া ক্ষান্ত হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি শরীর, মন, মস্তিষ্ক ও আত্মিক শক্তি দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাপুরুষের ন্যায় "ইহা হইতে পারে না" "ইহা হইবে না" "ইহা অসম্ভব" "ইহা আমাদের কপালে নাই" এইরূপ প্রলাপোচিত বাক্যে সময় ও সুবিধাকে নষ্ট করে না। অদৃষ্টের নাম অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না, যাহা বুদ্ধি বা বিদ্যায় আসে না, যাহা সাহস বা অধ্যবসায়ে কুলায় না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—অর্থাৎ বুদ্ধি, বিদ্যা বা সাহসে কুলায়, —ততক্ষণ পর্য্যন্ত অদৃষ্ট নাই; শক্তির বাহির হইলেই সকলই অদৃষ্ট; কিন্তু তোমরা প্রথম হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছ যে "এ সকল আর কিছুই নহে কেবল কপাল আর কপাল!!" তোমরা অনুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, অনুমাত্র সাহস অবলম্বন না করিয়া, মন বা মস্তিষ্ককে অনুমাত্র পরিচালন না করিয়া, প্রথম হইতেই অলসের ন্যায়—মহা কাপুরুষের ন্যায়—স্থির করিয়া রাখিয়াছ "কপাল আর কপাল!!' এই অযথা বিশ্বাস, এই মহা ভ্রমাত্মক সংস্কার, তোমাদের সমুদয় উৎসাহ, সমুদয় উদ্দীপনা, সমুদয় সৎগুণ এবং সমুদয় বিদ্যা বুদ্ধিকে অকর্ম্মণ্য ও অসার করিয়া তুলিতেছে। পুনরায় বলি, তোমাদের "কপালে আগুন লাগুক; তোমাদের এই বিশ্বাস তোমরা ভারত মহাসাগরের অগাধ জলে ফেলিয়া দাও; তোমরা এই বিশ্বাসে পদাঘাত করিয়া বীরের ন্যায়, প্রকৃত মানুষের ন্যায় উত্থিত হও। ঐ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস তোমাদিগকে মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে, তোমরা ঐ বিশ্বাসকে দূরে ফেলিয়া দিয়া সাহসের সহিত বল—

> "ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
> ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥"

এ দেশের বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণী, সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্য মধ্যে কপাল কথাটা যেন গার্হাস্থ শব্দ হইয়া উঠিয়াছে। সম্বৎসরের মধ্যে একটা ভারতবর্ষীয় লোক যতবার হরিনাম উচ্চারণ করে, একটা গৃহস্থের ছেলে বোধ হয় একদিনে ততবার "কপাল" শব্দটা উচ্চারণ করিয়া থাকে। খাইতে, শুইতে, বেড়াইতে, বসিতে, হাঁটিতে, কেবল কপাল আর কপাল!! সমগ্র জাতির মধ্যে এই সংস্কার অতীব দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। একটা দোকানে, একটা হাটে বা ঘাটে, একটা টোলে বা স্কুলে, যেখানে যাই, কপাল কথাটা পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায়। একটা হিন্দুস্থানী জুতার দোকানে ১০ মিনিটকাল মাত্র দাঁড়াইয়া থাক, বোধ হয়, তিনবার শুনিবে যে, "মেরী নশীব্‌মে রামজী যো লিখ্‌লা বাড়ে"। কাপড়ের দোকানে যাও, সেখানেও ঐ কথা—— "আরে! ভগবান যো লিখা হ্যায়" ইত্যাদি। আর বাঙ্গালী ভায়ার ত কথাই নাই, কথায় কথায় কপাল আর কপাল!! আমি পুনরায় বলি, তোমাদের ঐ কপালে আগুন লাগুক।

গত আষাঢ় মাসের "নব্যভারতে" বাবু প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয় আমাদের কাপুরুষত্ব সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা

অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, মনে কর, একজন নিরপরাধিনী ব্রাহ্মণী যুবতী স্ত্রীলোককে পাড়ার পাঁচ জন দুষ্ট মুসলমান মিলিয়া নির্য্যাতন পূর্ব্বক সতীত্ব নষ্ট করিল, স্ত্রীলোকটাকে অমনি তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং পল্লীর সকল লোক একত্র হইয়া সমাজচ্যুত করতঃ বাজারে পাঠাইয়া দিল, সেখানে সে বেশ্যারূপে বাস করিতে লাগিল; নিরপরাধিনী যুবতীর শ্বশুর, শাশুড়ী, মাতা, পিতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং গ্রামের লোকেরা কহিল "হায়! হায়! ইহার কপালে কি এই ছিল!!" অথচ একটা টাকা খরচ করিয়া, একটু চেষ্টা বা যত্ন করিয়া অধার্ম্মিক মুসলমানগুলোর দণ্ডবিধান জন্য কেহই প্রয়াস স্বীকার করিল না, কেবল সেই নিরপরাধিনী বালিকার দিকে তাকাইয়া "কপাল কপাল" রবে আকাশ পাতাল কাঁপাইতে লাগিল। একটা লোক পুকুরের অগাধ জলে পতিত হইয়া ডুবিয়া গেল, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তোমাদের কিছুমাত্র চেষ্টা নাই, কেবল কপাল আর কপাল রবে তোমরা জগৎকে কাঁপাইয়া তুলিলে!! পুলীষে ঘুষ খায়, মাজিষ্ট্রেট অবিচার করে, জমিদার প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়, স্কুলের পরীক্ষায় ছেলে ফেল হয়, অল্প বয়সে বিবাহিতা কন্যা বিধবা হয়, অলসের ঘরে ভাত থাকে না, কুঁড়ের ঘরে কাপড়খানি পর্য্যন্ত নাই, মাতালের সর্ব্বনাশ হয়, অসদাচার জন্য নিউমোনীয়া রোগ জন্মে, এ সমুদয়ই কেবল কপাল আর কপাল!! কপাল ভিন্ন ইহার অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে কি? থাকিলেও তোমরা তাহা বুঝিবে কি? তোমাদের "কপাল-বিশ্বাস" সমুদয় সৎগুণের হন্তারক। আশি বৎসরের মহা বুড়ো লম্পট পুরুষ, সুন্দরী সতী স্ত্রীকে তুচ্ছ করিয়া, সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক সন্তানকে উপেক্ষা করিয়া, গৃহে সুখ ও শান্তির মূলোৎপাটন করিয়া, কেবল কতকগুলা টাকার লোভে একটা নবম বর্ষীয়া কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিল; লোকটার পূর্ব্বকার পুত্র, মাতা, পিতা, জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে বুক চাপড়াইয়া চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল "কপাল আর কপাল!!" অথচ সেই লম্পট বুড়োটার অপকর্ম্মের জন্য কেহ একটা কথা কহিতেও সাহসী হইল না। এখানেও কপালের কেমন প্রাবল্য দেখিলে কি? মানুষ মরে একবার, কাপুরুষ মরে তিন বার, আর "কপালে বিশ্বাসকারী" মরে শতবার! পুনরায় বলি, তোমাদের কপালে আগুন লাগুক। হে বিধি! তুমি ভারতবাসীর কপালে আগুন জ্বালাও; যতদিন ইহাদের কপাল না পুড়িবে, ততদিন আর নিস্তার নাই।

আসল কথাটা কি জান? ভারতবর্ষ মহাদেশের উত্তরে যদি হিমালয়, দক্ষিণে যদি মহাসাগর এবং এতদুভয়ের মধ্যে গঙ্গা ও পদ্মা নদী না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতবাসীর কপালে আর বিশ্বাস থাকিত না। ভারতের লোকেরা উত্তরের সীমায় গিয়া দেখে, সম্মুখে অভ্রভেদী অত্যুচ্চ হিমগিরি দণ্ডায়মান। দক্ষিণের সীমায় গিয়া দেখে, মহা মহাসাগর মুখব্যাদান করিয়া প্রসারিত, সুতরাং পারের ভরসা না দেখিয়া নিরাশান্বিত হয়। এদিকে জলপ্লাবিতা পদ্মার ভীষণ মূর্ত্তি, ওদিকে ভাদ্রের তরঙ্গভরা ভাগীরথীর ভীষণতা দেখিয়া ভারতবাসী মনে করে "আর আশা নাই!"

এই "আশা নাই" ভাবনা হইতে নিরাশাত্মক কপাল শব্দের উৎপত্তি এবং সেই কপালে বিশ্বাসের সৃষ্টি !! ক্রমে সেই বিশ্বাস আমাদের বংশপরম্পরায় হাড়ে হাড়ে জমিয়া গিয়াছে। আমরা এইরূপে সকল কাজেই দুর্ভেদ্য হিমালয়কে ও মহাবিশাল মহাসাগরকে দেখিতে পাই, দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হই না। যদি সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, পাপের প্রতি ঘৃণা, অত্যাচার ও অবিচারের প্রতি অভক্তি, কাপুরুষতার প্রতি বিরক্তি এবং শরীর মন ও আত্মার প্রতি স্নেহ থাকিত, তাহা হইলে আমরা আর "কপাল" "কপাল" রবে কাপুরুষত্ব দেখাইতাম না। জাতীয় জীবন সংগঠন, সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করিতে হইলে "কপাল" কথাটা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। জাতি বলিয়া গণ্য হইতে হইলে, সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা, স্বদেশপ্রেম এবং সত্যপরায়ণতাকে অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে, বিগত-ভয় হইতে হইবে, এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎগীতায় অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "অর্জ্জুন! তুমি বিগতভীঃ (ভয়শূন্য) হও, তুমি প্রকৃত আর্য্য পুরুষের ন্যায় সাহসী হও।" যেখানে সত্য, সেইখানেই সাহস; যেখানে সাহস, সেখানে উন্নতি; যেখানে উন্নতি, সেইখানেই জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি।

কেহ কেহ বলেন, কখনও সয়তানের রাজ্য হয় এবং কখনও পরমেশ্বরের রাজ্য হয়। আমি একথায় আদৌ বিশ্বাস করি না। পরমেশ্বর যদি সত্য হয়েন, তাহা হইলে সত্যেরই রাজ্য চিরকাল থাকিবে; সত্যের রাজ্য আর মিথ্যার রাজ্য একাধারে থাকা অসম্ভব। পরমেশ্বরকেও মানিব, অপর সয়তানকেও মানিব, একথা ভুল। যে সত্যের অনুসারী, সে মিথ্যার অনুসারী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সাহস ও সত্যের অনুবর্ত্তী, সে ব্যক্তি কখনই কপালের বিশ্বাসী হইতে পারে না, সুতরাং কপালের বিশ্বাস কেবল দুর্ব্বলতা এবং কেবল কাপুরুষতা। পুনরায় বলি, তোমাদের কপালে আগুন লাগুক।

থিওডোর পার্কার, মার্টিণ লুথার, খ্রীষ্ট প্রভৃতি সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। পার্কারের সত্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়া, দাসব্যবসায়-প্রথা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সত্যে বিশ্বাস থাকিলে, সাহস নামক গুণ স্বতঃই দৃষ্ট হয়। সাহেবেরা নীলকররূপে এদেশে ভয়ানক অত্যাচার করিত; কবি দীনবন্ধু বড় দুঃখে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—

> নীল বাঁদরে সোণার লঙ্কা
> কোল্লে ছারখার।
> অসময়ে হরিশ মোলো,
> লংএর হলো কারাগার॥

সাহেবদিগের দৌরাত্ম্যে গরিব প্রজার ধন নাশ, ধর্ম্মনাশ, মান নাশ, কুল নাশ, জাতি নাশ, অন্ন বস্ত্র নাশ প্রভৃতি নিত্যনিত্যই ঘটিত, স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা পাইত না। প্রজারা যতদিন "কপাল" "কপাল" করিয়া নিরস্ত ছিল, ততদিন নীলকরের দমন হয় নাই, কিন্তু প্রজারা যখন বুঝিল, "কপালে বিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না," তখন তাহাদের দেহে ও মনে কার্য্যকরী শক্তির স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। ক্রমে, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, খুলনা

প্রভৃতি জেলার অসংখ্যাসংখ্য প্রজা একত্র হইয়া যখন ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল, তখন সাহেবদিগের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। ক্রমে নীলকরের অত্যাচার একেবারে দমিত হইয়া গেল। এ সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি তোমরা এখনও কপালের দোহাই দিতে চাহ? পুনরায় বলি, লাগুক তোমাদের কপালে আগুন !!

ধন্য তোমাদের কপাল এবং ধন্য তাহাতে বিশ্বাস !! ক্রমাগত "কপাল" "কপাল" রবে জগৎ কাঁপাইয়া তোমাদের কপালকে তোমরা আরও কাপুরুষত্বময় করিয়া তুলিতেছ। যাহারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়, জুতো ও গুঁতো খাইয়া কপালের দোহাই দেয়, যাহাদের মানাপমান জ্ঞান নাই, তাহারা পৃথিবীতে চিরকালই অধম, অপদার্থ, অসার, অকর্ম্মণ্য ও পতিত মনুষ্য বলিয়া গণ্য হয়। তাহাতেই বলিতেছি, তোমরা তোমাদের বৃথা "কপাল" কথা ছাড়িয়া দিয়া, স্বদেশের, স্বসমাজের এবং নিজের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও। সমগ্র বিশ্বের যাঁহারা বান্ধব, তাঁহারা শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ জন্য চরিত্র বল, মানসিক বল, শারীরিক বল, উৎসাহ, উদ্যোগ, পরিশ্রম, যত্ন, উদ্দীপনা, সাহস প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া থাকে। তোমরা যদি কেবল কপাল কপাল ভাবিয়াই নিরস্ত থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের কপালে আগুন লাগুক। তোমরা অতি বৃদ্ধ (পুরাতন) আর্য্যজাতির বংশধর, তোমরা জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের সিদ্ধিতে নিপুণ, কিন্তু এক কপালের বিশ্বাসের দোষে তোমাদের সকল সৎ গুণ মাটি হইয়া গেল। এখনও সাবধান হও, এখনও ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত মানুষের মত সাহসকে অবলম্বন কর। নতুবা—

অতি বড় বৃদ্ধ তুমি,
সিদ্ধিতে নিপুণ।
কিন্তু কোন গুণ নাই তব,
কপালে আগুন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ

প্রাগুক্ত সমাজ কয়টীর ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষগণ রাজকীয় দান প্রাপ্তি নিবন্ধন মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যাদির দ্বারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত সমাজগঠনের অব্যবহিত পরেই যাঁহারা তাৎকালিক এতদ্দেশীয় কোনও না কোন রাজসংস্রবে সংসৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারাই ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। দারিদ্র্য-দোষ, বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যরক্ষা বিষয়ে যে প্রধান অন্তরায়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সেকালের রাজসংসারের সহিত সংস্রব থাকিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিরূপ অর্থাগম ও প্রভুত্ব হইত, তাহা ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ তৎকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাজে যথেষ্ট সমাদর ও প্রতিপত্তি ছিল, এবং ধনীব্যক্তিগণ, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ, প্রায়ই দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে যদিও সংস্কৃত চর্চ্চার লোপ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি সমাদরের হ্রাস হইয়া আসিতেছে বটে, তথাপি যিনিই ধনবানের আশ্রয়ে থাকেন, তিনিই সকলের নিকট শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মেল বন্ধনজনিত বাঁধাবাঁধি নিয়মের ন্যায়, কোন কঠোর নিয়ম দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ ভেমুয়ার মুখোটী গ্রামীণ ভট্টাচার্য্যকে যে অবশিষ্ট পঞ্চ সমাজের কোনও না কোনও স্থলে কন্যা গ্রহণ অথবা প্রদান করিতে হইবে, তাহা নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে, আপন সুবিধামত, স্বশ্রেণীয় যে কোন ঘরে কন্যা আদান প্রদান করিতে পারেন। ইহার দ্বারা রাঢ়ীয় সর্ব্বদ্বারী বিবাহের চিহ্ন যে অদ্যাপি মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে বিবাহাদি সংস্কার কালে, কতিপয় বিশেষ নিয়ম বা প্রথা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই একটী প্রথার বিষয় নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। বিবাহের দিন কন্যাকে একটী পুষ্করিণীতে প্রথমে স্নান করাইতে হয়। কন্যা স্নানের পর বরকে প্রায়শঃ সেই পুষ্করিণীতেই স্নান করিতে হয়। কদাচিৎ এক পুষ্করিণীতে বর ও কন্যার স্নান ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু বরের আগে কন্যা স্নানের প্রথা বহু দিন হইতে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিবাহের পরদিবস কুশণ্ডিকা অর্থাৎ হোম ও উত্তর বিবাহাদি প্রধান বৈবাহিক সংস্কারগুলি কন্যা গৃহেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। (১২) বিবাহের পর তৃতীয় দিবসে বর ও কন্যা, বিশেষ বাধা না থাকিলে, বরগৃহে আগমন করেন। কুশণ্ডিকা হইয়া গেলে, সেই দিবস অপরাহ্নে "সুপারিতোলার" একটী ব্যবস্থা আছে। কন্যাপক্ষীয় কোন প্রধান ব্যক্তি, একটী কোশাস্থিত কয়েকটী সুপারি লইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, বরপক্ষীয় কোন প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক উহা সাদরে পরিগৃহীত হয়। অধিকাংশ স্থলেই বর ও কন্যার পিতা এই উভয়ের মধ্য উক্ত ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই "সুপারিতোলা" প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য বর ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কুটুম্বিতা স্থাপন। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কেহ কেহ এই প্রথার একান্ত বিরোধী। কুশণ্ডিকার দিন রাত্রিতে কন্যাপক্ষীয় সমবেত কুটুম্ব ও আত্মীয়গণকে "সুকৃতি ভোজন" অর্থাৎ একত্র আহার করিতে হয়। ইহা দ্বারা কুটুম্বিতা বন্ধন দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের অন্যান্য সংস্কারগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে বলা পুনরুক্তি মাত্র।

এক্ষণে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কতিপয় প্রধান পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

গোয়ীচন্দ্র—"সংক্ষিপ্তসার" ব্যাকরণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহামহোপাধ্যায় গোয়ীচন্দ্র (১৩) "উথাসনী" পদবী বিশিষ্ট ছিলেন; ইহা তাঁহার "বিবরণী" নাম্নী টীকার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ইত্যৌথাসনিক

---

(১২) ভবদেব ভট্টের "কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি" মহর্ষি গোভিল প্রণীত "গৃহ্যসূত্র" অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।- বিবাহাদি বৈদিক সংস্কার সকল কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহা ভবদেব পদ্ধতিতে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন কালে রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের" প্রভাবে বৈদিক সংস্কারগুলি যথেচ্ছ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(১৩) গোয়ীচন্দ্র সম্বন্ধে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিলাম। আমার এই মতের খণ্ডন আমি সাদরে আহ্বান করিতেছি। কেহ কিছু লিখিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রীগোয়ীচন্দ্র বিরচিতায়াং” ইত্যাকার পরিচয় জানিতে পারা যায়। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় উথাসনী পদবী বিশিষ্ট অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। উক্ত উথাসনী মহাশয়গণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গোয়ীচন্দ্র তাঁহাদেরই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোয়ীচন্দ্রের মধ্যশ্রেণীয়ত্ব সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী উক্ত সমাজে বহুদিন হইতে শ্রুত হওয়া যাইতেছে। উক্ত জনশ্রুতিটী এই যে, তাঁহার নিবাস সবঙ্গ-পরগণায় ছিল এবং অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা উক্ত স্থানে বাস করিতেছেন। স্বকৃত টীকায় গোয়ীচন্দ্র নিজের কিছুমাত্র পরিচয় দেন নাই। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ বাদীন্দ্রচক্র চূড়ামণি ক্রমদীশ্বর পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীমজ্জুমরনন্দি-পরিশোধিত রসবতী নাম্নী বৃত্তি-সমন্বিত। মেদিনীপুর জেলার এবং অন্যান্য অনেক স্থলের অনেক অধ্যাপকের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে, জুমরনন্দী তন্তুবায় জাতীয় ছিলেন। গোয়ীচন্দ্র বিবরণী টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, মহারাজ জুমরনন্দীর উমাপতি দত্ত নামে একজন সভাসদ্ ছিলেন এবং তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিচারকুশল পণ্ডিত ছিলেন। টীকার স্থানে স্থানে গোয়ীচন্দ্র ক্রমদীশ্বরকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গোয়ীচন্দ্র, ঔণাদিক-তন্ত্রের অব্যয় পদ এবং তদ্ধিত পরিশিষ্ট প্রকীর্ণাবৃত্তি সহ প্রণয়ন করিয়া সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কলেবর সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। আমরা গোয়ীচন্দ্রের কৃত তদ্ধিত পরিশিষ্টের চতুর্থ সূত্রের বৃত্তিতে “ধবকশব্দো বোরধান্যে রূঢ় ইতি”—এবম্বিধ বাঙ্গালায় বোর শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। যাহা হউক, গোয়ীচন্দ্র কৃত টীকা আদ্যন্ত পাঠ করিলে তিনি কোন্ দেশের লোক ছিলেন, এতদ্বিষয়ক কিছুমাত্র বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায় না। “লঘু সংক্ষিপ্তসার” ব্যাকরণ-প্রণেতা মধ্যশ্রেণীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয় সবঙ্গ-পরগণাস্থ মধ্যশ্রেণীয় উথাসনীগণকে গোয়ীচন্দ্রের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কবিচন্দ্র—বর্ত্তমান মেদিনীপুর সহরের এক ক্রোশ দূরে অগ্নিকোণে জিনসহর গ্রামে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-কুলতিলক মহাত্মা কবিচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি জিনসহর গ্রামে তাঁহার বংশধর বাস করিতেছেন। পিংলা গ্রামনিবাসী মধ্যশ্রেণীয় যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পিতা পরলোকগত ত্রিলোচন তর্করত্ন মহাশয় কবিচন্দ্রের বাটীতে বিবাহ করেন। কবিচন্দ্র মহাশয় বর্ত্তমান যোগেন্দ্রনাথের বৃদ্ধপ্রমাতামহ ছিলেন। কবিচন্দ্র সংক্ষিপ্তসারের টিপ্পনী রচনা করিয়া গিয়া মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত টিপ্পনীগ্রন্থ শ্লোকাত্মক এবং সিদ্ধান্তকারিকাবলী নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কেবলমাত্র পাঠকগণের নিকট কবিচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় স্বরূপ নিম্নে উহার শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

তিঙন্তপদের সিদ্ধান্তকারিকা—

“ইটা বা কিং কার্য্যং যনি-লুকিহলন্তেঽচিপরে
গুণো ন স্যাদেবং মৃড়মৃগধানামিতি সতি।
তথাপীড়্ যোগোঽয়ং জপয়তি নিঃষধানিয়মনা
যপোপোষীৎ সিদ্ধাবিতি গুণনিষেধো ন ভবতি।”

সমাসপদের সিদ্ধান্তকারিকা—

“সুবন্তানেষাং সমসন-বিধানে বিরচিতে
বিভক্তৌ-লুপ্তায়াং পুনরপি ভবেৎ প্রাতিপদিকম্।

যদা ন স্যাদেবং তদুপরি কথং তদ্ধিতবিধি
রতো গোয়ীচন্দ্রঃ স্মরয়তি হি নাম্নোঽপ্যাধিকৃতম্।"

এখনও কবিচন্দ্রের প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুষ্পাঠী গৃহ জিনসহর গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রাঢ়ীয় গোপাল চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। (১৪)

কবিরত্ন চক্রবর্ত্তী—এই প্রবন্ধ লেখকের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কবিরত্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংক্ষিপ্তসারের টিপ্পনী অথবা উক্ত ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানেও উহার কোন নিদর্শন এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। উহাঁর প্রথম বাস পাথরার নিকটবর্ত্তী জাগুল গ্রামে ছিল। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখুটী-গ্রামীণ এবং গঙ্গাধরের সন্তান ছিলেন। কোন কারণবশতঃ ইনি জাগুল গ্রাম হইতে কাঁথির নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কাজলা গ্রামে প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর স্বর্গীয় রাজা যাদবরাম রায়ের পূর্ব্বপুরুষের আশ্রয়ে সভাপণ্ডিত-স্বরূপে বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁর অপর নাম দেবীদাস ভট্ট-(মুখোপাধ্যায়) ছিল। ইহাঁর প্রপৌত্রের দৌহিত্র দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ লঘুসংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন—মহাত্মা গঙ্গাধরের পরে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের উন্নতির জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্নের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাঁর পিতা সার্থকরাম ব্যাবত্তা মহাশয় স্বীয় প্রতিভাবলে সামান্য অবস্থা হইতে তমোলুকের রাজা আনন্দনারায়ণ রায়ের দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে সার্থকরামই প্রধান ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অতিথি সৎকার ও বিদ্যাদানের দ্বারা এবং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। গুরুপ্রসাদ প্রথমতঃ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পাঠ করিয়া শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামীর নিকট স্মৃতি এবং ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, ভাগবত ও বেদান্ত শাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাঁর বিদ্যাবত্তা অপেক্ষা অন্ন ও বিদ্যাদানের জন্য অধিকতর খ্যাতি ছিল। এমন কি, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ইহাঁর তুল্য অতিথিসৎকার-পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি প্রতিবৎসর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণকে এবং সমগ্র মধ্যশ্রেণীয় সমাজ নিমন্ত্রণ করিতেন। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাপ্রসাদ তর্কভূষণ সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন। এবং উক্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের প্রথম

---

(১৪) কবিচন্দ্র ব্যতীত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের নিম্নলিখিত টিপ্পনীকারগণ ছিলেন—(১) বিদ্যাবিনোদ আচার্য্য, (২) ন্যায়পঞ্চানন, (৩) গোপাল চক্রবর্ত্তী, (৪) বংশীবদন ভট্টাচার্য্য, (৫) অভিরাম বিদ্যালঙ্কার, (৬) জ্ঞাপকাবলীকার খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী হরগোবিন্দ বাচস্পতি।

চতুষ্পাঠী স্থাপনের সময় ইনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও ভাগিনেয় দেবী তর্কালঙ্কার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। দয়ারসাগর স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় গোপীনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি বাৎস্য গোত্রীয়, পুতিতুণ্ড গ্রামীণ এবং চক্রপানির সন্তান ছিলেন।

গোপালপুরের বাবু—ঘাটালের অন্তর্গত চেতুয়া পরগণার অন্তঃপাতী গোপালপুরের চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ উক্ত পরগণার "বাবু" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ মাণিকরাম ও মুক্তারাম দুই সহোদর ছিলেন। উহাঁরা তাৎকালিক বর্দ্ধমান মহারাজার নিকট বিস্তর নিষ্কর ভূমি দানসূত্রে পাইয়া বিবিধ দানশীলতার জন্য চেতুয়া পরগণার "বাবু" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁরা ঘৃতকৌশিকগোত্রীয়।

তমোলুকের অধিকারী—তমোলুকের প্রসিদ্ধ বর্গভীমাদেবীর সেবাইতগণ "দেবীর অধিকারী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা বাৎস্যগোত্রীয় এবং কাঞ্জিলাল গ্রামীণ। ইহাঁরা বলেন যে, ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণদেব মিশ্র ও বিষ্ণুদেব মিশ্র দুই সহোদর ছিলেন। উহাঁদের মধ্যে গৃহবিবাদ হওয়ায় কনিষ্ঠ কৃষ্ণদেব শ্রীক্ষেত্রে গমন ব্যপদেশে এতদঞ্চলে আসিয়া বর্গভীমাদেবীর সেবক নিযুক্ত হইয়া তমোলুকের রাজদত্ত নিষ্করভূমি লাভান্তর মধ্যশ্রেণীর হইয়াছিলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ বিষ্ণুদেব কনিষ্ঠের উদ্দেশ পাইয়া এ প্রদেশে আগমন করিয়া কনিষ্ঠের ন্যায় ভীমাদেবীর সেবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদবধি জ্যেষ্ঠ বিধায় বিষ্ণুদেবের বংশ ভীমাদেবীর সমস্ত সেবার মধ্যে নয় আনা এবং কৃষ্ণদেবের বংশ সাত আনা দখল করিতেছেন। এক্ষণে উক্ত উভয় বংশে অনেক দৌহিত্র সন্তান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাঁতরাগড়—মেদিনীপুরের কিয়দ্দূরে সাঁতরাগড় নামক স্থানের রাজবংশ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। ইহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং মুগুটীগ্রামীণ। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ইহাঁরাই রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আটবেড়ে—অত্রত্য ভট্টাচার্য্যগণের শাণ্ডিল্যগোত্র এবং পারিহা গাঁঞি। ইহাঁরা "আটকাঠির" ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের বংশে গুপ্তকালী পূজার প্রথা বিদ্যমান আছে। ইহাঁদের বংশে আপনাদের মধ্যে দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে, পৃথক্ গুরুবংশ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কতকগুলি কুপ্রথা শনৈঃ শনৈঃ লব্ধপ্রবেশ হইতেছে। উক্ত সমাজের প্রধান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐ সকল কুপ্রথার মূলোচ্ছেদে কৃতসংকল্প না হইলে, মহাত্মা গঙ্গাধরের কীর্ত্তি-কোকনদ অচিরাৎ পরিম্লান হইয়া যাইবে,- সন্দেহ নাই। সমাপ্ত।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইংলণ্ড।

হে ইংলণ্ড মাতৃকল্পা রত্নগরবিণি,
শৌর্য্য, বীর্য্য, আভিজাত্য-মুকুট-ধারিণি,
লয়ে যাও পোত ভরি হীরক কাঞ্চন,
মণিমালা, ঘনসার, তণ্ডুল রতন ;
সেও লৌহ বিনিময়ে, ঢেলোনা কেবল
বৃদ্ধা ভারতের বুকে সভ্যতা গরল !
কি বিষ ক'রেছ দান হেথা ঘরে ঘরে,
স্ত্রীপুরুষে স্বার্থ-দেবে নিত্য পূজা করে।

'ধনলুব্ধ' মুগ্ধবাক্যে শিখায় বর্জ্জন,
'ভণ্ড' তাপসের বেশে করে বিচরণ,
উপচারে সাধনায় পাশ্চাত্য বিলাস-
অর্ঘ্যে "অটোডি"র গন্ধ—হরণে উল্লাস।
অবিশ্বাস পিতা পুত্রে সুখের লাগিয়া
আগ্রহে অধর্ম্মে লোকে ল'তেছে যাচিয়া।

জাহ্নবী-নির্ম্মল-চেতা, ভারতকামিনী
তোমার প্রভায় এবে ঘোর বিলাসিনী।
নহে নারী দ্রবময়ী—স্বভাব মধুরা
অতিথি-বৎসলা এবে, প্রগল্‌ভা চতুরা।
দানে ছিল মুক্তহস্ত সেবায় জননী,
গৃহে কমলার মূর্ত্তি ! কল্যাণী, পাবনী,
সরমে ঈষৎ ফোটা, মধুরিম ভরা
পর বেদনায় হ'ত, সহজ কাতরা।
হে ইংলণ্ড, চেয়ে দেখ তোমার কৃপায়
রাক্ষসী হ'য়েছে যত গৃহ দেবতায় !
হের পরভাবে স্ফীতা, আত্ম সুখরতা,
কোমল হৃদয়ে নাহি অক্ষয় মমতা।
ভক্তিশূন্যা ধর্ম্মহীনা দ্বন্দ্বপরায়ণা
'ত্যাগে' উগ্রা ভয়ঙ্করী বিষণ্ণ আননা।
মায়ে নাহি মাতৃস্নেহ পুত্রবৎসলতা !
একদেশদর্শী পিতা, প্রহৃত মমতা ;
অর্জ্জন নিপুণ পুত্রে, ধনুয়া বঙ্কিম
অর্থহীন পুত্র প্রতি সদা বক্র গীম।
(আবার)
পুত্র বাঁধা গৃহিণীর সোণার অঞ্চলে,
ভাসাইয়া পিতৃপূজা কর্ম্মনাশা জলে,
শুচীমেধ্য প্রেম ত্যজি, জীর্ণ লালসায়
ডুবাইছে আপনারে রূপ মদিরায়,
ব্যভিচার দুষ্টপ্রাণ সুনীতি স্খলিত,
কলুষিত পর্য্যুষিত জঘন্য ঘৃণিত।

হায় কোথা জাতীয়তা ? কোথায় জীবন ?
বৃদ্ধ ভারতের পদ কে করে অর্চ্চন !!
কর্ম্ম-দীন যশঃলুব্ধ গর্ব্বস্ফীতপ্রাণ
তাদের আবার কেন হিতৈষীর ভাণ ?
'কংগ্রেস' তোমার পদে করি নমস্কার,
তোমা হ'তে হইবে না জীর্ণসংস্কার,
আছ ক্রীতদাস সবে থাক ক্রীতদাস,
নীতির আলোকে কর আপন বিকাশ।
শিশুরে শিখাও সত্য, কন্যায় মমতা,
নারীরে শিখাও যত্নে, আর্য্যপতিরতা।
হিংসা, দ্বেষ, অসূয়ায়, দিয়া বিসর্জ্জন
অগ্নিশুদ্ধ ক'রে লও সবার জীবন।
প্রাণে কর স্বাস্থ্যশীল, উদার উদাস,
বুঝিবে কেমন মধু মনুষ্য বিকাশ।
কে করিবে অত্যাচার ? কে দিবে বাধন ?
শত্রু ত্রাসে পদযুগ করিবে লেহন।
পশু আছ বাঁধা আছ ত্যজ পশুভাব
কর্ম্মক্ষেত্রে নাহি রবে কিছুরি অভাব।

ন্যায়ের কনকতুলা করিয়া ধারণ
হে ইংলণ্ড, সাম্যতন্ত্র কর উচ্চারণ,
তোমার ন্যায়ের মন্ত্র রহস্য জড়িত,
ও মন্ত্রে ভারতপুত্রে করোনা দীক্ষিত।
কাজ নাই উচ্চপদে, চাহিনা সম্মান,
দাসের মতন কর দাসের বিধান !
অমানীরে মানরত্নে করিয়া ভূষিত
করিও না হে ইংলণ্ড অযথা গর্ব্বিত ;
আর্ত্তনাদ হাহাকার অভাব ভীষণ
স্থবির ভারতবক্ষ করিছে কম্পন,
আমাদের অতি স্বচ্ছ সারল্য বিনয়,
বিলাতি কাপট্যরসে আজি বিষময়,
রসনা উগারে মধু হৃদয় গরল
কপটী সাজিয়া থাকে তাপস সরল।
পৃথিবীর কেন্দ্র-সম দৃঢ় শক্তিমান্
সমাজ, তোমার স্পর্শে মলিন বয়ান !!

আপনি শতধা দীর্ণ, ভ্রষ্ট, ভগ্ন, ম্লান,
সেও চায় সমাজেরে করিতে মহান্ !!
আপনার সংস্কারে কুণ্ঠিত যে জন
সেও চায় ভাঙিবারে সব পুরাতন,
সামগান-পরায়ণ ব্রহ্মময় প্রাণ,
ঋষিকুল হারায়েছে আপন সম্মান,
কপট সমাজ-শিল্পী * কঠোর ভাষায়
স্বর্গ হ'তে ঋষিদলে পাতালে পাঠায় !

হে ইংলণ্ড,
সত্বর তোমার শক্তি লও ভূরি ভূরি,
স্বর্ণরেণু গজদন্ত চন্দন কস্তুরী।
এ আঁধারে জ্বালিও না সভ্যতার আলো,
ব্যথিত সুপ্তির মাঝে অন্ধকারি ভালো।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

দেহ।

শাস্ত্রীয় ভাষায় দেহ শব্দটীর অর্থ বিস্তৃত। দেহ বলিতে কেবল মানব দেহ, পশু পক্ষ্যাদির দেহ, কীট পতঙ্গাদির দেহ বুঝিয়াই ক্ষান্ত দিতে হইবে না, প্রত্যুত দেহ বলিতে মনুষ্যের দেহ, তির্য্যঙ্ দেহ, কীট পতঙ্গাদির দেহ, উদ্ভিজ্জ লতা গুল্মাদির দেহ বোধগম্য করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, পর্ব্বতাকারে পরিণত শিলারাশি, সমুদ্রে নিমগ্ন শৈল-শ্রেণী, ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থাদি, এমন কি, যে ভূপৃষ্ঠে আমরা বিচরণ করিতেছি, সেই ভূভাগও দেহ নামধারী। ফলতঃ যাহার অভিব্যক্তি আছে, তাহাই দেহীপদের বাচ্য। অগ্নি, বায়ু, দীপালোক, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাবলির রশ্মি ইত্যাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জে গঠিত হওয়ায় তাহাদিগেরও দেহ আছে, শাস্ত্রীয় জ্ঞানে বলিতে হইবে। যাহা হউক, মানব দেহ ও মানব সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

মনুষ্য দেহ, চেতনাদি শক্তি ও এই দেহের উৎপত্তি স্থিতি এবং বিনাশ অতীব বিচিত্র। ইহার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা বোধ হয় মানব বুদ্ধির অতীত। তবে মহা মহর্ষিগণ যোগবলে, ধ্যানবলে, তপস্যাবলে অবগত হইয়া লোকের হিতার্থ লেখনী সঞ্চালন দ্বারা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কণামাত্রও যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে কৃতকৃতা বোধ করা উচিত।

মানবদেহ প্রধানতঃ তিনটী তত্ত্বের সমষ্টি—স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং চেতন-আত্মা। স্থূলদেহ শুক্র শোণিত-জাত এবং ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুত ব্যোম, এই পঞ্চভূতে গঠিত। ত্বক্, রক্ত মাংস স্নায়ু অস্থি ও মজ্জা, এই ছয়টা কোষ আত্মার আবরণ, এই নিমিত্ত ইহার নামান্তর ষট কৌষিক দেহ। ষট কৌষিক দেহ অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। মৃত্যুর পর এই দেহ পড়িয়া থাকে, ভস্মসাৎ জলসাৎ, বা মৃত্তিকাসাৎ হয়, পচিয়া

---

* Reformer. ছায়া-ফুল,
ফুলে কীট চিতে ভুল নয়নে স্বপন,
প্রেমে ঈর্ষা অবিশ্বাস জীবনে মরণ—
শুধু ছায়া মায়া কায়া জলে চিহ্ন আঁকা
মরা শিশু বুকে লয়ে প্রাণ আশে থাকা ;
তরঙ্গিত যৌবনের কল্লোলে হিল্লোলে
ঊষা কলি প্রেমফুল তালে তালে দোলে ;
যৌবন জোয়ার দিয়া ধীরে চলে যায়
আঁধা মাঝে ছায়া ফুল নিমেষে মিলায়।

যায়, কিম্বা গৃধ্র শৃগাল আদি পশু পক্ষীর এবং কীট ক্রিমির ভক্ষ্য হয়।

সূক্ষ্ম দেহ বা সূক্ষ্ম শরীর, লিঙ্গ দেহ বা লিঙ্গ শরীর বা লিঙ্গ একই কথা। বেদান্ত মতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু এবং মন বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। মতান্তরে ইহার নাম পুর্য্যষ্টক (পুরি + অষ্টক) এবং পঞ্চবিংশতি অবয়বে রচিত, যথা—

> ভূতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি বাসনাকর্ম্মবায়বঃ।
> অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্য্যষ্টক মৃষিসত্তমৈঃ॥ (ক)
> কুল্লুকভট্ট, মনুর টীকা ৫৬ শ্লোক, ১ম অধ্যায়।

উভয় মতেই সূক্ষ্ম শরীর প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি, অতএব অত্যন্ত সূক্ষ্ম,—অতীন্দ্রিয়, তাহা আমরা চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না, কর্ণদ্বারা তাহার শব্দ শুনিতে পারি না, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিতে পারি না, রসনাদ্বারা রসানুভব কিম্বা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শানুভব করিতে পারি না, অথবা হস্তদ্বারা ধৃত করিতে পারি না। সূক্ষ্ম শরীর অস্ত্রে শস্ত্রে ছেদন, অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লিন্ন এবং বায়ুতে শুষ্ক হয় না, কোন বস্তুই ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। স্থূলদেহ ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর এবং কৃত্রিম, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর নিয়ত স্থায়ী। জীবের মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান থাকে।

চেতন আত্মা। পরমাত্মা বিশ্বের আধার। তিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ—ও অন্তাত্মাধার, নিজ—সত্তাতেই অবস্থিত আছেন। চন্দ্র সূর্য্য—তারকাবলি, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব ভূত, কারণরূপী সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিত আছে। তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর চিদ্রূপে চরাচর সর্ব্ব-ভূতে ব্যাপ্ত এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই জগৎ ধারণ করিতেছেন। তিনি চিন্ময়। দেব মানব তির্য্যক্ স্থাবর শরীরাভ্যন্তরে পরাৎপর পরমপুরুষের যে চিদংশ অনুস্যূত আছে—তাহা—"ক্ষেত্রজ্ঞ" এবং ঐ শরীরাদি "ক্ষেত্র" সংজ্ঞায় অভিহিত। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ যথা গীতা ২২ শ্লোক, ১৩ অধ্যায়—

> উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
> পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ শরীরান্তর্য্যামী পুরুষ শরীরের অধিদেবতা নিয়ামক ও প্রবর্ত্তক। তিনি নিরভিমান। অবিদ্যা হেতু প্রকৃতির প্রতি তাঁহার তাদাত্ম্য (ক) অধ্যাস। তদ্ধেতু দেহের সঙ্গে, কারণ দেহ প্রকৃতিরই পরিণাম, তিনি বিজড়িত ও একীভূত হইয়া—অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেই—তাঁহার দেহাভিমান, কর্ত্তাহং, ভোক্তাহং অভিমান এবং তাহাতেই তিনি প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তমোগুণজাত সুখ দুঃখে বিমোহিত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম শুভাশুভ কার্য্যের অধীন হইয়া বারম্বার শরীর পরিগ্রহ এবং সংসারচক্রে

(ক) ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, বায়ু, অবিদ্যা এই অষ্ট মহর্ষিগণ পুরি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

১। সূক্ষ্মভূত = পঞ্চতন্মাত্র, যথা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র।

২ { জ্ঞানেন্দ্রিয় = পঞ্চ, যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। কর্ম্মেন্দ্রিয় = পঞ্চ যথা বাক্, পানি, পাদ, পায়ু,* উপস্থ। †

৭। বায়ু = পঞ্চ যথা প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান।

প্রাণ বায়ু—নাসাগ্রবর্ত্তী, তাহার কার্য্য বহির্গমন।

অপান বায়ু—পায়ু আদি স্থানবর্ত্তী, তাহার কার্য্য অধোগমন।

ব্যান বায়ু—সমুদয় শরীরবর্ত্তী, তাহার কার্য্য আকুঞ্চন প্রসারণ।

সমান বায়ু—শরীর মধ্যাগত, তাহার কার্য্য ভুক্ত এবং পীত অন্নাদির পরিপাক এবং রস রুধির শুক্র পুরিষাদিতে পরিণত করা।

উদান বায়ু—কণ্ঠস্থানীয়, তাহার কার্য্য উর্দ্ধগমন।

* পায়ু—মলদ্বার। † উপস্থ—লিঙ্গ।

(ক) তাদাত্ম্য — তৎ + আত্মা সেইরূপ বা তাহার সমানরূপ বা একইরূপ তদাত্মার ভাব তাদাত্ম্য = সারূপ্য — সমান আকারত্ব।

অধ্যাস = ভ্রম। সারূপ্য প্রাপ্তে যে অধ্যাস, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। যথা লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইয়া পরস্পর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে লৌহতে যে অগ্নির অধ্যাস।

ভ্রমণ করিতেছেন। গীতার ২১ শ্লোক ১৩ অধ্যায়—

> পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজানগুণান্‌।
> কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনিজন্মসু ॥

প্রকৃতির সঙ্গে সারূপ্য প্রাপ্তি হেতু ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপের মলিনত্ব এবং ভ্রান্ত বুদ্ধি, —যাহা আত্মা নয়—তাহাতে আত্মভ্রম, যথা দেহাদি,—যাহা অনিত্য, তাহাতে নিত্যত্বভ্রম, যথা দেবগণ অমর, যাহা অশুচি, তাহাতে শুচিত্বভ্রম, যথা স্ত্রীকায়। এই কারণে তাঁহার আখ্যা জীব এবং ঐ ভাবটী জীবভাব। পরন্তু লিঙ্গ শরীরের সহিত যুক্ত থাকায় তিনি "লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন জীব" নামে কথিত হন্। জীবের এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে ভ্রমণের কারণ সূক্ষ্ম শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরাশ্রিত কর্ম্মশেষ। জীবের এইরূপ নানা যোনি ভ্রমণের নাম সংসার এবং এবম্বিধ সংসরণ হেতু জীব সংসারী। সংসরণ (সং+সৃ অনট) অর্থে সঞ্চরণ বা গতি। সংসার শব্দে—স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ শরীর পরিগ্রহঃ। অর্থাৎ জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফলের পরিপাক নিবন্ধন দেব মানবাদি—শরীর গ্রহণ।

দৃশ্যমান স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের মাত্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত যে লিঙ্গ শরীর, তাহাই বৃহদাকারে স্থূল শরীররূপে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বীজ মধ্যে যেমন বিশাল বৃক্ষ শক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকে এবং মৃদ্‌বারি তেজ আলোকাদি উপাদান দ্রব্য সংযোগ হইলে যথাকালে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া স্বাধর্ম্ম্য অনুরূপ প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হয়,—তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীব প্রাক্তন কিম্বা ইহকালের কর্ম্ম অনুরূপ দেব মানব পশু তির্য্যক অথবা স্থাবর শরীর গ্রহণ করেন। যেমন বৃক্ষ বীজ কণ্টকাদি বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইলে উৎপাদিত বৃক্ষও তদনুরূপ কণ্টকাদি চিহ্ন শাখা প্রশাখায় প্রকাশ করে এবং প্রাণীগণের অনুপভোগ্য ফল ফুল জন্মায়—বীজ যদি আরবার অনুকূল ধর্ম্মাক্রান্ত হয়—তাহা হইলে তদুৎপাদিত—তরু উপাদেয় ফল পুষ্প সমন্বিত হইয়া বিচিত্র পত্র পল্লবে শোভা পায়, সেই প্রকার জীবও স্বকর্ম্ম অনুসারে দেব মানব তির্য্যক আদি দেহ লাভ করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সূক্ষ্ম শরীরাশ্রিত কর্ম্মাশয় পুনর্জ্জন্মের কারণ। কর্ম্মাশয় কি, তাহা বলা যাউক। কর্ম্মশব্দের অর্থ ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য ইত্যাদি। আশয় শব্দ চিত্তস্থ ফলাঙ্কুর সংস্কার। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, পাপ কি পুণ্য যে কোন প্রকার কর্ম্ম জীব কায়া দ্বারা সম্পন্ন করে, কি মনের দ্বারা চিন্তা করে বা স্মরণ করে, তাহার একটী স্মারক (১) গুণ অথবা শক্তি (কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থা) চিত্তক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়। সুগন্ধি কি দুর্গন্ধি পুষ্প বস্ত্রে স্পর্শ হইতে থাকিলে বস্ত্রখানি যেমন সৌরভে বা পূতিগন্ধে সুবাসিত বা দুর্ব্বাসিত হয়, তদ্বৎ জীবের সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের বিশেষ একটী গুণ বা শক্তি অন্তঃকরণে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ সম্বদ্ধতা লৌকিক ভাষায় চিত্তে অঙ্কিত হওয়াকে ছাপ বা দাগ লাগা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ চিত্তে কোন প্রকার ছাপ বা দাগ লাগে না কিম্বা রেখাপাত হয় না, ভাবীকার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থা কারণরূপে কিম্বা—প্রেরণশীল ধর্ম্মে অন্তঃকরণে সংলিপ্ত হইয়া থাকে মাত্র। সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের যে গুণ বা শক্তি-চিত্তে সংক্রামিত হয়, কথিত হইল, ঐ গুণ বা শক্তি বহুবিধ নামে অভিহিত, যথা সংস্কার, কর্ম্মাশয়, আশয়, কর্ম্মবীজ, বাসনা, কর্ম্মবাসনা, অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ইত্যাদি। ফলিতার্থ এই অন্তঃকরণে কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবিধ নামধেয় যে সকল সংস্কার সঞ্চিত হয়, ঐ সকল সংস্কারের নাম "কর্ম্মাশয়"। কর্ম্ম জন্য আশয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ।

"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ" কর্ম্মের তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়—ভগবান্ পতঞ্জলী ও তচ্ছিষ্যেরা বলেন, চিত্তের বাসনারূপ সংস্কার দ্বিবিধ, অনুভবজ এবং কর্ম্মজ। অনুভব জন্য

---

(১) গুণ শব্দ দ্রব্যাশ্রিত। অর্থাৎ যে গুণটী কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যাহা কর্ম্ম কৃত হইবা মাত্র তৎসঙ্গে সঙ্গে জন্মে।

বাসনার ফল স্মৃতি মাত্র, কর্ম্মজন্য বাসনার ফল (২) জাতি (৩) আয়ু (ভোগ (৪)। কোন কর্ম্মের ফল ইহ জন্মে, কোন কর্ম্মের ফল জন্মান্তরে ভোগ হইয়া থাকে। অনুভবজঃ এবং কর্ম্মজ বাসনার ফল যেমন পৃথক্, কার্য্যও তেমনই পৃথক্। প্রথমোক্ত বাসনা সম্বন্ধে কথিতব্য যে, কোন বিষয় একবার অনুভূত হইলে তাহা আর যায় না, সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত থাকে। একবার সুখানুভব হইলে সময়ান্তরে সেই জাতীয় সুখসাধনের নিমিত্ত চিত্ত প্রধাবিত হয়। তদ্রূপ পূর্ব্বানুভূত দুঃখ স্মরণ হইলে তাহার প্রতি অনভিলাষ বা দ্বেষ জন্মে এবং সেই দুঃখ আরবার যাহাতে না হয়, তাহা করিবার জন্য চেষ্টা হয়। যে কার্য্য প্রীতিকর বা যে কার্য্যে চিত্তের কথঞ্চিৎ আকর্ষণও আছে, সেই কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিলে তাহার সংস্কার পরিপুষ্ট এবং চিত্তে দৃঢ়তররূপে সংলিপ্ত হইয়া তদীয় প্রেরণাশক্তি এত প্রবল হয় যে, তাহা না করিয়া থাকা যায় না, ইহারই নাম অভ্যাস। অভ্যস্ত কার্য্য স্বভাবসিদ্ধের ন্যায়, অতএব পাপ কর্ম্মের অভ্যাস সর্ব্বথা পরিহার্য্য এবং পুণ্য কর্ম্মের অভ্যাস সদা করণীয়। কর্ম্মজ বাসনা সম্বন্ধে ভগবান পতঞ্জলী বলেন, পুণ্য কর্ম্মারব্ধ যে জাতি আয়ুভোগ, যাহা সুখজনক এবং অপুণ্য কর্ম্মারব্ধ যে জাতি আয়ুভোগ তাহা দুঃখজনক। ঐ বাসনাগুলি মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাদিগের অনুরূপ আর একটী জন্ম আরম্ভ করায়। এবং অনুভবজ বাসনাগুলি আরব্ধ শরীরের অনুরূপ রুচি স্পৃহা অনুরাগআদি স্ফুরণ করিয়া দেয়, যথা দেব শরীর প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কুকুরের প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। কুকুর প্রকৃতির বাসনা তখন প্রসুপ্ত থাকে।

এই ভূমণ্ডলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ নির্ধনী, কেহ বলবান কেহ দুর্ব্বল, কেহ সাহসিক কেহ ভীরু, কেহ বিদ্বান কেহ মূর্খ, কেহ জ্ঞানী কেহ অজ্ঞান, কেহ ধার্ম্মিক কেহ অধার্ম্মিক; মানব চরিত্রের এবম্প্রকার বৈচিত্র্য এবং মানবের এবম্প্রকার ভোগাভোগের তারতম্য. কর্ম্ম বাসনার বৈচিত্র্য অনুসারে ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি, ইচ্ছা অনিচ্ছা, রাগদ্বেষ আদি বিবিধ মনোধর্ম্ম সঞ্চিত সংস্কারের প্রেরণায় ন্যূনাধিকরূপে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। "কর্ম্মণা জায়তে বুদ্ধিঃ" কাম ক্রোধ লোভ মোহ মান দর্প প্রমাদ আলস্য হিংসা অহিংসা হর্ষ বিষাদ আস্তিক্য মৈত্রী করুণা সরলতা লজ্জা ভয় ক্ষমা স্মৃতি ধৃতি মেধা ইত্যাদি মনোবৃত্তি নিচয় চিত্তস্থ সংস্কাররাশির প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন কাহার অন্তঃকরণে তীব্রভাবেই, কাহারও অন্তঃকরণে মৃদুভাবে প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, একবার সুখানুভব করিলে সময়ান্তরে তাহা মনে হয় এবং সেই সুখপ্রদ কার্য্য আরবার করিবার নিমিত্ত চিত্তে লোভ জন্মে। সুখানুভবই ভোগ। ভোগে কর্ম্ম বাসনার উদ্ভব এবং কর্ম্মবাসনায় ভোগেতে নিয়োগ। ভোগের নিমিত্ত জীবের পুনঃ পুনঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ভোগ। কর্ম্ম এবং ভোগ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইয়া জীবকে নিয়ত সংসারে ভ্রাম্যমান করিতেছে, বেদান্তে তাই বলিয়াছেন—

> কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্মকর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে।
> নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তর যাশুতে।
> ব্রজন্তে জন্মনোজন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃত্তিম্॥
>
> পঞ্চদশী, তত্ত্ব বিবেক।

জীব ভোগের নিমিত্ত কর্ম্মকরে এবং পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে। নদী প্রবাহে নিপতিত কীট যেমন এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে ঝটিতি যাইতে থাকে, কোন আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ ঐ জীবও এক জন্ম হইতে জন্মান্তর ভ্রমণ করিতে থাকে, সুখপ্রাপ্ত হয় না। ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

> এস সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
> জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ॥
>
> মনু ১২ অধ্যায়, ১২৪ শ্লোক।

---

(২) জাতি—জন্ম, দেব তির্য্যগাদি।

(৩) আয়ু—জীবন।

(৪) ভোগ—বিষয়জনিত প্রীতি।

পরমাত্মা পৃথিব্যাদি পঞ্চ মূর্ত্তি দ্বারা সকল প্রাণী ব্যাপিয়া পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম জন্য জন্ম স্থিতি নাশ দ্বারা চক্রবৎ জীব সকলকে এই সংসারে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

লৌকিক ব্যবহারে আমরা যাহা "জন্ম" "মরণ" বলিয়া থাকি, বস্তুতঃ তাহা কি? যজ্ঞদত্ত জন্মিলেন, যজ্ঞদত্ত মরিয়া গেলেন। অনেক জন্ম অনেক মরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যজ্ঞ দত্তেরও জন্ম মৃত্যু অবশ্যই তদ্রূপ; হয় হউক। কিন্তু এই ব্যাপার দ্বয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই—স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ অপূর্ব্ব কৌশলে পরস্পর সংযোজিত এবং একীভাব ও এক অবয়ীভূত হইয়া বর্ত্তমান আছে। জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ) উভয় দেহের অন্তর্য্যামী এবং অধিষ্ঠাতা। স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের পরস্পর বিচ্ছেদকে 'মরণ' এবং সূক্ষ্ম দেহের অন্য এক অভিনব স্থূল দেহাকারে পরিণতি আমরা 'জন্ম' বলিয়া থাকি। গীতা শাস্ত্রে মরণ ব্যাপার দেহান্তর প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

স্থূল দেহ হইতে প্রাণ বিয়োগই মরণ শব্দ প্রয়োগের প্রধান লক্ষ্য। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, এই পঞ্চ শরীরান্তর্গত বায়ু ইহাদিগের নাম অসু। প্রাণ বলিতে পঞ্চ বায়ুই বুঝিতে হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাণ শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই বহু বচনান্ত যথা প্রাণাঃ প্রাণান্ ইত্যাদি। প্রাণের কার্য্য নিবৃত্তি হইলেই দৈহিক সমস্ত কার্য্যের নিবৃত্তি; চেতন শক্তির, ইন্দ্রিয় শক্তির তিরোভাব, শ্বাস প্রশ্বাস আর বহন হয় না, শিরা স্নায়ু ধমনিতে রক্তসঞ্চালন নাই, শরীরে আর তাপ নাই, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রস্তরবৎ হিম। দেহ গতাসু হইয়া জড় বস্তুর ন্যায় ধরাতলে পতিত। মৃ ধাতু হইতে মরণ প্রাণত্যাগ। জীব ধাতু হইতে জীবন 'প্রাণ ধারণ'। কিন্তু স্থূল দেহ হইতে প্রাণ বায়ুর বহির্গমন মরণ কথাটীর মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও 'জীবের স্থূল দেহ ত্যাগ' এই ভাবেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কথোপকথনে আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, যজ্ঞ দত্ত দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, দেহ রাখিয়াছেন—প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার স্থলে যজ্ঞ দত্ত নামের অন্তর্ভাব মানব দেহধারী বিশেষ কোন এক জীব। জীবের দেহ ত্যাগ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে—

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি স্থানি কর্ষতি। ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

জীব এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া কর্ম্ম বশে শরীরান্তর প্রাপ্ত হন। উৎক্রান্তি সময় জীব পূর্ব্ব দেহস্থিত মন ও ইন্দ্রিয় নিচয় আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ তৎসহ শরীরান্তরে গমন করেন, পূর্ব্ব শরীরে আর পুনরাগমন করেন না। বায়ু যেমন পুষ্প বা কস্তুরীর সৌরভময় সূক্ষ্মাংশ নিয়া চলিয়া যায়, পুষ্প বা কস্তুরী পড়িয়া থাকে, তদ্বৎ জীব এক দেহ পরিত্যাগে অন্য দেহ আশ্রয় করেন।

প্রাণ ত্যাগের পর স্থূল দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ) অজর অমর, নিত্য শুদ্ধ এবং নির্ব্বিকার, তিনি লিঙ্গ দেহের সঙ্গে জড়িত আছেন। লিঙ্গ দেহ দীর্ঘকাল স্থায়ী, কিন্তু এক এক স্থূল দেহপাতে ইহার পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন এই যে, কর্ম্মাশয়ের হেতুমূলে ইহার কলেবরে নবীন আর একটী স্থূল দেহের সংঘটনা হয়। পুরাতন স্থূল দেহের বর্জ্জন এবং নবীন স্থূল দেহের বিকাশ লিঙ্গ শরীরের স্বাধর্ম্ম্য, তাহা কাল-কালান্তর—প্রবাহ রূপে কর্ম্মাশয়ের নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। অবিদ্যা নাশে কর্ম্মাশয়ের নাশ, কর্ম্মাশয়ের নাশে কি, না, বাসনা শূন্যত্ব। কর্ম্মাশয় নাশ, স্থূল দেহ ত্যাগান্তে লিঙ্গ শরীরের নাশ, তবেই জীবের মোক্ষ, জীবের স্বরূপাবস্থা চিন্মাত্রতায় স্থিতি। তখনই জীবের সংসার যাতায়াত নিবৃত্তি।

মানব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া বহু প্রকার কর্ম্ম, বহু বিষয়ের ধ্যান, বহু বিষয়ের চিন্তা, বহু বিষয়ের অনুশীলন করিয়া থাকে। অসঙ্খ্য বিষয়ে তাহার আসক্তি এবং অসঙ্খ্য বিষয়ের চিন্তায় তাহার চিত্ত নিমগ্ন। অন্তিম সময়ে সেই সকল কর্ম্মের, সেই সকল চিন্তার, সেই সকল অভিনিবেশের ফলাফলের ভিত্তি স্থাপন এবং জীবের ভবিষ্যৎ গতি নির্ণয়

হয়। প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অভিনিবেশ সংস্কার রূপে, শক্তিরূপে বা বীজরূপে চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রোথিত থাকে। ভাল মন্দ কর্ম্ম, সদসৎ চিন্তা, ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি চিত্তের গুরুতম প্রদেশে প্রবিষ্ট আছে, সর্ব্বতোভাবে চিত্ত অধিকার করিয়াছে, বস্ত্র যেমন কর্পূর সংযোগে কর্পূরবাসিত, কর্পূরের গন্ধযুক্ত হয়, তদ্রূপ সেই গুলি দ্বারা চিত্ত নিরন্তর অধিবাসিত হইতে থাকে। তাৎপর্য্য এই, পুণ্য কর্ম্ম জন্য সংস্কার হেতু চিত্তের প্রশান্ত ভাব, নির্ম্মলতা, প্রীতি এবং জ্ঞান আদি সুখময় বৃত্তি এবং পাপ কর্ম্ম জন্য সংস্কার হেতু রাগ, দ্বেষ, দুর্নিবার বিষয় তৃষ্ণা এবং অপ্রীতি আদি দুঃখময় এবং মোহ প্রমাদ আলস্য ক্লান্তি ও জাড্য আদি আবরক ধর্ম্ম চিত্তাভ্যন্তরে সদা সর্ব্বক্ষণ উদ্দীপিত হইতে থাকে। তাহার ফল নিষ্পত্তি এই যে, চরমে সেই সকল চিন্তা, সেই সকল ধ্যান, সেই সকল জ্ঞান, সেই সকল অভিনিবেশ, অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান, অন্য জ্ঞান, অন্য অভিনিবেশ পরাভব এবং নিরস্ত করতঃ প্রবলতর রূপে মুমূর্ষুর অন্তঃকরণে প্রকাশমান হয়। কথাগুলির সার মর্ম্ম এই, অন্তিমকালে চিত্তস্থ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম বীজ, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম বাসনা প্রজ্বলিত এবং সম্মিলিত হওনান্তর বর্ত্তমান দেহের সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া নূতন এক ভাবনা, বাসনা বা অনুভব উৎপাদন করে। অন্তিমে এবম্প্রকার চিত্ত পরিণামের অভিধা “ভাব” বা “ভাবনা” এবং মুমূর্ষুর এই ভাব বা ভাবনা প্রজ্বলিত দেহ “ভাব দেহ”—“ভাবময় দেহ” “ভাবনা দেহ” বা “ভাবনাময় দেহ” কথিত হয়। ভাব দেহের অন্য নাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহই প্রেত দেহ। ভাব দেহ পরজন্মের আরম্ভক এবং ভাবী স্থূল দেহের অঙ্কুর। বর্ত্তমান দেহেই ঐ অঙ্কুরের উদ্গম হয়। কথাটী এই, মুমূর্ষু যে দেহ ধারণ করিবে, তাহার মলিন প্রতিচ্ছায়া তখন সে দেখিতে পায়। প্রাণ বিয়োগের পর যদি কাহার ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিতে হয়, তবে ব্যাঘ্রোঽহং ভাব তাহার চিত্তে উদয় হয়।

তথাচ গীতা—৮ম অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং অজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই “তং তমেব, ভাবদেহ ত্যাগোত্তরমেবৈতি। যথা ভরতো দেহান্তে মৃগং চিন্তয়ন্ মৃগোঽভূৎ” ভাষ্যের মর্ম্মার্থ—ভাবদেহ ত্যাগানন্তর সেই সেই অর্থাৎ ভাব্য পদার্থের প্রাপ্তি হয়, যেমন রাজর্ষি ভরত, যিনি জড়ভরত নামে প্রসিদ্ধ, দেহ পাত সময়ে মৃগ চিন্তা করিতে করিতে মৃগ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ মৃগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃগ শরীর লাভ করিয়াছিলেন। *

অন্তিমে বর্ত্তমান দেহের জ্ঞান আদির বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া অন্য যে আর এক প্রকার ভাবের উদয় হয়, মুমূর্ষুর বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারাও তাহার কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। বিকার (delirium) অবশ্যই মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব। কিন্তু এক এক রোগীর মস্তিষ্কে এক এক প্রকার ভাবনা উত্থিত হয় কেন? এ বিষয়ে অশ্রদ্ধাবান লোকেরা যাহা হয় বলুন, আমরা কিন্তু আমাদিগের কথাই বলিব। বিকারগ্রস্ত কোন কোন রোগীকে দেখা যায় যে, তাহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভয়াবহ বিভীষিকা, বিকট স্বপ্ন, ভীষণ দৃশ্য বা ভীমরূপ অবলোকন করতঃ সময় সময় চমকিয়া উঠে, অস্থির এবং ভয়ার্ত্তচিত্তে হস্তাদি সঞ্চালন, মুখভঙ্গি, এবং জিহ্বা বিলোড়ন আদি অস্বাভাবিক ক্রিয়া করিতে, এবং নানারূপ প্রলাপ বাক্য, সংলগ্ন বা অসংলগ্ন, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে, বলিতে থাকে। কেহ ব্যাঘ্র বা অন্য ভয়ঙ্কর প্রাণী দেখিতে পায়—কেহ মানসিক বা দৈহিক যাতনা ভোগের পরিচয় দিয়া—মহা কষ্টে ইহলোক পরি-

---

* তর্ক হইতে পারে, সদ্যজাত কিম্বা গর্ভস্থ শিশুর যখন মৃত্যু হয়, এই জীবনে ত সে কোন কর্ম্ম করে নাই, তবে তাহার কর্ম্মাশেষই বা কোথায় এবং পুনর্জ্জন্মই বা কিরূপে সম্ভব? উত্তর— ঐ শিশুর আয়ুর এবং ভোগাদির অল্পতা বা অভাব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই তাহার এই দেহের গতি নির্ণায়ক। বাসনা ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত, জন্ম জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে কচিৎ কচিৎ দেখা যায়, কোন কোন পুণ্যাত্মা স্বীয় অভীষ্টদেব দেবীর আনন্দঘন মূর্ত্তি এবং তাঁহাদিগের লীলাদি বিষয় সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হয়েন—কোন কোন মহাত্মা স্বর্গীয় মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষগণের সম্মিলন ও সাক্ষাৎকার লাভ করত তাঁহাদিগের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিতে থাকেন। কেহ বা আনন্দে ভোর হইয়া ইষ্ট নাম জপ বা ইষ্টবিষয়ক গান করেন। এই সকল দেবসদৃশ মহানুভব নরগণ মৃত্যু সময়ে যে সকল ভাবভঙ্গি আকার ইঙ্গিত প্রকাশ করেন, তাহাতে নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা অনায়াসে পুরীষময় দেহ ত্যাগ করিয়া মহানন্দে পরম সুখে গন্তব্য সুখালয়ে প্রস্থান করেন। জীবের স্বকৃত কর্ম্ম, পরাৎপর পরমেশ্বরের অচিন্ত্য নিয়ম কৌশলে, অনুরূপ ফল, সুখ বা দুঃখ বলে আকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করতঃ জীবের স্কন্ধে আরোপিত করে। এই রহস্য উপলব্ধি করিয়া শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিমাত্রেই সেই পরম পুরুষের অচিন্ত্য মহিমা, অচিন্ত্য শক্তি, অচিন্ত্য ন্যায়পরতা স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণত হইবেন, সন্দেহ নাই। জীবের গতি স্বকর্ম্মাধীন হেতু ভগবন মনু উপদেশ করিয়াছেন।

এতা দৃষ্ট্বাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মেদধ্যাৎ সদা মনঃ॥
মনুসংহিতা ১২শ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক।

ধর্ম্মাধর্ম্ম হেতু জীবের স্বর্গ নরকাদি ভোগের উপযোগী প্রিয় অপ্রিয় দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য নাস্তিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

পরলোকঽপি সন্দেহে কুর্য্যঃ কর্ম্মাদি মানবাঃ।
নাস্তি চেৎ নহি নো হানিরস্তি চেন্নাস্তিকোহতঃ॥

পরলোক আছে কি না, সন্দেহ হইলেও মানবের পারলৌকিক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। যদি না থাকে, কর্ম্ম করণের দ্বারা আমাদিগের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু যদি থাকে, তবে নাস্তিকগণের পরম ক্ষতি ও কষ্টের বিষয়।

সূক্ষ্ম শরীর অতি সূক্ষ্ম এবং বিরূপ ভোগ ঐ শরীরে পাপ পুণ্যের ভোগ হইতে পারে না। প্রেত দেহান্তে দুষ্কৃত মনুষ্যের নরক যাতনা এবং সুকৃত মনুষ্যের স্বর্গসুখ ভোগের নিমিত্ত একটী শরীর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ভোগদেহ। ভোগদেহ শুক্রশোণিত-জাত জরায়ুজাদি দেহ নয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্থূলাংশ হইতে দুষ্কৃত নরগণের যমযাতনা অনুভবোচিত অলৌকিক দুঃখসহিষ্ণু দৃঢ় একটী দেহ সঞ্জাত হয়। দুষ্কর্ম্মা জীব ঐ দেহে লীন থাকিয়া তদ্দ্বারা দুঃসহ যমযাতনা ভোগ করিতে থাকেন। এবং পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্যগণের পঞ্চভূতের শ্রেষ্ঠাংশ হইতে তেজস্বান্ মৃদু স্নিগ্ধ এবং সুকুমার একটী দেহজাত হয়, যে দেহে পুণ্যকর্ম্মা জীব বিরাজমান থাকিয়া অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করেন। স্থূলদেহ ত্যাগ এবং ভোগদেহ উৎপত্তি, এই অন্তরাল (মধ্য সময়ে) পুণ্যাত্মা জীব "বায়ুভূতঃ য মূর্ত্তিমান" এবং অপুণ্যাত্মা জীব "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ" হইয়া থাকেন। *

পাপের আধিক্য থাকিলে দুষ্কর্ম্মাজীব নরক যাতনা ভোগান্তে ভুক্তাবশেষ পাপের নিমিত্ত লতা গুল্মাদি স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎপর তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভোগাবসানে নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় মানব দেহ লাভ করে। জীব মনুষ্য দশায় অধিক অধর্ম্ম এবং অল্প ধর্ম্ম করিলে তাহার অধোগতি, কি না, তির্য্যক্ আদি যোনি প্রাপ্তি, অধিক ধর্ম্ম এবং অল্প অধর্ম্ম করিলে উর্দ্ধগতি, কি না দেবাদি যোনি প্রাপ্তি এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তুল্যরূপ করিলে মধ্যগতি, কি না মানব যোনি প্রাপ্তি হয়।

পুণ্যবানগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীর পুণ্যাত্মারা ভগবদ্ভক্ত, নিষ্কাম উপাসক। আর এক শ্রেণীর পুণ্যবানেরা কাম্যকর্ম্মী—অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাভিসন্ধানকারী।—প্রথমোক্ত পুণ্যশীলেরা শ্রেষ্ঠাধিকারী, শেষোক্ত কাম্যকর্ম্মীগণ মৃদু অধি-

---

গতি — কর্ম্মফল।

* মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়—

কারী। প্রাণ উৎক্রমণানন্তর ঊর্দ্ধগমনের দুইটী পথ, দেবযানমার্গ এবং পিতৃযানমার্গ। ভগবদ্ভক্তগণ দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদিগের আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, কামনা-রাহিত্য হেতু তাঁহাদিগের কর্ম্মাশয় দগ্ধবীজের ন্যায় অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। ঐ কর্ম্মাশয় জন্মের অঙ্কুর আর প্ররোহিত করিতে পারে না। কাম্যকর্ম্মীগণ পিতৃযানমার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন। তাঁহারা চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন না। ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পুনঃ পুনঃ গমনাগমনের নিবৃত্তি হয় না, কারণ এই যে, তাঁহাদিগের ভোগবাসনা দূরীকৃত না হওয়ায় কর্ম্মাশয় শক্তিশালী থাকিয়া বারংবার জন্ম আরম্ভ করায়।

দেবযান মার্গ যথাগীতা ৮ম অধ্যায় ২৪শ্লোক—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদোজনাঃ।

পিতৃমানমার্গ, যথা গীতা ৮ম অধ্যায় ২৫শ্লোক।

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥

কাম্যকর্ম্মীগণের পতন এবং পুনঃ পুনঃ সংসার ভ্রমণ, গীতা ৯ম অধ্যায় ২০-২১ শ্লোক।

ত্রৈবিদ্যামাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোকমশ্নন্তি বিদ্যান দিবি দেব ভোগান্॥
তেতং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যমর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্ম মনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা-লভন্তে॥

পাপাত্মার নরক যাতনা ভোগান্তে, কাম্যকর্ম্মীর স্বর্গসুখ ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি এবং ক্ষুদ্র কর্ম্মীর বারম্বার জন্ম হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তিনি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া অনন্তকাল ঐ ভাবে থাকেন। ক্রমশঃ

শ্রীহরসুন্দর চক্রবর্ত্তী,
পেন্সন-প্রাপ্ত মুন্সেফ, মাইজখাড়া, মাণিকগঞ্জ।

ভাই-ফোঁটা।

কে তুমি ললাটে দিলে চন্দনের ফোঁটা
প্রীতি, প্রেম, চির-স্নেহ, পারিজাত সুধা,—
হস্তেতে তুলিয়া দিলে নন্দনের বাটা,
আকণ্ঠ ভরিল প্রাণ—চির যার ক্ষুধা।
বিধাতার কাছে আজি মাগিয়াছ বর
"যমের মতন হ'ন অজর, অমর
প্রিয়তম ভ্রাতা যত আছে ঘরে ঘরে
আশীষ বর্ষুন দেব তাঁহাদের শিরে!"
এত স্নেহ, এত প্রীতি চির স্নিগ্ধময়—
আশীর্ব্বাদ; দাও বর,—হোক মধুময়,
হউক স্নেহের জয় বিধাতার বরে,
প্রীতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক ঘরে ঘরে।
প্রকৃতির মত তব বিশাল হৃদয়,
হে ধরণি, গাও আজি ভগিনীর জয়!

THE BRAMHANANDA SOC
CALCUTTA

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (৫)

সমষ্টি ও ব্যষ্টি মানবসমাজ,—মনুষ্যত্ব,—মানবজাতি।

৩৯। আমরা যে সমাজাত্মার কথা বলিয়াছি, এই সমাজাত্মা কে, তাহা জানিতে হইলে, আমাদের আরও অনেক কথা বুঝিতে হইবে, অনেক দার্শনিক কূট তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। কঠিন ও নীরস হইলেও, আমরা এক্ষণে তাহার সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে সমগ্র মানবজাতির সহিত ব্যক্তিমানবের সম্বন্ধ কি, ব্যষ্টি সমাজের সহিত সমষ্টি সমাজের সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়া দেখিব।

সমস্ত 'ব্যক্তি'র সমষ্টিতে জাতি। আর সমস্ত মানবসমাজ সমষ্টিতে মানবজাতি। ক্ষুদ্র বৃহৎ, সভ্য অসভ্য সমাজ অনেক আছে। অসভ্য ক্ষুদ্র মানবসমাজ হইতে সভ্য বিস্তৃত মানবসমাজের প্রভেদ বিস্তর। সমাজের আবার বিভিন্ন স্তর আছে। বিভিন্ন মানবসমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই সব বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিতে এক বিরাট মানবসমাজ। সকল সমাজ একীভূত হইলে, সমস্ত মানব এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত হইতে পারে। সকল সমাজের পূর্ণবিকাশ হইয়া যদি কখন তাহাদের এরূপ একীভূত হওয়া সম্ভব হয়, অথবা যদি সব বিভিন্ন সমাজ মধ্যে একত্বের ভাব বিকাশিত হয়, যদি সব সমাজ একত্র-সম্বদ্ধ হয়, তবে এইরূপ বিরাট সমাজের ধারণা হইতে পারে। তখন মানবসমাজে ও মানবজাতিতে প্রভেদ থাকিবে না। বিবর্ত্তন নিয়মে যেমন একত্ব হইতে বহুত্বের বিকাশ হয়, তেমনই তাহার ক্রমপরিণ[illegible] বহুত্ব পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া—মূল একত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বহুত্বে একত্ব জ্ঞান, ও একত্বে বহুত্ব জ্ঞান,—এবং সর্ব্বত্র একত্ব জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ একত্বের ধারণা হইতে পারে। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির ধারণা, ও সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির ধারণা,—আমাদের জ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। অতএব যতক্ষণ আমরা বিভিন্ন সমাজকে ভিন্ন ভাবে দেখিব, ততক্ষণ আমরা আংশিক সমাজবিজ্ঞান লাভ করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত সমাজতত্ত্ব জানিতে পারিব না। এজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ পরস্পর আপাত বিভক্ত অনেক সমাজ হইতে আমরা এক সমষ্টি বিরাট সমাজের ধারণা করিতে চেষ্টা করিব।

৪০। আমরা বলিয়াছি,—সমস্ত ব্যষ্টি-মানবের সমষ্টি করিয়া, বিভিন্ন মানব সমাজ একত্র করিয়া মানবজাতি। ব্যক্তিসমষ্টি হইতে কিরূপে জাতির ধারণা হয়, তাহা এস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা ব্যষ্টির সমবায়ে সমষ্টির, ও সমষ্টির বিশ্লেষণে ব্যষ্টির ধারণা করি। এবং উভয় হইতে জাতির ধারণা করি। আবার জাতি হইতে আমরা ব্যক্তির ধারণা করি। জাতি ও ব্যক্তি পরস্পর নিত্য সম্বদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তি-জ্ঞানের সহিত জাতিজ্ঞান নিত্য অনুস্যূত। জাতিজ্ঞান ব্যতীত ব্যক্তিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের জাতিজ্ঞান যত বিকাশিত হয়, ব্যক্তিজ্ঞানও তত পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইনি মানুষ,—এ কথা বলিলে যেমন

আমরা ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দেশ করি, তেমনই তাহাকে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত মনে করি, তাহাতে মনুষ্যত্বের আংশিক বা বিশেষ বিকাশ ধারণা করি। আর আমাদের জাতিজ্ঞান ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধারণা অনুসারে, সেই মানবে মনুষ্যত্বের বা জাতিত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে, তাহারও পরিমাণ করিতে পারি। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জাতির অন্তর্গত রূপে ধারণা না করিলে, সেই ব্যক্তিকে আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিতে তাহার জাতিত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে, তাহা না বুঝিলে, আমরা সে ব্যক্তির ঠিক ধারণা করিতে পারি না। এই জাতি হইতেই জাতিত্বের ধারণা হয়। সমষ্টি মানবজাতি হইতেই মনুষ্যত্বের (বা humanityর) ধারণা হয়। এই জাতি বুঝিবার পূর্ব্বে মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনুষ্যত্ব বলিলে, আমরা সাধারণতঃ মনুষ্যের বিশেষভাব, সাধারণ জীবত্ব হইতে তাহার বিশেষত্ব, অথবা মানজাতির সত্বা কিম্বা তাহার গুণ বা ধর্ম্ম বুঝিয়া থাকি। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমরা কোন বস্তুর সত্বা, স্বভাব বা স্বরূপ জানিতে পারি না। আমরা কেবল তাহার ব্যবহারিক রূপ জানিতে পারি। অর্থাৎ অন্যের সহিত ও আমাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে, তাহার যে সকল গুণ প্রতিভাত হয়, আমরা কেবল সেই সকল গুণই জানিতে পারি। তাহার গুণ সমষ্টি আমাদের জ্ঞানে যেরূপ প্রতিভাত হয়, সেই গুণসমষ্টির আধার রূপে আমরা সে বস্তুর বা দ্রব্যের ধারণা করি। কেন না, আমরা আশ্রয়বিহীন গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। গুণ হইতেই আমরা গুণী বস্তুর অনুমান করি। আর যে শক্তি বলে এই গুণ সমষ্টির বিকাশ হয়, বা কার্য্যে পরিণতি হয়, সেব শক্তির আধারকেই বস্তু বলিয়া মনে করি। এইরূপে মানুষের বিশের গুণসমষ্টি হইতে মানুষের ভাব বা মনুষ্যত্বের ধারণা করি। এবং মনুষ্যত্বকে মানবের বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এই মনুষ্যভাবের নিম্নতম বিকাশ হইতে উচ্চতম বা আদর্শরূপে বিকাশ—সমুদায় একীভূত না করিলে,—মানুষের সমুদায় গুণের কাল্পনিক পূর্ণ বিকাশ একত্র ধারণা না করিলে, পূর্ণ মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মনুষ্য মধ্যে যে পশুত্ব আছে—যে সাধারণ জীবধর্ম্ম আছে, তাহার স্থলে যাহাতে, বা যে শক্তি বলে, কেবল মানব ধর্ম্মের বিকাশ করে, মানুষকে নিম্নতম অবস্থা হইতে উচ্চতম আদর্শে লইয়া যায়, তাহাই মনুষ্যত্ব। যাহা মানুষের বিশেষ গুণ বা শক্তি, যাহা মানুষকে ধারণ করে, ক্রমোন্নত করে, আদর্শ অভিমুখে লইয়া যায়, তাহাই মানবধর্ম্ম, তাহাই মনুষ্যত্ব। (১)

---

(১) মনুসংহিতাতে এই মানবধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ বা ধর্ম্মের স্বরূপ এইঃ—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচং ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

মনু,—৬।৯২।

অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থেও এই কথা আছে। যথাঃ—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনং॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা,—১।১১২।

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥"

বিষ্ণু-সংহিতা,—৬।৭—৮।

প্রতি মানুষে এই মনুষ্যত্বের ক্রমাভিব্যক্তি হইতে থাকে। দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া,[*] ও অবস্থাবিশেষের অধীন হইয়া, এই পৃথিবীতে ক্রমবিকাশ নিয়মে, মনুষ্যত্বের যতদূর বিকাশ সম্ভব হয়, ব্যক্তিমানবে তাহার ততদূর বিকাশ হইতে পারে। মনুষ্যত্ব জীবত্বের অংশ। অথবা দেশকালাদি অবস্থা অনুসারে মনুষ্যত্বই এ পৃথিবীতে জীবত্বের পূর্ণ বিকাশ। আমাদের পৃথিবীর অবস্থা অনুসারে, ইহাতে মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর জীব কল্পনার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। আমরা অন্য পৃথিবীর কথা জানি না। এই সৌর জগতে অন্য কোথাও, অথবা অন্য সৌর বা নাক্ষত্র জগতের মধ্যে কোন স্থানে, অথবা অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কোন কালে, মানব অপেক্ষা উচ্চতর জাতীয় জীবের অভিব্যক্তির কথা আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ধারণা বা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। দেবাদি সূক্ষ্ম শরীরী কোন উচ্চতর জীবের কথা সাধনাহীন আমরা সহজে বুঝিতে পারিব না। আমরা এই পৃথিবীর কথা বলিতেছি। এই পৃথিবীতে মানুষই শ্রেষ্ঠজীব, মনুষ্যত্বই জীবত্বের উচ্চতম বিকাশ।

ব্যক্তিমানবে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। পূর্ণ মনুষ্যত্বে আমরা যে ভাব, শক্তি বা গুণসমষ্টির ধারণা করিতে পারি, কোন মানুষে তাহার পূর্ণবিকাশ আমরা কখন দেখিতে পাই না। অসভ্য নগ্নদেহ আমমাংসভোজী আণ্ডামানবাসী মানবের ন্যায় জীবে, মনুষ্যত্বের বড় সঙ্কীর্ণ, বড় সীমাবদ্ধ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। তাহাদের মানুষ বলিতেই হয়ত আমাদের সহজে প্রবৃত্তি হয় না। অন্য দিকে আধুনিক সভ্য সমাজে কোথাও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় না।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' গ্রন্থে, এই ধর্ম্ম বিকাশে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, ও এই ধর্ম্মের অবনতিতে কিরূপে মনুষ্যত্বের অবনতি হয়, তাহা অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মানবের বিশেষত্ব তাহার শক্তি বা গুণই তাহার মনুষ্যত্ব। যে সকল গুণের দ্বারা এই মনুষ্যত্ব বা মানুষভাব রক্ষিত, ধৃত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহাই মানবধর্ম্ম। আর যে শাস্ত্রে এই ধর্ম্মের রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় উল্লিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। আমাদের ধর্ম্মসূত্র গৃহ্যসূত্র স্মৃতি প্রভৃতি এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র।

সে যাহা হউক, মানবধর্ম্মের উক্ত লক্ষণ কিছু সঙ্কীর্ণ। কেবল উক্ত দশবিধ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণা হয় না। তাহা দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির এবং চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ বুঝা যায় না। সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা, প্রকৃত মানবধর্ম্মের কথা, কেবল গীতা হইতেই পাওয়া যায়। আধুনিক culture theory ও এই মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব বিভিন্ন। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি, ও চিত্তবৃত্তি আছে। গীতায় এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও চিত্তবৃত্তির অনুশীলনের ও পূর্ণ পরিণতির কথা আছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা জ্ঞানমার্গে, কর্ম্মমার্গে ও ভক্তিমার্গে আমাদের গতি ও মুক্তি বা আদর্শলাভের কথা আছে। পূর্ণ নিত্য জ্ঞান---চিৎ, পূর্ণ কর্ম্ম—সৎ কর্ম্ম—সৎ, ও পূর্ণ সুখ—আনন্দ। মানবের এই পূর্ণাদর্শ সচ্চিদানন্দঘন ভগবান। তিনি অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ধারণার উপযোগী এই আদর্শ দেখাইয়া দেন। সেই আদর্শ ধরিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। সেই আদর্শ লাভ হইলেই মানবের মুক্তি হয়। বঙ্কিম বাবু, তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' গীতা হইতে কতকটা এইরূপ মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতায়, যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা, সাধারণতঃ আমাদের ক্রমবিকাশশীল মনুষ্যত্ব ধারণা পূর্ণ বিকাশিত হইলে, তবে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

একাধারে পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণকর্ম্মী, পূর্ণবীর পূর্ণধার্ম্মিক—এরূপ আদর্শ মানুষ আমরা কোথাও পাই না। অবশ্য আমরা এখানে অবতারের কথা বলিতেছি না। অবতারেও সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের কোন এক বিশেষ ভাবের দেশকালপাত্রোচিত আপেক্ষিক পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক, সর্ব্বদেশীয়, পূর্ণমনুষ্যত্বের পূর্ণ-আদর্শ—ভগবানের মনুষ্যত্ব কল্পনার পূর্ণরূপ, বুঝি তিনি একবার দেখাইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে সে কথার প্রয়োজন নাই। কোন মানুষ একাধারে পূর্ণমনুষ্যত্বের সকল গুণের পূর্ণবিকাশ দেখা যায় নাই। তাহা অসম্ভব। তবে তাহাতে কোন বিশেষ গুণের দেশকালোচিত পূর্ণবিকাশ সম্ভব হইতে পারে। তাহাও বুঝি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দেখাইয়া দেন। মানুষ বুঝি নিজের চেষ্টায় সে আংশিক আদর্শও লাভ করিতে পারে না। সে যাহা হউক, আমরা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সমগ্র মানব জাতির মধ্যে দেশ কাল পাত্র অনুসারে, কাহারও জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ, কাহারও কর্ম্মশক্তির পূর্ণবিকাশ, কাহারও ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির পূর্ণবিকাশ, কাহারও দেহের পূর্ণ বিকাশ, কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে। একাধারে সকল গুণের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই বলিয়াছি, এই সকলের সমষ্টি হইতে আমরা মনুষ্যত্বের ধারণা করি। আমরা প্রতি মানবের মনুষ্যত্বের যতদূর বিকাশ হয়, তাহার সমষ্টি বা একীভূত ধারণা হইতে, আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারি।

৪১। এইরূপে আমরা ব্যক্তির হইতে জাতির ধারণা করি। মানুষ, গো, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তির সমষ্টি হইতে আমাদের সে জাতির ধারণা হয়। জাতি নিত্য, দেশ কাল বিভক্ত সমগ্র ব্যক্তির একীভূত সম্মিলিত রূপ,—সেই জাতির অন্তর্গত সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের ব্যক্তিসমষ্টির একীভূত ধারণা। ব্যক্তি বিশেষ,—সেই জাতির ব্যষ্টিরূপ, দেশ কালে তাহার অসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ। প্রকৃতির শক্তি বলে বিবর্ত্তন নিয়মে, সেই জাতিত্ব নিয়মে, সেই জাতিত্ব হইতে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ হয়। জাতি কাহাকে বলে? জাতি সমানপ্রসবাত্মক। (১) ভাব বা সত্বার ক্রমানুবৃত্তি বা ক্রমাভিব্যক্তি হেতু—জাতি বা সামান্য। (২) প্রাদুর্ভাব ও বিনাশাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই দুই শক্তির গুণ দ্বারা যে এক সামান্য সত্বা বহুরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই জাতি। (৩) নিত্য একানুগত প্রত্যয় হেতু অনেকের সমবায়েই জাতি। (৪) ব্যষ্টি অনেক—এই অনেকের সমবায় হইতে পরিজ্ঞাত জাতিভাব বা সত্বার ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র। গোমহিষাদিতে সম্বন্ধি ভেদে ভিদ্যমান সত্বাই জাতি,—সত্বা এক, তাহাই জাতি—সম্বন্ধিভেদে ব্যক্তিতে তাহা বিভক্ত হইয়াছে। (৫)

(১) "সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ।"
ন্যায়দর্শন,—২। ২ ৩১।

(২) "ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব।"
বৈশেষিকদর্শন,—১।২।৪।

(৩) "প্রাদুর্ভাব বিনাশাভ্যাং সত্বস্য যুগপৎ গুণৈঃ।
অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বার্থাং তাং জাতিং কবয়োবিদুঃ॥"
মহাভাষ্য।

(৪) "নিত্যৈকানুগত প্রত্যয়হেতুরনেক সমবায়িনী জাতিঃ॥"—দশমী।

(৫) "সম্বন্ধিভেদাৎ সত্বৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥"
বাক্যপদীয়।

ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বাদ দিয়া, কেবল তাহার সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া —অর্থাৎ এক প্রকারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা লক্ষ্য করিয়া (generalisation, abstraction অথবা concept দ্বারা) আমাদের জাতিত্বের ধারণা হয় না। যে সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে বৈধর্ম্ম অপেক্ষা সাধর্ম্ম্য অধিক, তাহাদের সেই স্বধর্ম্ম হইতে, সেই সকল ব্যক্তিকে এক জাতির অন্তর্গত করা যায় না। জাতিবিশেষের সাধারণ আদর্শ প্রথমে কল্পনা করিয়া (type হইতে) তাহা হইতেও সে জাতিজ্ঞান আমরা লাভ করি না। কেন না সে জাতির ব্যক্তি সমষ্টির ধারণা ব্যতীত আমরা সে আদর্শও স্থির করিতে পারি না। আবার কেবল ব্যক্তিগণিত সমষ্টিতেও জাতির ধারণা হয় না। গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যাহাকে অনন্ত সংখ্যাপর্য্যায়ের যোগফল (বা summation of infinite series) বলেন, ঠিক তাহা হইতে জাতিত্বের ভাব পাওয়া যায় না। বৃক্ষের সমষ্টিতে বন, বা জলের সমষ্টিতে অর্থাৎ জলকণার সম্মিলনে জলাশয়—জাতিবাচক নহে। আমাদের স্মৃতিস্থিত একরূপ বহু ব্যক্তির প্রতিকৃতির একীকরণে ("images of things in the melted into one)" হইতেও ঠিক জাতির ধারণা হয় না।

বলিয়াছি ত, জাতিবিশেষের অন্তর্গত, ব্যক্তিগণের গুণ (১) সমুদায়ের সমষ্টি হইতে আমরা সেই সকল গুণের পূর্ণত্ব ধারণা করি। এবং তাহা হইতে সে জাতি বা জাতিত্ব ও জাতির আদর্শ ব্যক্তির ধারণা করিতে পারি। কোন জাতির একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া একটী ব্যক্তি দেখিয়া তাহা হইতে জাতির ধারণা হয় না। একটী গরু দেখিয়া গোত্ব বা গোজাতির ধারণা হয় না। কেন না, সেই ব্যষ্টি গো—গোজাতিত্বের বিশেষ সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র। আমরা নানা শ্রেণীর গো দেখিয়া তাহাদের গুণসমষ্টি হইতে, গোত্ব কি, তাহা সিদ্ধান্ত করি। এবং তাহা হইতে গোজাতির ধারণা করি। শুধু তাহাই নহে। বৃক্ষত্ব বলিলে আমরা বৃক্ষের সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম মাত্র বুঝি না,—সমগ্র বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের বিশেষ গুণেরও সমষ্টি বুঝিয়া থাকি, এবং যে সামান্য বা সাধারণ শক্তির দ্বারা কোন বিশেষ বৃক্ষে অবস্থানুসারে এবং বীজে অন্তর্নিহিত সেই শক্তিবলে এই সমষ্টি গুণের বা বৃক্ষত্বের বা বৃক্ষসত্বার বা বৃক্ষভাবের বিশেষ বিকাশ হইয়া থাকে, সেই শক্তির ধারণা হইতে আমরা বৃক্ষজাতির ধারণা করি, এবং সেই শক্তিবলে কোন বিশেষ বৃক্ষে এই বৃক্ষত্বের পূর্ণবিকাশ কল্পনা করিতে পারি। প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত জাতিশক্তি বলেই সেই জাতিসত্বা বহুরূপে ব্যাকৃত হয়, ও সেই জাতির ব্যক্তি বিশেষে সেই জাতিত্বের বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি হয়, ইহা অনুমান করিতে পারি।

৪২। অতএব এই জাতিত্বই ব্যক্তিত্বের মূল। কিন্তু আমরা কেবল আমাদের সাধারণ জ্ঞানে এই ব্যক্তিত্বই ধারণা করি। এবং ব্যক্তিত্ব হইতে জাতিত্ব কল্পনা করিয়া লই। কিন্তু প্রকৃত জাতিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। জাতিসত্বার স্বরূপ বা তাহার শক্তি আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। মায়াবদ্ধ আমরা, আমাদের সসীম

---

(১) এই গুণের ইংরাজী কথা connotaton. ইহা কোনরূপ accident নহে। এই accident বা আগন্তুক ধর্ম্মকে বস্তুর গুণ বা প্রকৃত ধর্ম্ম বলে না।

অপরিস্ফুট অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে আমরা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির অনুমান করি, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ লক্ষ্য করিয়া, তাহা হইতে যথাশক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্বের কল্পনা করি, ব্যক্তি হইতে জাতির ধারণা করি, কতকগুলি দৃষ্টান্ত হইতে জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বলে ব্যাপ্তি'-জ্ঞান লাভ করি, বিশেষ হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই, বহুত্ব হইতে একত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যতই অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ, অজ্ঞানজড়িত হউক, তাহা সেই এক অনন্ত জ্ঞানেরই আংশিক মায়াবদ্ধ বিকাশ। ভগবানের জ্ঞান পূর্ণ, অনন্ত, মায়াতীত। যিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানে অতীত পূর্ণরূপে প্রতিভাত, সেখানে অতীতও বর্ত্তমান। মহাকাশে যে অতীতের ছাপ্ চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত। যিনি অনন্ত শক্তিরূপ, যাঁহার শক্তি নিত্য অক্ষয়, যাঁহার শক্তিকণা অতীতে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার সেই শক্তি বশে সেই কার্য্যফলই সঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমানে কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাই আবার কারণরূপে লীন হইয়া ভবিষ্যতে কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত হইবে। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের বিকাশ। অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতিভাত, অথবা সেখানে ভবিষ্যৎও বর্ত্তমান। ভগবানের জ্ঞান কালপরিচ্ছিন্ন নহে। সেখানে অতীত ভবিষ্যৎ—সকলই বর্ত্তমান। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সমগ্র কালই সে অনন্ত জ্ঞানে সান্ত—সীমাবদ্ধ। সমগ্র দেশকালেই জীবত্বের সকল রূপ বিকাশই সে অনন্ত জ্ঞানে প্রতিভাত। ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে, সমষ্টিরূপে জাতিকল্পনা নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সমগ্র কালে তাহার সমুদায় ব্যষ্টি বিকাশ প্রতিভাত,—এবং দেশ কালে সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম আদর্শের বিকাশ পরিকল্পিত। তাহা না হইলে, জ্ঞান অনন্ত হইতে পারে না। যাহা ভগবানের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পরিকল্পিত, তাহাই তাঁহার প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত কালশক্তি বশে ক্রমে বিবর্ত্তিত হয়।

মানবজাতিজ্ঞানও এইরূপে ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত। ব্যষ্টি মানবও তাঁহার জ্ঞানে পরিকল্পিত। ব্যষ্টি মানবে তাঁহারই জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট। মানুষ ভগবানের অনুগ্রহ সর্গ। বলিয়াছি ত, মানুষই এই পৃথিবীতে জীবকল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি। মানুষেই ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। জ্ঞানরূপী ভগবান মানুষের হৃদয়মন্দিরে বাস করিবার জন্য তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভগবান তাঁহার উচ্চতর জীবকল্পনাকে শরীরী করিয়া, সত্তাযুক্ত করিয়া, তাঁহার বিরাট জগৎশরীরের এই পৃথিবীরূপে একাঙ্গে অভিব্যক্ত করেন, নিম্নতর জীবকে প্রকৃতির আপূরণে এই মানবরূপে উচ্চতর ইতর জীবে পরিণত বা বিবর্ত্তিত করেন। এজন্য মানবাতিরিক্ত ইতর জীবের বিকাশ সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের বিকাশের সীমা সেরূপ নহে। ব্যষ্টিমানব, মানবত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। ব্যক্তিমানব—মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ, ও মনুষ্য জাতিকল্পনার দেশকাল সীমাবদ্ধ আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র হইলেও, তাহাতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে। আমরা বলিয়াছি

যে, জ্ঞানরূপী ভগবান মানবহৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাই মানবজাতির পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণারূপী ভগবানের জ্ঞান প্রত্যেক ব্যষ্টিমানব অন্তরে অধিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আদর্শ মনুষ্যত্বের বীজ হৃদয়ে ধারণ করে। মানুষের এই মনুষ্যত্বের জ্ঞান, এই আদর্শের ধারণা ব্যবহারিক। ব্যবহারিক জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্য আমাদের এই আদর্শ ও এই মনুষ্যত্বের ধারণা ক্রমবিকাশশীল। যত সেই আদর্শজ্ঞানের ক্রমাভিব্যক্তি হয়, যতই মানুষের অন্তর সাধনাবলে ও প্রকৃতির অনুগ্রহে নির্ম্মল হইয়া অজ্ঞান দূর হইতে থাকে, মানুষের অন্তরে ততই সেই আদর্শের ধারণা, সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই মানুষ সেই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে,—ততই মানব ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া সমষ্টি মানবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই ব্যক্তিত্বভাব আমাদের মায়ার বন্ধন। (১) জাতিত্বভাবই সত্য,—ব্যক্তিত্বভাব অসত্য। এই জন্য উল্লিখিত হইয়াছেঃ—

"সত্যং তত্ত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়োমতাঃ।"

যাহা হউক, ব্যক্তিত্ব ভাব অসত্য, একথা পরমার্থতঃ সত্য হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে তাহা সত্য, একথা বলা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে ব্যষ্টি-সমষ্টি, ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আছে। ব্যক্তিচৈতন্য জীব—প্রাজ্ঞ, সমষ্টিচৈতন্য ঈশ্বর—বিরাট। এই সৃষ্টিতে বহুত্ব ব্যক্তিত্ব নিত্য অভিব্যক্ত। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিতে এই ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্ব উভয়ই আছে। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবাত্মা (ব্যক্তিরূপ) ও পরমাত্মা (জাতিরূপ) বাস করেন। (১) সুতরাং জীবাত্মার ব্যবহারিক অস্তিত্ব সিদ্ধ। অতএব আমাদের শাস্ত্রে—উল্লিখিত ব্যক্তিবাদ (individualism) ও জাতিবাদ (communism)—ইহার মধ্যে বিরোধ নাই। এই উভয় বাদের উপরে উঠিয়া, উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া তবে আমরা প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারি।

৪৩। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই জাতিত্ব ভাব হইতেই ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং ভগবতী দেবী নারায়ণী সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সংস্থিতা আছেন। (২) মানুষের এই ব্যক্তিত্বভাবের মধ্যে জাতিত্বের অভিব্যক্তি হইতে সমাজের সৃষ্টি। সমাজ, ব্যক্তিমানবকে পূর্ণ মানবত্বের দিকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যায়,—ব্যষ্টিকে সম্মিলিত করিয়া সমষ্টিতে পরিণত করিতে, ও মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। সমাজ, বহুত্বকে সম্মিলিত করিয়া দিয়া একত্বের দিকে মানুষকে লইয়া যায়, ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র জ্ঞান মিলাইয়া, সমষ্টিরূপে এক বিরাট শক্তির, এক বিরাট জ্ঞানের অঙ্গীভূত

---

(১) জর্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত সপেনহর, এই এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানকে মায়ার বন্ধন বলিয়াছেন। ইহাই *principium individuationis*। তিনি বলিয়াছেন,—"If that veil of *Maya*—the *principium individuationis* is lifted, so that the man no longer distinguishes between himself and others, he recognises in all being his own inmost true self......"

World as Will and Idea. Sec. 64.

(১) 'দ্বে সুপর্ণা...এই ঋক্ মন্ত্র—(১,১৬৪,২১) এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—৫।৪১।

করিয়া লয়, ব্যক্তিত্বকে, স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া জাতিত্বের ও পরার্থচেষ্টার বিকাশ করে। বলিয়াছি ত, অনেক মানবের সম্মিলনে এক ব্যষ্টিসমাজ। সমস্ত ব্যষ্টি-সমাজের সমষ্টিতে এক বিরাট মানব সমাজ —সমগ্র মানব জাতি। জ্ঞানরূপী 'নারায়ণে' মানব জাতির বা সমষ্টি মানবের যে কল্পনা নিত্য অভিব্যক্ত, সমষ্টি বিরাট সমাজের যে ধারণা পরিকল্পিত,—অথবা দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার ক্রমবিকাশের যে ধারণা —মনুষ্যত্বের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম-স্তর পর্য্যন্ত যে কল্পনা—হিরণ্যগর্ভরূপী নারায়ণ জ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত, তাহাই 'নর' (জীবাত্মা) বা মানবজাতি। 'নরোত্তম' সেই কল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি—তাহাই আদর্শ মানব। আর সমষ্টিভূত বিরাট সমাজই মানবজাতি বা মানবসমাজ-জ্ঞানময় ব্রহ্মের শরীর,—সেই জ্ঞানের সৎ-রূপ—ভগবানের বিরাট রূপ। অতএব আমরা এই 'নারায়ণ' 'নর' ও 'নরোত্তমকে স্মরণ করিয়া (৩) ভগবানের এই বিরাট রূপের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

উপনিষদের উপদেশ। (৮)

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

শ্বেতকেতু, আরুণির মুখে জগতের মূল কারণ একমাত্র সৎ ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। একই ব্রহ্মচৈতন্য এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কালে আধার রূপে অবস্থিত থাকেন। জীবের মৃত্যুকালেও, বাক্য মন প্রাণাদি সেই ব্রহ্ম চৈতন্যেই লীন হয়। শ্বেতকেতু শুনিলেন যে, জীব ব্রহ্মচৈতন্যে মৃত্যুকালে লীন হয়। কিন্তু যাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই, যাহারা অজ্ঞানী,—এরূপ জীব মৃত্যুর পর, ব্রহ্মচৈতন্য হইতে পুনরুত্থিত হইয়া, অন্যদেহ আশ্রয় করে। শ্বেতকেতু এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাই, অন্য এক দিবসে, অরুণি, পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া, সেই বিষয়টীর উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেনঃ—

“হে সৌম্য! যেমন মধুকরগণ নানা-দিক্-দেশস্থ নানাবিধ বৃক্ষ হইতে পুষ্পরস আহরণ করিয়া, সমুদয় রসকেই কেবল একমাত্র মধুরূপে পরিণত করিয়া ফেলে; সেই নানাশ্রেণীর রস সকল যেমন এক মধুরূপে পরিণত হইয়া যাইবার পর, সেই মধু কোন্ কোন্ বৃক্ষের কোন্ কোন্ রসের দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার যেমন আর পার্থক্যজ্ঞান থাকে না;—নানা শ্রেণীর বৃক্ষের মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু প্রভৃতি নানাবিধ রস যখন এক মধুতে পরিণত হয়, তখন যেমন তাহাদের আর মধুর, অম্ল, তিক্ততাদির পার্থক্য থাকেনা;—সেইরূপ সুষুপ্তিকালে এবং মরণ বা প্রলয়কালে, এই জীবনিবহ ব্রহ্মচৈতন্য প্রাপ্ত হইলেও, তাহারা যে ব্রহ্মচৈতন্যেই অবস্থিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারে না। না বুঝিবার কারণ এই যে, উহারা ব্রহ্মের একাত্মভাব না জানিয়াই,—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই, ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হইয়াছিল বলিয়া।

---

(৩) “নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্.” —এই শ্লোক এস্থলে স্মর্ত্তব্য।

ব্যাঘ্র, সিংহাদি বিশেষ বিশেষ জাতীয় জীব, যে যে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফলে, সেই সেই জাতীয় জীবদেহ ধারণ করিয়াছিল;—তাহারা সুষুপ্তি ও মরণাদি সময়ে,সেই জাতীয় কর্ম্মবাসনাদি দ্বারা অঙ্কিত হইয়াই ব্রহ্মচৈতন্যে প্রবিষ্ট হয়; তাই তাহারা সেই সেই ভাবেই পুনরুত্থিত হইয়া পড়ে। সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া, পূর্ব্ব কর্ম্মবাসনার ফলে, আবার সেই সেই ব্যাঘ্র, সিংহাদিরূপেই উত্থিত হয়। কেন না, উহারা তত্তৎজাতীয় কর্ম্মবাসনাদি লইয়াই ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মচৈতন্যই জগতের মূল কারণ। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই পরমচৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ।

হে সৌম্য! যেরূপ নানা দিগ্বাহিনী গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদী সকল, নানাদিক্ দেশ দিয়া বহিয়া সাগরে পতিত হয়; আবার তাহারা সেই সাগর হইতে বাস্পাকারে উত্থিত হইয়া, উহারা মেঘাকারে পরিণত হয়, এবং সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পুনরায় উহারা সাগরে প্রবিষ্ট হয়; সেই সমস্ত নদী সাগরে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন উহারা সমুদ্রজলের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় এবং তখন কে গঙ্গা, কে সিন্ধু, তাহা আর বুঝিতে পারা যায় না; এইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য হইতে উত্থিত জীবনিবহও বুঝিতে পারে না যে, উহারা সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই পুনরাগত হইয়াছে। জল হইতে ফেন, তরঙ্গ, বীচি, বুদ্বুদাদি উত্থিত হইয়া পুনরায় উহারা এক জলরূপেই পরিণত হইয়া যায়, এ ঘটনা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। জীব ও প্রত্যহই উহাদের কারণ স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে একাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াও, সুষুপ্তি, মরণ ও প্রলয়কালে একেবারে ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হইয়া থাকে না। পুনরায় সেই সেই জাতীয় জীবরূপে উত্থিত হয়। কেন না, উহারা তত্তজ্জাতীয় কর্ম্মবাসনাদি লইয়াই ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মচৈতন্যই জগতের মূলকারণ। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই পরমচৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ!

হে সৌম্য! তোমার সম্মুখবর্ত্তী এই সুবৃহৎ বৃক্ষটীর মূলদেশে যদি কোন ব্যক্তি কুঠার দ্বারা একবার মাত্র আঘাত করে, তবে সেই আঘাতেই এই বৃহৎ বৃক্ষটী একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না। ইহা একেবারে নষ্ট হয় না বলিয়াই, সেই ক্ষতস্থান হইতে রসক্ষরণ হইতে থাকে। এইরূপ মধ্যদেশে বা অগ্রভাগে আঘাত করিলেও, জীবিত থাকিয়াই রসক্ষরণ হইতে থাকে। এই বৃক্ষটী জীবিত থাকে বলিয়াই, মূলাদি দ্বারা ভূমির রস ও জলাদি আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করতঃ বাঁচিয়া থাকে। যদি কেহ এই বৃক্ষটীর একটী শাখা একেবারে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়, তখন সে শাখা শুষ্ক হইয়া যাইবে। বাক্, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদিতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যকেই "জীব" বলা যায়। এই জীব দ্বারা ভুক্ত ও পীত পদার্থ রসাদিরূপে পরিণত হইয়া, শরীর ও বৃক্ষাদির দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে। এই জীবের এক অঙ্গ বিনষ্ট হইলে, অর্থাৎ সেই অঙ্গ হইতে আত্মা উপসংহৃত হইলে, সেই অঙ্গটী শুষ্ক হইয়া যায়। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই জীব তদনুরূপ রসাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, জীবননাশ হইয়া গেলে, জীবের স্থিতির কারণ স্বরূপ এই রসাদিও বিনষ্ট হয়; রস চলিয়া গেলে, শাখাদিও শুষ্ক হইয়া যায়।

এইরূপে যখন সমগ্র বৃক্ষদেহ হইতে উহার চৈতন্যাংশ বা আত্মা ছাড়িয়া যায়, তখন সমগ্র বৃক্ষটীই শুষ্ক হইয়া যায়। রসক্ষরণ ও শোষণাদি চিহ্ন দর্শনেই, বৃক্ষাদিকে জীবিত বলা গিয়া থাকে। অতএব এই বৃক্ষের দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, এই দেহ জীব-বিরহিত হইলেই ধ্বংস হয়। এইরূপ, জীব যে সুষুপ্ত প্রভৃতির পরে পুনরুত্থান করে, সে অবস্থায় জীব একান্ত ধ্বংস হয় না; ইহার কারণ এই যে, জীবের তখনও কর্ম্মবাসনাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই, বালকে স্তন্যাভিলাষ ও ভয়াদি দৃষ্ট হয়; তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, উহা জন্মান্তরে স্তন্যপান ও সুখ দুঃখাদির অনুভব করিয়াছিল। অতএব জন্মান্তরে সম্পাদিত কার্য্যের শেষ থাকে বলিয়াই জীব পুনরুত্থিত হয়, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। কর্ম্মাদি না থাকিলে, জীব ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে এক হইয়া যাইত, আর উত্থিত হইত না। এই অতি সূক্ষ্ম সৎ ব্রহ্মচৈতন্যই জগতের মূল কারণ। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই পরমচৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ"।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আমাদের ভিতর ও বাহির।

আজি কালি আমাদের জাতির উন্নতির কথা লইয়া প্রায় প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্থানে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; সৌভাগ্য ক্রমে এতদ্দেশীয় অনেক শিক্ষিতা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত এই শুভদায়ক আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমাদিগকে আশার আনন্দময় আলোকে আলোকিত করিতেছেন। এইরূপ আন্দোলন যে আমাদের দেশের, সমাজের ও জাতির পক্ষে মহা কল্যাণকর, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সকল উপাদান—যে সকল উপকরণ—যে সকল মহাগুণ অবলম্বন করিয়া জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হয় এবং অধঃপতিত জাতিকে মহোন্নত অবস্থায় উন্নীত করা যায়, তাহা কয়জন বুঝে বা কয়জন বুঝিয়াছে? অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার মাল মশল্লার নাম ও পরিমাণের হিসাব জানা যেমন আবশ্যক, জাতীয় চরিত্র সংগঠন অথবা জাতীয় জীবন সংরক্ষণ বা পরিপোষণ জন্য তদ্রূপ উপযুক্ত উপকরণের নাম ও পরিমাণ জানার বিশেষ প্রয়োজন। জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় জীবন ছেলের হাতের নাড়ু নহে;—জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করিতে হইলে অনেক কাট্ খড় পোড়ান আবশ্যক। যথোপযোগী উপাদান না লইয়া জাতীয় চরিত্র সংগঠন করিবার চেষ্টা করা আর বালকের ধূলিখেলার প্রশ্রয় দেওয়া, একই কথা; একটু প্রবল বায়ু বহিলে বালকের খেলার ধূলি যেমন উড়িয়া যায়, উপযুক্ত উপকরণ না থাকিলে জাতীয় জীবনের পরিপোষণের চেষ্টা তদ্রূপ একটু সামান্য কারণে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারত এখন এমনই সুষুপ্ত যে, ইহাকে জাগাইলেও ইহা শীঘ্র জাগেনা, ইহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলে ইহা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার ঘুমায়, সুতরাং একটু আধটু সামান্য চেষ্টায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে সকল মহোপকরণ

সংগ্রহ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা-বাসীগণ বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, যে সকল মহাগুণে তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সুসভ্যতম এবং বিক্রমীতম বলিয়া সুপ্রখ্যাত হইয়াছেন, আমাদিগকে সেই সকল গুণের এবং সেই সকল উপকরণের অনুসরণ করিতে হইবে; এই সমুদয় গুণ ও উপাদানকে আমি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি; ইহাদের একটীর নাম—আভ্যন্তরিক, অপরটীর নাম বাহ্যিক। বাহিরে এবং ভিতরে, এই উভয় দিকেই কতকগুলি উপকরণের আবশ্যক; আমাদের ভিতর ও বাহির, এই উভয় দিকটা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা ভাল নয় কি?

ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সাহসী এবং বিক্রমী জাতি বাস করেন, কিন্তু ইহাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজ জাতির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর, সুতরাং বৃটিশের জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবনের উপাদানগুলির সহিত তুলনা করিলেই আমরা আমাদের অভাব, অসামর্থ্য, দুর্ব্বলতা এবং দরিদ্রতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতে পারি। সর্ব্ব প্রথমেই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতে ইচ্ছা করি। পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই বিগত বুয়র যুদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, ক্রমাগত তিনবর্ষাধিক কাল পর্য্যন্ত সমভাবে এই মহা প্রলয়ঙ্কর সংগ্রাম সমগ্র সভ্যজগতকে ত্রস্ত ও চমকিত করিয়া রাখিয়াছিল। ইংরাজেরা এই তিন বর্ষকাল পর্য্যন্ত, এই যুদ্ধ উপলক্ষে, তিন কোটি ২৭ লক্ষ লোককে অন্ন ও বস্ত্র দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন ক্রমাগত ৭৩ মাস কাল পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৬ সহস্র সেনার পোষাক, খোরাক, টিফিণ, লেমনেড্, সোডাওয়াটার, মদিরা, বরফ, ফল মূল, অস্ত্র, শস্ত্র; পীড়ার ঔষধ, শুইবার বিছানা, খেলিবার সরঞ্জাম, পড়িবার বই, এবং তদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার ভাবিয়া দেখ কি, ইংরাজের ধনবল কত প্রবল! এই লক্ষ লক্ষ সেনা পাঠাইতে না জানি তাহারা জলের মত কত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে; গোরাদের জন্য চাকর, পাচক, ডাক্তার, পাদ্রী, অধ্যক্ষ, উপদেষ্টা, শিক্ষক, মদ-ওয়ালা, দোকান-ওয়ালা প্রভৃতি না জানি কত লোকই গিয়াছে এবং কত লোকেরই খরচ যোগাইতে হইয়াছে!! তা ছাড়া, হাতি, ঘোড়া, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, গরু, পক্ষী ইত্যাদি এবং সহিষ, সেবক, কোচ্‌ম্যান, টহলদার, কুলী, প্রভৃতির ত কথাই নাই! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, ইংরাজ জাতির ধনবলটা কিরূপ! পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, বর্ত্তমান সময়ে লণ্ডন সহরে এবং সহরতলীতে প্রায় ৪ লক্ষ ৫২ সহস্র অট্টালিকা আছে, সেখানে বার মাসই শীত, সেখানে গৃহস্থের খরচ অসাধারণ, সুতরাং প্রত্যেক গৃহে যদি কয়লা, খোরাক, পোষাক, আস্‌বাব প্রভৃতি বহুবিধ কারণে প্রতি দিন গড়ে ৪ টাকা খরচ হয়, তাহা হইলে কেবল এই সাড়ে চারি লক্ষ গৃহ রাখিবার জন্য রোজ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকারও অধিক খরচ হইয়া যায়। ভাবিয়া দেখিলে, বৃটীশের ধন-বিক্রমটা কিরূপ? অতএব ধনবলটা একটা প্রধান বল; জাতীয় উন্নতি সংসাধন করিতে গেলে যে সকল বাহ্যিক বলের প্রয়োজন, তাহার প্রথমটার নাম—ধনবল। আমরা জাতীয়

জীবন সংগঠন বা পরিপোষণ করিতে চাই বটে, কিন্তু ধন বৃদ্ধির দিকে কাহারও দৃষ্টি আছে কি ? অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ মহামতি আডাম স্মিথ্ বলেন—

> "A nation that struggles for existence—struggles against poverty and lives from hand to mouth, is the most miserable of all nations."

অর্থাৎ যে জাতি দরিদ্রতা দুঃখে পীড়িত, যে জাতি দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহারা কখনও একটা "বিক্রমী জাতি" বলিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে শোভা পায় না। সুতরাং জাতীয় জীবন সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করিতে হইলে, প্রথমে জাতীয় ধনের (national wealth) পরিমাণ বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তির সমষ্টির নাম জাতি, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি যদি দরিদ্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে সমগ্র জাতি ধনবলে বলীয়ান হইতে পারে। ইংরাজের ধনবল দেখিয়া আমরা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই ; বুয়র যুদ্ধে কোটি কোটি, পদ্ম পদ্ম টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ঐরূপ মহা সংগ্রাম যদি আবার বাধিয়া উঠে এবং আবার যদি (তিন বৎসর নহে) ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে, তাহা হইলেও ইংরাজ জাতি ধনহীন হয় না, তাহারা সমভাবে অযুত অযুত নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব টাকা যোগাইয়া উঠিতে পারে। ভাবিয়া দেখ দেখি, ব্যাপারটা কি ! ! গত ৬৫ বৎসর মধ্যে রুস যুদ্ধে, ক্রিমিয়া যুদ্ধে, আফ্রিকার যুদ্ধে, আফগানিস্থানের যুদ্ধে এবং বহু স্থানে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সংগ্রাম দমন করিতে ইংরাজ প্রায় সতের শত পদ্ম টাকা খরচ করিয়াছে, বোধ হয়, এই সংখ্যা আমাদের অঙ্ক পুস্তকে নাই ! এখনও ইংরাজ জাতির ঘরে ঘরে [illegible] টাকা মজুত আছে এবং যে টাকা ইহারা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে, তাহা একত্রিত করিলে সতেরটা কুবের ভাণ্ডার অথবা তিনশতটা কারুণ বাদসাহের খাজানা খানা পরিপূর্ণ করা যাইতে পারে! ভায়া ! কেবল "জাতি" "জাতি" বলিয়া চীৎকার করিলে জাতীয় জীবন সংরক্ষিত বা জাতীয়-চরিত্র সংগঠিত হইবে না, প্রথমে খাইবার পরিবার উপায়টার দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক, নতুবা জগত অন্ধকার ! ! যেখানে অন্ন বস্ত্রের ঠিক থাকে, সেখানে নিশ্চিন্ততার সঙ্গে উৎসাহ, উদ্যোগ, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং নির্ভীকতা আসিয়া উপস্থিত হয়, পেট-খালি লোকের দ্বারা জগতে কোনও কালে কাহারও উপকার হয় নাই ; ভিখারী দ্বারা কখনও কোন জাতির "জাতিত্ব" সংরক্ষিত হয় নাই ; অতএব যাহাতে জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায়, তাহারই প্রথম উদ্যম করা আবশ্যক। জাতীয় জীবনের প্রথম বাহ্যিক বল—ধনবল। জাতীয় জীবনের দ্বিতীয় বাহ্যিক বলের নাম—জন বল। বুয়র যুদ্ধ দ্বারাই দেখান যাইতে পারে যে, ইংরাজের জনবল ধনবল অপেক্ষা কম নহে। ইংরাজ মনে করিলে আজ ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব ধাতুর এবং সর্ব্ব প্রকারের অসংখ্যাসংখ্য লোক বাহির করিয়া জগতকে দেখাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, যদি আবশ্যক হয়, সমগ্র পৃথিবী হইতে তাহারা আপনাদের অধিকৃত রাজ্যমধ্য হইতে অসংখ্যাসংখ্য লোকের আমদানী করিতে পারে। কবি, দার্শনিক, তার্কিক, বৈজ্ঞানিক, সংগীত-শাস্ত্র-পারদর্শী, যোদ্ধা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, দাতা, জ্ঞানী, ধনী, সাহসী, জ্যোতির্ব্বেত্তা, চিন্তাশীল সুলেখক, সুচি-

কিৎসক, শিল্পী, অসাধারণ পরিশ্রমী কুলী, সমরকুশল সেনা, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক ইংলণ্ড হইতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে তাহা আছে কি? ইংরাজের দেশের সকল শ্রেণীর লোককে এদেশের অনেকে দেখেন নাই। যাহারা সেখানকার সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান শ্রেণীর লোক, তাহারা প্রায়ই স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যায়না, যাইবার অবকাশও নাই; এই শ্রেণীর লোকেরা মন্ত্রিগিরি, কোষাধ্যক্ষগিরি, হাউশ-অব-লর্ডের মেম্বরীগিরি অথবা পার্লামেণ্টের সভ্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বড় বড় জমিদার—ইঁহারা আপনার ঘরে রৈইস, ইঁহাদেরই এক একটা লোক কখনও কখনও ভারতবর্ষে লাটগিরি করিতে আইসেন—যথা লর্ড রিপন, লর্ড কর্জ্জন, লর্ড নর্থকোট, ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর লোক মহাজন ও সওদাগর এবং বণিক। চতুর্থ শ্রেণীর লোক, সম্বাদ-পত্র-সম্পাদক, কবি, দার্শনিক, চিন্তাশীল লেখক, অধ্যাপক ইত্যাদি; ইহারাও প্রায় দেশের বাহিরে যান না। পঞ্চম শ্রেণীর লোক চাকুরে, যথা ইংলণ্ডের মাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি। ষষ্ঠশ্রেণীর লোক প্রবাসী, এই শ্রেণীর মহাপ্রভুরা আমাদের দেশের জেলার জজ এবং জেলার বড় সাহেব অর্থাৎ ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌ মাজিষ্ট্রেট; সপ্তম শ্রেণীর লোক গোরা, পুলিশের বড় কর্ত্তা এবং নীলকর ও চা-কর প্রভুগণ। জাহাজের কাপ্তেনেরাও এই শ্রেণীর লোক। অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে কুলি, খালাসী, মুটে, মজুর প্রভৃতি। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কত লোক এবং কত শ্রেণী!! অথচ সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ঈশ্বর না করুন, আজি যদি কেহ লর্ড কর্জ্জনকে হত্যা করে, তাহা হইলে ভাবিও না যে, আর কর্জ্জন মিলিবে না, আবার তাহারা কুড়িজন কর্জ্জন পাঠাইয়া দিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, যদি প্রয়োজন হয়, কর্জ্জন অপেক্ষাও উচ্চতর বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার লোক পাঠাইতে ইংরাজ জাতি অক্ষম হয় না। আবার এদিকে দেখ, যদি আবশ্যক হয়, ইংলণ্ডের দশবৎসর বয়স্ক বালক ও তের বৎসরের বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বুড়া ও বুড়ী পর্য্যন্ত, প্রত্যেক লোক স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য বন্দুক তরবারী চালাইতে চালাইতে অকাতরে হাস্যমুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে! ইংলণ্ডে বৎসর বৎসর লোক বৃদ্ধি হয়, আমাদের দেশে মাসে মাসে লোক কমে। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প, ঝড়, অত্যাচার, অতি বৃষ্টি, দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, উপার্জ্জনের উপায়াভাব, অনাবৃষ্টি, কৌমার্য্য, কুলীনদিগের অন্যায় বিবাহ প্রথা, প্রভৃতি অসংখ্য কারণে এদেশের লোকক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যে দেশে লোক কম, যে দেশে লোকের সংখ্যার বৃদ্ধি নাই, সে দেশের উন্নতি অসম্ভব। ইংলণ্ডে সংখ্যা এবং গুণ এই দুইটাই আছে, আমাদের quality নাই এবং quantityও নাই। যাঁহারা জাতীয় উন্নতি লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের একথা সদাসর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতীয় জীবনের দ্বিতীয় বাহ্যিক উন্নতির উপাদানের নাম—জনবল।

এইবারে তৃতীয় বলের কথা বলিব, জ্ঞানবল। উপরে ইংরাজের যে জ্ঞানবলের কথা বলিয়াছি, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়,

এতটা জ্ঞানবল না থাকিলে বৃটীশজাতি পৃথিবীর এত স্থানে এত বড় বড় অধিকার রাখিতে সক্ষম হইত না। এতগুলা রাজ্য রক্ষা করিতে কতটা বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রয়োজন, ভাবিয়া দেখ দেখি? জ্ঞানবল না থাকিলে কি ইংরাজজাতি এত বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বহু প্রকার লোকের মধ্যে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিত? আমরা পাঁচ জনকে লইয়া একত্রে ঘর রাখিতে পারি না, কিন্তু ইহারা কোটি কোটি লোককে বশীভূত করিয়া রাখিয়া অবাধে রাজ্যশাসন করিতেছে; ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের জ্ঞানের সীমাটা কত প্রশস্ত। যাহারা আকাশে মানুষ উড়ায়, সলিলে শিলা ভাষায়, এক মিনিটে পেশাওয়ারের খবর পদ্মা নদীর ধারে আনিয়া দেয়, তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বাহাদুরীর বলিহারী যাই!! প্রকৃত "জাতি" বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে এইরূপ জ্ঞানেরই প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞান ছিল বলিয়া, সেকালের টিকিনাড়া, মাথান্যাড়া, তিলককাটা ব্রাহ্মণেরা মত্ত মাতঙ্গসম মহাবিক্রমী ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে মুষ্টির মধ্যে রাখিয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলেই উঠাইত ও বসাইত এবং বসাইত ও উঠাইত। অতএব জাতীয় জীবনের তৃতীয় বাহ্যিক বল—জ্ঞান-বল।

এতক্ষণ বাহ্যিক বলগুলির কথা বলিতেছিলাম, এবারে আন্তরিক বলের কথা বলিব। ধনবল, জনবল এবং জ্ঞানবল খুব ভাল বল এবং খুব প্রয়োজনীয় বল হইলেও, কেবল এগুলি দ্বারায় জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট হয় না! কেবল ধনে, জনে এবং জ্ঞানে যে জাতির জাতিত্ব রক্ষা হয় না, তাহার অকাট্য প্রমাণ রোমের অধঃপতন। রোমকেরা যখন রূপার চেয়ারে বসিয়া, হাতির দাঁতের টেবিলের উপরে সোণার চামচের দ্বারায় খানা খাইত, তখনই রোমের পতন! অর্থাৎ ধনের অভাব ছিলনা, কিন্তু তবুও পতন হইয়াছে। যখন রোমকেরা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল, যখন ইঙ্গিত মাত্রে ইহারা কোটি কোটি লোক একত্র করিতে পারিত, যখন ইহাদের লোকবল অতুলনীয় ছিল, তখনই ইহাদের পতন! পৃথিবীর তাৎকালীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা রোমক সম্রাটদিগকে ঘেরিয়া থাকিত, কিন্তু তবুও রোমের পতন হইল, সুতরাং কেবল ধনে, জনে, আর জ্ঞানে জাতির "জাতিত্ব" থাকেনা—কেবল বাহ্যিক বলে সমাজ থাকেনা, আভ্যন্তরিক বল চাই। "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" দৈববল অপেক্ষা বল নাই। এই দৈববল ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। যদি বল, ধর্ম্ম কাহার নাম? আমি বলি, সত্যে শ্রদ্ধা, অসত্যে ঘৃণা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বদেশের প্রতি প্রেম, স্বজাতির প্রতি স্নেহ, হৃদয়ে আশা, মনে উৎসাহ, আত্মায় শুদ্ধতা, চরিত্রে নির্ম্মলতা, অত্যাচার ও অবিচারে তীব্রতা, অন্যায়াচরণে প্রতিবাদ, সদা সত্যের দিকে দৃষ্টি, ন্যায়ের জয় ঘোষণার জন্য অধ্যবসায়, প্রভৃতির নাম ধর্ম্ম। এই বল আভ্যন্তরিক বল; এই বলের প্রভাবে আর সকল প্রকার বল আপনা হইতে উপস্থিত হয়।

জগতে দুই প্রকার শক্তি থাকে, একটীর নাম সামাজিক, অপরটীর নাম ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত শক্তির সমষ্টির নাম সামাজিক শক্তি, এই শক্তির বলে ব্রাহ্মণ-

বর্গ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উপরে চিরদিন প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। যে শক্তি কেবল যথেচ্ছাচার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাহার নাম ব্যক্তিগত শক্তি, যেমন রুসিয়ার সম্রাটের অথবা তুরস্কের সুলতানের শক্তি। বিলাতে বড় বড় ধর্ম্মঘট করিয়া প্রজারা রাজাকে হারাইয়া দেয়। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত শক্তি এবং সামাজিক শক্তি এই উভয় শক্তিরই অভাব আছে। সামাজিক শক্তি কিছু পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু তাহাও অসার এবং অপদার্থ।

এতক্ষণ যে সকল কথা লিখিয়া আসিলাম, তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, আমাদের বাহিরের বল ও ভিতরের বল এই উভয় বলেরই সম্পূর্ণ অভাব। আমাদের ভিতর ও বাহির, দুই দিকেই কেবল খালি, আর খালি, আর খালি!!

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (১৩)

প্রাচীন আচার ব্যবহার।

সকল দেশে সকল কালের অবলা জাতির অলঙ্কারপ্রিয়তার কথা শুনিতে পাই, কিন্তু প্রাচীন কালের বঙ্গমহিলাদিগের যে, সমস্ত গল্প শুনা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা ভোগ বিলাস বা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য লালায়িতা ছিলেন না। "মোটা ভাত মোটা কাপড়" চিরদিন পাওয়াকে শ্লাঘ্য মনে করিতেন। গত চৈত্র মাসের নব্যভারতের ৬৫২ পৃষ্ঠায় যে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নামক দরিদ্র মহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতের উল্লেখ করা হইয়াছে, একদা তাঁহার ব্রাহ্মণী আর কৃষ্ণ চন্দ্রের রাজমহিষী একঘাটে স্নান করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণীর উভয় হস্তে দুই গাছি মাত্র লাল সূতা বাঁধা দেখিয়া রাজ্ঞী বলিয়াছিলেন, কোন দিন সূতা দুগাছা ছিঁড়িয়া যাইবে, দুগাছা কড় পরিতে পার না? ব্রাহ্মণী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, আশীর্ব্বাদ কর যেন এই সূতা লইয়া চক্ষু মুদিত করিতে পারি, যে দিন এই সূতা ছিঁড়িবে, সেই দিন কৃষ্ণনগর অন্ধকার হইবে। রাণীর মুখে এই গল্প শুনিয়া রাজা পণ্ডিতের কুটীরে গমন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ অপরাপর মহিলার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ধারণ করিতে মহিলারা সঙ্কুচিতা হইতেন। স্বর্ণালঙ্কার অপেক্ষা পরসেবাকে হস্তের, লোককে ভালবাসাকে বক্ষের এবং ঠাকুরদের কথা শুনাকে কর্ণের অলঙ্কার বলিয়া ভাল বাসিতেন।

লজ্জা তাঁহাদের এমন অভ্যস্ত ছিল যে, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা দশবৎসরের বালককে দেখিলেও অবগুণ্ঠন না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্বামী, দেবর ও শাশুড়ী ননন্দার কথা দূরে থাকুক, নিজ গর্ভজাত বয়স্ক পুত্রের সম্মুখেও মাথার কাপড় খুলিতেন না। উচ্চ সম্পর্কীয়া মহিলাদিগের সহিতও কথা কহিতেন না। উচ্চ সম্পর্কীয়া মহিলা গৃহে থাকিলে দিবসে স্বামীর সম্মুখীন হইতেন না। শাশুড়ী ননন্দা থাকিতে বধূ যতই বয়স্থা হউন, কিছুতেই গৃহিণীপনা করিতেন না, সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় উহাঁদের আদেশমত সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইহাতেও নিস্তার ছিল না, গালাগালী, কটু, কাটব্য ও বাক্য যন্ত্রণারূপ

পুরস্কার দিবা রাত্রি অজস্রধারে বধূর উপর বর্ষিত হইত। পরিত্যক্ত অপকৃষ্ট খাদ্য, যাহা দাস দাসীরাও গ্রহণ করিতে চাহিত না, বধূকে আদরের সহিত তাহা লইতে হইত। অনেক উগ্রচণ্ডী শাশুড়ীর হস্তে বধূরা এত যন্ত্রণা পাইত যে, আত্মহত্যা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না। অনেকস্থলে শাশুড়ী ননদের প্রহারে বধূ প্রাণত্যাগ করিত, পরে দড়িতে ঝুলাইয়া বা পুকুরে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইত। কোন পুরুষের সাধ্য ছিল না যে, স্ত্রীর পক্ষাবলম্বন করিয়া মাতা বা ভগিনীকে কোন কথা বলে। স্ত্রী মরিলেও পুরুষেরা শোকার্ত্ত হইতেন বলিয়া বোধ হয় না, শাশুড়ী ননদের ত কথাই নাই। "অভাগার ঘোড়া মরে ভাগ্যবন্তের মাগ * মরে" ইহা যে দেশের এবং যে কালের প্রবাদ বাক্য, সে স্থলে আবার স্ত্রী মরিলে দুঃখ কিসের! অশৌচের ভিতরেই সম্বন্ধ স্থির হইত, অশৌচান্তে আবার নূতন হতভাগিনীকে শঙ্খধ্বনি করিয়া গৃহে আনা হইত। যে সকল শাশুড়ী বধূদিগকে যন্ত্রণা দেয়, তাহাদিগকে "বউকাঁটকী" বলে, এই বউকাঁটকীদিগের সংখ্যা পূর্ব্বে বিস্তর ছিল। ইহাদের কার্য্য সমর্থক প্রবাদ বাক্য :-"হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে, পাড়াপড়সী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে," এই কথাটী কথায় কথায় উচ্চারণ করিতেন। যে সকল শাশুড়ী লোক নিন্দার ভয় রাখিতেন, উহাঁরা "ঝিকে মেরে বউকে শিখাইতেন।" ননন্দাদিগের অত্যাচার অধিকতর কুটীলতা মিশ্রিত, "ননন্দা শব্দের অর্থই হইতেছে, যিনি কখন আনন্দ দেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট কেহ কোন কালে আনন্দের প্রত্যাশা করেও নাই। বালিকারা ব্রত করিবার সময় প্রার্থনা করে "দশরথের মত শ্বশুর হউক, কৌশল্যার মত শাশুড়ী হউক, রামের মত স্বামী হউক আর লক্ষ্মণের মত দেবর হউক" কিন্তু শান্তার মত ননদ হউক, এ কথাত কোন দিন কোন বালিকাকে বলিতে শুনি নাই। তবে কি রামরাজ্যেও ননদের যন্ত্রণায় বধূগুলি অস্থির হইতেন! শান্তাও কি বাপের বাড়ী আসিয়া সীতার গায় গরম ফেন ফেলিয়া দিতেন? অসম্ভব নহে। এইরূপ যন্ত্রণা যে সহমরণে সহায়তা করিত, তাহার সন্দেহ নাই, যে সংসারে সধবাবস্থায় এত সুখ, সে স্থলে বিধবা হইলে কি আর কেহ তিষ্ঠিতে পারে? সুতরাং অগ্নিকুণ্ডই চিরশান্তির স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে অসম্ভব কি?

যে সকল বধূ অবাধ্য এবং শাশুড়ী ননদের কার্য্যে প্রতিবাদ করিত, তাহারাই অধিক যন্ত্রণা পাইত। শান্তস্বভাবা, বাধ্য, অনুগত, কষ্টসহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী বালিকারা প্রতিবাসীদিগের সহানুভূতি, উপদেশ এবং নিজ পিতৃগৃহের সুশিক্ষা ও সৎদৃষ্টান্ত পাইত, তাহারা শাশুড়ী ননদকে সেবায় ও ব্যবহারে এমন বশীভূত করিত যে, তাঁহারাও আপন কন্যা ও ভগিনীর ন্যায় বধূকে দেখিতেন। অত্যাচারী শাশুড়ী ননদের কথা অনেক বলা হইল বলিয়া স্নেহময়ী শাশুড়ী ননদের যে এককালে অভাব ছিল, তাহা নহে। যাহা হউক, বধূগুলি প্রথম কাল কষ্টে কাটাইলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের শ্রমশীলতা পরিবারের মঙ্গল কামনা ও সেবার ভাব বিশেষ বর্দ্ধিত হইত। ঠাকুর দেবতা ও গুরুজনকে ভক্তি এবং সাধা-

---

* প্রবাদবাক্য অবিকল রাখিবার জন্য ব্যবহারে বাধ্য। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন

রণের প্রতি সন্তানবৎ স্নেহ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইত। এখনকার মত পূর্ব্বে পাচক পাচিকা রাখার নিয়ম ছিল না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বড় বড় ধনীদিগের গৃহে ভিন্ন-জাতীয় কর্ম্মচারী ও দাস দাসীদিগের জন্য বহির্ব্বাটীতে ব্রাহ্মণ পাচক থাকিত, কিন্তু অন্তঃপুরের রন্ধন কার্য্য মহিলারা স্বয়ং আদর ও আহ্লাদের সহিত সম্পন্ন করিতেন। সমস্ত দিন রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইলেও তাঁহারা কষ্টবোধ করিতেন না। তখনকার নারী জাতির প্রধান শিক্ষা ছিল রন্ধন, রন্ধনে যে জন যত পটু হইতেন, সর্ব্বত্র তাঁহার তদ্রূপ সম্মান হইত। গ্রামের মধ্যে যে মহিলা রন্ধনে বিশেষ দক্ষা, তাঁহার জাতীয় কোন গৃহে ক্রিয়াকলাপে তাঁহার আদর দেখে কে, ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতে ক্রিয়াকর্ত্তারা তাঁহারই সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহার আদেশ মত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হইত, এবং রন্ধন শালার ও ভাণ্ডারের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইত। অন্যান্য মহিলারা তাঁহার সহকারিণী হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে তাঁহার তোষামোদ করিত। সহকারিণী নির্ব্বাচনের জন্য মধ্যে মধ্যে মহিলা সমাজের অধিবেশন হইত। "অমুকের বিবাহে যে ডাল ধরাইয়া ফেলিয়াছিল, যে পায়স আকিঁয়া দিয়াছিল, যে অপরিষ্কার, যে পরিশ্রমকাতর, যে অসাবধান হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল" প্রভৃতি অকর্ম্মণ্যাদিগের নাম খারিজ হইয়া যাইত। যাঁহারা নির্ব্বাচিতা হইতেন, তাঁহাদের উৎসাহ দেখে কে, "আমার হাতের ময়লা দশজনে খাইবে" ইহাকে পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া দেবতার পূজা মানিতেন। ক্রিয়া দিবসে সকলে প্রাতস্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্রে রন্ধন শালায় প্রবেশ করিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দলকর্ত্রী অগ্নির পূজা করিতেন, সকলে অগ্নিকে প্রণাম করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। দলকর্ত্রীর আদেশ সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া ভয়ে ও মহা উৎসাহে সমস্ত দিন এবং রাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ সমস্ত লোকের ভোজন সমাধা না হয়, ততক্ষণ রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া শেষে আপনারা ভোজন করিতেন। ভোজনীদিগের নিকট রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিলে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতেন। ক্রিয়া শেষে সমস্ত মহিলা একত্র হইয়া শুভচণ্ডীর পূজা করিতেন।

পূর্ব্বকালের সাদর ভোজনের বন্দোবস্তের কথা, অদ্বৈত ঠাকুরের গৃহে চৈতন্য দেব ও ঠাকুর নিত্যানন্দকে যে ভোজ্য প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেলঃ—

বত্রিশ আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্ন স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গ সূপ॥
সাদ্রক বাস্তুক শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
চই মরীচ সুক্তা দিঞা সব ফলমূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেল শস্য ছেনা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিষ্ট ইষ্ট॥
বত্রিশ আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।

চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিঞা।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিলা ধরিয়া॥
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন * পাত্র ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥
দুগ্ধ চিতাউ দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডী ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥

এই প্রকার বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রাচীন কালের মহিলারা প্রস্তুত করিয়া অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবা করিতেন। ভোজনী তন্মধ্যে যে ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিতেন, সেইটী বার বার প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া আহার করান হইত। এই আদরের প্রসঙ্গে একটী কৌতুকজনক গল্প আছে। এক শিষ্য গুরুগৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। গুরুপত্নী স্নেহের সহিত নানা প্রকার ব্যঞ্জন সহ প্রচুর অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন, গুরুর প্রসাদ ফেলিতে নাই, সুতরাং শিষ্য প্রাণপণে সকল বস্তুর শেষকণিকা পর্য্যন্ত কোনরূপে আহার করিয়া শেষে আমড়ার অম্বলের একটা আঁটি ছিল, সেটিকেও অল্প অল্প করিয়া দাঁতদিয়া কাটিয়া খাইতেছিলেন। গুরুপত্নী ভাবিলেন, আমড়ার অম্ল এত ভাল হইয়াছে যে, শিষ্য আঁটিটি পর্য্যন্ত খাইতেছে, সুতরাং আর ৫।৬টী আঁটি সহ একবাটী অম্ল তাহার পাতে ঢালিয়া দিলেন।

পরিশ্রমে পিতামহীরা কাতর হইতেন না। তাঁহাদিগকে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হইত, গোশালার সমস্ত কাজ করিয়া ঘুটিয়া দিতে হইত, রন্ধন, বাসনমাজা, গৃহ লেপন, সন্তান সেবা প্রভৃতিতে ভোর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। তাহার মধ্যে একটু হাত অবকাশ হইলে শিল্প কার্য্য করার নিয়ম ছিল। তাঁহারা বহুবিধ শিল্প কার্য্য জানিতেন, তন্মধ্যে চড়কায় সুতা কাটাই প্রধান। সকলেরই নিজের এক একটী চড়কা থাকিত, গৃহস্থদিগের অষ্ট প্রহরী বস্ত্রের এবং বিছানার সমস্ত বস্ত্রের সুতা মহিলাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইত। চড়কার সহিত এক একটী ধনুক থাকিত, তদ্বারা তাঁহারা তুলা ধুনিতেন, স্বহস্তে লেপ তোষকাদি বালিস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। যাঁহাদিগের অবকাশ কাল অধিক থাকিত, তাঁহারা সুতা কাটিয়া হাটে বেচিতে পাঠাইতেন। এক একজন এমন সূক্ষ্ম সুতা কাটিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের সুতা দেশ বিদেশের ব্যাপারীরা আসিয়া বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। কেবল ভারতের নহে, পৃথিবীর অপরাপর দেশের রাজা রাণীরা অতি আদরের সহিত তাঁহাদের সুতার বস্ত্র পরিধান করিতেন।

প্রাচীন বাবিলন ও রোম প্রভৃতি যখন আপনাপন মুকুটের জ্যোতিতে পশ্চিম এসিয়া ও সমগ্র ইউরোপ খণ্ডকে আলোকিত করিত, তখন বাঙ্গালার সূক্ষ্ম সূত্রনির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট বস্ত্রই তাঁহাদের আদরের পরিধেয় ছিল। সেই জন্য প্রবাদ আছে।

চড়কা মোর ভাতার পুত চড়কা মোর নাতি।
চড়কার দৌলতে আমার দোরে বাধা হাতী॥

হায় আজ তাঁহাদিগের পৌত্রী প্রপৌত্রীদিগের বিদেশীয় সূত্র ভিন্ন লজ্জা নিবারণের উপায় নাই। (১) সুতা কাটার নাম কাটনা

---

* তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু পাত্র পরি।

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬০ হইতে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এক কোটী টাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র কেবল ঢাকা

কাটা, এই কাটনা কাটা ভিন্ন তাঁহারা অতি সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। আজিও যশোহর খুলনা প্রভৃতি জিলার মহিলারা এমন সুন্দর চিত্রবিচিত্র কাঁথা প্রস্তুত করেন যে, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে তাহা শাল বলিয়া মনে হয়। এই কাঁথা শিশুদিগের এবং নিজেদের শয্যা হইত, উৎকৃষ্টগুলি কর্ত্তাদিগের পাছুড়ী হইত, অর্দ্ধ হাত প্রস্থ তিন হাত দীর্ঘ কাঁথাকে পাপস বলিত, কর্ত্তারা শীত কালে তাহা পদতল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত জড়াইয়া শীত কাটাইতেন। পাটের নানাবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট শিকা প্রস্তুত করিতেন। কড়ি বসাইয়া এক প্রকার মনোহর ও মূল্যবান শিকা, আলনা, ঝাঁপি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। মম এবং খয়েরের কারুকার্য্যে তাঁহারা বিশেষ দক্ষা ছিলেন। মমের নানা প্রকার পুত্তলিকা এবং খয়েরের অতি সুন্দর সকল প্রকার অলঙ্কার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈজস পত্র, খট্টা, পশু পক্ষী এবং সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করিতে অনেকে জানিতেন। চিত্র বিদ্যায়ও ন্যূন ছিলেন না, আলিপনা দ্বারা ক্রিয়া কর্ম্মে প্রাঙ্গন সুচিত্রিত করিতেন, ঠাকুর ঘর ও আপনাদিগের ঘরের প্রাচীরে অতি চমৎকার আলিপনা দিয়া রাখিতেন। বিবাহাদির পীঁড়ায় এক একটী মহিলা এমন অপূর্ব্ব আলিপনা চিত্র অঙ্কিত করিতেন যে, লোকে তাহা দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিত। তাঁহার দ্বারা আলিপনা দিবার জন্য অনেকে তোষামোদ করিয়া পীঁড়া পাঠাইয়া দিত। বিবাহে বরণের জন্য তণ্ডুল পিণ্ডের অতি চমৎকার কারুকার্য্য বিশিষ্ট "শ্রী" নির্ম্মাণের জন্য অনেকে বিখ্যাত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলির জন্য অতি সুন্দর চিত্র বিচিত্র মাটীর ও কাঠের ছাঁচ খুদিতেন। পরিত্যক্ত কেশ গুচ্ছ দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূত্র গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের কবরী বন্ধন করিতেন, নানা বর্ণের কার্পাস সূত্রে গুন্সী বিনাইতেন। ইত্যাদি অনেক কারুকার্য্যে অনেকেই বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

দিবারাত্রি অকাতরে প্রফুল্লচিত্তে পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনকার মহিলাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা অনেক সুস্থ থাকিতেন। বায়ুরোগ (হিষ্টিরিয়া) অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই হইত, (ডিস্পেপ্‌সিয়া) পেট ফাঁপা, এবং বহুমূত্র কাহাকে বলে

হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাদের বাঙ্গালার বস্ত্র ব্যবসায় ক্রমশঃ অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। ১৭৮৫ সালে বিলাতের নটিংহাম নগরে প্রথম সূক্ষ্ম বস্ত্রের কল হয়, তখনও হাতে বয়ন হইত। দুই বৎসর পরে বিলাতের তন্তুবায়েরা বৎসরে পাঁচ লক্ষ থান সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। সেই সময় ইংলণ্ডে স্বদেশী শিল্প উন্নতির জন্য ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার ফলে পার্লামেণ্ট ভারতীয় তুলার বস্ত্রের উপর শতকরা ৭৫৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারণ করেন। তদবধি ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায় কমিতে লাগিল, তত্রাচ ১৭৮৭ সালে ৩০ লক্ষ, ১৮০৭ সালে ৮লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১৮১৩ সালে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, টাকার ঢাকাই বস্ত্র কোম্পানি লইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ অসুবিধা দেখিয়া শেষে ১৮১৭ সালে তাঁহাদের ঢাকার কুঠী তুলিয়া দিয়াছেন। বিলাতের তন্তুবায়েরা তখন অতি সহজ কৌশলে এত রকম বস্ত্র ও সূত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল যে ১৮২৭ সালে তাহারা প্রায় চারি কোটী টাকার এবং ১৮৩১ সালে প্রায় সাত কোটী টাকার কেবল সূত্র এদেশে পাঠাইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় পিতামহীদিগের দুর্ব্বল হস্ত নির্ম্মিত চড়কার সূত্র কেবল ব্রাহ্মণের উপবীতের জন্যই প্রস্তুত হইত। Old Records of India office, P.59

তাহা তাঁহারা জানিতেন না, অম্ল রোগও অনেক অল্প হইত। কেবল যে তাঁহারাই সুস্থ থাকিতেন, তাহা নহে, তাঁহাদের সন্তানেরাও তাঁহাদের স্বাস্থ্যগুণে সবল ও দীর্ঘজীবী হইত।

আমোদ।—সাবেক কর্ত্তাদিগের অধিকাংশ আমোদ প্রমোদ ধর্ম্ম লইয়া হইত। তন্মধ্যে পূজার আমোদই প্রধান। দুর্গোৎসব, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কার্ত্তিকপূজা ও সরস্বতীপূজায় অনেকেই যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। কুমারটুলীর গোবিন্দরাম মিত্রের দুর্গা পূজা যেন উপন্যাসের ব্যাপার, এখানে তাহার কোন বর্ণনা করিব না, তাঁহার কথা লিখিবার সময় বলিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এই মাত্র বলিব যে, তাঁহার কয়েক অধঃস্তন পুরুষ পৈত্রিক রীত্যনুসারে পূজার ধুমধাম করিয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পলাশী যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোর ঘটায় দুর্গোৎসব করিবার জন্য উত্তরের রাজবাটী এত সত্বর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার দুর্গোৎসবে উদ্বোধন হইতে বাইনাচ আরম্ভ হইত, তাহা দেখিবার জন্য সহরের বড় বড় সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন এবং এখনও হন। সাহেবেরা এই নৃত্যোৎসবকে পলাশীযুদ্ধ জয়ের স্মৃতি উৎসব বলিয়া সাদরে যোগদান করিতেন এবং আজিও করেন।

কালীশঙ্কর ঘোষের বাটীর কালীপূজা অতি ভয়ানক ব্যাপার ছিল। এই স্থানে সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা কিছু বলিয়া রাখি, ইহাঁরা চোপার ঘোষ, ভীষণ তান্ত্রিক, এখনও সুরাপান ভিন্ন আহ্নিক সম্পন্ন হয় না। কালী শঙ্কর ঘোষের বাটীর গুরু পুরোহিত কর্ত্তা প্রভৃতি পুরুষ, অন্দরে গৃহিণী এবং সমস্ত পুরনারী মায় দাস দাসীকে পর্য্যন্ত সুরাপান করিতে হইত। শ্যামাপূজার রাত্রে এই সুরাপান অব্যাহত ভাবে চলিত। সুরাপানে উন্মত্ততা সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প প্রচলিত আছে, একবার ঢুলিরা পূজার দিন মধ্যাহ্ন কালে অন্তঃপুরে গৃহিণীর নিকট গিয়া তৈল ও জলপান প্রার্থনা করায় পানোন্মত্তা গৃহিণী বলিলেন, "কি তোরা আমার বাড়ীতে তেল জলপান চাহিতেছিস, মিঠাই খা মোম বাতি মাখ।" একদিন সন্ধ্যাহ্নিক অন্তে কালীশঙ্কর একটী পা মুড়িয়া একটী পা বাড়াইয়া মালাজপ করিতেছেন, মাতাল ভৃত্য সেই পা খানি টিপিতে টিপিতে কাঁদিতেছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কাঁদিতেছিস কেনরে ? উত্তর হইল, কর্ত্তা এত দিন চাকুরী করিতেছি, কখনও কোন অপরাধ করি নাই আজ আপনার একখানা পা হারাইয়া ফেলিয়াছি, খুঁজিয়া পাইতেছি না। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, তার জন্য চিন্তা কি, বোধ হয় জল খাবার জায়গায় ফেলিয়া আসিয়াছি, যা বাটীর ভিতর হইতে লইয়া আয়। ভৃত্য অন্দরে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল, শেষে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, একবার আহ্নিকের জায়গায় দেখিয়া আয়, তাহাও হইল, কিন্তু পা পাওয়া গেল না। কাঁদিতে কাঁদিতে ভৃত্য আবার কর্ত্তাকে সমস্ত অনুসন্ধানের কথা জানাইল, তিনি বলিলেন, তবে বুঝি আহ্নিকে নৈবেদ্য সহিত ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছে, যা সেখানে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়। ভৃত্য গুরুর গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ওরে কালীশঙ্করের পা যদি আমার

বাটীতে আসিয়া থাকে; তাহা হইলে আমি কাল সকালে মাথায় করিয়া পঁহুছিয়া দিয়া আসিব, তুই এখন যা। ভৃত্য আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

একবার কালীপূজার রাত্রে কর্ত্তার খেয়াল হইল যে,আমি এতগুলা পশুকে বলিদান দিয়া স্বর্গে পাঠাইতেছি, আমার কত পুণ্য হইতেছে, যদি গুরুদেবকে বলিদান করিয়া স্বর্গে পাঠাই, তাহা হইলেত আরও পুণ্য হইবে। গুরুকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র তিনি তথাস্তু বলিয়া নাচিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে হাড়িকাঠের নিকট উপস্থিত করা হইল। যে কামারেরা বলিদান করিতেছিল, তাহাদিগকেও মদ খাইতে হইয়াছে। কিন্তু যখন এত বলিদান করিতে হইবে, তখন মাতাল হইলে বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া তাহারা সামান্য পান করিয়া কর্ত্তাদিগের নিকট অধিক পানের ভান করিতেছিল। কামার বলিল, কর্ত্তা মহাশয় এ সব খাঁড়াগুলাতে চিরকাল পশু বলি দিয়া আসিতেছি, ইহাতে কি গুরুদেবকে বলি দিতে আছে? আমার গৃহে গুরু বলির জন্য নূতন খাঁড়া প্রস্তুত আছে, একটু অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্র লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া আপনার সহকারীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বাহিরে গিয়া থানাদারকে ডাকিয়া আনিয়া গুরুকে রক্ষা করিল।

এই গৃহে শ্যামাপূজার রাত্রে প্রাঙ্গন রক্তে ডুবিয়া যাইত, নর্দ্দমা দিয়া রক্তের স্রোত বহিত। সাত হাত লম্বা প্রতিমা হইত, দালানে পর্ব্বত প্রমাণ মিষ্টান্নের স্তূপ হইত। আমরা বাল্যকালে ইহাঁর পর বংশীয়দিগের পূজার এক একটা মিঠাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম, দুইটা বড় মালসার ভিতর মিঠাই ঢালিয়া এক একটা মিঠাই প্রস্তুত হইত।

দরজীপাড়ায় কবিরাজ রামকমল সেনের বাটীর জগদ্ধাত্রী পূজারও শেষাবস্থার ব্যাপার আমরা বাল্য কালে দেখিয়াছি। এখন তত বড় ঠাকুর ও সে রকম জাঁকজমক কোথাও দেখিতে পাই না। ঐ জগদ্ধাত্রীর সিংহ মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিত,লেজ নাড়িত। এইরূপ পূজার ধুমধাম পাড়ায় পাড়ায় এত হইত যে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেক পূজায় মাতিয়া থাকিত। কোজাগার পূর্ণিমায় এবং শিবরাত্রে কেবল বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নহে, অল্পবয়স্ক বালক বালিকা ভিন্ন সকলকেই রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। কোজাগারের দিনে উপবাস নাই,কেবল রাত্রে লক্ষ্মীপূজার পর ঝুনা নারিকেল চিঁড়া ও তালের ফোঁপল খাইয়া সকলকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। তদুপলক্ষে অনেক গৃহে নাচ তামাসা লইয়া জাগরণ হইত, অনেকে তাস পাশা প্রভৃতি খেলায় রাত্রি কাটাইতেন। শিব রাত্রি উপলক্ষে দিবারাত্রি উপবাস করিতে হইত, “উপবাসে পরিশ্রান্ত হইয়া কেহ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলে দয়াময় শিব নিজে আসিয়া ভক্তের পদসেবা করিয়া থাকেন,” এই বিশ্বাসে কেহ ঘুমাইতেন না। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা শিবপূজা ধ্যান ধারণায় থাকিতেন, যুবক যুবতীরা নৃত্য গীত তাস পাশা প্রভৃতি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিতেন।

দুর্গোৎসবের তিন দিন শাক্তদিগের গৃহে বলিদান হইত, নবমীর দিন অনেক স্থানে বলিদানের বিশেষ বাড়াবাড়ী। শোভাবাজারে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট যাহাকে জয়মিত্রের গলি বলে, সেই রাস্তায় জয়মিত্রের বাড়ী, আমরা তাঁহার দুর্গোৎসবে

নবমীর দিন অসংখ্য মহিষ মেষ ও ছাগ বলি দেখিয়াছি। যাঁহারা মহাষ্টমীর দিন কালীঘাটে গিয়াছেন, তাঁহারা তথাকার ব্যাপার স্মরণ করিলেই সে দৃশ্য বুঝিতে পারিবেন। কথিত আছে, জয়মিত্র সপ্তমীর দিন হইতে যত বলিদান হইত, নিজ গৃহের ব্যবহার্য্য ভিন্ন অপর ছেদিত ছাগগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিতেন, একাদশীর দিন খাতা দেখিয়া পৈত্রিক আমল হইতে যে যে ব্রাহ্মণের বার্ষিক ছিল, তাঁহাদের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

নবমীর বলিদানের আমোদ কর্ত্তাদিগের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহা আরও অদ্ভুত। তাঁহারা বলিতেন, কেবল মহিষ মেষ ছাগ কুষ্মাণ্ড ও আক বলি নহে, অনেক গৃহে আমোদ করিয়া গোধিকা, কপোত, মাগুরমাছ, নানাবিধ লেবু সুপারি এবং গোলমরিচ পর্য্যন্ত বলিদান হইত। বলিদানের পরে আরতি শেষ হইলে নৃত্য আরম্ভ হইত, কেবল নৃত্য নহে, সেই রক্তপ্লাবিত প্রাঙ্গনে মল্লযুদ্ধ ও নানা প্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া হইত। মোষের মুণ্ড, আক, কুমড়া, লেবু নারিকেল প্রভৃতি লইয়া কাড়াকাড়ী করিতে করিতে রক্তে গড়াগড়ি দেওয়া হইত। এক একজন উবু হইয়া বসিয়া উদর ও উরুদ্বয়ের মধ্যে একটী নারিকেল ধরিয়া থাকিতেন, আট দশ জন বীর তাঁহার সেই নারিকেলটী বাহির করিয়া লইবার জন্য টানাটানি করিয়া আছাড় পিছাড় করিতেন। এইরূপে রক্ত মাখিয়া গীতবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পথে মিছিল বাহির হইত। সেই সময় তাঁহাদের দেখিলে মনে হইত যেন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া শৈব সৈন্যেরা সদর্পে পৃথিবী কাঁপাইয়া চলিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর দধিকাদা মাখিয়াও এই রূপে মিছিল বাহির করিয়া গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইত। এ দুইটী মিছিলে পথে দর্শকদের প্রতি কোন উপদ্রব হইত না, কিন্তু দোলের মিছিলের ব্যাপার স্বতন্ত্র। সে সময় কোন ব্যক্তির বেদাগ বস্ত্র থাকিত না, দলে দলে মিছিল বাহির হইতেছে, পিচকারি ও আবীরে পথ ঘাট ঘর বাড়ী লালে লাল হইয়া যাইতেছে। মিছিলওয়ালারা সুশ্রাব্য অশ্রাব্য গীতে পাড়া মাতাইয়া এবং নরনারী যাহাকে সম্মুখে পাইত, তাহাকে আবীর ও পিচকারিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া চলিয়া যাইত। এমন অশ্রাব্য গীত এবং কুৎসিত সং প্রকাশ্য পথে বাহির করিতেন যে, এখনকার লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে না। কর্ত্তারা কিন্তু তাহা লইয়া খুব আমোদ করিতেন। গৃহিণী ও বালক বালিকাদিগের সহিত শ্রবণ ও দর্শন করিতেন।

ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে লালদীঘিতে দোল যাত্রার বড় ঘটা হইত। এই লালদীঘি গোবিন্দপুরবাসী মুকুন্দরাম শেট বা তাঁহার পুত্রের খোদিত। ইহার পশ্চিম পাড়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার ইষ্টক-নির্ম্মিত কাছারী বাটী ছিল, সমস্ত কাছারী ও পুষ্কর্ণী এক সীমায় আবেষ্টিত থাকিত। দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটী দোলমঞ্চ নির্ম্মিত ছিল, দক্ষিণের মঞ্চে গোবিন্দজী, উত্তরের মঞ্চে রাধিকাজীকে স্থাপন করিয়া কতক লোক রাখাল বেশে গোবিন্দজীর পক্ষে,আর কতক লোক সখী বেশে রাধিকাজীর পক্ষে থাকিয়া পরস্পরে আবীর যুদ্ধ খেলা হইত। দীঘির জলে আবীর গুলিয়া পিচকারি দেওয়া হইত, সেই জন্যই উহার

"লালদীঘি" নাম হইয়াছে। বহু দূর হইতে গ্রামবাসীরা আসিয়া এই দোল উৎসবে যোগ দিত, তদুপলক্ষে:বহু দূর বিস্তৃত বাজার বসিত। রাধারাণীর উত্তরের বাজারটীর নাম রাধাবাজার বলিত, সেই নাম আজিও রহিয়াছে, যে স্থানে পর্ব্বত প্রমাণ আবীরের স্তূপ বিক্রয়ার্থ থাকিত, তাহাকে লালবাজার বলিত।

ইংরাজেরা দ্বিতীয়বার সুতালুটীতে আসিয়া যখন বসেন, তখন তাঁহাদের অতি দুরবস্থা, থাকিবার বাসাঘরগুলি ভাঙ্গা, বেমেরামত, সুতরাং কেহ কেহ তাঁবুতে, কেহ কেহ জাহাজের উপর বা নৌকায় বাস করিতেন। তাঁহারা এই দোলের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া বল প্রয়োগ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা করায় দেশীয়েরা বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সাহেবেরা প্রহার খাইয়া পলাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণে জবচার্ণক স্বয়ং সদলে বন্দুক লইয়া উপস্থিত হন। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া দোল যাত্রীরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে, চার্ণক সাহেব উক্ত কাছারী বাটী দখল করিয়া আপনাদের দপ্তরখানা আনিয়া ঐ বাটীতে স্থাপন করেন। সে সময় শেঠ বসাকদের এতদঞ্চলে অদ্বিতীয় ক্ষমতা। তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিয়া এখানে বাণিজ্যের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা জানিয়া শেষে আপোষে বিবাদ মিটাইয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কাছারী বাটী আর ছাড়িয়া দেওয়া হইল না, মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া তাহার প্রাঙ্গনে চালা ঘর বাঁধিয়া আপনারা বাস করিতে লাগিলেন। পরে ঐ স্থানেই দুর্গ নির্ম্মিত হয়, দুর্গ নির্ম্মাণের পরও দুর্গ প্রাঙ্গনে উক্ত কাছারী বাটী কয়েক বৎসর রাখা হইয়াছিল।

রাসের আমোদও এখানে খুব হইত। শিয়ালদহের পূর্ব্বে যে সার পল্লীনামক অতি প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাই এখন শুঁড়ো বলিয়া পরিচিত। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পিতাম্বর মিত্র সর্ব্ব প্রথম দিল্লীর সম্রাটের নিকট চাকুরী সূত্রে রাজা বাহাদুর উপাধিসহ জায়গীর ও দশহাজার অশ্বারোহীর মুনসেব হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী ছাড়িয়া ভবানী চরণ দত্ত মহাশয়ের পরামর্শে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং মেছুয়া বাজারের বাটী পরিত্যাগ করিয়া শুঁড়ায় যে উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সপরিবারে তথায় গিয়া বাস করিলেন। সেখানে মহা ধুম ধামে রাসোৎসব করিতেন, তদবধি আজি পর্য্যন্ত শুঁড়ার রাস অত্যন্ত বিখ্যাত। যদিও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্র বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহের নিকট হইতে মদনমোহন বিগ্রহ এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন। এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে, যখন রাজা মদনমোহনকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোকুল মিত্র আর একটী মদনমোহন প্রস্তুত করিয়া পাশাপাশি দুইটী মূর্ত্তি রাখিয়া রাজাকে নিজের বিগ্রহ তুলিয়া লইতে বলেন। কোন কোন লোকের মতে রাজা নকল মদনমোহন লইয়া গিয়াছেন, আবার কোন কোন লোকে বলে রাজা তাঁহার নিজ ঠাকুরকেই আনিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটী গীতাংশ প্রচলিত আছে যথাঃ—

"সুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোণার মদন মোহন বাঁধা দিয়ে গেল।"

আর একটী কথা বালকেরা ব্যবহার করে যথাঃ—

"কারুর কিছু হারিয়েছে।
বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে।"

মদনমোহন সোণার নহেন, কৃষ্ণ প্রস্তরের। গোকুল বাবু মদনমোহনকে পাইবার পরই একটা রাধিকা গড়াইয়াছিলেন, কারণ রাজা নিজ রাধিকাকে বাঁধা দেন নাই। গোকুল বাবু রাধা মদনমোহনের ঠাকুর বাটী, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত পর্ব্ব যথেষ্ট অর্থ-ব্যয়ে সম্পন্ন করিতেন। তন্মধ্যে রাসোৎসবটীই প্রধান, তদুপলক্ষে কোন আমোদ তামাসার ত্রুটী হইত না। ঠাকুর বাটীর দক্ষিণে বৃহৎ একটী দীঘি ছিল, তাহাতে চারিখানি নৌকা ভাসাইয়া স্ত্রীলোকদের কবি গান হইত। অনেক প্রকারের সং এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছবি টাঙ্গানা হইত, সুবৃহৎ রাসমঞ্চের সম্মুখে সুসজ্জিত প্রাঙ্গনে অবিশ্রান্ত নৃত্য গীত হইত, দর্শকের জনতায় সম্মুখস্থ চিৎপুর রোডে যাতায়াত করা দুরূহ ছিল। আহীরিটোলার নিমু গোসাঁয়ের লেনে চিৎপুর রোড দিয়া প্রবেশ করিয়া, ডানহাতেই নিমাই চরণ গোস্বামীর বৃহৎ বাটী, তাঁহার গৃহে বলরাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। তিনি চৈত্র মাসে ঘোরঘটায় বলরামের রাসোৎসব করিতেন। রাসের জাল খাটাইবার জন্য প্রাঙ্গনে বহু সংখ্যক সুউচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইত, ঐ স্তম্ভগুলি ৪০।৫০টী বাঁস একত্র তাড়া বাঁধিয়া নির্ম্মিত হওয়ায় লোকে গীত বাঁধিয়াছিল,

"জন্ম মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।
আলোর সঙ্গে খোঁজ নাইক বোঝা বোঝা বাঁস।"

সিমুলিয়ার অনাথ নাথ দেবের বাজারের দক্ষিণে বাবু বংশীধর মিত্রের বাটী, তাঁহার বাটীতেও রাস উপলক্ষে আমোদ হইত। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা প্রকার বহু মূল্য বৃহদাকার ছবি ও পুত্তলিকা ইত্যাদি দ্বারা গৃহকে এমন চমৎকার সাজান হইত যে, উপরোক্ত কয়েকটী বিখ্যাত রাসের কোথাও তেমন হইত না।

খড়গদহ অর্থাৎ খড়দার শ্যাম সুন্দর বড় জাগ্রত দেবতা, তজ্জন্য খড়দা হিন্দুদিগের একটী তীর্থ স্থান রূপে প্রচলিত বলিলেও বলা যায়। এখানকার রাস দেখিবার জন্য নিকটস্থ অনেক গ্রাম ও নগরের লোক সমবেত হয়। আমরা এই শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সম্বন্ধে যে যে গল্প শুনিয়াছি, তাহা এই স্থানে বর্ণন করিব। রুদ্ররাম নামক একটী ব্রাহ্মণ যুবা শ্রীরামপুরের নিকস্থ চাতড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। এক দিন তিনি মাতুলের কৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করিতেছেন দেখিয়া মাতুল বলিলেন, এখনও তোমার এই বিগ্রহ পূজা করিবার অধিকার হয় নাই। যুবক ইহা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বর্ত্তমান বল্লভপুর তখন নিবিড় জঙ্গল ছিল, তিনি সেই বনে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু কাল পরে তিনি দেশ পর্য্যটনে গমন করেন। একদিন গৌড় নগরে ভ্রমণ কালে সহরের একটী ফটকের সম্মুখে বসিয়া আছেন, ফটকের উপরে দেখিতে পাইলেন, একখানি কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ প্রস্তর সর্ব্বদাই ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে। তিনি ভাবিলেন, এই প্রস্তরে কৃষ্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে পারিলে ভক্ত সমাজের বিশেষ ভক্তি আকর্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু মুসলমান নবাবের ফটকের প্রস্তর খুলিয়া লইয়া দেবতা গঠন করার

অভিপ্রায় অপেক্ষা আকাশ কুসুম আর কি হইতে পারে? রুদ্ররাম যে একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অধ্যবসায়ী পুরুষ, তাহা তাঁহার প্রথম কার্য্যেই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি এই অসম্ভব ব্যাপারেও নিরস্ত হইলেন না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে অধিকার ছিল, তিনি একজন ক্ষমতাবান হিন্দু অমাত্যের নিকট গিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব (১) আমি নারায়ণের আদেশে বহু দূর হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি, তিনি স্বপ্ন যোগে আমায় বলিয়াছেন যে, গৌড়েশ্বরের তোরণ দ্বারের উপর আমি প্রস্তর রূপে আবদ্ধ আছি, তুমি খাঁ সাহেবের নিকট গমন করিলে তিনি আমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিবেন, তৎপরে তুমি আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিবে।" খাঁ সাহেব, আমি ভগবানের আদেশ আপনাকে জানাইলাম, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন, আমি গরিব ব্রাহ্মণ আমার কি সাধ্য।

ভগবানের আদেশ শ্রবণে হিন্দু অমাত্যের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, কি করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন। যদিও সে সময়ের নবাব হুসেন সা শুর হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী, মুসলমান হইলেও হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যাসী ও ভক্তদিগকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আপনার ধর্ম্ম ভাবকেও অনেক পরিমাণে হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার আদেশে তাঁহার কবরের উপর একখানি শ্বেত প্রস্তর ফলকে একটী পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, প্রত্যহ তাহাতে শ্বেত চন্দন লেপন করিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত এবং তাহার ভরণ পোষণের জন্য ভূমি প্রদত্ত আছে। সমাধি মন্দিরটী "কদম রসুল" অর্থাৎ হজরত মহম্মদ রসুলের পদাঙ্ক মন্দির বলে। আমরা গৌড়ের কোন পুরাতন মন্দিরাদিতে সেবায়ত দেখি নাই, কেবল এই স্থানে লোক জন উদ্যান ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। এই নবাব হিন্দু বিরোধী না হইলেও মুসলমান ত বটে, সুতরাং তাঁহাকে কি ভরসায় এমন গুরুতর কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিবেন, অমাত্যবর তাহাই একান্ত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। শেষে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ঠাকুর, আমি যে বিষম বিপদে পড়িলাম, এ দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতি ভগবানের এমন গুরুতর আদেশ কেন হইল, বুঝিতে পারিতেছি না, নিশ্চয় ইহা তাঁহারা ছলনা বলিয়াই বোধ হয়। আপনার চরণে ধরিয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি আমায় ইহার উপায় বলিয়া দিয়া এ বিষম দৈব ছলনা হইতে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনার কোন ভয় নাই, আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনি নির্ব্বিঘ্নে এই আদেশ পালনে সক্ষম হইবেন। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বলিয়া আমায় নবাব দরবারে উপস্থিত করিয়া দিন, তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য আমি সাধন করিয়া লইব। খাঁ সাহেব তাহাই করিলেন। নবাব পণ্ডিতকে নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কবে চন্দ্র গ্রহণ, কবে সূর্য্য গ্রহণ হইবে, বৃষ্টি কেমন হইবে, শস্য কেমন হইবে, প্রভৃতি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদত্ত হইলে একজন রহস্যপ্রিয় মুসলমান মন্ত্রী জিজ্ঞাসা

---

(১) নবাবী আমলে হিন্দু প্রধান অমাত্যেরা খাঁ উপাধি পাইতেন, লোকে তাঁহাদিগকে খাঁ সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিত।

করিলেন, ভাল পণ্ডিতজী কবে ভূমিকম্প হইবে বলিতে পারেন? পণ্ডিত তদুত্তরে বলিলেন, ইহা হিন্দুদিগের বলিবার ক্ষমতা নাই, কারণ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মরিলে আমরা তাঁহাদের দেহ ভস্ম করিয়া থাকি, ধূমের সহিত তাঁহাদের আত্মা আকাশে গমন করেন এবং আকাশের সংবাদ আমাদের জানাইয়া থাকেন, আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মৃত্তিকায় কবরিত হন, তাঁহারা আপনাদিগকে ভূমিকম্পের সঠিক সংবাদ অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং সুবিজ্ঞ মৌলবী সাহেবেরা তাঁহাদের কেতাবের সাহায্যে অবশ্ত বলিতে পারিবেন। এই সুযোগ্য যুক্তি নবাবের বিশেষ মনঃপুত হওয়ায় তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন যে, নবাবের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, তখন বলিলেন, বাদসাহ, আমি গণনার দ্বারা আপনার রাজধানীতে একটী বহুকাল স্থায়ী অমঙ্গল দেখিতেছি। একটা ভূত বহুকাল হইতে রাজধানীর অমুক ফটকের উপর প্রস্তর মধ্যে আবদ্ধ আছে এবং দিবা রাত্রি রোদন করিতেছে, তাহার চক্ষের জল প্রস্তর ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। আপনার পূর্ব্ব বাদসাহের উষ্ণীষের উপর তাহার অশ্রুপাত হওয়ায় সেই বাদসাহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আপনার সুযোগ্য পুত্র যে কোচদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হইয়া আসেন (১) তাহার কারণ ঐ ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাদসাহ জাদা যখন যাত্রা করেন, তখন তাঁহার উষ্ণীষের উপরেও উহার অশ্রু পতিত হইয়াছিল। আপনি মহা পুণ্যবান, সেই জন্ত কেবল আপনার পুণ্যবলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। অপরের পুত্র হইলে জীবন সংশয় হইত। সেই ভূতকে দূরীভূত না করিলে আপনার এবং রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। আমরা জ্যোতির্ব্বিদ শুভাশুভ সকল কথাই আমাদিগকে বলিতে হয়, তাই এই অশুভ কথাও আপনাকে বলিলাম।

সেই রোরুদ্যমান ভূতকে দেখাইতে পারিবেন কি না, জিজ্ঞাসিত হইলে পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। নবাব সপারিষদ ব্যগ্রতার সহিত ব্রাহ্মণের পশ্চাতে ভূত দরশনে গমন করিয়া যখন স্বচক্ষে সেই ঘর্ম্মসিক্ত কৃষ্ণ প্রস্তর দর্শন করিলেন, তখন কেবল আশ্চর্য্য হইলেন না, ভয়ে তাঁহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বৃহৎ তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, বাদসাহ আমায় ক্ষমা করুন, এ আদেশ প্রত্যাহার করুন, এমন কোন

---

(১) কুচবিহারের রাজা কান্তেশ্বর গুরুতর কারণে আপনার গুরুপুত্রের প্রতি এমন কুপিত হন যে, তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস রন্ধন পূর্ব্বক গুরুকে ভোজন করাইয়াছিলেন। গুরু, পুত্রের মাংস খাইলাম জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত চিত্তে একেবারে গৌড় নগরে আসিয়া নবাব হুসেনসার নিকট অভিযোগ করিলেন। নবাব ব্রাহ্মণের প্রতি বিনা দোষে পুত্রের মাংস ভোজন করান শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি করিয়া আপনার পুত্রকে সসৈন্তে কুচবিহার গিয়া রাজাকে বন্ধন করিয়া আনিতে আজ্ঞা করেন। কান্তেশ্বর এমন প্রবল নরপতি ছিলেন যে, তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা, তিনি নবাব সৈন্তদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন, তাহারা পলায়ন পরায়ণ হইলে গৌড়ের প্রাচীর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া প্রাচীর গাত্রে আপনার বিজয় পতাকা স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিলেন।

মনুষ্য নাই যে, উহাকে স্পর্শ করিতে পারে, আমায় আজ্ঞা করুন, আমি এই স্থানে একটী যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞের মন্ত্রপূত হোমাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে তাহার উত্তাপে ঐ ভীষণ ভূত যখন মৃতপ্রায় হইবে, তখন আমি স্বহস্তে উহাকে নামাইয়া নৌকাযোগে লইয়া গিয়া একেবারে মহা সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া আসিব।

ব্রাহ্মণের প্রতি নবাব হুসেন সার এমন অটল বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। চতুর ব্রাহ্মণ এই সুকৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া নবাবের নিকট যথেষ্ট পুরস্কার লইয়া নৌকাযোগে খড়দহে উপনীত হন এবং সেই প্রস্তরে চারিটী কৃষ্ণ মূর্ত্তি গঠন করেন। তাহারই একটী খড়দহের শ্যামসুন্দর, একটী বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, একটী সাইমানার নন্দদুলাল, আর একটী বগড়ির কৃষ্ণরায় নামে বিখ্যাত বিগ্রহ রূপে বিরাজ করিতেছেন। আরও খানিক প্রস্তর খড়দহের অশ্বথ মূলে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই চারিটী বিগ্রহই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ পূজনীয়। তজ্জন্য খড়দহের রাসোৎসব অতি বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে বগড়ির কৃষ্ণরায় ভিন্ন অন্য কোন বিগ্রহকে ঘামিতে দেখা যায় না। খড়দহের শ্যামসুন্দর কখন কখন ঘর্ম্মাক্ত হন, কিন্তু ইনি ঘর্ম্মাক্ত হইলেই প্রধান সেবায়েতের মৃত্যু হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। রাস ভিন্ন ফুল দোল উপলক্ষেও খড়দহে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে আর একটী কিম্বদন্তি এই যে, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র যখন মক্কা তীর্থ দর্শন করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন, তখন বাদসাহ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য গোমাংস বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। বাহক উহাকে বাদসাহ প্রেরিত পুষ্প বলিয়া বীরভদ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তিনি বস্ত্র উদ্ঘাটন করিতে আদেশ করেন। আবৃত বস্তু তখন সত্য সত্যই পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। বাহক বাদসাহের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে বৈষ্ণবকে পুরস্কার দিতে চাহিলে, গোস্বামী তাঁহার ফটকের উপরিস্থ উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রার্থনা করেন এবং লাভ করিয়া খড়দহে আনিয়া মূর্ত্তি চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করেন। (১)

---

(১) নবাব সায়দ হুসেন সাহ ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন, কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদিগের প্রচার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। খড়দহের উল্লেখ এবং তথায় নিত্যানন্দের বাসস্থান নির্ম্মাণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, মাহেশ গ্রামেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু বল্লভপুর বা রাধাবল্লভ অথবা খড়দার শ্যামসুন্দরের কোন উল্লেখ নাই। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরভদ্র গোস্বামী বালক, অবশ্য যথেষ্ট বয়প্রাপ্ত না হইলে কখনই মক্কা তীর্থ যাইতে সক্ষম হন নাই। আমাদের অনুমান হয়, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় তিনিই দিল্লী হইতে উক্ত কৃষ্ণ প্রস্তর আনিয়া থাকিবেন। বড় বাজারের মল্লিক বংশের ইতিহাসে দেখা যায়, তাঁহাদের আদি পুরুষ সপ্তগ্রামবাসী বনমালী মল্লিকের পৌত্র কৃষ্ণদাস মল্লিক বল্লভপুরে রাধাবল্লভের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণদাস মল্লিক ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, কিছু দিন পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতামহের মৃত্যুতে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীর ১৬০৬ হইতে ২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ২০ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়। এবং মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রথম বারের মূর্ত্তিটী অত্যন্ত বৃহৎ হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়, তাহাই

পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের স্থাপিত বিগ্রহেরও বিশেষ সমারোহে রাসোৎসব হইয়া থাকে। এই বিগ্রহ খড়দহের শ্যামসুন্দর অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ রাঘব পণ্ডিত চৈতন্য দেবের একজন প্রধান সহচর ও বন্ধু ছিলেন, চৈতন্যদেবের জীবনে ঐ বিগ্রহ সেবার অনেক উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বৈষ্ণব পর্ব্বের মধ্যে রাস ও দোল যাত্রাই সর্ব্ব প্রধান পর্ব্ব। সকল দেবালয়েই এই দুই পর্ব্ব উপলক্ষে সমারোহ হইত।

রথের উৎসবও কলিকাতার মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে এখানে যোত্রমান হিন্দু অনেক ছিলেন, তাঁহারা মহাসমারোহে বারমাসের তের পার্ব্বণ সম্পন্ন করিতেন। তাহার প্রমাণ শেঠদিগের লালদীঘির দোল এবং বৈঠক খানার রথে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐ রথখানি ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মতে ৭০ ফুট উচ্চ, সমস্ত বৎসর বৈঠকখানার সুবৃহৎ বট বৃক্ষের নিম্নে অবস্থিতি করিত, ইহার অধিকারী কাহারা, তাহার কোন প্রমাণ তাঁহারা দেন নাই। আমাদের অনুমান হয়, গোবিন্দপুরের শেঠেরাই ইহার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। লালদীঘি হইতে বৈঠকখানা পর্য্যন্ত সরল পথটাই কলিকাতার অতি পুরাতন ও প্রশস্ত রাস্তা, এই পথেই তাঁহাদের গোবিন্দজীর রথযাত্রা হওয়া সুবিধাজনক।

পোস্তার জগন্নাথের তিনখানি সুবৃহৎ রথ বাহির হইত। এই রথ তিনখানির কথা কলিকাতাবাসী অনেক বৃদ্ধেরই স্মরণ আছে। সম্বৎসর রথ তিনখানি গরাণহাটায় লালা বাবুর বাটীর প্রাঙ্গনে থাকিত। এই বাটী বর্ত্তমান বিডন উদ্যানের দক্ষিণে চিৎপুর রোডে, সেখানে এখন পাটের কল আছে। সুবিখ্যাত রাসমণি দাসীর শ্বশুর প্রীতরাম মাড়্ মহাসমারোহে রৌপ্য নির্ম্মিত রথ বাহির করিতেন, সে রথযাত্রা আজিও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষমতাবান হিন্দুরা অনেকেই ছোট রথ বাহির করিতেন। এখনও দুই এক খানা রথ কলিকাতার পথে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মত জাঁকজমক কিছুই নাই বলিলেও বলা যায়। রথযাত্রার অগ্রে নানা বর্ণের দুই শ্রেণী পতাকার মধ্যে বিবিধ প্রকার বাদ্যভাণ্ড দলে দলে সংকীর্ত্তন, সুবৃহৎ ছাতায় রাস্তা আচ্ছাদিত হইয়া যাইত। ইহার মধ্যে তিন চারি হস্ত পরিধি-বিশিষ্ট গোলপাতার ছাতাই অধিক, বস্ত্রের ছাতাও দুই চারিটী থাকিত। এই বস্ত্রের ছাতাগুলি অতি সুন্দর, নানা বর্ণের মোটা মোটা বস্ত্রে

বল্লভপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবত কৃষ্ণদাস মল্লিক ঐ স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং বল্লভপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিটীই সর্ব্বশেষে নির্ম্মিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল। যদি রুদ্ররাম পণ্ডিত প্রস্তর আনিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন, তাহা হইলে তিনি পরম সুন্দর মূর্ত্তিটী আপনার তপোবনে স্থাপন না করিয়া খড়দহের বীরভদ্র গোস্বামীকে প্রদান করিলেন কেন। ইহাতে অনুমান হয়, বীরভদ্র গোসামীই প্রস্তর আনাইয়া মূর্ত্তি গঠন করাইয়া, প্রথমটী তাঁহার পছন্দ না হওয়ায় উহা রুদ্ররাম পণ্ডিতকে প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস মল্লিকের পঞ্চম পুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্র নিমাই চরণ মল্লিক, যিনি কলিকাতায় ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির ভগ্নদশা দেখিয়া অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আর একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

আচ্ছাদিত, অতি সুদৃশ্য ঝালোরে তাহার নিম্ন দেশ বেষ্টিত, মোটা মোটা বেতের শিক, দুই তিন ইঞ্চি মোটা কাঠের রং করা বাঁট। (আজিও কোন কোন নগর সংকীর্ত্তনে গোঁসাইজীর মস্তকে সেই প্রকার ছাতা ধরিতে দেখা যায়) তা ছাড়া বড় বড় হাত পাখা আড়ানী, রংমসাল, ন্যাকড়ার মসাল এবং নারিকেল সাঁশের মসালের আলোক শ্রেণীতে পথ আলোকিত হইত। কর্ত্তারা খালি গায় খালি পায় কেহ কোমরে কেহ মাথায় উড়ানী বাঁধিয়া বর্ষাকালের কাঁচা রাস্তায় একহাঁটু কাদার উপর মহা উৎসাহে "জগবন্ধু দেখা দাও আমারে কত মহাপাপী উদ্ধারিলে বসে শ্রীমন্দিরে" প্রভৃতি সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিতেন। দোল যাত্রার ন্যায় রথযাত্রায় অশ্লীল সঙ্গীত গাইতেন না। পথের উভয় পার্শ্বে তাল পাতার ছোট বড় নানা প্রকার কারুকার্য্য করা ভেঁপু, মাটীর রথ, জগন্নাথ প্রভৃতি খেলানা, হাঁড়ি ধামা চুবড়ী নানা প্রকার ফল জলপান ও মিষ্টান্ন ইত্যাদির দোকান সাজান হওয়ায় মেলাটী খুব জমকাল হইত। ভীড় এত অধিক হইত যে, কোথাও অধিক জনতা দেখিল লোকে "রথ দোলের মেলা হইয়াছে" বলিয়া থাকে।

আজিও নিকটবর্ত্তী মাহেশ ও বল্লভপুরে আট দিন ধরিয়া রথের মেলা মহাসমারহে হইয়া থাকে। এই মাহেশ গ্রাম অতি প্রাচীন। মুকুন্দ রামের চণ্ডীকাব্য এবং কবিরামের "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক ভৌগোলিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কবিরাম লিখিয়াছেন, মাহেশ ও খড়দহের মধ্যে গঙ্গা বহুদূর সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছেন, মাহেশের রাজার নাম কুলপাল, তিনি কায়স্থ বংশীয়, তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ হরিপাল হইতে হরিপাল নামক গ্রামের স্থাপনা।

বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে নিত্যানন্দের প্রচার সম্বন্ধে মাহেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থেও মাহেশের জগন্নাথ বা বিখ্যাত স্নানযাত্রা বা রথের কোন উল্লেখ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে গত চৈত্র মাসের নব্যভারতের ৬৫২ পৃষ্ঠায় মুকুন্দ ময়রার মোয়া খাইবার জন্য জগন্নাথের মাহেশে আগমন বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু তাহা কোন্ সময় তাহার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, চৈতন্য দেবের লীলা সাঙ্গের অনেক দিন পরে, এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কবিরামের সময়ও যদি জগন্নাথের মাহেশে অধিষ্ঠান থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার গ্রন্থে উহার অবশ্য উল্লেখ করিতেন। বল্লভপুরের মন্দিরনির্ম্মাতা কৃষ্ণদাস মল্লিকের প্রপৌত্র নয়ান চাঁদ বা কমল নয়ান মল্লিক (১) যিনি ১৭১০

---

(১) সেন্সস উপলক্ষে কলিকাতার যে ইতিহাস লেখা হইয়াছে, তাহাতে বড়বাজারকে অতি প্রাচীন বাজার বলিয়া বলা হইয়াছে। "শিবের একটী নাম "বুড়া" সেই বুড়ার বাজার বলিয়া পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল, ক্রমে বড়বাজার হইয়াছে।" বাস্তবিক তাহা নহে, কৃষ্ণদাস মল্লিকের পৌত্র দর্পনারায়ণ মল্লিক মুসলমানদিগের উৎপীড়নের ভয়ে ত্রিবেণী হইতে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজ কোম্পানির সীমানার মধ্যে বাস করিতে চাহিলে, তাঁহাকে কলিকাতা গ্রামের মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ একটী ভূখণ্ড প্রদত্ত হয়। তিনি দস্যুভয়ে সেই সমস্ত স্থান উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া তাহার মধ্যে আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দেয়াল দৃষ্টে কলিকাতার প্রবাদ আছে "কায়েত মরে খেয়ালে, বেণে মরে দেয়ালে।" দর্পনারায়ণ মল্লিকের পুত্র নয়ান

াব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মাহেশের মন্দির এবং ধর্ম্মশালার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্যামবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু, যিনি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হুগলির নিকট তারা (তড়া) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রায় বিংশতি বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন করিয়া অতি সমান্য মূলধনে লবণের ব্যবসায় করিতেন। একবার তিনি অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া কোম্পানির লবণের একটী চালান একেবারে একচেটিয়া রূপে সমস্ত বায়না করিয়া তোলেন, অদৃষ্ট ক্রমে সেই লবণে তাঁহার ৪০ হাজার টাকা লভ্য হইয়াছিল। সেই লভ্যাংশ হইতে তিনি মাহেশের জগন্নাথের রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি হুগলির কলেক্টরের দেওয়ান হন, তখন হুগলি জেলার অনেক জমীদারী ক্রয় করেন, তাহা হইতে জগন্নাথকে এমন ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন যে, আজিও মাহেশের রথের সমস্ত ব্যয় কৃষ্ণরাম বসুর প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই রথ উপলক্ষে আট দিন মেলা বসে এবং বিক্রেতা ও দর্শকে কত লক্ষ লোক যে কত দূর হইতে আসিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা নাই।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

উদ্বেগে।

সংসার-সমুদ্র-মাঝে,
অজ্ঞেয় উদ্দেশ্য, কাজে,
এ ক্ষুদ্র জীবন তরী চলেছি বাহিয়া,
কোথা যাই কেন যাই,
তাহা কিছু জানা নাই,
সকলি দিয়াছি নাথ! তোমারে সঁপিয়া

২

দেখি না দেখিতে চেয়ে,
তবু আছে প্রাণ ছেয়ে,
অদৃশ্য স্নেহের নেত্রে করুণ চাহনি,
ঝঞ্ঝা, উল্কা, বজ্রাঘাতে,
সহস্র বিপৎ-পাতে,
কেন আছি?—এত যুগ তুমি কি রাখনি?

৩

ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ আমি,
তুমি যে সম্রাট, স্বামী!
সে গৌরবে ভুলে আছি হীনতা আমার,
মনে আসে—একদিন
বাতাসে না হয়ে "লীন"
পৌঁছিবে আমার সবি শ্রীপদে—তোমার।

৪

সে শুভ গোধূলি বেলা,
এই উপেক্ষিত খেলা,
বেদনার বিষ অশ্রু, মৌন হাহাকার,

চাঁদ, তাঁহাকে কমলনয়ানও বলিত। কালে উক্ত বহু দূর ব্যাপী প্রাচীরকে লোকে "কমল নয়ানের বেড়" বলিত। বেড় বলার কারণ এই যে, সে সময় বাঁধা রাস্তা অতি অল্পই ছিল, লোকে আবশ্যক মত অন্যের জমীর উপর দিয়া সুবিধামত গমনাগমন করিত, কিন্তু নয়ান চাঁদের জমী প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় সেখানে বহু দূর বেষ্টন করিয়া যাইতে লোকের বড় অসুবিধা হইত, তাই উঁহাকে রহস্য ভাবে কমল নয়ানের বেড় বলিত। তখন বড়বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, মুল্লুক চাঁদ ক্ষেত্রী (বাবু দামোদর দাস বর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ) মুরসিদাবাদ হইতে আসিয়া মল্লিকদের প্রতিবাসী হইয়া উভয়ে বড়বাজারের পত্তন করেন।

ব্যর্থ আশা, তপ্ত পাপ,
অনাহূত অভিশাপ,
সকলি জুড়াবে গিয়া আদরে তোমার!

৫

কিন্তু তুমি কোন্ শূন্যে,
কিবা ধর্ম্ম, কিবা পুণ্যে,
কত কর্ম্ম ফল শেষে পশিব সেথায়?—
কত জন্ম মৃত্যু বহি,
কত বা অসহ্য সহি,
সে শুভ নির্ব্বাণ মুক্তি মিলিবে কোথায়?

৬

তাই শুধু দাও ক'য়ে,
আরো থাকি—আরো স'য়ে,
চ'লে যাক্ ক্ষুদ্র তরী মহা স্রোত ভরে,
অলক্ষ্যে থাকিও সাথে,
শুভাশীষ দিও মাথে,
তুমি যে আমারি, তাই বল ভাল ক'রে।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

দেবী-সূক্ত।

ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাঙ্‌নাম্নী কোন মন্ত্রদ্রষ্ট্রী কর্ত্তৃক রচিত কয়েকটী ঋক্, দেবীসূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের মধ্য হইতে কি কারণে এই কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত হইয়া, পৌরাণিক চণ্ডী-মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য, স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, চণ্ডীর কোন ব্যাখ্যায় অথবা অন্যত্র তাহার সমীচীন কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট নাই। চণ্ডীতে এই দেবীসূক্তের উল্লেখ আছে যথাঃ—

"সন্দর্শনার্থ মম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবী-সূক্তং পরংজপন্॥"

চণ্ডীর প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় "পরং দেবীসূক্তং" অর্থে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র বিশেষ লিখিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের দ্বারা প্রতীতি হয় যে, চণ্ডী রচনা কালে এই কয়েকটী ঋক্ ভগবতীর উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। দেবীসূক্তের ষষ্ঠ ঋকের সায়ণ-কৃত ভাষ্যে মহাদেব-কৃত ত্রিপুরাসুর বিজয়ের উল্লেখ আছে। সায়ণ "রুদ্র" অর্থে "মহাদেব" এবং "শরবে" অর্থে "ত্রিপুর-নিবাসী-অসুর" লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই জন্য, এই কয়েকটী ঋক্, চণ্ডী মাহাত্ম্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল।

সায়ণাচার্য্য এই ঋক্ সমূহের ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই বলিতেছেন—

"অম্ভৃণ মহর্ষির ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্না বাঙনাম্নী দুহিতা স্বীয় আত্মার স্তুতি করিতেছেন, এই জন্য তাঁহাকে ঋষি বলা হইয়াছে। সচ্চিৎ-সুখাত্মক এবং সর্ব্ব-গত পরমাত্মা এই ঋক্ সমূহের দেবতা। এই ঋষি-ললনা সেই পরমাত্মার সহিত আপনার একাত্ম ভাব অনুভব করিয়া পরমাত্মার স্তব করিতেছেন।"

ঋগ্বেদের অন্তর্গত অপালার বৃত্তান্ত প্রভৃতি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঋগ্বেদের ঋক্ স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক রচিত (দৃষ্ট) হইয়াছিল। সেই সকল ব্রহ্ম-বিদুষী মহিলা ঋগ্বেদে ঋষি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দেবীসূক্ত-রচয়িত্রী ঋষি-দুহিতা বাক্ এই প্রকার ঋষি ছিলেন। ইদানীন্তন সময়ে আমরা অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী; কিন্তু বৈদিক যুগে মহিলাগণও ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উপাস্য দেবতা-সম্বন্ধে পৌত্তলিকতার আপত্তি

উঠিতে পারে, কিন্তু দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য দেবতার বিষয় ধ্যান করিলে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় পরমাত্ম ভাবে বিভোর হইয়া সেই বিরাট পুরুষের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়, এবং হিন্দু জাতির পূতাদপি পূত গ্রন্থের অপৌরুষেয়ত্বের প্রতি সন্দেহ নিরস্ত হইয়া যায়।

দেবীসূক্তের ঋক্ সংখ্যা অষ্ট; ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ঋক্ জগতীচ্ছন্দে এবং অবশিষ্ট ঋক্গুলি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। আমরা দেবীসূক্তের একটী যথাশক্তি পদ্যানুবাদ নিম্নে প্রকটিত করিতেছি,—

১

আমি——
একাদশ রুদ্র অষ্টবসু রূপে
করিতেছি বিচরণ।
দ্বাদশ আদিত্য বিশ্বদেবগণ
স্বরূপে করি ভ্রমণ।
মিত্র ও বরুণ ধরিতেছি আমি
পুরন্দর হুতাশন।
অশ্বিনীকুমার উভয়ই আমি
ধরিতেছি সর্ব্বক্ষণ॥

২

আমি——
শত্রু-নাশকারী দেবতাত্ম সোম
ত্বষ্টা পূষা ভগ আর।
হবির্যুক্ত যিনি দেবে হবির্দাতা
সোমাভিষব যাঁহার;
হেন যজমানে ধনদান করি,
আমি যজ্ঞ ফলাধার॥

৩

আমি——
সর্ব্ব বিশ্বেশ্বরী দিয়া বহু ধন
তুষি উপাসক-গণে।
যজ্ঞার্হ-প্রধান সদাই তন্ময়
সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম-জ্ঞানে।
বহু ভাবে আমি প্রবেশিয়া আছি
সর্ব্ববিধ জীবগণে।
করেউপাসনা মম বিশ্বরূপ
দেবগণ বহু স্থানে॥

৪

আমি——
ভোজন শ্রবণ করি দরশন,
আমিই সবার প্রাণ।
আমাকে যাহারা জানেনা, তাহারা
সংসারের অতীব হীন।
দুর্লভ শ্রদ্ধেয় মম এই বাণী
শ্রবণ কর হে বিদ্বান।

৫

স্বয়ং——
মানব দেবতা—— সেবিত, পরম
ব্রহ্ম কথা কহি আমি।
মম ইচ্ছা হয় বাঁচাতে যাঁহারে
তাঁরে শ্রেষ্ঠ করি আমি।
তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তত্ত্বদর্শী ঋষি
সুমেধা হয়েন তিনি॥

৬

মহাদেব যবে ব্রাহ্মণে-হিংসক
বিনাশে(ন্) ত্রিপুরাসুরে।
আমি তাঁর ধনুঃ করিনু বিস্তার
অসুর বিনাশ তরে।
আমি যুদ্ধ করি স্তোতৃ-জন হেতু
প্রবিষ্ট বিশ্ব ভিতরে।

৭

আমি——
পরমাত্মোপরি স্থিত যে আকাশ
প্রসব করেছি তাহা।
আমি সে কারণ ত্রিভুবন মধ্যে
ভূত সমুদায় যাহা।
প্রকৃতি ভুবনে আমিই, স্বরগ
স্পর্শিছে মায়িক কায়া।*

৮

আমি——
সকল ভুবন সমুদয় প্রাণী
সৃজিয়া, পবন যথা
অপরের দ্বারা চালিত না হয়,
বর্ত্তমান আছি তথা।
বিশ্ববিকারের পরপারে আছি
আমিই স্বয়ং নির্লিপ্তা॥

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

* সায়ণ এই ঋকের নানাবিধ অর্থ করিয়াছেন যথা—

(১) এই ভূলোকের উপরিস্থিত আকাশ আমি প্রসব করিয়াছি। সমুদ্রের জল মধ্যে আমার কারণভূত অম্ভৃণাখ্যে ঋষি বাস করিতেছেন।

(২) সমুদ্র অর্থাৎ অন্তরীক্ষে দেবশরীর সকলে মূল কারণভূত যে চৈতন্য রহিয়াছেন, আমি তাহার কারণাত্মিকা হইয়া সকল ভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছি।

কয়লার খনি। (৫)

দূষিত বায়ু বা গ্যাস্।

সমস্ত কয়লার খনিতে বায়ু সঞ্চালন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালন না হইলে খনির মধ্যে উত্তাপ অধিক হয় এবং কুলীগণের পক্ষে কয়লা কাটাই কষ্টকর হইয়া উঠে। অতএব যাহাতে কয়লার খাদে বিশুদ্ধ বায়ু উত্তমরূপে গতিবিধি করিতে পারে, অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য একটী সিঁড়ি খাদ কিম্বা একটী পীট খাদ খনন হইবামাত্র, যাহাতে অপর একটী খাদ খনন হইয়া অনতিবিলম্বে দুইটীর সংযোগ হয়, তাহার উপায় করিবে। বিলাতে গভীরতর খনি সমূহে up-cast (অর্থাৎ যদ্দারা খনির বায়ু নিঃসরণ হয়) এবং down-cast (অর্থাৎ যদ্দারা খনির ভিতর বায়ু প্রবেশ করে) কূপ বিশিষ্ট খনির দ্বারা বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে রাণীগঞ্জ ও মানভূম জেলার ঝরিয়া অঞ্চলের খনি সমূহে বায়ু সঞ্চালনের কোন প্রকার অভাব দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ ৮।১০ ফিটের কম পরিমাণের কয়লার উচ্চতা বিশিষ্ট খনিতে কার্য্য করা হয় না এবং উহাতে যে পরিমাণ কুলীর দ্বারা কয়লা উত্তোলন করা হয়, উহাতে খনি সমূহ অল্প বায়ু প্রযুক্ত অধিক উত্তাপিত হইতে পারে না। কোন কোন সময়ে ইহা দেখা গিয়াছে যে, খনিতে অল্প বায়ু বশতঃ আলো নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে এবং উহা দূরীকরণ অভিপ্রায়ে উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করতঃ একটী Air-shaft অর্থাৎ বায়ু নির্গমনের কূপ খনন দ্বারাই বায়ুর অভাব দূর হইয়াছে। খনির মধ্যে একটী বাতি লইয়া গেলে এবং তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে কোন্ দিক হইতে বায়ুর গতি কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বায়ুর গতি নির্দ্ধারিত হইলে, খনির কোন্ ভাগে বায়ুর ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে, তাহা অপনয়ন করিবার নিমিত্ত সুঁদ পরদা দিয়া আবদ্ধ করতঃ, বায়ুর গতি যে স্থানে অল্প পরিমাণ অনুমিত হয়, তথায় লইয়া যাওয়া যায়। এবম্প্রকারে পরদা সংযোজন করিয়া, খনির যে স্থানে কম বায়ু প্রবাহিত হয়, তথায় অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

যে খনিতে বায়ুর নিতান্ত অল্পাধিক্য বোধগম্য হয়, তথায় বায়ু-সঞ্চালিত Fan, shaft engine দ্বারা পরিচালন করতঃ নল (pipe) সহযোগে অধিক পরিমাণ বায়ু প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং খাদের মধ্যে কোন দূষিত গ্যাস্ কিম্বা অন্য কোন প্রকার প্রাণহানিকর বাষ্প থাকিলে উহা দূরীভূত করিয়া দেয়। যে সমস্ত খাদে অস্বাস্থ্যকর বায়ু বা গ্যাস অনুভূত হয়, তথায় Fan প্রবর্ত্তিত করিয়া দূষিত বায়ু দূর করাই সঙ্গত। অন্যূন দশ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে কোন খনিতে দূষিত গ্যাস্ বাহির হইয়া ৮।১০ জন ব্যক্তিকে অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিয়াছিল, এবং ঐ দূষিত বায়ুর অপনয়ন কার্য্য fan দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। দূষিত গ্যাস্ খাদে নানা প্রকার আছে। তন্মধ্যে এক প্রকার গ্যাস্

কয়লার চালের সন্নিকটে থাকে। উহা চালের কয়লার সিউনির মধ্য হইতে সময় সময় বাহির হয়। উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য Davy's, Clanny's কিম্বা Stephenson's ল্যাম্প্ খনি সমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ল্যাম্পের নিম্নদেশে আলোটী টানিয়া নিবাইয়া দিবার জন্য একটী লৌহ কিম্বা তাম্র শলাকা আছে। উক্ত ল্যাম্প্ জ্বালিয়া যে স্থানে দূষিত গ্যাস্ বা দূষিত বায়ু পরীক্ষা করিতে হইবে, তথায় গমন করিলে আলোর মধ্যস্থিত সমস্ত স্থান জ্বলিয়া উঠিবে, এবং ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য ল্যাম্পের নিম্নপ্রদেশের শলাকাটী টানিয়া দিবামাত্রই ল্যাম্পের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, কিন্তু সময়ে সময়ে দূষিত গ্যাস্ অধিক পরিমাণে খনি সমূহে জড় হইয়া থাকিলে ল্যাম্পের বাতি নির্ব্বাপিত হইয়া গেলেও ল্যাম্পের ভিতরে কিছুক্ষণ অগ্নিময় পরিলক্ষিত হয়। যখন উক্ত প্রকার দূষিত গ্যাস্ খনির কোন স্থানে আছে বলিয়া অনুমিত হইবে, তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্থান হইতে অধিক অন্তরে গমন করিবে। কোন খাদে দূষিত বায়ু দ্বারা কয়লার স্তম্ভে কিম্বা খনির গাত্রে প্রজ্জ্বলিত আলো দৃষ্ট হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রজ্জ্বলিত স্থানে জল ছিটাইয়া না দিয়া দুর হইতে কর্দ্দম এবং বালি নিক্ষেপ করিবে।

যখন এবম্প্রকারে কোন প্রকার অগ্নিচিহ্ন পরিলক্ষিত না হইবে, তখন ঐ কয়লার স্তম্ভে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ কর্দ্দম লেপন করিয়া উক্ত স্থানে কয়লা কাটাই বন্ধ করিয়া দিবে। গ্যাস্ যে সমস্ত খনিতে অধিক পরিমাণে সমবেত হয়, তথায় কুলীগণের কয়লা কাটা কিম্বা অন্য কোন কার্য্য করা দুষ্কর হইয়া উঠে। এই জন্য প্রত্যেক কয়লার খনিতে যাহাতে দূষিত বায়ুর উৎপত্তি না হয়, তাহার প্রতিবিধান করা ম্যানেজারের কর্ত্তব্য। প্রতিবিধানের উপায় অনেক আছে; তাহার দুই একটী পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, খনির ম্যানেজার কিম্বা অধিস্বামীর অনবধানতা বশতঃ খনিতে অগ্নি কিম্বা গ্যাস প্রযুক্ত অগ্নি লইয়া সমস্ত খনি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ এবম্প্রকার খনিতে অগ্নি লাগিয়া তাহা বর্ষাগমে প্রবল জলস্রোত ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে নির্ব্বাপিত হয় না। খনিতে আগুন লাগিলে যে স্থলে নিরেট্ কয়লা (solid coal) আছে, (অর্থাৎ কোন প্রকার সুঁদ চলিয়া বায়ু সমাগমের পথ প্রশস্ত হয় নাই) সেই স্থানে নিরেট কয়লায় আগুন লাগিতে পারে না। খনি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কোন প্রকার পচা কাষ্ঠ, ন্যাকড়া, অনেক দিনের সঞ্চিত দুর্গন্ধ জল,, ভগ্ন কয়লা-মিশ্রিত প্রস্তর, মৃতদেহ এবং পুরাতন স্তূপাকার কয়লার গুড়া (dust) কখনও খনিতে রাখিতে দিবে না। উহা অনতিবিলম্বে খনির অভ্যন্তর হইতে উঠাইয়া দূরে ফেলিয়া দিবে। সময় সময় কুলীগণ কয়লার খাদের পরিত্যক্ত স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া খনির বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। ইহার প্রতিরোধ যাহাতে হয়, আগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন (oxygen) গ্যাস মিশ্রিত থাকে এবং উহার মধ্যে কিঞ্চিৎ কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ (Nitrogen) গ্যাস্ ও বাষ্প

মিশ্রিত লক্ষিত হয়। অক্সিজেন গ্যাসের দ্বারা প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। নাইট্রোজেন গ্যাস কেবল অক্সিজেনকে তরল অবস্থায় রাখিয়া দেয়। নাইট্রোজেন শতকরা ৭৯ এবং অক্সিজেন শতকরা ২১ শুষ্ক জলশূন্য বায়ুতে পরিলক্ষিত হয়। কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ গ্যাসকে ইংলণ্ডে কয়লা-কাটা কুলীগণ ইংরাজিতে black or chokedamp কহে। কিন্তু যাহাকে ব্ল্যাক্ ড্যাম্প কহে, তাহা জলীয় স্থান সম্ভূত গ্যাস্ এবং অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন ও সামান্য পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ুতে সংঘটিত হইয়াছে। যখন কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ গ্যাস্ অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তখন প্রাণিগণের নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিতে কষ্ট বোধ হয় এবং যথায় এই গ্যাসের অভ্যুদয় হয়, তথায় আলো নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ বায়ু হইতে ওজন আধিক্যবশতঃ খনির নিম্নপ্রদেশে অবস্থিতি করে এবং যেখানে আলো না জ্বলিবে, সেখানে ইহার আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। অক্সিজেনের অল্লাধিক্যবশতঃ ব্ল্যাক্ড্যাম্প নামক গ্যাস ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিলে জ্ঞানশক্তির অপচয় হয় এবং পুনরায় তাহাকে পরিষ্কার বায়ুতে লইয়া আসিলে ২।১বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টানিলে জ্ঞানশক্তির পুনরুত্থান হইয়া থাকে। আরও দুই তিন প্রকার গ্যাস্ আছে, যাহার প্রতিবিধান না করিলে জীবন মারাত্মক হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্গদেশের খনিসমূহে দুই একটী স্থান ভিন্ন প্রায়ই দূষিত গ্যাস্ দৃষ্টিগোচর হয় না, তজ্জন্য এই প্রবন্ধে উহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হইলাম। খনির গভীরতা যত অধিক হইবে, তত অধিক পরিমাণে তাহাতে বায়ুর প্রবলতা হইয়া থাকে এবং প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা খনিসমূহে বায়ুর চলাচল রাখাই শ্রেয়ঃ। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, খনির উত্তাপ ঋতুর সকল সময়েই এক ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। তজ্জন্য শীত ঋতুতে খনির উত্তাপ উপরিস্থিত শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে উপরিস্থ বায়ু হইতে শীতল অনুভূত হইয়া থাকে। কয়লার খনি সমূহের উত্তাপ কেবল জনতা এবং লোকসংখ্যা আধিক্যবশতঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিলারকাটিং (Pillar-cutting.)

খনিরকার্য্য মধ্যে পিলার-কাটিং কার্য্য অতি গুরুতর এবং আশঙ্কাপ্রদ। পিলার-কাটিং কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সমস্ত খনি সার্ভে করিয়া প্ল্যান করিতে হইবে এবং প্ল্যান করিয়া প্রত্যেক পিলারের নম্বর প্ল্যানে অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপর নিম্ন হইতে আউটক্রপের দিকে পিলার-কাটিং কার্য্য আরম্ভ করিবে। এক একটী পিলারের চতুষ্পার্শ্বে গোলাকার শক্ত রোলা কাষ্ঠ চালের অবস্থানুসারে ৩।৪ ফুট অন্তর লাগাইবে এবং প্ল্যানের ক্রমিক নম্বর অনুসারে অবস্থাভেদে পিলার কাটিং আরম্ভ করিবে। পিলালের চতুষ্পার্শ্বে যে গোলাকার রোলাকাষ্ঠ লাগাইবে; উহার মাথায় ৪ ফুট দৈর্ঘ্য, ৪।৫ ইঞ্চি পরিসর এবং ৪ ইঞ্চি পুরু কাষ্ঠ চালে দিয়া ঐ গোলাকার কাষ্ঠ উহার নিম্নে দিয়া শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবে। পিলার কাটিংএর সময় একজন ছুতার মিস্ত্রিকে অনবরত খনির মধ্যে তাহার সাহায্যকারী কুলীর সহিত রাখিয়া কাষ্ঠ প্রস্তুত করাইবে এবং ঐ কাষ্ঠ লাগাইবার

অন্য ৩।৪ ফিট উচ্চ কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্ল্যাটফ্রম, যাহাকে কুলীরা ঘোড়া বলে, খাদের মধ্যে প্রস্তুত রাখিবে। যখন যে স্থলে চালে কাঠ লাগাইতে হইবে, তখন ঐ প্ল্যাট্‌ফর্‌মে উঠিয়া কাঠ লাগাইবে। পিলারের চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গোলাকার কাঠ লাগাইবার পর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, ঐ সমস্ত কাঠগুলি শক্ত অবস্থায় লাগান রহিয়াছে কি না। যদি ঐ কাষ্ঠের মধ্যে কোনটী নড় চড় ভাবে থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহাকে স্থানান্তরিত কিম্বা অন্য উপায়ে শক্ত করিয়া দিবে। পিলারের কয়লা কাটিবার সময়ে একজন হুঁসিয়ার সর্দ্দারকে তথায় নিয়োজিত করিয়া রাখিবে। কোন প্রকার পিলারের কয়লা কুলীদিগের গাত্রে হঠাৎ না পড়িয়া যায়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং পিলারের পার্শ্ব যেমন কাটাই হইবে, তেমন পরিসরের অবস্থা বুঝিয়া, পুনরায় আর এক শ্রেণী কাঠ পিলারের নিকটে লাগাইয়া দিবে। এই প্রকারে পিলারের চতুষ্পার্শ্বে যেমন কয়লা কাটাই হইবে, তেমন কাঠের লাইনও অগ্রসর করিয়া লইবে। যখন পিলারের সমস্ত কয়লা কাটিয়া বাহির করা হইবে, তখন সমস্ত কুলীদিগকে ঐ স্থান হইতে দূরে সরাইয়া দিবে। এই প্রকারে যখন দুই লাইন অগ্র পশ্চাৎ পিলার কাটিয়া নিঃশেষিত হইবে, সেই সময়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে কাঠ ছাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবে। সমস্ত কাঠ যখন ছাড়ান হইয়া যাইবে, তখন চাল পড়িবার পূর্ব্বে চালের উপরিস্থিত দুই একটী কয়লার চাপ অগ্রে পড়িয়া চট্‌ চট্‌ শব্দ দ্বারা চাল যে অল্পক্ষণ পরে পড়িয়া যাইবে, উহা অনুমিত হইবে। যখন চাল পড়িবে, তখন কোন কুলীকে খনির মধ্যে উহার নিকটে থাকিতে দিবে না। বর্ষাগমে পিলার কাটিং একবারে নিষিদ্ধ। যখন বর্ষা না থাকিবে, তখন পিলার কাটিং কার্য্য করা প্রশস্ত। যে স্থলে কয়লার খাড়াই ১০।১২ ফুট হইতে অধিক, সেই সমস্ত খনিতে পিলার কাটিং করিবার সময় অগ্রে কয়লার সিমের উচ্চতা অনুযায়ী গোলাকার রোলা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া এবং কাঠের প্ল্যাটফরমের পরিবর্ত্তে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া উহার সাহায্যে ঐ প্রকার খাদে পিলারের চতুষ্পার্শ্বে কাষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দিবে। যে স্থলে ধাক্কা দিয়া কাঠ ছাড়াই করিতে আশঙ্কাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, তথায় আঁকুশী দ্বারা কাঠ ছাড়ান যুক্তিসঙ্গত। খনির মধ্যে ডাইক কিম্বা ফল্‌ট থাকিলে খাদের উপরিস্থিত জমি সমানভাবে পতিত হইতে পারে না। এবং যেস্থলে চাল শক্ত না থাকে, তথায় পিলার কাটিং কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় না। কারণ তথায় একটী কিম্বা দুইটী পিলার কাটিলেই চাল পড়িতে আরম্ভ হয় এবং ঐ চাল পড়িবার সুরু হইয়া নিকটস্থ পিলার কাটিবার ব্যাঘাৎ জন্মাইয়া দেয়। যে স্থানে পিলার কাটিং হইয়া যাইবে, সেই স্থানের চাল পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার উপরিস্থ জমিতে কোন প্রকারে লোকজন যাইতে দিবে না এবং তৎপর ধ্বসকা স্থানের চতুর্দ্দিকে ফেন্‌সিং দিবে। যাহাতে মনুষ্য কিম্বা পশ্বাদি গমন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সিঁড়িখাদের ও পীট খাদের খনির মধ্যে প্রবেশের দ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অগ্রে পিলার কাটিং কার্য্য করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সমস্ত স্থানের পিলার

অন্য কিছু নাই, যাহা শরীরপতনের পরেও থাকিতে পারে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, মস্তিষ্ক ব্যতীত মনের অস্তিত্ব কি কোথাও দেখা গিয়াছে? মস্তিষ্কই মনের কারণ এবং মস্তিষ্কের সঙ্গেই মনের সম্পূর্ণ লোপ। প্রত্যক্ষ উদাহরণ ও প্রমাণাদি দ্বারা এই শ্রেণীর মহাত্মাদিগের সহিত তর্ক করিবার শক্তি সাধারণ লোকের নাই, স্থূল-জড়াতীত সূক্ষ্মরাজ্য সমূহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবই ইহার হেতু। যে সকল তত্বজ্ঞান-পিপাসু শক্তিমান ব্যক্তিগণ সূক্ষ্ম দেহাদিতে জড়জগৎ অতিক্রম করতঃ সূক্ষ্ম লোক সমূহে বিচরণ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই জড় পৃথিবী সম্বন্ধীয় জ্ঞান যেরূপ প্রত্যক্ষ, সূক্ষ্ম লোকাদির জ্ঞানও ঠিক তদ্রূপ। তাঁহাদের কথায় আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহি না, পারি না; যেমন পৃথিবীর গোলাকৃতি আজও বিস্তর লোক বুঝিতে পারেন না, সুতরাং বিশ্বাস করেন না।

যাঁহারা পৃথিবীর কোন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারা উল্লিখিত জড়বাদী মহাপ্রভুগণের তর্কযুক্তির উত্তরে বলেন, বিশ্বেশ্বরের সুবিশাল রাজ্য কি এই পরিদৃশ্যমান জড় সংসারেই পর্য্যবসিত? তাহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি স্বয়ং যেমন আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, তেমনি তাঁহার অনন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তর অংশ আছে, যাহা এ চক্ষে কিছুতেই দেখা যাইতে পারে না।

সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই দেহাতিরিক্ত একটা শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহা যে দেহান্তেও অটুট থাকে, ইহাও বিশ্বাস করেন; তাঁহাদের মতে ঐ শক্তিই দেহের প্রভু; জীবদ্দশায় দেহের দ্বারা যাহা কিছু করা যায়, সমস্তই সেই শক্তির প্রভাবে; এবং জীবন রক্ষা হেতু শরীরে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহারও মূলে ঐ শক্তি। ইঁহাদের মধ্যে দুই দল বিদ্যমান। একদল বলেন, মৃত্যুর পর উক্ত শক্তি জীবিতকালে উপার্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান সহ পরলোকে ক্রমাগত উন্নতির পথে ধাবিত হইবে, মানুষের এ পৃথিবীতে একবারই জন্ম, একবারই মৃত্যু। অপর দলের বিশ্বাস, আমাদিগকে এ পৃথিবীতে বহুবার আসিতে হইয়াছে, আরও কতবার আসিতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। এই জন্মজন্মান্তরবাদী ব্যক্তিগণ নানাবিধ যুক্তি সহকারে বলেন যে, এই দেহ কর্ম্মজ, সুতরাং কর্ম্মক্ষয় না হইলে কি প্রকারে ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব? কর্ম্মানুসারে মানুষকে বারম্বার নানা অবস্থায় নানারূপ মূর্ত্তিতে এই পৃথিবীতে আসিতেই হইবে, যাবত কর্ম্মের জের মিটিয়া জীবন্মুক্তি লাভ না ঘটিতেছে। এই মতের সমর্থন হেতু তাঁহারা যেমন বিস্তর সুযুক্তি দেখাইয়া থাকেন, তেমনি অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণাদিও উপস্থিত করিতে ত্রুটি করেন না। অধুনা একটী বিশেষ প্রকারের উদাহরণ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, বিচারের ভার তাঁহাদের হস্তে।

রেঙ্গুন গেজেটে প্রকাশিত :—

“১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রহ্মদেশের পেগু-খালের তীরবর্ত্তী ওয়াগ্রামে পেগু জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টাকার সাহেব কতকগুলি ডাকাইত কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার খণ্ড বিখণ্ডিত দেহ পেগুনগরে আনীত হইয়া ইংরাজদের গোরস্থানে সমাহিত হয়। সে সময় এই লোমহর্ষণ ব্যাপার জন্য দেশে একটা হলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। পার্থিব সকল বিষয়ের ন্যায় কালে উহাও বিস্মৃতিসাগরে

ডুবিয়া যায়; কিন্তু এক্ষণে একটী রহস্যজনক ঘটনা বশতঃ উহা আবার লোকের আলোচনার মধ্যে আসিয়াছে। ৺টাকার সাহেবের * পুনর্জ্জন্ম ইহার কারণ।”

ব্রহ্মদেশবাসী লোকেরা প্রায় সমস্তই হীনায়ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ; সুতরাং জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যাহাকে জাতিস্মর বলি, উহারা তাহাকে উইঞ্জা † নাম প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার সমূহ বলিতে পারে এবং উভয় জন্মের স্মৃতি সমানভাবে মস্তকে ধারণ করিতে সক্ষম, তাহাকে ব্রহ্মদেশের ভাষায় উইঞ্জা বলা হয়। পেগু জেলার কোন গ্রামে উক্ত টাকার সাহেব উইঞ্জারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; বালকের বয়স এখন প্রায় সাত বৎসর। গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসিগণের ধ্রুব বিশ্বাস যে, মৃত টাকার সাহেবের আত্মা ঐ উইঞ্জার দেহে বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি যে সুদৃঢ়, তাহা অস্বীকার করা নিতান্ত কঠিন, কারণ তিন চারি বৎসর বয়সকালে শিশু নানাবিধ জটিল ও আইনঘটিত বিষয়ের সমীচীন উত্তর প্রদানে শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিত; এবং ৺ টাকার সাহেব জীবদ্দশায় যে সকল ঘটনার সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ ছিলেন, তৎসমুদয়ের সঠিক বর্ণনা করতঃ আত্মীয় স্বজনের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল; এতদ্ব্যতীত তাহার মূর্ত্তি দ্বারা লোকের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে—বর্ণ, কেশ ও চক্ষুদ্বয় ঠিক ইংরাজের মত—সর্ব্বোপরি বিশিষ্ট প্রমাণ, তাহার শারীরিক চিহ্নগুলি এবং দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অভাব;—হত্যাকালে টাকার সাহেব দেহের যে যে স্থানে যেরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তদ্রূপ দাগসমূহ বর্ত্তমান, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিও দা দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়।

গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ, বিশেষ বালকের পিতা মাতা এই গভীর রহস্যের চূড়ান্ত মীমাংসার উদ্দেশ্য স্থির করেন যে, উহাকে পেগুনগরে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। চারিবৎসরের শিশু তথায় উপনীত হইলে ঠিক ঠাক বলিতে লাগিল—অমুক বাংলাতে অমুক সালে আমি অবস্থিতি করিয়াছিলাম, সেখানে অমুক সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়; অমুক স্থানে অমুক সময়ে বন্ধুগণ সহ পিকনিক্* সম্ভোগ করি;—দুই একটী প্রশ্নও করিল, যথা;—অমুক সাহেব এখনও পেগুতে আছেন কি না? ব্লাক্ সাহেব পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন কি না?—তদনন্তর ডাকাইতগণ যথায় তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, তথায় নীত হইলে কম্পান্বিত-কলেবরে হুবহু সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করতঃ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে চমকিত করিল;—এই স্থানে আক্রান্ত হয়, এইখানে আহত হয়, এইস্থানে ভূমে পাতিত হয়, ইত্যাদি। অবশেষে গোরস্থানে পঁহুছিলে দ্বিধাশূন্য ভাবে টাকার সাহেবের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখাইল, “এইখানে আমার দেহ সমাহিত হয়।” এই সকল বর্ণনা কালে তাহার গম্ভীর চিন্তাশীল ভাব দেখিয়া দর্শক মাত্রকে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত যদি সত্য হয়, জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিতে চাহেন না, সত্যনির্দ্ধারণ উদ্দেশে তাঁহাদের

---

* W. H. Tucker, late District Superintendent of Police, Pegu (Burma.)

† Winza.

* Picnic—প্রান্তর-উদ্যান বা উপবনে পান-ভোজনাদি আমোদ।

বর্ম্মা, ব্রহ্মদেশীয় এই বালকের বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান করেন।

এখন কথা এই যে, এত শীঘ্র কি আমাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়? তাহা হইলে লোকলোকান্তর পরিভ্রমণ, স্বর্গনরকাদি ভোগ কি মানুষের কল্পনা মাত্র? যদিও আমাদের কোন এক শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মানবাত্মা কোন প্রকার ফল শস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তৎসহ জীবের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় দেহ ধারণ করে; কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত মত এই যে, দেহান্ত হইবার পরে আত্মা অল্প বিস্তর কাল স্বর্গনরকাদি নানা লোক ভ্রমণ করনান্তর পুনরায় ইহলোকে আগমন করে। পরলোকবাসের ঐ সময়ের পরিমাণ অতি সামান্য কাল হইতে দুই এক সহস্র বৎসর বা ততোধিক হইতে পারে। যাহা হউক, কর্ম্মানুসারে কাহাকে কতদিন পরলোকে থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা বিধাতা বা তাঁহার অনুগৃহীত মহাত্মাগণ ভিন্ন আর কাহার বলিবার শক্তি সম্ভবে? পশ্চিম দেশের লোকে বলে,

"পাঁড়ে ভটকৃতে হ্যাঁয়, হাজারোঁ পণ্ডত,
লাখোঁ মোল্লা, কোড়োরোঁ শেয়ানে।
লকিন আখেরকোঁ যো দেখা ইয়ারোঁ।
খোদা কি বাতেঁ খোদাহি জানে।"

অর্থাৎ হাজার হাজার পণ্ডিত, লক্ষ লক্ষ মোল্লা, কোটি কোটি বুদ্ধিমান পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন, অবশেষে যাহা বুঝিলাম ভাই, তাহা এই যে, ভগবানের কথা ভগবানই জানেন।

বাস্তবিক কথাও তাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুসলমান ভ্রাতারা "খোদার গজব" বলিয়াই সর্ব্বপ্রকার রহস্যের সম্মুখে নিশ্চিন্ত থাকেন। সাধারণ লোকের পক্ষে ওটা এক প্রকার মন্দ নয়;—বুঝিতে চেষ্টা করিতে গিয়া তাহারা কেবল হাঁকুপাঁকু করিয়া বিষম অশান্তি ভোগ করিয়া মরে, অথচ যেখানকার, সেইখানেই থাকে।

মায়ামোহের নেশাতে বিভোর অবস্থায় আমরা ধূলাখেলায় মত্ত হইয়া কোন প্রকারে সংসারের দিন কয়টা কাটাই, এই বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে কোন চিন্তা করি না; কিন্তু ক্ষুদ্র মস্তক লইয়া যদি কেহ ইহার বিষয় ভাবিতে বসে, তাহার নিশ্চয় পাগল হইবার কথা। বোধ হয়, কেবল সেই কারণে দয়াময় আমাদিগকে সংসারের মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মদিরামত্ত জীবগণের মধ্যে কেহ বা নিজের পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে অস্থির হইয়া অপরকে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, কেহ বা সবজান্তা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভ্রাতৃবর্গকে কত প্রকার উপদেশ দিতেছেন; কত মজাই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি।

আজ কাল অনেকেই ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অনেকেই প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু, বিষয়টী অতি দুরূহ, জানি না, কে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়া-

ছেন। বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র যাহাই বলুন, এই সমস্যার সত্যতা এক বাক্যে কেহ যে নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ করি, কেহই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন না। যদি কেহ অন্তর্জগতে একবার মিলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে পারেন, তবে তিনিই ব্রহ্ম এবং জগৎ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবার একটী তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ; কিন্তু এমন সিদ্ধাত্মা মানব আজ পর্য্যন্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত মত, অনন্ত যুক্তি, একে অন্যে ঐক্য নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখ, ব্রহ্ম এবং জগৎ সম্বন্ধে এক বাক্যে স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই নাই।

তুমি শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা দেখাইতেছ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; আমি অধিক পারি আর নাইবা পারি, দুই একটী শাস্ত্রীয় বাক্য এবং যুক্তি দ্বারা দেখাইব, ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎও সত্য।

বেদ বলেন, সৃষ্টিকার্য্য দ্বিবিধ, এক ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি, আর এক ব্রহ্মা কৃত সৃষ্টি; উভয়ই জগৎ সৃষ্টিকার্য্য। এই দ্বিগুণিত সৃষ্টির আকৃতিতে কিরূপ বৈষম্য, তাহা ভাবিয়া একবার দেখা উচিত।

মহাপ্রলয়ের পরে যে সৃষ্টি তাহাই ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৮ম প্রপাঠকের ৬ষ্ঠ অনুবাদকে বলেন—

> সোহকাময়ত বহু সাং ব্রজায়েয়েয়েতি। সতপোতপ্যত। সতপঃতপ্ত্বা ইদংসর্ব্ব মসৃজত যদিদংকিঞ্চ তৎদৃষ্টা তদেবানু প্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ।"

ইহার সংক্ষেপ ভাবার্থ এই, কাম সংস্কারবতী মায়া দ্বারা ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন, "আমি এক বহু হই।" অমনি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী পুরুষও হইল, ইহাই ব্রহ্মকৃত সৃষ্টির সূত্রপাত। এই সূত্র দ্বারা বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে, ব্রহ্মকৃত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী পুরুষ, ব্রহ্মের মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এই ব্রহ্মমায়া শক্তিইত জগৎ। ব্রহ্মে মায়া শক্তি ছিল, তাই কামসংস্কারবতী মায়া দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, মায়া শক্তি ব্রহ্মে না থাকিলে ব্রহ্ম কেবল মুখের কথায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। ব্রহ্ম ছিলেন, কি আছেন, অথবা চিরকাল থাকিবেন; তাই বলিতে হইয়াছে, ব্রহ্মমায়া শক্তিও ছিলেন, কি আছেন, অথবা অনাদিকাল পর্য্যন্তও থাকিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> "নাসতো বিদ্যতেভাবোনা ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
> উভয়োরপি দৃষ্টোহন্ত স্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"

যাহা ছিলনা, তাহা হয় না, এবং যাহা বর্ত্তমান, তাহার অভাব হয় না। বীজ না থাকিলে কোন বস্তুর সৃষ্টি হইতে পারে কি? ব্রহ্ম সত্য হইলে তাঁহার জগৎ মায়া শক্তি বীজও সত্য।

মহাপ্রলয়ের পরই ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি হইয়াছে। মহাপ্রলয়ই প্রকৃতির অব্যক্ত ভাব (তিরোভাব)। ব্রহ্মকৃত সৃষ্টিই আদি সৃষ্টি, ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মের মায়া শক্তি বা প্রকৃতি কিছুই ব্যক্ত ভাবে ছিলেন না, এই অবস্থাকেই মহাপ্রলয় সিদ্ধান্ত করা যায়। সে সময় কেবল এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, মায়া বা প্রকৃতি শক্তি অব্যক্তভাবে ছিলেন; ছিলেন কোথা? সেই অনাদি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই একীভূত ছিলেন। ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবেই হউক, যখন মায়া

শক্তি বা প্রকৃতির অস্তিত্ব ব্রহ্মে একীভূত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতেছে, তখন তাহা অসত্য বলিয়া কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে? সত্য বস্তু হইতে অসত্য একটী বস্তু উদ্ভব হইতে পারে কি? যদি বল পারে, তবে সত্যের সত্যতা রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তর্ক স্থলে বলিতে পার, ব্রহ্ম সত্য কিন্তু ব্রহ্মের বিভূতি মায়া শক্তি বা প্রকৃতি অসত্য, কেন না, মায়াশক্তি বা প্রকৃতির ধ্বংস আছে। যে বস্তু বিনাশশীল, সেই বস্তুই অসত্য, ইহা স্বীকার্য্য।

ব্রহ্ম মায়া শক্তি বা প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব কি না? যদি বল, তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তবে বলিতে হয়, ব্রহ্মের আর অন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সুতরাং ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলা যাইতে পারিল না, ব্রহ্ম হইতে জগৎ পৃথক ভাবিতে হইল। শাস্ত্র কি যুক্তিতে এরূপ সিদ্ধান্ত বোধ করি কেহই করিতে পারেন না। মায়া শক্তি বা প্রকৃতি ব্রহ্মে যে একীভূত ছিল, ইহা অভ্রান্ত বাক্য; কেননা, তাহা না হইলে ব্রহ্মের সৃষ্টি কার্য্যে মায়াশক্তি বা প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্মে ঐ মায়াশক্তি বা প্রকৃতি বীজ অব্যক্ত ভাবে না থাকিলে ব্রহ্ম কখনই জগৎসৃষ্টি করিতে পারিতেন না। ঐ বীজ স্বরূপ মায়া বা প্রকৃতি ব্যক্তে, জগৎ অব্যক্তে তাহা আবার ব্রহ্মে একীভূত থাকে; ইহা সত্য, অতি সত্য; কিন্তু মায়াশক্তি বা প্রকৃতির এইরূপ একীভূত অব্যক্ত অবস্থাকে কি মিথ্যা বলা যায়? চক্‌মকি পাথর হইতে যখন অগ্নি প্রকাশ হয়, তখন তাহা সত্য, আর যখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাহা কি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে পারে? মিথ্যা হইলে কখনো তাহা হইতে আবার সেই অগ্নির উদ্গীরণ হইত না। প্রলয় কালেওত ব্রহ্ম অব্যক্ত অবস্থায় থাকেন, তবে ব্রহ্মের অব্যক্ত অবস্থাকে মিথ্যা বলিতে হইবে নাকি? কোন্ সাহসে বলিব, ব্রহ্মের অব্যক্ত অবস্থা মিথ্যা, কোন্ সাহসে বলিব, ব্রহ্মের মায়াশক্তি বা প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা মিথ্যা? ব্যক্ত অব্যক্ত সকল অবস্থাই সত্য।

জগৎ কার্য্যের উপর একমাত্র প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—

"প্রকৃতিঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃকর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

প্রকৃতিই সমস্ত জগৎ কার্য্যের কর্ত্রী, আত্মা কেবল অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল কার্য্যকে নিজের বলিয়া বিবেচনা করেন।

জগৎ কার্য্যের উপর ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া যে ঈশ্বর নাই, একথা বলিতে পারি না; কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় আমরা অনুমান করিতে পারি। পাতঞ্জলী বলেন—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।" ঈশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞের বীজস্বরূপ হইলেন, তখন এবীজ যদি মিথ্যা হয়, তবে জগৎও মিথ্যা বলিয়া আরোপিত করিতে পার; নতুবা তার হেতুবাদ আর কি হইতে পারে?

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ বলেন—"পরমাণুসমষ্টিই জগতের মূল, পরমাণুর পরস্পর সম্মিলনেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সকল পরমাণুই অবিনশ্বর; মহর্ষি কপিল যেমন প্রকৃতি ও পুরুষকে নিত্য বলেন, মহর্ষি কণাদও তদ্রূপ "জল, বায়ু, পৃথিবী, তেজ, আকাশ, কাল, দিক, মন, ও আত্মা" এই নয়টী পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন"; তবে অনিত্য আর রহিল কি? সকলি সত্য। ভগবান মনু বলেন—

"আসীদিদন্ত মোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ সয়ম্ভূর্ভগবান ব্যক্তেব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" মনু ১।৫।৬

প্রলয়কালে জগৎ প্রকৃতিতে এভাবে লীন ছিল যে, তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণের অধীন ছিল না। সকল জগৎ যেন নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। প্রলয়ের পর সৃষ্টি সামর্থ্যকারী ও প্রকৃতি-প্রেরক সেই আদি পুরুষ স্বেচ্ছাকৃতে এই আকাশাদি পঞ্চভূত ও মহদাদি-তত্ত্ব, যাহা প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত ছিল, তাহা স্থূলরূপে প্রকাশ করিয়া আপনিই ব্যক্ত হইলেন। সূক্ষ্ম এবং নিদ্রিতাবস্থা একটী মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে কি? বিশেষতঃ যখন এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও মহদাদি তত্ত্ব স্থূলরূপে প্রকাশ করিয়া, তাহা আশ্রয়ে আবার সৃষ্টি কার্য্যে আপনি সেই আদি-পুরুষ ব্যক্ত হইলেন, তখন মিথ্যা বলিয়া আর একটী পদার্থ রহিল কৈ? ইহাতেও প্রণিধান হইতেছে, সকলি সত্য, যেমন ব্রহ্ম সত্য, তেমন জগৎও সত্য।

ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি বার বার হয় না; তাহা একবার মাত্র হইয়াছে, আর হইবে না। ঐ সৃষ্টি যে কখন হইয়াছে, তাহা বেদও বলিতে পারেন না। একবার যে হইয়াছে, এই টুকু বেদ বলেন। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ৪৮ সূক্তের ২২ মন্ত্র—

"সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদভূমি রজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানুজায়ত।"

একবার মাত্র দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছে, একবার মাত্র ভূলোক উৎপন্ন হইয়াছে, মরুৎগণের মাতা হইতে একবার মাত্র দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। এ সকল পদার্থ অন্য স্বরূপে বার বার হয় না, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিতে ঐ ঐ পদার্থের একই সদৃশ সৃষ্টি (আবির্ভাব) হইয়া থাকে। ইহাতেও সিদ্ধান্ত করা যায়, কোন পদার্থই মিথ্যা নহে; যেমন ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য।

খণ্ড প্রলয়ের পর যে সৃষ্টি, তাঁহাই ব্রহ্মাকৃত সৃষ্টি। এই প্রলয়ে জগৎবীজ কিছুই নষ্ট হয় না, একার্ণব জলে অবস্থিত থাকে; ব্রহ্মা ঐ একার্ণব জলকে ঘনীভূত করিয়া আবার পৃথিবী ইত্যাদি সর্ব্বলোক সৃষ্টি করেন। সাংখ্যকার বলেন—

"সৃষ্টি আবির্ভাব মাত্র।"

যাহা আবির্ভাব, তাহা তিরোভাব, ধ্বংস নহে। ব্রহ্মা যখন বার বার সৃষ্টি করেন, তখন ঠিক সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থেরই আবির্ভাব করেন মাত্র, নূতন কিছুই করিতে পারেন না। এই উক্তিটী বেদও বলেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৯০ সূক্তের ১।২।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোধ্যজায়ত।
ততোরাত্র্য জায়ত ততঃসমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসং বৎসরোঅজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ
পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ মথোস্বঃ॥"

ব্রহ্মা যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরপরবর্ত্তী সৃষ্টিতেও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বলেন—

"যদ্ যৎ পূর্ব্বামিহলোকে (ভবন্তি) সম্বভূবুঃ তদেব পুনরাগত্য ভবন্তি।"

তাই বলিতে হয়, একই বীজে বার বার সৃষ্টি আবির্ভাব হইতেছে, যখন বীজের বিনাশ নাই, তখন জগৎ মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না।

"অগ্নির যে লোহিত বর্ণ, তাহা সূক্ষ্ম তেজ পদার্থেরই রূপ, উহার যে শুক্লতা, তাহা

সূক্ষ্ম জলেরই রূপ,ইহাতে যে কৃষ্ণচ্ছায়া দেখি, তাহা পৃথিবীর পরমাণুর রূপ, এই সকল রূপ লইয়া অগ্নি। এইরূপ ছাড়িয়া দিলে অগ্নির আর অস্তিত্ব থাকে না।" স্বীকার করিলাম, ঐ সূক্ষ্ম শক্তিত্রয়ের গুণ যোগে অগ্নি লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছে, ঐ শক্তিত্রয় ছাড়িয়া দিলে, অগ্নির লোহিত বর্ণ, কি দাহিকা শক্তি কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না; কিন্তু কার্য্যকারণে যখন আবার ঐ গুণত্রয়, একত্রে সংযোগ করা যাইবে, তখন এই অগ্নির দাহিকা-শক্তি-বিশিষ্ট লোহিত বর্ণ হইবে, না অন্য আর কোনরূপ পদার্থ অন্য বর্ণাকারে হিম বিশিষ্ট হইবে? ইহা, বোধ করি, সকলেই স্বীকার করিবেন, সেই অগ্নিই স্বধর্ম্মে লোহিত বর্ণাকৃতি হইয়া পুনঃ আবির্ভূত হইবে, আর অন্য কোনরূপে অগ্নি উৎপন্ন হইবে না। ঐ গুণত্রয়, অগ্নি এবং তাহার লোহিত বর্ণের উপাদান কারণ; অগ্নি এবং তাহার লোহিত বর্ণ ঐ গুণত্রয়ের কার্য্য কারণ; ঐ গুণত্রয় শক্তি উপাদান কারণ যদি সত্য হয়, তবে কার্য্যকারণ অগ্নি এবং তাহার লোহিত বর্ণ ও দাহিকা শক্তি কেন সত্য হইবে না?

"এই প্রকার পৃথিবীর কৃষ্ণবর্ণ রূপটী শুক্লরূপাত্মক জল হইতে উৎপন্ন। জলের শুক্লতা লোহিত রূপাত্মক তেজ হইতে জাত। আর সেই লোহিত রূপাত্মক তেজও একমাত্র সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থের পৃথক অস্তিত্ব নাই, সকলি মিথ্যা, কেবল সেই ব্রহ্মপদার্থই সত্য।" ইহা কেমন করিয়াই বা স্বীকার করিতে পারি? অনন্তকাল পর্য্যন্ত যে যে শক্তির যেরূপ প্রক্রিয়া, তা হইবেই হইবে। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালে এমনও সময় উপস্থিত হইতে পারে, অগ্নি, জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি কোন পদার্থেরই স্ব স্ব ধর্ম্মশক্তি কিছুই বর্ত্তমান থাকিবে না; তিরোভাব হইবে। ইহাকেই প্রলয়-কাল বলা যায়। আবার যখন শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখন সেই সেই শক্তি আপন আপন ধর্ম্মে পুনঃ আবির্ভূত হইবে, ইহা অনিবার্য্য।

কোন কোন পদার্থের শক্তিগুণে যদি অন্য আর একটী পদার্থ উৎপদ্যমান হয়, তবে সেই উৎপদ্যমান পদার্থকে কি মিথ্যা বলা যাইতে পারে? সামান্য লৌকিক প্রক্রিয়ায়ও যেন দেখিতে পাই, মনে কর, কালো, ধবল, হরিতাল পদার্থের শক্তিতে সবুজ বর্ণের একটী পদার্থ উদ্ভূত হইল; এই সবুজ বর্ণের পদার্থ কি মিথ্যা কল্পনা? কালো, শাদা, হরিতাল পদার্থ পৃথক পৃথক করিলে সবুজ বর্ণের পদার্থ আর স্থির থাকিবে না সত্য, কিন্তু যখন আবার এই পদার্থত্রয় একত্র মিশ্রিত করা হইবে, তখনইত সেই সবুজবর্ণের পদার্থ উৎপন্ন হইবে; কালো, কি লাল বর্ণের কোন পদার্থ উৎপন্ন হইবে না। অতএব সবুজ বর্ণের পদার্থও মিথ্যা কল্পনা নহে।

কোন পদার্থের শক্তিতে যদি অন্য আর একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে সেই উৎপাদিকা-শক্তি-বিশিষ্ট পদার্থ সত্য; আর উৎপন্ন পদার্থ মিথ্যা; ইহা কেমন একটী কল্পিত কথা? এক পদার্থের শক্তিতে অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, যদি সৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তবে মূল পদার্থের শক্তিরূপ বীজ কেমন করিয়াই বা স্থিরতর থাকিবে?

ব্রহ্মের মূল বীজশক্তি জগৎরূপে আসিয়া পড়িলে তা মিথ্যা, এরূপ কল্পনা করিলে ব্রহ্ম সর্ব্বগুণাধর, সর্ব্বশক্তিমানই বা রহিলেন কৈ? "শিরো নাস্তি শিরব্যথা, শক্তি নাই শক্তিমান"; এইরূপ নির্দ্দেশ করা, একটী মত্তপ্রলাপ সদৃশ হইয়া উঠে। অতএব, ব্রহ্ম সত্য স্বীকার করিলে, ব্রহ্মশক্তি জগৎ সত্য, ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য। জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া নহে এবং ব্রহ্মও জগৎ ছাড়া নহেন। ব্রহ্ম, তাঁহার জগৎ বিভূতি ছাড়িয়া কি থাকিতে পারেন? প্রলয় কালেও ঐ সকল বিভূতি শক্তি সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, পুনঃ সৃষ্টিতে আবার আবির্ভাব হয়। এই প্রকার জগৎশক্তির আবির্ভাব, তিরোভাব, অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল এই ভাবেই চলিবে; ইহা অনিবার্য্য।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তু হইতে অনাদিপুরুষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখ, অন্ততঃ দুইটী বস্তুর সংযোগ না হইলে কোন বস্তু উৎপন্ন কি কোন কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। সেই অনাদিপুরুষই ত মায়াশক্তি এবং ইচ্ছার আশ্রয়ে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং জগৎরূপ শক্তি ব্রহ্ম ছাড়া, এবং ব্রহ্ম জগৎ ছাড়া, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। সকলি এক ঐশ্বরিক শক্তির করতলগত, ঐ মহাশক্তির ধ্বংস নাই।

যদি সৎ ও নিত্য পদার্থ কিছু থাকে, তাহাই ঐ মহাশক্তি, তাহাই সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির সমষ্টি-মূলতত্ত্ব, তাহাই দেবান্তের মায়াশ্রিত একমেবাদ্বিতীয়ং, তাহাই জগতের আশ্রয়, এবং তাহাই আবার পরিণাম জগৎ। তাহাই নিত্য ও অপরিণামী। কিন্তু তাঁহার বিশেষ গুণ এই, তাঁহা অসংখ্য পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, অথচ অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আবার দেখা দেয়। এইজন্য তাঁহাকে নিত্য ও সৎপদার্থ বলা যায়। তাহা সৎ বটে, অথচ মায়া তাঁহার রূপ, তাঁহা নিত্য পুরুষ বটে, অথচ প্রকৃতি তাহার পরিণাম। জগৎ তাহারই রূপ, তাহা চিরকাল বর্ত্তমান। চিরকালই প্রকৃতি এবং পুরুষে অভিন্নভাব; যিনি ভিন্ন ভাবেন, তিনি কল্পনায় ভিন্ন ভাবেন। ঐ মহাশক্তির তুলনা নাই, এই জন্যই ঐ মহাশক্তির প্রকৃতি ও ধর্ম্ম তুলনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যায় না।

আমরা জ্ঞানে এই মহাশক্তিকে অনুভব করি, শক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাহার কতক আভাষ পাই মাত্র। ইহা জ্ঞানের অনুভব ও উপলব্ধি। এই উপলব্ধি মিথ্যা কল্পনা নহে, ইহাকে যিনি মিথ্যা বলিবেন, তাহার নিকট কিছুই সত্য হইতে পারে না।

তুমি যে কল্পনায় ব্রহ্মকে সত্য বল, আমিও সেই কল্পনায়, ব্রহ্মশক্তি যে জগন্ময়, তাহা সত্য বলি। যদি ইহা স্বীকার না কর, তবে আর কি করিব, তাই যেন বলিতে ইচ্ছা হয় 'কৃষ্ণ যার মনে যেমন।" ব্রহ্মকে উত্তম রূপে জানিতে পারিলে জানিবার আর কিছু বাকী থাকিবে না, এই উক্তিটী যেমন সত্য, শক্তি আশ্রয় করিয়া তাহা অনুভূত করিতে পারিলে যে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হইবে, তাহাও তেমনি সত্য, আমার বিশ্বাস।

শ্রীজয়চন্দ্র দাস।

মেনকার খেদ।

(১)

কেন হে দিলে বিধি এরূপ রাশি,
অমিয় বিষমাখা আঁখি জোড়,
সোণার শতদল এ মুখ সুকোমল,
হৃদি না দিলে যদি বিধি মোর?

(২)

রমণী হৃদি যেগো অনুপম,
স্নেহ, মমতা, প্রেম পারাবার,
কাঁদিয়া নিরবধি পাই সে হিয়া যদি
এ সুখ, স্বরগেরে গণি ছার।

(৩)

যে শোভা ছিল বিধি কাছে তোর
ঢেলেছ শুধু কি এ দেহ মাঝ,
ললনা হৃদি মম করেছ মরুসম
দাওনি আভরণ প্রেম, লাজ।

(৪)

কেন পুতলি করি মোরে রাখ নাই,
পরাণ কেন দিলে দেহে মোর?
রমণী হৃদিহীন শুনেনি কোন দিন,
কঠিন হয় কি গো ফুল ডোর?

(৫)

ছলনা কেন এত শিখালে,
আঁখিতে দিলে কেন সুষমা?
ভাবিয়া দুঃখে মরি করেছ নিশাচরী
জগৎ-জননীর প্রতিমা।

(৬)

যে মোরে পূজে বিধি অনিবার
ফুলের মত দেয় হৃদিখান,
তাহারে মিছে কই "জানিনে তোমা বই"
দিতে ত পারিনাক প্রতিদান।

(৭)

জীবনে ভাল কারে বাসি নাই,
কেহ ত আপনার নাহি মোর,
স্মরিয়া কারো মুখ হয়নি মনে দুঃখ
কখন ঝরে নাই আঁখিলোর।

(৮)

হৃদয়ে ভালবাসা নাহি যার
কোথায় পাবে সে গো বল না?
কত যে দিন হায় পূজিতে তারে চায়,
গুমরি কাঁদে শুধু বাসনা।

(৯)

প্রেমের ছায়া যদি কোন দিন
পড়ে এ হৃদি মাঝে একবার,
তুমি গো নিজ করে মুছিয়া দাও তারে
জনমে দেখা নাহি হয় আর।

(১০)

(তাই) বিজনে কত দিন মনে হয়,
হ'তাম যদি ওই ধরাগায়,
পে'তাম পিতা মাতা, ভগিনী, প্রিয় ভ্রাতা,
শ্বশুড়, শাশুড়ীগো, আর তায়।

(১১)

যতনে ক্রোড়ে লয়ে তনয়ায়
বসিয়া থাকিতাম গৃহমাঝ,
অচেনা মুখ হেরি যেতাম লাজে মরি
দেখায়ে এ মাধুরী কিবা কাজ!

(১২)

এমুখ দেখিতে গো একজন
দেখিতে পেত'না'ত কেহ আর
হইত সে আমার, আমি হতেম তার
ফুটিত এ ফুল সে পদছায়।

(১৩)

এরূপ রাশি হত সে জনার,
লুটিয়া থাকিতাম সে পদে,
তাহারি সুখে সুখী, তাহারি দুঃখে দুখী,
বিপদ গণিতাম বিপদে।

(১৪)

যাতনা, দুঃখ, যত ধরণীর
যেতাম ভুলি, হেরি মুখ তার,
রহিয়া গৃহকাজে দিনে, সকাল, সাঁজে
যতন করিতাম সবাকার।

(১৫)

অধরে মিশে যেত এ হাসি,
এ আঁখি দেখিতে গো শুধু তায়,
ধরণী সমুদয় হইত একময়,
সে সুখ বল বিধি কেনা চায়?

(১৬)

ললনা পতিরতা, দেবী সেই,
স্বরগ তার ছোট গৃহ খান,
তনয় মুখ তার ত্রিদিব সুখসার
পুলকে ভাসে সদা তারি প্রাণ।

(১৭)

পতি সে রমণীর মন, প্রাণ,
এ নদী, সেই প্রেম পারাপার ;
এরূপ, এবদন, দেখিবে একজন;
শরমে ঢাকা রবে অনিবার।

(১৮)

শিখিতে মোরে বিধি দাও নাই
রমণী ধরম সে সুমহান,
মিটেনি কোন আশ, জীবন মধুমাস
বিফলে হবে বুঝি অবসান?

(১৯)

এরূপ হেরি ঘোর ঘৃণা হয়,
এ সুখে রমণীর কিবা কাজ,
স্বরগে কি কারণে সৃজিলে এ পাষাণে
চরণে ধরি বিধি বল আজ।

(২০)

অহল্যা সম দেহ শিলা খান
বলগো কোন দূর বরষে—
জাগিবে সুখী হয়ে রমণী হৃদি লয়ে
দেবতা শ্রীচরণ পরশে !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

স্বেচ্ছাচারিতার যুগ।

মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন, "এটা স্বেচ্ছাচারিতার যুগ।" বাস্তবিকও আমরা দেখিতেছি, কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে যাওয়া দিন দিন এদেশে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সমাজে পাপ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে; কেহ কোন নিয়ম, ব্যবস্থা বা সংহিতা মানিয়া চলিতে চায় না। তাহারা কর্ত্তা মানিবে না, গুরু মানিবে না, চালক মানিবে না, যে যাহা করুক, কেহ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবে না! তোমার দোষের কথা আমি বলিলে তুমি আমার দোষ দেখাইবে; আমার দোষের কথা তুমি বলিলে আমি তোমার দোষ দেখাইব,—এই পারস্পরিক বলার ভয়ে সদা সকলে সশঙ্কিত; যেন "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!" অন্যদিকে ইংরাজ শাসন-প্রণালীর কঠোরতায়, লাইবেলের ভয়ে, কেহ কাহার কোন দোষের কথা বলিতে সাহসী হন না; অন্যদিকে, সিডিসন আইনের ভয়ে, কেহ রাজনীতি সম্বন্ধেও বিশেষ কোন রূপ আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করেন

না। ঘুষ গ্রহণের মাত্রা সর্ব্বত্রই দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিবে না। শুনিতেছি, এমন বড় বড় ইংরাজগণও ইহার প্রলোভনের হাতে পড়িতেছেন; কেবল যে রেল-কোম্পানি ও মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তাগণ কণ্ট্রাক্টরদিগের হাতের পুতুল হইতেছেন, তাহা নহে, এখনকার দিনে, শাসন-বিভাগের বড় বড় কর্ত্তারাও রাজাদিগের নিকট বড় বড় ভেট, উপঢৌকন লইয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছেন। কোন কোন সংবাদ পত্রে বলেন, "ভেট, উপঢৌকন বা ঘুষ না দিলে কি কোন কাজ পাওয়া যায়? ঘুষ না দিলে সকল কাজ পণ্ড হইয়া যায়;—জমীদার ও রাজাদের রাজস্ব, ব্যবসায়ীর ব্যবসা, মক্কেলদিগের মকদ্দমা সব যে নষ্ট হইয়া যায়।" সংবাদ পত্রে ঘুষের এমন সকল উদাহরণ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে যে, আপামর-সাধারণ মনে করে, উপঢৌকন বা ঘুষ না দিলে, চলিবার উপায় নাই; সুতরাং দিন দিনই ঘুষ প্রদানের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বকালে ওয়ারেন-হেষ্টিংসকে বিলাতে কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ কালে আর কাহাকেও কোন কৈফিয়তের তলে পড়িতে হয় না। শুনা যায়, লাট উড্‌বরণ সাহেব, বর্দ্ধমান রাজের অভিষেকের উপঢৌকনের মমতায়, দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াও নাকি বিদায় গ্রহণ করেন নাই। পেনেল সাহেবের দুরবস্থার পর আর কে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে অগ্রসর হইবে? অবাধে—কর্ত্তারা স্বেচ্ছাবিচার, স্বেচ্ছা-শাসন-নীতি চালাইয়া যাইতেছেন। অত্যাচারের উপর অত্যাচার বাড়িতেছে, কিন্তু সকলে নির্ব্বাক, কেহ কোন কথা বলে না!! প্রতিবাদের মাত্রা দিন দিনই হ্রাস হইতেছে। অরাজকতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে!

এক দিকের অবস্থা এইরূপ, অন্যদিকের অবস্থা আরো শোচনীয়। সমাজে যাহাদের ঘরে অর্থের অভাব নাই, তাহারা অনায়াসে দরিদ্রদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া টাকার খাতিরে রক্ষা পাইতেছে। তাহারাই দেশে গণ্য, মান্য, পূজ্য। এক দিন এক ধনীর সন্তান আস্পর্দ্ধা সহকারে বলিতেছিলেন—"সকল সংবাদ-পত্রের গ্রাহক থাকিব, সকলকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইব, দেখি কোন্ শালা আমার বিরুদ্ধে বলে বা লেখে!" শুনিয়াছি, ভাওয়ালের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর আমলে টাকার তোড়া লইয়া প্রতিনিধিগণ সম্পাদক মহলে যাতায়াত করিয়া সকলের মুখবন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। সেদিন কলিকাতায় আসিয়া রায়-বাহাদুর কত সম্মানের মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া গেলেন, যাইয়াই এমন এক মকদ্দমায় জড়িত হইয়াছেন, যাহা স্মরণ করিতেও লজ্জায় ম্রিয়মান হইতে হয়। এসকল কথা বলিবার উপায় নাই,—ইহাতে ব্যক্তিগত নিন্দা হয়!! ব্যক্তির সমষ্ঠিতেই সমাজ, যদি ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপরাধ মধ্যে গণ্য হয়, তবে সমাজ সম্বন্ধেও কোন কথা বলা আর চলে না। সুতরাং কেহ কাহাকেও কিছু বলিও না, যে যাহা করে বা করিয়াছে, তাহাই ভাল হইতেছে ও হইয়াছে, ইহা ঘোষণা করিয়া, হে প্রাচীন সম্পাদকগণ, তোমরা পরিতুষ্ট থাক, সমাজ বা দেশ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, যাক্। কেবল ভয়ে ভয়ে যে সকলে নির্ব্বাক্, শুধু তাহাও নয়;—টাকার

প্রলোভন, ভালবাসার প্রলোভন, সম্মানপ্রাপ্তির প্রলোভন, এ সকল কি ছাড়া যায়! গা-চাটাচাটিতে সকলে মাতোয়ারা, সুতরাং অবাধে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা চলিয়াছে!! তবে হঠাৎ যদি কেহ কাহারও বিদ্বেষের চক্ষে পড়েন, কিম্বা যদি স্ব-সমাজ বা স্বদলভুক্ত লোক না হয়েন, তবে আর রক্ষা নাই। তিনি যত বড় লোকই হউন, এবং যত ভাল লোকই হউন না কেন, তাঁহার দোষ থাকুক বা না থাকুক, তাহা কীর্ত্তন করিতেই হইবে, তাহাতে নিন্দা হয় না, তাহাতে কোন অপরাধ নাই! এই ভাবে কোন কোন সম্পাদক সময়ে সময়ে কোন বিষয় বা কোন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে আন্দোলন করেন বটে, কিন্তু ঠিক সেই অবস্থায় পতিত স্ব-দলের লোক সম্বন্ধে একবারে নির্ব্বাক্!! পরন্তু, অন্য সমাজের লোকে সে সম্বন্ধে আলোচনা বা আন্দোলন করিলে তখন কত কত লোক তাহাকে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইবে। এক দল যদি নিন্দা করে, আর এক দল অমনি তাহার দিগন্তবিস্তৃত প্রশংসা আরম্ভ করিবে। দশজন এক জনকে পরিত্যাগ করিল, আর দশ জন তাহাকে মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! ব্যক্তি সম্বন্ধে এই নিয়ম, ব্যক্তি ছাড়িয়া সমাজ ধরিলেও, এই কথা ষোল আনা খাটে। কোন ব্যবস্থা বা কোন কাজকে দশজনে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলে, আর দশ জনে অমনি তাহার পোষকতা করিতে আরম্ভ করে। পক্ষপাতিত্বের রাজত্বের যুগে নিরপেক্ষতা আশা করা বৃথা। অবশ্য, প্রতি কাজেরই দুইটা দিক আছে, প্রতি ব্যক্তিরই মন্দের ধারে ভালও কিছু কিছু আছে। মন্দ বিষয়টা ধরিয়া সকলে যদি নিরপেক্ষ ভাবে তীব্র আন্দোলন করিত, তবে বুঝিবা, কি ব্যক্তি, বা কি সমাজ, সকলই কতকটা সংশোধিত হইত। বঙ্গদেশের কত ধন-ভাণ্ডার, কত কোম্পানি, পরধন লুণ্ঠন, পরধন হস্তগত করিয়া শেষে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে; সে ইতিহাস কে না জানে? এ দেশে কত শত ব্যক্তি, নরহত্যা, ডাকাতি, পরধন-লুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ, পরনারীহরণ করিয়াও অবাধে দশের মধ্যে একজন হইয়া বুক ফুলাইয়া ফিরিতেছে, সে কাহিনী কে জানে না? তাহা লিখিলে যে পরনিন্দা হয়! তাহা লিখিলে যে অনেকের তীব্র দৃষ্টির তলে পড়িতে হয়! আমি অন্যের নারী হরণ করিব, তুমি সাবধান, কোন কথা বলিও না। আমি নরহত্যা করিব, তুমি সাবধান, কোন কথা বলিবে না! আমি ঘুষের বোঝা মস্তকে লইয়া বাহাদুর সাজিব, সাবধান, তুমি কোন কথা বলিও না। যদি বলিবে, লাইবেল-কোর্ট খোলা রহিয়াছে, তোমাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া লাঞ্ছনার মুকুট মাথায় পরাইয়া দিব! যদি তাহাও না পারি, দশ জনে মিলিয়া তুমি "পরনিন্দুক" বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিব। আমরা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া অন্যের ধন অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার পিতৃকুলের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে? আমরা স্কুল বা কলেজ হল বা অমুক মন্দির সাধারণের চাঁদায় নির্ম্মাণ করিয়া নিজস্ব করিয়াছি, তাহাতেই বা তোমাদের চৌদ্দ পুরুষের কি আসিয়াছে, গিয়াছে? আমরা পাপীদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়া নরহন্তার বাড়ীতে মহা সম্মানের আসন পাই, বা ব্যভিচারীর রঙ্গ-

মঞ্চে বিশেষ গৌরবের স্থান পাই, তাহাতে তোমাদের চক্ষে কণ্টক বিঁধিল কেন? তাহারা প্রশ্রয় পায়, তাহাতে তোমাদের কি আসিয়া যাইতেছে? আমাদের যাহা খুসি, তাহাই করিব। আমরা প্রাপ্য টাকা না দিয়া ঠকাইতে পারিতেছি, ফাঁকি দিতে সমর্থ হইতেছি, কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না, তাহাতে তোমাদের কি? আমরা নানা প্রকারের মিথ্যা বিজ্ঞাপন-সাহায্যে, কখনও সাহেব সাজিয়া, কখনও নাম বদ্‌লাইয়া, লোককে ঠকাইয়া, শত শত টাকা আত্মসাৎ করিতেছি, তাহাতে তোমরা হিংসা কর কেন? আমরা অশ্লীল ছবি সহ বিজ্ঞাপন দিয়া যা-তা ছাইভস্ম বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছি, তাহাতে তোমরা বিরক্ত হও কেন? বলিতেছি, তোমরা নীরব থাক। যদি কথা বলিবে, যেরূপে হয়, ধনে পারি, বলে পারি, তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তবে ছাড়িব। এই রূপ চোক রাঙ্গানি, ভয়-বিভীষিকার তীব্র ইঙ্গিত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আমরা দুর্ব্বল ভীরু জাতি, দিন দিন আরো ভীরু হইয়া শান্তির অন্বেষণ করিতেছি, সব অবস্থাতেই নির্ব্বাক থাকিতেছি। এ হেন সময়ে কি করিয়া সমাজের বা দেশের উন্নতি হইবে?

বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। এরূপ অবাধে আর কোন যুগে এদেশে পাপ প্রশ্রয় পাইয়াছে কি না, সন্দেহ। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষ পান করিয়া দিন দিন লোকের বিলাসিতা বাড়িয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থের অভাব অনুভূত হইতেছে। শ্রম-বিভাগ, বিলাসিতার যুগে, কোন দেশেই, তেমন আদর পায় না। মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, স্বাবলম্বন করিয়া মানুষ হইব, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিব, এইরূপ সঙ্কল্প যে জাতির মধ্যে থাকে, সে জাতি কখনও বিলাসী হইতে পারে না। খাটিতে খাটিতেই দিন অবসান হইয়া যায়, শ্রান্ত, ক্লান্ত শরীরে কখন আর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবে? আমাদের দেশে বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমকাতরতা সর্ব্বদিকে বাড়িয়া যাইতেছে। এ দিকে নানা পাপ, ও ভোগ-বাসনা জাগিয়া উঠিতেছে, মানুষ মদ-মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দিগ্‌বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে এবং নানা অসৎ বাসনা চরিতার্থ করিতেছে। ইংরাজ-রাজও, ক্লেদ-রাশি ঢাকিবার জন্য, এজাতিকে ডুবাইবার অমোঘ উপায় অতি সুবিধার ইনসলভেন্সি-আইন, লাইবেল-আইন ও সিডিসন-আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আর ভয় কি! কত কত লোক অপরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া শেষে ইনসলভেন্সি আইনের আশ্রয় লইয়া, পরের ধনে নবাবী করিয়া ফিরিতেছেন! কাহাকেও কিছু বলিবার যো নাই। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, সুবিধার পর সুবিধা করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট, সকলকে দলবদ্ধ করিয়া, পতনের মুখে চালিত করিতেছেন। ভারতীয় জাতিকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করিলে গবর্ণমেণ্টের ইষ্ট-সাধনে ব্যাঘাত হয়, চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিতে হইলে, এইরূপে পশুর ন্যায় করিয়া রাখাতেই গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ। ভেদ-নীতির বলে, উড়িষ্যা, আসামকে পৃথক করিয়া, ভাই ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করিয়া, পাপের পথে চালিত করিয়া, সকলকে জীবন্মৃত করাতেই গবর্ণমেণ্টের লাভ! আমরাও

এমনই জীব, তাহাতেই আমাদের উন্নতির কুহক স্বপ্ন দেখিয়া সাহ্লাদে নাচিতেছি। স্বেচ্ছাচারিতার এমন মোহন যুগ আর কোন দেশে কখনও হইয়াছে কি না, জানি না। নরহত্যা, ব্যভিচার, মদ্য পান, পরস্বাপহরণ, প্রতারণা, অন্যকে ঠকান—অবাধে এদেশে প্রশ্রয় পাইয়া চলিয়াছে !!

আমরা আর্য্যবংশধর। তোমরা বিদেশী লোক, কেহ কিছু বলিতে চাও যদি, অমনি আমরা আর্য্যধর্ম্মের দোহাই দিব, পিতৃপুরুষের দোহাই দিব,—ভারতবর্ষের দোহাই দিব। আমরা উত্থান-মন্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গকামী-দলের লোক ;—পাপ আমাদের দ্বারা কখনও প্রশ্রয় পায় নাই ! হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান—সকলে সম্মিলিত, ধর্ম্মবাদীদিগের কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিবে না। প্রতি বৎসর এদেশে কত কত ভ্রূণহত্যা, কত কত নরহত্যা, কত কত আত্ম-হত্যা হয়, তাহা কে গণিবে ? এ দেশের কত লোক অন্যকে ফাঁকি দিবার জন্য ইনসলভেন্সি আইনের আশ্রয় লয়, কে হিসাব রাখিবে ? এদেশের কত মেয়ে, পুরুষের অত্যাচারে, বৎসর বৎসর কুল ত্যাগ করিয়া অকূলে ঝাঁপ দেয়, ধর্ম্ম ত্যাগ করে, সে ইতিহাস কে লিখিবে ? ভারতে কত বংশ পাপে নির্ব্বংশ হইয়াছে ও হইতেছে, কত কুলে কালী পড়িতেছে, কে তাহা লিখিবে ? বেদ বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ মহাভারতের দোহাই দিয়া, শাস্ত্র চর্চ্চা ও ধর্ম্মোন্নতির ভাণে আমরা সকল কালিমা, সকল দুষ্কৃতি ঢাকিয়া ফেলিব, এবং সত্যযুগ আবার আসিতেছে বলিয়া মাভৈঃমাভৈঃ রবে মহা কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইব। এমন চাপাচাপি, এমন ঢাকাঢাকির রাজত্ব আর কখনও কোথাও হইয়াছে কি ? এখন যে যা কর, "না" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অস্বীকার করিলে আর কোন দোষ নাই। সমস্ত সমাজটা কপটতার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত,—"কলঙ্ক ঢাকো, ঢাকো,'' "অস্বীকার কর" "অস্বীকার কর"; চতুর্দ্দিকে কেবল এই রব। কত কত কুকার্য্য যে এইরূপে অবাধে সমাজে চলিয়া যাইতেছে, কোন হিতৈষী, কোন সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ তাহা ভাবিতেছেন না। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা চলিলে এ দেশের রক্ষা পাওয়া কঠিন। আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "অঙ্গে কখনও ফোড়া হইলে, অস্ত্র দ্বারা তাহা কাটিয়া ক্লেদরাশি বাহির করিয়া দিতে হয় ; না দিলে সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত হয়। সেইরূপ কোন পাপ-ফোড়া সমাজের গাত্রে দেখা দিলে, তাহা ঢাকিয়া ঢাকিয়া বসাইয়া দিয়া সমাজকে বিষাক্ত না করিয়া, তাহা বিবেক-ছুরি দ্বারা কাটিয়া দিতে হয় ; তবে সমাজের মঙ্গল।" বন্ধুর এই কথা এখন ব্যবহার এবং কার্য্যে তিনি প্রত্যাহার করিয়া থাকিলেও, আমরা ইহার মধ্যগত উজ্জ্বল সত্য স্বীকার করি। চাপিয়া ও ঢাকিয়া রাখার শিক্ষা ইংরাজরাজ এবং বর্ত্তমান সমাজ শিক্ষা দিয়া, এ দেশের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। বাহিরে ধর্ম্মে পোষাক পরিধান করিয়া, নামাবলী গায়ে দিয়া, তিলক কাটিয়া, গৈরিক পরিয়া, এবং অন্তরে পাপ-ক্লেদরাশি পোষণ করিয়া কত কত লোক, কত কত দস্যু, সমাজে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে ! সন্ন্যাসী এবং ধর্ম্মবেশধারী লোকদিগের মধ্যে কত ডাকাত, কত নরহন্তা ছদ্মবেশে রহিয়াছে, কে জানে ? ঢাকাঢাকি, চাপাচাপির ব্যবস্থার প্রাবল্যে চতুর্দ্দিকে

দিগ্বিজয়ী প্রতাপে সমাজের গুপ্ত পাপ দিন দিন প্রশ্রয় পাইয়া চলিয়াছে। এ যুগকে যদি কোন এক কথায় ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলিতে হইবে যে, ইহা "ঢাকাঢাকি, চাপাচাপির যুগ"— অথবা ইহা "স্বেচ্ছাচারিতার যুগ।" কিন্তু হায়, লোকেরা বলে, এ সকল কথা বলা কেবল অরণ্যে রোদন করা মাত্র। বিধাতার প্রেরণায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিলাম, ফলাফল তাঁহার হাতে। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৮। দিল্লি-মহোৎসব-কাব্য।—হেমোদ্বাহ-কাব্য ও বিজয়িনীকাব্যের রচয়িতা কাকিনিয়া রাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও কবি। 'দিল্লি মহোৎসব' তাঁহার তৃতীয় কাব্য। এই কাব্যে তিনি অসাধারণ কবিত্ব ও বহুদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা কাব্যখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। দিল্লি-মহোৎসব কাব্যকে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক কাব্য বলা যাইতে পারে। কবিবর যদিও মহোৎসবের সময় দিল্লি নগরীতে উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি কেবল আত্মপ্রীতি ও রাজভক্তি বশতঃ তত্রত্য মহোৎসবের ইংরেজী বর্ণনা আনাইয়া উহা অবলম্বন পূর্ব্বক এই কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া অপার আনন্দলাভ করিবেন।

এই কাব্যখানি ছয় সর্গে বিভক্ত। ইংহাতে দশদিন-ব্যাপী দিল্লির অভিষেকোৎসব ও দিল্লির অধীশ্বরগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই পাঠ কালে স্থানে স্থানে দেবভাষার মধুর ঝঙ্কারে মন প্রাণ বিমুগ্ধ হয়। কিন্তু কবিবর এই কাব্যে এঙ্গলে:- সংস্কৃত ও যাবনিক ভাষার কিছু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য ঐতিহাসিক দেশ কাল পাত্রের নাম অবিকৃত রাখিতে হইলে উহা না করিয়া উপায় নাই; সুতরাং সাহেব, জানুয়ারী, ক্যাম্প, কার্জ্জন, লেডী, কনট্, কিস্মার, কামান, বাহাদুর, হিপ্‌হিপ্ হুর্‌রে, প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ করা দোষের হয় নাই। কিন্তু যাবনিক শব্দ সংস্কৃত বিভক্তি-যুক্ত করিয়া পদ প্রস্তুত করিতে গিয়া স্থানে স্থানে কিছু কঠোর করিয়া ফেলিয়াছেন। লেডী শব্দ প্রথমার দ্বিবচনে "লেড্যৌ", জহুরি শব্দের প্রথমার বহুবচনে "জহুরয়ঃ" প্রভৃতি পদের প্রয়োগে শ্রুতিকটুতা ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় "জহুরয়ঃ" লিখিলে লোকে অগ্রে "জহুঃ" "অয়ঃ" বুঝিয়া বসে। যাবনিক শব্দের সহিত আবার সংস্কৃত শব্দের সমাস করা হইয়াছে, অন্য স্থলে যাহাই হউক "লেডীজানিঃ" কথাটা তত সুন্দর হয় নাই। আর আমরা একটা স্থলে দেখিলাম, তিনি মুদ্ ধাতু সকর্ম্মকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু উহা প্রসিদ্ধ অকর্ম্মক ধাতু। তবে যদি কোন বৈয়াকরণ সকর্ম্মকরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাই বলিয়া আমাদের করা উচিত্ নয়। কবিবর যে

লিখিয়াছেন "যঃ প্রব্রজেৎসম্খলেৎ" অর্থাৎ অগ্রসর হইতে হইলেই স্খলিতপদ হইতে হয়, উহাই ঠিক। বর্ত্তমান কালে ভাল সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরই অভাব, তাহার উপর এরূপ সংস্কৃত কবির যে একান্ত অভাব, উহা বলাই বাহুল্য। তিনি যেরূপ নানাশাস্ত্রবিৎ এবং অসাধারণ কবিত্ব-সম্পন্ন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে রাজ-সম্মানে বিভূষিত দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

১৯। অজ্ঞাতবাস-কাব্য।—

শ্রীজগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, রথিডং-আকিয়াব। নামেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিব্যক্ত। ইহা জগচ্চন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় কাব্য। প্রথম কাব্য ভারত-বংশ-সম্বন্ধে যথা সময়ে (চৈত্র, ১৩০৯) আমরা পরিচয় দিয়াছি। এই কাব্য খানি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। যে সকল গুণ থাকিলে কাব্য রচনায় কৃতীত্ব লাভ করা যায়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সে সকলের সমাবেশ হইয়াছে। কালে জগৎ বাবু দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

২০। রাঘব-বিজয়-কাব্য।—

শ্রীশশধর রায় প্রণীত, মূল্য ১৲। শশধর বাবুর ইহা দ্বিতীয় কীর্ত্তি; প্রথম কীর্ত্তি ত্রিদিব-বিজয় কাব্য সম্বন্ধে, ১৩০৩ সালের চৈত্র সংখ্যা নব্যভারতে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখান হইয়াছিল যে, বৃত্রসংহারের পরে এরূপ কাব্য আর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয় নাই। রাঘব-বিজয় কাব্যেও শশধর বাবু অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন।

বাঙ্গলায় অনেক কবি আছেন, তাঁহারা সংবাদপত্র মহলে বিশেষ পরিচিত, গীতি-কাব্যই তাঁহাদের প্রধান সম্বল। রবীন্দ্র নাথ বাঙ্গালার অসাধারণ কবি, তিনি এখন কাব্য ছাড়িয়া উপন্যাস রচনাতেই অধিকতর মনোযোগী; বোধ হয়, মাইকেলকে অতিক্রম করা কঠিন ভাবিয়া, উপন্যাসে প্রণয়-চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিম বাবুর শূন্য আসন গ্রহণে আশান্বিত। তাই কাব্য ছাড়িয়া উপন্যাস-সাধনায় তিনি ব্রহ্মচর্য্যের কাল অতিবাহিত করিতেছেন। আমরা ইচ্ছা করিলেও, মহাকাব্য সম্বন্ধে আর তাঁহার নিকট আশা করিতে পারিতেছি না। হেমচন্দ্র স্বর্গে, নবীনচন্দ্র বার্দ্ধক্যের এবং তদুপরি গবর্ণমেণ্টের সেবায় তৎপর। এ হেন অবস্থায়, এ কে ধীরে ধীরে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে অগ্রসর?

রাঘব বিজয় কাব্যে চতুর্দ্দশটী সর্গ আছে। প্রথম সর্গে ইন্দ্রজিতের পতন সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৪শ সর্গে রাবণবধে বিভীষণের বিলাপ, রাবণের স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণে কাব্য পরিসমাপ্ত। মেঘনাথবধ কাব্যের ন্যায় এ গ্রন্থও, রামায়ণ অবলম্বনে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মাইকেল যে মধুচক্র রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, রাঘব-বিজয়ে তাহারই স্ফূরণ হইয়াছে। শশধর, মাইকেলের অকৃত্রিম ও যোগ্য শিষ্য। কোন কোন স্থলে শিষ্য স্থানে মাইকেলের দোষের অনুকরণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত; কিন্তু তিনি স্থানে ২ সরসতায় ও সরলতায় গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন। পাঠক বর্ণনার নমুনা দেখুন—

> "উত্তরিলা আপ্তনের—
> কার্য্যসিদ্ধ এতদিনে, হে বীর্য্যকেশরি।
> ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে রণে, অরিন্দম
> সৌমিত্রির শরে। বীরশূন্য লঙ্কা এবে

ভগ্নশাখ তরুসম এ অররুপুরে.
একমাত্র জীবে রক্ষ রাবণ দুর্ম্মতি।
ঐ শুন হাহাকার! কত যে পড়িল
রক্ষ, নাগদল কত, কর্দ্দমিত রণ-
স্থল করিয়া পঙ্কিল, না পারি বর্ণিতে
প্রভু। যজ্ঞের প্রাঙ্গণতলে, বটবৃক্ষ-
মূলে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ-হেতু অনুচর
সহ আইসে রাবণি ইন্দ্রজিৎ, মহা-
দর্পে সেই সর্পে অহ্বানিলা রণে শূর
গরুড়ের সম। অমনি বাধিল রণ
অতি ভয়ঙ্কর। সশস্ত্র উভয় বীর।
সানুচর ইন্দ্রজিৎ। যজ্ঞের প্রাঙ্গণ
মুহূর্ত্তে হইল ক্ষুব্ধ; ঝঞ্ঝা-সমাগমে
প্রতিদ্বন্দ্বি-বায়ু-বিলোড়িত মহার্ণব
যথা। শিখেছিলা অস্ত্র সত্য মেঘনাথ
বলী। কিন্তু ধন্য শিক্ষা লক্ষ্মণের, শুন
নরমণি। বায়ুপুত্র দাস; হেরিয়াছে
পিতৃদেবে আক্রমিতে উন্মত্ত প্রতাপে
সিন্ধু নাথে; ভীম গর্জ্জি উর্দ্ধচূড়া ধরি,
হেরিয়াছে নিক্ষেপিতে অলক্ষিত দাপে
অর্ণবের বক্ষপরি মহা গর্ব্বভরে!
বিকট হুঙ্কারে হেরিয়াছে, নরনাথ,
উপাড়িতে পৃথ্বীভেদী মহীরুহব্যূহে;
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে বন, অরণ্য, ভূধরে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া, দেখিয়াছে দাস,
অভ্রভেদি শৈল-চূড়া নিমেষ মাঝারে
উড়াইতে শূন্যপথে। মুহুর্মুহু মহা-
কম্পে কাঁপাইতে অটল অচল-ব্রজে
পুত্তলিকাসম, নিত্য। কিন্তু এই চক্ষে
হেরি নাই কভু লক্ষ্মণের রণ-ক্রীড়া-
সম রণোন্মাদ। হেরি নাই হেন দ্বন্দ্ব-
যুদ্ধ কভু নিষ্পন্দ নয়নে। ধন্য,—ধন্য
শিক্ষা, বীর চূড়ামণি। মণ্ডলে কখনো,
মহা মণ্ডল কভু বা, বর্জ্জন, ধারণ,
স্থিতি. অপদ্রুত, উপন্যাস, অপন্যাস
গতি,—ক্ষণপ্রভা জিনি চঞ্চল চরণে,
ভুজ আস্ফালিয়া, কি কৌশলে বিফলিলা
লক্ষ্মণ সুমতি রাক্ষসের কু-কৌশল !!
টলটলি কাঁপিলা মেদিনী। ধূলারাশি
উড়িল গগনে, ঢাকা সুধাংশুর অংশু
ঘন আবরণে, অগণ্য বিশিখরাশি,
শিখা উগরিয়া, জ্বলন্ত-কৃতান্ত-সম
ধাইল গগনে, কণ্টকিত করি নভ-
স্থলী। রক্ষোরাজ-চমূ পড়িল ভূতলে
মর্ম্মাহত। বারিস্রোতসম লোহস্রোত
বহিল প্রাঙ্গণে। শেল, শূল, জাঠা, গদা,
করবাল, খরশাণ, তবক, বেলক,—
যতই ক্ষেপিলা রক্ষঃ, বক্ষে লক্ষ্মণের,
মুহূর্ত্তে কাটিলা বলী অস্ত্র বরষণে।
মেঘদল ভেদি উঠিতে বাসবজয়ী,
বায়ু অস্ত্রে উড়াইলা হেলায় জলদে
বীরবর; বায়ু স্তম্ভি পুনঃ, যে কৌশলে
ভূমিতলে আকর্ষিলা তারে,—সুবিক্রম
তুমি,—হেরিলে নয়নে, তোমারও হইত
বক্ষ গর্ব্বে বিস্ফারিত। আর কি কহিব
নরেন্দ্র। বিঁধিয়া বক্ষে মহাশরজালে
শোণিতে প্লাবিয়া দেহ, এক লম্ফে,—পড়ি
বক্ষে তার,—সিংহ যথা গজ স্কন্ধে,—ঘোর
আস্তাড়নে ত্রস্ত করিলা সৌমিত্রি, মেঘ-
নাদে। অবশেষে মন্ত্রপূত ইন্দ্রশরে
বিঁধিলেন শূর রাবণিরে। মহাশব্দে
পড়িলা রাক্ষসসুত রণভূমি তলে
গতজীব। মহোল্লাসে নাদিল বিজয়-
বার্ত্তা ব্যোমতল জুড়ে; পুষ্পবৃষ্টি হ'ল
ধরাতলে। সকরুণ হাহাকার ধ্বনি
উঠিল রাক্ষসদলে। পলাইল রড়ে
রক্ষচয়, রণ অবশিষ্ট মাত্র ছিল
যে সকল, মুষ্টিমেয়। পশ্চিম তোরণে
কপিবৃন্দ মহানন্দে বিঘোষিলা রক্ষঃ
চমূ "জয়রাম নাদে।"

উদ্ধৃত অংশে গ্রন্থকারের দোষ গুণ উভয়ই পরিলক্ষিত হইবে।

পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে বহুবার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে—বহুবার অশ্রুপতন হইয়াছে। ইহা গ্রন্থকারের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়। ভাষা যেন দাসীর ন্যায় গ্রন্থকারের পরিচর্য্যা করিয়াছে,—মধুর, সরল, কর্কশতা-বর্জ্জিত, বিশুদ্ধ, সহৃদয়তায় মণ্ডিত। এরূপ গ্রন্থ যে দেশে প্রকাশিত হয়, সে দেশেও ধন্য, যে ভাষায় রচিত হয়, সে ভাষাও ধন্য। রাঘব-বিজয়-কাব্য বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় কীর্ত্তি।

পুস্তক খানির সুদীর্ঘ সমালোচনা করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম; দুঃখের বিষয়, সুবিধা হইল না। আমরা আশা করি, এগ্রন্থ এদেশে বিশেষ রূপ আদৃত হইবে। শশধরের লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।

২০। কর্ম্মক্ষেত্র।—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য ।০।

গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে—

"জাগো, উঠো, চল সুখে,
কিসের ভাবনা।

কর্ম্ম জীবনের যন্ত্র,
কর্ম্ম সাধনার মন্ত্র,
কর্ম্ম বেদ, কর্ম্ম তন্ত্র,
পুণ্যতীর্থ কর্ম্মক্ষেত্র,
এ মহা সাধন ক্ষেত্রে
পঁরাণ সঁপনা।"

শক্তি পরিচয়, সঙ্কল্প, সাধনা ও সিদ্ধি—এই চারিটী বিষয়ে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই উপন্যাস-প্রধান যুগে,—যখন সাপ্তাহিক এবং মাসিকের কলেবর নানা গল্পে পূর্ণ হইতেছে, যখন মানুষের রুচি, মতি, তরল সাহিত্যের দিকে ধাবিত করিবার জন্য, সামান্য হইতে অসামান্য সকল লেখকই বদ্ধপরিকর, তখন এই গ্রন্থকার এই পবিত্র বিষয়ের অবতারণা করিতে আসিলেন কেন? এ দেশে স্কুল-পাঠ্য রচনার জন্য অনেকে ব্রতী, তাহাতে পয়সা ও সুনাম, দুই মিলে। উপন্যাস বা গল্প রচনা করিলে পাঠক মিলে, অর্থ মিলে, পরন্তু জাতির গতি তারল্যের দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য, সকল মাসিকেই উপন্যাস,—ভাল হউক, মন্দ হউক, উপন্যাস দিতেই হইবে। সাপ্তাহিকে উপহার এবং মাসিকে উপন্যাস—এই দুই প্রলোভন ভিন্ন এদেশে আর কোন কাগজের নাকি আদর হইবে না। এই কথা ত শুনিতেছি। শশি বাবু কি তাহা শুনেন নাই? তবে এ কার্য্যে গ্রন্থকার কোন্ আশায় ব্রতী হইলেন? আশা থাকুক বা না থাকুক, গ্রন্থকার স্বজাতির উন্নতিকামী। এরূপ সহৃদয় গ্রন্থকার এদেশে বড় অধিক দেখা যায় না। গ্রন্থকার বলেন—

"একে একে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহারাজ রামবর্ম্ম, স্যার মাধব রাও, স্যার সলর জঙ্গ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহম্মদ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, স্যর মধুস্বামী আর্য্য, শ্যামাচরণ সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, রাম দুলাল সরকার এবং স্যার জেমসেটজী জিজিভাইয়ের সাধনার পুণ্য প্রসঙ্গ বিবৃত হইল। কর্ম্মক্ষেত্রে, সাধনভূমিতে, সাধক ইঁহাদের পুণ্যপ্রসঙ্গ শ্রবণে আশান্বিত হইবেন। এই সকল মহাপুরুষগণের সাধনার পুণ্যপ্রসঙ্গ ঘটনাবৈচিত্রে-পূর্ণ। ইহাঁদের সাধনার মূলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়াছি। আর সেই সঙ্কল্পের অন্তরালে তাঁহাদের ইচ্ছা শক্তির প্রবলতা দেখিয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদের সাধনার পুণ্যপ্রসঙ্গের শেষে একবার তাঁহাদের কার্য্যকলাপের পুনরালোচনা করা যাউক। দেখা যাউক, তাহা হইতে আমরা কি শিখিতে পারি। মহাপুরুষচরিত আলোচনা করিতে যাইলে আমরা সর্ব্ব প্রথমে কয়েকটী গুণ দেখিতে পাই। বিশ্বাস, আশা, সাহস এবং অধ্যবসায়ের চিহ্ন আমরা তাহাদের সর্ব্ব কার্য্যে দেখিতে পাই। ভগবানের কৃপায়, আত্মশক্তিতে এবং কর্ম্মের ঔচিত্যে ও উপকারিতায় ইহাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়। আশায় তাঁহারা ভগবানের অভয় ও আশ্বাসবাণী শ্রবণ করেন। মহাপুরুষগণ বীরপুরুষ। উত্তাপবিহীন বহ্নি যেমন নিরর্থক, সাহসবিহীন মহাপুরুষ শব্দও তেমনি নিরর্থক। সাহসের সাহায্যে মহাপুরুষগণ সকল ভয় অতিক্রম করেন, সকল বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হয়েন। আর অধ্যবসায়ের সাহায্যে প্রাণপাত করিয়া সাধনায় রত থাকেন। মহাপুরুষগণ উত্তম গুণ সম্পন্ন।"

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"—এই মহাবাক্য এই জাতির উদ্ধারের মূল মন্ত্র। যদি কখনও এই পরপদদলিত জাতি আত্ম-নির্ভর-শীলতা শিক্ষা করিয়া মনুষ্যত্বের পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইতে পারে, তবে এই মহামন্ত্রেই পারিবে। "শরীর পাতন" না করিলে—সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রয়াসী না হইলে এ জাতির উদ্ধার হইবে না। শশি বাবুও এই মন্ত্রে দীক্ষিত; তাই তিনি এই মন্ত্র-ধ্বনিতে দেশ প্রকম্পিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে আত্ম-বলিদান-পুণ্যক্ষেত্রে আলিঙ্গন দান করিতেছি।

বাবু প্রসন্নকুমার দাসের সৌভাগ্য-সোপান, বাবু চারুকৃষ্ণ দত্তের চারুনীতি পাঠ, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের আত্মোৎসর্গ, এবং এই কর্ম্মক্ষেত্রে এক জাতীয় পুস্তক। এই সকল পুস্তকই স্মাইলের অনুকরণে লিখিত। এরূপ পুস্তকের প্রচার ভিন্ন এ জাতির উদ্ধারের পথ নাই। বিধাতা শশিভূষণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে আদৃত হউক।

গ্রন্থের ভাষা, বিষয়-নির্ব্বাচন, রুচি—সকলই সুন্দর, অতি সুন্দর।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমতে জন্মান্তরবাদ। *

হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধদিগের নিকট পুনর্জ্জন্ম (Reincarnation) নূতন কথা নহে। জন্মান্তরবাদ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও দর্শনের অন্তর্ভূত। পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন না। ডারুবিন (Darwin) অথবা মোসেস্-প্রমুখ (Moses) ধর্ম্মবীরগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের ধ্রুব সত্য। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর ভোগ পূর্ণ করিয়া লয়, তৎপরে এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন হয় অনন্ত স্বর্গ, না হয় অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে। এই পৃথিবীতে জন্মাইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং কোথা হইতেই বা সে আসিতেছে,—ইহার উত্তরে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ নীরব। তাঁহারা অতীত জন্ম মানেন না এবং বলেন যে, জীবের অস্তিত্ব এই জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে মনুষ্যের আত্মা একটী যষ্টির ন্যায়,—এই যষ্টির এক প্রান্ত মনুষ্যের হস্তে রহিয়াছে এবং অন্য প্রান্ত অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ যষ্টি যেমন মনুষ্যের হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তে মিশিয়াছে, সেইরূপ তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যের আত্মা ইহজন্মে এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তে মিশিয়াছে। যাহার এক প্রান্ত অনন্তে বিস্তৃত, তাহার অন্য প্রান্তও অনন্তে বিস্তৃত হওয়া চাই, নতুবা ঐরূপ যষ্টির অস্তিত্বের কল্পনাও অসম্ভব; সেইরূপ, আত্মা ইহজন্মে এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া পরজন্মে অনন্তে মিশিতে পারে না, অনন্তে মিশিতে হইলে তাহার উৎপত্তিও অনন্তে মানিতে হইবে। সুতরাং পাশ্চাত্যদিগের মত যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস দুই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই ভিত্তিদ্বয় প্রতীচ্য সভ্যজাতিরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। প্রথম ভিত্তি হইতেছে, ক্রমবিকাশের আধ্যাত্মিক উৎপত্তিতে (Spiritual origin of evolution) বিশ্বাস, এবং দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে, মনুষ্যের ভিতর যে সূত্ররূপী আত্মা রহিয়াছে,—যাহাকে আমরা 'অহং' (self) বলিয়া থাকি—তাহাতে বিশ্বাস। এই আত্মা অনন্তের পথে চলিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া ইহার বিকাশ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই আত্মাই মনুষ্যের দেহকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে এবং মৃত্যুর পর অল্পাধিক সময়ের মধ্যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রস্থান করিতেছে। যেমন সূত্রে মুক্তা সকল গ্রথিত থাকে, সেই প্রকার এই সূত্রাত্মায় মনুষ্যের বিভিন্ন জীবন গ্রথিত রহিয়াছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার জীব বিরাজ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ সৃষ্টির উচ্চ সোপানে এবং কেহ বা নিম্ন সোপানে রহিয়াছে, কিন্তু এই সমুদয় সৃষ্টি এক সঙ্গে ধরিতে গেলে, উহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। তাহাদিগের আরও ধারণা এইরূপ যে, সৃষ্টির প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন

---

* দর্জ্জিপাড়া পরাবিদ্যালোচনা সমিতিতে পঠিত। লেখক।

জাতি, তাহাদিগের জাতীয় হিসাবে তাহারা পূর্ণ (perfect),—একটী মৎস্য তাহার জাতীয় হিসাবে সে সম্পূর্ণ, তাহাকে একটী অসম্পূর্ণ পক্ষী বলা যায় না, কিম্বা কোন পক্ষীকে একটী অসম্পূর্ণ স্তনপায়ী জীব (mammal) বলা যায় না। নিম্নোক্ত দুইটী বিষয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহার নির্দ্ধারণ করাই হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য,—প্রথমতঃ সমুদয় সৃষ্টির ক্রমোন্নতি সাধন এবং দ্বিতীয়তঃ উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সম্পূর্ণতা বিধান। পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় তাঁহারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ (types) পাইয়া সন্তুষ্ট হন না, কিম্বা এইরূপ বলেন না যে, কতকগুলি আদর্শ ক্রমশঃ বিকাশ পাইয়া, মনুষ্যরূপে পরিণত হইতেছে এবং অন্য আদর্শ সকল বিভিন্ন দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া, কোনটী বা উদ্ভিদ এবং কোনটী বা জন্তুরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

প্রাচ্যরা ঐ দুইটী বিষয় এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক জাতীয় জীবন্ত বস্তু সেই জাতীয়ের উপযোগী জীবাত্মা সমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে; প্রত্যেক জীবাত্মাকে সূত্রাত্মা বলা হয় এবং যে পঞ্চভৌতিক আকৃতিকে উহা অনুপ্রাণিত করে, সেই পার্থিব শরীরের সসীমত্বের উপর, উহার পার্থিব বিকাশের শক্তি, সেই সময়ের জন্য নির্ভর করিয়া থাকে; এবং উক্ত প্রকার আকৃতির সম্ভবানুসারে উহার কামনা সকলও বাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উহার পার্থিব শরীরের সম্ভবানুযায়ী কার্য্য করিলে উহা সুখী হয়, এবং অসম্ভবানুযায়ী কার্য্য করিতে যাইলে দুঃখ অনুভব করে। যেমন, যখন কোন আত্মা মৎস্যের শরীরে বাস করে, তখন পক্ষীর ন্যায় ইহার উড্ডীয়মান হইবার অথবা বাদরের ন্যায় লম্ফ ঝম্প করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, উহার ঐরূপ করিবার কামনাই হয় না। ইহা যতকাল মৎস্য জন্মগ্রহণ করিবে, ততকাল তাহার মৎস্যরূপ জন্মের সংবিতে ঐ প্রকরে উড্ডীয়মান হইবার অথবা বৃক্ষারোহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদয় হইবে না এবং তজ্জন্য তাহাকে দুঃখিত চিত্তে কাল যাপনও করিতে হইবে না। প্রাচ্য মনীষিগণের মত এইরূপ নহে যে, মনুষ্যের আত্মা অথবা অপর কোন জন্তুর আত্মা অনন্তকাল ধরিয়া,কেবল মাত্র তাহার জাতীয় গুণ সকল (characteristics) সংগ্রহ করিতে করিতে ক্রমবিকাশের (Evolution) পথে অগ্রসর হইবে। সেইজন্য পাশ্চাত্যদিগের যে ধারণা আছে যে,মনুষ্যের ক্রমশঃ বিকাশ হওয়াতে, ভবিষ্যৎ কালে মানব সমূহ সমুন্নত ও গৌরবান্বিত 'রাম' 'শ্যাম' অথবা 'হরি'রূপে পরিণত হইবে—সেই ধারণাকে তাঁহারা অসার বলিয়া ত্যাগ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, যেমন অনগ্রসরাবস্থা সকল উন্নতির চরমসীমা নহে, তদ্রূপ মনুষ্যত্বও উন্নতির চরম সীমা নহে। যেমন শিক্ষা কিম্বা ধৌতি দ্বারা কোন শৃগাল কিম্বা গর্দ্দভকে মনুষ্য সমাজের উপযুক্ত করিতে পারা যায় না, সেইরূপ, বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা, শরীরের মলধৌতির দ্বারা অথবা সুশিক্ষার দ্বারা যতই কোন ব্যক্তিকে সুসভ্য করা হউক না কেন, সে কখনই স্বর্গীয় বাসের এবং স্বর্গীয় সমাজের যোগ্য হইবে না। প্রাচ্যরা এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, যখন কোন আত্মা ভিন্ন

ভিন্ন আকৃতিতে পর পর বাস করিতে থাকে, তখন ইহার বিকাশের জন্য, প্রত্যেক নূতন পাত্রের শারীরিক এবং মানসিক সামর্থানুসারে, উন্নতির প্রত্যেক সোপানে ইহার সংবিতের প্রসারণ (ekpansion) হইতে থাকে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, আত্মার যখন বিকাশ হয়, তখন ইহাতে যদি অসীম প্রসারণের ক্ষমতা গুপ্তভাবে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে ক্রমবিকাশ বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকিত না। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, যদি বাষ্পের প্রসারণের (expansive) ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে বাষ্পীয় যন্ত্রের দণ্ড (piston) কখন পরিচালিত হইত না,—এই প্রসারণের ক্ষমতাকে প্রাচ্যরা কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বটবৃক্ষের ফলের ভিতর প্রসারণের ক্ষমতা বা কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়াই, ঐ ক্ষুদ্র বীজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আত্মার ঐরূপ প্রসারণের ক্ষমতা আছে।

আধুনিক সুসভ্যজগৎ ক্রমবিকাশকে (Evolution) যে 'স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের' ('Spontaneous variation') কারণ স্বরূপ বলেন,—যাহা মানিতে হইলে এই বিশ্বকে একটী বিশাল সংঘটনের (accident) ফলস্বরূপ বলিতে হয়,—তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় না। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের অস্তিত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা, কোন অনুসন্ধিৎসু বালকের তৃপ্তি আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিবেকী পুরুষ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না। যাঁহারা বলেন যে, এই বিশ্ব কোন নিয়ম অনুসারে পরিচালিত নহে, কেবলমাত্র 'স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন' এবং 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' (Survival of the fittest), এই দুই নীতির দ্বারা চালিত হইয়াছে, তাঁহারা একবার ভাবেন না যে, কেমন করিয়া একই প্রকার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন অন্যগ্রহ উপগ্রহেও সংঘটিত হইয়া স্থায়ীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে—অথচ, কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহ অপর কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে না। একই মৃণ্ময় ছাঁচ (mould) হইতে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে,—এইরূপ বাক্যের ন্যায় তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত মতও অতীব হাস্যাস্পদ। সেই জন্যই, যে ছাঁচ হইতে একই প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রাচ্যরা এইরূপ একটী মহান ছাঁচের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ ছাঁচটীকে তাঁহারা একটী নিয়ম বলিয়া অবগত আছেন এবং বলেন যে, ঐ মহান নিয়ম অনুসারে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। ঐ নিয়মটী হইতেছে আত্মার অন্তর্বিকাশ বা পরিণমণ(Involution of spirit)।

মহামতি ডারবিন (Darwin) বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের জন্য আমরা মাটীর পোকাদিগের (Earth worms) নিকট ঋণী, ঐ পোকা না থাকিলে জমী (soil) প্রস্তুত হইত না, জমী প্রস্তুত না হইলে উদ্ভিদ্ রাজত্বের সৃষ্টি হইত না এবং উদ্ভিদ রাজত্বের সৃষ্টি না হইলে জীব রাজত্বের অস্তিত্ব থাকিত না। প্রাচ্যরাও ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং বলেন যে, অবিকল পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে অন্তর্বিকাশের নিয়ম (Law of Involution) পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যখন কোন জীবাত্মা (Ego)—বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে—যদিও

সামান্য কার্য্য করিবার জন্য বিকাশোন্মুখ হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা তখন মহৎ কার্য্য করিবার সূত্রপাত করে। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা সে তাহার ভিত্তি স্থাপিত করিয়া লয়; ভিত্তি স্থাপিত হইলে উহা তখন অন্যান্য যন্ত্রাদি লইয়া—বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে—তদপেক্ষা উন্নত কার্য্য আরম্ভ করে; সেই কার্য্য শেষ হইলে অন্য যন্ত্র লইয়া তাহা অপেক্ষা কঠিন এবং বিস্তৃত কার্য্য করিতে থাকে; কিন্তু বিকাশের (Manifestation) এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহারা একই জীবাত্মা (Ego) মাত্র,—ঠিক যেমন একই ব্যক্তি, যখন রন্ধন করে, তখন 'রাঁধুনি' ব্রাহ্মণ হয়, যখন পূজা করে, তখন 'পূজারি' হয়, যখন আফিসে যায়, তখন কেরানী হয় এবং যখন বিস্কুট বিক্রয় করে, তখন 'বিস্কুটওয়ালা' হয়। সমাজের উচ্চনীচ সোপানে দাঁড়াইয়া, কেহ যেমন তুলার চাষ করিতেছে, কেহ তাহাকে বিক্রয় করিতেছে, কেহ তাহাকে ধুনিতেছে, কেহ সূত্র প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কেহ বা সেই বস্ত্র পরিধান করিতেছে এবং যেমন একই সময়ে ঐ সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে, সেই প্রকার বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার জীবত্মা (ego) সমূহের কার্য্য ক্রমাগত এবং পরপর হইয়া যাইতেছে এবং এই প্রকার ক্রমান্বয়ে কার্য্য হইতেছে বলিয়া আমরা এই বাসোপযোগী পৃথিবীর অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইতেছি।

অন্তর্বিকাশ-বাদীরা (Involutionists) বলেন যে, জীবাত্মার (Ego) অসীম প্রসারণের ক্ষমতা আছে। পাশ্চাত্যরা যাহাকে ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) বলেন এবং প্রাচ্যরা যাহাকে অন্তর্বিকাশ (Involution) বলেন, সেই উভয়ের ধারা একই প্রকার,—তবে ভিন্ন আলোকে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্রে। যখন জীবাত্মার (Ego) প্রতীচ্য মতানুসারে ক্রমাভিব্যক্তি হয়, অথবা প্রাচ্য মতানুযায়ী অন্তর্বিকাশ হয়, তখন কি প্রকারে উহার প্রসার হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, নিম্নলিখিত দুইটী চাপের (Pressures) ভিতর কি সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে,—প্রথমতঃ, চতুর্দ্দিকস্থ সসীম বাহ্যিক চাপ এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবিকাশের জন্য আত্মার প্রসারণরূপ আভ্যন্তরিক চাপ। যখন এই দুইটী চাপ সমান ও স্থায়ী হইয়া যায়, তখন ইহার বৃদ্ধি বা বিকাশ আর হয় না; যেমন কতকগুলি নিম্ন অবস্থার জৈবিক বিকাশ অতি পুরাকালে যাহা ছিল, এখনও তাহা রহিয়াছে। যখন কোন প্রাণীর চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্যিক চাপ, অন্তঃরস্থ শক্তির চাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই প্রাণীর ধ্বংস হইয়া থাকে; এবং যখন আভ্যন্তরিক চাপের আধিক্য ঘটে, কখন নূতন ও উন্নতজীবের জন্ম হইয়া থাকে। যেমন পুরাতন বৃক্ষে নূতন 'কলম' প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ঐ চাপের আধিক্য ঘটিলে পুরাতন বংশে নূতন নূতন ক্ষমতা ও মানসিক শক্তির আবির্ভাব হয়।

বিষয় দুইটী একই প্রকার, কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত থাকা বশতঃ অন্তর্বিকাশ ও ক্রমবিকাশ ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশবাদীরা বলিবেন যে, মনুষ্য সৃষ্টির অতি নিম্নস্তর হইতে আসিয়াছে,—মনুষ্যের জীবাত্মা (Ego) ক্রমান্বয়ে গ্রন্থিলজীব (Mollusc) মৎস্য, পক্ষী এবং অবশেষে পশুর ভিতর দিয়া আসিয়া এবং প্রত্যেক অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বশেষে

মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। অন্তর্বিকাশ বাদীরা বলেন যে, মনুষ্যের ভিতর যে আত্মা (Ego) রহিয়াছে, তাহা যে বহুযুগপূর্ব্বে ঐ সকল নিম্নস্তরের প্রাণীর ভিতর দিয়া আসিয়াছে,তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মনুষ্যের আত্মার যে ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি অথবা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এই দুই মতের ভিতর যে কত আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মনে করুন, একটী গৃহে দুইজন ক্রমবিকাশবাদী এবং অন্তর্বিকাশবাদী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্মুখের গৃহভিত্তির ভেদ করিয়া কেহ যেন সেই গৃহে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা প্রথমতঃ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের সম্মুখস্থ গৃহভিত্তিতে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল, কেমন করিয়া যে ছিদ্র হইল,তাহা তাঁহারা জানেন না; তাহার পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটী অঙ্গুলি বাহির হইল। তৎপরে তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, সেই অঙ্গুলিটী পুনরায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল; এবং ছিদ্রটী ঈষৎ বর্দ্ধিত হইল, ও তাহার ভিতর দিয়া একটী হস্ত বাহির হইল। ছিদ্রটী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহার ভিতর দিয়া যথাক্রমে মস্তক ও স্কন্ধাদি বাহির হইতে লাগিল এবং অবশেষে ছিদ্রটী এত বিস্তৃত হইল যে, উহার ভিতর দিয়া একটী মনুষ্য অক্লেশে বাহির হইয়া আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহা দেখিয়া ক্রমবিকাশবাদী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! অঙ্গুলিটী একটী হস্ত হইল, হস্তখানি মস্তক হইল এবং মস্তকটী একটী মনুষ্য হইল! কিন্তু পদের অঙ্গুলি অগ্রে বহির্গত না হইয়া, হস্তের অঙ্গুলি বহির্গত হইল কেন? পদের পরিবর্ত্তে প্রথমে হস্তই বা বহির্গত হইল কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে যে মনস্থ (design) ছিল,তাহা প্রকাশ পায় এবং তাহা হইলে ঈশ্বর কিরূপে বলা যায়? সুতরাং ঐরূপ ধারণা অসম্ভব। 'স্বতঃ বিস্তার'(Spontaneous Enlargment) এবং 'যোগ্যতমের উদ্গমন' (Protrusion of the fittest) এই দুই নিয়মের দ্বারাই ক্রমবিকাশ পরিচালিত হইতেছে।" কিন্তু অন্তর্বিকাশবাদী বলিবেন "বন্ধো! তুমি যেরূপ আশ্চর্য্যকর ভাবিতেছ, তাহা অপেক্ষা উহা আরও আশ্চর্য্যকর; সমস্ত ক্ষণ ধরিয়া ঐ মনুষ্যটী প্রাচীরের অপর পার্শ্বে ছিল; এবং আমরা যে সকল ঘটনা দেখিতেছিলাম, তাহা উহারই কৃত; সে প্রথমে প্রাচীরে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করে, পরে ঐ ছিদ্রটী বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে তাহার উপযোগী বিস্তৃত হইলে সে তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আইসে।"

কিন্তু অন্তর্বিকাশবাদী কখনও বলিবেন না যে, এই প্রকাশমান মনুষ্যজীবন জীবাত্মার(Ego) সম্পূর্ণ বিকাশ। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে অজ্ঞেয় ও অপরিমেয় আত্মা ছিদ্রটীর সম্পূর্ণ বিস্তৃতির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে যাহা হউক,উক্ত বিষয় আমাদের বর্ত্তমান সমালোচনার বহির্ভূত, কারণ উহা বুঝিতে হইলে কর্ম্ম ও জন্ম হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, তাহার বিচার করিতে হয়। প্রাচ্যদের মতে এক একটী পার্থিব জীবন, জন্ম ও মৃত্যুরূপ দুই শেষ প্রান্তের ভিতরে সূত্ররূপী আত্মার একু একু বার কম্পন

মাত্র। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া অসংযত শক্তিতে ঐ সূত্র কম্পিত হইতেছে। ঐরূপ প্রত্যেক কম্পনের অর্থ হইতেছে যে, এক একটী নূতন মন এবং তদুপযুক্ত এক একটী নূতন শরীর ধারণ,—যাহাকে একত্রিত করিয়া 'ব্যক্তিত্ব' (personality) বলা হয়। সূত্রে যেরূপ মুক্তা গ্রথিত থাকে, আত্মারূপী সূত্রে এক একটী 'ব্যক্তিত্ব' সেই প্রকারে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। জন্মান্তরবাদের এই অংশ লইয়া পাশ্চাত্যরা মহা গোলযোগে পড়িয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপ তর্ক করেন যে, "মনের এবং শরীরের যদি পুনরবতারণা বা পুনর্জ্জন্ম না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি গুণ বা দোষের সমষ্টি, অথবা কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ সংস্কার বা কতকগুলি বিদ্যার সমষ্টি,—যাহাকে আমরা 'রাম' 'শ্যাম', অথবা 'হরি' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি,—তাহাদিগের কখনও পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। সুতরাং মৃত 'রামের' কর্ম্মফল একজন নূতন 'শ্যাম' বা 'হরির' উপরে আসিয়াছে, এইরূপ বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইহা ভিন্ন, পূর্ব্বোক্ত গুণ, দোষ ইত্যাদির সমষ্টিকেই আমরা ভালবাসি এবং অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের সহিত লইয়া যাইতে চাই।"

প্রাচ্যরা বলেন যে, তুমি তোমার প্রিয় জনের যাহা ভালবাস, অথবা তোমার প্রিয়জন তোমার যাহা ভালবাসেন,—তুমি যাহাকে দোষ গুণ ইত্যাদির সমষ্টি বলিতেছ,—তাহা ক্ষণস্থায়ী 'অহং' নহে, তাহার ধ্বংস হয় না। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচ্যদিগকে মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাদান করিতে আসিয়া থাকেন, তাহাদের 'অহং' (self) সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দেখিয়া প্রাচ্যরা বিস্মিত হন। ক্ষণস্থায়ী 'অহং'—যাহাকে 'ব্যক্তিত্ব' বলা হয়, এবং যে 'অহং' অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে,—সেই 'অহং'এর ভিতর যে কি পার্থক্য আছে, তাহা ঐ সকল পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন না; এবং ঐরূপ পার্থক্য বিদ্যমান আছে কিনা, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। তাঁহাদিগের অজ্ঞতার কারণ হইতেছে, এ শিক্ষার দোষ। পাশ্চাত্যরা তাঁহাদিগের বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে এইরূপ শিক্ষা করিয়া থাকেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক স্মৃতির বাসের স্থান এবং ভাণ্ডার বিশেষ এবং স্মৃতি আছে বলিয়াই আমাদের অস্তিত্বের জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, "আমার অস্তিত্ব"এবং "আমার রাম বলিয়া অস্তিত্ব" এই দুইটী জ্ঞান দুইটী বিভিন্ন প্রকার সংবিতের উপর স্থাপিত এবং আমাদের মস্তিষ্কের সহিত আমাদের অস্তিত্বের জ্ঞান কোন প্রকার সংশ্লিষ্ট নহে; কিন্তু ঐ আত্মারূপী সূত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং ঐ একমাত্র অস্তিত্বের জ্ঞানই উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত সকল সজীব পদার্থে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন সজীব পদার্থ ঐ জ্ঞান হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না এবং ঐ জ্ঞান রহিয়াছে বলিয়াই ঐ সকল পদার্থ সজীব রহিয়াছে। প্রাচ্য দর্শনে "আমার অস্তিত্ব" (I am) এবং "আমার রাম বলিয়া অস্তিত্ব"(I am Ram) এই দুইপ্রকার সংবিতের ভিন্নতার উপর সমস্ত মনোবিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতীচ্য দর্শনে এই

দুই প্রকার বিভিন্ন সংবিতের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। মনুষ্যের ভিতর যাহা চিরস্থায়ীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাকে অবগত হওয়ার নামই যথার্থ আত্মজ্ঞান এবং মনুষ্য যখন সেই আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখনই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এই আত্মজ্ঞান কি প্রকার? 'আমি' অর্থাৎ জীবাত্মা (Ego) যে অনন্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং সম্পূর্ণতার আধার, এবং ঐ সকল 'আমরই' গুণ বলিয়া কেহ আমাকে ঐ সকল গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না,—এইরূপ জ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান। কিন্তু ঐ সকল ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে আমি এক্ষণে পরিচালনা করিতে, ধারণা করিতে, কিম্বা অনুধাবন করিতে পারিতেছি না, কারণ, এক্ষণে আমার মনের ও শরীরের প্রত্যেক শক্তি উহাদিগকে সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ করিয়া চাপিয়া রহিয়াছে এবং আমি যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চাই, সেই পূর্ণতাকে উহারা অনিশ্চিত ও সংশয় পূর্ণ আশামরীচিকায় পরিণত করিয়াছে।

প্রাচ্যেরা বলেন যে, আমাদের গাত্রাবরণকে যেমন আমরা 'আমি' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, সেই প্রকার আমাদের শরীর রূপ আবরণকে আমরা যথার্থ 'আমি' বলিতে পারি না। মনুষ্যের আত্মাই মনুষ্যের যথার্থ 'আমি'। এই চিন্তাশীল জীবাত্মা (Ego) আছে বলিয়াই মনুষ্যকে জন্তু হইতে পৃথক করা হইয়াছে। যদি কোন উন্মাদের মধ্য হইতে এই চিন্তাশীল জীবাত্মাকে উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে যদিও মনুষ্যের ন্যায় থাকে, তত্রাচ তাহার এবং জন্তুর ভিতর কোনই প্রভেদ থাকে না; এই জীবাত্মাতে (Ego) জন্মজন্মান্তরের ভূয়োদর্শন সঞ্চিত থাকে। এই আত্মাই বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইহাতেই স্মৃতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান (Intuition) এবং ইচ্ছা নিহিত থাকে। ইহাদিগকে আত্মার কিরণ বলা যাইতে পারে। ইহারা আমাদের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। যেমন কেবল মাত্র বীণা হইতে সুমধুর শব্দ নির্গত হয় না, সেইরূপ কেবলমাত্র মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার স্রোত বহির্গত হয় না;—উভয় উদাহরণে একজন যন্ত্রীর প্রয়োজন। যন্ত্রী না থাকিলে যন্ত্র কোন প্রয়োজনে আইসে না। কিন্তু যন্ত্রীর নিজকে যন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, যন্ত্রের সামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। আমাদের শরীর যন্ত্রের ন্যায় এবং আমাদের জীবাত্মা (Ego) যন্ত্রীর ন্যায়। শরীর ত্যাগ করিয়া আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের শরীর রূপ আবরণ এবং তাহার সহিত আমাদের তদ্ 'ব্যক্তিত্ব' (Personality) জন্মান্তরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাচ্যেরা জন্মান্তরকে অন্তর্বিকাশরূপ যন্ত্রের কার্য্যবিশেষ বলিয়া অবগত আছেন, এবং তাঁহারা বলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিতে গেলে আত্মার অন্তর্বিকাশকেই স্বভাবতঃ প্রথম সোপান বলিতে হয়। কারণ, অন্তর্বিকাশ (Involution) বাদ দিয়া কেবলমাত্র ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) আলোচনা করাও যে প্রকার, আর; কোন মনুষ্যের 'আয়' বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার 'ব্যয়' সম্বন্ধে আলোচনা করাও সেই প্রকার। পাশ্চাত্য মনীষিগণ যখন সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া এই বিশ্ব, প্রতিযোগীতার (Competition) উপর অর্থাৎ সাধারণ অন্যোন্য স্বত্ব সংরক্ষণের চেষ্টা (Struggle for existence) উপর নির্ভর করিতেছে,—এই প্রকার মতে উপনীত হন, তখন প্রাচ্যরা তাঁহাদের ঐ প্রকার মত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা অবগত আছেন যে, এই বিশ্ব সহযোগীতার (Co-operation) ফল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য অত্মবিকাশবাদীরা ইহা মানিয়া থাকেন যে, প্রতিযোগীতা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য, কারণ উহা যে কেবল আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, উন্নতির জন্যও প্রয়োজনে আসিয়া থাকে; কিন্তু প্রাচ্যরা জানেন যে, প্রতিযোগীতার মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিলে, আমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, এমন জীব সমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করিয়া, উহা স্বীয় উন্নতির উপায় স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এবং তাঁহারা আরও অবগত আছেন যে,যে সহযোগীতার নিয়ম (Law of Co-operation) প্রতিযোগীতার নিয়ম Law of competition) অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, সেই সহযোগীতার মূলে উহা কুঠারাঘাত করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যরা সহযোগীতার যাহা দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের স্বকীয় স্বার্থ সাধনের পন্থা বিশেষ। প্রাচ্যরা বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্ব সহযোগীতা সম্ভূত, প্রতিযোগীতা-সম্ভূত নহে। তাহাদের বিশ্বাস এইরূপ যে, সহযোগীতা হইতে সংযোগ, সমবেত, গঠন এবং উন্নতি হইয়া থাকে। নূতন ক্ষমতা সমূহ আহরণ করার নামই সহযোগীতা, যদি ইহাকে সুনিয়মে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক অংশের, সুতরাং সমুদয়ের,—সুখ বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু যখন প্রতিযোগীতার মাত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং অপরের স্বত্বে আক্রোশ জন্মায়, তখন বিসম্বাদ, অনৈক্য, অনিয়ম ও ধ্বংস হয় এবং উহা অন্যায় বিচারে ও মহা অনিষ্ট রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

যে পরিমাণে প্রত্যেক জন্তুর সহজজ্ঞানের (instincts) ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে ঐ জন্তুর বিকাশ হইয়া থাকে। তাহাদের সংবিতের যত প্রসারণ হইতে থাকে, তাহাদের সহজ জ্ঞানেরও তত পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং উহারা কতকগুলি পুরাতন সহজজ্ঞান ত্যাগ এবং কতকগুলি নূতন সহজজ্ঞান গ্রহণ করিতে থাকে। নিম্ন স্তরের প্রাণিদের 'অনুবর্ত্তন অথবা মৃত্যু' (Confirm or die) এই নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যদের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। মনুষ্য অন্য প্রাণিদের ন্যায় একেবারে অবস্থার দাস হইয়া পড়ে না, তাহাদের উন্নতির নূতন নিয়ম না মানিয়াও তাহারা বুদ্ধিবলে মৃত্যুরূপ শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে এবং তাহাদের পূর্ব্বকার এবং নিম্নস্তরের উন্নতিতে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে। পাশবিক (animal) অবস্থা হইতে মানবীয় অবস্থায় আসিতে তাহাদের সংবিতের প্রসারণ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাদের উপযোগী মানবীয় সহজ জ্ঞান (human instincts) ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিম্নস্তরের পাশবিক সহজ জ্ঞান (animal instincts) গ্রহণ করে; এবং পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্ত থাকাতে সেই অনুসারে চলা তাহাদের পক্ষে সহজ বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং নূতন নিয়ম অনুসারে,—অর্থাৎ সহযোগীতার (Co-operation) সহজ জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া এবং প্রতিযোগী-

তার (competition) সহজজ্ঞান হ্রাস করিয়া,—রীতিমত চলিতে সক্ষম হইবার জন্য এখনও মনুষ্যদিগকে অনেক দিন ধরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্যের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমুলক (Intellectual) এবং রাগমুলক (Emotional) সহযোগীতাই প্রকৃত সহযোগীতা, অর্থাৎ যখন আপনা আপনি, এবং বিচার বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিন্তার দ্বারা, অনুভবের দ্বারা এবং রাগের (Emotion) দ্বারা অন্য লোকের সুখ দুঃখ, আমাদের নিজেদের সুখ দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে, তখনই প্রকৃত সহযোগীতা বলা যাইবে। মনুষ্য জীবনের এইরূপ সহজ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সহজ জ্ঞান। প্রকৃতি সকলের নিকট সমপ্রাণতা (Harmony) চায়, এবং মনুষ্য জাতি শত কামনা ও বাসনা যুক্ত হইয়াও যদি শান্তি ও সম-প্রাণতার সহিত থাকিতে চায়, তাহা হইলে সহযোগীতা (Co-operation) ভিন্ন আর অপর কোন উপায় নাই।

সহজ জ্ঞানের (instincts) পরিবর্ত্তন কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সমুদ্র কিম্বা নদীর তীরস্থ পাহাড়ে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা জীবনের প্রথম অংশ পাহাড়ে কাটাইয়া থাকে, তাহার পর সন্তরণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের নিকট যে সকল খাদ্য আসিয়া থাকে, সেই সকল খাদ্য যখন তাহারা আহরণ করে, তখন তাহাদের সহজ জ্ঞান অনুসারে আহরিত খাদ্যসমূহকে নিজের স্বত্ব বলিয়া বুঝিয়া থাকে; সুতরাং তখন শান্তিতে এবং পৃথক পৃগক ভাবে বাস করিতে থাকে। তখন তাহারা প্রতিযোগীতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না, কিম্বা সহযোগীতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। কিন্তু তাহারা যখন সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন দেখিতে পায় যে, তাহাদের জাতীয় অপর প্রাণীরাও সমান ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া, একই সময়ে যে কোন খাদ্য তাহাদের সম্মুখে আসে, তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং গ্রহণ করিবার সমান অধিকারও আছে। এইরূপে প্রতিযোগীতা ও বিবাদের সূত্রপাত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতিযোগীতাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর লইয়া যাইলেই, উহা ধ্বংসের কারণ হয় এবং সাধারণ একপ্রাণতাকে নষ্ট করে; সুতরাং শীঘ্রই ঐ সকল প্রাণীদের হিংসা দূরে যায় এবং দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা ও একপ্রাণতা উপস্থিত হয় এবং অবশেষে প্রত্যেক প্রাণী তাহার প্রতিবেশীর অংশের উপর লোভ না করিয়া, নিজে নিজের অংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে। প্রাণিগণ যতই অন্তর্বিকাশের সোপান পরম্পরায় অধিরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের জীবন জটিল হইতে থাকে এবং ততই ধীরে ধীরে এবং বিশেষ কষ্টের সহিত তাহার পুরাতন সহজজ্ঞানের লোপ পাইতে থাকে এবং নূতন সহজ জ্ঞানের বীজ রোপিত হয়। মনুষ্যদের পক্ষে দলবদ্ধ হইয়া থাকা অর্থে একপ্রাণতা ও পরদুঃখকাতরতা বুঝাইয়া থাকে, এবং পার্থক্যতা অর্থে বিদ্বেষ ও প্রতিযোগীতা বুঝাইয়া থাকে। মন্দ হইতে ভাল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরাতন বা নীচ সহজজ্ঞান সকল বলবতী থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য পুরাতন সহজ জ্ঞান সমূহকে অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র যে সৎ অভ্যাসের (habits) প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, সৎ সহজ জ্ঞানেরও বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের চিরস্থায়ী 'আমিতে' সহজ জ্ঞান (instincts) বাস করে এবং ক্ষণস্থায়ী 'আমিতে' অভ্যাস (habits) বাস করে। যাহাকে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি বলা যায়, তাহা তাহার স্বীয় (individual), ব্যক্তিগত (personal) নহে এবং সেই উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদের পুরাতন সহজ জ্ঞান সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া নূতন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সৎ সহজ জ্ঞান সমূহের বীজ বপন করিতে হইবে। কি উপায়ে এই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার উত্তরে প্রাচ্যজ্ঞানীরা বলেন যে, জন্মান্তর ইহার একমাত্র উপায়। কোন বিষয়ের পুষ্টিসাধন বলিলে যেমন সেই বিষয়ের বয়োজীর্ণ এবং নিষ্ফল বিষয় সমূহের ত্যাগ এবং সারবস্তু সমূহের শোষণকেই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যের উন্নতিসাধন বলিলে তাহার ক্ষণস্থায়ী "ব্যক্তিত্বের" (personality) ধ্বংস বুঝাইয়া থাকে এবং তাহার সহিত তাহার প্রত্যেক পার্থিব জীবনে সে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এবং রাগমূলক বিষয় আহরণ করিয়া থাকে, তাহার অসার অংশ সমূহের (যেমন, নির্ব্বুদ্ধিতা, মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এবং গর্ব্ব প্রভৃতির) ত্যাগও বুঝাইয়া থাকে। এই সকল অসার অংশ আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সহিত ওতপ্রোতঃভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে আমরা আমাদের পুষ্টিকর অংশ সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে এবং এমন কি, ইহাদিগের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেও পারি না; এই সকল অসার, এবং ধ্বংসকারী অবশিষ্ট অংশ সকল আমাদের পূর্ব্বকার পাশবিক অবস্থারই উপযোগী। সকলেই অবগত আছেন যে, যখন আমরা নিদ্রা যাই, তখন আমরা পরিপুষ্ট হইয়া থাকি, সেইরূপ একজন্ম হইতে অন্য জন্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি বা উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। যখন আত্মা "হিসাব নিকাশ" করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তখন পুরাতন ভুল ও অন্ধসংস্কার সমূহ ত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে এবং আত্মা যখন বিশ্রাম লইতে গিয়াছিল, তখন কালপ্রবাহে সংসারে যে সকল নূতন বিষয় এবং নূতন চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল বিষয় ও চিন্তার গঠনোপযোগী নমনীয় (plastic) মন লইয়া অবতীর্ণ হয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাশ্চাত্যেরা ক্রমবিকাশবাদ অবলম্বন করিয়া যেরূপে সৃষ্টির মীমাংসা করিয়া থাকেন, তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ মতভেদ হইবার কারণ এই যে, পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, ক্রমবিকাশের জন্য স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, পাশ্চাত্যদিগের ঐ ধারণা ঠিক নহে; তাঁহাদের মতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ শুদ্ধা 'চিৎ' হইতে এই জগৎ'রূপ বিষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব অন্তর্বিকাশের (involution) হেতু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আত্মার উন্নতি হইতে পারে না, আত্মার অন্তর হইতে বিকাশ হইতে থাকে মাত্র। বৈজ্ঞানিক আলোকের দ্বারা লব্ধ সত্য

আবিষ্কার হওয়াতে পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ডারুবিনের মত ঠিক নহে এবং "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" এই নীতির দ্বারা জগৎ চলিতে পারে না। প্রাচ্যরা বলেন যে, অন্তর্বিকাশবাদ হইতে আমরা এইরূপ অবগত হইয়া থাকি যে, আত্মার (Ego) বিকাশ মনুষ্যে যে প্রকার হইয়াছে, অন্য প্রাণিতে এখনও সেই প্রকার হয় নাই; অর্থাৎ, আত্মার বিকাশের জন্য মনুষ্য যে প্রকার যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, অন্য প্রাণিকে সেইরূপ যন্ত্র স্বরূপ পরিণত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অপর কোন প্রাণী মনুষ্যের জীবাত্মাকে (Ego) বহন, উপযোগী এখনও হয় নাই। আত্মার অন্তর্বিকাশই পুনর্জন্মের কারণ। আত্মার উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ হইবে বলিয়া পুনর্জন্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গৃহের পূর্ণতালাভ এখনও হয় নাই; পূর্ণতালাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরমোৎকর্ষ। মনুষ্য যখন আত্মার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে, তখন তাহার জন্মচক্র রোধ হইবে; তাহার আর জন্মের প্রয়োজন হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনুষ্যের বিশিষ্ট জাতিকুল কিম্বা বিশিষ্ট বর্ণযুক্ত হইয়া বিশিষ্ট দেশে জন্ম হইবার কারণ কি, এবং কেহ বা পুরুষ হইয়া এবং কেহ বা স্ত্রীলোক হইয়া জন্মায় কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্মফল ঐ সকলের কারণ। অতীত জন্ম সমূহের ফলে আত্মা যে প্রকার চরিত্র গঠন করিয়াছে,সেই চরিত্রের উপযোগী বিকাশের জন্য, যেরূপ বর্ণ, বংশ ও জাতির ভিতর জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকে, মনুষ্য সেইরূপ বংশ, বর্ণ কিম্বা জাতির উপযোগী শরীর এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদুপযুক্ত ফল ভোগ করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। মৃত্যুর পর যখন সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন তাহার অতীত জন্মে সে যে সকল ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে তাহার জন্ম হইবে এবং এই পৃথিবীতেই তাহার পাপের জন্য ফলভোগ করিতে হইবে। যেমন নূতন উপকরণের, বর্ণের, অথবা আকৃতির পরিচ্ছদের দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুর পর যখন পুনর্জন্ম হয়, তখন সেই অসীম, পুরাতন আত্মাকে নূতন "ব্যক্তিত্বের" দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় মাত্র। যে এই 'ব্যক্তিত্ব' গ্রহণ করে, সে পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এখনও সেই পুরাতন আত্মা মাত্র। কিন্তু মনুষ্য কি প্রকারে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই। কেহ বলেন যে, একই আত্মা যখন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন পুরুষের ভূয়োদর্শন এবং যখন স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন স্ত্রীলোকের ভূয়োদর্শন সঞ্চয় করিয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম ফলভোগের নিমিত্ত ঐ পুরুষ অপর জন্মে স্ত্রী হইয়া জন্মাইবে এবং ঐ স্ত্রী পুরুষ হইয়া জন্মাইবে।

জন্মান্তরবাদের প্রমাণস্বরূপ দুই একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১) এমন দুই একজন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন,

যাহারা তাঁহাদের অতীত জন্মের ঘটনা সমূহ বলিতে পারেন। (২) সমুদয় প্রাণী-জগৎ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য ভিন্ন অপর সমুদয় প্রাণীর নৈতিক ও মানসিক উন্নতি স্থিরভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যেরই কেবল নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হইতেছে, কিন্তু অপর প্রাণীর উক্ত উন্নতি মোটে হয় নাই। মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ (heredity) হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের ভূয়োদর্শন সংগৃহীত হয় না। ইতিহাস হইতে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, জন্তু সকল পূর্ব্বে যেরূপভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এখনও সেইরূপ ভাবে করিতেছে; যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা একই ভাবে রহিয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, মনুষ্যের আত্মা জন্মজন্মান্তরের ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু অপর প্রাণিদিগের সেইরূপ হয় না বলিয়া, তাহারা স্থিরভাবে রহিয়াছে। (৩) যদি মানসিক এবং নৈতিক স্বভাব পিতা মাতা হইতে লাভ করা যায়, তবে একই পিতা মাতার সন্তানসমূহ বিভিন্ন প্রকারের হয় কেন? জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ; মানসিক এবং নৈতিক গুণসমূহ আত্মাতেই অবস্থিতি করে; পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত স্থূল শরীরে বাস করে না। (৪) পূর্ব্বোক্ত পার্থক্য জমজ সন্তানদের ভিতর স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। একই পিতা মাতার সন্তান, দেখিতে একই প্রকার, কিন্তু তাহাদের ভিতর মানসিক ও নৈতিক গুণের প্রভেদ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ। (৫) শৈশব অবস্থায় কোন কোন বালকের যে অকাল পক্কতা লক্ষ্য করা যায়, তাহা জন্মান্তরবাদের অন্যতম প্রমাণ। মোজার্টের (Mozart) ন্যায় চতুর্বৎসর বয়স্ক বালকের অদ্ভুত সঙ্গীত শক্তি "পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ" এই নিয়মের (Law of heredity) দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। মোজার্টবংশে অনেক বালক ছিল, কিন্তু ঐ বালকই বা ঐরূপ শক্তি সম্পন্ন হইল কেন, ইহার উত্তর কেবল জন্মান্তর-রহস্য হইতেই বুঝা যায়। (৬) বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতিভার (genius) ব্যাখ্যা, জন্মান্তর রহস্য না মানিলে, আর কোন প্রকারে মীমাংসা করা যায় না। (৭) অবস্থার অসমানতা, অর্থাৎ কেহ উচ্চ, কেহ বা নীচ হইয়া জন্মায় কেন, তাহার ব্যাখ্যা জন্মান্তরবাদ হইতেই প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে, যাহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যের আত্মা অমর এবং এক একটী জন্ম উহাতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে সুন্দর উপদেশ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "সেই আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়, এই বিনাশধর্ম্মশীল সমস্ত দেহ তাঁহার, ইহা তত্ত্বদর্শিগণ কহিয়াছেন। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হয়েন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়েই আত্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। কেননা,

আত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না। আত্মার কখন জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই, আত্মার হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই, তিনি অজ, নিত্য, অক্ষয় ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। হে পার্থ! যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কিজন্য এবং কিরূপে কাহাকে হনন করিবেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন! মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নববস্ত্র গ্রহণ করে, দেহীও তদ্রূপ এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শস্ত্রসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিও দাহ করিতে পারে না, জলও আর্দ্র করিতে পারে না, এবং বায়ুও শোষণ করিতে পারে না। আত্মা ছিন্ন, ক্লিন্ন, দগ্ধ বা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন, ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে।” (গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮-২৪।)

জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে যে দুএকটী আপত্তি উত্থাপিত করা হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা যাউক। (১) প্রথম আপত্তি হইতেছে যে, স্মৃতির ধ্বংস হয় কেন? যদি মনুষ্যের বার বার জন্ম লইয়া থাকে, তবে তাহার অতীত জন্মের ঘটনা মনে থাকেনা কেন? পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের আত্মা প্রতিজন্মে ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিয়া থাকে। মনুষ্যের ‘ব্যক্তিত্ব’ লইয়া মনুষ্যের ‘রাম’ ‘শ্যাম’ ইত্যাদি উপাধি হয়। একই আত্মা একজন্মে ‘রাম’, অন্যজন্মে এবং অপর জন্মে হয়তো ‘হরি’ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। ভাবী জন্মের চরিত্র অতীত জন্মের উপর নির্ভর করিতেছে, আমরা যদি এই জন্মে ভাল হই, তবে আমাদের ভাবী জন্মও ভাল হইবে। যিনি যথার্থ ‘আমি’,—অর্থাৎ আমাদের আত্মা,—তিনি সকল জন্মের কথা অবগত আছেন। কিন্তু আমাদের স্থূল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া যে পঞ্চভৌতিক ‘আমির’ প্রকাশ হইতেছে, তাহা কখনও জন্মান্তরের স্মৃতি বজায় রাখিতে পারে না, কারণ প্রতিজন্মে উহার ধ্বংস হইয়া থাকে। সেইজন্য উক্ত হইয়া থাকে যে, একজন্মের ‘রামের’ এবং অপর জন্মের ‘শ্যামের’ অর্থাৎ দুইজন্মের দুই নামধারী একই ব্যক্তির স্মৃতির ভিতর কোন সম্বন্ধ নাই। এই হেতু, সাধারণ লোকে অতীত জন্মের ঘটনা অবগত নহেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারা অতীত জন্ম বিস্মৃত হন না। এইরূপ জাতিস্মর ব্যক্তি এখনও বর্ত্তমান আছেন। (২) দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে যে, যদি জন্মজন্মান্তরশীল আত্মার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কেন?’ প্রথমতঃ, পৃথিবীর সমুদয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা, তাহার কোন প্রমাণ নাই; এ পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আদমসুমারি (census) গ্রহণ করা হয় নাই। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এইরূপ ধরিলেও, কোন আপত্তি হয় না, কারণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা যাহা আছে, তাহার ভিতর কতকগুলি জন্মাইতেছে এবং অপর গুলি বিশ্রাম লইতেছে। যাহারা বিশ্রাম লইতেছে, তাহাদের সংখ্যা, যাহারা জন্মাইতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

সুতরাং, এক সময়ে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং অপর সময়ে যে হ্রাস হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? (৩) তৃতীয় আপত্তি এই যে, অনেকে বলেন যে, জন্মান্তরবাদ, (৩) পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ এই নিয়মকে (Law of heredity) খণ্ডন করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না, বরঞ্চ যে সকল উদাহরণে ঐ নিয়ম খাটে না, সেই সকল উদাহরণেও জন্মান্তরবাদ মীমাংসা করিয়া দেয়। যেমন পিতা মাতা যেরূপ হয়, সন্তানও সেইরূপ হইবে; উহাদের যদি কোন স্থায়ী পীড়া থাকে, তবে সেই পীড়া সন্তানেও সংক্রামিত হইয়া থাকে; উহাদের মানসিক গঠন যেরূপ, সন্তানেরও মানসিক গঠন সেই প্রকার হওয়া উচিত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটেনা; যেমন, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাপিষ্ঠের পুত্রও অতি ধার্ম্মিক হয়, অতি মূর্খের সন্তানও বিদ্বান হয়, ইত্যাদি; এই সকল ক্ষেত্রে জন্মান্তরবাদ হইতেই উহাদিগের মীমাংসা হইয়া থাকে। এইরূপ আরও অনেক আপত্তি আছে, কিন্তু সকলগুলিই জন্মান্তরবাদের দ্বারা খণ্ডন করা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পুনর্জ্জন্ম হয় কিনা, তাহা তর্কদ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে না। সংস্কারের সাক্ষাৎ হইলেই আপনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্"। সুতরাং যুক্তি দ্বারায় জন্মান্তর গ্রহণ প্রমাণ করিতে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃস্কর।

অনেকে প্রাচ্যদিগের জন্মান্তরবাদকে ঈজিপ্‌সিয়ানদিগের 'মেটেমসাইকোসিস্'* (Metempsychosis) বাদের সহিত গোল করিয়া থাকেন; এইরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে যে, পাইথ্যাগোরাস্ (Pythagoras) 'মেটেমসাইকোসিস্‌বাদ' গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্লেটো (Plato) উহার সাহায্যে, তাঁহার কল্পনাকে রঞ্জিত করিয়াছিলেন। ঈজিপ্‌সিয়ান্‌রা এইরূপ বিশ্বাস করিত যে, প্রত্যেক মনুষ্য মৃত্যুর পর জন্মজন্মান্তর (trasmigration) নামক চক্রে তিন সহস্র বৎসরের জন্য প্রবেশ করিয়া থাকে। মনুষ্য আকার ধারণ করিলে পর তিন সহস্র বৎসর অতীত হইলে, আত্মা পুনরায় মনুষ্য আকার ধারণ করিত। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে এই সময়ের মধ্যে উন্নতির সকল সোপান দিয়া ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে হইত—জীবনের অতি নিম্ন বিকাশ হইতে, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী এবং পশুর ভিতর দিয়া অবশেষে মনুষ্যরূপ ধারণ করিত। কিন্তু ভারতবর্ষীয় জন্মান্তরবাদ এইরূপ নহে, ঠিক ইহার বিপরীত; জন্মান্তরবাদ হইতে আমার এই শিক্ষা করিয়া থাকি যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর পর প্রায় স্বজাতীয় রূপ ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যে জাতীয় ছিল, সেই জাতীয় আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। 'প্রায়' কথাটী এইজন্য ব্যবহার করিলাম যে, কর্ম্মফলানুসারে এই নিয়মেরও সময় সময় ব্যতিক্রম হইয়া

---

*"The Egyptians are, moreover, the first who propounded the theory that, the human Soul is immortal, and that when the body of any one perishes it enters into some other creature that may be born ready to receive it, and that, when it has gone the round of all created forms on land, in water, and in air, then it once more enters a human body born for it; and this cycle of existence for the soul takes place in three thousand years."

(Herodotus. ii. 123)

থাকে। কিন্তু ঈজিপ্টে মনুষ্যের আত্মা বিড়াল, কুম্ভীর কিম্বা ষণ্ড প্রভৃতির ভিতর অবস্থান করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে এই সকল প্রাণিরা তথায় পূজার্হ হইয়াছে এবং এই সকল প্রাণির আকৃতি মনুষ্যের আকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া, তাহাদের দেবতারূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথা এই রূপ নহে; যেখানে কোন জন্তু পূজিত হইয়া থাকে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, কতকগুলি অমানুষিক গুণের জন্য,—যেমন হস্তী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য, ষণ্ড শারীরিক বলের জন্য, সিংহ সাহসের জন্য,—অথবা বিষ্ণুর অবতারদিগের সম্মান প্রদর্শনের জন্য, কিম্বা কোন পৌরাণিক রূপক স্বরূপ, এই সকল জন্তু পূজিত হইয়া থাকে। ঈজিপ্টে দেবতা সকল জন্তুর গুণসমূহ ধারণ করিত বলিয়া, জন্তু সকল পূজিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে জন্তু সকল আমাদের ন্যায় একই পরম পিতার সন্তান বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। প্রাচ্যদিগের মধ্যে সাধারণ লোকেরা, আপনাদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে জন্তুদিগের দেবতার সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়; এইজন্য তাহারা প্রত্যেক জাতীয় জীবের এক একটী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পনা করিয়া লইয়াছে,—যেমন সর্প দেবতা, কুম্ভীর দেবতা, ব্যাঘ্র দেবতা ইত্যাদি। এই সকল দেবতারা ঐ সকল জন্তুদিগের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; ইহাদিগের জন্য মন্দিরাদি এবং পীটস্থান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় এবং যে সকল ব্যক্তি, যে সকল জন্তুর সংস্রবে সদাসর্ব্বদা আসিয়া থাকে, সেই সকল জন্তুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য, সেই সকল জন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের সন্তোষের জন্য পূজাদি দিয়া থাকে। এবং এই জন্যই যে সকল য়ুরোপীয়েরা এইখানে আসিয়া থাকেন, তাহারা এই সকল লোককে, ঐ সকল জন্তুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। যেমন মনুষ্যের সংবিত, মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 'সেল' সমূহের (cells) পৃথক পৃথক জীবন সমূহকে একত্র করিয়া একটী প্রাণরূপ সমষ্টিতে (unit) পরিণত করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত কোন দেবতা তাহার অধীনস্থ জন্তুদিগের সামুদায়িক ব্যক্তি (collective unit) স্বরূপ, কোনটী সর্প সমষ্টি, (unit) কোনটী ব্যাঘ্র সমষ্টি ইত্যাদি। সুতরাং যদি একটী মনুষ্যকে একটী সম্পূর্ণ-সমষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে নিম্ন স্তরের কোন প্রাণিকে, মনুষ্যরূপ সম্পূর্ণ সমষ্টির ন্যায় অপর একটী সমষ্টির (unit) অংশ বলা যাইতে পারে। অতএব কোন একটী মৎস্য, কিম্বা সর্পের জন্ম হওয়াও যে কথা। আর মনুষ্য শরীরের কোন 'সেলের' (cell) পুনর্জন্ম হওয়াও প্রায় সেই কথা।

জন্মান্তরগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥" (১—৬)

অর্থাৎ, যে ব্রহ্মচক্র সমুদয় জীবের উৎপত্তি এবং আধার, সেই ব্রহ্মচক্রে হংস, অর্থাৎ এক একটী জীব, আপনাকে প্রেরয়িতা, হইতে পৃথক ভাবিতেছে; যখন তাঁহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইবে,

তখন তাহার মুক্তি হইবে। সুতরাং আমরা অবগত হইতেছি যে, যতদিন মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বর হইতে পৃথক ভাবিবে, ততদিন তাহার মুক্তি হইবে না; ততদিন তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ পৃথক্ ভাবিবার কারণ হইতেছে অবিদ্যা। অবিদ্যার জন্য মনুষ্যের রূপ-রস-জ্ঞান জন্মিতেছে। রূপ-রস-জ্ঞান হইতে সুখের তৃষ্ণা উৎপত্তি হইতেছে; সুখের তৃষ্ণায় মনুষ্য কর্ম্মে রত হইতেছে এবং কর্ম্মফলে মনুষ্য জন্মাইতেছে। সুতরাং অবিদ্যা দূর হইলে অর্থাৎ মনুষ্য যখন নিজকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া বুঝিবে, তখন জন্মচক্র রোধ হইবে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" (১—৯)

অর্থাৎ উভয়েই জন্মহীন, একটী জ্ঞানী অপরটী অজ্ঞানী, একটী ক্ষমতা-বিশিষ্ট, অপরটী ক্ষমতাহীন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ পার্থক্যের কারণ হইতেছে, অবিদ্যা বা মায়া। ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যের ভিতর সকল বিষয়ই রহিয়াছে, কিন্তু যখন জীবাত্মা পঞ্চভৌতিক শরীর ধারণ পূর্ব্বক প্রকৃতিতে নিমজ্জিত হয়, তখন ঐ সকল বিষয় প্রকাশমান অবস্থা হইতে সমবেত (inherent) অবস্থায় আসিয়া থাকে। অন্তর্বিকাশের দ্বারা ঐ সকল বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে; জন্ম মৃত্যু গ্রহণের দ্বারাই অন্তর্বিকাশ হইতে থাকে। জীবাত্মা যখন প্রকৃতির অধীনে আসিয়া থাকে, তখন প্রথমতঃ খনিজ, তৎপরে উদ্ভিদ্ রাজত্বের বিভিন্ন প্রকার অস্তিত্বের ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। তাহার পর যথাক্রমে স্বেদজ, অন্তজ এবং অবশেষে জরায়ুজ জন্ম গ্রহণ করে।

শাস্ত্রে অন্তর্বিকাশের ধারা, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"স্থাবরে লক্ষবিংশত্যো জলজং নবলক্ষকম্।
কৃমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্॥
পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশচ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে।
ততোঽপি মানুষা জাতাঃ কুৎসিতাদির্দ্বিলক্ষকম্॥
উত্তমাচ্চোত্তমং জাতমাত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাম্॥"

স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্য-মকরাদি যোনিতে নব লক্ষ, কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষিযোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদি যোনিতে ত্রিংশ লক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্ল্লক্ষ, এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্যজন্মেও প্রথমতঃ কুৎসিতাদি মনুষ্য কুলে দুইলক্ষ জন্ম হয়। ক্রমে জীব উত্তম হইতেও উত্তম জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম গ্রহণ করিয়া যে, আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ যাতনা ভোগ করে। কল্পকল্পান্তর ধরিয়া জীবের যে প্রকার ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে উক্ত হইল। প্রথমতঃ স্থাবরযোনি, তৎপরে মৎস্য-মকরাদিযোনি, তৎপরে কৃমি এবং কীটপতঙ্গযোনি, তৎপরে পক্ষিযোনি তৎপরে পশুযোনি, তৎপরে বানরযোনি, এবং অবশেষে মনুষ্যযোনিতে জীব জন্ম গ্রহণ করে। বানর হইতে যে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা যে ডারুবিন (Darwin) সাহেব, নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে তাঁহার বহুপূর্ব্বে প্রাচ্য মনীষিগণ উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রকার চতুরশীতিলক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে কত কল্প কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর জীব, ক্রমবিকাশিত

হইয়া এই কল্পে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

এইরূপ অন্তর্বিকাশের দ্বারা জীবের দুই প্রকার ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, তাহার পার্থিব আকৃতির উন্নতি হইতে থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার সংবিতের প্রসারণ বা উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমটীকে পাশ্চাত্যরা পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ(heredity) বলিয়া থাকেন। এক আকৃতি হইতে অন্য আকৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া মনুষ্যের 'ব্যক্তিত্ব' (personalitics) পুত্র পরম্পরায় সংক্রামিত হইতে থাকে; কিন্তু মানসিক এবং নৈতিক গুণসকল কেন সংক্রামিত হয় না, তাহা পাশ্চাত্যরা ঠিক করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যরা বলেন যে, মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব যেমন সংক্রামিত হয়, মনুষ্যের সংবিতও সেইরূপ অবাধে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যের আকৃতির যেরূপ উন্নতি হইতেছে, মনুষ্যের সংবিতে ও সেইরূপ উন্নতি বা প্রসারণ হইতেছে। একটী শরীর অব্যবহার্য্য হইলে জীবাত্মা তাহার উপযোগী অন্য একটী শরীর ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্যের আকৃতির এবং সংবিতের অবিচ্ছেদ (continuity) বর্ত্তমান থাকে।

যখন জীবাত্মা ক্রমে ক্রমে জান্তবরাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যরাজত্বে প্রবেশোন্মুখ হয়, তখন ঈশ্বরের তিনটী বিভাব (aspects),—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া, —আত্মজ্ঞানরূপে (Self-consciousness) মনুষ্যে স্পষ্টতর প্রতিফলিত হয়। তখন অহংকারের উৎপত্তি হয় এবং মনুষ্য কোনটী 'অহং' এবং কোনটী 'নাহং' বুঝিতে পারে। জান্তব রাজত্বে মনুষ্যের কামনা স্বভাব গঠিত হইয়াছে, উহা আরও বলবতী হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রথমে কামনার বশীভূত থাকে, কিন্তু যখন দেখিতে পায় যে, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ পাইতেছে, তখন কামনাকে বশে আনিতে চেষ্টা করে এবং যখন বশে আনিতে পারে, তখন উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ক্ষমতা সকল লাভ করিয়া থাকে। তখন তাহার পারমার্থিক জ্ঞানের উদয় হয় এবং অবশেষে তাহার মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। তখন জন্মমৃত্যুচক্র রোধ হইয়া যায়।

মনুষ্য যদিও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু সময় সময় ঐ পথ হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য কর্ম্মফলে, অর্থাৎ আত্মাবনতির দ্বারা মৎস্য, সর্প, মেষ প্রভৃতি অপকৃষ্ট জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা কিরূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচ্যদিগের উপদেশ স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্য দুইপ্রকার উপাদানে গঠিত হইয়াছে,—একপ্রকার, মানবীয় (human) এবং অপর প্রকার, জান্তব (animal)। প্রথম প্রকার উপাদান, অর্থাৎ মানবীয় গুণ বা আত্মজ্ঞান, মনুষ্যের আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকে। মনুষ্যের পূর্ব্বোক্ত প্রথম উপাদানটী তাহার দ্বিতীয় বা জান্তব উপাদানের উপর ঠিক যেন উপর্য্যুপরি স্থাপিত থাকে। পার্থিব জীবনে এই দুইটী উপাদান সংযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর পর উহাদের বিশ্লেষণ ঘটে। মনুষ্যজন্মে যেমন তাহার জান্তব উপাদানের উপর তাহার মানবীয় উপাদান স্থাপিত থাকে, সেইরূপ অন্য প্রাণীর জান্তব উপাদানের উপর মনুষ্যের মানবীয় উপাদান, শাস্তিস্বরূপ স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু

জন্তু প্রাণীর, মস্তিষ্ক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ, মনুষ্যের আত্মার চালনার উপযোগী না হওয়াতে উহারা মানবীয় ক্ষমতা সকল প্রদান করিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া গলা টিপিয়া ধরিলে, তাহার যেরূপ কষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত আত্মারও ঐ জন্মে সেইরূপ কষ্ট হইতে থাকে। ঐ জন্মে কর্ম্ম করিবার জন্য তাহাকে যে যন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে সে, অন্য ব্যক্তিকে তাহার প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে না এবং যদিও জন্তুর ন্যায় তাহার আকার হইয়াছে এবং তাহার ন্যায় কার্য্যও অনুভব করিতেছে—তথাচ সে যে অপর জন্তুদিগের ন্যায় সামান্য জন্তু নহে, এই জ্ঞান ভিন্ন ইহার অন্য জ্ঞান থাকে না এবং ইহা নিজেও ইহার যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারে না। তবে ইহা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে যে, কোন পাপের জন্য ইহার এইরূপ দশা হইয়াছে। প্রত্যেক জন্তুতেই যে, এইরূপ পাপগ্রস্ত আত্মা বাস করে, তাহা নহে এবং এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন কোন মহাত্মা দেখিবামাত্র জানিতে পারেন যে কোন্ জন্তুতে ঐরূপ আত্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,—বুদ্ধদেবের ঐরূপ শক্তি ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এমন কতকগুলি বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচ্যদিগের পূর্ব্বোক্ত মত, একেবারে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। যদিও মনুষ্যের আত্মা, কোন জন্তুতে আবদ্ধ রহিয়াছে, দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু এক মনুষ্যে দুই তিন জন পৃথক্ ব্যক্তির 'আবেশ' দৃষ্ট হইয়া থাকে,—অর্থাৎ একই সময়ে দুই তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তির 'ব্যক্তিত্ব' (personalities) একই শরীরে আশ্রয় লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া বাস করিয়া থাকে। ইহাকে পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদীরা "double or multiple personalities" ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের আত্মাকে কোন জন্তুর শরীরে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে, যেমন জান্তব (animal) ও মানবীয় (human) উপাদানের পার্থক্য করিতে হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বুদ্ধির (intellectual উপকরণ ও পাশব (animal) উপকরণের পার্থক্য করা হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কালের পুস্তকাদিতে যেমন বেদাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য তখন প্রায় মনুষ্যজন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইত,—কারণ, আদিম অবস্থা বলিয়া এখনকার অপেক্ষা, তখন মনুষ্য জন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাহার বহুবৎসর পরে ভগবান্ গীতাতে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। গীতাতে আমরা কোন স্থলে দেখিতে পাই না যে, মনুষ্য, পশ্বাদি জন্ম গ্রহণ করিবে। পুণ্যবান্‌দিগের কি প্রকার গতি হয়, সেই সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেনঃ—

> "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং।
> ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥" (৯—২১)
> "প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥"
> (৬—৪১)

অর্থাৎ—সেই সমস্ত কর্ম্মী, বিশাল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। পুণ্যকর্ম্মকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, লোক সকল লাভ করিয়া তথায় বহুবৎসর বাসের সুখ অনুভব করিয়া সদাচারী ধনী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

পাপীদিগের গতি-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।"(১৪—১৫)

অর্থাৎ, তমোগুণাপন্ন ব্যক্তি, মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

"ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু।"(১৬—১৯)

অর্থাৎ, অশুভ-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

এখানে মূঢ় ও আসুরী অর্থে অজ্ঞান অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি মনুষ্য বুঝাইতেছে। উপনিষদ্‌ও বলিয়াছেনঃ—

"আনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ॥"

অর্থাৎ, দুবুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর সেই সমুদায় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক, আনন্দশূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। সুতরাং আমরা অবগত হইতেছি যে, পূর্ব্বে মনুষ্যজন্ম হইতে বিচ্যুত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা ছিল, গীতাকারের সময় বোধ হয় সেইরূপ সম্ভাবনা ছিল না। সেইরূপ সম্ভাবনা থাকিলে তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন।

প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মনুষ্য যখন নিজেকে অবনতির পথে লইয়া যায়, তখন মনুষ্য ক্রমোন্নতির যে সোপানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সোপানে উপনীত হইতে পারে না। তখন নিম্নশ্রেণীর জীবের আকৃতি গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং জন্তু, উদ্ভিদ অথবা খনিজ জীবের সহিত এক শরীরবাসী (cotenant) হইয়া বাস করে। মনুষ্যের যাহা শিক্ষা করিবার অবশিষ্ট ছিল, তাহা শিক্ষা হইলে মনুষ্য আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। কোন জন্তুর প্রতি অত্যাধিক আসক্তি থাকিলে মনুষ্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের সময় ঐরূপ জন্তুর আকৃতি ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ভরত রাজা হরিণ ভাবিতে ভাবিতে হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনুষ্য, কর্ম্মফলে যে পশ্বাদিযোনি গ্রহণ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ—হিন্দুশাস্ত্রে অনেক আছে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যোনি মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"
(কঠোপনিষৎ, ৫-৭)

অর্থাৎ, যাহার যেমন কর্ম্ম ও যাহার যেমন জ্ঞান, তদনুসারে শরীর ধারণ জন্য যোনিতে প্রবেশ করে; অপর কেহ কেহ স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়। মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥"
(১২-৯)

অর্থাৎ শারীরিক কর্ম্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিক কর্ম্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযোনী এবং—মানস কর্ম্ম-দোষের আধিক্যে চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা ভরত, হরিণ-জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-জাতক-মালায় উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মসমূহে সর্প, ব্যাঘ্র, হস্তী, রাজপুত্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যজন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, যে সকল মনুষ্য নিকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহারা কেহ আত্মজ্ঞান (self-consciousness) বিস্মৃত হয় নাই। ভরত রাজা যখন হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হন নাই। সাধারণ জন্তু এবং মনুষ্যের ভিতর, এই আত্মজ্ঞান (self-consciousness) লইয়াই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যের আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু জন্তুদের তাহা নাই। যে সকল মনুষ্য, কর্ম্মদোষে জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের আকৃতি, দেখিতে জন্তুর ন্যায় হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি জন্তুর ন্যায় নহে। সাধারণ জন্তুর আত্মজ্ঞান থাকে না, কিন্তু উক্তপ্রকার জন্তুর আত্মজ্ঞান থাকে। মনুষ্য নিজের মনুষ্যত্ব—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান (self-consciousness) হারাইয়া জন্তুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। ক্রম-বিকাশের সোপানপরম্পরা আরোহণ করিয়া জীবসকল, ক্রমবিকাশের (evolution) যে সোপানে মনুষ্যরূপে অধিষ্ঠিত, সেই সোপান হইতে নিম্নে অবতরণ অতি কচিৎ ঘটিয়া থাকে।

জন্মান্তর গ্রহণ কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ উল্লিখিত আছে, তাহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা অন্য কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। মৃত্যুর পর মনুষ্যের কি গতি হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেদান্তে দুইটী মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। এই মার্গদ্বয়, স্থানবিশেষ নহে; ইহারা অবস্থাবিশেষ। প্রথম হইতেছে—উত্তরমার্গ বা দেবযান এবং দ্বিতীয়টী,—দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযান। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী মার্গ অবলম্বন করিয়া পরলোকে গমন করেন। তথায় পুণ্যানুরূপ ফলভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা কুক্কুর, শূকর কিম্বা চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। পুণ্যানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণের মধ্যে যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক অথবা প্রতীকোপাসক, তাঁহারা উত্তরমার্গে বা দেবযানে গমন করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে উত্তর মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানশীল গৃহস্থেরা দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযানে গমন করেন।

দেবযানগামীরা ব্রহ্মলোকে নীত হন বলিয়া, এই পথের অপর নাম ব্রহ্মপথ। পিতৃযানগামীরা স্বর্গভোগার্থ চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। চন্দ্রমণ্ডলকে স্বর্গলোক বা দেবলোক বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা নিষ্কামী তাঁহারা দেবযানগামী হন; এবং যাঁহারা সকামী তাঁহারা পিতৃযানগামী হন। পুণ্যকর্ম্মশীলদিগের জন্য এই দুই মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা ইষ্টাদিকারী নহে, বরঞ্চ অনিষ্টকারী অর্থাৎ পাপাচারী, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিতে পারে না, তাহারা যমালয়ে অর্থাৎ প্রেতলোকে গমন করিয়া নিজ-কর্ম্মফলানুযায়ী যাতনা অর্থাৎ নরক ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণের নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে। যাহারা বিদ্যাকর্ম্মশূন্য (যেমন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ), তাহাদের লোকান্তর হইতে গতি বা লোকান্তর হইতে অবগতি হয় না। তাহারা ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়।

উত্তরমার্গ বা দেবযান, বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর দেবযান যে এক-

রূপ, তাহার আর অন্যথা নাই। বেদান্তদর্শনানুমত দেবযান, নিম্নে বর্ণিত হইল। উত্তর-মার্গ-গামীরা প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। অর্চ্চিদেবতা হইতে অহর্দেবতা, অহর্দেবতা, হইতে শুক্লপক্ষ দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা হইতে উত্তরায়ন দেবতা, উত্তরায়ন দেবতা হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর দেবতা হইতে দেবলোক দেবতা, দেবলোক দেবতা হইতে বায়ুদেবতা,বায়ু দেবতা হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা হইতে চন্দ্র দেবতা,চন্দ্র দেবতা হইতে বিদ্যুদ্দেবতা,বিদ্যুদ্দেবতা হইতে বরুণ দেবতা, বরুণ দেবতা হইতে ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্র দেবতা হইতে প্রজাপতি দেবতা প্রাপ্ত হইয়া, উপাসক পরে ব্রহ্মলোকে নীত হন। দেবযানগামী জীব, বিদ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া উত্তরমার্গগামী জীবকে সত্য বা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।

অর্চ্চিরাদি দেবতা, অতিবাহিকী দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহারা মৃতজীবকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়। প্রথমতঃ অর্চ্চিঃদেবতা, অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেবতা শুক্লপক্ষ দেবতার নিকট, শুক্লপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ন দেবতার নিকট ইত্যাদি রূপে তত্তদ্দেবতা কর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া পুণ্যশীল সত্যলোকে উপস্থিত হন। পুণ্যশীল ব্যক্তি এই প্রকারে একভাব হইতে অন্যভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।

দেবযানগামীরা বর্ত্তমান কল্পে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরা পরাবতো বসন্তি।"
(৬—২—১৫)

অর্থাৎ তাঁহারা অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন।

দক্ষিণ মার্গ, নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃতজীব প্রথমতঃ ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা, তাহাকে রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া যায়; রাত্রি দেবতা কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতৃলোক দেবতার নিকট, পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট, আকাশ দেবতা অবশেষে তাহাকে চন্দ্র দেবতার নিকট লইয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং।" (৬-২-১৬)

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মনুষ্য পিতৃলোকে যায়, তৎপরে পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে যায়। যে সকল মনুষ্য জন্মমৃত্যু-চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছেন, তাঁহারা পিতৃলোক হইতে স্বর্গলোকের যে অংশে যান, তাহাকে চন্দ্রলোক বলে। স্বর্গলোকের অন্যান্য অংশ আছে, যথা, ইন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি। জীব বিশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল লোকও লাভ করিতে পারেন। চন্দ্রমণ্ডলে তাহার ভোগোপযোগী জলময় দেহ নির্ম্মিত হয়। এই জলময় দেহকে মনোময় কোষ বলা হয়। যে পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ দ্বারা সেই কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, আর সে ক্ষণকালের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতে পারে না। তখন জীব পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে।

ইহলোকে আগমন বা জন্মান্তরগ্রহণের প্রণালী এইরূপ। কর্ম্মক্ষয় হইলে চন্দ্র-

লোকীয় জলময় শরীর বা পুরাতন মনোময় কোষ বিলীন হইয়া আকাশে আগত হয়। সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আসিয়া থাকে। এই আকাশভূত জীব, জলের সহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ চাল্যমান হইয়া বায়ুভাবাপন্ন হয়, ক্রমে ধূমভাব এবং তৎপরে অভ্র বা কুজ্ঝটিকাভাবাপন্ন হয়। অভ্রভাবাপন্ন হইতে মেঘভাবাপন্ন হয়। তৎপরে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হয়। অর্থাৎ এই সকল জলীয় ব্যাপারের দ্বারা মনুষ্যের নূতন জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ নির্ম্মিত হয়। বারিধারার সহিত ঐ সকল জীব, ওষধি বনস্পতি, ব্রীহি, যব, তিল, মাষ ইত্যাদি প্রকার বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। বর্ষধারার সহিত পতিত বীজ পর্ব্বততট, দুর্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, অরণ্য এবং মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়। বর্ষাদি ভাব হইতে তাহার নিঃসরণ, বিশেষ কষ্টসাধ্য। মনুষ্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহার স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল রূপক বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীব যথাক্রমে নূতন প্রাণময় এবং অন্নময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। ঐ জীব নয় দশ মাস কাল তাহার মাতার গর্ভে থাকিয়া অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়। যে স্থানে ক্ষণিক অবস্থান করিতে কষ্টের অবধি থাকে না, সেই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা যে কত কষ্টকর—তাহা বলাই বাহুল্য।

অর্চ্চিরাদির অভিমানিনী দেবতাদিগকে পরাবিদ্যা (Theosophy) অনুসারে প্রাকৃত গণদেবতাদিগের (Natural Elementals) প্রধান (Lords) বলা হইয়া থাকে। প্রাকৃত গণদেবতাদিগকে (Natural Elementals), প্রাকৃত উপদেবতাও (Nature spirits) বলা হয়। ইহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত; ক্ষিতি (earth), অপ্ (water), তেজঃ (fire) মরুৎ (air) এবং ব্যোম (ether)—এই মূল পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত হইতে বিভিন্ন গণদেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর ভূতকে পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহাদিগের দ্বারা দৈবশক্তি বিভিন্ন প্রদেশে নীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত গণদেবতার উপর এক এক জন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর ভূতের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইন্দ্র হইতেছেন আকাশের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, আদিত্য বা অগ্নি হইতেছেন, তেজের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, পবন হইতেছেন, বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং প্রজাপতি হইতেছেন, ক্ষিতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। আদিত্য, তেজের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়া তেজঃ, বিভিন্ন ভূমিতে (Planes) অবস্থিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার অনুচরবর্গ বা আগ্নেয় গণদেবতা-সমূহের (Fire Elementals) সহিত প্রকৃতির তেজঃ-সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এই প্রকার অন্যান্য ভূতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ তাহাদের অনুচরগণের (Elementals) সহিত প্রকৃতির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। মনুষ্য, যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন প্রত্যেক ভূতের অনুচরবর্গ (Elementals) মনুষ্য শরীরের নির্দ্দিষ্ট ভূত সকলকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যায়,—এই প্রকারে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় লইয়া যাইয়া থাকে। এই প্রকারে ভূত

সকল তাহাদের সাহায্যে এক ভূমি (Plane) হইতে অন্য ভূমিতে (Plane) উপস্থিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রজাপতিকে পৃথিবী-গ্রহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (Logos) বলা হইয়া থাকে। মনুষ্য, প্রজাপতির নিকট নীত হইলে পর সত্যলোক প্রাপ্ত হয়।

ভূতসকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবকে লইয়া দেবলোকে (Devachan) উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎপরে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় বায়ু দেবতা, বায়ুর অংশ গ্রহণ করেন, আদিত্য, তেজের অংশ গ্রহণ করেন, বরুণ জলীয় অংশ গ্রহণ করেন, ইন্দ্র আকাশের অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রজাপতি, ক্ষিতির অংশ গ্রহণ করেন। জীব, অবশেষে ভূত (Matter) হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মা (Spirit) রূপে প্রকাশ পাইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাকে দেবযান বা শুদ্ধ মার্গ বলে। পুণ্যশীল নিষ্কাম ব্যক্তি এই মার্গ অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। জীব, বিদ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে কোন অমানব পুরুষ, তাহাকে সত্য লোকে লইয়া যায়। এই অমানব পুরুষ, ভগবানের অনুচর; তাঁহার কার্য্যের সাহায্যের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহারাই মহাত্মা বা মহাপুরুষ। পুরাণে ইঁহাদিগকে কুমারসৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা মুক্তকামী ব্যক্তিদিগের গুরুস্বরূপ। ইঁহাদিগের কৃপায় পুণ্যশীল ব্যক্তি ভবসাগর পার হইয়া থাকেন।

যাঁহারা পুণ্যশীল সকাম ব্যক্তি, যাঁহাদিগের রূপরাগ বা স্বর্গাদির কামনা আছে, তাঁহারা পিতৃযান প্রাপ্ত হন। ধূম হইতে দক্ষিণায়ন পর্য্যন্ত যে সকল দেবতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইঁহারা সম্ভবতঃ বিভিন্ন গণদেবতা। মৃত্যুর পর ইঁহারা বিভিন্ন ইথিরীয় অবস্থার ভিতর দিয়া জীবকে পিতৃলোকে (Astral plane) লইয়া যান। তৎপরে পুণ্যশীল সকাম পুরুষ চন্দ্রমণ্ডলে (Devachan) নীত হন। তথায় তিনি সুখভোগ করিয়া ইহলোকে অবরোহণ করেন। চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইবার সময় জীব জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে এই শরীর মিলিত হইলে পর, জীবের সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে কিরূপে পরিণতি হয়,তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জীব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পরিশেষে পৃথিবীর উপকরণ গ্রহণ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পাপী, তাহারা চন্দ্রলোকে যাইতে পারে না; তাহারা যমালয়ে (Astral plane) যায়; এবং তথায় নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে।

চন্দ্রলোক বা যমলোক হইতে আগমন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জীব, অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি, দৈবাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত হইবার সময় যেমন তাহার সংজ্ঞা থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণের সময় জীবদিগের সেরূপ জ্ঞান থাকে না। কেননা, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতু-ভূত কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—

“তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।”

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম থাকে, চন্দ্রলোকগামী জীব সে পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করে। এবং কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পূর্ব্বোক্ত পথে ইহলোক আগমন করে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের দ্বারা যদি সমস্ত কর্ম্ম

ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদি কর্ম্মশেষ না থাকে, তাহা হইলে ইহলোকে অবরোহণ পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ এবং সুখ দুঃখ ভোগ কিরূপে হইতে পারে? বুধগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, স্বর্গভোগজনক কর্ম্ম নিঃশেষে পরিভুক্ত হইলে, পূর্ব্বসঞ্চিত ঐহিক কর্ম্মফল অনুসারে জীবের ইহলোক জন্ম পরিগ্রহ হয়। চন্দ্রমণ্ডলারূঢ়দিগের ভোগের অবসান হইলে তাহারা ইহলোকে সমাগত হইয়া সঞ্চিত পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধম শরীর পরিগ্রহ করে। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

> "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপুয় চরণা অভ্যাসোহ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।"

অর্থাৎ—যাঁহারা, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ইহলোকে সমাগত হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যশীল, তাঁহারা শুভযোনি প্রাপ্ত হন। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর, যাহারা পাপশীল, তাহারা কুক্কুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র যে সমুদয় হিন্দুজাতি, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা নহে; হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মেও জন্মান্তরবাদ-সম্বন্ধে মোটের উপর একমত দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্য মতে যাহাকে 'আমি' বলে, তাহা ক্ষণস্থায়ী 'আমি' এবং যাহা যথার্থ 'আমি' তাহা চিরস্থায়ী। এক ব্যক্তিই এক জন্মে ভাল, অপর জন্মে মন্দ, একজন্মে সুন্দর, অপর জন্মে বিশ্রী, ইত্যাদি প্রকার হইলেও, সে ব্যক্তি যাহা—তাহাই থাকে, অর্থাৎ তাহার চিরস্থায়ী বা পাকা 'আমির' কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জন্মান্তরবাদের বিপক্ষে জড়বাদীরা, এক যুক্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন—'কোন লোকই তাহার প্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তবে জন্মান্তর বাদ মানিয়া, প্রিয়ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে ভাবিয়া, মনে কষ্ট আনিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি আমরা গুণ ধরিয়া বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সকল ব্যক্তিই সমান ভালবাসার পাত্র। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনরূপ "লটারি" 'সমান ভালবাসার' পাত্র সকলের মধ্যে কতকগুলিকে আরও অধিক ভালবাসার পাত্র করিয়াছে এবং অপর কতকগুলি 'সমান ভালবাসার' পাত্রদিগকে অপর ব্যক্তিদের ভালবাসার পাত্র করিয়াছে। পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের ভালবাসার পাত্রসকলকে বিনিময় করিয়া অপর পাত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া থাকি; ইহারাও পূর্ব্বের ন্যায় সমান ভাবে আমাদের ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বের পাত্র সকলকে হারাইয়া ফেলি না। মধুমক্ষিকা যেমন নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া তাহার চক্রে গিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ যখন আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমাদের প্রিয়পাত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই; এবং যেমন মধুমক্ষিকা আবার তাহার ভাণ্ডারে মধু সঞ্চিত করিবার জন্য পুনরায় অপর পুষ্প সকল খুঁজিয়া বেড়ায়, সেইরূপ যখন আমরা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করি, তখন অপর প্রিয়পাত্রদিগকে সংগ্রহ করিয়া লই। কারণ, যাহাদিগকে আমরা

ভালবাসি, তাহাদের যথার্থ 'আমি' অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃত ভালবাসার যোগ্য,তাহা অবিনশ্বর এবং চিরকালের জন্য আমাদের আপনার হইয়া থাকে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (৬)

সমষ্টি মানবসমাজ ভগবানের বিরাট শরীর,—ভগবানই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ,—তিনিই সমাজাত্মা।

৪৪। আমরা পূর্ব্বে যে এক বিরাট সমাজের ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই বিরাট সমাজ ভগবানের বিরাট রূপ,—এই মহা তত্ত্ব এক্ষণে আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এ তত্ত্ব না বুঝিলে আমরা সমাজ মধ্যে বিরাটরূপী ভগবানের ধারণা করিতে সমর্থ হইব না, তিনিই যে সমাজাত্মা—তাহা বুঝিতে পারিব না। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন, তাঁহাদের একথা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে ধারণা করেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে জগৎরূপে বিবর্ত্তিত মনে করেন, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন সত্ত্বার ধারণা করিতে পারেন না, যাঁহারা এই ব্যবহারিক জগৎকে ভগবানের বিরাটরূপ বলিয়া ধারণা করেন, যাঁহারা সাধনাসিদ্ধ জ্ঞানবলে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা সমাজাত্মা যে ব্রহ্ম, তাহা সহজে ধারণা করিতে পারেন।(১) এই সমাজাত্মা যে ভগবান এবং বিরাট মানবসমাজ যে ভগবানের বিরাট শরীর, এ কথা বুঝিবার জন্য, আমরা এস্থলে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমরা বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সত্য, কিন্তু জগৎ হইতে ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্মেই সর্ব্বভূত অবস্থিত, অথচ ব্রহ্ম তাঁহাতে অবস্থিত নহেন। আবার ভূত সকলও তাঁহাতে অবস্থান করে না। (১) ইহাই ব্রহ্মের ঐশ্ব-

---

(১) আধুনিক জড়বাদী ও প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতগণ এ তত্ত্ব স্বীকার করেন না। যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের Realism এবং Nominalism মধ্যে বিবাদের কথা স্মরণ করিয়া, দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন—জাতিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা ব্রহ্মের জাতিকল্পনা বা Ideaকে ব্যক্তিত্বের মূল বলিতে চাহেন না, যাঁহারা জাতিজ্ঞানবাচক শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত মনুষ্যত্বের তত্ত্ব ও সমাজাত্মার কথা, এবং বিরাটরূপী ভগবানের কথা স্বীকার করিবেন না। যাঁহারা ভগবানকে জগতের বাহিরে, অথবা পৃথিবীর বাহিরে স্বর্গে অবস্থিত, পৃথিবীর নিয়ন্তারূপে ধারণা করেন, অথবা যাঁহারা ব্রহ্মকে অজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত, জগদতীত, transcendental বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা ভগবানের এই বিরাটরূপ স্বীকার করেন না। যাঁহারা নাস্তিক জড়বাদী প্রত্যক্ষপ্রমাণসর্ব্বস্ব, তাঁহাদের ত কথাই নাই। এস্থলে তাঁহাদের অভিমতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে আমরা একথা বলিতে পারি যে, এ সম্বন্ধে ইহাঁরা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও, আমাদের মূল আলোচিত বিষয়ের সহিত ইঁহাদের মতভেদ না থাকিতে পারে।

(১) ময়া ততং ইদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।

রীয় যোগ। আশ্চর্য্য !—ধারণার অতীত। বিলাতী দর্শনের কথায়,—আমরা বলিতে পারি যে. ব্রহ্ম transcendental এবং immanent—উভয়ই। জগদতীত, জ্ঞানাতীত (transcendental) ব্রহ্ম আমাদের ধারণার অতীত। অক্ষর (absolute, transcendental) পরম ব্রহ্ম—সীমাবদ্ধ দেশকাল নিমিত্ত রূপ মায়া দ্বারা আবৃত মানব জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। শ্রুতিতে আছে, সর্ব্বময় ব্রহ্মের চারি পাদ। (২) তন্মধ্যে এই অক্ষর পরমব্রহ্ম চতুর্থ পাদ। তাহা কালাতীত, অচিন্ত্য, অব্যবহার্য্য। তাঁহাকে সৎ কি অসৎ, (৩) জ্ঞানময় কি অজ্ঞানময়, (৪) বাস্তব কি শূন্য, (৫) Being কি Naught—কিছুই বলা যায় না। ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তাঁহার স্বরূপ—আমাদের এই সীমাবদ্ধ দ্বৈতাত্মক জ্ঞানের অতীত। কেন না, তাহা 'একাত্মপ্রত্যয়সার'। তবে আমাদের সহিত ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাঁহার অন্য তিন পদ বা তিন সগুণ রূপ,—অর্থাৎ তাঁহার পুরুষোত্তম বা পরমপুরুষ রূপ (Ideaরূপ), হিরণ্যগর্ভ রূপ (Essence রূপ), ও বিরাট রূপ (Being রূপ) আমরা বিশেষ সাধনাবলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারি। আমরা ব্রহ্মের জগৎরূপে বিবর্ত্তিত রূপ ও জগৎ স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা রূপ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই তটস্থ লক্ষণাযুক্ত সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক রূপ জানিতে পারি মাত্র। এবং আমাদের জ্ঞাতারূপে বা জ্ঞাতার জ্ঞাতা রূপেও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি।

আমরা জ্ঞান দ্বারাই তত্ত্বলাভ করিয়া থাকি। সাধনাবলে চিত্তদর্পণ যত নির্ম্মল হইতে থাকে, ততই জ্ঞানসূর্য্য তাহাতে পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হয়। প্রকটিত বা অপ্রকটিত সকল অবস্থাতেই জ্ঞান দ্বৈতাত্মক। জ্ঞানের দুই নিত্য ভাব—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। বলিয়াছি ত, আমরা এই 'জ্ঞেয়' বা জগৎতত্ত্ব পর্য্যালোচনা দ্বারা, ও 'জ্ঞাতা' বা আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম জ্ঞেয় জগতের পরম কারণ। ব্রহ্ম জ্ঞাতার জ্ঞাতা। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়—প্রজ্ঞাঘন। আমাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হইলে, আমরা জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমায় গিয়া, বা 'বেদান্ত' জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিতে পাই যে, সগুণ ব্রহ্মেরও দুইরূপ,—পরম জ্ঞানময় পরম পুরুষ, আর পরাশক্তিময়ী পরমা প্রকৃতি। ব্রহ্ম অসীম অনন্ত প্রপঞ্চাতীত। কিন্তু, কি-জানি-কি-রূপে ব্রহ্ম আপনাকে আবরিত, পরিমিত বা সীমাবদ্ধ করেন। অথবা তিনি অসীম হইয়াও নিত্য এইরূপ সীমাবদ্ধ। অনন্তের মধ্যে সান্ত নিত্য অভিব্যক্ত। অসীমের মধ্যে 'সসীম' নিত্য অনুস্যূত। এই জন্য ব্রহ্ম—অসীম-সসীম, অনন্ত-সান্ত, সগুণ-নির্গুণ,

---

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।

গীতা, ৯। ৪—৬।

(২) এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদসংহিতার পুরুষসূক্ত ও মাণ্ডূক্য-উপনিষৎ শ্রোতব্য। মাণ্ডূক্য উপনিষদে আছেঃ—"সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।" ২।

(৩) অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে। —গীতা, ১৩। ১২।

(৪) "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞং।"—মাণ্ডূক্য উপনিষৎ। ৭।

(৫) প্রজ্ঞাপারমিতার শূন্যের লক্ষণা, ও বেদান্তের অক্ষর ব্রহ্মের লক্ষণা এক।

সৎ-অসৎ, জ্ঞেয়-অজ্ঞেয়। তিনি এ সকলই বা এ সকলের অতীত, অথচ এ সকলে অনুপ্রবিষ্ট। অনন্তের মধ্যে সমুদয় সান্ত ভাবই অভিব্যক্ত। নতুবা অনন্তের ধারণা হয় না, অনন্তের অনন্তত্ব থাকে না। সে যাহা হউক, অনাবৃত অসীম ব্রহ্মের, আপনাকে এইরূপে আবরিত বা সীমাবদ্ধ (limitation) করিবার স্বভাব বা শক্তিই—মায়া। পরিমাণার্থক 'মা' ধাতু হইতে 'মায়া'। যাহা দ্বারা পরিমিত বা সীমাবদ্ধ হওয়া যায়—তাহাই মায়া। অতএব যাহা দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে সীমাবদ্ধ বা পরিমিত করিয়া বিবর্ত্তিত হন, তাহাকেই মায়া বলে। মায়া দ্বারা ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হইয়া, 'সসীম' 'সগুণ' হন। তখন তিনি জ্ঞানময় পরমপুরুষ ও শক্তিময়ী পরমাপ্রকৃতিরূপে বিবর্ত্তিত হন। তাহার পর, সেই পরম জ্ঞানময়ের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে বিবর্ত্তন হয়। ইহাই মায়ার প্রথম বিকাশ। (১) কিন্তু জ্ঞানময় পরমপুরুষের জ্ঞান এক অখণ্ড অবিকৃত। সে জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় একীভূত। সে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে প্রভেদ থাকে না। অথবা সে জ্ঞান—জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই দ্বৈতাত্মক জ্ঞানের অতীত। সে জ্ঞান আমাদের ধারণার অতীত। যাহা হউক, সৃষ্টিকল্পে সেই জ্ঞান ব্যাকৃত হয়,—অপর জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় রূপে বিবর্ত্তিত হয়। সেই জ্ঞাতার মায়িক দিক্‌কালরূপে বিবর্ত্তিত আধারে—তখন জ্ঞেয় জগৎ কল্পিত হয়। আমাদের জ্ঞানে সুষুপ্তির পর স্বপ্নে যেমন কাল্পনিক জগৎ প্রতিভাসিত হয়, কতকটা সেইরূপ ভাবে কল্পিত হয়। এইরূপে পরম জ্ঞাতার পরম জ্ঞেয় রূপে বিকাশই,—তাঁহার পরম 'কল্পনা', 'ভাবনা', 'সঙ্কল্প', 'ঈক্ষণ' বা 'ইচ্ছা'। তাহাই জগৎবীজ হিরণ্যগর্ভ। তাহাই জ্ঞাতার 'বহু' হইবার কল্পনারূপে ক্রমাভিব্যক্ত হয়। এজন্যই হিরণ্যগর্ভ জগৎ কারণ। তিনি অক্ষর—দ্বিতীয় পুরুষ। ব্রহ্মের মায়াজাত এই হিরণ্যগর্ভই পরমজ্ঞাতার দ্বিতীয় অভিব্যক্তি। তিনিই পরমপুরুষের পরম জ্ঞেয়।

৪৫। এই পরম জ্ঞাতার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের আরও দুই এক কথা চিন্তা করিতে হইবে। আমরা আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, স্ফুট বা অস্ফুট শব্দময়ী ভাষা ব্যতীত—কল্পনা, চিন্তা বা জ্ঞানক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। 'রূপ' (percept) 'ব্যক্তি'—আমরা ভাষা ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে একরূপ ধারণা করিতে পারি। কিন্তু 'নাম' বা জাতি (বা concept, abstract notion) আমরা শব্দ ব্যতীত চিন্তা বা ধারণা করিতে পারি না। এই জন্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পরম জ্ঞাতার জ্ঞানে যে কল্পনা বা ভাবনা অভিব্যক্ত,—তাহা শব্দ ব্যতীত বা নাম ব্যতীত সাধ্য নহে। তাই, ব্রহ্মের বা পরম পুরুষের সে কল্পনা 'নাম'ময়ী—শব্দরূপা। তাই কার্য্যব্রহ্ম নামরূপ শব্দময়; এ

---

(১) জর্ম্মণ পণ্ডিত সপেনহর, তাঁহার World as Will and Idea গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধেও জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপ দ্বৈতভাবই প্রথম অজ্ঞানাবরণ বা মায়ার বন্ধন(Veil of Ma´ya´) তাহার পর দেশকাল ও নিমিত্ত বা কার্য্যকারণজাল দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়াই জ্ঞানের দ্বিতীয় আবরণ। তাহার পর (প্রাক্তন জন্মজ ?) বাসনা (বা will) দ্বারা পরিচালিত হওয়াই জ্ঞানের তৃতীয় আবরণ। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সপেনহরের পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ জ্ঞানের এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপ দ্বৈতাবরণের কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝান নাই।

কারণ ব্রহ্মকে—ওঙ্কার—শব্দব্রহ্ম—Idea—*Idee*—Logos—Word—*Sophia*—বলা যায়। এবং কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের শক্তিকে সরস্বতী বলা হয়।

শব্দার্থক বা বৃদ্ধার্থক বৃহ্ ধাতু হইতেই ব্রহ্ম। যিনি 'কল্পনা', Idea, Logos, বা পরমপুরুষরূপে ব্যাপ্ত বা বিবর্ত্তিত হন, অথবা যাঁহার কল্পনা বা Idea অনুসারে তদনুরূপ জগৎ ব্যক্ত বা বিবর্ত্তিত হয়,—তিনিই ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞানে বহু হইবার সঙ্কল্প নিত্য বিকাশিত। এই জন্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,— "স অকল্পয়ৎ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।" এইরূপে পরমপুরুষের জ্ঞানে অসংখ্য অনন্তরূপ কল্পনা বা Ideaর বিকাশ হয়। তাই তাঁহার হিরণ্যগর্ভরূপে এই কল্পনা অসংখ্য হইয়া পড়ে। এই সব মূল Ideas বা বহু কল্পনাই 'নাম', ইহাই মূল জাতিজ্ঞান। আর পরম পুরুষের মায়া বা ইচ্ছাশক্তি অনুসারে, এবং তাঁহার কর্ম্মশক্তি বা প্রকৃতি বলে, তাঁহার এই বহুধাকৃত সঙ্কল্প তাঁহারই কালশক্তি প্রভাবে কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত (realised) হয়। তাঁহার ভাবনা—ভাবরূপ হইতে সৎরূপে পরিণত হয়। ইহা হইতে 'রূপ'। ইহা হইতেই নামরূপময় জগৎ। এই নাম—জাতি, আর রূপ—ব্যক্তি। যাহা হউক, সেই জ্ঞাতা ব্রহ্মের কল্পনাই দিক্কালময়ী ব্রহ্মজ্ঞানপটে জ্ঞেয়রূপে ব্যাকৃত হয়,—ও ক্রমবিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্পযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রথমে যাহা জ্ঞেয়রূপ পরিকল্পিত, ব্রহ্মের মায়া বা ইচ্ছাশক্তি বলে তাহাই ব্রহ্মসত্বায় সৎরূপে বিবর্ত্তিত। ব্রহ্মজ্ঞানস্থ কাল্পনিক বা মায়িক বা প্রতিভাসিক জগৎ, তাঁহার শক্তিবলে ব্যবহারিক সত্য জগতে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে তাঁহার 'বাক্' অর্থ সম্পৃক্ত হয়। এইজন্য ব্রহ্মে 'Thought' এবং 'Being' বা 'Extension' একই। (১) এবং এই জন্য তাঁহার Thought ও Extension দুই নিত্য ভাব। 'ওঁ' অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ বা চিৎস্বভাব জ্ঞানময় ব্রহ্মে 'তৎ' বা জ্ঞেয়রূপে কল্পিত 'ইদং' বা জগৎবীজ, 'সৎ'-রূপে পরিণত হয়। অতএব 'ওঁ' তৎসৎ'-ব্রহ্মের সেই মায়ারূপময়ী সঙ্কল্প অনুসারে ব্রহ্মের মহাশক্তির কার্য্যরূপে বিকাশই তাঁহার বিরাটরূপ। এই বিরাটই তৃতীয় পুরুষ। পরম পুরুষের বহুকল্পনাময়ী হিরণ্যগর্ভরূপ হইতে, তাঁহার পরাশক্তিবলে সেই বহুকল্পনার সৎরূপে বা কার্য্যরূপে যে অভিব্যক্তি, তিনিই এই বিরাট। তিনিই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয়। তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ। (২)

---

(১) বিলাতী পণ্ডিতদের মধ্যে স্পাইনোজা ও হেগেল্ এই কথা বুঝাইয়াছেন। হেগেল্ আরও বুঝাইয়াছেন যে, যে নিয়মে ব্রহ্মের অব্যাকৃত জ্ঞান ক্রমে ব্যাকৃত হয়, মূল এক কল্পনা—বহু হইয়া বিকাশিত হয়, জগৎও সেই নিয়ম অনুসারে তাঁহারই কালশক্তিবশে ক্রমাভিব্যক্ত হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সেই ব্রহ্মজ্ঞানের (Absolute Reasonএর) সহিত একস্বভাব। এই জন্য জ্ঞানের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব বুঝিলে, আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগতের ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝিতে পারি। হেগেল্, তাঁহার লজিক্ (Logic) গ্রন্থে এই কথা বুঝাইয়াছেন। তাঁহার লজিক্ ও Logos-বিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান একই।

(২) বিলাতী দার্শনিকদিগের মধ্যে হেগেল্ বোধ হয় কতকটা আমাদের শাস্ত্রের এই গূঢ় অর্থ অবলম্বনে, তাঁহার Philosophy of Religion গ্রন্থে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের 'Trinity'বাদ বুঝাইয়াছেন। এই 'ত্রিত্ব' মধ্যে God, the Father—মহাপুরুষ। God, the son বা খ্রীষ্ট—দ্বিতীয় অক্ষরপুরুষ। তিনিই পরম-

এই রূপে পরমজ্ঞাতাই পরম জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত হন। জ্ঞাতা পরমপুরুষই শব্দ-ব্রহ্ম হইয়া—বা মায়া বলে পরমজ্ঞেয়রূপে পরমা প্রকৃতিরূপিনী মহৎব্রহ্ম অধিষ্ঠিত হন। তখন প্রকৃতি সেই ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু—চৈতন্যরূপিনী হন। এবং ব্রহ্মের সঙ্কল্প অনুসারে জগৎকে ক্রমে তাঁহার কালশক্তি বশে সৎরূপে বিবর্ত্তিত করেন। অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমপুরুষ, তাঁহার জ্ঞানময়-তপোযুক্ত ইচ্ছা বা ঈক্ষণশক্তি বলে, তাঁহার (Ideas বা) বহুসঙ্কল্পবীজ অথবা হিরণ্য-গর্ভরূপে মহাতেজোময় বীজ—মহৎব্রহ্ম-রূপিনী পরমা প্রকৃতিতে নিষেক করিলে, অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমপুরুষের মায়িক কল্পনা তাঁহার প্রকৃষ্ট কর্ম্মশক্তি বা প্রকৃতি (২) বলে কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইলে,—পরমজ্ঞান ও পরমকর্ম্মশক্তি একীভূত হইয়া কার্য্যোন্মুখ হইলে, বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্বের বা হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি হয়। এই হিরণ্যগর্ভই এক অর্থে চিন্ময়ী প্রকৃতির প্রথম বিকাশ। ক্রমে তাহা হইতে এই বিরাটরূপ জগতের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক, ব্রহ্মের এই কল্পনা বা জ্ঞানই কেবল 'শব্দ' বা 'নাম' দ্বারা অভিব্যক্ত হইতে পারে। তাই জ্ঞাতা পরমপুরুষের হিরণ্যগর্ভ বা শব্দব্রহ্মরূপে প্রথম বিকাশ হয়। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা আরও এক তত্ত্বের উল্লেখ করিব। যেমন সেই 'শব্দ' দ্বারা এক দিকে জ্ঞানের বিকাশ হয়—ব্রহ্মের সঙ্কল্প 'বহু' হইয়া পড়ে, যেমন মহাশক্তি বলে, অথবা নানারূপে বিকাশিত মায়া, বিভিন্নরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মে কল্পনা বহু হইয়া বিবর্ত্তিত হয় (১), তেমনই ব্রহ্ম হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া সেই শব্দ, তাহার 'এজৎ' বা অনুকম্পন ক্রিয়া দ্বারা, এক দিকে 'প্রাণ'শক্তি রূপে ও অন্য দিকে আকাশরূপে, ও তাহা হইতে জীবজড়ময় ভৌতিক জগৎরূপে বিকাশিত হয়। (২) এইরূপে ব্রহ্ম নিজশক্তিবলে 'কার্য্যব্রহ্ম' হইয়া, তাঁহার সেই শব্দময়ী কল্পনাকে বিকাশ করেন। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, অক্ষরপুরুষের প্রথম বিকাশ—শব্দ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভরূপে, এবং তাঁহার দ্বিতীয় বিকাশ—কার্য্যব্রহ্মরূপে বা বিরাট রূপে হইয়া থাকে। (৩) এই হিরণ্য-গর্ভরূপী শব্দব্রহ্ম হইতে বেদের অভিব্যক্তি হয়। শব্দ দ্বারা প্রকটিত ব্রহ্মের কল্পনা যে নিয়মে বহু হইয়া বিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী অক্ষরপুরুষের জ্ঞান যে নিয়মে বহুরূপে ব্যাকৃত হয়,—তাহাই বেদ। সেই বেদ অনুসারে ও ব্রহ্মের কার্য্যশক্তি বলে জগতের অভিব্যক্তি হয়। এই জন্য এই বেদই জগতের মহাগ্রন্থ—এই বেদানু-

---

পুরুষের জ্ঞেয়। আর Holy Ghost বা Procession of the spirit, তৃতীয় পুরুষ,—জগতের ক্রমবিকাশ শক্তি—বিরাট। তিনি দ্বিতীয় পুরুষের—জ্ঞেয়। হেগেল্ এই জন্য Procession of the Spirit কে সমাজাত্মা—বিশেষরূপে খ্রীষ্টানসমাজের আত্মা বলিয়াছেন, এবং এই শক্তিবলে সমাজের ক্রমবিকাশ হয়, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা স্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে।

(২) প্র পূর্ব্বক কৃ ধাতু হইতে প্রকৃতি।

(১) "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ।"—বৃহদারণ্যক্ উপনিষৎ, ২। ৫। ১৯।

(২) "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।" কঠশ্রুতি, ৬। ২।

(৩) "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং।"—গীতা ৩। ১৫।

সারেই জগৎ বিবর্ত্তিত হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সেই মহাবেদ লাভ করিতে পারি না। তবে বিশেষ অবস্থায় কোন কোন সমাজ তাহা আংশিকরূপে লাভ করিতে পারে,—এবং সেই বেদ লাভ করিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব কতকটা ধারণা করিতে পারে। (৪)

পরমপুরুষের যে জ্ঞান এইরূপে বহু হইয়া ক্রমে ব্যাকৃত হয়,—ব্যাপ্ত হইয়া সৎ-রূপে বা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়—বলিয়াছি, যে জ্ঞান হইতে জগৎবীজ হিরণ্যগর্ভের বিকাশ হয়,—তাহাই জগতের পিতৃশক্তি। আর ব্রহ্মের যে পরাশক্তি বলে, তাঁহার পরমাপ্রকৃতিরূপিনী "মহৎ" গর্ভে তাঁহার সেই সংকল্প বীজের পুষ্টি ও সৎরূপে অভিব্যক্তি হয়,—যে পরমাপ্রকৃতির মমতাময়ী শক্তিবলে, কার্য্যরূপে জাত—সেই বহু কল্পনার পোষণ, বর্দ্ধন ও ক্রমপরিণতি হয়, তাহাই মাতৃশক্তি। এই পিতৃমাতৃশক্তি বলেই এই অনন্ত জড়জীবময় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পরিণতি হয়। (৫)

যাহা হউক, সেই বিরাটরূপী ভগবানের এই বিরাট অভিব্যক্তির কথা, পিতৃমাতৃশক্তি রূপে এই জীবজড়ময়ী জগতের রক্ষণ ও পালনের কথা আমাদের এস্থলে আলোচ্য নহে। মহৎব্রহ্মে উপ্ত—ভগবানের এই বহুসংকল্পবীজময় হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্মের —কিরূপে ব্রহ্মের কালশক্তি বা পরিণতি করিবার শক্তিবলে জন্ম বৃদ্ধি ও লয় হয়, কিরূপে সেই এক নিয়মে সৃষ্টির পর লয়, ও লয়ের পর সৃষ্টি অনাদি অনন্তকাল চলিতে

---

(৪) জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের Transcendental Logic বা Logos-বিজ্ঞান কতকটা যে এই অর্থে ব্যবহৃত, তাহা পূর্ব্বের টীকায় (৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উল্লিখিত হইয়াছে। হেগেলের মতে, Logic is the theory of thought and being in one. (Falckenberg's History of Philosophy দ্রষ্টব্য।) "Logic is the science of the pure Idea......of God or the Logos...Logic considers the self movements of the Absolute from the most abstract conceptions ......to the most concrete conceptions." (Ueberweg's History of Philosophy দ্রষ্টব্য।)

(৫) আমরা এস্থলে ব্যবহারিক জগতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছি। যাঁহারা আমাদের নিজের কল্পনা হইতে নিজজ্ঞানে উদ্ভাসিত জগৎ মাত্র স্বীকার করেন, যাঁহারা প্রতিভাসিক জগৎ ব্যতীত ব্যবহারিক জগৎ স্বীকার করেন না,—তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে কল্পিত জগৎ মাত্র স্বীকার করেন, জগতের ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিভাসিত কাল্পনিক অস্তিত্ব ব্যতীত তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা জীবজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানের অংশ বা প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়া, ব্রহ্মের জগৎকল্পনা জীবজ্ঞানে নিত্য প্রতিভাসিত—একথা সিদ্ধান্ত করেন,—তাঁহারা মায়াবাদী। আর যাঁহারা ব্রহ্মের জগৎকল্পনাকে ব্রহ্মশক্তিবলে ব্রহ্মসত্ত্বায় সৎ-রূপে বিবর্ত্তিত বা পরিণত বলিয়া স্বীকার করেন, ও এইরূপে জড়জীবময় জগতের নিত্যত্ব ও সত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহারা কেবল সগুণ (বা Immanent) ব্রহ্মবাদী। আর যাঁহারা ব্রহ্মের এই সগুণভাবকে—এই জগৎকে কেবল ব্যবহারিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মের অদ্বয় জগদতীত (transcendental) ভাবই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন,—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। এই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের উপরের ভূমিতে উঠিয়া, Transcendent ও Immanent ব্রহ্মবাদের বাহিরে গিয়া, উভয়কে একীভূত (বা synthesis) করিয়া, তবে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। প্রকৃত তত্ত্ব—দ্বৈত বা অদ্বৈত নহে।—

'ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ইত্যেতৎ পরমার্থিকং। দক্ষ সংহিতা, ৭। ৭৮। আমরা যথাসধ্য এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, এবং মায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ ও শক্তিবাদ সামঞ্জস্য করিয়া, তন্মূলে সমাজাত্মা ও সমাজশরীরের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

থাকে, সে তত্ত্ব এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। এস্থলে আমরা কেবল পরমপুরুষের পরম জ্ঞানে হিরণ্যগর্ভরূপে সংকল্পিত মানবজাতি ও মানব সমাজ রূপ মহাভাব বা মহাকল্পনা (Idea,) এবং এই বিরাট জগতের একাংশে মাতৃরূপিনী পরমাপ্রকৃতির পরাশক্তি বলে সে কল্পনার অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশতত্ত্ব যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

৪৬। একথা বুঝিবার জন্য, আমাদের এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আলোচনা করিতে হইবে। ব্রহ্মের কার্য্যশক্তি বা পরাপ্রকৃতি বলে ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞেয় বা পরিকল্পিত জগতের দুইরূপ অভিব্যক্তি হয়। জীব ও জড়, বা আত্মা ও অনাত্মা, অথবা চিৎ ও অচিৎ—সেই দুইরূপ। এইজন্য, অর্থাৎ এই প্রকৃতির কার্য্য জন্য, এ উভয়কেও প্রকৃতি বলে। ইহাদের মধ্যে জীব—পরাপ্রকৃতি, আর জড়—অপরা প্রকৃতি। জীব—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই, জড়—শুধু জ্ঞেয়। জীব অনেক ও অনেক জাতীয়। আব্রহ্মস্তম্ভ সমুদায়ই জীব। দেশকালে সীমাবদ্ধ হেতু পরম পুরুষের সেই জীবরূপী কল্পনা বিকাশের ক্রম আছে। এই জন্য অসংখ্য জাতীয় জীবকল্পনার অভিব্যক্তি হয়। বলিয়াছি ত, সেই কল্পনা ব্রহ্মপ্রকৃতি বলে সৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়। জাতিরূপিনী সেই প্রকৃতির জাতিশক্তি বা জাতিরূপের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে বলা উচিত যে, এই জাতি দ্বিবিধ—পর ও অপর। পর জাতি অবিশেষে। সেই এক অবিশেষ সত্তার বিবর্ত্তনে এই জগতের ক্রমবিকাশ হয়, তাহা হইতেই বিশেষ সত্তা বা অপর জাতির অভ্যুদয় হয়। সেই অপর জাতি আবার সামান্য বিশেষ ভাবে আমাদের জ্ঞানে অবস্থা বিশেষে গৃহীত হয়। মানুষ—আমাদের সম্বন্ধে সামান্য জাতি কিন্তু জীবের সম্বন্ধে বিশেষ জাতি। যাহা এক অবস্থায় সামান্য জাতি (genus), তাহাই অন্য অবস্থায় আমাদের জ্ঞানে উচ্চতর জাতির (genus এর) অন্তর্গত হইয়া বিশেষ জাতি (species) হয়। আমাদের জ্ঞানে যে রূপেই এই জাতিজ্ঞানের বিকাশ হউক, ব্রহ্মজ্ঞানে এক পরজাতিকল্পনা হইতেই তাহা ক্রমে ক্রমে সীমাবদ্ধ হইয়া বহুজাতিকল্পনার বিকাশ হয়—তাহা হইতে প্রকৃতির জাতিশক্তিবলে বহু জাতির ক্রমবিকাশ হয়। এইরূপে পরমপুরুষের এক অবিশেষ কল্পনা বা পরজাতি ভাব, বহুরূপে ব্যক্ত হইবার সংকল্প বশে, হিরণ্যগর্ভ রূপে বিশেষ ভাবে ও বহুরূপে প্রকৃতিবলে ব্যক্ত ও বিবর্ত্তিত হয়, ও এই প্রকারে বিরাটরূপে বহু জাতীয় জীবের বিকাশ হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞাতারূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট। হিরণ্যগর্ভই সেই জ্ঞাতা অক্ষরপুরুষ রূপ। জীবেও তিনি অধ্যাত্মরূপে, অনুচৈতন্যরূপে, কূটস্থরূপে, ক্ষরপুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। জীবেই পরমপুরুষের জ্ঞাতাস্বরূপের আংশিক অভিব্যক্তি হয়,—অপরিস্ফুট, সীমাবদ্ধ, দেশকালনিমিত্তরূপ মায়াবশে ব্যষ্টিভাবে তাহার বিকাশ হয়। এই আংশিক খণ্ডিত জ্ঞাতারূপ জন্যই—জীব পরাপ্রকৃতি। অপরাপ্রকৃতি—তাহারও জ্ঞেয়। এইরূপে ব্যক্তিজীবে ব্রহ্মজ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট। জীবত্বের ক্রমবিকাশ ও জাত্যন্তরের সহিত প্রত্যেক জীবজ্ঞানে তাহার সত্ত্বারূপে নিম্নতর জাতিজ্ঞান ও জাতিভাব হইতে উচ্চতর জাতিজ্ঞান ও জাতিভাবের

ক্রমবিকাশ হয়। মানবে সেই জীবজ্ঞান পূর্ণ বিকাশিত। মানবই জীবত্বের পূর্ণ বিকাশ। মানবের হৃদয়েই জ্ঞানরূপী ভগবান তাঁহার উপযুক্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন—বলিয়াছি। যাহা হউক, ব্রহ্মের কালশক্তি বশে ও এই ক্রমবিকাশ নিয়মে—প্রত্যেক জীবপ্রকৃতির আপূরণের সহিত ও জীবজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হেতু, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবের ক্রমে জাত্যন্তর প্রাপ্তি হয়, (১) এবং জীবকে ক্রমে ক্ষুদ্রজীবাণু অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশিত মানব জাতিতে উন্নীত হইতে হয়,—এবং মানবত্ব লাভ করিবার জন্য জীবকে নানাজাতীয় জীব স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। (২) জীবজ্ঞানকে, জীবাণুতে সুপ্ত অবস্থা হইতে, ইতরপ্রাণীতে স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া, পরে মানবেই পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসিতে হয়। এবং সে জন্য, কত কতযুগযুগান্তর, কত কোটী কোটী বৎসরের প্রয়োজন হয়। (৩)

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি বলে,—ব্রহ্মের এই অসংখ্য জাতীয় জীবকল্পনাসমষ্টির বহুরূপে প্রথম বিকাশই মহত্তত্ব। তাহাই হিরণ্যগর্ভ,—তাহাই জ্ঞানরূপে এ জগতে অনুপ্রবিষ্ট ও বিবর্ত্তিত। তাহাই এক অর্থে ব্যষ্টিজীবে অনুপ্রবিষ্ট—ব্রহ্মজ্ঞানসমষ্টি বা বুদ্ধিতত্ত্ব। এই হিরণ্যগর্ভ হইতে, প্রথমে যে নানা জাতীয় জীব কল্পনার অভিব্যক্তি হয়,—তাহাই সে হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। সেই বহুরূপে ব্যাকৃত জাতি-কল্পনা—অপরা প্রকৃতিতে বা জড়জগতে অধিষ্ঠিত ও দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া, বহুরূপে বিভক্ত হইয়া, বা ব্যষ্টিরূপে শরীরী হইয়া যে অভিব্যক্ত হয়, বা পরমাপ্রকৃতির সহায়ে বিবর্ত্তিত হয়, বলিয়াছি ত, ইহাই হিরণ্যগর্ভের বিরাট সৃষ্টি। হিরণ্যগর্ভের প্রত্যেক জাতি কল্পনা এইরূপে ব্রহ্মের পরাশক্তি বলে, দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া ব্যষ্টি বা বহুরূপে বিরাটশরীরে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। তাঁহার মানবজাতিকল্পনাও এই বিরাট শরীররূপে অভিব্যক্ত। সমাজরূপে সেই মানবত্বের বা মানবজাতিত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা তাঁহার বিরাট রূপেরও ক্রমাভিব্যক্তি হয়। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—সমগ্র কালে, ও সমগ্র দেশে সেই মানবকল্পনার ব্যষ্টি বা বিশেষ অভিব্যক্তির সমষ্টিতে এক বিরাট মানবসমাজ। এই জন্য সেই বিরাট-সমাজ ভগবানের বিরাট রূপ। হিরণ্যগর্ভের সমষ্টিমানবকল্পনা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত বা শরীরী হইবার জন্যই বিভিন্ন মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হয়। প্রত্যেক ব্যষ্টি সমাজ সেই বিরাট সমাজ-শরীরের অঙ্গ বা অংশ মাত্র। প্রত্যেক মানবসমাজ ভগবানের সেই ব্যষ্টি সমাজ-শরীরের অংশ বা উপকরণ। বলিয়াছি ত, প্রত্যেক মানবের মানবত্ব সেই সমাজ সহায়েই ক্রমবিকাশিত হয়।

৪৭। আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবানের

---

(১) "জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"—পাতঞ্জলদর্শন,—৪।২।

(২) বিলাতী পণ্ডিত (Darwin) ডারুইন সাহেব, জাতির ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, বহু জাতির মধ্যে একত্ব সংস্থাপন, ও এক পরজাতির বহুরূপে ক্রমবিকাশতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝান নাই। তাহা এপর্য্যন্ত কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ধারণা করিতে পারেন নাই।

(৩) A spirit which sleeps in the stone, dreams in the animal, and awakes in man."

Schopenhpur's "Fourfold Root."

অনন্ত জ্ঞানে সমগ্র মানবজাতি বা সমস্ত মানবসমাজ এক। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ— সমগ্র কালের মানব সমষ্টির কল্পনা হইতে, আমরা সেই এক অখণ্ড বিরাট মানবসমাজের কতকটা ধারণা করিতে পারি। এই বিরাট সমাজে মানব-প্রবাহ অনন্ত। প্রতিদিন লক্ষাধিক লোক জন্মিতেছে, প্রায় লক্ষ লোক মরিতেছে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সমাজ অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই নিত্য মানবপ্রবাহ মধ্যে এক অখণ্ড মানবত্ব, এক অনন্ত মানবসমাজ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। বলিয়াছি ত, এই সমগ্র মানবসমাজ ভগবানের বিরাট শরীরের এক অংশ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজ সেই এক বিরাটসমাজের আংশিক ব্যষ্টি বা সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র। ভগবানের সমষ্টিমানব বা মানবজাতির ধারণা হিরণ্যগর্ভের মানসসৃষ্টি রূপে ক্রমে প্রকট হইয়া, এই বিরাটরূপে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রের কথায়, ইহা স্বয়ম্ভুর শরীর গ্রহণ। ক্রমে তাহার পূর্ণ পরিণতি হইতে থাকে। যেমন নিম্নতর জীবত্ব হইতে উচ্চতর জীবত্ব অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ক্রমবিকাশিত হইতে থাকে, তেমনই মনুষ্যত্বের নিম্নতম বিকাশ হইতে, উচ্চতম বা কাল্পনিক আদর্শের বিকাশ সমুদায়ই যথাসম্ভব অভিব্যক্ত হইতে থাকে। দেশকাল ও নিমিত্ত অনুসারে সেই মনুষ্যত্বের বা মনুষ্যধর্ম্মের যেখানে যখন যেরূপ বিকাশ নিয়মিত হয়, সেখানে সেইরূপ বিকাশ হইতে থাকে। সমষ্টি মানবত্বের ক্রমবিকাশ জন্য—খণ্ড মানবসমাজ। ব্যষ্টি মানবে এই সমষ্টিমানব বা পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি জন্য—এক কথায় মানুষের ক্রমোন্নতি জন্য, তাহার ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার ও বাসনা সংযত করিয়া জ্ঞানস্বরূপে অধিষ্ঠান জন্য—এই ব্যষ্টি খণ্ড মানবসমাজ। আমরা দেখিয়াছি যে, সমাজ মাত্রেই পরার্থ সংহত, অর্থাৎ তদন্তরস্থ আত্মা বা চৈতন্যের প্রয়োজন জন্য অভিব্যক্ত। আমরা দেখাইয়াছি যে, কেবল সমাজ সহায়েই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। যে ব্যষ্টিসমাজ যেরূপ পরিণত, সে সমাজে ব্যক্তি মানবে তদনুরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। বিরাটরূপী ভগবান যখন যে সমাজে যেরূপ মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম্ম সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন, সে সমাজে সেইরূপ মনুষ্যত্বই বিকাশিত হইতে পারে। সুতরাং এই মনুষ্যত্ব বিকাশ জন্যই সমাজ সংহত। ভগবান সমাজশরীর রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া সমাজাত্মা রূপে সেই সমাজশরীরে অধিষ্ঠিত হন। ভগবান তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব কল্পনার ক্রমবিকাশ জন্য সমাজাত্মারূপে তাঁহার প্রত্যেক ব্যষ্টি সমাজশরীরে অবস্থান করেন।

আমরা এতদূর যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, সমাজ শরীরান্তর্গত এই চৈতন্য, এই সমাজাত্মা—হিরণ্যগর্ভ, অথবা পরমপুরুষ। প্রত্যেক দেহকে ক্ষেত্র বলে। এবং তদধিষ্ঠিত চৈতন্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। স্বয়ং ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রতিশরীরে (সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে) অধিষ্ঠিত। বিরাট সমাজক্ষেত্রে ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার মনুষ্যত্ব কল্পনার সংরূপে পরিণতি জন্য, ক্রমবিকাশ জন্য, প্রকৃতির সহায়ে তিনি সমাজশরীর সৃষ্টি করেন। ব্যক্তিমানব ভগবানের সেই সমাজশরীরের উপকরণ মাত্র। ভগবান পরম জ্ঞাতারূপে সেই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। আর সমাজশরীর সেই শরীরাভিমানী আত্মারূপে—বা পূর্ণ অখণ্ড মনুষ্যত্ব

ভাবে—তিনি হিরণ্যগর্ভ। সমগ্র মানবসমাজ সেই হিরণ্যগর্ভের বিরাট রূপ। হিরণ্যগর্ভের বিভিন্ন জীব সৃষ্টি কল্পনা বীজই—মনু। 'মনু'—জীব ভাবের ও সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় জীবকল্পনার সমষ্টি। সেই মনু—বিরাট হইতেই অভিব্যক্ত। [illegible] জন্য মনু বিরাটের সন্তান। মনু হইতেই প্রজাপতি দেব গন্ধর্ব্ব মানুষ কীট তৃণ প্রভৃতি সকল জাতীয় জীবত্বের অভিব্যক্তি হয়। (১) বলিয়াছি ত, মানবই এ জগতে জীবত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। এজন্য মানবজাতিই বিশেষরূপে মনুর সন্তান। প্রত্যেক মানব এই সমষ্টি মনুষ্যত্বের,—শ্রেষ্ঠ জীবত্বের বা এই মনুভাবের ব্যষ্টি বিকাশ। এই জন্য মানব—মনুর সন্তান। (২)

এইরূপে আমরা বিরাট মানবসমাজের কথা ও সমাজাত্মা ভগবানের কথা বুঝিতে পারি। এইরূপে আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব ধারণা করিয়া, তাহা হইতে এক বিরাট সমাজশরীরের কথা ও সমাজাত্মা ভগবানের কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, তাঁহারা, বর্ণতত্ত্ব অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ বা বর্ণ ও তাহার কার্য্যবিভাগতত্ত্ব বুঝাইবার সময়, এবং ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণ যে বিরাট সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ ও তাহা হিরণ্যগর্ভ হইতে অভিব্যক্ত—ইহা বুঝাইবার সময়, এই কথা আরও পরিষ্কার রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সে যাহা হউক, আর্য্যঋষিগণের উল্লিখিত, এই বিরাট সমাজশরীর ও সমাজাত্মার কথা, আজ কাল কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ সমগ্র মানবজাতির একত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র বিভিন্ন মানবসমাজকে একীভূত করিয়া—'Humanity' বা মনুষ্যত্ব রূপ বা মানবজাতি রূপ বিরাট মানবসমাজের আভাস দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক জন দার্শনিক পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিব মাত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ফরাসি দার্শনিক কোম্‌ত্—ইঁহাদের অগ্রণী। তাঁহার ধারণা অপরিস্ফুট বটে। কিন্তু বলিয়াছি ত, তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়া সমাজের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই 'হিউম্যানিটি' ব্যতীত অন্য ঈশ্বরই স্বীকার করেন নাই। ইঁহার পর, জার্ম্মণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রচারিত চুক্তিমূলে সমাজসৃষ্টিবাদ তাদৃশ—সঙ্গত বিবেচিত না হইলেও, তিনিও সমগ্র মানবসমাজ মধ্যে একত্ব (১) ধারণা করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন ব্যষ্টি সমাজ সেই একত্বের

---

(১) মনুসংহিতা,—১। ৩৩—৪১। দ্রষ্টব্য।

(২) কেহ কেহ বলেন, দক্ষকন্যা মনু হইতে মানুষের জন্ম বলিয়াই 'মানব' নাম হইয়াছে। একথা সঙ্গত ঠিক নহে।

(১) ক্যাণ্টের কথা এইরূপ :—

"In other words, Kant allows that, in order to give rational meaning to the history of man, we are obliged to take the point of view of humanity, and treat the whole life of the race, as if it were the continuous development of one immortal being, who could realise its "Idea" as a being endowed with reason, "only in the species and not in the individual;" but he maintains that if we take this point of view, it is possible to regard the whole of History as a process towards an end, determined by the "Idea of Man."

E. Caird's Critical Philosophy of Kant. Vol. II. P. 549.

দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে (২), ইহাও বুঝিয়াছিলেন। জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্তে বোধ হয় আরও বিশদরূপে সমগ্র সমাজ জাতির এই একত্ব ধারণা করিয়াছিলেন। মানবজাতি যে সেই সগুণ (Immanent) ব্রহ্মের প্রাণশক্তির বিকাশ,—তাহা যে ব্রহ্মের মহাকল্পনার একমাত্র সার অভিব্যক্তি, মনুষ্যত্ব যে এক—অবিভক্ত,--দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া নানারূপে বিভক্ত হইলেও মুলতঃ মানুষ যে এক,—মানবজাতি অপেক্ষা উচ্চতর জাতিকল্পনা যে ব্রহ্মজ্ঞানে, কখন বিকাশিত হয় নাই—তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন। (৩) জর্ম্মাণ পণ্ডিত হেগেল, তাঁহার ঐতিহাসিক তত্ত্ববিচার গ্রন্থে, সমাজ শরীর দ্বারা আত্মার মায়িক বিকাশতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। (১) আধুনিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের প্রকাশিত এই তত্ত্ব,—ইটালির অসাধারণ কর্ম্মবীর মহামতি ম্যাট্সিনি তাঁহার প্রচারিত"মানুষের কর্ত্তব্য" আখ্যাত অসাধারণ গ্রন্থে অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। (২) ইহা হইতেই আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই এক বিরাট সমাজ সম্বন্ধে ধারণার কতক আভাস পাই। এই বিরাট সমাজশরীর যে ভগবানের বিরাট-রূপ, সমাজাত্মা যে ভগবান, তাহা আমরা ইঁহাদের কথা হইতে জানিতে পারি।

---

(২) এ সম্বন্ধে ক্যাণ্টের কথা এইরূপ :—

"We must also remember that the same necessity which makes the individual submit to the rules of law in one society, is working to drive all societies into an alliance, and that ultimately it points to the Idea of Universal Civil Society, by which alone a perfect equilibrium of man's impulses—of his impulse towards unity and his impulse towards liberty—can be secured."

E. Caird's Critical Philosophy of Kant. Vol. II. P. 552.

(৩) ফিক্তের (Fichte) কথা এই :——

"This living and visible Manifestation of the Divine Life, we call Human race. * * * As Being—absolute Being, constitutes Divine Life, and is wholly exhausted therein, so does existence in Time or Manifestation of the Divine Life consitute the whole united Life of Mankind and is thoroughly and entirely exhausted therein. Thus in its Manifestation the Divine Life becomes a continually Progressive Existence. * * The progressive culture of the human Race is the object of the Divine Idea. * * The Life of Man which in truth is essentially one and indivisible, is divided into the life of many proximate individuals."

Fichte,—"On the Nature of the Scholar."

(১) নিম্নোদ্ধৃত কথা হইতে এ সম্বন্ধে হেগেলের মতের আভাস পাওয়া যায় :—

"Objective Spirit is realised in legal right, morality and ethicality, which latter unites in itself the former two, and in which the person recognises the spirit of the community, the ethical substance in the family, in civil society and in the state, as his own essence."

Ueberweg's History of Philosophy.

"History is the development of the rational state : the world spirit—the guiding force in the development : its instrument— the spirit of the nations and great men. A particular people is the expression of but one determinate moment of the universal spirit......"

Falkenburg's History of Modern Philosophy.

(২) ম্যাট্সিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Humanity is the word (Logos) living in God. The spirit of God fecundates it, and manifests itself through it. * * * Humanity is the successive incarnation of God. In our terrestrial existence, limited both in education and capacity, the realisation of this Divine Idea can only be most imperfect and momentary. Humanity only......is capable of gradually evolving, applying and glorifying the Divine Idea.

We have yet to teach mankind that as humanity is one sole body, we all being members of that body, are bound to labour for its development. * * we can only elevate ourselves toward God through the souls of our fellow men."

Mazzini,—"On the duties of man."

আর কোন পণ্ডিতের কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

৪৮। এইরূপে কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক বিরাট মানব-সমাজের কথা,—Humanity বা মনুষ্যত্বের কথা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, ব্রহ্মের বিরাটরূপ বুঝিতে না পারিলে, এই বিরাট মানবসমাজের ধারণা সহজে সম্ভব হয় না। একেশ্বরবাদ লাভ করিয়াও—যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলেন, মানুষকে ঈশ্বরের দাস রূপে কল্পনা করেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে এ পৃথিবী হইতে দূরে—স্বর্গে অবস্থিত বলেন, ঈশ্বরকে পৃথিবীর নিয়ন্তারূপে ধারণা করেন, তাঁহারা মানুষের মধ্যে প্রকৃত একত্বের কোন মূলসূত্র ধরিতে পারেন না, তাঁহারা বিরাট সমাজশরীরতত্ত্ব ধারণা করিতে পারেন না।

ভক্তাবতার খ্রীষ্ট উনবিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন,—সকল মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, সকলে সমান, সকলে ভাই ভাই, অতএব সকলকে ভালবাস। তিনি এই মহা সাম্যবাদ সংস্থাপন করিয়া প্রথমে সে দেশে মানুষের মধ্যে একত্বের আভাস দিয়াছিলেন—এবং এইরূপে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আরও অগ্রসর হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া, ঈশ্বরের সহিত আপনার একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি শব্দরূপে—Sophia বা Word রূপে—জ্ঞানরূপে, জগতে বিবর্ত্তিত সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিয়াছিলেন। তাই খ্রীষ্ট ধর্ম্মপুস্তকে এই সমাজশরীরের আভাস পাওয়া যায়। (১) কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পরে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান ইউরোপ এই তত্ত্ব সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই। রুসো যখন ফরাসী দেশে তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার করেন, তখনও এই তত্ত্ব অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ছিল। কেবল গত শতাব্দীতে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিরাট মানবসমাজের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যতক্ষণ সনাতন ধর্ম্মের সহায়ে আমরা সেই অদ্বিতীয় একের তত্ত্ব লাভ করিয়া প্রকৃত একত্বের ধারণা করিতে না পারি, যতক্ষণ সেই মহা একত্বজ্ঞানমূলক প্রকৃত সাম্যবাদ শিক্ষা করিতে না পারি, যতক্ষণ মানুষে মানুষে পৃথক্—তুমি আমি ভিন্ন—আমাদের এই ভেদজ্ঞান দূর হইয়া না যায়, ততক্ষণ আমরা সমষ্টি মানবের বা প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধারণা করিতে পারি না। যতক্ষণ আমরা কেবল 'ভাই ভাই' নহে—শুধু এক পিতা বা এক মাতার সন্তান নহে—কিন্তু আমরা মূলতঃ সকলে এক অভিন্ন—একথা না বুঝিতে পারি, যতক্ষণ তুমি আমি এক—আমরা স্বরূপতঃ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—তোমার আমার তুমিত্ব আমিত্ব—এ প্রভেদ বস্তুতঃ ব্যবহারিক—আমাদের এই তুমি আমি ভেদজ্ঞান ব্রহ্মের মায়াময় কল্পনাজাত ও আমাদের অজ্ঞান প্রসূত—একথা না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ আমরা প্রকৃত সমাজ-

---

(১) সেণ্টপল্ বলিয়াছেন :—

"For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members, one of another."

The Bible—New Testament.—Romans XII. 4—5.

শরীরতত্ত্ব, প্রকৃত মনুষ্যত্বকথা বুঝিতে পারিব না। যতক্ষণ আমরা ‘সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্মা’ না হইতে পারি, যতক্ষণ আমরা সর্ব্বভূতকে আমাদের মধ্যে ও আমাদিগকে সেই ভগবানের মধ্যে দর্শন করিতে না পারি, (১) যতক্ষণ আমরা এই প্রকৃত সাম্যে অবস্থান করিতে না পারি, যতক্ষণ আমরা সকল পরকে আপনার করিয়া না লইতে পারি, স্বার্থ অহঙ্কার সব বিসর্জ্জন দিয়া বাসনাবীজ নষ্ট করিয়া নিষ্কাম ভাবে—পরার্থে—ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করিতে না শিক্ষা করি, যতক্ষণ আমরা আমাদের ‘অহঙ্কার’কে ‘ওঙ্কারে’ বিলীন করিয়া দিতে না পারি, ততক্ষণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। ততক্ষণ আমরা ব্যষ্টি সমাজশরীর দ্বারা মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ধারণা করিতে পারিব না। ততক্ষণ আমরা বিভিন্ন সমাজমধ্যে পার্থক্যজ্ঞান দূর করিয়া সকল সমাজ মধ্যে সেই মহান্ একত্ব দর্শন করিয়া এক বিরাট সমাজশরীরের ধারণা করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের দর্শন আমাদিগকে এই মহান্ একত্বতত্ত্ব শিক্ষা দেন। আমরা সাধনাবলে সেই শাস্ত্রজ্ঞান প্রকৃতরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ক্রমে আমাদের মধ্যে ‘তুমি’ ‘আমি’ এই পার্থক্যজ্ঞানের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিব। কিন্তু সে ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেও, নেত্ররোগবিশেষে দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায়, অথবা পীতরোগে সর্ব্বত্র পীত বর্ণ দর্শনের ন্যায়, কিম্বা নিরয়ণ সূর্য্যের বার্ষিক ও আহ্নিক গতি দর্শনের ন্যায়, অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে সংসারী আত্মার কখন সে ব্যবহারিক ভ্রান্তি একেবারে দূর হইতে পারে না। তাহা না হইলেও, বিশেষ সাধনাবলে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর হইতে থাকে, ততই আমরা সেই মহা একত্ব জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। আমাদের ব্যষ্টি সমাজ সেই একত্বজ্ঞান সাধন করিবার ভূমি, সেই একত্বজ্ঞানে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবার প্রকৃত ক্ষেত্র। (১)

৪৯। অতএব এই মহা একত্বজ্ঞান

---

(১) “সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
গীতা,—৬।২৯—৩০।

(১) জর্ম্মাণ দার্শনিক প্রসিদ্ধ সপেনহর আমাদের শাস্ত্রের এই কথা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,——

“To him who does the work of love, the veil of *Maya* has become transparent —the illusion of the *principium individuationis* has left him. He recognises himself in everything —in the sufferer .....”

“Good conscience is the satisfaction which we experience after every disinterested deed, which proceeds the knowledge that our true exists in everything that lives. By this the heart is enlarged. Hence peace and virtuous disposition......”

“Whoever is able to say this ‘*tat twam asi* (তত্ত্বমসি)to himself with regard to everything he comes in contact, with clear knowledge and firm inner conviction is certain of all virtue and blessedness, and is the direct road to salvation. Thus love leads to salvation by the entire surrender of the will to live *i. e.*, of all volition...... Besides all love is sympathy.”

Schopenheaur's World as Will and Idea. ---Vol. II. Sec. 69.

বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক পল্‌ ডুসেন (Paul Deussen) তাঁহার *Elements of Metaphysics* গ্রন্থে (৩৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,--

“......the celebrated (তত্ত্বমসি) *tat twam asi* (that art thou) a sentence which expresses in three words at once the deepest mystery of metaphysics, and the highest aim of morality : as an interpretation of this great truth we may consider as in a wider sense, our whole work .....”

আমরা সহজে লাভ করিতে পারি না। আমরা সহজে আমাদের ব্যক্তিত্বকে—মমত্বকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়া, সকল 'তোমাতে' 'আমাকে' অনুভব করিয়া পূর্ণ একত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। আমরা সমাজাত্মা ব্রহ্মকে সহজে ধারণা করিতে পারি না। সেই পরম জ্ঞান বিকাশের জন্য, আমাদের প্রকৃতির ক্রম-আপূরণ, আমাদের সাধনার ক্রমসঞ্চিত শক্তির অপেক্ষা করিতে হয়। সে জ্ঞান লাভ করিতে ব্যক্তিজীবের হয়ত কত যুগ যুগান্তর কাটিয়া যায়। সুতরাং সমাজ সংগঠন বা সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য যদি আমাদের সেই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিত, তবে বুঝি কখন মানবসমাজ সংগঠিত হইত না। আর সমাজ সংগঠিত হইলেও, তাহার কোন উন্নতি হইত না। যেমন ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষা সংগঠিত ও ক্রমবিকাশিত হইতে পারে, যেমন ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা ব্যতীত লোকে বিচার করিতে পারে, যেমন শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ব্বে শিল্পী তাহার প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, যেমন সে সম্বন্ধে মানুষ প্রথমে তাহার প্রকৃতি বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হইয়া থাকে, তেমনই সমাজবিজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে সমাজের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি হইতে পারে, প্রকৃতিই মানুষকে সমাজবদ্ধ করিয়া লন।

বলিয়াছি ত, প্রকৃত জ্ঞানের বীজ আমাদের সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে। প্রকৃতি সহায়ে—আমাদের প্রকৃতির ক্রম আপূরণে—সেই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়। পরের সঙ্গে সহানুভূতিতে, আমাদের স্নেহ দয়া প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে, আমরা সেই একত্বজ্ঞানের আভাস পাই। প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাতে এই সকল বৃত্তির ক্রমবিকাশ দ্বারা ক্রমে ক্রমে আমাদের এই জ্ঞানের দিকে লইয়া যান। আমাদের প্রবৃত্তির মলিনতা যত দূর হইতে থাকে, ততই আমাদের অজ্ঞানাবরণ দূর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। আমাদের প্রকাশাত্মক সত্বগুণের বিকাশে আমাদের জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। এই রূপে সেই জ্ঞানের যত বিকাশ হয়, ততই আমাদের অজ্ঞানমূলক মোহময় ব্যক্তিত্ব জ্ঞান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়া আমাদের জাতিত্ব জ্ঞানের—একত্বজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়। এইরূপে প্রকৃতি সহায়েই আমাদের সামাজিকতার ক্রমবিকাশ হয়, পরের সঙ্গে সহানুভূতি বলে পরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া আমাদের পরার্থকর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ হয়, ক্রমে পরকে আপনার ভাবিতে শিক্ষা হয়, এবং সেই ভাবনাবলে শেষে আমরা আপনাকে ও অন্য সকলকে ব্রহ্মমধ্যে দর্শন করিয়া, সেই জ্ঞান পরিপাকে আমরা প্রকৃত একত্বজ্ঞান ক্রমশঃ লাভ করি। সমাজ যে ব্রহ্মের বিরাটশরীর—তিনিই যে সমাজাত্মা তাহা বুঝিতে পারি।

তিনি অন্যত্র (Phiiosophy of Vedanta প্রবন্ধে) বলিয়াছেন :——

> "The highest and purest morality is the immediate consequance of the Vedanta. The gospels fix quite conrrectly as the highest law of morality—'love your neighbour as yourselves.' But why should I do so? ......The answer is not in the Bible...but it is in the Veda, is in the great formula, *tat twam asi* which gives in three words metaphyisics and morals altogether. You shall love your neighbour as yourselves—because you are your neighbour, and mere illusion makes you believe that your neighbour is something different from yourselves. Or in the words of the Bhagbat Gita, he who knows himslf in everything and everything in himself, will not injure himself by himself ..."

সেই ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিই আমাদের সমাজ-শক্তি। তাঁহা হইতেই সমাজের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। আমরা এ তত্ত্ব ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

উত্তরা

[মুগ্ধা নবোঢ়া]

১। বিজনে।

আমি যে লাজে মরি
মুকুরে রূপ হেরি ;
দেখাব মুখ তারে
কেমনে ?
সে আসি প্রেম ভরে
হেরিতে চাহে মোরে ;
ঢাকিরে মুখ খানি
বসনে।
সে যে গো মনোহর
নবীন বিভাকর !
তারে কি দীপশিখা
দেখাব ?
এত যে প্রসাধন,
উজল আভারণ,
তাহে কি সে রতনে
ভুলাব ?
হেরিলে একবার
উদার বক্ষ তার,
বুকে কি হারপরা
সাজেলো
নয়নে হেরি তার
আলোক প্রতিভার,
আপনি মুদি আঁখি
লাজেগো
পরশে মরি মরি,
হরষে ফেটে পড়ি ;
সরমে তবু কথা
ফোটেনা !
হেরিতে মুখ তার
বাসনা অনিবার,
তবুও আঁখি পাতা
ওঠেনা !

২। প্রিয় সদনে।

লাজের বাসে পার কি সখি
রাখিতে ঢাকি আপনায় ?
বিকচ নব কুসুমটি কি
আবরি রাখে কিসলয় ?
লালসা আসি চমকি যায়
আঁখির পাতা ভাঙিয়া ;
বাসনা যেগো ফুটিয়া ভায়
কপোল তল রাঙিয়া !
অধর ছাপি উছলি চলে
সরল সুধা কামনার ;
বাঁধিয়া বাঁধ রদন দলে
রুধিবে সখি কেমনে আর ?
আকুল যবে প্রাণের ভাষা
বক্ষ মাঝে গরজে গো !
মর্ম্ম কথা প্রেমের আশা
কাঁপিয়া ওঠে উরসে গো !
রুদ্ধ সেই বুকের বাণী
বক্ষপাতি শুনিতে চাই,—
তখনো সখি, লাজ যে টানি
আঁচল খানি রাখে গো হায়।
কুসুমদলে ফুটেছে যেরে
অমল শোভা মাধুরিময় ;
আবরি তারে রাখিবে কিরে
নবীন লাজ-কিসলয় ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মহাভারতীর কপালে আগুন।

"যা থাকে কপালে আর, যা করেন কালী।"

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ঠাকুরের নাকি ধক্ ধক্ করিয়া কপালে আগুন জ্বলিতেছে, যাহার জ্বালায় দেশদেশান্তর ঘুরিয়া পবিত্র স্নিগ্ধ জাহ্নবী নীরে সেই অনল নির্ব্বাপনোদ্দেশে পুনরায় আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাই তিনি নিরীহ-প্রকৃতি বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন-বিশিষ্ট মোক্ষপদ-প্রয়াসী ভারতবাসীকে তাঁহার অযথা তীব্র বাক্য সমূহ দ্বারা উৎখাত করিতে প্রবৃত্ত। আমাদের জন্ত তাঁহার এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? তিনি কি বলিতে চাহেন যে, শাস্ত্রে অনুশাসন আছে যে, উদ্যোগী, উদ্যমশীল ব্যক্তি সিংহের ন্যায় বলবিক্রম লাভ করতঃ লক্ষ্মীকে করতলস্থ করিতে সক্ষম হন, আর অদৃষ্টের দোহাই দিয়া যাহারা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া কালক্ষেপণ করে, তাহারা কাপুরুষ? তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রাদিতে কি একথা নাই?

"যত্র দেশে যস্মিন কালে যদ্দণ্ডে যন্মুহূর্ত্তকে।
লাভো হানি যশো মৃত্যু দেবৈরপি ন বাধ্যতে॥"

যে স্থানে যে সময়ে দণ্ডে যে মুহূর্ত্তে লাভ, হানি, যশ, মৃত্যু যে প্রকার ঘটিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, উহার ব্যতিক্রম ভগবানের দ্বারাও সম্ভবে না।

এরূপ স্পষ্ট শাস্ত্রোক্তির উপর কাহারও জারিজুরি চলে না।

যদি বলেন, গীতাতে ভগবানের উপদেশ আছে:—

"মাক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

হে কৌন্তেয়, কাপুরুষোচিত ক্লৈবভাবের অধীন হইও না, তোমাতে উহা শোভা পায় না। হে শত্রুদমনকারী পার্থ, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার পূর্ব্বক উত্থান কর।

এরূপ বাক্‌চাতুরীতে আমরা ভুলি না, অর্জ্জুনের মত কাঁচা ছেলে আমরা নই; আমাদের পক্ষে এরূপ উপদেশ বা উত্তেজনা-বাক্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। উহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা; শান্তপ্রকৃতি করুণস্বভাব অর্জ্জুনকে কূট-বুদ্ধি কুচক্রী কৃষ্ণ যুদ্ধের ন্যায় অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত করনোদ্দেশে ওরূপ কদর্য্যভাবে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। আগাগোড়া কৃষ্ণের কুপরামর্শেই কুরুপাণ্ডবের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া ভারতবর্ষ উৎসন্ন হয়।

ভগবদ্গীতাকে কেহ কেহ ভাল পুস্তক বলিয়া থাকে, যাহার বিস্‌মোল্লায় এরূপ গলৎ, তাহাকে সৎগ্রন্থ বলিয়া প্রশংসা করি কি প্রকারে? বিচার না করিয়া যশোগান করা নিতান্ত ভ্রমের কাজ। আমরা দুই-একবার গীতা পড়িবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু গোড়াতেই "মারামারি কর," "যুদ্ধ কর," "আত্মীয়-স্বজনকে হনন কর," এবম্বিধ দৌরাত্ম্যের কথাবার্ত্তা শুনিয়া পুস্তক বন্ধ করিতে বাধ্য হই। ইহা ত নিতান্ত মোটা বুদ্ধিতেও উপলব্ধি হয় যে, লড়াই করা নিতান্ত নৃশংসের কাজ। আজকাল অনেকের মুখে গীতার প্রতিষ্ঠা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা বোধ হয়, মহাভারতীর মত কপালের আগুন-জ্বালায় চোটে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের প্রলাপ বাক্যে আমরা পথভ্রষ্ট হইতে পারি না। বেশ আরামের সহিত সদানন্দে দিন কাটিতেছে, গীতা

পড়িয়া তামাদী কথায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া ছুটোপাটী করিতে যাওয়া কেবলমাত্র অশান্তি উৎপাদন। আমাদের বিবেচনায়, কোম্পানির হুকুমে গীতার অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ করা উচিত। গীতোক্ত উপদেশ দ্বারা যখন একবার মহাভারতের তুমুল সংগ্রাম হইয়া দেশটা ছারেখারে গিয়াছে, তখন আবার গীতাপাঠে সব লোক উন্মত্ত হইয়া ইংরাজ বাহাদুরের তোপ কামানের সহিত নিশ্চয় লড়াই আরম্ভ করিবে। কত কাণ্ড-কারখানার পর সুবুদ্ধি মীরজাফর, দূরদর্শী কৃষ্ণচন্দ্র, ক্ষণজন্মা উমীচাঁদ প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণ দ্বারা কোম্পানির হাতে রাজ্য দিয়া প্রজাকুলকে বিমল শান্তি প্রদান করতঃ তাহাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার হক্‌দার হইয়াছেন; হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবাসী একমুষ্টি খাইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতে সক্ষম হইয়াছে; (উক্ত মহাত্মাদের নামে স্বর্গ হইতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।) গীতা পড়িতে দিয়া আবার একটা মহাভারতের সূচনা কি বিবেচনার কাজ? কোম্পানি-বাহাদুরের অতিকষ্টে অধিকৃত হিন্দুস্থান-মুকুলে যদি নূতন ধরণের ফরাসী-বিপ্লব দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবেই গীতা পাঠ চলুক, নচেৎ বৃটীশ-সিংহের কর্ত্তব্য, রাতারাতি হুঙ্কার ছাড়িয়া, আইন পাশ করতঃ হুকুম জারী করেন যে, ভারতের ত্রিসীমা মধ্যে যেন কেহ গীতা খুলিতে না পারে। আর যদি আওরঙ্গজেব বাদশাহের মত অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ গীতার বংশ নির্ব্বংশ করিবার আদেশ প্রচারিত হয়, অতি উত্তম; কিন্তু তাহার সঙ্গে এরূপ আজ্ঞা চাই, যাহাতে বিদেশ হইতে কেহ ইংরাজী, ফরাসী, ওলন্দাজী প্রভৃতি গীতার ইউরোপীয় সংস্করণ আম্‌দানী করিতে না পারে। তৎসহ বুড়ো বক্‌বকী মহাভারতীর ফাঁসীর হুকুম হইলে আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হয়।

ভারতসন্তানের একমাত্র অবলম্বনীয় সর্ব্বশাস্ত্র-সার কথা, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" আমরা যুক্তিতর্ক মানি না, ধারাবাহিক রূপে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা বেদবাক্য স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার প্রশ্ন করিতে প্রস্তুত নহি। মহাভারতী সকল বিষয় জানেন, তাঁহাকে নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না; তত্রাচ বলি,—আমাদের শেষ নরপতি ভারতের সুসন্তান, অনন্ত মহিমার অর্ণব লাঞ্ছণের কেবলমাত্র কপালের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি-খ্যাতি-সম্পন্ন দূরদর্শী ভবিষ্যদ্বক্তা সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে আঠার জন যবন অশ্বারোহীর করে রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ সন্তুষ্ট চিত্তে হাত ধুইয়া নিশ্চিন্তমনে আরামের সহিত পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপ নগরে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই পবিত্র কাহিনা অদ্যাপি পৃথিবীর চারিখণ্ডের লোক নানাবিধ ভাষায় গান করিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিতেছে। ধন্য সেই পুণ্যশ্লোক রাজা, ধন্য তাঁহার সভাসদ্ পাত্রমিত্রবর্গ! ধন্য সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রতিম সভাপণ্ডিতগণ! তাঁহাদের উদার হৃদয়ের কথা ভাবিলে আমরা পুলকিত হই, এবং মুক্তিপ্রদ অদৃষ্টবাদের শত সহস্র সাবাস্ না দিয়া থাকিতে পারি না। বাঙ্গালা মুলুকের অসংখ্য প্রজাকে দ্বিধাশূন্য অন্তঃকরণে নবাগত বিদেশীয় মুসলমানদিগের শ্রীকরকমলে

সম্যক প্রকারে অর্পণ করতঃ, তাঁহারা যে মহোচ্চশ্রেণীর অনাসক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,তাহা কি সামান্য গৌরবের কথা। ওরূপ উদাহরণ জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি দেখা যায় ?

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যথার্থই প্রকৃত গুণগ্রাহী। এ দেশে ইংরাজাধিকার হওয়া অবধি তাঁহারা নানা প্রকারে আমাদের কপাল-ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছেন। পাঠকগণের গোচরার্থ কতক কতক যশোগীতি তাঁহাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি ; তদ্দ্বারা সহজে বুঝা যাইবে যে, মহাভারতীর প্রলাপ-বাক্য-সমূহ কতদূর অসার।

কারাচিওলী নামক জনৈক ধীমান ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইবের এক জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে প্রকাশিত ;—

"Another great obstacle to their success in war is their superstition and particularly their strict observance of lucky and inauspicious days, which often prevents them from taking the most obvious advantages of an enemy. They are also particularly fond of all kinds of beasts of prey, they keep great numbers of them, and often visit them before they give battle; if they find them, heavy and dull, they think it a bad omen, and a sufficient reason to postpone the action, on the other hand the accidental fury of the animal is regarded as a presage of success."—Caraccioli.

উক্ত বিবরণ দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, পঞ্চ শতাধিক বর্ষকালে আমরা কতদূর উন্নতি লাভে সক্ষম হইয়াছিলাম। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত শাস্ত্রোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম্ম অবগত হইয়া বিধিলিপি শিরে ধারণ করতঃ রাজ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সিংহাসন পরিত্যাগান্তে পলায়ন করিতে বাধ্য হন, আর আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অদৃষ্ট-লেখা জানিবার নিমিত্ত ইতর জন্তুর সাহায্য লইয়া তাহাদের ইঙ্গিতে কার্য্যে প্রবৃত্ত অপ্রবৃত্ত হইতে শিক্ষা লাভ করি। অতঃপর আবার দেড়শত বৎসরের মধ্যে আমরা যে উন্নতি-সোপানে কতদূর উঠিতে সক্ষম হইয়াছি, অজগর-ভাবের ভাবুক হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে শিখিয়াছি, মহাভারতীর ব্যঙ্গোক্তি তাহার অকাট্য প্রমাণ।

অপর একস্থলে কারাচিওলী ভ্রম ক্রমে লিখিয়াছেন ;—

"Our victories will teach the native barbarians to avoid themselves of their numbers."

কার্য্যতঃ তাহা যে ঘটে নাই এবং কস্মিন কালেও ঘটিতে পারে না,তাহা বলা বাহুল্য। আমরা যে বারম্বার হারিয়া সংসারকে হারাইয়া উপদেশ দিতে বসিয়াছি, তাহা তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই।

আমাদের তাৎকালিক মহিমার বর্ণনা উক্ত লেখক যে ভাবে করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কিরূপ প্রশংসা করিব, জানি না।—

"Their perpetual use of rice, which they eat in inconceivable quantities, gives them but little nourishment, and their marrying early—the males befere fourteen, and their women at ten or eleven years of age—keeps them low and feeble in their persons. A man is in the decline of life at thirty; and a woman in the decline of beauty at eighteen; at twentyfive women have all the marks of old age. We are not therefore to wonder at their being soon strangers to all personal exertion and vigour of mind; and it is with them a frequent saying, that it is better to sit than to walk, to lie down than to sit, to sleep than wake, and death is the best of all."

তাৎপর্য্য এই যে, কেবল এক এক রাশি ভাত খায় বলিয়া তাহাদের শারীরিক পুষ্টির অভাব হইয়া থাকে। তদুপরি বাল্য বিবাহ তাহাদের বলহীনতার বিশেষ কারণ। পুরুষগণ ত্রিশ বৎসরেই জরাগ্রস্ত, আঠার বৎসর

বয়সেই স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্য লুপ্তপ্রায়, পঁচিশে তাহারা বৃদ্ধার মধ্যে পরিগণিত। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের শারীরিক উদ্যম এবং মানসিক বলের অভাব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, পদচালন অপেক্ষা উপবেশন ভাল, বসিয়া থাকা অপেক্ষা শয়ন আরও উত্তম, জাগ্রতাবস্থাপেক্ষা নিদ্রা আরও সুখের, এবং মৃত্যু সর্ব্বোপরি উৎকৃষ্ট অবস্থা।

বাস্তবিক ইনি যে একজন বিশেষ রকমের গুণগ্রাহী ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইনি মহাভারতীর মত "ব্রণমিচ্ছন্তি মক্ষিকা" নন, ইনি "মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদা" শ্রেণীর লোক। আমাদের আসল: আসল গুণ ইনি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহঁার লেখার পর যে সুদীর্ঘকাল গিয়াছে, তাহাতে আমরা কিছু উন্নতি করিয়াছি;—বিবাহের বয়স কমাইয়াছি এবং তাহার ফলে সকলেই জানেন যে, রমণীগণকে এখন আমরা "কুড়িতেই বুড়ী" বলিয়া থাকি; এবং "মৃত্যু হইলেই বাঁচি" এ কথা ত আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে সর্ব্বদা শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। ক্রমোন্নতি দ্বারা বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কিছু পূর্ব্বে আমরা যে উচ্চাবস্থায় উপনীত, তাহা সুলেখক মেকলের দ্বারা সুন্দররূপে বর্ণিত ;—

"The Castilians have a proverb that in Valencia the earth is water and the men women; and description is at least equally applicable to the vast plain of the Lower Ganges. Whatever the Bengelee does, he does languidly. His favourite pursuit are sedentary. He shrinks bodily exertion; and though voluble in dispute, and singularly pertinacious in the war of chicane, he seldom engages in a personal conflict, and scarcely ever enlists as a soldier. There never perhaps, existed a people so thoroughly fitted by nature and by habit for a foreign yoke."—"The physicial organisation of the Bengalee is feeble even to effeminacy. He lives in a constant vapour bath. His pursuits are sedentary, his limbs delicate, his movements languid. During many ages he has been trampled upon by men of bolder and more hardy breeds. Courage, independence, veracity, are qualities to which his constitution and his situation are equally unfavourable. His mind bears a singular analogy to his body. It is weak even to helplessness for purposes of manly resistance.--"Macauly.

উক্ত গুণানুকীর্ত্তনের মর্ম্ম এই যে, বঙ্গদেশের মাটী জলের মত নরম এবং তথাকার পুরুষগণ নারীর ন্যায় কোমল। বাঙ্গালীরা যে কাজ করে, তাহাতেই তাহাদের অবসন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ; তাহারা অঙ্গসঞ্চালনে অপটু, সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেই রাজী, বাক্‌বিতণ্ডা, ছলচাতুরীতে খুব মজবুত, কিন্তু আত্ম-রক্ষার্থও হাতাহাতি করিতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। প্রকৃতি ও অভ্যাস দ্বারা ইহারা যেমন আপনাদিগকে পরাধীন জাতির সকল অবস্থার জন্য ঠিক উপযুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে, পৃথিবীতে আর কেহ কখন সেরূপ পারে নাই। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় স্ত্রীলোকের মত শক্তিহীন, সুকোমল হস্তপদবিশিষ্ট মৃদুমন্দ-গতি বাঙ্গালী যেন চব্বিশ ঘণ্টা হাওয়ায় উড়িতেছে। সুদীর্ঘকাল বীর্য্যশালী জাতিগণ কর্ত্তৃক পদদলিত হইয়া সাহস, স্বতন্ত্রতা, স্বাবলম্বন, বাঙ্‌নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে। যেমন দেহ তেমনি মন, মনের দুর্ব্বলতাবশত মানুষের মত অত্যাচার-উপদ্রবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইহারা সম্পূর্ণ অক্ষম।

বলিহারি! বলিহারি! বলিহারি!

মেকলে মহোদয় আমাদের অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপাদির বিষয়ে যে প্রকারে লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সবাই জানে, এস্থলে সে সব কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়ো-

জন। হইতে পারে, তিনি কোন কোন সদ্‌গুণ প্রচারে অত্যুক্তি করিয়া থাকিবেন, সেটা কেবল মাত্র তাঁহার গুণগ্রাহিতার আধিক্যবশতই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, বাদ্‌সাদ্‌ দিয়া সত্য সঙ্কলন করিলেও আমাদের খ্যাতির পক্ষে যথেষ্ট।

এ ত গেল সব পুরাতন বর্ণনা। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে আমরা কোথায় পঁহুছিয়াছি, সে সম্বন্ধে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ষ্ট্রাচী সাহেব কি বলিতেছেন, পাঠক শুনুন ;—

> "I have heard of no men in any country enamoured of their own verbosity in so extraordinary a degree"—"Courage is no more an invariable virtue among the hardiest races of Europe than cowardice an invariable infirmity among the population of Bengal."—"It has often been said, and it is probably true, that Bengal is the only country in the world where you can find a great population among whom personal cowardice is looked upon as in no way disgraceful. This is no creation of their enemies; the Bengalis have themselves no shame or scruple in declaring it to be a fact."
>
> Sir John Strachey G. C. S. I.

"ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে এই সাহেব বাহাদুর উক্তরূপ বাক্যাবলী দ্বারা আমাদের যশোঘোষণা করিয়াছেন। মন্তব্য এই :—কুত্রাপি এমন কোন জাতীয় লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, যাহারা বাঙ্গালীদের মত আপন বাক্‌পটুতা-বাহাদুরীতে এ প্রকার মুগ্ধ। সাহস যেমন ইউরোপের বীরজাতিগণের প্রকৃতিগত গুণ, ভীরুতা তেমনি বাঙ্গালী স্বভাবের নিত্য সহচর। অনেকেই এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না যে, পৃথিবীর কোন অংশে এমন লোক দেখা যায় না, যাহারা কাপুরুষের ভীরুতাকে নিন্দনীয় বিবেচনা না করে, পরন্তু বাঙ্গালা দেশে ঐ কদর্য্য অপগুণ ঘৃণার্হ নহে। শুধু বাঙ্গালী-বিদ্বেষীগণ দ্বারা একথা প্রচারিত নয়, বঙ্গবাসীরা নিজে উহা স্বীকার করিতে সংকোচ বা লজ্জা বোধ করে না।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, মহাভারতী যে সকল দেশ বিদেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ব্যক্তিগত সামাজিক রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য, উদ্যম উৎসাহ সাহসিকতা প্রকাশ করতঃ হাত পা ছোড়া পুরুষের কাজ, তাহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিনা। আমাদিগকে নিতান্ত প্রিয় জানিয়া রাজ কার্য্যাদির গুরুভার হইতে জন্মের মত অব্যাহত প্রদানান্তর বিধাতা যখন আমাদিগকে নির্ব্বাণ মুক্তির পথে খাড়া করিয়াছেন, তখন চৈতন্য-বিহীন জড়ভাবাপন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করিবার এরূপ অবকাশ আমরা যদি পরিত্যাগ করি, আমরা মহাপাপী বলিয়া ঈশ্বরের নিকট দণ্ডার্হ হইব।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা অল্পপ্রাণতাবশতঃ কপালের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে একেবারেই অশক্ত, তাঁহারা রাজার আদালতের আশ্রয় লইয়া থাকেন, উহাই যথেষ্ট, তদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে নিজেদের প্রতিবিধান-প্রয়াস নিতান্ত দোষাবহ। এমন চিরশান্তির আলয় ধর্ম্মাধিকরণ থাকিতে বৃথা ভাবিয়া মরা বর্ব্বরের কাজ। মহাভারতী কি জানেন না, আমাদের মধ্যে কত মহাপুরুষ আইন-আদালতে অকাতরে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া ঝাড়া হাত-পা হইতেছেন। ইহা কি বৈরাগ্যের কথা! কলিযুগে আদালত-যজ্ঞের ফল সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

শঙ্করাচার্য্য

(কালনির্ণয়)

ভারতীয় সাহিত্যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের যে অক্ষয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার নামে যে বহুবিধ অলৌকিক গল্প রচিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তিনি প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত ভারত-গগনে উদিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার জ্ঞানরশ্মির প্রভাবে এ দেশে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহার যথার্থ জীবন-চরিত, ভাষ্যাদি গ্রন্থে এবং চিন্তাশীলের মস্তিষ্কে, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু পূজ্য এবং প্রিয়জনের সাধারণ বৃত্তান্ত লইয়া আলোচনা করিতে অনুরাগ বলিয়া, তিনি কখন জন্মিয়াছিলেন, এবং কি ভাবে জীবন-যাপন করিতেন, এ সকল কথা জানিতে আগ্রহ হয়। এই জন্যই প্রাচীন সময়ে শঙ্করচরিত রচিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এগুলি যথার্থ জীবনচরিত নহে। এ বিষয়ের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ, বিদ্যারণ্যের শঙ্করবিজয়। বিদ্যারণ্য, নবকালিদাস নাম লইয়া গ্রন্থখানিকে মহাকাব্য রূপে রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন।

যে মনস্বীর চিন্তাস্রোত, এ দেশে নব প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিল; ইতিহাসে তাঁহার সময় নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কোন্ সময়ে কি প্রকার চিন্তার ফলে কোন্ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে, এই সময়-নির্ণয়ের বিশেষ আবশ্যক। প্রাচীন কালে এ দেশে ইতিহাস লিখিত হইত না। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণী, দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত; এবং জৈনদের "চরিত" গ্রন্থগুলিও বড় পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের নহে। এই জন্য এই সকল কথা লিখিতে হইলে নানাদিকের নানা কথা আলোচনা করিতে হয়, এবং নিঃসংশয় ভাবে কোন কথাই বলা চলে না।

এ দেশের একটা প্রাচীন প্রবাদে শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুদিত বলিয়া কথিত আছে। যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী প্রণীত আর্য্যবিদ্যা-সুধাকর নামক গ্রন্থে এই প্রাচীন প্রবাদ সংগৃহীত আছে। প্রথমতঃ ঐ সংগ্রহ হইতে সেই প্রাচীন প্রবাদটীর কথা তুলিতেছি। 'শঙ্করমন্দারসৌরভ' গ্রন্থ-প্রণেতা নীলকণ্ঠ ভট্ট লিখিয়াছেন:—

> প্রাসূত তিষ্যশরদামতিযাতবত্যাম্।
> একাদশাধিকশতোনচতুঃ-সহস্র্যাম্।

চারি হাজার বৎসর হইতে একশত একাদশ বৎসর বাদ দিলে কলির ৩৮৮৯ বৎসর হয়। সম্প্রদায়-বিদেরাও বলেন :—

> নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে মাসি মাধবে।
> শুক্লে তিথৌ দশম্যাংতু শঙ্করার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ।

এ গণনাও ৩৮৮৯ বলিয়া, ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই। কলির এই অব্দ হইতে সংবৎ ৮৪৫ পাওয়া যায় বলিয়া আর্য্যবিদ্যা-সুধাকরে লিখিত আছে :—"শঙ্করাচার্য্য-প্রাদুর্ভাবস্তু বিক্রমার্কসমাদতীতে পঞ্চচত্বারিংশদধিকাষ্টশতীমিতে সম্বৎসরে কেরল দেশে কালটি গ্রামে" ইত্যাদি।

এই গণনায় শঙ্করাচার্য্য ৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া পড়েন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে ইহার

পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি বলিয়া, এটী গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐ গণনাটাও যখন অনেক পরবর্ত্তী সময়ের, তখন সহসা উহাতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

সুরেশ্বর নামে শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য ছিলেন; ইনি শঙ্করের সমসাময়িক ব্যক্তি। এই সুরেশ্বরের একজন শিষ্য চালুক্য রাজাদের সময়ে সংক্ষেপশারীরক নামে একখানি বেদান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, আপনাকে সর্ব্বজ্ঞাত্মা নাম দিয়াছেন। আত্ম-পরিচয় স্থলে লিখিত আছে :—

> শ্রীদেবেশ্বর পাদপঙ্কজরজঃ সম্পর্ক-পূতাশয়ঃ-
> সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপ-শারীরকম্।
> চক্রে সজ্জনবুদ্ধি বর্দ্ধনমিদং রাজন্যবংশ্যে নৃপে,
> শ্রীসত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি।

এখানে কথিত হইল যে, যখন ঐ গ্রন্থ রচিত হয়, তখন অক্ষত-শাস্তা মনুকুলের "আদিত্য" ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। চালুক্য রাজারা যে আপনাদিগকে মনুবংশোদ্ভব বলিতেন, তাহা তাঁহাদের সকল লিপিতেই পাওয়া যায়। এখন চালুক্য রাজাদের বংশাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, দ্বিতীয় পুলকেশীর নাম বিক্রমাদিত্য, পৌত্রের নাম বিনয়াদিত্য, এবং প্রপৌত্রের নাম বিজয়াদিত্য। কেহ কেহ বলেন যে "আদিত্য" নামটা অন্ততঃ এক পুরুষের পুরাতন না হইলে, কেবল "আদিত্য" বলিয়া রাজার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। এই হিসাবে তাঁহারা সংক্ষেপ শরীরকখানি অন্ততঃ পক্ষে বিনয়াদিত্যের সময়ের রচনা বলেন। আমার একথায় আপত্তি আছে। আমার বোধ হয় যে, প্রথম "আদিত্যের" সময়ে রচিত বলিয়াই কেবল "আদিত্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতর্কে, সময়ের বড় বিশেষ প্রভেদ হয় না বলিয়া, বিনয়াদিত্যের সময়টাও যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এই গ্রন্থের সময় ৬৮০ হইতে ৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী হয়। শঙ্করের সমসাময়িক ব্যক্তির শিষ্য যখন ঐ সময়ে প্রাদুর্ভূত, তখন শঙ্করাচার্য্য নিশ্চয়ই উহার পূর্ব্বে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। এখানেই ১০০ বৎসরের প্রভেদ পাওয়া গেল। কারণ পূর্ব্বগণনায় শঙ্করের জন্ম ৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

সংক্ষেপ শারীরক যখন শারীরক ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ, এবং ঐগ্রন্থ যখন চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মাদির পূর্ব্বে এবং পুলকেশী প্রভৃতির পরে রচিত বলিয়া ধরিতে পারা যায়, তখন গ্রন্থকর্ত্তা শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্যের শিষ্য বলিয়া যে পরিচয় আছে,তাহা অগ্রাহ্য করিলেও, শঙ্করাচার্য্যের সময় ৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী করিতেই হয়।

এবারে শঙ্করাচার্য্যের নিজের গ্রন্থ হইতে সময় সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি।

(১) ব্রহ্মসূত্রের "উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ"র ভাষ্য লিখিতে গিয়া যেখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী বচনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, সেখানে কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। যে ভাবে ঐ উল্লেখটী হইয়াছে,তাহা বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। উপনিষদের যে বচনটীর ব্যাখ্যা হইয়াছে,সেটী এই—"তেহর্চিষমভি সম্ভবন্ত্যর্চিষোহহঃ। অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্। আপূর্য্যমানপক্ষাস্যান্‌ষডুদঙ্‌ এতি মাসাংস্তান্।" ইহার সহজ অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে যাইবার সময়, প্রথমতঃ "অর্চি"তে যাইতে হয়, তাহার পর অর্চি হইতে

"অহ"তে, অহ হইতে "আপূর্য্যমাণপক্ষে" ইত্যাদি। অর্চি অর্থ বহ্নিশিখা, অহ অর্থ দিবস, এবং আপূর্য্যমাণপক্ষ অর্থ শুক্লপক্ষ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ঐ সকল পদার্থের অর্থ, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেব বুঝায়। ঐ সকল দেবগণ মৃত ব্যক্তিকে একবিভাগ হইতে অন্য বিভাগে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁহুছাইয়া দেন। ঐ কথাটার লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "লোকপ্রসিদ্ধেষপি অতিযাত্রিকেষু এবং জাতীয়ক উপদেশো দৃশ্যতে। গচ্ছ ত্বম ইতো বলবর্মাণং, ততো জয়সিংহং ততঃ কৃষ্ণগুপ্তমিতি''। ইহার ভাবার্থ এই ;—এ সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক রাজ্য হইতে নির্ব্বিঘ্নে অন্য রাজ্যে যাইতে হইলে,এক এক রাজ্য হইতে "পাশ্" লইয়া অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথম যাও বলবর্ম্মার রাজ্যে, সেখান হইতে জয়সিংহের রাজ্যে, এবং তাহার পর কৃষ্ণগুপ্তের রাজ্যে।

কানিংহাম সাহেবের অর্কিয়লজিকাল্ সর্ভের ১৪শ ভাগে, পঞ্জাব প্রদেশ হইতে সংগৃহীত মেরুবর্ম্মার লিপিতে একজন বলবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। মেরুবর্ম্মার পিতার নাম দিবাকরবর্ম্মা ; এবং এই দিবাকর বর্ম্মা বলবর্ম্মার পৌত্র বলিয়া লিখিত আছে। এই চারি পুরুষে যদি ১০০ বৎসর ধরা যায় ; তাহা হইলে মেরুবর্ম্মার সময়ের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে, পঞ্জাবের কোন প্রদেশে বলবর্ম্মার অভ্যুদয়কাল ধরা চলে। লিপি-প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে উক্ত খোদিত লিপি ৮ম এবং নবম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এরূপ স্থলে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া লইলে, বলবর্ম্মার সময় ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। এই বলবর্ম্মা শঙ্করের উদাহৃত বলবর্ম্মা কি না, সে বিচার পরে করিতেছি।

(২) শঙ্করাচার্য্য পঞ্জাব প্রদেশে অনেক দিন ছিলেন, তাহা তাঁহার বিবরণ বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে। এখন যদি তর্কচ্ছলে ধরা যায় যে, পঞ্জাব প্রদেশ হইতেই কাহারো পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে কোন্ কোন্ দেশ দিয়া যাইবার কথা, তাহা পূর্ব্ব সময়ের অবস্থা দৃষ্টে নির্দ্দেশ করিতেছি। পঞ্জাবের সহিত গুজরাট এবং মালবদেশ সংলগ্ন। যে সময়ে বলবর্ম্মার রাজত্বকাল অনুমিত হইয়াছে, ঐ সময়ে চালুক্যরাজাগণ দক্ষিণ এবং পশ্চিম প্রদেশে প্রবল হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল ৬৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে ; কারণ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দেও হুয়েনসাং তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। পুলকেশীর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমাদিত্য দক্ষিণাপথে রাজা হইয়াছিলেন ; এবং এই বিক্রমাদিত্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহকে গুজরাট এবং মালবদেশের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন। এখন দেখিতে পাইতেছি যে, যে সময়ে বলবর্ম্মার রাজত্ব, সেই সময়েই গুজরাট ও মালবে জয়সিংহের রাজত্ব।

(৩) মালবদেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব প্রদেশের দিকে গেলে, সে সময়ে কে রাজা ছিলেন, তাহাও দেখিতে হইতেছে। দ্বিতীয় পুলকেশী, থানেশ্বর এবং কানোজের সুপ্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক রাজা। হর্ষবর্দ্ধনের সময় সুনিরূপিত হইলেও, তাঁহার মৃত্যুর পর কে রাজা হইয়াছিলেন, ঠিক ধরিতে পারা যায় না। তাঁহার ভগিনীপতিকুল মৌখরী-বর্ম্মাদিগের মধ্য হইতে যশোবর্ম্মা আসিয়া যে ঠিক হর্ষবর্দ্ধনের পরেই রাজা হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে

বুঝিতে পারি নাই। এই সময়ে যে মগধ গুপ্ত বংশের আদিত্য সেন, পূর্ব্বাঞ্চলে, খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীতও কতকগুলি গুপ্তশাখা গাঙ্গ প্রদেশে এবং অন্যত্র রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন এ সময়ে এত রাজা ও রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল যে, গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, বিভিন্ন প্রদেশে অনেক রাজা থাকিলেও, মগধের রাজারা সার্ব্বভৌম রাজা বলিয়া সকলেই অন্ততঃ নামেও স্বীকার করিতেন। সে দিন আর ছিল না। হর্ষবর্দ্ধন, এই স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই কানোজের ক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যেও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ভারতে সার্ব্বভৌম রাজা ছিল না। (সোসাইটীর সংস্করণ ৩১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অবস্থাটা ঠিক মিলিতেছে, কিন্তু এ সময়ে একটী কৃষ্ণগুপ্ত পাইতেছি না। কৃষ্ণগুপ্ত নামের অনেক রাজা পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাঁহাদের সময় অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী; এবং তাহার সহিত বলবর্ম্মা এবং জয়সিংহ মিলান যায় না। কিন্তু গাঙ্গপ্রদেশে তখন একজন কৃষ্ণগুপ্ত থাকা অসম্ভব নহে।

(৪) পুনশ্চ, ছান্দোগ্য উপনিষদের টীকায় একটী দৃষ্টান্ত আছে যে, "যথা পূর্ণবর্ম্মণঃ সেবা ভক্তপরিধানমাত্রফলা, রাজবর্ম্মণস্তু সেবা রাজ্যতুল্যফলেতি তদ্বৎ।" দেখিতে পাই যে, যে সময়ে কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্কনরেন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন,তখন রাজ্যবর্দ্ধন এবং তৎপরে হর্ষবর্দ্ধন কানোজের রাজা। শশাঙ্কনরেন্দ্র, বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রাজা পূর্ণবর্ম্মা তাহা সুরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। একথা হুয়েনসাংএর বর্ণনায় উল্লিখিত আছে। মৌখরীবর্ম্মাগণ, তখন গয়াপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া, পূর্ণবর্ম্মা চীনপর্য্যটকের সমসাময়িক বলিয়া মনে করিতে পারি। শঙ্করাচার্য্য আবার, "অসদেবেদং অগ্র আসীৎ", কথার টীকায় পূর্ণবর্ম্মা সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ণবর্ম্মা পূর্ব্ব সময়ের রাজা বলিয়া জানা যায়। এ দৃষ্টান্ত হইতেও ঠিক ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময় সূচিত হইতেছে।

(৫) উল্লিখিত প্রমাণগুলি সমবেত ভাবে গ্রহণ করিলে, এবং উহার সহিত শঙ্করশিষ্যের শিষ্যরচিত গ্রন্থের সময় মিলাইলে শঙ্করাচার্য্যকে জয়সিংহ এবং বলবর্ম্মার সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মসূত্রের "তথা প্রাণাঃ" প্রভৃতির ব্যাখ্যা স্থলে "যথা সিংহস্তথা বলবর্ম্মেতি" দেখিয়া, বলবর্ম্মা যে ভাষ্য লিখিবার সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহাই অনুমিত হয়। পূর্ণবর্ম্মার পূর্ব্বে এবং জয়সিংহের সময়ে যখন বলবর্ম্মা পাইতেছি, তখন আমাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বলবর্ম্মাই যে শঙ্কর-কর্ত্তৃক উদাহৃত, তাহা মনে করা সঙ্গত।

শঙ্করাচার্য্য যখন সংক্ষিপ্ত শারীরক গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, তখন তিনি জয়সিংহের পরবর্ত্তী বলিয়া ধরিলেও, তাঁহাকে ৬৫০ হইতে ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের পরবর্ত্তী করা যায় না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

উপনিষদের উপদেশ। (৯)

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

শ্বেতকেতু পিতার মুখ হইতে এই সকল অতি মধুর ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া, অতৃপ্তহৃদয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ— "পিতঃ! নামরূপ-বিবর্জ্জিত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অদ্বিতীয় সৎপদার্থ হইতে কিরূপে এই নামরূপবিশিষ্ট স্থূল জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা আমাকে পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন্"। পিতা, পুত্রের আগ্রহাতিশর্য্য দর্শনে সন্তুষ্টচিত্তে আদেশ করিলেন—"যদি এ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে তোমার সম্মুখে এই যে সুবৃহৎ বটবৃক্ষ, শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে, উহা হইতে একটী ছোট ফল ছিঁড়িয়া আন।" শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। পিতা তাহাকে ঐ ফলটী দ্বিখণ্ডিত করিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন —"এখন তুমি ঐ কর্ত্তিত ফলের মধ্যে কি দেখিতে পাইতেছ?" পুত্র মনোযোগের সহিত দেখিয়া শুনিয়া উত্তর দিল—"পিতঃ, আমি, ইহার মধ্যে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম অণুবৎ বীজ রহিয়াছে, দেখিতেছি।" পিতা পুনরায় পুত্রকে, ঐ জীবগুলির মধ্য হইতে একটী বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি দেখিতে পাইতেছ?" পুত্র উত্তর দিল—"কৈ, এখন ত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।" পিতা বলিতে লাগিলেনঃ—"হে সৌম্য! এই বটবীজ ভাঙ্গিয়া ফেলাতে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া, যদিও তুমি আর উহাকে দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অদৃশ্য, অণুস্বরূপ, এই বীজ হইতেই, উহার কার্য্য (Effects) স্বরূপ এই প্রকাণ্ড শাখা, স্কন্ধ, ফল-পত্র-বিশিষ্ট মহাবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে জানিবে, ইহাতে সন্দেহ করিও না। এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সৎপদার্থ হইতে, এই স্থূল, নামরূপধারী বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই অতি সূক্ষ্ম, সৎপদার্থই জগতের মূল; এবিশ্ব সেই পরম সূক্ষ্ম সদাত্মক; উহা নিত্যরূপে বর্ত্তমান। হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই পরম চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ।"

"হে সৌম্য! নিকটে বর্ত্তমান থাকিলেও, পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত নাও হইতে পারে; কিন্তু প্রকারান্তর অবলম্বন করিলে তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। অদ্য সন্ধ্যাকালে একখণ্ড লবণ, এই জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখিও। কল্য প্রাতঃকালে উহা লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইও।" শ্বেতকেতু তাহাই করিল। পিতা বলিতে লাগিলেনঃ—"তুমি গতকল্য সন্ধ্যাকালে যে পাত্রে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে, সেই জলপূর্ণ পাত্রটী লইয়া আইস"। পুত্র, সেই জলপূর্ণ পাত্র পিতার নিকটে আনিয়া রাখিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে হাত দিয়া দেখিল যে, সে লবণ-খণ্ড অন্তর্হিত হইয়াছে। পিতা হাসিয়া বলিলেন—"পুত্র! লবণ উহাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; জলে মিশিয়া যাওয়াতে, তুমি উহার অস্তিত্ব চক্ষু ও স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু বুঝিতে না পারিলেও, উহা ঐ জলের মধ্যেই লীন-

ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি ঐ পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পান করিলেই বুঝিতে পারিবে। ঐ জলের যে কোন স্থান হইতে পান কর, বুঝিতে পারিবে যে, সেই জলে লবণের আস্বাদন বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব হে পুত্র! যেরূপ, জলে বিলীন এই লবণের অস্তিত্ব তুমি দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও, জিহ্বা দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলে; সেইরূপ তেজ, অপ্, অন্নাদির (পার্থিব পরমাণুর) কারণ স্বরূপ সেই সৎপদার্থ, এই শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হন না। পূর্ব্বোক্ত লবণ যেমন দর্শন ও স্পর্শের অগ্রাহ্য হইলেও, জিহ্বা দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছিল, তেমনি এই নিত্য বর্ত্তমান, জগতের মূল কারণ, সৎপদার্থকেও উপায়ান্তর দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সেই অতি সূক্ষ্ম সৎপদার্থই জগতের মূল; এ বিশ্ব সেই পরমসূক্ষ্ম-সদাত্মক; উহা নিত্য সত্তারূপে বর্ত্তমান। হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই পরমচৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ"।

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো! কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, তাহা দয়া করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন্।" পিতা বলিতে লাগিলেনঃ—"হে সৌম্য! যেমন কোন দুষ্ট তস্কর,—কোন পুরুষকে গান্ধার দেশ হইতে চক্ষু দুইটী বাঁধিয়া দিয়া ও হস্তাদি বন্ধন করিয়া, অতি দূরে কোন জনশূন্য, হিংস্রজন্তুসঙ্কুল, ভয়ঙ্কর অরণ্যে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে,—সেই পুরুষ দিগ্ভ্রান্ত হইয়া, ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া, ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে এবং যদি এই সময়ে হঠাৎ কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তি তাহার ক্রন্দন শুনিয়া, বন্ধনাদি মোচন করিয়া দেয় এবং গান্ধারের পথটী দেখাইয়া দেয়, তখন সেই পুরুষ সেই পথ অবলম্বন করিয়া, স্বদেশে উপস্থিত হইলে, যেমন তখন তাহার দুঃখ দূরে যায় এবং সে অত্যন্ত সুখী হয়;—সেইরূপ, মোহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত নয়ন এই জীবকে, স্বকৃতপাপ পুণ্য কর্ম্মরূপ তস্কর,—মাংসশোণিত ও কৃমিকীট মূত্র পুরীষময় এবং শীতবাতাদি দুঃখ-সঙ্কুল এই দেহারণ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। সেই মোহান্ধ জীব, ভার্য্যাপুত্র ও রূপ রসাদি বহুবিধ বিষয়ে তৃষ্ণাপাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া, 'হায়! কিরূপে জীবন ধারণ করিব,' 'হায়! আজ আমার ধন নাশ হইল, পুত্র প্রাণত্যাগ করিল'—ইত্যাদি বহু প্রকারে আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়ায়! পুণ্যবলে, কখনও কোন কারুণিক ব্রহ্মবিদ্ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলে, সেই মহাপুরুষ যদি দয়া করিয়া, তাহাকে বিষয় সকলের দোষ দেখাইয়া দেন, তবে সে মোহজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, সেই নিত্য, সৎপদার্থকে পাইলে, আর তখন তাহার কোন দুঃখ ক্লেশ থাকে না। যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ে দেহনাশ হইলে, সে তখন সেই পরম পদার্থকে প্রাপ্ত হয়; তখন তাহার মুক্তি হয়।

কোন পুরুষের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তাহার বান্ধবেরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, "আমি তোমার পিতা বা মাতা, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ?" সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ আত্মচৈতন্যে যে পর্য্যন্ত না ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সকলকেই চিনিতে পারে। কিন্তু ঐ গুলি

বিলীন হইয়া গেলে, আর সে কাহাকেও চিনিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই গতি সমান। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, উভয়েরই যখন ইন্দ্রিয়াদি বিলুপ্ত হয়,—ভূতসূক্ষ্ম উপসংহৃত হয়,—তখন উভয়েরই বিষয়-বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তখন তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। তৎপর, যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা পুনরায় সেই ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে উত্থিত হইয়া, স্ব স্ব বাসনা ও কর্ম্মানুরূপ মনুষ্যাদি দেহ ধারণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তির বাসনাদি ক্ষয়ে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ওরূপে পুনরুত্থিত হইতে হয় না; কেন না ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা তাহার বাসনাকর্ম্মাদি ধ্বংস পাইয়াছে *। এই অতি সূক্ষ্ম সৎপদার্থই জগতের মূল; এ বিশ্ব সেই পরম সূক্ষ্ম সদাত্মক; উহা নিত্য সত্যরূপে বর্ত্তমান; হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই পরমচৈতন্য হইতে পৃথক্ নহ”।

আমরা এতদিনে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান সম্পূর্ণ করিলাম। এই সুদীর্ঘ উপাখ্যান হইতে আমরা ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে কি কি জ্ঞান লাভ করিলাম, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছি। এই উপাখ্যান হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে:—

১। ব্রহ্মচৈতন্য এই জগতের সর্ব্বপদার্থে ব্যাপ্ত বলিয়া, ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা যায়।

২। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই ব্রহ্ম “সৎ” রূপে বিদ্যমান ছিলেন।

৩। তিনি চৈতন্য স্বরূপ, নতুবা সৃষ্টির কামনা করিবেন কিরূপে?

৪। তাঁহা হইতে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; এই ভূতসূক্ষ্মকেই “মায়া” বলা যায়।

৫। বিশ্বের সমুদয় পদার্থই এই পঞ্চভূতের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে।

৬। নামরূপ প্রাদুর্ভাবের জন্যই, সেই চৈতন্য জীবদেহে প্রবিষ্ট।

৭। মন, বাক্য, প্রাণ ও মনোবৃত্তিগুলি, পৃথিবী জল ও তেজ দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে।

৮। যখন জীবের উত্তম সুষুপ্তি হয়, তখন জীব ব্রহ্ম চৈতন্যকেই প্রাপ্ত হয়।

৯। এই সূক্ষ্ম সৎপদার্থই বিশ্বের মূল; সমস্ত পদার্থের বিশ্লেষণ করিলে সেই এক সূক্ষ্ম সৎই অবশিষ্ট থাকেন।

১০। যতদিন অবিদ্যা ধ্বংস না হয়, ততদিন জীব পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে; কেননা তখনও তাহার বাসনা ও কর্ম্ম সূক্ষ্ম ভাবে থাকে।

১১। ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইলেও, তাঁহা হইতে এই সুবিশাল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

১২। ব্রহ্মস্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, তিনি যে নাই, তাহা নহে। তিনি প্রকারান্তরে গ্রাহ্য হইয়া থাকেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

* যাহারা অজ্ঞানী, যাহাদের কর্ম্মবাসনাদি ক্ষয়িত হয় নাই, তাহাদের মৃত্যুর পরও সূক্ষ্মশরীর থাকে। জ্ঞানীর সেরূপ সূক্ষ্মশরীর থাকে না। অজ্ঞানীর সূক্ষ্মশরীর শক্তিরূপে একাকার হইয়া ব্রহ্মেলীন থাকে। সমগ্র ইন্দ্রিয়শক্তি, মন বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সুতরাং বুদ্ধি-ধর্ম্ম বাসনাদিও সূক্ষ্মশক্তিরূপে তাহাতে থাকিয়া যায়। থাকে বলিয়াই, পুনরুদ্ভবকালে, অজ্ঞানীর সে গুলি লইয়াই জন্ম হয়। জ্ঞানীর এগুলি কিছুই থাকে না, জ্ঞান দ্বারা ধ্বংস হয়।

ভক্তিবিচার।

ভক্তি কাহাকে বলে? ভগবানে একান্ত অনুরাগের নাম ভক্তি। বৈষ্ণবদিগের নিকট গলায় মালা, কপালে তিলক ও অঙ্গে নামাবলী ধারণ করিলে অতিভক্ত হয়। কিন্তু নারদাদি ঋষিগণ এত সহজে কাহাকেও ভক্ত বলেন নাই। তাঁহারা বলেন, তোমাদের তিলক চন্দন মাখা আমরা দেখিতে চাই না। দেখিতে চাই, তোমাদের পরমপদে অনুরাগ অছে কি না? যদি তাহা থাকে, তবে বুঝিব, তোমাদের ভক্তি আছে। তখন বলিব, তোমরা ভক্ত। এবিষয়ে মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরমানুবৃত্তিরীশ্বরে"। ভগবানে পূর্ণ অনুরাগের নাম ভক্তি। বৈষ্ণব গোস্বামীদের মতে ইহা অপূর্ণ, কেন না, ইহাতে তাঁহাদের ভাবভক্তি ও সাধন ভক্তির উল্লেখ নাই, কেবল প্রেমভক্তিকে ভক্তি বলা হইয়াছে মাত্র। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।" স্বস্ব রূপের অনুসন্ধানই ভক্তি। কিন্তু ইহাও অপূর্ণ; কেননা, ইহাতে কেবল সাধনভক্তির উল্লেখ হইল বটে, কিন্তু ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তির লক্ষণ নাই। এই দুইভাব পূরণের নিমিত্ত শ্রীমৎরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" ভগবদ্বিষয়ে সম্যক অনুশীলনের অর্থাৎ কায়িক, বাচিক, মানসিক চেষ্টা ও প্রীতি সমূহের নাম ভক্তি। উহা ব্রহ্মজ্ঞান ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের আবরক এবং ভক্তিব্যতীত অপর কোন দ্রব্যের আকাঙ্খা না থাকিলেই উহাকে উত্তমাভক্তি কহে। ভক্তি অমৃত স্বরূপ। অমৃত খাইতে মিষ্ট এবং এক বার খাইলে আর ক্ষুধা থাকে না। ভক্তিও সেইরূপ, মধুর হইতে মধুর, অতি মধুর, স্বাদু হইতে স্বাদু, অতি সুস্বাদু। ভক্তির উদয় হইলে সকল বাসনা দূর হয়। এমন কি, ভক্তের নিকট মুক্তিও অতি তুচ্ছ পদার্থরূপে পরিগণিত হয়। হরিভক্তি সুবোধ গ্রন্থে বলিয়াছেন "তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোস্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যাপি জগৎ গুরো॥" হে জগৎগুরো, তোমার সাক্ষাৎকারলাভে আমি সদানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট গোস্পদের ন্যায় তুচ্ছবোধ হইতেছে। ভক্তির উদয় হইলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, তখন সদানন্দে দিন কাটায় ও পরিতৃপ্ত হয়—সিদ্ধ হইয়া যায়। কেননা, তাহাদের আর অন্য কোন সাধনা করিতে হয় না। অণিমা লঘিমাদি আপনা আপনি তাঁহাদের হস্তগত হয়। লোকে কথায় বলে "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" নারদ পঞ্চরাত্রে ঈশ্বর বলিয়াছেন "হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বমুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যা শ্চেটিকা বদনুব্রতা॥" চেটিকাগণ যেরূপ দেবীর অনুগামিনী হয়, সেইরূপ ভক্তি মুক্তি প্রভৃতি আশ্চর্য্যসিদ্ধগণ হরিভক্তির অনুগামী হয়। ভক্তির উদয় হইলে মানুষের কোন বিষয়ে বাসনা, শোক, দ্বেষ, রতি বা উৎসাহ থাকে না। থাকিবেই বা কিরূপে? পরমপদে যাহার মন বিশ্রাম

করে, সে আর কোন্ বস্তুকে ভালবাসিবে বা দ্বেষ করিবে ? আর কোন কার্য্যেই বা উৎসাহিত হইবে ? এবিষয়ে ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন “যোনহৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি ন কাঙ্খতি। শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ।” হে অর্জ্জুন, আমার প্রিয়ভক্তগণ, আকাঙ্ক্ষা, শোক, দ্বেষ, আনন্দ প্রভৃতি সমুদায় শুভাশুভ পরিত্যাগ করেন। ভক্তি বিদিত হইলে, মানুষ মত্ত, শুদ্ধ ও আত্মারাম হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভক্ত অন্য কোন কার্য্য করিতে পারে না; এক্ষণে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। ভক্ত অন্যকার্য্য কিরূপে করিবে ? ভক্তিকে বিদিত হইলে মানুষ উন্মত্ত হইয়া যায়, স্তব্ধ ও আত্মারাম হইয়া যায়। সে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন নাচে, কখন বা নিস্তব্ধ হইয়া আত্মাতে বিহার করে। সে আবার অন্য কাজ করিবে কিরূপে ? এবিষয়ে ভাগবতে বলিয়াছেন “ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্তি লৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তিতুষ্ণীং পরমেত্যনিবৃত্তাঃ ॥” ভক্তগণ অবিনাশী চিন্তা করিতে করিতে কখন কখন রোদন করেন, কখন কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হয়, কখন লৌকিক কথা বলেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন নৃত্য করেন, কখন বা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। ভক্তি দ্বারা কোন কামনা পূরণ করা যায় না। কেননা, উহা নিরোধরূপী। ধন, মান, যশ প্রভৃতির জন্য যিনি পূজা অর্চ্চনাদি করেন, তিনি নীচ ব্যবসায়ী মাত্র। তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র নাই; কেননা ভক্তি নিরোধরূপী, তাহার উদয়ে মানুষের সকল কামনা দূর হইয়া যায়। কামনা-বিহীন ব্যক্তি আবার কোন্ কামনা পূরণ করিবে ? ভাগবতে কপিলমুনি বলিয়াছেন “অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে। সালোক্য সাষ্টিসামীপ্য সারূপৈ্যকত্বম প্যুত। দীয়মানাং ন গৃহ্লাতি বিলাসাৎ সেবনং জনাঃ। সএব ভক্তি যোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥” মাতঃ আমাতে যাহাদিগের অহৈতুকী ও ব্যবধান-বিহীন ভক্তি জন্মায়, আমার সেবা বিনা তাহাদের আর অন্য কোন প্রকার কামনা করা দূরে থাকুক, সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য ও একত্বরূপ অপবর্গও প্রদান করিলে তাহারা গ্রহণ করে না। পূর্ব্বভক্তিকে নিরোধরূপী বলা হইয়াছে, এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে; নিরোধ কাহাকে বলে ? তদুত্তরে শ্রুতি “নিরোধস্থ্য লোক ব্যাপার সন্ন্যাস।” লৌকিক ও বৈদিক কার্য্য মাত্রে সন্ন্যাসের নাম—নিরোধ। অর্থাৎ ভগবান অন্তরের ধন। অন্তর দৃষ্টিপরায়ণ না হইলে মানুষ তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তগণের দৃষ্টি একবারে অন্তরপরায়ণ হইয়া যায়। এজন্য বাহ্যিক, লৌকিক, বৈদিক ব্যাপারে আর তাহাদের মনোযোগ থাকিতে পারে না। ভগবানের চরণে একান্ত ভাবে শরণ লওয়া ও তদ্বিরোধী সমুদায় বিষয়ে উদাসীন হওয়াকেও নিরোধ বলা যায়। অনন্যভাবে ভগবানের চরণে শরণ লইলে অপরাপর বিষয় আর ভাল লাগে না; কাজে কাজেই সে সকল বিষয়ে উদাসিনতা আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনন্যতা কাহাকে বলে ? তৎসম্বন্ধে শ্রুতি “অনাশ্রয়ানাং ত্যাগোনন্যতা।” অপরাপর সমুদায় আশ্রয়

ত্যাগপূর্ব্বক একবারে শরণাগত হওয়ার নাম অনন্যতা। এই অনন্যতার প্রধান শত্রু হৃদয়স্থ অহংকার বা আমিত্ব-বোধ। যত দিন মানুষের এই জ্ঞান প্রবল থাকে, তত দিন সে অনন্যভাবে ঈশ্বরের শরণ লইতে পারে না। আবার নাহংকর্ত্তা ভোক্তাচ, এই জ্ঞানের উদয় হইলে মানুষের পক্ষে ভগবানের চরণে অনন্যভাবে শরণ লওয়া ব্যতীত উপায় নাই। এক্ষণে তদ্বিরোধীষূদাসিনতা কাহাকে বলে, তাহার সূত্র যথা "লোকে বেদেষু তদনুকুলাচারং তদ্বিরোধীষুদাসিনতা।" লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম সমুদায়ের সম্যক অনুষ্ঠান করিলে—নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রতি বিরাগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। নিশ্চয় বুদ্ধি দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। উপরোক্ত সূত্রে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা কত কাল কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পড়িয়া থাকিব? একমাত্র ভগবানের স্মরণ, মনন ও ধ্যান না করিয়া বৃথা কর্ম্মকাণ্ডে কেনইবা পড়িয়া থাকি? এতদুত্তরে—যতদিন নিশ্চয় বুদ্ধি দৃঢ়রূপে আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ভগবানের চরণে অবিচলিত ভক্তি যতদিন না জন্মাইবে, ততদিন আমাদের অবশ্য শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না; চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানের উদয় হয় না; এজন্য যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "গৃহস্থের বৌ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সন্তান হইবার উপক্রম হইলে, ক্রমে ক্রমে সে সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর তাহার আর অন্য কোন কাজ করিতে ভাল লাগে না, সে সমস্ত দিন কেবল সেই সন্তানটীকে লালন পালন করে এবং তাহার মুখ চুম্বন করিয়া আনন্দিত হয়। সেইরূপ মানুষের আত্মা প্রথম অবস্থায় কার্য্য করিয়া আনন্দিত হয় এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্তির আশা করে, কিন্তু আত্মা যখন ফলবতী হয়, তখন আর কার্য্য দ্বারা সুখ লাভ হয় না। জ্ঞান চৈতন্যের অভ্যুদয় হইলে মন আর কর্ম্মকাণ্ডে পড়িয়া থাকিতে পারে না। তখন কেবলই আত্মাতে জ্ঞানানন্দ সম্ভোগ করিতে চায়। অন্যথা পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। একবারেই বা একদিনেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। অথবা সলীন জীব ঈশ্বরের দর্শন পায় না। অতএব যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, অগ্রে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা যেমন সহজে চিত্তশুদ্ধি হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এজন্য প্রথমে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নতুবা স্খলিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। দৃষ্টান্তও প্রতিদিন তাহাই দেখাইতেছে। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া একবারে যাঁহারা উচ্চ সামামন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঘোর কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। একমাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করাই তাহার মুখ্য কারণ। ব্রহ্ম যামলে উক্ত আছে "শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রি বিধিংবিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতাইব কল্পতে॥" বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে যে সকল বিধি আছে, তাহা পালন না করিয়া হরিতে ভক্তি করা বিড়ম্বনা মাত্র। লৌকিক ব্যাপারও

ততদিন থাকিবে ; কিন্তু ভোজনাদি ব্যাপার যত দিন শরীর আছে, তত দিন থাকিবে। ভক্তির উদয়ে কর্ম্মত্যাগ হয় বলিয়া ভোজনাদি কর্ম্মত্যাগ হয়, মনে করিবেন না।

প্রেমের লক্ষণ কি ? পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিতে যে প্রেম করা যায়, তাহা কি প্রেম নয় ? না তাহা প্রকৃত প্রেম নহে। তবে প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ কি ? প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ভগবানের অর্চ্চনাদিতে যে অনুরাগ জন্মায়, তাহাই ভক্তির লক্ষণ। ভক্তি না হইলে পরম পদ লাভ হয় না এবং অর্চ্চনা দ্বারা যখন সেই পদ লাভ করা যায়, তখন অর্চ্চনাই যে ভক্তির লক্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ বিষ্ণুরহস্যে বলিয়াছেন "শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যেতু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি। তে যান্তিশাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্।" এই ভূলোকে যাঁহারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তাঁহারা বিষ্ণুর নিত্য পরমানন্দ পদ প্রাপ্ত হন। গর্গ বলিয়াছেন "কথাদিষ্বিতি মার্গ ;" অর্থাৎ ভগবৎ কথাতে অনুরাগেই ভক্তির লক্ষণ। মানুষের মন স্বভাবতঃই অসার বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় ; শাস্ত্রপাঠ বা ধর্ম্মালোচনা ভালবাসে না। কিন্তু যখন দেখিবেন, মনুষ্য অসার সংসার চিন্তা দূর করিয়া ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে, তখন জানিবেন যে, তাহাতে ভক্তির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কেননা, ভগবান স্বয়ংই গুণানুবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তনের অপার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। ভাগবতে উক্ত আছে "ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা শিষ্টস্য সুক্তস্য চ বুদ্ধ দত্তয়োঃ। অবিচ্যুতার্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তম শ্লোক গুণানুকীর্ত্তনং।" অর্থাৎ কবিগণ দ্বারা ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে, ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞান ও দানের ফল স্বরূপ। যখন মনুষ্য একমাত্র আত্মরতি বিষয় সমূহে রত থাকেন এবং তদ্বিরোধী বিষয় মাত্রে লিপ্ত না হন, তখনই বুঝিব, তাঁহাতে ভক্তির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মরতি কাহাকে বলে ? দৃশ্য দোষমার্জ্জনা পুরঃসর একমাত্র আত্মাচৈতন্যে জগৎ চৈতন্য বোধ করার নাম আত্মরতি। ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করা এবং তাঁহাকে বিস্মরণে ব্যাকুল হওয়ার নাম ভক্তি। ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ কাহাকে বলে ? তাহা ভাগবতে বলিয়াছেন "কুর্ব্বানা যত্র কর্ম্মাণি, ভগবচ্ছিক্ষয়া সকৃৎ গৃণন্তি গুণ নামানি কৃষ্ণস্যানুসরন্তি চ।" অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইলে এইরূপ ভাবিতে হয় যে, তাঁহার শিক্ষা মতেই আমরা সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি এবং এই সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁহার গুণ নামাদি কীর্ত্তিত হইতেছে। ভক্তির লক্ষণ এইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে প্রেমের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে। যদি প্রেমের লক্ষণ দেখিতে চাও, তবে ব্রজগোপিকাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আহা, কি জলন্ত দৃষ্টান্ত ! প্রেমের গুরু গোপিকাগণ ভগবানের জন্য কি না ত্যাগ করিয়াছেন ? মান বল, লজ্জা বল, ভয় বল, ভগবানের জন্য তাঁহারা সকলই জন্মের মতন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কুলস্ত্রীগণ ঘোরা নিশীথ সময়ে প্রাণসম পতিকে ত্যাগ করিয়া লজ্জা, ভয় জলাঞ্জলি দিয়া পাগলের ন্যায় হা কৃষ্ণ !

হা কৃষ্ণ! বলিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছে; ইহা অপেক্ষা প্রেমের উচ্চ দৃষ্টান্ত আর কি চাও? আবার বিরহই বা কত, যে মুখচন্দ্র একবার দেখিলে জীবন সার্থক হয়, যাঁহাকে দেখিবার জন্য মহর্ষিগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান; মনের সাধে কত বার প্রাণ ভরিয়া গোপিকাগণ সেই মুখচন্দ্রিমা দর্শন করিয়াছে, তথাপি অদর্শনে তাহাদের প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। এই ত প্রেমের লক্ষণ! এই ত প্রেমের স্বভাব! আর তোমার আমার প্রেম নয় যে, প্রাতে একবার উপাসনা করিলাম ত সমস্ত দিনের কাজ গোছাইলাম—সমস্ত দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু তথায় মাহাত্ম্য জ্ঞানের অভাব নাই। গোপিগণ কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জ্ঞাত ছিল। নতুবা ব্যভিচারী দোষ পড়ে। মাহাত্ম্যজ্ঞান ব্যতীত যে প্রেম, তাহা ব্যভিচারী প্রেম। গোপিকাদিগের প্রেম যদি তাহাই হইবে, তবে পরম বৈরাগী নির্দ্দোষচরিত্র শুকদেব গোস্বামী মহাশয় কখনই ইহার আদর করিতেন না। কালভয়ে ভীত ঋষিগণ কখনই ইহা শুনিবার জন্য ব্যাকুলিত হইতেন না। আর আসন্নমৃত্যু গঙ্গাতীরবাসী রাজা পরীক্ষিৎ এই ব্যভিচারী প্রেমের কাহিনী কেনই বা শুনিবেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া কেনইবা গোপী গোপী বলিয়া বেড়াইবেন? সে গোপীদের প্রেম কি কখন ব্যভিচারী প্রেম হইতে পারে? ব্যভিচারিগণ প্রিয়তমের সুখে সুখী হইতে পারে না। গোপিকাদিগের প্রেম ব্যভিচারী নহে। গোপিকাগণ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত ছিল, যদি বল কিরূপে জানিব যে, উহা ব্যভিচারী প্রেম নহে? তদুত্তর এই—ব্যভিচারী প্রেম কামমূলক, ব্যভিচারিণী স্ত্রী কামনার বশ হইয়াই অপরকে প্রেম করে। সে আপনার সুখ অন্বেষণ করে, প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু গোপীদিগের প্রেম সেরূপ নহে। তাহারা নিজের সুখ কখনই অন্বেষণ করে নাই। রাধাকৃষ্ণের সুখেই তাহারা চিরদিন সুখবোধ করিয়াছে। ইহাই তাহাদের আশ্চর্য্য প্রেমের লক্ষণ। ইহাই তাহাদের মাহাত্ম্য-বোধের পরিচয়। প্রেম তিন প্রকার, সাধারণী, সামঞ্জসা, সামর্থ্যা। তুমি মর, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমার সুখের উপায় করিয়া দাও—ইহাই সাধারণী,—ইহাই ব্যভিচারী প্রেমের লক্ষণ। আমিও সুখে থাকি, তুমিও সুখে থাক—ইহাই সামঞ্জসা। আর আমি মরি, ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি আমার, তুমি সুখে থাক, ইহাই সামর্থ্যা। ইহাই গোপিকাদিগের প্রেম। ধিক সে পাষণ্ডদের, যাহারা এ প্রেমকে ব্যভিচারী প্রেম মনে করে।

ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবান উদ্ধবকে ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়াছেন "যৎকর্ম্মভির্য্য তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্যতাশ্চ যৎ। যোগেন দান ধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেইঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম্ কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥" 'হে উদ্ধব, কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান প্রভৃতি শ্রেয়োদ্বারা যাহা লাভ করা যায়, আমার ভক্তগণ একমাত্র ভক্তি দ্বারা সে সমুদায় লাভ করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের বাসনা থাকে না, তথাপি ইচ্ছা করিলে তাহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও মদ্ধাম পর্য্যন্ত

পাইতে পারেন; কেননা উহা ফল স্বরূপ।' শাস্ত্রে বলে, কর্ম্ম বা যোগের মুক্তি প্রদান করিবার শক্তি নাই। তবে কর্ম্ম বা যোগ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কেন না, ঐ সকল যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইয়া যায় এবং চিত্ত শুদ্ধ বা নিরুদ্ধ হইলেই জ্ঞানের উদয়। কিন্তু ভগবৎ কৃপা না থাকিলে শুদ্ধ জ্ঞানে কি ফল? ভগবৎ কৃপায়ই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সেই কৃপা হইতে ভক্তি লাভ হয় বলিয়াই ভক্তি সকলের ফল। কর্ম্ম ও যোগের ফল ভগবৎ কৃপা এবং ভগবৎ কৃপার ফল ভক্তি; এজন্য ভক্তিকে সকলের ফল বলা যায়। ভগবান অভিমানীকে ঘৃণা ও দীনকে ভালবাসেন, কিন্তু কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ মনুষ্যকে কেবল অহঙ্কারী করিয়া তুলে। ভগবান কাঙ্গালের ধন, দরিদ্রের রত্ন, তিনি অহঙ্কারীর কেহ নহেন। তিনি দীনের বন্ধু, দীনহীনকে তিনি বড়ই ভালবাসেন। অতএব ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহাতে দীনতা আনয়ন করে। সে দীনতা ঈশ্বরের প্রিয়। অনেকে বলেন যে, জ্ঞানই ভক্তির সাধন, কিন্তু শাণ্ডিল্য ঋষি তাহা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন "জ্ঞানমিতি যেন্নদ্বিষতোইপি জ্ঞানস্তদসংস্তি।" ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞানকে ভক্তি বলা যায় না, কেননা, ভগবৎদ্বেষী পুরুষেরও তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিতে পারে। ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান এবং এই মহান জগতের আদি পিতা মাতা, ইহা অনেকেই জানেন, কিন্তু কয় জনে তাঁহাকে প্রেম করে? অতএব জ্ঞান থাকিলেই প্রেম বা ভক্তি হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর সাপেক্ষ, অর্থাৎ জ্ঞান সাধন করিতে করিতে ভক্তি হয়; ভক্তি সাধন করিতে করিতে জ্ঞান হয়। কিন্তু শাণ্ডিল্য ঋষি এ কথাও বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন "তয়োপক্ষয়াচ্চ" ভক্তির উদয় হইলে জ্ঞানের নাশ হয়। ভালবাসার আধিক্য জন্মিলে প্রেম ও প্রেমাস্পদ এক হইয়া যায়। উহাদের আর পৃথক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ব্রহ্মকুমারদ্বয় নারদ ও সনৎকুমার বলেন, ভক্তি স্বয়ংই ফল স্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, বা যোগ—যাহারই অনুষ্ঠান কর না কেন, কিছুতেই ভক্তি মিলিবে না। একমাত্র ভগবানের কৃপা হইলেই ভক্তির উদয় হয়; অতএব কর্ম্মাদি কাহারও ফল নহেন, ইনি স্বয়ংই ফল স্বরূপ। রাজ দর্শন ও ভোজ্য দর্শনে ইহাই দৃষ্ট হয়, যেমন তাহাতে রাজার সন্তোষ হয় না, ক্ষুধারও শান্তি হয় না। যদি জ্ঞান হইতে প্রেম হইত, তাহা হইলে আমি রাজদর্শন করিলাম, রাজা আমাকে কেন ভালবাসেন না। মিষ্টান্ন দেখিলাম, কেন আমার ক্ষুধার শান্তি হয় না। জ্ঞানের দ্বারা ভগবানেব স্বরূপ জানা যায়, কিন্তু স্বরূপ জানিলেই প্রেম হয় না। প্রেম স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহার সহিত জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; কেন না, ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী।

সাধন কিপ্রকারে করিতে হয়? সাধন করিতে হইলে বিষয় ও লোক সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে লোকসঙ্গ ত্যাগ ও বিষয় বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য; ইহাই সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়। দিবানিশি ভগবানের ভাবনা করাও ভক্তির সাধন বিশেষ। যে দিবা-

নিশি বিষয় চিন্তা বা অসার সংসারের চিন্তায় মগ্ন হয়, সে কিরূপে ভক্তি সাধন করিবে? সংসার চিন্তা মানুষকে রজঃ বা তমোগুণে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু ভক্তির উদয় সত্বগুণ ব্যতীত হয় না, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে সত্বগুণের উদয় হয়। এই জন্য ইহাকে ভক্তিলাভের উপায় বলিয়া সাধুগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা ভাগবতেও বলিয়াছেন, "শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভিক্ষ্ণয়া স্মরন্তি নন্দন্তি অবেক্ষিতং জনাঃ। তবৈব পশ্যন্ত্য চিরেণ তারকং ভব প্রবাহো পরমং পদাম্বুজং॥" 'হে কৃষ্ণ! হে মাধব! যাঁহারা তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন, তোমার নাম পদাবলী গাঁথিয়া গান করেন, তাঁহারাই সংসারে ভয় নাশকারী ও পরমোপকারী তোমার পদাম্বুজের সাক্ষাৎ লাভ করেন। লোকের নিকট হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করাও ভক্তির লক্ষণ। যে হেতু ভাগবতে উক্ত আছে, "যস্যাংবৈ শ্রূয়মানায়াং পরম পুরুষে। ভক্তি রুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক মোহভয়াপহা॥" অর্থাৎ যাঁহারা সেই মহাপুরুষ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি বিনাশকারিনী ভক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। পুনরপি আদি পুরাণে উক্ত আছে "গীত্বা চ মমনামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ। ইতি ব্রবীমিতে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জ্জুন॥" 'হে অর্জ্জুন! আমি তোমায় যথার্থ বলিতেছি, যে আমার নাম গান করতঃ আমার সমীপে বিচরণ করে, আমি তাহার চিরক্রীত হইয়া থাকি।" ভগবান নারদকে বলিয়াছেন, "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিণাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" 'হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি করি না, যোগিগণের হৃদয়-কন্দরেও অবস্থিতি করি না, যেখানে মদ্ভক্তগণ আমাকে স্মরণ করে, আমি সেই স্থানে অবস্থিতি করি।' কিন্তু ভক্তিলাভের প্রধান উপায় মহাজনের কৃপা বা ভগবানের কৃপাকণা প্রাপ্ত হইলে মানুষ ভক্তিমান হইয়া যায়, ইহা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন না। কিন্তু সাধু-সঙ্গের যে কত মহিমা, তাহা দুই এক জন ভুক্তভোগী ব্যতীত সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না। এমন কি, মানুষের কৃপায় মানুষ ভক্তিমান হয়, একথা তাহারা বিশ্বাস করেন না। আমি এ স্থলে এইমাত্র বলিতে চাই যে, সাধুর কৃপা হইলে ভক্তি লাভ হয়; একথা কেবল আমি বলিতেছি, এমন নহে। সমুদায় হিন্দুশাস্ত্রে একবাক্যে সাধুসঙ্গের অপার মহিমা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,এই চারি যুগের হিন্দু সাধকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। শাস্ত্রের একথা অভ্রান্ত সত্য ও প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "গীতায়া শ্লোক পাঠেন গোবিন্দ স্মরণ কীর্ত্তনাৎ। বৈষ্ণব দৃষ্টমাত্রেণ তীর্থকোটিফলংলভেৎ॥" গীতা পাঠ করিলে, ভগবানকে স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু এক সাধু দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ কোটীতীর্থের ফল লাভ হয়। আরও বলিয়াছেন, "গঙ্গা পাপং শশিতাপং দৈন্যংকল্পতরু হরেৎ। পাপং তাপং তথা দৈন্যং সর্ব্বং সাধুসমাগম॥" 'গঙ্গা পাপ হরণ করেন, শশীতাপ হরণ করেন, ও কল্পতরু দৈন্য হরণ করেন, কিন্তু সাধু সমাগমে পাপ, তাপ, দৈন্য এ তিনবিধই বিদূরিত হইয়া যায়।' নারদ বলিয়াছেন "মহৎ সঙ্গস্তু দুর্লভোগম্যো

মোঘশ্চ"—মহৎ সঙ্গ দুর্লভ ও অগম্য কিন্তু অমোঘ। দুর্লভ কেন না, অনেক সুকৃতি না থাকিলে সাধু চেনা যায় না।

বিদ্যাভূষণ।

রামায়ণের কেন্দ্র-কৌশল

১। কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা।

মহাকবি বাল্মীকির প্রণীত রামায়ণ জগতে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, ইহার প্রণেতা ভারতবাসী হইলেও স্বপ্রণীত কাব্যের উৎকর্ষ গুণে তিনি জগৎবাসী কবিকুলের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সর্ব্বথা উপযুক্ত। রামায়ণের পুঞ্জীকৃত সৌন্দর্য্যরাশি পৃথক পৃথক রূপে দেখিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। আধুনিক শ্রম বিভাগের যুগে তাদৃশ ধীরতা লইয়া কেহ আর ঐরূপ মহাকাব্য প্রণয়নে অথবা অধ্যয়নে সহজে স্বীকৃত হয় না। সহস্র কর্ত্তব্যের সহস্র আহ্বানে সমাজশক্তি এখন ব্যতিব্যস্ত এবং বিচ্ছিন্ন, এখন খণ্ডকাব্য ও নাটক লইয়া ক্ষুদ্র অবসর অতিবাহিত করিতে সকলেই একান্ত অভিলাষী। আমরাও তজ্জন্য বিরাট রামায়ণ কাব্যের কেন্দ্র-কৌশল প্রথমতঃ খণ্ডাকারে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

যেমন প্রকাণ্ড সেতুর বিস্তৃত আয়তন কেবল মধ্য-কেন্দ্রস্থিত পাষাণ খণ্ডের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ, বাল্মীকির যশ-সেতুরূপী অক্ষয় রামায়ণ সেতু কাব্যনীতির নিগূঢ় নিয়মে মানব-সমাজ-সাধারণের উপর কয়েকটী সূক্ষ্ম ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উক্ত ঘটনা কতিপয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে রামায়ণ গাথার কেন্দ্র-কৌশলের অপূর্ব্ব প্রসারণ ও পূর্ণতা মহাকবির আদর্শ সৃষ্টির অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনারূপ ঘটনা হইতেই প্রকৃত কাব্যের আরম্ভ। দশরথ রাজচক্রবর্ত্তী; তাঁহার একাধিক দারপরিগ্রহ তৎসাময়িক রাজনীতি ও রাজধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। যাহা অন্যের পক্ষে প্রকৃত দূষ্য হইলেও, সামাজিকতার চক্ষে অনঘ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কবি কৌশলে তাহাকে তদনুরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৈকেয়ীর কনিষ্ঠতাও তাঁহার সাহৃদয়তার পরিচায়ক। একদিকে যেমন অপত্য-স্নেহ-সুরক্ষিত দশরথ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া, আত্মজের অভিষেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমন ভোগপরতন্ত্র ও স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সায় অধিকতর স্পৃহাবান হইয়া কনিষ্ঠা পত্নী কৈকেয়ীর একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাজ্ঞানী দশরথ আপনার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জ্ঞাত হইয়াই বুঝি, ভরতের অনুপস্থিতিতে, সামন্ত ও বান্ধব নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই, মন্ত্রী সভা ও পুরোহিত সভার অনুজ্ঞাক্রমে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। অভিষেকের যাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্যজাত নিমেষ মধ্যে আহৃত হইল, নিয়ত চিত্তে অভুক্ত থাকিয়া রাম সীতার সহিত নিশা যাপন করিতে অনুজ্ঞাত হইলেন।

রামের অভিষেক বৃত্তান্তের তাড়িত স্রোতে অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নূতন রাজশ্রী দর্শনাশায় পুলকিত হইয়া উঠিল। কৈকেয়ী মাতৃপরায়ণ ভরত-পূজ্য গুণাভিরাম রামকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন বলিয়াই ভরতের সাময়িক অনুপস্থিতি তাঁহার মনে কোন রূপ অভাব আনিতে পারে নাই। তিনিও সাধারণ হর্ষে সহানুভূতি দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? তাঁহার বর্ত্তমান চিদাকাশ নির্ম্মল ও প্রসন্ন, কিন্তু তাঁহার অতীত হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে একটী পুরাতন স্মৃতি অদৃশ্য বাষ্পপুঞ্জের ন্যায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বুঝিবা তাহার অজ্ঞাত প্রভাবে কৈকেয়ীর প্রসন্ন মানস আবিল হইয়া উঠিবে, কিন্তু এখনও উহা শরীরী হইয়া তাঁহার চিন্তা-পথে পতিত হয় নাই। এখনও রামের মঙ্গল কামনা ব্যতিরেকে কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে অন্তবিধ কামনা স্থান পায় নাই, এখনও কৈকেয়ীর ভবিষ্যৎ আশা রামের অভ্যুদয়ে উজ্জ্বলিত, কিন্তু সহসা কৈকেয়ীর সুখ স্বপ্ন তিরোহিত হইল। তিনি সম্মুখেই মন্থরার কুব্জ দেহ নিরীক্ষণ করিলেন, এখন কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে পাপ ও পুণ্যের, স্বর্গ ও নরকের, সুর ও অসুরের, ন্যায় ও অন্যায়ের ঘোরতর সংগ্রাম আপতিত হইল।

বাল্মীকি ঈদৃশ চিত্ত-সংগ্রামের প্রকৃত বিভীষিকা শরীরী মূর্ত্তি দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে দেখাইবার অভিলাষে মন্থরার সৃজন করিয়াছেন। ম্যাকবেথ-পত্নীর স্বীয় অন্তঃকরণে লুক্কায়িত উচ্চাভিলাষের বিকট মূর্ত্তি যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় নাই, তথাপি ম্যাকবেথ-বীর শূন্যে অবস্থিত শাণিত অস্ত্রের আবির্ভাবে তাহার শরীরী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কম্পিত হইয়াছিলেন। মন্থরা,—রক্ত-মাংস-সম্বলিতা মন্থরা—যুক্তি মার্গানুসারিণী মন্থরা কেবল হিংসা উদ্দীপ্ত করিয়াই অন্তর্হিত হইল; সেই হিংসার বর্দ্ধিত শিখায় দুর্ভাগা কৈকয়ী স্বয়ং ভস্মীভূত হইয়া অযোধ্যার রাজশ্রীকে নিমেষ মধ্যে ভস্মীভূত করিবে। একটী ক্ষুদ্র ক্রোধাগারে অযোধ্যার ন্যায় একটী বিশাল সম্রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী একটী রমণীর দীর্ঘনিশ্বাসে পরিবর্ত্তিত হইবে; কেহই তাহা জানিলেন না। উৎসবোন্মত্ত অযোধ্যা-বাসীর সম্মিলিত জয়োল্লাসে অপূর্ব্ব ঐকতানে কৈকেয়ীর পৈশাচিক আর্ত্তনাদ ডুবিয়া গেল, কেহই তাহা শুনিল না। যিনি পুত্রের নিকট রাজ্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি আবার পত্নীর নিকট সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যে আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন, দশরথ স্বয়ংও তাহা ভাবেন নাই।

সমরাঙ্গনে বীরের পরীক্ষা হইলেও, গৃহ-কোণ বীরের পরীক্ষার প্রশস্ত স্থান। দিগ্বিজয়ী অনেকেই আপনার কুটীরে আত্মহারা হইয়াছেন। যে অলৌকিক মন্ত্রের প্রভাবে সেদিন বিশ্বজিৎ নেপোলিয়ন অষ্টাদশ বর্ষীয়া ভামিনীর কর্কশ কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়া স্পানীয় সারমেয়ের ন্যায় কাপুরুষতা অবলম্বন করিতেন, ভারতীয় কবি দণ্ডকারণ্যের কুটীরে বসিয়া সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই তাহা পরিজ্ঞাত ছিলেন। ঋষি-কবি ত্রিকালজ্ঞ, ভূতভবিষ্যৎ তাঁহার করতলগত আমলকবৎ। মানব-স্বভাবে আলোক ও আঁধারের সমাবেশ তাঁহার অবিদিত নহে, তিনি পরাক্রান্ত হৃদয়ের লুক্কায়িত দুর্ব্বলতা সম্যকরূপে বিদিত ছিলেন। তাই আজ উৎসব-উৎফুল্ল নির্ম্মল বাসন্তী-নিশীথে

আবালবৃদ্ধ বনিতার উল্লাস-ধ্বনির ভিতর রাজ-অন্তঃপুরে তিনি দেবাসুর সংগ্রাম-জেতা রাজচক্রবর্ত্তী দশরথের পরীক্ষা লইলেন। সামরিক বিজয়লক্ষ্মী মহাকাব্যের আশ্রিতা নহে, মহাকাব্য অন্তর্জ্জগতের ইতিহাস। উহার ললিতভেরী কেবল দুর্দ্ধর্ষ ভয়াবহ চিত্তসংগ্রাম ঘোষণা করে, লঙ্কাকাণ্ড কেবল ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা ও কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য গ্রথিত হইয়াছে। কেবল যুদ্ধ বর্ণনার জন্য মহাকাব্য প্রণীত হয় না। বার্দ্ধক্যে ও রাজধর্ম্মের গৌরবে এতদিন দশরথ সকলের অনধিগম্য হইলেও, আজ তিনি সমদর্শী তপস্বীর অন্তস্থলভেদী দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। শান্তিপ্রিয় আর্ষকবি মহাশান্তি ও হর্ষের ভিতর বীরত্বের পরীক্ষা লইলেন। বৃদ্ধরাজার সমস্ত জীবনের যাবতীয় বিভব পরাভূত হইল। রামের বনগমন অপেক্ষা দশরথের আত্মবিনাশ কি অধিকতর শোচনীয় ও ভয়াবহ নহে?

যে রমণী পাশ্চাত্য দেশে পিতৃ সদৃশ রাজ-অতিথির সম্মাননা লাভ করিয়াও সহসা অসম্ভাবিত রাজত্ব-লালসায় উন্মত্তা হইয়া জিঘাংসা বৃত্তির চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিতা হয় নাই, সেই রমণী স্নেহ-দুর্ব্বল প্রাচ্য দেশে, অনুগত পতির নিকট, সুযোগ বুঝিয়া, স্বীয় পুত্রের মঙ্গলার্থ, সপত্নী পুত্রের কেবল মাত্র বনবাস প্রার্থনা করিবে না কেন?

কৈকেয়ী বাস্তুতঃ আপনার পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া পরোক্ষে হিন্দুসমাজকে যে অমূল্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, যদি হিন্দু-জগৎ সে শিক্ষার সমাদর করিত, তবে অধুনা হিন্দু-পরিবার সপত্নীর দীর্ঘনিশ্বাসে হতশ্রী হইত না।

শুভানুষ্ঠান যথা সত্বর কার্য্যে পরিণত করা যদিও লোকসমাজে অপরা নীতি বলিয়া পুরাকাল হইতেই আদৃত হইয়া আসিতেছে, তথাপি রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে দশরথ এত ত্বরান্বিত না হইলে, উহা বুঝি এতদূর শোচনীয় হইত না। দশরথ যে অদৃষ্টের ভয়ে রাজ্যাভিষেক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে এত ত্বরান্বিত হইয়াছিলেন, সেই অদৃষ্টই তাহার হন্তারকরূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহাকে অনুসরণ করিল। যাহা ভবিতব্য, তাহা ঘটিবেই, কিন্তু তাহা এমনি ভাবে ঘটিবে যে, ঘটনার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কেহই তাহার ফল উপলব্ধি করিতে পারে না। অতি তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনাবলীতেই সামাজিক ও নৈতিক নিয়তির অহরহ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

রামের রাজ্যাভিষেক সংকল্প অপেক্ষাও, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা অধিকতর দ্রুতগামী, যদিও নিয়তির গতি অচিন্তনীয়, তথাপি সুখ ও দুঃখের ঈদৃশ ত্বরিতাগমনে অদৃষ্টের চিত্র অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎকালে ভবিতব্যের রুদ্র শাসনে আপামর সাধারণ জর্জ্জরিত ও ভীত হইয়া অদৃষ্টরূপী কল্প দেবতার প্রসন্নার্থ কেবল যজ্ঞকেই অবলম্বনীয় করিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্টবাদ বাল্মীকির অবলম্বনীয় হইলেও উহা তাঁহার চরম উদ্দেশ্য নহে। সহসা আপতিত সুখ ও দুঃখ হইতেই অদৃষ্ট সূচিত হয় এবং তাহা হইতেই ব্যক্তিগত চেষ্টার বিকাশ পায়, নতুবা জাতির অধ্যবসায় প্রবুদ্ধ হয় না। অদৃষ্ট পুরুষার্থের অনন্যতা। অদৃষ্ট ও পুরুষার্থের নিগূঢ় যোগ কেবল ভারতীয় যোগীর পরিজ্ঞাত, তজ্জন্যই রক্ষণশীল যোগী, সময় ও সমাজের ঐক্য সংরক্ষণ করিয়া, অতি কৌশলে অদৃষ্টবাদের অব-

ভারণা করিয়া, যেন অদৃষ্টের অনুসরণ করিতে করিতে, অতি সহজে পুরুষকারে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। লক্ষ্মণের অন্ধ ক্ষাত্র তেজ যে অদৃষ্টের সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ, রামের শান্ত চরিত্র-বলে তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইবে, রাম কেবল পিতৃ আজ্ঞা পালনরূপ সাধারণ নীতির অনুসরণ করিয়া অদৃষ্টের কঠোর আজ্ঞা অকুতোভয়ে শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু তন্মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইল। সমদর্শী বাল্মীকি, বিবেকী না হইলে কি এমন নির্ম্মম ও কঠোর ভাবে,রামের রাজ্যাভিষেক বনবাসে পরিবর্ত্তিত করিতে সাহসী হইতেন? রামায়ণ রচয়িতা বৈরাগ্যের কি অপূর্ব্ব উদাহরণ দিয়াছেন! অধিবাস ও বনবাস তাঁহার নিকট তুল্য সামগ্রী। রামের অধিবাসে ভবিষ্যতে যাহা হইত, তাহার বনবাসেও বস্তুতঃ তাহাই হইবে—ইহাই কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার গূঢ় রহস্য। সমগ্র রামায়ণ অদৃষ্টের পরাজয় ও পুরুষার্থের বিজয় কাহিনী, স্বাবলম্বন কেবল বাহু আস্ফালন ও বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত নহে, চরিত্রশক্তির ধীরতা ও দৃঢ়তাই মেরুদণ্ড। বাল্মীকির রামায়ণ পতিত জাতির অভ্যুত্থানের অমোঘ আশ্বাস, হিন্দুদর্শনে অপরিচিত হইয়া ভারতীয় কবির কাব্য বুঝিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। রামায়ণের জাতি এখন মুখে মাত্র "রামসীতাকী জয়" ঘোষণা করিয়া রামায়ণের শিক্ষা কেন উপেক্ষা করিতেছে? ইহার মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া কি কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে?

শ্রীকুমুদকান্ত বসু।

বিশ্ব-সঙ্গীত

(১)
দিবসের দুখ-ধান্ধা করি সমাপন,
এই দেবদারু মূলে,
তোমার পবিত্র-কূলে,
নিতি নিতি সন্ধ্যাকালে করি বিচরণ।
সংসারের দাবানলে
যখন হৃদয় জ্বলে,
তখন মা ভাগীরথি, তবকূলে আসি;
তাতেই মা, তোরে আমি এত ভালবাসি।

(২)
নির্দ্দয় সংসার-প্রাণ কঠিন এমন—
দুখীর নয়ন জলে,
কা'র না হৃদয় গলে,
সকলেই নিজ স্বার্থ করে অন্বেষণ।
কেহ নাহি মুখ চায়,
এমন দারুণ হায়,
কঠিন পাষাণে বাঁধা মানুষের মন,
কে বলে মানব-হৃদে দয়ার আসন?

(৩)
শীতল-সলিলা অয়ি, তুইলো তটিনি!
তব কুল কুল স্বরে,
সুধা বরিষণ করে।
ঢালে লো তাপিত প্রাণে মৃত সঞ্জীবনী,
স্নিগ্ধ তব সমীরণ,
স্নিগ্ধ তব উপবন,
স্নিগ্ধপ্রাণা, স্নিগ্ধনীরা তুই মা জাহ্নবি!
অঙ্কিত হৃদয়ে তোর স্নিগ্ধতার ছবি।

(৪)
জীবের দুর্গতি হেরি গলিল হৃদয়,
তাই দ্রবময়ী নামে,
পূজিতা মরত ধামে,
হইল জীবন তোর পবিত্রতাময়,

পরের দুখের তরে।
যার মা, নয়ন ঝরে।
সেই দেবী, ধন্য সেই ত্রিলোক-পূজিতা,
পতিতপাবনী নামে তেঁই অভিহিতা।

(৫)

এত দয়া বল মাতঃ, কাহার সম্ভবে ?
অন্তিমে শবের দেহ,
যবে না পরশে কেহ,
তব শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পায় ভবে ;
চিতাভস্ম-হাড়-মালা,
অবাধে মা, শৈলবালা,
ত্যজি ঘৃণা, কর সদা অঙ্গ আভরণ,
কে দেখেছে, কে শুনেছে বাৎসল্য এমন ?

(৬)

সন্ন্যাসী ঘরণী তুই তাই সন্ন্যাসিনী—
তাতেই কি অবিরত,
সাধিতেছ মহাব্রত,
জীবের কল্যাণ হৃদে ধরিয়া আপনি।
দিন নাই, রাতি নাই,
তিলেক বিশ্রাম নাই।
ছুটিছ কর্ত্তব্য-পথে অব্যাহত-গতি।
ধন্যব্রত; পদে তোর সহস্র প্রণতি।

(৭)

তাই তুই পতি পাশে এত আদরিণী।
দেহে হর গৌরীমূর্ত্তি,
হৃদয়ে কালিকা স্ফূর্ত্তি,
তুই মাত্র মহেশের শিরোবিহারিণী।
সর্ব্বত্র গুণের জয়,
গুণেতে সকলি হয়।
ভুবনে গুণের পূজা আছে চিরন্তন।
তাই তোর সদা পূজা করে ত্রিলোচন।

(৮)

কুল কুল, কুল কুল, নাহি অন্য বাণী—
কি কহিছ মনে মনে,
বল মাতঃ অভাজনে,
শুনিতে বাসনা বড় অস্ফুট কাহিনী।
প্রাণেতে বড়ই আশা,
শিখিতে মা, তোর ভাষা,
কি কহিছ কৃপা করি কহ দেখি শুনি।
কাহার দুখেতে মাতঃ, কাঁদিছ আপনি।

(৯)

ঐ যে কনকলতা বসি তব তীরে—
আলু থালু কেশ পাশ,
পরিধান শ্বেতবাস,
দয়িতের চিতা ভস্ম মাখিয়া শরীরে—
শোকে কর হানি ভালে,
তোমার হৃদয়ে ঢালে,
তপত নয়ন বারি ঝর, ঝর, ঝরে—
তাপিছে বিলাপ স্বরে সুনীল অম্বরে।

(১০)

পড়িয়া হৃদয়ে তোর তপ্ত অশ্রুকণা,
অনন্ত তরঙ্গে পশি,
অনন্ত প্রবাহে মিশি,
অনন্ত সাগর বক্ষে হারায় আপনা ?
অথবা হৃদয়ে তোর,
শোকের প্রবাহ ওর,
ক্ষণকাল তরে, হায় উপজে বেদনা,
জিজ্ঞাসি তোমায় মাতঃ, স্বরূপ কহনা।

(১১)

ঐ যে বিলাপ-ধ্বনি উঠে অনিবার,
বায়ু রাশি স্তরে স্তরে,
গরল সঞ্চার করে,
সুনীল অম্বরে ভ্রমে করি হাহাকার।
আন্দোলিয়া বায়ু রাশি,
স্বকীয় অস্তিত্ব নাশি,
ক্ষণকাল পরে হয় বিনাশ তাহার ;
অনন্তের সন্নিধানে যায় না কি আর ?

(১২)

সাধি, মাতঃ, দয়া করি কহনা আমারে,
জীবের নয়ন জলে,
অনন্তের হিয়া গলে ?
দুখীর বিলাপ ধ্বনি কখন কি তাঁর—
চিরশান্তি নিকেতন,—
নির্ব্বিকার যাঁর মন,—
মহান্ হৃদয়ে করে করুণা সঞ্চার,
ক্ষুদ্রতরে মহা হিয়া গলে কি মা, আর ?

(১৩)

জীব কোলাহল পূর্ণ এই যে সংসার—
উগারিছে নিশি দিন,
শ্রবণে বিরাম হীন,
আনন্দ-উচ্ছ্বাস কত শোক-পারাবার।
উঠি কি ত্রিদিব লোকে,
হরিষে, বিষাদে, শোকে,
শব্দময় ব্রহ্মে লভে অনন্ত বিস্তার,
হয় কি অনন্ত হৃদে প্রতিধ্বনি তার ?

(১৪)

তুমি ত, মা, অন্তর্যামী জানত সকলি।
কহমা, কিসের বলে,
এবিশ্ব সংসার চলে,
দুখের আগার কি মা সংসার কেবলি ?
সৃষ্টি কি অশুভ ভার,
দয়াময় বিধাতার,
সুন্দর, এ নর-দেহ করিয়া ধারণ,
করিবে কি চিরকাল অশ্রু বরিষণ ?

(১৫)

হারাইয়া তব তীরে তিনটী রতন।
প্রতিদিন তব তীরে,
ভাসি নয়নের নীরে,
বাতুলের প্রায় হেথা করি অন্বেষণ—
নিতি নিতি আসি যাই।
দেখিবারে নাহি পাই।
লুকায়ে রেখেছ কি মা করিয়া যতন,
এতব সৈকতে মম হৃদয়ের ধন ?

(১৬)

তুইত মা, দেববালা সর্ব্ব-শক্তিমতী—
ইচ্ছাময়ী তুমি যদি,
কেন তবে নিরবধি,
অভাগারে পরিতাপ দেও নিতি নিতি ?
গলে না কি হিয়া তোর,
করুণ বিলাপে মোর,
পাষাণ-তনয়া তাই হেন আবরণ,
"দ্রবময়ী" নামে কি মা, কলঙ্ক অর্পণ ?

(১৭)

"হাবা ছেলে, জান নাকে বিশ্বের পদ্ধতি—
এই বিশ্ব-চরাচর,
ভীষণ আবর্ত্ত পর,
"আবর্ত্তে আবর্ত্তে তার শত পরিণতি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা।
পরমাণুরাশি তারা,
কাল শক্তি বশে ধরি অনন্ত আকার,
অনন্ত আকাশ পথে ছুটে অনিবার।

(১৮)

"জড় পরমাণু পূর্ণ অনন্ত গগন,
সমাধানে সৃষ্টি কয়,
বিশ্লেষে প্রলয় হয়,
অনন্ত বিনাশ তার নহে কদাচন।
একের বিনাশে হয় অন্যের সৃজন।

(১৯)

"বিশ্বের নিয়ম এই দেখরে চাহিয়া—
দেহের বিনাশ স্থলে,
অনন্ত শকতি চলে,
পঞ্চ তত্ত্বে পঞ্চ তত্ত্ব যায় মিলাইয়া।
জীব-ধ্বংস অবশেষে,
উদ্ভিদ্ পরকাশে।
উদ্ভিদ্ উপাদানে জীবের সঞ্চার।
এমন আবর্ত্ত কভু দেখিয়াছ আর ?

(২০)

"অনন্ত উন্নতি পথে ধাইছে সংসার,—
প্রথমে উদ্ভিদ্ কায়,
মহীরুহ লতিকায়,
বসুমতী দেহে ছিল অরণ্য-বিস্তার।
ক্রমে জীব প্রকাশিল,
সরীসৃপ দেখা দিল,
ক্রমে, কর, পদ আদি উপজিল তায়।
জীবের বিবর্ত্তোন্নতি শোভিল ধরায়!

(২১)

"বিশ্বের অনন্ত শোভা নিরখিতে হায়,
এই বিশ্বপতি যিনি,
সৃজিলা মানব তিনি,
জীবের উন্নতি সৃষ্টি রূপ প্রতিভায়।
এ প্রিয় সৃজন কিরে,
প্রলয় সাগর নীরে,
বিস্মৃতির অন্ধকারে লভিবে বিরাম,
এত উন্নতির কিরে এই পরিণাম?

(২২)

"গাইতে তাঁহার গুণ অনন্ত মহিমা—
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে,
তাঁরে ধন্যবাদ দিতে,
সৃজিলা মানব এবে উন্নতির সীমা,
ক্রমোন্নতিশীল জীব,
ক্রমে জীব হয় শিব,
কাটিয়া সংসার পাপ মোহময় মায়া,
অনন্ত প্রেমের স্রোতে ঢালি দেয় কায়া।

(২৩)

"জীবন মুকতি জীবে লাভ করে যবে,
বিষাদ না যায় পাশে,
সদা বিশ্ব প্রেমে ভাসে,
আত্ম-পরজ্ঞান তার লয় হয় তবে;
জনমে না পায় সুখ,
বিয়োগে না পায় দুখ,
অতৃপ্ত বাসনা নাহি করে হাহাকার,
বিষদন্তে দষ্ট সেই নহে কামনার।

(২৪)

"দেবত্ব মানব-ভালে যদ্যপি লিখন,
পরিহর পরিতাপ,
গৃহে ফিরে যাও বাপ,
করিওনা জীবনের শান্তি বিসর্জ্জন।
কহিওনা এ সংসার,
দুখময় কারাগার,
করিওনা কলঙ্কিত আমার জীবন।
অহরহ শোক-অশ্রু করি বিমোচন।

(২৫)

"অনন্ত বারিধি পথে নাবিক যেমতি—
চাহি ধ্রুব তারা পানে,
চলে রে অর্ণবযানে,
তেমতি তোমার হবে নিয়মিত গতি।
কর্ত্তব্যের পানে চাহি,
চালাইবে ধারাবাহী,
স্বকীয় জীবন-স্রোত অনন্ত সন্ধানে।
জীবনের অমরতা লভিবে সে স্থানে।"

শ্রীপ্রসন্ন নাথ রায়।

ভারতের অন্ধ ও মূক-বধির।

> Deaf, dumb and blind!
> What sorrows here combined
> To chain a deathless soul
> Ere it hath reached its goal.
> —Kate M. Farlow.

অন্ধ, মূক ও বধির মানব-সমাজের অশেষ কৃপাপাত্র। অপর মানবেরা প্রকৃতি-দত্ত যে সকল পরম প্রসাদ নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিয়া থাকে, ইহারা তাহার

সম্ভোগে বঞ্চিত। ক্রীড়াচঞ্চলা, শ্যামলা প্রকৃতির অনন্ত লীলালহরী ও জাগতিক অনন্ত দৃশ্যরাজী অন্ধের নয়নে প্রতিভাত হয় না। প্রাণিরাজ্যের বিচিত্র ভাষা, সুমধুর বিহগ-কাকলী, মানব কণ্ঠোচ্ছ্বসিত প্রাণারাম সঙ্গীতধ্বনি ও ঐকতান বাদন শ্রবণে বধিরের কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। মূকের রসনায় ভাষার উৎস উৎসরিত হয় না; তাহার অনন্ত সুখ দুঃখের ভাষা, উদ্বেলিত আবেগ ও ঘনীভূত বিষাদের কাহিনী, হৃদয়-সঙ্কটেই চিররুদ্ধ থাকে, তাহার চিন্তা ও ভাবরাশি জড়তার কঠোরাবরণ ভেদ করিয়া কদাপি ভাষায় অভিব্যক্ত হইতে পারে না। অন্ধ, মূক, ও বধির জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াও বিধাতার নিদারুণ অভিসম্পাত-গ্রস্ত। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল হতভাগ্য জীবের অবস্থা ও শিক্ষার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

জগতের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে,পুরাকালে ইহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। তৎকালে ইহাদের অভিশপ্ত জীবন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধতা ও স্তব্ধতার তিমিরেই পর্য্যবসিত হইত। সমাজ ইহাদিগকে নিদারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। ইহারা নরজন্ম লাভ করিয়াও সাধারণ মানব সমাজের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইত। এমন কি, কোন কোন স্থলে ইহারা স্নেহাধার পিতা ও করুণারূপিণী জননীর স্নেহলাভেও বঞ্চিত হইত। ফ্রান্স দেশে কোন পরিবারে কোন মূক, বধির কিম্বা অন্ধ শিশুর জন্ম হইলে, পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাহা নিতান্ত অসম্মানসূচক জ্ঞান করিতেন। এই সকল দুর্ভাগ্য শিশু অতি সন্তর্পণে, মানব চক্ষুর অন্তরালে, লোকালয় হইতে দূরে, কোনও আশ্রমে নির্ব্বাসিত হইত এবং ভীষণ অবরোধে রুদ্ধ হইয়া আপনাদের চিরদুঃখময় জীবন যাপন করিত। কোন প্রকার শিক্ষা দ্বারা যে এই সকল দুর্দ্দশাপন্ন জীবের শারীরিক কিম্বা মানসিক অবস্থার কিয়ৎ পরিমাণেও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব—ইহা তখন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন কি, তাৎকালিক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, মূক ও বধিরদিগকে কোন প্রকার শিক্ষা প্রদান করা অসম্ভব। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে যে ভাষা শিক্ষা করা যাইতে পারে না—ইহাই তাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার ছিল। এ বিষয়ে ইউরোপীয় জন সাধারণের হৃদয়ে যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা লুক্রেশিয়াসের কবিতায় পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

To instruct the deaf no art could ever reach,
No care improve them and no wisdom teach.

তৎকালে মূক ও বধির শিশুর পিতা মাতারাও এই সার্ব্বজনীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সন্তানগণের শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। কালক্রমে এই ভ্রান্ত সংস্কার কোন কোন দেশে এরূপ অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল যে, কোন বালক বালিকা তিন বৎসর বয়সেও কথা বলিতে না পারিলে কিম্বা কাণে শুনিতে না পাইলে, তাহাদিগকে মুকুলেই বিনষ্ট করা হইত। কোন উপায়ে যে ইহাদের দুঃখময় জীবনের দুর্ব্বহ দুঃখভার লঘু হইতে পারে—ইহা তদানীন্তন মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর ছিল। এই জন্যই পুরাকালে, এমন কি,

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও মূক, বধির ও অন্ধদিগের শিক্ষার উপায় বিধানের জন্য ইউরোপে কোন চেষ্টাই হয় নাই। কিন্তু এককালে যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত, আজি বিজ্ঞান বলে তাহাই সম্ভবপর হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানব সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের জ্যোতিতে আজি জগতের দুঃখ ও অভাব-তিমির বিদূরিত হইতেছে। যে মূক, বধির ও অন্ধদিগকে শিক্ষা প্রদানের বাসনা একদিন অলীক কল্পনা বলিয়া উপহসিত হইত, আজ সেই সকল হতভাগ্য জীব শিক্ষা ও অনুশীলন প্রভাবে অভাবনীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়া অনেক পরিমাণে মানব সমাজের দুঃখ ও দৈন্যরাশির লাঘব করিতেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকা আধুনিক সভ্যতার জন্মভূমি, বৈজ্ঞানিক উন্নতির লীলাক্ষেত্র। এই সকল দেশের মনীষিগণ বিজ্ঞানবলে মানব জাতির দুঃখ, দুর্গতি ও অভাব মোচনের বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন। অন্ধ, মূক ও বধিরের দুঃখেও ইউরোপ ও আমেরিকার লোক-হিতব্রত-ধারীমহাত্মাগণ উদাসীন রহেন নাই। কিরূপে চির দুর্দ্দশাপন্ন অন্ধ, মূক ও বধিরের স্বাভাবিক অভাব সমূহ যথা সম্ভব বিদূরিত হইতে পারে, কিরূপে ইহারা অপর সাধারণের ন্যায় জ্ঞানের আলোক লাভে ও জগতের সুখ-ভোগে অধিকারী হইতে পারে, ইহাই বহুকাল হইতে তাঁহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে এই সকল পরহিতব্রত-পরায়ণ সদাশয় ব্যক্তির প্রযত্নে অন্ধ ও মূক বধিরের শিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সহস্র সহস্র অন্ধ ও মূক বধির এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাদিগকে যে ধনে বঞ্চিত করিয়াছেন, মানব আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধি-প্রভাবে তাহার অভাব নিরাকৃত করিয়া জগতকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করিতেছে। আমরা অদ্য এ স্থলে কয়েকটী বিদ্যালয় ও ইহাদের ছাত্রগণের সাফল্যের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। ইহা হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকার মূক বধির ও অন্ধদিগের অবস্থা কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মূক-বধির বিদ্যালয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে মূক ও বধিরদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন-নগরে একটী মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭১ সালের লোক সংখ্যা গণনার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৭৯২ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ১৫, স্কট্‌লণ্ডে ৫ ও আয়ার্লণ্ডে ৪টি মূক-বিধির শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ২০৩১ জন ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিত। যুক্তরাজ্যের যে সকল মূক ও বধির তৎকালে শিক্ষার আলোক লাভ করিয়া বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

শ্রেণী	ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	স্কট্‌লণ্ড
১। ব্যবসায়ী	১২০	২৬
২। গৃহস্থ	৩৭৬	৭৬
৩। বণিক	১১৮	৭০
৪। কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত	৭২৮	৩৪০
৫। শ্রমজীবী	২৯৯৫	৯২১
৬। অনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মোপজীবী	৭১৮১	৬৫৪
	মোট ১১৫১৮	২০৮৭

১৮৭৩ সালের আমেরিকার বার্ষিক বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে আমেরিকার ৩৫টী বিদ্যালয়ে ৪২৫৩জন ও কানাডার ৪টী বিদ্যালয়ে ২৯২ জন মূক-বধির ছাত্র শিক্ষালাভ করিত। আমেরিকার গবর্ণমেণ্টও এই সকল বিদ্যালয়ে প্রচুর পরিমাণ সাহায্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন। আমেরিকার কোন মূক-বধির শিক্ষালয়ের সরকারী কার্য্য বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানা ইন্‌ষ্টিটিউশনে বার্ষিক ৫০০০০ ডলার (বর্ত্তমান মূল্য ১৩০০০০ টাকা) সাহায্য প্রদান করিতেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা তৎকালে ১৮৬ জন ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৎসরে প্রতি ছাত্রের জন্য প্রায় ৭০০্ টাকা সাহায্য দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে গবর্ণমেণ্ট আরও ৪২৫০০ ডলার (১১২৫০০ টাকা) প্রদান করেন।

পৃথিবীতে যতগুলি মূক-বধির বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই বিদ্যালয়ে ৪৭ জন শিক্ষক আছেন এবং ৫০০ এরও অধিক মূক-বধির এখানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে গেলডেট্‌ কলেজ নামে একটী মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। যে সকল ছাত্র এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; এতদ্ব্যতীত অনেকে পত্র-সম্পাদক ও প্রকাশকের কর্ম্মে ব্রতী আছেন। একজন ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের সুপ্রীমকোর্টে ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন; কয়েকজন মূক-বধিরদিগের নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন, অপরেরা গবর্ণমেণ্টের সিবিলসার্ব্বিসে কার্য্য করিতেছেন।

অন্ধ-বিদ্যালয়।

Encyclopœdia Britannica পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে চারিটী মাত্র অন্ধ-বিদ্যালয় ছিল, এক্ষণে তাহার সংখ্যা ৫৩ হইয়াছে। এতন্মধ্যে স্কটলণ্ডে ৫টী ও ইংলণ্ডে ৪০টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কট্‌লণ্ড, আয়ার্লণ্ড ও ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্যালয়ে যথাক্রমে গড়ে ৭৬, ৬০ ও ৪৩ জন অন্ধ ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। যুক্তরাজ্যে ৩০০০০ অন্ধ আছে। তন্মধ্যে ২২৫০ জন বিদ্যা ও কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে।

ইংলণ্ডের রয়াল নর্ম্মাল কলেজই যুক্তরাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অন্ধ-বিদ্যালয়। ডাক্তর কেম্বেল (Campbell) এই কলেজের অধ্যক্ষ। তিনিও অন্ধ। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৬০। ছাত্রগণ সাধারণ শিক্ষা, শিল্প ও সঙ্গীত বিষয়ে সুন্দররূপে শিক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন যে, যে সকল ছাত্র এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা অন্যূন ৮৯ জন স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কিরূপ আশ্চর্য্য শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের লিখিত পত্র হইতে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা স্থানাভাবে অধিক পত্র উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। নিম্নে একখানি লিপির মর্ম্ম অনূদিত হইল:—

"শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল,—মহাশয়েষু

"১৮৯২ সালে কলেজ পরিত্যাগের পর আমি যে যে কাজ করিয়াছি, অদ্য তাহা সংক্ষেপে আপনার নিকটে বিবৃত করিতেছি। আমি প্রথমে জেনারেল মার্চ্চেণ্ট আফিসে টাইপ্ রাইটারের (Typist) কার্য্যে নিযুক্ত হই। সেখানে একজন পত্রের বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতেন, আমি তাহা লিখিয়া লইতাম। কোন কোন সময়ে আমাকে পত্র পড়িয়া শুনান হইত, আমি তাহা শুনিয়া যথাযথ উত্তর দিতাম। বাণিজ্য ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ এবং জনাকীর্ণ রাজপথ সমূহ পার হইতে অভ্যাস করিবার অভিপ্রায়ে আমি অবসর সময়ে কিয়ৎকালের জন্য সহরে বেড়াইতে বাহির হইতাম। ক্রমে ক্রমে অধিকদূর বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে সমস্ত সহর সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিল। এক্ষণে আমি সহরের যে কোন স্থানে যাইতে পারি। পথ চিনিতে আমাকে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। আমি কখনও কখনও পথহারা হইয়া যাইতাম। আমি তিনবার ক্যাব (cab) গাড়ীর ধাক্কা খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কোন বারই বেশী আঘাত পাই নাই।

১৮৯৫ সালে আমার ভ্রাতার সহিত সম্পত্তির দালালের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম। চিঠি পত্র লেখা, আফিসে লোক জনদের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং অন্যান্য আফিসে যাওয়া আমার কাজ ছিল। কোন বাড়ী কি আফিসের ঠিকানা বাহির করিতে হইলে আমার কেরাণী ডাইরেক্টরি খুলিয়া তাহা বাহির করিত এবং কোন্ রাস্তায় কতগুলি দ্বার, তাহা আমাকে বলিয়া দিত। আমি যখন একবার কোন আফিস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতাম, তাহার ঠিকানা যেন ভুলিয়া না যাই, তদ্বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিতাম।

এই বৎসরের প্রারম্ভে আমরা আমাদের কারবারকে লিমিটেড্ কোম্পানিতে পরিণত করিয়াছিলাম এবং আমি এই কারবারের খাজাঞ্চি নিযুক্ত হইয়াছিলাম। কখনও কাহাকে অচল মুদ্রা দেই নাই এবং অধিকতর সুখের বিষয় এই যে, নিজেও কখনও মেকি টাকা গ্রহণ করি নাই।

আমার আশঙ্কা হয়, আপনি আমার এই পত্রখানা খুব অহমিকা-পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমি যে কৃতীত্ব লাভ করিয়াছি, তজ্জনিত প্রশংসা আমার প্রাপ্য নহে। বিদ্যালয়ে যে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম—যে শিক্ষা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, কোন কাজই আমাদের পক্ষে দুষ্কর নহে—এই সফলতা সেই শিক্ষারই ফল। আপনি আমাকে যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যায়াম শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি এখনও সেই সকল ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া থাকি। আমি প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময়ে গাত্রোত্থান করি, তৎপরে শীতল জলে স্নান ও ডাম্বেল্ ব্যায়াম করি। ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই। অনন্তর প্রাতরাশ সমাপন পূর্ব্বক ৩ মাইল পথ হাঁটিয়া আফিসে যাই। সাড়ে ৯টা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত আফিসে কাজ করি। তারপর আবার হাঁটিয়া বাড়ী আসিয়া আহার করি এবং দিন ভাল থাকিলে দ্বিচক্রযান (Bicycle) লইয়া বেড়াইতে বাহির হই। আমি কয়েকবার সাইকল্ লইয়া ইউরোপ খণ্ডে বেড়াইতে

গিয়াছি এবং তাহাতে নিতান্ত আমোদ উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু আমার ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমি আপনার ন্যায় বাইসিকল্ লইয়া মণ্টব্ল্যাঙ্ক শিখরে আরোহণ এবং চক্রযানারোহণে ভূপ্রদক্ষিণ করি।" জে, এইচ্, মাইন্স্।

অপর কয়েকখানা পত্র পাঠে জানিতে পারা যায় যে, রয়াল নর্ম্মাল কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণের কেহ কেহ প্রচুর উপার্জ্জনক্ষম। ইহাদের একজনের বার্ষিক আয় ১০০০ পাউণ্ড (১৮৭৫০্ টাকা)। আর পি, মুর নামক একজন বৎসরে ১০৪ পাউণ্ড (১৩০০্ টাকা) এবং সি, এফ্, সেয়ার্স নামক আর এক জন অন্ধ বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড (২৫০০্ টাকা) উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

সার জে, ষ্টার্লিং ম্যাক্সওয়েল্ নামক পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক সভ্য এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষা ও তজ্জনিত উৎকর্ষ সম্বন্ধে গ্লাস্‌গো হেরল্ডে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম গৃহীত হইল :—

"যে শিক্ষা প্রণালী দ্বারা ছাত্রগণের স্বাধীনতা, কার্য্যকুশলতা ও স্বাস্থ্যের বিকাশ হয়, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্কুলে সূত্রধরের কার্য্য, সূচীকর্ম্ম, আদর্শানুযায়ী শিল্প, সন্তরণ-কৌশল, স্কেটিং (Skating) এবং ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রগণ বারজন মনুষ্য বহনোপযোগী সুদীর্ঘ দ্বিচক্রযান শ্রেণীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে শত শত মাইল ভ্রমণ করে। একজন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন লোক যান চালকের কার্য্য করে। আমি নিজে বিগত সপ্তাহে গ্লাস্‌গো প্রদর্শনীতে তাহাদের ব্যায়াম চর্চ্চা দেখিয়াছি।"

নিউজীলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার একটী ক্ষুদ্র দেশ। এই দেশের গবর্ণমেণ্ট জন সাধারণ স্বদেশীয় অন্ধগণের দুঃখ ও দুর্গতি মোচনে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ১৮৯৯ সনের New Zealand Official Year Book হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল :—

"১৮৯৬ সালে নিউজীলণ্ডে ৩৪৪ জন অন্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে ৩৭ জন অকৃলাণ্ড জুবিলী অন্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র উপনিবেশের প্রতি ৯জন অন্ধের একজন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াছিল।"

নিউজীলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট অন্ধদিগের শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অতি সমীচীন। উক্ত সরকারী বার্ষিক পুস্তিকাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রগণের পিতা মাতা হইতে যাহা পাওয়া সম্ভব, তদ্ব্যতীত আবশ্যক বোধে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি ছাত্রের জন্য বৎসরে গড়ে ২৫ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া থাকেন।

নিউজীলণ্ডে অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য ৩টী বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ পরিশেষে যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইতে হয়। নিম্নে ইহাদের একটী তালিকার কিয়দংশ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত করা গেল :—

"ব্যারিষ্টার—১ ; অন্ধদিগের শিক্ষক—২, সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক—১ ; দোকানদার- পুরুষ ৩, স্ত্রী-১, মোট—৪, কেরাণী ১ ; সাবান-প্রস্তুতকারী ১ ; সূত্রধর—৩ ; মালী—৪ ; খনির কার্য্যে নিযুক্ত—৩।

উপরে মূক, বধির ও অন্ধদিগের কথা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু

যাহারা বাক্, দর্শন ও শ্রবণ, এই ত্রিবিধ শক্তিহীন, তাহারাও যে শিক্ষা ও অনুশীলন প্রভাবে অচিন্তনীয় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, ইহা শুনিয়া সকলেই নিতান্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন। কেবল মাত্র মূক ও বধিরদিগের শিক্ষার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পরেও কাহার চিন্তাশক্তি এই সকল হতভাগ্য জীবের শিক্ষার কোনও উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হয় নাই। পরিশেষে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বোষ্টন-নগর-নিবাসী ডাক্তার স্যামুয়েল গ্রিড্‌লি হো লরা ব্রিগ্‌ম্যান নাম্নী একটী মূকান্ধবধির বালিকাকে অন্ধতা ও নিস্তব্ধতার তিমির হইতে জ্ঞানের আলোকরাজ্যে আনয়ন করিয়া জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। ডাক্তার হো-ই এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি যেরূপ অক্লান্ত উদ্যম ও সাহসে উদ্বোধিত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেরই থাকে। এই নূতন ও দুরূহ পথে অগ্রসর হইতে তাঁহাকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই সময়ে সার জেম্‌স্ ম্যাকিণ্টস্, সার টমাস ডিক্‌লডার্, সার এষ্টলি কুপার, বথান, ও ডুনাল্ড ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভূয়সী আলোচনা, বিচার ও গবেষণার পর এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই সকল হতভাগ্য জীবকে কোন প্রকার শিক্ষা প্রদান করা কিম্বা কোন উপায়ে ইহাদের মানসিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ডাক্তার হোর চিন্তাশক্তি আরও উর্দ্ধে প্রধাবিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে,যে যত্ন ও চেষ্টা করিলে এই সকল দুর্দশাপন্ন জীবকে শিক্ষাপ্রদান অসম্ভব হইবে না। তিনি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, অসীম ধৈর্য্যের সহিত বিবিধ প্রণালী পরীক্ষা করিলেন, অবশেষে তাঁহার জয় হইল। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় লরা ভাষার ব্যবহার ও চিন্তার মূল্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল। ডাক্তার হো এই জন্য জগতের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার নাম মূকান্ধবধিরের ইতিহাসে চিরকাল সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিবে। তাঁহার সাফল্য লাভের পর আমেরিকায় কয়েকটী মূকান্ধবধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮৬ সালের ২৮শে মে মেসাচুসেট্ প্রদেশে মূকান্ধবধিরের শিক্ষা প্রভৃতির সুবিধা বিধানার্থে একটী আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহার পর আরও কয়েকটী প্রদেশে এতদ্বিষয়ক বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে নিউইয়র্ক, ওহিও, ইলিনয়স্, দক্ষিণ ডাকটা,টেকসাস্, মিসিসিপি ও মেসাচুসেট, এই কয়েকটী স্থানে মূকান্ধবধিরদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

কিরূপে যত্ন ও অধ্যবসায় বলে দুর্ভাগ্য মূক, বধির ও অন্ধদিগের দুঃখান্ধকারময় জীবন সুখালোকে আলোকিত হইতে পারে, কিরূপে প্রকৃতির পরম প্রসাদে বঞ্চিত হইয়াও ইহারা সংসারের প্রায় সর্ব্ববিধ কর্ম্মের উপযোগী হইতে পারে, উল্লিখিত বিবরণ পাঠে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। ইহাদের অত্যাশ্চর্য্য সাফল্যের কাহিনী শ্রবণ করিলে হৃদয় যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হয়। যে সকল পরোপকারপরায়ণ মহাত্মাগণের যত্ন ও চেষ্টায় এই সকল দুর্দ্দশাপন্ন জীবের দুঃখরাশি বিদূরিত হইতেছে, তাঁহারা সর্ব্বথা মানব সমাজের

অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন, সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে অন্ধ ও মূক-বধিরের সংখ্যা বহু লক্ষ। Statistics পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক মাত্র বঙ্গদেশেই মূকবধিরের সংখ্যা ৭০০০০। বোম্বাই নগরে ইহাদের সংখ্যা ৫৫১; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৬০০০০ এরও উপর। সমগ্র ভারতবর্ষে মূকবধিরের সংখ্যা ২ লক্ষ ও অন্ধের সংখ্যা ৫ লক্ষ। কিন্তু ভারতের মূক-বধির ও অন্ধদিগের অবস্থা ইংলণ্ড, আমেরিকা কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ার অন্ধ ও মূক বধিরগণের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমাজ ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহারা আজীবন ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত ভাবে আপনাদের দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া থাকে। এই সুবিশাল দেশের লক্ষ লক্ষ অন্ধ ও মূক বধির নর নারীর জীবন কাহিনী এক নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ইতিহাস। ইহাদের অনেকেই অপরের গলগ্রহ হইয়া অতি ক্লেশে জীবন যাপন করে, অনেকেরই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ব্যতীত আর উপায় নাই। অনেক স্থলেই ইহাদের দুই বেলা দুই মুষ্টি উদরান্নের সংস্থান হয় না। অন্নপূর্ণার পীঠভূমি ভারতবর্ষে ইহারা অন্নহীন, দুর্ভিক্ষ ইহাদের নিত্য সহচর। এই যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষিত অন্ধের করুণ আর্ত্তনাদ, লক্ষ লক্ষ রোগ-ক্লিষ্ট মুমূর্ষু মূক বধিরের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস আকুল আবেগে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধে বায়ুস্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কে তাহা শ্রবণ করে? এই যে প্রতিদিন এইরূপ কত হতভাগ্যের অসহনীয় জঠর জ্বালা সর্ব্বসন্তাপহারী মৃত্যুর সুখালিঙ্গনে চিরশান্তি লাভ করিতেছে,.কে তাহার খোঁজ নেয়। ইহার কারণ এই যে, এ দেশে হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা অতি অল্প—জাতীয়ভাব ও জাতীয় প্রেমের একান্ত অভাব। স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর দুঃখ দুর্গতিতে এ দেশের লোকের হৃদয় সহজে ব্যথিত—বিচলিত হয় না। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এরূপ নহে। সেখানে জাতীয়তা আছে, সমাজ দেহে প্রাণ আছে, লোকের হৃদয় আছে। সেখানকার লোকেরা স্বদেশীয়ের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না।

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যেরূপ সহস্র অন্ধ ও মূক বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে, ভারতবর্ষে কি তাহা সম্ভবপর নহে? নিউজীলণ্ডের মুষ্টিমেয় লোক যাহা করিতেছেন, ভারতের কোটী কোটী লোক কি তাহা করিতে পারেন না? কিন্তু এ বিষয়ে ভারতের জন সাধারণ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। ভারত-গবর্ণমেণ্টও যে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু করিয়াছেন, এরূপ জানা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জীবিত কালে মিষ্টার মেগিনোর অক্লান্ত চেষ্টায়, ভারতবর্ষের মূক বধিরদিগের শিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য, ভারত গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রায় ৬০০০ মূক-বধির এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে, জানিনা। ফল যাহাই হউক না কেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ অন্ধ ও মূক বধিরের দুর্দ্দশা মোচনে যত্নপর হওয়া যে গবর্ণমেণ্ট ও জন সাধারণ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, উপযুক্ত শিক্ষায় ইহাদিগের অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইতে পারে এবং ইহাদিগকে সংসারে প্রায় সকল প্রকার কার্য্যেরই উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সত্য বটে, অন্ধ ও মূক বধিরদিগকে শিক্ষা দিতে জানে, এদেশে এরূপ লোক অধিক নাই। এতদুদ্দেশ্যে কয়েক জন যুবককে ইংলণ্ড কিম্বা আমেরিকায় প্রেরণ করা উচিত। তাঁহারা শিক্ষাদান প্রণালী আয়ত্ত করিয়া আসিয়া ভারত-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, ভারতের অন্ধ ও মূক-বধিরদিগের দুর্দ্দশা নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে বিদূরিত হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রাহা

সুয়ারাণী।

প্রিয়তম !
কার সাধনার ধন দিলে সাধি কারে,
না জানি সে হতভাগী,
এ নিধি পা'বার লাগি,
কত বার কাঁদিয়াছে দেবতার দ্বারে !—
জগতের রত্ন ধন,
দিতে পারে বিসর্জ্জন,
জগতের নব সুখ পারে ঠেলিবারে !—
তার সে অমূল্য নিধি দিলে তুমি কারে ?

২

কে আমি, অজানা নারী অচেনা হৃদয়,
জানি নাই ভালবাসা,
ছিল না কামনা, আশা,
শিখি'নি প্রেমের লীলা—প্রাণ বিনিময় !
আমারে আপনি খুঁজি,
দেবীর আদরে পূজি,
কেন নিলে মন্ত্র পড়ি নির্ম্মম নির্দ্দয়,
আমি তো অজানা নারী অচেনা হৃদয় !

৩

তথাপি আমারে দিলে হিয়া প্রাণ মন,
সেধে সেধে আপনারে,
বিকাইলে একেবারে,
মরমে গড়িলে এক আনন্দ স্বপন !
আমারি সৌন্দর্য্য-স্রোতঃ
মনে প্রাণে ওতপ্রোত,
প্রাণের আরাধ্য শুধু আমারি মিলন !—
ছি ছি ছি কৃতঘ্ন এত পুরুষের মন !

৪

বিমুখী বালিকা আমি সদা উদাসীনা,
আমি চাহি মা'র কোল,
ভাই বোনে তুচ্ছ গোল,
আমি চাহি ক্ষেমী, পুঁটী, ঘোষেদের বীণা;
চাহি সে দু'পর বেলা,
লুকাইয়া তাস খেলা,
চুপে চুপে গান গাই, ঠিক হল কিনা,
আমি চাহি সেই সুখ—তোমারে চাহিনা।

৫

আমারে বাঁধিলে তুমি দিয়া কত ফাঁসী,
মাথায় ঢাকাই ফুল,
কাণে সে হীরার দুল,
সোণালী জ্যাকেট বডী, এসেন্সের রাশি,
ফল, ফুল, পাখী কত,
খেলানা সহস্র শত,
রবি বর্ম্মার ছবি কমল-বিলাসী !
এসব কত কি দিয়া,
আরো দিলে বুঝাইয়া,

"তোমারে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি,
পাগল করেছে মোরে অই রূপ রাশি!"

৬

হায় রে তোমারি তরে সে যে পাগলিনী,
তুমি তার প্রিয়তম,
প্রাণের দেবতা সম,
নয়নের আলো রেখা, জীবনে জীবনী!
তোমারে হইয়া হারা,
নেত্রে তার শত ধারা,
বিরাট শ্মশান তার বিশাল মেদিনী,
তোমারি সে হতভাগী প্রেম-পাগলিনী।

৭

সন্ধ্যাবেলা যূথি বেলা করিয়া চয়ন
আন মনে গাঁথে হার,
অমনি স্বপন তার,
ভেঙে যায়, পুড়ে যায় কুসুম কানন!
কভু বা পোহায় রাতি,
ফুলের বিছানা পাতি,
উছলিত অশ্রু জলে ভিজায়ে বসন,
ভালবাসা গেল যদি কি লাগি জীবন!

৮

কত সাধ আশা তার গিয়াছে মরিয়া,
প্রেমের শ্মশান-মাঝে
যৌবনে যোগিনী সাজে,
অভাগী রয়েছে শুধু মরণে স্মরিয়া;
যে দিকে ফিরায় আঁখি,
দেখে সব শূন্য ফাঁকি,
প্রাণের বাঁধন হায় গিয়াছে ছিঁড়িয়া,
অভাগী রয়েছে বেঁচে মরণে ভাবিয়া!

৯

কিবা চাও প্রিয়তম, কিসে সাধ আশা?
কি ছিল না তার কাছে,
বল কি আমাতে আছে,
মিটাইতে এলে কোন নির্ম্মম পিপাসা?
এ রূপ সৌন্দর্য্য মম,
দংশিছে ভুজঙ্গ সম,
কি যে ব্যথা কি যে জ্বালা নাহি জানি ভাষা
আশ্বাসে বিশ্বাসে আহা,
সে তোমা দে'ছিল যাহা,
সেই যে অমরাবতী, অমৃত-বিপাসা,
আর না কোথাও পাবে,
দিন রাত্রি বহি যাবে,
পাবে না সে স্নেহ নীড়, আরামের বাসা,
দুজনে কাঁদিব, ভাবি পুরিল না আশা!

১০

কার সাধনার ধন দিলে তুমি কারে,
পাইতে তোমারে স্বামী,
সাধিনি, কাঁদিনি আমি,
রহিনি কো অনশনে ঠাকুরের দ্বারে;
ছিঁড়িনি মুকুতা মালা,
ভাঙিনি হীরার বালা,
ছোটেনি বুকের রক্ত আঁখির আসারে!—
তবে কেন হেন খেলা,
প্রাণ নিয়ে পায়ে ঠেলা,
এ বিশ্বাসঘাতকতা দানবে কি পারে?
তার সেই আর্ত্তশ্বাস,
তার সেই সর্ব্বনাশ,
তার সে দলিত হিয়া পিষিছে আমারে!—
আতঙ্কে কম্পিত হৃদি,
সত্য কি আমারে বিধি,
গড়িলা রাক্ষসী রূপে প্রেমের সংসারে,
কে আমি, কি আমি, নাথ, সুধিব কাহারে?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

রাজসিঙ্ [রাজসিংহ]

মহারাণা জগৎসিঙ্, যে 'মার্বার্' রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ২ (দুইটী) পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হিন্দুর রাজ-নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ—"রাজসিঙ্ই" মিবারের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মিবার-রাজ্যে যে শান্তিদেবী, বহু দিন হইতে, বিরাজ করিতেছিলেন, রাণা রাজসিঙের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই, সহসা তাঁহার অন্তর্ধান হইল। অলঙ্ঘনীয় ঘটনা-বৈচিত্র্যে রাজ্যের পূর্ব্বাবস্থা, অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইল! অশান্তির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, সমগ্র মিবারের চতুষ্পার্শ্বে দেখা দিল!

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি, পুনঃ-প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কেবল মিবার কেন? সমগ্র রাজবারা, ঘোরতর ভয়ঙ্কর অশান্তির আলয় হইয়া উঠিল। রাণা রাজসিঙ্, এই বিষম বিবাদের মূলীভূত হেতু বলিয়া, অনুমিত হইলেন।

ভট্ট-গ্রন্থে স্বীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের অলৌকিক বীরত্বের বহুল বৃত্তান্ত, বিলক্ষণই তিনি জ্ঞাত হইলেন। রাজসিঙ্, বাল্যকাল হইতেই, স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরবের ও গরিমার পুনরুদ্ধারসাধনে চির-দিনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিলেন। প্রতিজ্ঞার ও সাহসের দৃঢ়বন্ধনে হৃদয়, আবদ্ধ করিয়া, যিনি, পবিত্র, কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন,—তাঁহার মনোরথ, পূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হয় কি? রাজসিঙ্, যেমনই সাহসী—তেমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সুতরাং, অচিরে তদীয় সঙ্কল্পও সুসিদ্ধ হইল। তিনি আশৈশব আওরঙ্গজেব্‌কে ঘৃণাপূর্ণ নয়নে অবলোকনে অভ্যস্ত। অনুক্ষণ তদীয় অনিষ্ট-সাধনের উপায়-চিন্তনের নিমিত্ত তাঁহাকে দৃষ্ট হইত।

এক্ষণে আওরঙ্গজেব্‌কে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরূঢ় দেখিয়া, তিনি তদ্-বিরুদ্ধে তরবারি-ধারণে কৃতপ্রতিজ্ঞ।

মার্বারের "রাঠোর"-কুল, নানা শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে একতম শাখা, স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক "রূপনগর"-নামক স্থানে উপনিবিষ্ট হইলেন। সেই 'রূপনগর' মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত। এইজন্য রূপনগরের রাজাকে মোগলের অধীন সামান্য সামন্ত-স্বরূপ অবস্থিত হইতে হইত। আওরঙ্গজেবের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্প কাল পরেই, রূপনগরের সামন্ত-রাজের "প্রভাবতী"-নামক এক পরম রূপবতী বালিকার অপূর্ব্ব অনুপম রূপলাবণ্য, তদীয় শ্রুতি-মূলে উপনীত হইল। শ্রবণ-মাত্রই সেই রমণীরত্নকে হস্তগত করিবার কারণে তাঁহার কত মত প্রকারের ঐকান্তিক যত্ন চলিতে লাগিল!

রাণাগণের অভিষেক-কালে যে সকল বিধির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তন্মধ্যে "টিকাতোর"—বিশেষ বিখ্যাতি-বিশিষ্ট। বহুল কালাবধি এই ব্যবস্থা, সমাচরিত হয় নাই। মহারাজ রাজসিঙ্, মিবারের সিংহাসনে সমারূঢ় হইবার অব্যবহিত পরেই, সেই বিলুপ্তপ্রায় বিধানের পুনরুজ্জীবন সমাধান করিলেন। এই প্রথানুসারে রাণা কর্ত্তৃক আজমীরের নিকটবর্ত্তী 'মানপুর' নগর আক্রান্ত হইল। যেমন আক্রমণ—তাহার ফলও, তেমনই ফলিল। নগরের লুণ্ঠন

কার্য্যও, অত্যাশ্চর্য্য রূপে সমাহিত হইয়া গেল! তৎপরেই তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। অবিলম্বে ঐ ভয়ঙ্কর সমাচার, স্থবির রাজাধিরাজ শাহ্‌জঁহার কর্ণগোচর হইল। তাঁহার অনুচর-বর্গ কর্ত্তৃক, এতদ্‌বৃত্তান্ত, নানা বর্ণে অতিরঞ্জন পূর্ব্বক সম্রাটের সন্নিকটে উপস্থাপিত হইল! তদীয় কোপের মাত্রা, সংবর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু, উদারান্তঃকরণ শাহ্‌জঁহা, সেই বিষম বিসংবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ মহাপ্রতাপ "প্রতাপ-সিঙের" সঙ্গেই রাজপুত-কুল-গৌরব, এক প্রকার প্রলুপ্ত হইয়াছিল।—তখন "রাজসিঙের" রাজ্যাভিষেক হইতে সেই বীর্য্যবত্তার পুনর্বিকাশ হইল। এতাবৎ কাল 'শিশোদীয়' সর্দ্দার-বৃন্দ, শান্তির সুধা-সি[illegible] সুষমা-সম্পন্ন ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, কালযাপন করিতেছিলেন। রাজসিঙের সিংহাসনাধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও, কুলোচিত কার্য্যপ্রদর্শনে উন্মত্ত হইয়া ও অধীরভাবে উত্তেজিত হইয়া, ভীষণ সিংহনাদে 'মিবার'-ভূমি, প্রকম্পিত করিলেন। রাণা 'রাজসিঙ'—'বাপ্পা রাওলের' যোগ্য বংশধর। 'শিশোদীয়' বংশের যথাযোগ্য শূর—উপযুক্ত মহাবীর—মহান্‌ জন—তিনি ছিলেন।

অচিরাৎ বিবাহ-প্রস্তাব সহিত রূপনগরের সামন্ত-রাজের সমীপে ২,০০০ (দুই সহস্র) অশ্বারোহী, প্রেরিত হইল।

"প্রভাবতীর" পিতাকে সেই বিভীষণ বার্ত্তায় সাতিশয় বিচলিত করিয়া দিল! উপস্থিত ভয়াল বিপজ্জাল হইতে, কিরূপে উদ্ধারলাভ করিবেন,—তিনি, তাহার কিছুরই অবধারণে সমর্থ হইলেন না। উত্তরোত্তর এই সমাচার, "প্রভাবতীরও" কর্ণগোচর হইল। তদ্দণ্ডেই পিতাকে আপতিত আপদ্‌ হইতে উদ্ধারের উপায়-উদ্ভাবনে অনুরোধ-প্রস্তাব, উত্থাপিত হইল। 'রাঠোর'-সামন্ত—ভয়ে ও বিস্ময়ে, এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দুহিতার কথার, তিনি কোনই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া, "প্রভাবতীকে" স্বয়ং উপযুক্ত উপায়-উদ্ভাবনে উদ্যোগিনী হইতে হয়।

"প্রভাবতী" প্রথমে আপনার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি তাকাইলেন। সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি এক জন সহায়-সম্পত্তি হীন সামান্য সামন্তের তনয়া। তবে কি তিনি মার্‌বার্‌-রাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন? মারবার-পতি, সম্রাটের অধীন। এই অবস্থায় তিনি দিল্লীশ্বরের উদ্দেশ্যসাধনের ব্যাহন্তা হইতে পারেন না। অগত্যা কাহারও নিকট কোনপ্রকার সাহায্য লাভ করা, এককালে অসম্ভব। কে, স্বেচ্ছায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অসি-ধারণ পূর্ব্বক আপনার অনিষ্ট করিবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, প্রভাবতী—স্থির করিলেন, কোনই উপায় নাই। ধর্ম্মপারায়ণ বাদশা শাহজঁহা, তখন বিষম বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত।

মোগল-সম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া, তাঁহার পুত্র-চতুষ্টয়ের (দারা, সুজা, মোরাদ ও আওরঙ্গজেবের) মধ্যে অন্তর্বিপ্লব-বহ্নি, বিলক্ষণ প্রধূমিত। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহারা প্রত্যেকেই, অনেক অসদুপায়ে মোগল-সিংহাসনকে করায়ত্ত করিতেই, সচেষ্ট। সেই ভয়ঙ্কর বিগ্রহ-বহ্নিতে ভারত-ভূমি, বিদগ্ধ হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে অনেক হতভাগ্যের জীবন-লীলারও পরিসমাপ্তি। দুরভিসন্ধি-সিদ্ধির উদ্দেশে তাঁহারা

চারি (৪) জনেই, রাজস্থানের নৃপতিবৃন্দের সাহায্যপ্রার্থী। 'রাণা রাজসিঙ্ও', সেই সূত্রে আমন্ত্রিত। দারা, সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুসলমানের শাস্ত্রানুসারে তিনিই-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁহারই পক্ষাবলম্বনে রাণা রাজসিঙের প্রবৃত্তি, উদ্রিক্ত হইল। দারার পক্ষ-সমর্থনে তিনি উদ্যোগী,—এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হইবামাত্রই রাজস্থানের অন্যান্য ভূপতিও, দারারই পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু, জয়শ্রী, কূট-নীতিজ্ঞ আওরঙ্গজেব্কেই আশ্রয় করিলেন। ইতিহাস—এ কথা, যথেষ্ট স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছে।

আওরঙ্গজেব্, রাজলক্ষ্মী হস্তগত করিয়া, যাঁহারা তাঁহার সুখের পথের উৎকট কণ্টক-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ, পূর্ণও হইল। দুরাকাঙ্ক্ষার ও রাজ্যলিপ্সার বশীভূত হইয়া, যিনি পরমারাধ্য পিতৃদেবের বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন—যিনি রাজ্যলোভে ভ্রাতৃগণের বিনাশ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন—তিনি যে, অন্যের সর্ব্বনাশ-সাধনে উদ্যত হইবেন—এটা, একটা স্বতঃসিদ্ধ কার্য্য, কি নহে? কিন্তু, এই অদূরদর্শিতার ফলে, আওরঙ্গজেব্, আপনার ভবিষ্য বংশধরগণের মঙ্গল-তরুর মূলে যে সাংঘাতিক কুঠারাঘাত করিলেন—তখন তাহা, তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মোগল-কুল-চূড়ামণি উদারচেতাঃ অক্বর্, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিত্যাগ পুরঃসর—হিন্দুরাজগণের সহিত দুশ্ছেদ্য-প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই উদার-রাজনীতিবলে তিনি নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্ব, সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই নীতির অনুসরণে তাঁহার উত্তরাধিকারী জহাঁগীর এবং তৎসুত শাহজ্হাঁ, দিল্লীর সিংহাসনকে অচলতুল্য অটল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, কুটিলমতি আওরঙ্গজেবের বুদ্ধিতে সেই গরীয়সী রাজনীতির বিন্দুপ্রমাণ স্থানও ছিল না। সুতরাং, আওরঙ্গজেব্, অদূরদর্শিতা-দোষে আপন পদে আপনিই বিষম শাণিত ভীষণ কৃপাণ প্রহার করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই প্রভাবতী, রাণা রাজসিঙের গুণবর্ণন শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজসিঙ্, সমুদায় রাজগুণে সমলঙ্কৃত। রাণার গুণ-গরিমার বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে, “প্রভাবতী’, অচিরে রাণার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিত থাকিল,—যদি রাণা, এই সঙ্কটে উদ্ধার না করিয়া, তাঁহার পাণি-গ্রহণ করেন—তাহা হইলে, তিনি আত্মঘাতিনী হইয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন।

যথাকালে পত্রখানি, রাণা রাজসিঙের হস্তগত হইল। তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া 'প্রভাবতীর' উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন। তৎক্ষণাৎ দুরাচার আওরঙ্গজেবের হস্ত হইতে তাঁহার সমুদ্ধারসাধনে তাঁহাকে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইল। রাণা রাজসিঙ্, প্রতি মুহূর্ত্তেই সম্রাটের অসদ্ব্যবহারের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে প্রস্তুত। দৈবাৎ সেই সুযোগ পাইয়া,তিনি আত্যন্তিক আনন্দিত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহস ও উৎসাহ, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ঐকান্তিক বৃদ্ধি। দেবোপম পূর্ব্বপুরুষগণের অসীম-গুণ-গরিমা, যবন-হস্তে বিনাশিত হইয়াছে। প্রাণাদপি গরীয়সী স্বাধীনতার লীলাস্থলী পবিত্র মিবার-রাজ্য, 'জায়গীর'-নামে কল-

ক্ষিত! মনস্বী তেজস্বী বীরসিংহ রাণা রাজসিংহ [রাজসিঙ্], নিজ-করে শাণিত-কৃপাণ-ধারণে সেই বিলুপ্ত গৌরবের—অসীম গরিমার পুনরুদ্ধারে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। তদীয় প্রচণ্ড উৎসাহে ও উদ্দীপনায় তাঁহার সর্দ্দারেরা ও সোনানীগণ, উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই, তদানীং ভীষণ রণক্ষেত্রে রাণার অনুসরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

“প্রভাবতীর” উদ্ধার-সাধন, রাণার প্রথম কর্ত্তব্য। তিনি সর্দ্দারবর্গের ও সেনানীগণের সঙ্গে রূপনগরাভিমুখে অভিযানে উদ্‌যুক্ত হইলেন। ‘আরাবল্লী’-শৈল-মালার পাদ-দেশে উক্ত সুন্দর নগর, সংস্থাপিত। রাণা রাজসিঙ কর্ত্তৃক সেই অদ্রি রাজ-রাজির বিশাল তল-স্থল অতিক্রান্ত হইল; বিপুলবিক্রমে মোগল-বাহিনী, আক্রান্ত হইল! হিন্দু-মুসলমানে বহুল ক্ষণ ব্যাপিয়া, যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু, মোগল-যোদ্ধৃগণ, রাণার প্রচণ্ড প্রতাপে পর্য্যুদস্ত, পরাজিত ও নিষ্পিষ্ট হইল। মোগলের অনধিক-সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত-সমস্ত, অতি কষ্টে তখন রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন-পরায়ণ! রাজসিঙ্, বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ লাবণ্যবতী “প্রভাবতীকে” পাইয়া, তৎপরেই স্বরাজ্যে প্রত্যাগত। রাণার এই অমানুষী শক্তির ও বীরত্বের অভিনয়-সন্দর্শনে সমগ্র রাজপুত-জাতীয় সমিতি, অতীব প্রীতিপ্রাপ্ত। তিনিই মহাতেজাঃ “প্রতাপ-সিঙের” উপযুক্ত বংশধর বলিয়া, শত মুখে প্রশংসিত হইলেন। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রতিকূলে রাণার অস্ত্র-ধারণ—এই প্রথম। মিবার নিবাসি-গণ, রাণার উদ্দেশ্য-সমাধানে ও সাফল্য-দর্শনে, মনে মনে কত আশাকেই হৃদয়ে পরিশেষে, নিঃশেষিত ভাবে—অস্বার্থ ভাবে—পোষণ করিল! এবং নবীনা রাজ্ঞী, সমান-সম্ভ্রম-সহকারে সুরম্য-রূপে যথাযথ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক সাহ্লাদে নরপতির বিশাল-তম নিলয়ে অভ্যর্থিত হইলেন!

মার্‌বার্-রাজ ‘যশোমন্ত সিঙের’ পুত্র-পুত্রীদিগের সংখ্যা, তালিকায় অনেকগুলি। সেগুলি যে, নিতান্ত অনল্প-সংখ্যক—তাহা নহে। অজিতসিঙ, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ। কুটিল-মতি কু-চক্রী আওরঙ্গজেব্, বিষপ্রয়োগে বিষম ভাবে—যশোমন্তের উচ্ছেদ সাধন করিলে, অ-পরাজিত “অজিত”তখন শিশু। ‘মারবার’-মহিষী, অন্তরের অন্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে স্থির বুঝিলেন,—অপ্রাপ্ত বয়স্ক ‘অজিত’কে মোহন সিংহাসনে বসাইয়া, স্বয়ংই, রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, এই আশয়েই—আগ্রহেই—পতির অনুসরণ করেন নাই। পতির পরলোক-গমনে কেমনে কিন্তু, তিনি স্বামি-শোক-সংবরণ করিবেন? শোক, বিস্মৃত না হইতেই, তাঁহাকে পুত্র-রত্নে বঞ্চিত হইতে হয়! তিনি তৎকালে আত্যন্তিক বাহুল্য-ভাবেই—সমাকুল। কঠোর রূপেই তিনি কাতর। অগত্যা, কার্য্যতঃ অনন্যোপায় হইয়া, সর্ব্বশেষে তাঁহাকে, রাণা রাজসিঙের সু-কুমার-কোমল করে আত্ম-সমর্পণানন্তর আশ্রিত ও শরণাপন্ন হইতে হইল। গুণাংশে গরীয়সী মহীয়সী মহারাজ্ঞীর, শিশোদীয় কুলে জন্ম। এক্ষণে সেই কুলের গরিমার ও মহিমার একমাত্র রক্ষক—বীরবর রাণা ‘রাজ-সিঙ’। মারবার-মহিষী, আপনার বিদ্যমান বিপত্তির বিষম বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইবার পরে, বিশ্বস্ত-দূত-হস্তে তেজস্বী, মনস্বী মহামানুষের (রাণার) নিকট লিপি, লিখিত ও প্রেরিত করিলেন। রাণা রাজসিঙ্, তাঁহার

প্রস্তাবে প্রধানতঃ প্রস্তুত ও পরে সম্যক্—সম্মত হইলেন এবং কোমল-প্রকৃতি সু-কুমার—সুতরাং,সুন্দর-শরীর রাজকুমারদিগকে রক্ষা করা, কর্ত্তব্য জ্ঞানের অন্যতম করণীয় ক্রিয়া-জ্ঞানে শুভদিনের উপেক্ষা পূর্ব্বক ক্ষণ-বিলম্ব-ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে মারবার হইতে মিবারে স্থানান্তরিত করিতে, কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তখন বাসোপযোগী ভবন নির্দ্দেশিত হইল।

অতঃপর সার্দ্ধ-দ্বিশত (২৫০) মহাবল রাজপুত-সমভিব্যাহারে ‘মার্‌বারের’ রাজকুমার অজিতসিঙ্, মিবারে শুভাগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা ‘আরাবল্লী’-পর্ব্বত-মালার দুর্ভেদ্য ও জটিলতা-সঙ্কুল, কুটিল ও উৎকট, ভয়াল ও কূট—বর্ত্মের সন্নিকটে বন্ধুর অভ্যন্তরাঞ্চলে উপনীত হইলে, হঠাৎ একদল মোগল-চমূর চমৎকার-জনক সুকৌশল-সমাকুলা অনীকিনী, যুদ্ধস্থলে সম্পূর্ণ একদল সুশিক্ষিত সেনানী ও অগণ্য সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। সেই সংকীর্ণ অবিস্তীর্ণ অপ্রশস্ত মার্গ-সমস্ত-বিশিষ্ট গিরি-বর্ত্মের অভ্যন্তরকেই—মনে মনেই—সুপ্রশস্ত মনে করিয়া লইলেন। রাঠোর ও মোগলসৈন্যের,—দলে দলে বল-বহুলাবাহিনী-সকলের অনেক ক্ষণ ধরিয়া, বহুল স্থলে যুদ্ধ চলিল! বিলক্ষণ-ভীষণ-তনু মোগলসেনা, অজিতসিঙ্‌কে হরণ করিবার উদ্দেশ্যেই সুন্দর রূপেই অবরোধ করে। কিন্তু, অমিতশক্তি অজিতসিঙ্, নিজের শরীর-রক্ষিগণের সঙ্গে রহস্যোদ্রেক-কর রঙ্গ-ভঙ্গে অবাধে নির্বিবাদে নিরাপদে—নির্ব্বিঘ্নে—সেই ক্ষণে মিবারে পৌঁছিলেন। অধিকন্তু—পরাক্রমী,বিক্রমী, সুরোপম রাঠোর, কঠোরান্তর অসুর-সম যবন-সেনাগণের যাতায়াতের গতি-বিধির বিবিধ বিধানের সুব্যবস্থায় আস্থা-স্থাপনের যথোচিতই প্রতিরোধ করিল! তাহারা বস্তুগত্যা ‘অজিতের তুল্য নহে—না, তাঁহার তুল্য মূল্য নয়;—তাহা অমূল্য—মূল্যহীন নহে—মহামূল্য। অসহৃদয়ের হৃদয়, কবেই বা কে-ই বা, সরস দেখিতে পায়? বীরের অন্তরাগার—ভয়ঙ্কর, অন্ধকার-ময় অ-সুন্দর কারাগার-বৎ কঠোর। রাজকুমার ‘অজিত-সিঙ্’ মিবারে উপস্থিত হইলে, রাণা “রাজসিঙ্” তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিলেন। ‘কৈলবর’-জনপদের রাজভবন, তাঁহার বাসার্থ নির্দ্ধারিত হইল। ‘দুর্গাদাস’-নামক জনৈক সাহসিক রাজপুত-বীর, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। মার্‌বার্-মহিষী, অপ্রতিম অধ্যবসায়প্রভাবে তথায় কয়েক দিবসমাত্র থাকিয়া, স্ব-রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি, বিশ্বাসঘাতক যবন-রাজকে রীতিমত উপযুক্ত প্রতিফল-প্রদানের উপায়-উদ্ভাবনে উত্তম উদ্যুক্ত। মহিষীর উদ্যোগও, অবিলম্বে-অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইল। ‘মিবার’ ‘মারবার’ ‘অম্বর’—জনপদ-ত্রয়, একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া, দুর্দ্দর্ষ-যবন-নৃপতির বিরুদ্ধে শাণিত কৃপাণাদি—অসি ও অস্ত্র-শস্ত্র—ধারণ করিতে, প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয়—এই সমানুভূতি, দীর্ঘ-কাল-স্থায়িনী হইতে পারে নাই। অচিরাৎ ‘শিশোদীয়’ ‘রাঠোর’ ‘কুশাবহ’ এই সব গোত্র-গৃহে পূর্ব্ব-বৎ বিদ্বেষ-বহ্নির বীজ, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল!

নিষ্ঠুর কঠোর-প্রাণ মোগল-সম্রাট্—অধর্ম্মাচরণে জয়সিঙের ও যশোমন্ত সিঙের উচ্ছেদ করিয়া, আপন নিরাতঙ্ক অঙ্কে দুর্বিসহ দুরভিসন্ধি ও ষড়্‌যন্ত্র-সূচক কু-মন্ত্রণা-

সাধনে সযত্ন হইলেন, হায় ! তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে, তাঁহার সহসা সাহস ও সামর্থ্য কোথায় ? মূর্ত্তিমান্ কৃশাণুসম তেজঃপুঞ্জ বীরবর মহারাণা রাজসিঙ্,তাঁহার সুখের পথে প্রধান ও কঠিন অন্তরায়—কণ্টক। রাজকোষ, অবশেষে শূন্য প্রায়—নিঃশেষিত ! আওরঙ্গজেব্, সমগ্র হিন্দুজাতির প্রত্যেকের উপর জঘন্য শিরঃশুল্ক (Head tax) সংস্থাপন দ্বারা, প্রজাপুঞ্জের অপ্রীতির আধার হইলেন। কর-ভারে প্রপীড়িত হইয়া, হিন্দু-প্রকৃতি-কুল—ঘোরতর, ভয়ঙ্কর ও তার-স্বরে হাহাকার রবে—আকুল অন্তরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হিন্দুর হৃদয়বিদারক বিলাপের ও প্রলাপের ধ্বনি, হিন্দুনৃমণি রাণা রাজসিঙের কোমল প্রাণে সহনীয় হইতে পায় কি ? তিনি আপন পূর্ব্ব-পুরুষ-গণের অতিশয় অক্ষয় কীর্ত্তির স্মরণে এবং বিনশ্বর অসার বিশ্ব-সংসারে অত্যাচারী বিকট উৎপীড়ক মোগলের প্রাবস্যকে ক্ষণস্থায়ী জানিয়া, তিনি সেই 'মুণ্ড-কর'-প্রতিষ্ঠার ভূয়িষ্ঠ প্রতিবাদের অভিপ্রায়ে তেজস্বিনী অথচ আবেগাত্মিকা ভাবময়ী ভাষায় লিখিত এক সুদীর্ঘ লিপি, লিপিবদ্ধ করিয়া, সম্রাট্-সন্নিকটে প্রেরণে বাধ্য হইলেন। সেই পত্রিকাখানিতেই বিশ্ব-প্রেমিকতার, মানবীয় হিতৈষণার ও উদার নীতির শত শত জ্বলন্ত দৃষ্টান্তকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বলিতেই বা কাহার বাধা বল দেখি ? বস্তুতঃ, রাণা রাজসিঙের চেষ্টায়, সেই পরমাদ্ভুত পত্রের পবিত্র গাত্রে—ছত্রে ছত্রে—অনুপম লিপিচাতুর্য্য, যথেষ্ট প্রকটিত—একান্তই পরিব্যক্ত।

"প্রভাবতীর" পাণি-পীড়নে, রাণা রাজসিঙ্, আওরঙ্গজেবের অন্তঃ-প্রধূমিত রোষানল, উদ্দীপিত করিয়া দিলেন ! "অজিতসিঙ্কে" আশ্রয় দিয়া, তিনি সেই অশেষ আক্রোশাগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিলেন। এক্ষণে তদীয় এই কটু ও কষায়, তীব্র ও তিক্ত, বিস্বাদ ও অ-মধুর প্রতিবাদপূর্ণ সুদীর্ঘতম পত্র, সম্রাটের প্রজ্বলিত রোষানলে, ঘৃতাহুতি দিল। মহারাজাধিরাজ, তদ্দণ্ডেই—সেই মুহূর্ত্তেই—মিবার-ভূমিকে অবরোধ করিতে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী ভীষণ মহারণের আয়োজন চলিল। সম্রাটের অনুমতিমতে, সুবিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের যেখানে যত অগণ্যবৎ সৈন্যবর্গ ও সামন্তসমস্ত ছিল,—সকলেই, একত্র সমবেত হইল। কুমার অক্বর্, তৎকালে কুমার। তৎকালে তিনি নিজেই, বঙ্গরাজ্যে এবং আজিম্, কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারাও রাজধানীতে (দিল্লীতে) আনীত হইলেন। সেই বহুল সৈন্য-সকলকে সমভিব্যাহারে করিয়া, সদর্পে দম্ভ ও গর্ব্ব সহকারে মিবারাভিমুখে যুদ্ধমাত্রার জন্য ভীষণ অভি-যান। সুদূর হইতে বিপক্ষ পক্ষের "আল্লা হো অক্বর্" এই তুমুল কোলাহল-আকর্ণনে কৌতূহলাক্রান্ত অন্তরে রাজসিঙের, বীরতেজে সমুত্তেজিত অবস্থা। বলদর্পিত মদ-মত্ত মাতঙ্গতুল্য উদ্ধত, উত্তেজনা-দৃপ্ত অতৃপ্ত, মোগলের রণ-কণ্ডূয়ন নিবারণের নিমিত্ত তাঁহাদের সকলকে সমর-সজ্জায় শোভিত ও মণ্ডিত হইবার জন্য ঘোষণাপ্রচার। রাণা,চমূ-সমূহের অতিমাত্র অল্পতা-অবলোকনে "গিহ্লোট" বীরগণের প্রাচীন—চিরন্তন প্রথার অনুসরণে জটিল, নানাবিধ-বল্লরী-বেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গম অদ্রিরাজ 'আরাবল্লী'-শৈল-রাজির অভ্যন্তরে "শিশোদীয়" বীর-বৃন্দকে রক্ষা করিতে গমন করিলেন। তৎ-সঙ্গে মিবারের পুঞ্জ পুঞ্জ

প্রকৃতিকুলকে নিম্ন-প্রদেশস্থ জনপদ পরিত্যাগ করিয়া,সেই নিখিল শৈল-মালার মধ্যে আশ্রিত হইতে লাগিল। ইহাতে মিবারের নিম্ন-ভূমি-সমূহ, এক কালেই জন-কোলাহল-পরিশূন্য হইয়া পড়িল। দুর্দ্দান্ত মদোদ্ধত মোগল সৈন্য-সমস্ত, সেই বিজন প্রদেশে সমুপনীত হইয়া, সেই সকল স্থল নির্বিরোধে ভুজ যুগলে আয়ত্তীকৃত করিতে লাগিল! সম্রাটের, উৎকট উদ্যমের উত্তম ফলে অচিরে 'চিতোর' 'মণ্ডলগড়' 'মুন্দিসন,' 'জীরণ' ও অন্যান্য অনেকগুলি দুর্গ, অধিকৃত হইয়া গেল! তৎসমস্ত দুর্গে যবন-সেনা সংরক্ষিত হইল। সম্রাট্ তখন বিপুল যাবনিক বাহিনী হইয়া, রাণা রাজসিঙকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশে আরাবল্লীর অগম্য কুটিল রথ্যায় (পথে) প্রবেশ করিতে, উদ্যোগী হইলেন।

এই ভয়াবহ মহাবিগ্রহে দুর্দ্দান্ত যবনদিগের প্রচণ্ড পদ-ভরে সমগ্র মিবারভূমি, বিকম্পিত হইয়া উঠিল। রাণা রাজসিঙের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কেবলমাত্র শিশোদীয় অন্বয়ের রাজ্য ও সম্মান সম্ভ্রম, বিপন্ন নহে। পরন্তু, সমগ্র রাজপুত-জাতির সনাতন ধর্ম্ম ও চিরন্তন সংস্কার, ব্যাহত হইবার আত্যন্তিকী আশঙ্কা। তাহাতে রাজপুত-মহিলা-সকলের সতীত্ব-রত্ন, বিনষ্ট হওয়া, নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। যে করাল কবল হইতে হিন্দুজাতির পবিত্র ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকল রাজপুত-বীরই, বীর-প্রবর মনুজ-সিংহ রাজসিংহের (রাজসিঙের) পতাকা-মূলে দলে দলে সম্মিলিত হইতে লাগিল। বহু দিনের অবসানের পর বীরসিংহ বাপ্পা রাওয়ের প্রচণ্ড "ছেজি" প্রবল প্রতাপের ও ভীম দর্পের সহিত "গিহ্লোট' সম্রাটের মস্তকোপরি সমুদ্যত হইল। সমবেত রাজপুত সৈনিকগণ—ভীম, গম্ভীর ও গভীরতর রবে জয়নাদ করিয়া উঠিল। মোগলের সেনা, বিকট চীৎকারে তাহার প্রত্যুত্তর দিল।

রাণা রাজসিঙ, অগণ্য-প্রায় সৈন্যকে তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়া, তিন জন উপযুক্ত সেনা-নায়কের কর্তৃত্ব-প্রভুত্বে সেই তিন দলের ভারার্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার জয়সিঙ্, এক দল সৈন্য সহিত আরাবল্লীর বন্ধুর সমুন্নত শিখর প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। এ দিকে গুর্জ্জর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি প্রদেশস্থিত 'ভীল'-সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবার জন্য রাজকুমার ভীমসিঙ্, পশ্চাদ্ দিক্ রক্ষায় মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং রাণা রাজসিঙ্, বহু সৈন্যের সহিত 'নাইন' গিরি-সঙ্কটের সন্নিকটে উপস্থিত থাকিলেন। রাণার সৈন্য-দল, তিন দিকেই এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে,অরাতি-পক্ষ, কোন গতিকে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলে, আর নিস্তার পাইবে না। এ-দিকে, দুর্দ্ধর্ষ মোগল-সম্রাট্, "ছোবারি"-নামক 'ভীল'-জনপদে উপনীত হইলেন। সুচতুর 'টাইবার্ খাঁর' পরামর্শানুসারে অগণ্যপ্রায় সৈন্য-সমভিব্যাহারে হুমায়ুন, স্বীয় পুত্র অক্‌বরকে রাজধানীতে (উদয়পুরাভিমুখে) পাঠাইয়াদিলেন।

পিতার আদেশ-মতে রাজাত্মজ অক্‌বর্, পশ্চাশৎ সহস্র (৫০,০০০) সৈন্য সঙ্গে করিয়া, রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অত্যাচারি-শত্রু-সৈন্যগণের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার কারণ,মিবারের প্রজাবৃন্দ,ইতঃপূর্ব্বেই গৃহাবাস ত্যাগ করিয়া, দুর্গম গিরি-প্রদেশে লব্ধাশ্রয়। এইজন্য রাজকুমার অক্‌বর্, যতই অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকিলেন,উদ্যো-

ন্তর—রাজভবন, ও বন, উপবন ও উদ্যান, সরোবর ও প্রান্তর প্রভৃতি, তাঁহার ততই নয়নপথে পতিত হইল। কিন্তু, মানবমাত্রও, তাঁহার গতিরোধ করিল না। এবম্ভূত ব্যাপারদর্শনে রাজকুমার, কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্মিত বা চমকিত, স্তম্ভিত অথবা বিচলিত হইলেন না। তিনি আপনাকে নিরাপদ্ জানিয়া, নিঃসংশয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিত। কিন্তু, এতাদৃশ ভাবে নিশ্চিন্ত অন্তরে তাঁহাকে অধিক ক্ষণ থাকিতে হইল না। ত্বরায় রাজপুত্ত-রাজ-সুত জয়সিঙ্, বিপুল বিক্রমে তদুপরি নিপতিত হইয়া, তাঁহাকে পাদ-বিদলিত করিলেন। তখন সম্মান-সম্ভ্রমের সহিত তদীয় পদবী-পর্য্যন্তও, বিপক্ষের চরণ-ভরে নিরাপদেই—বিমর্দ্দিত হইতে চলিল! সম্রাট্-তনয় অক্বর্, নিষ্কৃতি পাইতে, যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু, পদে পদে জয়সিঙ্ কর্ত্তৃক তাঁহাকে নিগৃহীত হইতে হইল! অবশেষ উপায়ান্তরবিহীন হইয়া, অক্বর্, জয়সিঙের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। উন্নত-চিত্ত হৃদয়বান্ জয়সিঙ্, তদীয় দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া, উপস্থিত বিপদ্ হইতে তাঁহাকে প্র-বিমুক্ত করিলেন। অধিকন্তু, তাঁহাকে ও তদীয় হতাবশিষ্ট—কি বিশিষ্ট, কি অ-বিশিষ্ট—সব সৈন্যকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্য, কেবল কতিপয় রক্ষককে 'জিল্‌বয়ার' গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত প্রেরণ করিলেন। বিপন্ন সম্রাট্-তনয়কে সেই রক্ষিগণের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে চিতোরের প্রাকার-তলে আশ্রয়লাভার্থ শরণাগত হইতে হইল।

এ দিকে যবন-বীর "দেহহির্ খাঁ," অন্য একটী মোগল-বাহিনীর সমভিব্যাহারে 'মার্‌বার্' হইতে "উদয়াপুরীয়" পার্ব্বত্য পথের ভিতর দিয়া, গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইলেন। তদ্দণ্ডেই "রূপনগরাধিপতি" 'শোলাঙ্কির' ও 'গানোর'-নৃমণি "গোপীনাথ রাঠোর" কর্ত্তৃক প্রচণ্ডবেগে তিনি আক্রান্ত হইলেন। তিনি তাহাতেই সসৈন্য পরাজিত। সোমগণ, সম্রাট্ আওরঙ্গজেব, অক্বর্ ও দেলহির্ খাঁর যুদ্ধের ফলাফল জানিবার অভিপ্রায়ে পুত্রের (আজিমের) সহিত 'দোচারি' গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দৈব-যোগে রাজা রাণা, তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। 'দোচারির' প্রশস্ত গিরি-বর্ত্মের অভ্যন্তরে হিন্দু-মুসলমানে ভয়ঙ্কর, ঘোরতররূপে ভীষণ, তুমুল রণ বাধিয়া গেল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টীয় অব্দের বাসন্ত ঋতুর প্রথম প্রক্রমে (ফাল্গুন-মাসে) বীর-পুরুষ-পুঙ্গব, সুর-সম, শূর-নর-শার্দ্দূল রাণা রাজসিঙ্, জয়লাভ করিলেন সত্য বটে; কিন্তু—ইহাতে অনেকগুলি রাজপুত-বীর, নিঃশেষে প্রথমতঃ নিপাতিত—পশ্চাৎ নিহত হইল। আস্তে আস্তে পরাস্ত হইলে, যাহাকে দূরস্থ হইতে হয় না—সেই অবমানিত সম্রাট্ আওরঙ্গজেব্ও, দুর্দমনীয় আধি-ব্যাধি-জনিত মনোদুঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইলেও, ক্ষণেকের তরেও, বস্তুতঃ—নিরুৎসাহ হইবার বস্তু ছিলেন না। তিনি প্রনষ্ট-গৌরবের পুনর্জ্জন্ম জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও যথোচিত যত্ন, করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশেষ প্রয়াস—চলিতে লাগিল।

পরাজিত অরাতির প্রতি ক্ষমা ও তিতিক্ষা প্রদর্শন, রাজপুত-জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু, আওরঙ্গজেবের অতিমাত্র অত্যাচারে ও উৎকট উৎপীড়নে রাজপুতগণ, সেই বীর-ধর্ম্ম, একেবারে বিস্মৃত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে রাজপুত-রাজ, অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর আওরঙ্গজেব্কে ও তদীয় পুত্রকে সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি দান করেন;

কিন্তু, পাপমতি সম্রাট্, তাঁহাদের সেই মহোপকার ভুলিয়া গিয়া, পুনরায় তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে অনেক আহব, চলিয়াছিল। রাজপুত-শূর দয়ালশা, ভীমসিঙ্ ও জয়সিঙ্ প্রভৃতি বীরগণের বীর্য্য-বিক্রমে সম্রাট, একে একে সকল স্থানেই পরাভূত হইলেন। রণ-বিশারদ রাজপুত-সমস্তের ভীম বিক্রম সহ্য করিবার, মোগলগণের আদৌ ক্ষমতা ছিল না। সম্রাট্, অসীম সুযোগ ও বিপুল সহায়তা, সম্পত্তি, বল এবং বীর্য্যসত্ত্বেও, কিছুতেই বীরপুরুষ রাজসিঙের প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে চতুর-চূড়ামণি আওরঙ্গজেব্, সন্ধি-সংস্থাপন-পূর্ব্বক অব্যাহতি লাভ করিলেন ; কিন্তু, এই শান্তিময় সন্ধি-পত্রে শিরস্কর রহিত করিবার কোন কথাই, উল্লিখিত ছিল কি ?

সন্ধি-বন্ধনের আয়োজন শেষ হইতে না হইতেই, রাজপুত-কেশরী বীরশ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিঙ্, কাল-করাল গ্রাসে পতিত। সিংহাসনে আরোহণের কাল হইতেই তিনি মোগল-সম্রাটের সহিত ক্রমাগত রণ-রঙ্গে প্রবৃত্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থল, ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত আঘাত নিমিত্ত সেই ক্ষত, ক্রমে বিষম হইতে বিষমতর হইয়া উঠিয়া, অবশেষে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কারণ হইল। একে অবিরত চিন্তায় তিনি নিরন্তর জর্জ্জরীভূত ; তদুপরি আবার তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা। বীরশেখর রাজসিঙ্, সেই সমস্ত যন্ত্রণা হইতে, মুক্তি লাভ পূর্ব্বক ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করিলেন।

অনুপমরূপে—অপরিসীমভাবে—স্বদেশ-প্রেমিক প্রতাপসিঙের পরলোক-গমনের পর হইতেই মিবারভূমি, বিষম বিষাদে-তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী নৃপতিবৃন্দ, সে তামস কিছুতেই বিদূরিত করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। কিন্তু, বীরপুঙ্গব রাজসিঙ্, আপনার অপূর্ব্ব বল বিক্রমে ও স্বদেশ-প্রেমিকতায় মিবারের সেই বিলুপ্ত অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিয়া দেন। রাজসিঙ্, বীরাগ্রগণ্য প্রতাপসিঙের যথাযোগ্য বংশধর। ভারতের নিদারুণ অধঃপতনকালে তিনি সম্ভূত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই আজি পর্য্যন্তও সুপ্রাচীন সভ্যতম হিন্দু-জাতির ও সনাতন আর্য্য, পূজ্য এবং আর্ষ হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব, অধুনাপি অব্যাহত। তিনি পদানত শত্রুর উপর কদাচ প্রতিশোধ চাইতেন না। তাঁহার হৃদয়—দয়া দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা ক্ষমা, সদয়তা সহৃদয়তা—প্রভৃতি বহুবিধ গুণে বিভূষিত। তিনি ইচ্ছা করিলে, দুষ্টমতি সম্রাট্ আওরঙ্গজেব্‌কে সদলে সংহার করিতে পারিতেন ; কিন্তু, তাঁহার ও তদীয় স্বজাতীয় প্রজাবর্গের ভবিষ্য কষ্ট-দুঃখের বিষয় ভাবিয়া, যশোমন্ত, স্বীয় পুত্র জয়সিঙ্‌কে রণস্থল হইতে ক্ষান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার-অসীম-সমর-কৌশল ও অপূর্ব্ব বিক্রম, অনন্ত কালের জন্য ঘোষিত থাকিবে। তিনি স্বয়ংই—বিশিষ্ট, বিদ্বান্ ও হিতৈষী নৃপতি ছিলেন। তৎপ্রকাশিত পূর্ব্ব-কথিত সুদীর্ঘ তেজস্বিনী পত্রিকাই, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ, বর্ত্তমান কালেও বিদ্যমান। তিনি যে বিশাল 'রাজ-সমুন্দ সরোবর' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই—তাঁহার শিল্প প্রিয়তার পরিচয়, প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত।

সিংহাসনারোহণের ৭ (সাত) বৎসর পরে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মিবার-রাজ্যে সাতিশয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপের প্রাদুর্ভাব হয়। রাণা

রাজসিঙ্, প্রজাবৃন্দের পরিপালনের ও সৎকার্য্য-সাধনের উদ্দেশ্যে 'রাজ-সমুদ্র-সরোবর, সংস্থাপিত করিতে, সঙ্কল্পারূঢ়। তদনুসারে রাজধানীর সার্দ্ধ দ্বাদশ (সাড়ে বার) ক্রোশ উত্তরে আরাবল্লীর পাদপ্রস্থের এক ক্রোশ দূরে স্থিত স্থান 'গোমতী'-নাম্নী এক বক্রগতি তরঙ্গিণী স্রোতস্বতীর স্রোতঃ, প্রতিরুদ্ধ করিয়া, এই তড়াগ-প্রতিম হ্রদ, প্রস্তুত হইয়াছিল। সরোবরটী, অত্যন্ত গভীর ও সুন্দর। ইহার পরিধি, প্রায় ৬ (ছয়) ক্রোশ হইবে। রাণা, বাঁধের আদ্যোপান্ত শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরে সংগঠিত করিয়াছিলেন। সেই মনোহর সরোবরের শীর্ষদেশ হইতে, গর্ভ অবধি এক বিশাল সোপান-পঙ্‌ক্তি সংরচিত হয়। অধিকন্তু, সেই সোপানবলীও, মর্ম্মর প্রস্তরময়। উহা, সরোবরকে বেষ্টন করিয়া, সংস্থাপিত আছে। এই বৃহতী বাপীর প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে রাণার ৯৬,০০,০০০ (ছিয়ানব্বুই লক্ষ) মুদ্রা, ব্যয়িত হয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কর্ত্তব্য।

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শতদিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক!
এ সংসার কর্ম্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা,
পুড়িতে হইবে গাদ থাকে যতটুক,
অযুত আঘাতে নিত্য,
গড়িতে হইবে চিত্ত
যুদ্ধ জয়েচ্ছুক;
দিতে হবে বজ্র শাণ,
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ,
তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ।

২

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত বিপদ দেও আসিবে আসুক।
রুদ্ধ করি ব্যূহপথ,
থাক্ শত জয়দ্রথ,
অমরের প্রিয় সে যে সমর কৌতুক,
সে অনন্ত কুরুসৈন্য,
ভীরুর দৌর্ব্বল্য দৈন্য,
ডরে না জম্বূক!
সাগর তরঙ্গ ঠেলি,
তিমিঙ্গিল করে কেলি,
কূপে কাঁপে কূপের মণ্ডূক!

৩

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শতবজ্র গর্জ্জিবে গর্জ্জুক!
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ!
হ'লে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি লণ্ড ভণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক!
গম্ভীর গৌরবভরা,
মহাদম্ভে ভেঙ্গে পড়া,
কি আনন্দ! কি প্রচণ্ড সুখ!

৪

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আসুক!
স্থাপ' তুমি জয়স্তম্ভ,
কর আত্ম অবলম্ব,
দেও অস্থি মেদ মজ্জা লাগে যত টুক,

শত সূর্য্য করি গুড়া,
গড়' সে উজ্জ্বল চূড়া,
দেবতা দেখুক !
বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে,
সিংহ ফিরে বীরমদে,
আত্মগুপ্ত সভায় শম্বূক !

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
সংসারের শত দুঃখ আসিবে আসুক !

ক্ষুধাতুর শিশুবক্ষে,
উপবাসী নারীচক্ষে,
চাহিয়া দেখ'না তার ম্লান অশ্রুটুক,
ফিরিয়ে শুন না তার,
অন্ন বিনা হাহাকার,
কাঁদিবে কাঁদুক !
বীরের সন্ন্যাস ধর্ম্ম,
ছিঁড়ে ফেলা হৃন্মর্ম্ম,
কর্ত্তব্য রাখিতে জাগরুক !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়।

"Every variation from unity is but a
Progression towards nullity."—W.Secker.

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিরোধী পক্ষের সহিত তর্কযুদ্ধের হেরফের হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার অমূল্য "অনুষ্ঠান পত্র" ও "সবিনয় নিবেদন" পত্রে আপন প্রাণের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"উপনিষদে কথিত শুদ্ধ সনাতন উপাসনার বিরোধী বিচারতঃ কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ্য করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেননা প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন। যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন, সেই সেই উপাস্তকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে? দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায় ও দাদুপন্থী, কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতির সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ করা উচিত নহে। ইউরোপীয় যাঁহারা যীশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত কহেন, ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে, যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে। আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যীশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন, তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে; বরং যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা করেন, তাঁহাদের সহিত যেরূপ অবিরোধ ভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয় যীশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানাপ্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না।"

কিন্তু মহাপুরুষের এই উদার মহতী উক্তি, তাঁহার এই বিশেষ ভাবটী, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে কি না? অবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ বিবেকের খাতিরেই হোক্,কি মতের খাতিরেই হোক, যে কাজটা ব্রাহ্ম আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী, সেই কাজের অনুসরণ করিয়া আপনাদের মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করিলেন কেন? মতবাদের অকারণ কলহ ফলে একেশ্বরের বিশ্বজনীন পুণ্যনাম সাধনা করিয়াও ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ পবিত্র মিলনের ধর্ম্ম সাধনা করিতে পারিলেন না কেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য কি? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা—"সেই বেদবাক্য 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'।" পরন্তু পৃথিবীর জাতিবর্গ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যাঁহাতে যেটুকু সত্য আছে,তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে জাতিভেদ বুদ্ধির গন্ধ নাই, সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র আভাষ নাই। কারণ একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যিনি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" রূপে বিশ্বাস করেন,তাঁহার বাস্তবিকই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি থাকিতে পারে না। তিনি হিন্দুসমাজেরও কেহ নহেন, ব্রাহ্মসমাজেরও কেহ নহেন,তিনি শুধু সত্যের সেবক। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর যেমন সার্ব্বভৌমিক, ইন্দ্রিয়বিজয়ী পরম ভক্ত মহাজ্ঞানী মানব হইতে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত যাঁহার সমান কৃপা লাভ করিতেছে, তেমনি সর্ব্বব্যাপী একেশ্বরে যিনি হৃদয়ের অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি জাতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, উচ্চ নীচ অধিকারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই "আমার প্রভুর অর্চ্চনাকারী" বলিয়া প্রীতি করেন, কিন্তু কখনই বিরোধ ভাব পোষণ করেন না। ইহাই যথার্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ। বরং অজ্ঞান পৌত্তলিকের ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, যেখানে তাহার মূর্ত্তি নাই, সেখানে ঈশ্বরও নাই, কিন্তু একেশ্বরবিশ্বাসী কখনই একথা মনে করিতে পারেন না যে, সাকার উপাসক যখন মৃন্ময়ী প্রতিমার নিকট তাঁহার স্বাভাবিক মানব হৃদয়োচ্ছ্বসিত শোক দুঃখ-অভাব-আকাঙ্ক্ষার অকৃত্রিম ব্যাকুল প্রার্থনার অশ্রুসলিল ধারায় বুক ভাসাইয়া দেন, সেই মুহূর্ত্তে যে দেবতা অলক্ষ্যে সকলের অন্তর বাহির দেখিতেছেন, সেই সর্ব্বজীব-বৎসল ভাবগ্রাহী ভগবান তাহা অজ্ঞানের প্রার্থনা বলিয়া উপেক্ষা করেন। মহিম্নস্তোত্র বিশ্ব-প্রেম-গদ্গদ ভাষায় গাহিয়াছে—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানা পথজুষাং
নৃনামেকোগম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।"

"ঋজু অথবা কুটিলগামিনী নদী সকল যেমন সকলেই অবশেষে একদিন সেই এক মাত্র সাগরকেই প্রাপ্ত হয়, তেমনি রুচির বিচিত্রতা হেতু ঋজু কুটিল নানা ধর্ম্ম পথাবলম্বী মানবেরাও একমাত্র জগদীশ্বরকেই লাভ করে।" ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, অতএব ধর্ম্ম বাস্তবিক একই পদার্থ; সাম্প্রদায়িক ভাব-বহুল মতবাদই তাহাকে বহুবিধ রূপে প্রতীত করে।

হিন্দুশাস্ত্রের মুকুটমণি ভগবদ্গীতা ভক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুকে এই অপূর্ব্ব দয়ার্দ্র আশ্বাস-বাণী দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

"যথা যেন প্রকরেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিত ফলদানেন ভজামি, অনুগৃহ্লামি, ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে, তানহ মুপেক্ষইতি মন্তব্যং, যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি

মমৈব বর্ত্ম, ভজন মার্গমনুবর্ত্তন্ত ইন্দ্রাদি রূপেনাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ স্বামী ॥

অর্থাৎ, "যে যে ভাবেই আমায় প্রার্থনা করুক, সে প্রার্থনা যদি সকাম হয় হোক্. আমার নামের সঙ্গে যদি তাহার পার্থিব কামনা থাকে থাক্, আমি তথাপি তাহাকে অনুগ্রহ করি। আর যে আমায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কল্পিত দেবতার পূজা করে, আমি তাহাকেও ত্যাগ করিনা, অনাদর করিনা, কারণ যে যে দেবতারই পূজা করুক, সে প্রকারান্তরে আমারই পূজা, অথবা কোন রূপ বিশেষকে সেবা করিলেও, তাহা আমার সেবা বৈ আর কিছু নয়।"

একদিন সর্ব্বজীব-বৎসলের এই উদার অভয় বাণীকে ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ্য তাহার বিশেষ স্বার্থকামনানুকূল মনে করিয়া সরল উপাসনাকে ভীষণ যাগযজ্ঞযূপের রক্তাক্ত মৃত্তিকার নীচে সমাধি দিয়া স্বরচিত স্বার্থকামনানুকূল রাজসিক শাস্ত্রকে তুমুল বাদ্যধ্বনির সহিত ভারতবর্ষে প্রচার পূর্ব্বক বলিয়াছিল "ইহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, ইহারই সেবা কর, মোক্ষ মুক্তি ইহাতেই সব— অন্যথা চৌরাশীলক্ষ ভীষণ নরককুণ্ড ঐ দেখ তোমার জন্য প্রস্তুত; তুমি অন্ধ তাই বুঝি দেখিতে পাইতেছ না!"—হায়রে হিন্দুধর্ম্ম!

কিন্তু বহুদিন পরে আমাদেরি বাঙ্গালা দেশের পিতামাতা স্বজাতি-পরিত্যক্ত একটী ব্রাহ্মণ-কুমার সেই ঝুঠা হিন্দুধর্ম্মের রক্তাক্ত যজ্ঞভূমির গভীরতম প্রদেশ হইতে অলোক-সামান্য প্রতিভা-বলে লুক্কায়িত আসল হিন্দুধর্ম্মকে বাহিরে করিলেন। দেখিয়া পৃথিবী মুগ্ধ হইল। বিদেশীয় দৃপ্ত, উন্নত, জ্ঞান-পিপাসু জাতিরা সেই অমূল্য রত্ন-প্রসবিনী ভারতমাতার দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই স্বজন-পরিত্যক্ত, সার্থকজন্মা হিন্দু-সন্তান তাঁহার প্রাচীন পিতৃপুরুষকে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুরূপে প্রমাণ করিলেন। মনীষী পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার ভারতের উদার সার্ব্বভৌমিক সত্যকে স্বদেশে প্রচার পূর্ব্বক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বলিয়াছিলেন—

"But that self, that Highest self, the Paramatma, could be discovered after a severe moral and intellectual discipline only, and those who had not yet discovered it, were allowed to worship lower gods, and to employ more poetical names to satisfy their human wants. Those who knew the other gods to be but names or persons, worshipped in truth the Highest self, though ignorantly. This is the most characteristic feature in the religious history of India. Even in the Bhagabatgita, a rather popular and exoteric exposition of Vedantic doctrines, the supreme lord or Bhagabat himself is introduced as saying. "Even those who worship idols, worship me." This fundamental idea is worked out with systematic completeness in the Vedanta Philosophy, and no one who can appreciate the lessons contained in Barkeley's Philosophy will read the Upanishads and the Brahma Sutras and their commentaries without feeling a richer and a wiser man."*

কেবল ইহাই নহে। হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাপুরুষ মালাচির (Prophet Malachi) দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান জেহেবার মুখে গীতোক্ত এই সত্যের অবিকল প্রতিধ্বনি শুনিয়া আমরা বিস্ময়-পুলকে পূর্ণ হইয়াছি। অধ্যাপক কেনেন (Professor Kuenen) মূল হিব্রু ভাষা হইতে ঈশ্বর জেহোবার উক্তির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন যথাঃ—

"For I am a great king and my name is feared among the heathen."

অর্থাৎ, "ঘোর বর্ব্বরদিগেরও আমিই ভয়স্বরূপ ঈশ্বর।"—অধ্যাপক বলেন—

"The reference is distinctly to the adoration already offered to yahweh by the people, whenever they serve their own gods with true reverence and honest zeal. Even in Deuteronomy the adoration of these other gods by the nations is represented as a dispensation of yahweh. Malachi goes a step further, and accepts their worship as a tribute, which in reality falls to yahweh, to Him the only true. Thus the opposition between yahweh and the other gods, and afterwards between the one true god and the imaginary gods, makes room here for the still-higher conception that the adoration of yahweh is the essence and the truth of all religion."

Hibbert Lectures, P. 181.

অর্থাৎ, ভগবান জেহোবার উল্লিখিত উক্তি "বর্ব্বরদিগেরও আমি" জনসাধারণের "ইয়াওয়ে" নামক দেবতা-পূজার প্রতি সুস্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করিতেছে। কিন্তু—

"Whenever they serve their own gods with true reverence and zeal." "তখনই তাহাদের আমি, যখন তাহারা তাহাদের সেই সব কল্পিত দেবতা সকলকে যথার্থ ভক্তি এবং সরল আবেগের সহিত পূজা করে।" এমন কি, Old testament এর আদি পঞ্চপুস্তক Pentateuch এর পঞ্চম পুস্তক Deuteronomy, যাহাতে মুসার দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'তাহাতেও জন সাধারণের এই সকল কাল্পনিক পূজা যে দেবতা 'ইয়াওয়ে" দ্বারা প্রবর্ত্তিত, তাহার উল্লেখ আছে। ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ মালাচি শুধু তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি এই সকল দেবতা পূজাকে সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপের উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করেন।

"He accepts their worship as a tribute which in reality falls to yahweh, to him the only True.'

এইরূপে ইয়াওয়ে এবং তদেতর দেবতারও এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে এবং কাল্পনিক দেবতায় বিরোধ-বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া এখানে এই উচ্চতর বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে যে, ঐ ইয়াওয়ের প্রাথমিক সরল উপাসনা সমুদায় ধর্ম্মের সার সত্য।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও অবিকল এই কথাই বলিয়াছেন। সাকারোপাসক সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ ত দূরের কথা, তিনি সরল সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদের সহিত একেশ্বরবাদীর তত্বতঃ অভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি জগদীশ্বরকে শুধু সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নাই, নিখিল বিশ্ব প্রকার ভেদে তাঁহারি ঈশ্বরের পূজা করে, ইহাই তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। সেই মহাত্মা বিরোধী পক্ষগণের সহিত তর্কদ্বন্দ্বের হেরফের হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার "অনুষ্ঠান পত্র" ও "সবিনয় নিবেদন" পত্রে তাঁহার যথার্থ ধর্ম্মমত প্রকাশ পূর্ব্বক পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত পূর্ব্বক বলিতেছেন,—"উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন উপাসনার বিরোধী বিচারতঃ কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা, এই উপলক্ষ্য করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেননা প্রত্যেক্ দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন। যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন, সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে?"

অতএব, এখন স্বভাবতঃই এই কথা মনে হয়, তবে সেই মহাত্মা পৃথক্ সমাজ স্থাপন করিলেন কেন? উদার, অসাম্প্রদায়িক, বিশ্বজনীন ভাবে যাঁহার হৃদয় পূর্ণ, তিনি

স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন পূর্ব্বক পৃথিবীর শত শত সম্প্রদায়ের সহিত আবার আর একটা সংখ্যা মাত্র যোগ করিলেন কেন ? পৃথিবীর উচ্চ নীচ অধিকারী ভেদে সমুদয় উপাসক-সম্প্রদায় মাত্রের সহিতই যদি তাহার অবিরোধ, তবে আত্মার আর একটী স্বতন্ত্র সমাজ কেন ?

কিন্তু, স্বতন্ত্র সমাজ নহে, সম্মিলনের সমাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কোন সাম্প্রদায়িক সমাজ স্থাপন করেন নাই; বরং তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা পৃথিবীতে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব অসাম্প্রদায়িক-সমাজ স্থাপন করিয়াছে। 'অসাম্প্রদায়িক সমাজ' কথাটাই অভিনব। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কখনই পৃথক সমাজ স্থাপন করেন নাই, কখনই সাম্প্রদায়িক সমাজ স্থাপন করেন নাই, কাহারও বিরোধী সমাজ স্থাপন করেন নাই;—যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিশ্বজনীন সত্যের সমাজ। পৃথিবীতে অনেক সত্যধর্ম্মের সমাজ, অনেক ভক্তের সমাজ, অনেক জ্ঞানীর সমাজ, অনেক বিশ্বাসীর সমাজ ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সে সব প্রত্যেক্ সমাজই পরস্পরকে বিরোধী মনে করে, পৃথক্ মনে করে, কিন্তু এই অলোক-সামান্য মনুষ্যটীর সমাজ পৃথিবীর সেই সব পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়কে আহ্বান পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাবে বলিয়াছে,—"সত্য এক ভিন্ন দুই নহে, ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহে। তোমরাও আমারি প্রভুর অর্চ্চনা কর, আমিও তোমাদেরি প্রভুর অর্চ্চনা করি, অতএব এস, এখন হইতে যাহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোক-স্বীকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাই সাধনা করি;—কিন্তু ভাই, তদতিরিক্ত কিছু নহে।" ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম, ইহাই তাঁহার আদর্শ। পৃথিবীর সকল সমাজই পরস্পর বিরোধী, কিন্তু তাঁহার সমাজ অনন্ত-বিরোধী। এ সমাজের ইহাই অভিনবত্ব, অপূর্ব্বত্ব। "সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোক-স্বীকৃত কর্ত্তব্য সাধন" তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বীজমন্ত্র।

এখন দেখা যাক্, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সমুদায় লোক এক বাক্যে কোন্ কর্ম্মগুলিকে মনুষ্যের কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে স্বীকার করিতেছে। আশ্চর্য্য, এখানে সব শেয়ালের এক ডাক! এই খানেই যথার্থ সত্যের বিশ্বব্যাপিনী শক্তি অনুভব করা যায়, এইখানেই সমুদয় সংশয়-তিমিরান্ধতা অপসারিত হয় এবং এক অদ্বিতীয় সত্য-সূর্য্যের আলোকে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া নির্ভরপরায়ণ নিশ্চিন্ত আত্মা অনুভব করে যে, সর্ব্ববাদিসম্মত যে সত্য, তাহাই অবিনশ্বর সত্য শাস্ত্র, আর পরস্পর যাহা বিরোধ দেখিতে পাই, তাহা সাম্প্রদায়িক অসার কর্ম্মকাণ্ডের কদর্য্য আবর্জ্জনা মাত্র।

নতুবা কোন্ দেশের কোন্ সম্প্রদায় স্বীকার না করে, অনিত্য বিষয়ে অনাসক্তি, সত্যপরায়ণতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, প্রলোভন-সংযম, পিতা মাতা আত্মীয় অন্তরঙ্গের সেবা, পরের সেবা, পাপীর প্রতি ক্ষমা, ভ্রাতৃভাবের চর্চ্চা, মনের সরলতা, অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করা, সহিষ্ণুতা, সাধুভক্তি, একতা, বাধ্যতা, স্বদেশের দুঃখ দুর্গতি নিবারণ চেষ্টা, স্বার্থত্যাগ, এসকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম? এই তো আসল, নতুবা শুধু বিশুদ্ধ-মতাবলম্বী হইয়াও আমার জীবন ও কার্য্যে যদি এই সব কর্ত্তব্যপরায়ণতার অন্ততঃ কোন একটী জাগ্রত না হইল, অথচ অন্যদীয় সম্প্রদায়ের সেবা-প্রেম-বিনয়-ভক্তি-বিমণ্ডিত আমা হইতে শ্রেষ্ঠ-চরিত্র একজনকে আমি অম্লান বদনে গোঁয়ারতামি পূর্ব্বক বলিলাম "হত-

ভাগ্য পৌত্তলিক", তবে কি শুধু ইহাই প্রকাশ পায় না যে, আমি এতদ্বারা আমার ব্যর্থ-অভিমান চরিতার্থ করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করিয়াছি মাত্র? প্রকৃত প্রস্তাবে আমি যদি সাম্প্রদায়িক নহি, তবে সাম্প্রদায়িক কে? সাকার পূজক মাত্রেই পৌত্তলিক নহে, আবার নিরাকারবাদী মাত্রেই ব্রহ্মসাধক নহে। যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হও, সাধনার আন্তরিকতা, জীবনের বিশুদ্ধতা ও স্বার্থত্যাগ সর্ব্বোপরি, নতুবা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ মতবাদে কিছুই আসে যায় না। বিশ্বজনীন সত্যকে ধ্রুবতারার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া যিনি অনন্তবিরোধী অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন পূর্ব্বক মতবাদ-বিসম্বাদ-পরায়ণ সোদর-প্রতিম স্বজাতির শতধাবিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল সমাজকে তাহারই মূলে সম্মিলিত করিবার সুমহৎ আশা পোষণ করিয়াছিলেন, তাই আজ্ কি না আমরা লোক-শিক্ষকের উচ্চ আসন স্বহস্তে অধিকার পূর্ব্বক তাঁহারি সমাজে, তাঁহারি আদর্শকে উচ্ছেদ করিতেছি, তাঁহারি নামে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সমাজে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিতেছি, সেই স্বদেশবৎসল মহাপুরুষের একেশ্বর উপাসকদের আত্মীয়-সমাজে আজ্ সমবিশ্বাসী অন্তরঙ্গগণের মধ্যে মতবাদ বৈষম্যের ব্যক্তিগত অসহিষ্ণুতার ফলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া গিয়াছি! ইহারি নাম কি ব্রাহ্মভাব?

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আর এক সুমহান উদ্দেশ্য ছিল, যাহা পতিত ভারতের আজ্ সর্ব্ব প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। মাতৃভূমির সুসন্তান সেই মহাপুরুষের ধর্ম্ম বিশ্বাস জ্ঞানযোগে সার্ব্বভৌমিক ছিল, কিন্তু স্বদেশবাৎসল্যের স্বাভাবিক অনুপ্রাণনায় তাঁহার কর্ম্মযোগসাধনা আরম্ভ হইয়াছিল। স্বদেশের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা সাম্প্রদায়িকতা নহে, জাতিভেদ-বুদ্ধি নহে। স্বদেশের সেবা ও দুঃখ দুর্গতি-নিবারণ-চেষ্টা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম নীতি শাস্ত্রের বহিরঙ্গ নহে, বরং নিতান্ত অন্তরঙ্গ। মাতৃভূমির সেবা ও মঙ্গলকামনা সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোক-স্বীকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাই তিনি যখন দেখিলেন, আপন ঘরের অমূল্যরত্ন হারাইয়া তাঁহার স্বদেশবাসী তুচ্ছ কাচের পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে, তখন তিনি ভারতের শ্রুতি উপনিষদ গীতারূপ জ্যোতির্ম্ময় অমূল্য রত্নমালা স্বহস্তে তুলিয়া ধরিয়া শুধুই যে তাঁহার স্বজাতির হৃদয়ে এক অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, সরল জাতীয় মর্য্যাদাবোধের প্রাণময় মৃদুকরস্পর্শ করিয়া গেলেন, তাহা নহে, প্রতীচ্য পৃথিবীর সম্মুখে তাঁহার মাতৃভূমির রুদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার-দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক তিনি সেই সকল বিস্ময়-বিমুগ্ধ মনীষী মণ্ডলীর উক্তি দ্বারা প্রমাণ করাইলেন, পঞ্চনদের পুণ্যসলিল-বিধৌত আর্য্যাবর্ত্তের সেই সরল শুভ্র ঋষিগণই জগতের আদিগুরু, মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনায় তাঁহারাই আদর্শ—সর্ব্বলোক শিক্ষক। তৃষিত আত্মার জন্য অমন আরোগ্যপ্রদ, উপাদেয় পানীয় আর কে দিতে পারিয়াছে? ব্যথিত, বিষাদিত, মলিন মানবের সমুদয় সন্দেহ তর্ক নিরাশাময় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া আর কে অমন প্রেমের অভয় আহ্বান শুনাইতে সক্ষম?

আমাদের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, "রামমোহন রায় কেবল শ্রুতি উপনিষদ

প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্রের সত্যের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, তিনি পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতেই সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যকে শুধু শ্রুতি উপনিষদের সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে বুঝিবা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক আদর্শ আর থাকে না। কিন্তু একথা ভাবিয়া ভীত হইবার পূর্ব্বে ইহাই মনে করা উচিত যে, সেই শ্রুতি উপনিষদের সরল উপাসনাধ্বনি যাহা আদিকালে ঋষিদিগের পবিত্রকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বজনীন সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাতে মানবমাত্রেরই অধিকার। ইহা ব্যতীত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় একখানি অনন্যবিরোধী শাস্ত্র নাই। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থের পরস্পর-বিরোধী সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারের আবর্জ্জনারাশির মধ্য হইতে সারগ্রাহী জ্ঞানীগণ দেশে কালে যে সকল সত্য নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহাও ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রতিধ্বনি মাত্র। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষিদিগের সরল ব্রহ্মোপাসনার আদর্শে গঠিত, এই সত্য কথা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ সঙ্কীর্ণ হয় না, অথচ আমরা আমাদের জাতীয় গৌরবের দায়ীত্ব অনুভব করিতে পারি।

মাহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব শাস্ত্রের সারগ্রাহী ও সর্ব্বলোক-বৎসল হইয়াও তাঁহার স্বদেশজাত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ভিত্তির উপরেই তাঁহার সমাজ-মন্দির গঠিত করিয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সার্ব্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক হইয়াও তাঁহার আর্য্য প্রপিতামহের বিশ্বাদর্শ জ্ঞানামৃত দ্বারাই তাঁহার সমাজমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসনা পদ্ধতিতে এমন একটী ভাব, একটী উক্তি কেহ দেখাইতে পারিবেন না, যাহা ঋষিদিগের ভাব, ঋষিদিগের উক্তি নহে। জাতীয় গৌরবমুগ্ধ সেই মহাত্মা তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় পরিচ্ছদে সাজাইয়া নিদ্রিত হিন্দুস্থানকে জাতীয় ভাবে উদ্বোধিত করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মহান উদ্দেশ্য ছিল। ঋষি-প্রচারিত সার্ব্বজনীন সরল সত্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শরূপে গ্রহণ করা আমাদের সাম্যোন্মত্ততার নিকট সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় ভগবৎপ্রেরিত জীবন সেই ঋষি-প্রচারিত মহা সত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়াই পৃথিবীতে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব অসাম্প্রদায়িক সমাজ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। এই সমুচ্চ আদর্শকে অনেকেই যথার্থরূপে চিনিতে পারেন নাই; অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক যাহারাই তাঁহার কথা শুনিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে আপন প্রাণের মধ্যে স্বাভাবিক রূপে উপলব্ধি করিয়া বলে "তিনি যে আমাদের সমধর্ম্মী ছিলেন।" কিন্তু সেই মহাত্মার প্রচারিত ধর্ম্ম কোনও সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবীর সকল সমাজই পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু তাঁহার সমাজ পরস্পরের মিলনের সমাজ। সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব লোকসম্মত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন, ইহাই তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বীজমন্ত্র। অথচ এই সর্ব্বলোক-সম্মত কর্ত্তব্যকর্ম্ম

সাধনারই একটা প্রধান অঙ্গ স্বজাতি-বাৎসল্য, তাই তিনি আদর্শ স্বজাতিবৎসল। এই সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোকসম্মত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনার প্রধান অঙ্গ মাতৃভূমির সেবা, তাই তিনি বিশ্বাদর্শ শ্রুতি-উপনিষদ-গীতার জননী জন্মভূমির সেবক। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক লিখিয়াছেন "রাজার সার্ব্বভৌমিক উপাসনার জন্য সমাজ-প্রতিষ্ঠা জগতে এক নূতন ব্যাপার।" আমি এ কথাতেও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া বলি, সার্ব্বভৌমিক উপাসনার জন্য তাঁহার জাতীয় ভাবে সমাজ প্রতিষ্ঠা জগতে এক নূতন ব্যাপার। একান্ত মনে আশা করি, আমার এই কথার সহিত স্বর্গীয় মহাত্মার ভাবের নিকটতর সম্বন্ধ। সেই মহাত্মা "উপাসনা সভাকে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় আকার দিয়াছিলেন" একথাও তাঁহার জীবন চরিতকার লিখিয়াছেন। 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থে মহাত্মা রাজা যে উপাসনা-প্রণালী লিখিয়াছেন, তাহাকে তিনি "শাস্ত্রানুযায়ী সনাতন উপাসনা" বলিয়া তাহার প্রত্যেক্ উক্তির সহিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন। এইরূপে কি স্বদেশে কি বিদেশে, কোথায় এবং তাঁহার কৃত কোন্ অনুষ্ঠানে যে তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতিবাৎসল্য প্রকাশ পায় না, তাহা বলিতে পারা অসম্ভব। ঋষি-প্রণীত অধ্যাত্ম-শাস্ত্রকে তিনি যে পৃথিবীর মনীষীমণ্ডলীর সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা সেই মহাত্মার জীবন ঘটনা প্রতিপদে সাক্ষ্যদান করে। সে হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি শতধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা সামান্য মতের অনৈক্য সহ্য করিতে না পারিয়া পরস্পর পৃথক হইয়া যাই, কিন্তু হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক শুধু পরিত্যক্ত নয়, অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াও সেই বিশ্বাদর্শ স্বদেশপ্রেমিক স্বজাতিকে পরিত্যাগ করেন নাই। এ হৃদয়ের তুলনা কোথায়? জাতিবর্ণ দেশকাল নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব শাস্ত্রের সারগ্রাহী রাম মোহন রায় আপনাকে আমরণান্তকাল সমুদায় জাতির নিকট হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইংরেজ পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকাল নিয়ত বাস করিয়াও তিনি সর্ব্বথা জাতীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেন। প্রাণ বিয়োগের পর ব্রাহ্মণ সন্তানের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার বক্ষে শুভ্র যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হয়। তাই মনে করি, যদি আবার কোন দিন ভারতের প্রাণহীন দেহে জীবন সঞ্চার হয়, যদি আবার কোন দিন সেই সরল শুদ্ধ উদার ঋষি-সেবিত পুণ্যভূমে সমবেত কোটি কণ্ঠে ব্রহ্ম নামের বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠে, যদি আবার কোন দিন ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ এবং ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের 'পাঞ্চজন্য' দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই বিরাট ধ্বনির মৃত সঞ্জীবনমন্ত্র-সঞ্জাত উৎসাহ ও আত্মসম্মান জ্ঞানে ত্রিংশৎ কোটি মৃত ভারতবাসীর হৃদয়ে যদি প্রাণ স্পন্দন উপস্থিত হয়, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক স্বচ্ছলতায় যে জাতি বহুদিন সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, সেই জাতির ত্রিবিধ ক্ষুৎ পিপাসার কারণ নির্ণয় করিয়া যদি ত্রিংশৎ কোটি মানবের ধমনীতে সজীব শোণিত-স্রোত উচ্ছ্‌লিত হইয়া এক দিন যুগান্তর উপস্থিত করে, তবে সেই অপূর্ব্ব কারণ-জ্ঞান-সঞ্চারের মূলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ রাম মোহন রায়ের আদর্শ। ইহাতে আজ আর সংশয় নাই। সেই মহাত্মা বলিতেন,—

"গীতার কথা না শোনে যে
তা'র কথা শোনে কে ?

অতএব তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি ? তবে কেন আমরা, তিনি জাতীয় একতার আদর্শে অমানুষিক আয়াসে দেশের চিরবদ্ধমূল সাম্প্রদায়িক শতধাবিভক্ত সমাজের পরিবর্ত্তে যে বিশাল সম্মিলনের সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া মতবাদের কলহ ভেদ-বুদ্ধিবশে, তথাকথিত সাম্যবাদের দোহাই দিয়া, পুনরায় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করি ? হায়, উদার অখণ্ড সমাজ সামান্য চল্লিশবৎসরের মধ্যে তিনটী সম্প্রদায়ে পৃথক্ হইয়া গেল ! আদর্শের কি লজ্জাজনক ব্যভিচার ! উদ্দেশ্যের কি শোচনীয় অধঃপতন !

তাঁহার স্বহস্তলিখিত আত্মজীবনচরিতে আমরা দেখি, ষোল বৎসরের বালক রামমোহন ভারতের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা ভাবিতে ভাবিতে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন । ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয় হইতে গৃহে ফিরিবার সময় কি অপূর্ব্ব জাতীয় স্বতন্ত্রতায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ঋষিগণের বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শের উপর ভারতের নিজস্ব মৌলিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ! আবার সেই যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার বড় আদরে নাম দিলেন, আত্মীয় সমাজ ! মিস্ মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা ইংলণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট গৌরবের সহিত বলিয়াছিলেন,—"হিন্দুদর্শনের তুলনায় ইংলণ্ডের দর্শন কিছুই নহে।" আবার নেটাল বন্দরে ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়িতেছে শুনিয়া, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য ভগ্নচরণ লইয়া কি অদ্ভুত অধীর আনন্দে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন এবং যেন হৃদয়ের কি বাঞ্ছিত দৃশ্য দেখিয়া তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। তাঁহার এই সকল কার্য্যে হৃদয়ের ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি সর্ব্বলোকস্বীকৃত জ্ঞান ও কর্ম্মের অনন্তকালস্থায়ী ভিত্তির উপর তাঁহার সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সার্ব্বজনীন মূলসত্য একেশ্বরে সরল বিশ্বাস রাখিয়া সমাজকে একতার আদর্শে চির আবদ্ধ থাকিতে তিনি তাঁহার জীবন-ঘটনার প্রত্যেক্ কার্য্য দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর আমরা তাহাই ভাবোন্মত্ততা দ্বারা বিনাশ করিতে বসিয়াছি।

বর্ত্তমান যুগে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ রামমোহনের প্রচারিত ইহাই অপূর্ব্ব শিক্ষা যে, ধর্ম্ম রক্তমাংসময় সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাময় প্রকৃতির অতীত নহে। এবং তাহা দেশকাল জাতি নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মনুষ্য সমাজকেই সর্ব্বলোক-স্বীকৃত কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে উপদেশ দেয়। তাহা এক অদ্বিতীয় জগদীশ্বরে সরল বিশ্বাসী থাকিয়া প্রার্থনা-পরায়ণতার সঙ্গে মানুষকে শুধু মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে বলে, অধিক কিছু বলে না। বরং মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া তাহা মানুষকে দেবতারূপেও দেখিতে ইচ্ছা করে না। এই স্বাভাবিক অকৃত্রিমতার উপরে তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহা মানব মাত্রেরই আদর্শ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র রামমোহন রায়ের নিকটেই পৃথিবী প্রথম শুনিয়াছে, অনন্তবিরোধী কর্ম্মজ্ঞান

প্রেমের পরস্পর মিলনে যে ধর্ম্ম, তাহাই মানুষের আদর্শ ধর্ম্ম, তাহাদের পরস্পর বিরোধী যে ধর্ম্ম, তাহা কখনই মনুষ্য সমাজের আদর্শ নয়। যেখানেই মানুষ মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দেবধর্ম্মী হইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই খানেই পৃথিবীর ইতিহাস সেই সব দেবধর্ম্মীদিগের লজ্জাজনক পতনের প্রমাণ দিয়াছে। আবার যেখানেই সম্পদগর্ব্বিত মানুষ মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধি ও শক্তির সাধনা করিয়াছেন, তাহা অজেয় মহাশক্তি হইলেও পরিণাম তাহারও শোচনীয় পরাভব ঘোষণা করিয়াছে। কর্ম্ম জ্ঞান প্রেম, এই ত্রিধারার পবিত্র সলিলে যদি উৎসর্গ করিতে পার, তবেই তোমার মনুষ্যসমাজ শক্তিমান,অন্যথা তাহা হয়তো আসুরিক সমাজ,অথবা পরপদদলিত পরাধীন সমাজ। দুইই মনুষ্যত্বের হিসাবে অনেক নীচে। এই অপূর্ব্ব, মহতী বাণী পতিত ভারত ও আসুরিক ইউরোপ, উভয় দেশের মনীষীগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়াছেন। আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মিলিয়া একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবের ঢেউ খেলিতেছে। প্রেমের বন্ধনে মানব জাতি পরস্পর মিলিত হইবার অপূর্ব্ব সম্ভাবনা অন্ততঃ মনেও কল্পনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাঁহারই মহতী প্রতিভার ফলে।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (১৪)

চড়ক পর্ব্ব। চড়কের আমোদ অতি ভয়ানক। ঝুলঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ বা বঁটিঝাঁপের কথা বলিতেছি না, বাণফোঁড়ার ব্যাপার স্মরণ করিলে বাঙ্গালীর দেবোদ্দেশে কষ্টসহিষ্ণুতার নিন্দা করিবার আর পথ থাকে না। রথ ও চড়ক, দুইটীই বৌদ্ধ পর্ব্ব বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করিতেছেন। রথ অবশ্য বৌদ্ধ পর্ব্ব, তাহার কোন সন্দেহ নাই, বুদ্ধদেব রথারোহণ করিয়া স্বীয় রাজধানীর পথে লোকের কষ্ট যন্ত্রণা মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার বিবেক জাগ্রত হওয়ায় তিনি রাজসম্পদ ত্যাগ করিয়া জীবের দুঃখ নিবারণ উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই ঘটনার স্মৃতি জন্য বৌদ্ধেরা রথযাত্রা পর্ব্ব অবলম্বন করেন, ইতিহাসে তাঁহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, আজিও অনেক বৌদ্ধভূমে উহা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। জগন্নাথ দেবেরই রথযাত্রা হইয়া থাকে, ইহাতে রথ যে বৌদ্ধপর্ব্ব, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু চড়কের কোন বৌদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না। কেবল তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে চৈত্র মাসে দেব দানব সাজিয়া লোকে নৃত্য গীত কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি করায় ঐতিহাসিকেরা চড়কের বৌদ্ধত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে ইহা বাণরাজার শিব তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। মধ্যভারতের বেরারের মধ্যে বাণগঙ্গা ও পাণগঙ্গা নামে দুইটী সরিৎ একটী পর্ব্বত তলে মিলিত হইয়া ক্রমে গোদাবরী নদীতে পতিত হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গকে "থাউ" বলিয়া থাকে, উহা মাণিক দুর্গের কয়েক ক্রোশ উত্তর পশ্চিম এবং চান্দা নগরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। সেই পর্ব্বত শৃঙ্গে বাণরাজা শিবের তুষ্টির জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত

হন, এবং ক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। যথা—প্রথমে কেবল পূজায় অভীষ্টলাভ করিতে না পারিয়া একটী বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বৃক্ষশাখায় পদদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক উক্ত অগ্নির উপর হেটমুণ্ডে ঝুলিতে লাগিলেন, শিবের কৃপায় ইহাতে তাঁহার প্রাণান্ত দূরে থাক কোন কষ্টই হইল না, অথচ অভীষ্টলাভ করিলেন না। ইহার অনুকরণের নাম ঝুলঝাঁপ। ইহা দিনাগমের পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়। যাহারা বাণরাজার তপস্যার অনুকরণ করে, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে, ব্রাহ্মণেরা এই সন্ন্যাস করেন না।

বাণ রাজা তৎপরে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া মহাদেবের নামোচ্চারণ করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে কণ্টকাদি পূর্ণ উপত্যকায় ঝম্প প্রদান করিলেন, শিবের কৃপায় মরিতে পারিলেন না, অভীষ্টও সিদ্ধ হইল না। ইহাই কাঁটা ঝাঁপ। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা বৈকালে স্নানান্তে বাদ্যভাণ্ড সহ নিকটস্থ জঙ্গল হইতে বঁইচি ফলের কণ্টকিত ঝাড়গুলি কাটিয়া আনে এবং একটী বাঁসের ভারা বাঁধিয়া তাহার সম্মুখে স্তূপাকারে রাখিয়া লাঠীর দ্বারা কাঁটা ঝাড়গুলি এমন করিয়া পিটিতে থাকে যে, উপরের কণ্টকগুলি ভাঙ্গিয়া বা অধোমুখ হইয়া যায়, তৎপরে একে একে ভারার উপর হইতে মহাদেবের নামোচ্চারণ করিয়া সেই বঁইচির ঝাড়গুলির উপর পড়িতে থাকে।

বাণরাজা শিবের উদ্দেশ্যে প্রাণদানের জন্য তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র পৃথিবীতে বিদ্ধ করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে তদুপরি পতিত হইলেন, অথচ প্রাণ বাহির হইল না, অভীষ্টও অপূর্ণ রহিল। ইহার অনুকরণ বঁটি ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপের পর দিন করিতে হয়, ঐ দিন অপরাহ্ণে সন্ন্যাসীরা স্নানান্তে কতকগুলি নূতন বঁটি (তাহাতে কিছুমাত্র ধার থাকে না) মাথায় করিয়া আনিয়া ঝাঁপের ভারার নিম্নে রক্ষা করে, একটা বৃহৎ থলিয়া খড় পূর্ণ করিয়া ঐ বঁটিগুলি সারি সারি তাহার উপর পাতিয়া জনকয়েক লোক থলিয়াটী ধরিয়া থাকে সন্ন্যাসীরা ভারার উপর হইতে "মহাদেব" নাম উচ্চারণ করিয়া তদুপরি পতিত হয়। প্রায়ই দেখা যাইত, এক একজন পড়িবার পূর্ব্বেই বঁটিগুলি কাত হইয়া পড়িত। উপরোক্ত তিনটী ঝাঁপের পূর্ব্বে শিবের অনুমতি লইতে হইত। অনুমতি লওয়ার প্রথা এইরূপ, সন্ন্যাসীরা শিবের ঘরের সম্মুখে বসিয়া মাথা ঘুরাইতে থাকে, ইহাকে মাথাচালা বলে, সেই সময় পূজারি ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতর শিবের মস্তকে ফুল গঙ্গাজল চড়াইতে থাকেন। যতক্ষণ না শিবের মাথার ফুল পড়িয়া যায়, ততক্ষণ সন্ন্যাসীরা প্রাণপণে মাথা চালিতে থাকে, এই প্রক্রিয়ায় কাহারও কাহারও মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িত। লোকে বলিত, এই ব্যক্তি গোপনে সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়াছে। কোন কোন সন্ন্যাসী অচেতন হইয়া পড়িত, কেহবা অচেতন হইয়া নানাপ্রকার বকিতে আরম্ভ করিত। ইহার উপর শিবের ভর হইয়াছে বলিয়া সকলে তাহার পদধূলি লইত, মাথায় গঙ্গাজল দিত, এবং ভক্তি করিত। সে ব্যক্তি নানাপ্রকার ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলিয়া শ্রোতাদিগকে ত্রস্ত করিয়া দিত। অনেক পরিচিত পরিবারের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে বর্ণন করিয়া সেই পরিবারের প্রতি দেবাভিসাপের ভয় দেখাইত, কখন বা মূল সন্ন্যাসীর

কখন বা যে বাবুর চড়ক, সেই বাবুর দোষের কথা তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিত। তখন সন্ন্যাসী দল বাবুর নিকটস্থ হইয়া, কখন বা তাঁহাকে ধরিয়া কখন বা কৃত্রিম বন্ধন করিয়া শিবের সম্মুখে উপস্থিত করিত। বাবু উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক আত্ম অপরাধের জন্য বিবিধ স্তুতি মিনতি করিতেন; দণ্ড স্বীকার করিলে শিরের মাথা হইতে ফুল পড়িত। তখন সন্ন্যাসীরা বাদ্যসহ নৃত্য করিতে করিতে "তারকেশ্বরের শিবো মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করিয়া ঝাঁপের নিকট উপস্থিত হইত।

কঠোর সাধক বাণরাজা নিরস্ত না হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষে পৃষ্ঠদেশে বাণ বিদ্ধ করিয়া উহা বৃক্ষ শাখায় বান্ধিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তখন সদাশিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর দান করিয়াছিলেন।

কলিকাতার সন্ন্যাসীরা অতি প্রত্যূষে কালীঘাটে গিয়া বাণ ফুড়িয়া আসিত। অন্যান্য কালীস্থানেও বাণ ফোঁড়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আমরা হুগলকুড়িয়ার বাবু শিবচন্দ্র গুহের কালীবাড়ীতে একটী লোকের জিহ্বা ফুঁড়িতে দেখিয়াছিলাম। একদল সন্ন্যাসী আসিয়া উক্ত কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলে চারিদিক বাদ্য ভাণ্ডে পূর্ণ হইল, একজন ব্রাহ্মণ scrachর মত একখানি অস্ত্র আনিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর জিহ্বাখানি টানিয়া ধরিয়া তাহার মধ্য স্থলে বিদ্ধ করিয়া দিল। সন্ন্যাসী থুথুর মত খানিকটা শোণিত ফেলিয়া দিয়া, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম মূলভাগ এক ইঞ্চি অপেক্ষাও স্থূল ৪।৫ হস্ত দীর্ঘ একটী লৌহ শলাকা তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হইত। এই সকল গাজনের দল কালীঘাট হইতে বাহির হইয়া সহরের পথে পথে, ভদ্র লোকের গৃহে গৃহে, প্রত্যেক ঠাকুরবাড়ী ও শিবমন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিত। ঢাক ইহাদের প্রধান বাদ্য যন্ত্র, অন্যান্য বাদ্যও থাকিত। দুইটী বালককে হর গৌরী সাজান হইত, তাহাদের সঙ্গে কয়েকটী ভূত এবং অন্যান্য অনেক সং সাজাইয়া পথে রঙ্গ ভঙ্গ করিত। তন্মধ্যে জেলেপাড়া ও কাঁসারীপাড়ার সং দেখিবার জন্য চিৎপুর রোড ও যে যে পথ দিয়া তাহারা প্রতি বৎসর যাইত, সেই সকল রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইত। প্রত্যেক গৃহের ছাদ বা রাস্তা ও জানালায় তিলার্দ্ধ স্থান থাকিত না। ইহার মধ্যে অশ্লীল সং, সংগীত, অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গি যথেষ্ট থাকিত। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যদিও তখন বাণ ফোঁড়া প্রচলিত ছিলনা, তত্রাচ কাঁসারীপাড়ার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে কাঁসারীরা মহা উৎসাহে সঙের মিছিল বাহির করিত। সেই সময় মহাত্মা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে, কলিকাতার অনেক গুলি কৃতবিদ্য লোক ও খ্রীষ্টান পাদরী একটী অশ্লীলতা নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন; এই সভার অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য পথে অশ্লীল সঙ্গীতাদি নিবারণোদ্দেশ্যে দণ্ডবিধির প্রচার করায় ঐ মিছিল বন্ধ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় সংবাদ পত্র এই সভাকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই।

গাজনের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে হাড়ী, মুচি, বাগদী প্রভৃতি ইতর জাতীয় লোকেরাই বাণ ফুঁড়িত, উপবীতের ন্যায় এক গোছা সূতা গলায় পরিধান করিত, সে সময় তাহাদের সম্মান দেখে কে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রেরা তাহাদিগকে প্রণাম করিত; এমন কি, অনেকে মূল সন্ন্যাসীর পদধূলিও গ্রহণ করিত। অতি আদরের সহিত তাহাদিগকে ভোজন করাইত। তাহারা লৌহ শলাকা ভিন্ন বাহুতে ছিপ, বাঁস, পূরিয়া নৃত্য করিত, কোন কোন সন্ন্যাসীকে ক্ষত ছিদ্রে সর্প পূরিয়া রাখিতেও দেখা গিয়াছে। উদরের উভয় পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া দুইটী ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্র বাণ বিদ্ধ করিয়া অগ্রভাগে ঘৃতসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে ধূনা প্রজ্জ্বলিত করা হইত, ইহাকে দশলকি বাণ বলিত। এই বাণ বালক সন্ন্যাসীরা ফুঁড়িত। দুইগাছি দড়ির উভয় মুখ দুইজন লোকে ধরিয়া থাকিত, একদল বালক সন্ন্যাসী আপনাদিগের উদরের উভয় পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে উক্ত রজ্জু প্রবেশ করাইয়া সারি বাঁধিয়া নৃত্য করিত। কণ্ঠনলির সম্মুখের চর্ম্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে তরবারি বা ছোরা বিদ্ধ করিয়া রাখিত।

শেষদিনে চড়ক। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বাণফোঁড়া বন্ধ করায় চড়ক অগত্যা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবুও দুই এক স্থানে বাণ না ফুঁড়িয়া যতদূর হইতে পারে, তাহা হয়। তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলায় কোটালীপাড়া এবং কলিকাতায় সাতুবাবুর মাঠে চড়কগাছে ঘুরান হয় দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে যে সন্ন্যাসী চড়কগাছে ঘুরিত, তাহাদের পৃষ্ঠে দুইটী মোটা মোটা বড়সী বিদ্ধ করিয়া রজ্জুযোগে তুলিয়া পাক দেওয়া হইত। সে সময় তাঁহার কষ্টের কথা বর্ণনাতীত, কিন্তু সে ব্যক্তি কোন প্রকার কষ্ট প্রকাশ করা দূরে থাকুক, নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী নৃত্য ও ব্যঙ্গ পরিহাস করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। সেইজন্য "চড়কীর হাসি" প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। পিটের চামড়া ছিঁড়িয়া সময়ে সময়ে সন্ন্যাসী পড়িয়া মারা যাইত। মাজিষ্ট্রেটগণ, ঐরূপ মৃত্যু নিবারণ জন্য পৃষ্ঠে ছিদ্রের উপর একখানি গামছা বাঁধিয়া চড়কগাছে তুলিবার নিয়ম করায় অনেক উপকার হইয়াছিল, কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপারে কত সন্ন্যাসী যে শেষে ধনুষ্টংকার রোগে মারা যাইত, তাহার সংখ্যা নাই।

বাগুয়া বাজার অর্থাৎ বাগবাজারের ষোল চড়কী কলিকাতায় সর্ব্বপ্রধান বিখ্যাত চড়ক ছিল, বাগবাজার ষ্ট্রীটের এখন যেখানে মৃত বাবু নন্দলাল বসুর বাটী, তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে এই চড়ক হইত। ইহাতে চড়ক গাছের গাত্রে উপর উপর করিয়া চারিটী মাচান বাঁধিয়া সর্ব্বোচ্চ মাচানের মধ্যস্থলে একজনকে মহাদেব সাজাইয়া বসান হইত, আর প্রত্যেক মাচানের প্রত্যেক কোণে একজন করিয়া ১৬ জন লোকের পিট ফুঁড়িয়া ঝুলাইয়া দিয়া ঘুরান হইত। কিন্তু দু চড়কীগুলি যেমন বেগে ঘুরিত, ১৬ চড়কী তেমন ঘুরিত না। এই চড়ক গাছটী সম্বৎসর পেরিংস্ উদ্যানের বৃহৎ পুষ্করণীতে নিক্ষিপ্ত থাকিত। গত ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের "নব্যভারতের" ৭৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহা রামধন ঘোষের চড়ক, অনুমান ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই চড়ক বন্ধ হইয়াছে।

ঘেঁটুপূজা:—এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ঘেঁটু পূজা হইয়া থাকে। এটী বড় চমৎকার পূজা, ইহার পদ্ধতি এইরূপ:—ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির প্রাতঃকালে বাটীর গৃহিণী বা অপর কোন বয়স্থা মহিলা বাসী মুখে বাসী কাপড়ে একটা ভাঙ্গা কাল হাঁড়ি সদর দ্বারের বাহিরে উবুড় করিয়া পাতিয়া তাহার উপর এক ড্যালা গোবর, একটু সিন্দূর, পাঁচ কড়া কাণা কড়ি, একটু ছেঁড়া চুল, অত্যল্প সিদ্ধ চাউল এবং ভাট ফুল (ঘেঁটু ফুলও বলিয়া থাকে) দিয়া পূজা করিতে হয়। পূজাও বাম হস্তে করিবার নিয়ম। প্রণামের পরিবর্ত্তে বালকেরা এই হাঁড়ির উপর লগুড়াঘাত করিয়া থাকে। পরে সেই ভাঙ্গা হাঁড়ির একটু খাপরা এবং পাঁচ কড়া কাণা কড়ির সহিত

গোবরটুকু পূজা-কারিণী গৃহে লইয়া গিয়া খাপড়ার কালী দ্বারা বালক বালিকা ও শিশুদিগের চক্ষে অঞ্জন লেপন করিয়া গোবরটুকু দ্বারের উপরের চৌকাঠে লাগাইয়া তাহাতে কড়ি পাঁচটী বসাইয়া দেন।

ঘেঁটু পূজার ইতিহাস এইরূপ। মেধার গর্ভজাত মঙ্গলের পুত্র ঘণ্টেশ্বর অভিশপ্ত হইয়া নররূপে উজ্জয়িনী নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের প্রধান পণ্ডিত হইবার জন্য শিবের আরাধনা করেন, কিন্তু শিব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। ইহাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, মুখে আর শিব নাম উচ্চারণ করিব না, কর্ণে আর শিব নাম শুনিব না। কিন্তু মুখে বলা না বলা তাঁহার সাধ্যায়ত্ব হইলেও অপরে বলিলে কর্ণে নিশ্চয় শুনিতে হইবে, সুতরাং তিনি দুই কর্ণে কতকগুলি ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিলেন। কেহ শিব নাম উচ্চারণ করিতেছে বুঝিলেই মাথা নাড়িতেন এবং ঘণ্টাগুলি বাজিত। তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন, বিক্রমাদিত্যের সভাকে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইলেন, কালিদাস ব্যতীত আর সকলেই পরাস্ত হইলেন, এইবার কালিদাসের পালা, তিনি কৌশল করিয়া বলিলেন, আচ্ছা আমি আপনার সহিত বিচার করিতে পারি, যদি আপনি একটী শিব স্তোত্র রচনা করিয়া শুনাইতে পারেন। তখন ঘণ্টাকর্ণ শিব নাম ব্যতীত এমন চমৎকার একটী স্তোত্র রচনা করেন যে, সমস্ত সভাসদ চমৎকৃত হইলেন, কালিদাস বিনা বিচারে পরাজয় স্বীকার করিলেন।

কর্ণে ঘণ্টা বাঁধার জন্য ইহাঁর ঘণ্টাকর্ণনাম হয়। এবং শিব নাম ত্যাগ করায় লোকে তাঁহাকে শিববৈরী বলিত, ঘৃণার সহিত সকল প্রকার চর্ম্ম রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া পূজার ব্যাপদেশে অপমান করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু "তীর্থ্যাদি তত্ত্ব" গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি মহাদেবের একজন প্রিয় অনুচর, মীন সংক্রান্তিতে স্নুহী বৃক্ষতলে ইহাঁর পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা :—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি বিনাশন।
বিস্ফোটক ভয় প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥

ঘেঁটু পূজাও পূর্ব্বে এখনকার মত সামান্য ভাবে হইত না, ইহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে কর্ত্তারা নানা প্রকার বাদ্য সহ পথে পথে রঙ্গ ভঙ্গের সহিত গীত বাদ্য করিতেন, ফাল্গুন সংক্রান্তির প্রাতে বড় বড় জালা গামলা প্রভৃতি দ্বারা আড়ম্বর ও রহস্যসহ পূজা সমাপ্ত হইত। প্রণাম অর্থাৎ লগুড়াঘাতের সময় কে আগে লগুড়াঘাত করিবে, তাহা লইয়া বল পরীক্ষা হইত, যে সকলকে পরাস্ত করিতে পারিত, সেই অগ্রে লগুড়াঘাতের অধিকার পাইত।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্য। (১)

''বাণিজ্যে বশগালক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজ-সেবায়ং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

এতদ্দেশে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, দিন দিন লোকের যে সকল মানসিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তন্মধ্যে স্বজাতীয় প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির সমধিক উন্নতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় সম্বন্ধে দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিতেন না এবং মনোনিবেশের বিষয় বলিয়াও গ্রাহ্য করিতেন না, আজ্ কাল পাশ্চাত্য বিদ্যালোক প্রভাবে তাহা পরিদৃশ্যমান ও সম্যক্ আলোচ্যমান হইতেছে।

যদিও আমাদিগের চিত্তহারিণী কামদুঘা সংস্কৃত ভাষা বিদ্যমান থাকিতে ইংরাজী ভাষা হইতে গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যাদি শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শিক্ষিতব্য বিষয় অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি আমরা এই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা হইতে যে মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমরা এতদ্ ভাষাকে হৃদয়ের সহিত ভাল-

বাসি। এই মানসিক উন্নতি কি? বলা বাহুল্য যে, এস্থলে মানসিক উন্নতি গুটিকতক প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও গুটিকতক প্রসুপ্ত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ মাত্র। ইহা সাধারণতঃ অনুসন্ধিৎসা, কুসংস্কার-পরিবর্জ্জন বা সাধারণ চিন্তাশীলতা, স্বজাতীয় গৌরব-রক্ষণ, স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বজাতীয় অভাব মোচনেচ্ছা। পাশ্চাত্য বিদ্যার সুবিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতেছে, এবং দিন দিন কৃতবিদ্য লোকের রুচির পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে। জ্ঞানের জন্য যত না হউক, ধর্ম্ম, দয়া দাক্ষিণ্যাদির জন্য যত না হউক, স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য এবং স্বজাতির হীনত্ব মোচন জন্য সুশিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। চতুর্দ্দিকেই অনুসন্ধিৎসা, চতুর্দ্দিকেই অভাব-বোধ, এবং চতুর্দ্দিকেই আবার সেই অভাব দূরীকরণার্থ প্রযত্ন ও অধ্যবসায়।

ইদানীং কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রই স্বজাতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী হইয়া প্রাচীন শাস্ত্র নিচয় ও পুরাণ ইতিহাসাদি হইতে সার সঙ্কলন করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বসংগ্রহে এবং তদ্দ্বারা জাতীয় গৌরব-রক্ষণে ও জাতীয় গৌরব পরিবর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্বজাতীয় পুরাতন ইতিহাসের এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, তৎসম্বন্ধীয় কোন একটী বিষয়ের অবতারণা দেখিলেই স্বজাতিপ্রিয় সহৃদয় পাঠকের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে উৎসাহিত হইয়া উঠে।

শীর্ষকোল্লিখিত বিষয়টী যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি আবার গুরুতর। ইহার উপর প্রাচীন ভারতের সমস্ত হিন্দু সমাজ, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এবম্বিধ প্রবন্ধের লেখককে সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ, পুরাতন হিন্দু সমাজতত্ত্ব-বিশারদ, বহুদর্শী এবং প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়। কিন্তু যথোচিত ক্ষমতা না থাকিলেও সদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা সকলেরই উচিত, এই কর্ত্তব্যানুরোধে অথবা "গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ" —পণ্ডিতেরা দোষ না দেখিয়া গুণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, এই ভরসায় মাদৃশ স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন-ব্যক্তিও এতাদৃশ প্রয়োজনীয়, দুরূহ ও গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, যখন যে জাতিই সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়াছে, সেই জাতিরই সভ্যতা, প্রধানতঃ কৃষি ও বাণিজ্যের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিয়াছে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে প্রকৃত সভ্যতার সমুদ্ভব হয় না। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; একের অভাবে অপরের বিদ্যমানতা, অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয়।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমুত্থিত হইয়া এক সময় পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির সভ্যতা-পথ-প্রদর্শক ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহারা দশগুণোত্তর সংখ্যা নিয়মের উদ্ভাবয়িতা হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, চিকিৎসা বিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যাদির উৎকর্ষসাধন করত, প্রাচীন আরব, মিশর ও গ্রীস দেশ বাসীগণকে সেই সেই শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের গভীর মস্তিষ্কসমুত্থিত বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, দর্শন, জ্যোতিষ ও সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র, পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য জাতির নিকট উপাস্য দেবতা হইয়া রহিয়াছে। যে প্রাচীন গ্রীস সমস্ত ইয়োরোপ খণ্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষক ও সভ্যতা-প্রবর্ত্তক, সেই পুরাতন গ্রীসই এক কালে ভারতের মন্ত্র-শিষ্য ছিল। আর্য্যগণ ভূমি-কর্ষণ, গৃহ ও রাজপথ-নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি যে সর্ব্বাগ্রে শিখিয়াছিলেন, তাহা ভাষাতত্ত্ব দ্বারাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

ফলতঃ, যৎকালে ভারত ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ ঘোর অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন, তখন কেবল মাত্র ভারতীয় আর্য্যগণই কালে

বিজ্ঞানোন্নত ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অঙ্কে লালিত হইয়া সভ্যতার উচ্চতম চূড়া সমারূঢ় হইয়াছিলেন, তৎকালে যে তাঁহারা সভ্যতার ও উন্নতি নিদান কৃষি-বাণিজ্যাদির প্রকৃষ্টরূপে উন্নতির সাধন করিয়াছিলেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? রত্ন-প্রসূতি ভারতভূমি সাগরাম্বরা পৃথিবীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী, ইতিহাসের আদরের ধন, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ভারত পৃথিবীতে স্বর্গ। যে ভারতে ছয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানাবিধ স্থলজ ও জলজ শস্যোৎপাদন করে; যে ভারত প্রাচীন গ্রীকজাতি ও রোমীয় জাতির নিকট স্বর্ণভূমি বা দেবভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল; সেই ভূস্বর্গ ভারতে যে বাণিজ্য ছিল না, ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা।

উত্তরে চিরতুষার-মণ্ডিত মস্তক অভ্রভেদী হিমালয়, দক্ষিণে সাগরোর্ম্মি-বিধৌত কন্যাকুমারী, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি রাজ্যস্থ পর্ব্বতমালা ও পশ্চিমে কলনাদী সিন্ধুনদ—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের (এ স্থলে কুমারিকা খণ্ডকেই ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করা হইল) বিচিত্র দেশনিকরের ভূভাগ-নিচয়ে আবহমান কাল হইতে উদ্ভিজ্জ, খনিজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রভূত দ্রব্য-জাত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্তও প্রকৃতি-দেবী ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন ও মুক্তহস্ত রহিয়াছেন, এবং চিরকালই যে এইরূপ থাকিবেন, ইহাও বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

যদিও কালের পরিবর্ত্তনশীল প্রভাবে রত্নগর্ভা ভারতভূমি প্রাক্তন সৌভাগ্য সুখে বঞ্চিত হইয়াছে; যদিও উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতি-নিচয়ের আক্রমণে হৃতসর্ব্বস্ব ও শক্তিহীন হইয়াছে; যদিও ভারত নানাবিধ আভ্যন্তরিক দুরবস্থায় দিন দিন ক্ষীণ ও অন্তঃসার-শূন্য হইতেছে; ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থাতেও যখন আমরা যাহা চাই, তাহাই পাইতেছি, এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানবগণও ইহার প্রসাদে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে, তখন প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ, পৃথিবীর যৌবনাবস্থায় ভারত যে কত রত্ন, কত জীবিকা-দ্রব্য এবং অমৃতময় ভোজ্যই প্রদান করিত, তাহা একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। এরূপ সর্ব্বশস্যাঢ্য দেশের মানবগণ ঐ সমস্ত সামগ্রীর পরস্পর বিনিময়ার্থ অবশ্য অতি পূর্ব্ব কালেই অল্প বা বিস্তৃতরূপ বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে অপরিজ্ঞাত কালে বর্ণ-বিভাগ সংগঠিত হইয়াছিল, তৎকালেও ভারতে সামান্যরূপ ব্যবসায়ের আরম্ভ হওয়া নিতান্ত সম্ভব; কারণ, কৃষি বাণিজ্যাবলম্বনই বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল।

প্রাচীন কালে যে হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও দেশ দেশান্তরে গমনাগমন ছিল, তদ্বিষয়ে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, মনু, মিতাক্ষরা, ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, নাটকাদি গ্রন্থে ও পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের গ্রন্থাবলীতে বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা যতই অনুসন্ধান করিব, ততই এতদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগ প্রাপ্ত হইব।

যখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ঋগ্বেদ-সংহিতায় সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন অতি পূর্ব্ব কালেই যে হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা করিতেন ও দেশ বিদেশে গমন পূর্ব্বক বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। বোধ হয়, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ মনুসংহিতা ও বাল্মীকি-রামায়ণের অপেক্ষা প্রাচীন নহে।

আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর শাস্ত্রীয় বিভাগ এবং ভারতবর্ষস্থ ও তদ্বহির্ভূত দেশগুলির অবস্থান ও কালক্রমে তাহাদের নাম-পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি; কারণ, প্রাচীন ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলেই কোন্ কোন্ দেশ ও মহাদেশের সহিত ঐ সকল বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যকীয় হয়।

পুরাণাদি শাস্ত্রানুসারে চতুঃসাগর পরিবেষ্টিতা পৃথিবী প্রধানতঃ অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা এই ত্রিবিধ খণ্ডে বিভক্তা। অধুনা অশ্বক্রান্তা,—আশিয়া, রথক্রান্তা—আফ্রিকা এবং বিষ্ণুক্রান্তা—ইয়োরোপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুরা প্রতিদিন স্নান কালে এই ত্রিবিধ খণ্ডে বিভক্তা পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া পাপক্ষয়ার্থ গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া থাকে; যথা—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে! হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
উদ্ধৃতাসিবরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয় ॥"

মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন যে, চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বাজাশ্বের অধস্তন সন্তান মহারাজ অশ্বের নামানুসারে তদধিকৃত মহাদেশের নাম 'আশিয়া' হইয়াছে।

রথক্রান্তা মহাদেশের অপর নাম সূর্য্যারিকা। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যাবনিক ভাষায় 'আফ্' শব্দের অর্থ সূর্য্য, সুতরাং যবনাধিকার সময়ে সূর্য্যারিকা এই শব্দের সূর্য্য এই শব্দাংশটী 'আফ' শব্দাংশে পরিবর্ত্তিত হয়, 'আরিকা' শব্দাংশটীর 'আ' পরিত্যক্ত এবং কেবল 'রিকা' এই অংশটুকু গৃহীত হয়, তদনুসারে আফ্ (সূর্য্য) + রিকা = আফ্রিকা নাম হইয়াছে। আমেরিকা মহাদেশ অশ্বক্রান্তা বা আশিয়া খণ্ডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। পুরাণোক্ত আবর্ত্তন বা রামায়ণোক্ত সুদর্শন মহাদ্বীপ বলিয়া অনুমিত হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগর গর্ভস্থ অষ্ট্রেলিয়া পৌরাণিক পাঞ্চজন্য মহাদ্বীপ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

অতি পুরাতন কাল হইতে ভারত-মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু সংখ্যক দ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল দ্বীপের মধ্যে সুমিত্র (Sumatra,) যব (Java,), বলি (Bali,), সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ, মল্লদ্বীপ এবং সুখতর বা শোকত্র' (Sacotra) দ্বীপ প্রধান।

অশ্বক্রান্তা (আশিয়া) খণ্ডের দক্ষিণ দিকে যে মহান্ উপদ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। অতি পূর্ব্বকালে ইহা নাভিবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে দুষ্মন্ত-নন্দন মহারাজ ভরতের নামানুসারে উহার নাম ভারতবর্ষ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রে ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে মহাসাগর রহিয়াছে বলিয়া কথিত আছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যমণি মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যের প্রারম্ভেই শৈলরাজ হিমালয়ের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে,—

'অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশিদেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌতোয়নিধীবগাহ্যস্থিতঃপৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ ॥''

ভারতবর্ষের উত্তরে দেব-নিবাস হিমালয় নামে পর্ব্বতরাজ, পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র প্রবেশ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

এই শ্লোকোক্ত পূর্ব্ব সমুদ্র যে বর্ত্তমান চীন সাগর বা প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিম সমুদ্র যে ভূমধ্যসাগর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, সাময়িক উপপ্লব দ্বারা পৃথিবীতে বিবিধরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সকল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।

সমুদ্রজলপ্লাবন, ভূমিকম্প, এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত-জনিত বিবিধ নৈসর্গিক উপপ্লব দ্বারা মহোচ্চ পর্ব্বত সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন এবং ভূমি-নিমগ্ন হইয়া যায়। আবার এই সকল উপপ্লব দ্বারা সমতল ক্ষেত্র সকল হইতে সহসা প্রস্রবণ ও পাহাড় বা পর্ব্বত সমুত্থিত অথবা ঐ সকল ক্ষেত্র খাতে বা হ্রদে পরিণত হইয়া থাকে।

এইরূপে বহুকাল হইতে নগপতি হিমালয় নৈসর্গিক উপপ্লব দ্বারা স্থানে স্থানে ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক হিমালয়ই পশ্চিম দিকে আফগানিস্থানের উত্তরে হিন্দুকুষ ও পারস্যের উত্তরে মজন্দরন্ (Mezanderan) নামে অভিহিত হইয়া তুর্কদেশের মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে আবার ঐ পর্ব্বতই মানলিং (Manling) নামে কথিত হইয়া

চীনদেশের মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। পরন্তু হিমালয়ের পূর্ব্বাংশের অন্য এক শাখা চীনদেশের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ দিয়া আনাম (Anam) দেশের মধ্য দিয়া চীন সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। যিনি আশিয়া খণ্ডের মানচিত্র অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিবেন, তিনি এই সকল বিষয় অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতদ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হইল যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত মহাকবি কালিদাসের উক্তির কোন বিরোধ নাই। পরন্তু, যে সময় সর্ব্বগুণাকর প্রবল প্রতাপ মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন সুশোভিত করেন, তৎকালে হিন্দু ভুগোল ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। এইক্ষণ যেমন ইংরাজী ভুগোল ও জ্যোতিঃশাস্ত্রকারেরা গ্রীণিচ নগরে আদ্য মধ্যাহ্ন-রেখা (The first Meridian) কল্পনা করিয়াছেন, তেমনি পূর্ব্বকালে ভারতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম রত্ন ভুগোল-জ্যোতিঃ শাস্ত্র-বিশারদ বরাহমিহির উজ্জয়িনী নগরীতে আদ্যমধ্যাহ্ন-রেখা কল্পনা করিয়া স্থান সমূহের দ্রাঘিমা নির্ণয় করিয়াছিলেন *।

এই প্রবন্ধে হিন্দু ভুগোল শাস্ত্র বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং প্রাচীন কালে যে সকল মহাদেশ, দেশ ও নগরাদির সহিত ভারতীয় বাণিজ্য বিষয়ক সংস্রব ছিল, আমরা কেবল সেই সকল স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য যথাজ্ঞান লিখিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত আধুনিক ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ, প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুতরাং, বর্ত্তমান সাময়িক আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, তুর্ক এবং আরব দেশ পুরাতন ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে শক, দরদ, বর্ব্বর, পহ্লব, হূন, কিরাত, হারীত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ যবন জাতি নিচয়ের বাসভূমি সকল—বর্ত্তমান তিব্বৎ, তুর্কস্থান বা তুরান্, চীন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও সাইবিরিয়া নামক দেশগুলি পুরাণাদি শাস্ত্রে সাধারণতঃ, হিমালয় প্রদেশ নামে বিখ্যাত। বিশেষতঃ, মানস-সরোবর, চীন, মহাচীন ও উত্তর কুরুবর্ষের কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বারম্বার উল্লিখিত রহিয়াছে। প্রাচীন কালে সিন্ধুনদের পশ্চিমে আফগানিস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশ ব্যতীত আফগানিস্থানের পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত দেশসমূহ ম্লেচ্ছ ও যবন জাতির বাসভূমিরূপে প্রসিদ্ধ। পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে মহারাজ সগর এবং ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম এই উভয়ের ভয়ে হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য হইতে পলায়ন করিয়া সিন্ধু নদের পারস্থিত বিবিধ স্থানে এবং হিমালয়ের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত নানা দেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল। এইরূপে মহারাজ যযাতির অভিশপ্ত জাতি-ভ্রষ্ট পুত্রগণও ভারতের সীমান্ত প্রদেশ-সমূহে, হিমালয়ের পাদস্থিত বিবিধারণ্যে এবং ভারত-বহির্ভূত বিবিধ দেশে যাইয়া বসতি করে। ইহারা সকলেই স্বজাতীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বেশ, ভূষা, আচার ও ব্যবহারাদি হইতে পরিভ্রষ্ট এবং সামান্যতঃ ম্লেচ্ছ ও যবন জাতীয় নামে পরিচিত হইয়া শক, দরদ, বর্ব্বর, পহ্লব, হূন, কিরাত, হারীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। * অপিচ, ক্ষত্রিয়জাতি-চ্যুত বিকৃত-বেশধারী উল্লিখিত শকাদি ম্লেচ্ছ ও যবনগণ কালক্রমে ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় যাইয়া বাস

---

* The Kumaon conquerer seized upon Delhi but was soon dispossessed by Vicramaditya, who transferred the seat of imperial power from Indra prastha to Avanti or Ojein, from which time it became the first meridian of the Hindu astronomy.
Tod's Rajasthan, Vol I.

Vide রামায়ণ, মহাভারত and বিষ্ণুপুরাণে।

করিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুপ্রদেশে ইঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ নরপতিগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ হইতে আমেরিকায় গিয়া বাস করিয়াছিল, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়।

প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত কুমারিকা খণ্ডেই হিন্দুদিগের প্রধান বাসস্থান ছিল বলিয়া, উহাই পরে ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ বলিলে প্রাচীন ভারতবর্ষ না বুঝিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান বুঝিতে হইবে।

এই ভারতবর্ষের (কুমারিকা খণ্ডের) উত্তরদিকে চিরতুষারশীর্ষ অভ্রভেদী নগপতি হিমালয়, পশ্চিমে নদ-রাজ সিন্ধু, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন যুনানী মণ্ডলে ইহা ইণ্ডিয়া নামে খ্যাত ছিল বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সমাজে ইহা ঐ নামেই পরিচিত রহিয়াছে।

এই ভারতবর্ষ প্রকৃতি দ্বারা চির বিভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে বিন্ধ্য নামক মহাগিরি অবস্থিত। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে পুণ্যভূমি—আর্য্যাবর্ত্ত, এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য দেশ চিরপ্রসিদ্ধ। বৈদিক কালে এই আর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি নামক দুইটী পবিত্র দেশ অতি প্রসিদ্ধ ছিল। পুণ্যসলিলা সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ নামে খ্যাত। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই সুবিস্তীর্ণ ব্রহ্মর্ষি দেশ। এই দেশে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন নামক প্রদেশগুলি অবস্থিত;—যথা—

"সরস্বতী-দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তংদেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"
"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥" মনু।

এইরূপ আমরা আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য নামক বিভাগদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তী দেশ ও প্রদেশসমূহের সংস্থিতি বর্ণনার অগ্রে সিন্ধুনদপারবর্ত্তী ও হিমগিরির উত্তরদিকস্থিত দেশ ও প্রদেশাদির যথাযথ সংস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। আফগানিস্থান——প্রাচীন নাম অপগণ। পুরাকালে ইহা আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। এই দেশের অন্তর্গত গান্ধার (বর্ত্তমান কান্ধার) প্রদেশে পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিল। গান্ধার রাজতনয়া গান্ধারী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ছিলেন। এই দেশে বৈয়াকরণ-কেশরী ভগবান্ পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন।

এই সময়ে আফগানিস্থানে যদুবংশীয় নৃপতিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া বহুকাল রাজ্যশাসন করে।

কোন সময় কাশ্মীর রাজ, উক্ত দেশীয় যাদবগণ কর্ত্তৃক কন্যা-স্বয়ম্বর-সভায় সমাহূত হইয়াছিল। *

বহুকাল পরে যাদবগণ যবনাক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার ভারতে আসিয়া সিন্ধুদেশে ও যশল্মীরে রাজধানী স্থাপন করে। যশল্মীরের বর্ত্তমান রাজবংশ সেই প্রাচীন যদুবংশের শাখা। †

২। বেলুচিস্থান—পূর্ব্বোক্ত অপগণ দেশান্তবর্ত্তী প্রদেশ। এই প্রদেশে যদুবংশীয়েরা বহুকাল রাজত্ব করিলে, উহা যবনাধিকৃত হয়।

৩। পারস্য—প্রাচীন পারসীক দেশ। ইহার অন্য নাম ইরান্। ইহা প্রাচীন কালেও অনার্য্য দেশ ছিল। এই দেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যায় বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। অমরকোষ অভিধানেও অশ্বের প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে,—

"বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লিকা হয়াঃ।"

বনায়ু, পারসীক, কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশীয় অশ্ব প্রসিদ্ধ। ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

---

* Vide Rajatarangini.

† "The Yadus of Jessulmier, who ruled Zabulisthan and founded Guzni, claim the Chagitais of their own Indu stock."
Tod's Rajasthan, Vol. I.

রাজর্ষি কালীনারায়ণ।

জন্ম—ঢাকার অধীন আকানগরে, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১২৩৬ সালে।

মৃত্যু—ঢাকা নগরে, ১৩ই আষাঢ়, রবিবার—১৩১০, ২৮শে জুন, ১৯০৩।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী লর্ড রোজবেরি, সুবিখ্যাত মহাত্মা গ্লাডোষ্টোন সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—"যে জাতিতে এ হেন লোকের অভ্যুদয়, সে জাতি ধন্য। আমরা আশা করি, যে জাতি গ্লাডোষ্টোনকে সৃজন করিয়াছে, সেই জাতি আবারও এইরূপ মহাত্মার অভ্যুদয়ের কারণ হইবে।" আমরা গ্লাডোষ্টোন সাহেবের মহত্ব যখন স্মরণ করি, তখন উপরোক্ত কথাগুলিও স্মৃতিতে জাগরিত হয়। ইংরাজ জাতির মধ্যে দিন দিন নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে যখন স্মরণ করি, তখন আপনা আপনি প্রশ্ন উপস্থিত হয়,—"ইংরাজ জাতিতে আবার কি গ্লাডোষ্টোনের ন্যায় মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইবে?"

বঙ্গদেশের নানা কালিমার চিত্র চতুর্দ্দিকে দেখিয়া দেখিয়া আমরা ম্রিয়মান। আমাদের দেশীয় লোকদিগের পূতিগন্ধময় চরিত্রের আভাস পাইয়া আমরা মরিয়া রহিয়াছি। এহেন দেশে যখন ক্ষণজন্মা পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের চরিত্র-মাধুর্য্যের পরিচয় পাই, তখন বিস্ময়পূর্ণ মনে জিজ্ঞাসা করি, কি দেখিলাম, কি শুনিলাম!! মনে হয়, এই পতিত জাতির উদ্ধারের বীজমন্ত্র যেন তাঁহাদের জীবন-ইতিহাসে প্রোথিত;—মনে হয়, তাঁহারা মহান্ধকারের আলো;—তাঁহাদের জীবনের আলোকে এ দেশ আলোকিত;—মনে হয়—তাঁহারা স্বর্গচ্যুত দেবতা।

এই বঙ্গদেশে প্রতিদিনই কত কত লোক জন্ম গ্রহণ করিতেছে—কত কত লোক মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে—কত আসিতেছে, কত যাইতেছে! তাহাদের ইতিহাস কেহ লেখে না, কেহ জানে না, কেহ গণে না। জীবন পাইয়া জীবনের সৎব্যবহার এদেশে অতি অল্প লোকে করে, আহার বিহার লইয়াই অনেকে ব্যস্ত; সুখ সুখ করিয়া সকলে অস্থির;—পরের ভাবনা অতি অল্প লোকে ভাবে;—পরকালের কথা ভাবে আরো অল্প লোকে। হাসিতে খেলিতে, নাচিতে গাইতে, অনেকের জীবন কাটিয়া যাইতেছে। আর অনেকের কাটিতেছে, অহঙ্কারের সেবায়,—হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায়,—অথবা কেবল ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ও রিপু-সেবায়। হায়, এদেশে অমূল্য মানব জীবন পাইয়া তাহার সৎব্যবহার করে, অতি অল্প লোকে! আর যাঁহারা এই পতিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও চরিত্র, ধর্ম্ম ও সেবায় সকলের পূজা পাইবার যোগ্য, তাঁহাদের কথাই বা কে ভাবে? এদেশে কত কত মহাজন বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিতেছেন, কে তাহার গণনা করে?

আমরা অল্প দিন পূর্ব্বে বালি-গ্রামে গিয়াছিলাম। বালির গঙ্গার তটে এ দেশের এক অমূল্য কীর্ত্তি আছে। আমরা একদিন সেই কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। যে বাড়ীতে মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত শেষ জীবন কাটাইয়াছিলেন, সেই বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। অধিক দিন হয় নাই, অক্ষয়কুমার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন;—আজও তাঁহার বাড়ী সেই ভাবে আছে। আজও তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত নানা বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বাড়ী, সেই বৃক্ষরাজি, সেই রাস্তা, সবই আছে, কিন্তু সেই মহাপুরুষ নাই! আমরা সেই নির্জ্জন বাড়ীতে যাইয়া এ জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে কত কথা ভাবিয়াছিলাম! একটা অক্ষয় কীর্ত্তি যে বাড়ীর সর্ব্বস্থানে—ইষ্টকে ইষ্টকে, বৃক্ষে বৃক্ষে, প্রোথিত, হায়, আজ তাহা পরিত্যক্ত,—অবহেলিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত! যে দেশে মহাপুরুষের আদর নাই, সে দেশ আবার জাগিবে কি? এমারসন, কারলাইল, সেক্ষপিয়র, স্কট প্রভৃতির বাসগৃহ এখন মহা তীর্থে পরিণত হইয়াছে,—কত সহস্র সহস্র

লোক কত দূর দূরান্তর হইতে সেখানে যাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, আর এই কলিকাতার অতি নিকটে অক্ষয় কীর্ত্তি আজ অবহেলিত! কেহ দেখে না, কেহ ভ্রমেও সে কথা ভাবে না। এইরূপে, মহাত্মা রাজনারায়ণের গৃহ, বিদ্যাসাগরের গৃহ, এবং সর্ব্বোপরি রামমোহনের গৃহ উপেক্ষিত! সেখানে দুর্দ্দান্ত প্রতাপে কাল কেবল উদাসীনতার কথা ঘোষণা করিতেছে। যে জাতির মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তি, এইরূপে উপেক্ষিত, সে জাতি আবার জাগিবে কি? অক্ষয়কুমার যে কত লোকের নবজীবনের কারণ, তাহা অতি অল্প লোকে জানে। আজ আমরা এক মহাপুরুষের কথা লিখিব, যিনি অক্ষয়কুমারের অনুপ্রাণনে পরিবর্ত্তিত। সেই জীবনের কথা লিখিবার সময় বালির কীর্ত্তির কথা আপনা আপনি প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

ঢাকা-মৈমনসিংহ-রেলওয়ে লাইনে কাওরাইদ নামক একটী ক্ষুদ্র ষ্টেসন আছে। সে স্থান এ দেশের এক মহাপুরুষের পদরেণুতে পবিত্র হইয়াছে,—সে স্থান মহাজনের মহাকীর্ত্তিতে পূর্ণ। সে স্থানও বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিবে কি না, আমরা জানি না। জানি না, যে মহাত্মার লীলা-কীর্ত্তিতে সে স্থান পূর্ণ, সে লীলা-কীর্ত্তি এ দেশের পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য একটুও সাহায্য করিবে কি না? কিন্তু ইহা জানি, সে মহাজনের লীলা অমানুষীভাবে পূর্ণ। পাঠক সে মহাজন কে, যদি জানিতে চাও, আমাদের অনুসরণ কর।

অবস্থাপন্ন লোকেরা রাজভবনে বাস করেন—রাজভোগ্য আহার করেন, গাড়ী ঘোড়ায় বিচরণ করেন, বড় বড় লোকের সহিত মেশামিশি, ঘেসাঘেসি করেন। এক সময়ে যে ঘোর দরিদ্র ছিল, সেও যদি সময়ে ধনী হয়, তবে তাহাকে আর দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, দরিদ্রদের সহবাসে দেখিতে পাইবে না,—অবস্থার স্তর ভেদ করিয়া সে উন্নত স্তরে আসন পাইয়াছে, পূর্ব্বের সব পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বের বাড়ী, ঘর, চাকর-বাকর, বন্ধুবান্ধব—সব উপেক্ষিত, বিস্মৃত, অনাদৃত। তাহাকে আর পূর্ব্ব সংসর্গে, পূর্ব্ব মিলনের স্থলে, দেখিতে পাইবে না। সে এখন বড়ত্বের মুকুট মাথায় দিয়া রাজভবনে রাজবেশে দণ্ডায়মান। এ হেন কান্তিধ্বজী একজন বাবুকে এক সময়ে পাড়ার একজন বিশিষ্টা আত্মীয়া "পেঁচো, তোর পাতে একটা মাছের মুড়ো দিব"—বলায় কত লাঞ্ছনা, কত তিরস্কার উপহার পাইয়াছিলেন। আত্মীয়ার অপরাধ এই—"তিনি পাঁচু বাবু বলিয়া সম্বোধন করেন নাই!" এইরূপ পরিবর্ত্তনধর্ম্মী জাতির মধ্যে এমন এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বর্ণ-সিংহাসনের অধিকারী হইলেও, কাঙ্গালের পর্ণকুটীরকে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি, উড়িষ্যার কামিসনার শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত মহাশয়ের পিতৃদেব—আমাদের কাঙ্গাল ঋষি কালীনারায়ণ! তিনি নরদেহে দেবতা ছিলেন, প্রবন্ধের প্রারম্ভে, আজ তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি।

স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন-ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—এ দেশের প্রকৃত মহৎ লোকেরা সদা লুক্কায়িত থাকিতেই চিরদিন ভালবাসেন। এ দেশের যোগী ঋষিরা গহন-বনে পর্ব্বত-গুহায় তাঁহাদের অমূল্য জীবন কাটাইতেন। এ দেশের প্রাচীন গ্রন্থকারগণ নিজের লেখা অন্যের পুস্তকে প্রক্ষেপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এ দেশের প্রকৃত সেবকগণ অন্যের মস্তকে যশের মুকুট অর্পণ করিয়া নিজেরা গোপনে থাকিতে ভালবাসিতেন। সমস্ত ভারত-ইতিহাসে, এই জন্য, প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির অতি অল্প পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। এখনকার দিন খুব পরিবর্ত্তিত—বিজ্ঞাপন-যুগে ঢাক-ঢোল-বাদ্য নিনাদে সব কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এহেন দিনেও এমন অনেক মহাপুরুষ এদেশে জন্মিয়াছেন, যাঁহারা সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে ঋষি-তুল্য জীবন কাটাইতেছেন। তাঁহারা কখনও উপাধিতে ভূষিত হন নাই, কখনও অবাধ-আদর-অভ্যর্থনা পান নাই। তাঁহারা গোপনে গোপনেই কাজ করিয়া বেড়ান, ধর্ম্ম সাধন করেন, এবং কাঙ্গাল

গরিবদের জন্য দেহপাত করেন। কাঙ্গাল হরিনাথ এহেন লোক ছিলেন, মৌনী বাবা প্যারীলাল এহেন লোক ছিলেন, সাধু ভুবনমোহন এ হেন লোক, এবং এহেন লোক ছিলেন— স্বর্গীয় কালীনারায়ণ। যাঁহার সন্তানগণের মধ্যে কেহ কমিসনার, কেহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ সিবিল সার্জ্জন, যাঁহার জামাতাগণের মধ্যে কেহ হাইকোর্টের উকীল, কেহ এসিস্‌টেণ্ট কমিসনার, কেহ বারিষ্টার, কেহ ডাক্তার, কেহ স্কুল-ইনস্পেক্টর, এবং পুত্রের জামাতাগণ সিবিলিয়ান, ব্যারিষ্টার, তিনি কাঙ্গালদিগের মধ্যে কাঙ্গালবেশে জীবনের অধিকাংশ সময় কাঙ্গালদের নানাপ্রকার অভাব মোচন করিয়া ফিরিতেন, এরূপ চিত্র কখনও কেহ দেখিয়াছ কি ? আমরা যখন তাঁহার কথা ভাবি, তখন মনে হয়, তিনি প্রকৃত ঋষি ছিলেন। ধন্য তাঁহার জীবন। লোকেরা বলে, তিনি দেড় পয়সার আয়না চিরুণী দ্বারা চিরকাল কাজ সারিয়া গিয়াছেন, জীবনের বার্দ্ধক্যের অংশ বাদে আর সব সময়েই রেলের নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন, * শেষ জীবনে অন্যের উত্তেজনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইলেও, প্রায়ই তৃতীয় শ্রেণীতে যাইয়া বসিতেন, এবং জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন, "এমন খোলা প্রাণ সাধারণ লোকের মধ্যে ভিন্ন পাওয়া যায় না, আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হই।" এমন সামান্য বেশে, সামান্য ভাবে বেড়াইতেন যে, কেহ তাঁহাকে কমিসনারের পিতা বলিয়া বুঝিতে পারিত না। কালীনারায়ণের আবির্ভাবে এ দেশ ধন্য হইয়াছে।

এই যে সাধারণ-সহবাস-পিপাসা, অদম্য ভাব-বিহ্বলতা, দয়া, প্রেমের স্ফূর্ত্তি, এ সকল কালীনারায়ণ কোথায় পাইলেন ? পাঠক সাধকের আপন কাহিনী পাঠ কর, এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে। তিনি যে "মাতৃদেবী" লিখিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু তাঁহার গুপ্ত আত্মবিবরণ পাওয়া যায়।

"মা বলিতে আমার গর্ভধারিণী মা যশোদা দেবী এবং আমার চারিবর্ষ বয়সাবধি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র ভাবে আমার দেহ, মন, শক্তি লইয়া খেলা করিয়াছেন যে মা ভাগীরথী দেবী, এই দুই মা-ই আমার সর্ব্বস্ব। অতএব আমার প্রাণের ভক্তিবাচক এই মাতৃদেবী খানা প্রেম-সোহাগের অবতার মাতৃদেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে অনন্তকোটি প্রণিপাত পূর্ব্বক উৎসর্গ করিলাম।

মা গো! প্রাণারাম পূর্ণ-ব্রহ্মের মহাদান যে আপনাদের পাদপদ্ম, ইহা যেন আমার চিরজীবনের আলো হইয়া আমাকে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতে থাকে, এই বর চাই!

প্রাণ ব্রহ্ম! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সেবকাধম, শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।"

আবার—

"নরাধম দাসে রাখি ধরা বাসে,
তুমি গেলে মাগো! আপনার দেশে;
চিন্ময়ী হইয়া চিতে বিরাজিয়ে,
এদেশ সে দেশ কর একাকার।
চিতাভস্মরূপে মন্দিরে পশিয়ে
তোষ দাসে মাগো! শ্রীচরণ দিয়ে;
বিভূতিভূষণ সর্ব্বাঙ্গে মাখায়ে
কালা কালী সাদা কর গো এবার।"

অন্যত্র—

"ওঁ ব্রহ্ম বলি মন মাতৃগুণ গাও।
ব্রহ্মই যে মাতৃরূপ সে দিকেও চাও।
যেই রূপে জনে জনে করিতে মোহিত,
মাতা পিতা রূপে রূপ প্রত্যক্ষ বিদিত।"

যে মাতৃভক্তিতে পতিত আগষ্টাইন সেণ্ট হইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ও ম্যাট্‌সিনি দেশ-পূজ্য, সেই মাতৃভক্তিতে কালীনারায়ণের জীবন আরম্ভ। বোধ হয় যেন, মাতৃভক্তি-সরসীতে স্নান করিয়া কাঙ্গাল কালীনারায়ণ ভক্ত বেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তের নিজ ভাষায় বাল্য-কথা পাঠক শ্রবণ করুন।

"মন রে! জানত তুমি চারি বর্ষ কালে।
জন্মদাতা পিতা ছাড়ি পোষ্যপুত্র হলে।
সুধারাম সেন পিতা সুধার জীবন।
শিশুকালে দেখিয়াছি হয় না স্মরণ॥
এখানেও পিতৃদেব, মহীন্দ্র নারায়ণ।
তোমার আসার আগে অনন্তে গমন॥
পারিলে না মাতা পিতা সমানে দেখিতে।
পারিলে না সেই রূপ দুলাল হইতে।
পাছে বা তোমার মনে এই দাগ রয়।
তাই দাতা পূর্ণ ব্রহ্ম দিল মাতৃদ্বয়।
ভোগাতে তোমারে দাতা অমিয়ার ভার।

---

* ঢাকা গেজেট, ৩২ শ্রাবণ, ১৩১০।

সকলের এক মাতা তুই মা তোমার॥
যশোদা গর্ভধারিণী তোমার জননী।
ভাগীরথী মা'র কোলে দিয়াছেন যিনি॥
এর পর কত বার ঈশ্বরের বরে,
ভোগেছি জননী স্নেহ সদা মনে পড়ে!
জন্মভরা দুই মা'র স্নেহ মমতায়।
ডুবায়ে ফেলেছে তোরে কিবা সুখ হায়।"

এইরূপে শিশু সংসার-প্রান্তরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে প্রেম ভক্তিতে জীবন আরম্ভ, তাহাতেই পরিণতি। সাধুর আত্ম-কাহিনী বড় মধুর।

"এই ত আমার বয়স সত্তর ছাড়িল।
এর মধ্যে কত কিছু বদল হইল।
জনম অবধি ধরে বৎসর বৎসর।
দেহ মন বদলিয়ে কত রূপান্তর।
আমার বদল নাই চিরকাল আমি।
মাতৃগর্ভে সেই আমি আজিও সেই আমি।
বাল্য যৌবন প্রৌঢ় এসেছি কাটিয়ে।
এবে বৃদ্ধ বসে আছি দাড়ি পাকাইয়ে।
কালো ছিল দাড়ি মোছ মুখে দাঁত ভরা।
নাই কালো সাদা এবে দাঁতগুলি পড়া।
শৈশবে কোলের ছেলে মার মাই খাই।
কিসে কি হতেছে হবে কিছু জানা নাই।
সেই জানিবার পর জানিতে জানিতে।
উপনীত হইলাম যৌবনের পথে।
যৌবন জোয়ারে মন উজানে উজায়।
আমি ভাবি ভাটি স্রোতে ধারে ধারে যায়।
এ ভাবি জোয়ার ধারে ঢেলে দিনু গা।
বিনা বাইসে চলে যায় মন্দ লাগে না।
প্রাণব্রহ্ম দেখি মোর উজানের গতি,
সে গতি ফিরায়ে দিল ব্রাহ্মধর্ম্মে মতি।
ফুটাল প্রাণের চক্ষু করিল দীক্ষিত।
দেখিয়া বুঝিতে দিল আপনার হিত।
যৌবনের সনে কত করায়ে ভ্রমণ।
দেখাল শিখাল কত চলন চালন।
কত ফুল, ফল, শস্যে তোষিয়াছে মন।
কত ধন জন দিয়ে দানের দলন।
তার পর পড়ি যবে প্রৌঢ় অবস্থায়।
গৌরবের সৌরভ তিনি মাখাইল পায়।
বার্দ্ধক্যের দক্ষতাতে পড়েছি যখন।
তখন হইতে দেখি অন্য অয়োজন।
এখানকার লীলা সাঙ্গ হইবার আগে।
সেখানেও আয়োজন যাহা যাহা লাগে।
তার তরে অগ্রে নিলে মাতৃ মহাদেবী।
যাতে আমি মাতৃপদ পরপদে সেবি।
ভার্য্যা নিলে, পুত্র নিলে, কন্যা, পুত্রবধূ।
নাতিনী বালিকা নিলে যার মুখে মধু।
এথা যথা মধু দিয়া আদর আমাকে।
সেইরূপ অনুরূপ হল পরলোকে।
কেন নাথ! কেন নাথ! কেন নাথ এত।
ভেকেরে মোহন চূড়া পরাবার মত।
শোক তাপে কাঁদি পাছে মনে দুঃখ পাই।
তাই সে মৃত্যুর পথে অমৃতের ঠাঁই।
এখানে যেমন তুমি আমার আশ্রয়।
থাই লই থাকি পরি নাহি কোন ভয়।
এখন অনন্ত কাল যে লোকেই রব।
তুমিই আমার প্রাণ অনন্ত বৈভব।"

উপরোক্ত কথার ভিতরে সম্যকরূপে কালীনারায়ণের ধর্ম্মজীবন পরিস্ফুট রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, অক্ষয়কুমারের অনুপ্রাণনে কালীনারায়ণের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ। কিরূপে কি পরিবর্ত্তন হইল, এস্থলে সংক্ষেপ উল্লেখ করা আবশ্যক। আমরা ১৩১০—২৫শে শ্রাবণের ঢাকা প্রকাশ হইতে এতৎসম্বন্ধীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"কালীনারায়ণ ১৬। ১৭ বৎসব বয়সের সময়, ময়মনসিংহের অন্তর্গত উথরাসাল-নিবাসী, প্রসিদ্ধ গুরু জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের নিকট সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় এবং মুড়াপাড়ার বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জমিদারগণ উক্ত জগদানন্দের শিষ্য ছিলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত কালীনারায়ণ পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা, অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তখন কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব দেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তার পর, এক বৎসর ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি ত্যাগ করিয়া, কেবল সচন্দন পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একদিন একজনের মুখে শুনিলেন;

"উত্তমা মানসী পূজা, জপ পূজা তু মধ্যমা।
অধমা প্রতিমা পূজা, বাহ্যপূজাঽধমাধমা॥"

অর্থাৎ মানসিক পূজাই উত্তম, জপপূজা মধ্যম, প্রতিমা পূজা অধম, এবং বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধম। এই সংস্কৃত বচন শ্রবণাবধি প্রতিমা ও বাহ্যপূজার প্রতি কালীনারায়ণের অনুরাগ, শিথিল হইয়া

পড়িল। ভগবান কোন্ সূত্র অবলম্বনে কাহাকে কোথায় লইয়া যান, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। কালীনারায়ণ, পূর্ব্বে বাড়ী বসিয়া পূজা করিতেন। ঐ সংস্কৃত বচন শুনার পর, পুকুরের ঘাটে যাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘাটে সাধারণ ভাবে, পূজা করিয়া পুকুরের পারস্থিত শিবশঙ্কর সেনের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে যাইয়া মানসিক পূজা করিতেন। মানসিক পূজা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, এজন্য মানসিক পূজা আরম্ভ করিলেন। কালীনারায়ণের তখন বেশী বিদ্যা বুদ্ধি হয় নাই, সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, সুতরাং মানসিক পূজার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। সরলমতি কালীনারায়ণ মানসিক পূজার এই অর্থ করিলেন, মনে মনে ষোড়ষোপচারে কল্পনা করিয়া পূজা করার নাম মানসিক পূজা। তাই তিনি মনে মনে মালাই, সন্দেশ, বাতাসা, চিনি, আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, প্রভৃতি ফল ও নানাবিধ ফুল কল্পনা করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিমা পূজা ও বাহ্যপূজার বিরুদ্ধে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে তিনি কয়েকদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঢাকাতে মুন্সী কুদরতুল্লার নিকট পার্সি পড়ার সময়, তিনি একদিন বৈকালে, তাঁতিবাজারে সুলতানসাদি নিবাসী রামানন্দ সেনের বাসায় বেড়াইতে যান। উক্ত গ্রামবাসী গোকুলচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তি (আদালতে নকল মোহরের) ঐ বাসায় থাকিতেন। ঘটনাক্রমে, কালীনারায়ণ সেই বাসায়, মুখে পান চিবাইতে চিবাইতে, প্রস্রাব করিতে গিয়াছিলেন। প্রস্রাব করিয়া ফিরিয়া আসিলে, উক্ত গোকুলচন্দ্র সেন অতি বিরক্তির সহিত কালীনারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কিরে তুই ব্রহ্মজ্ঞানী নাকি ?" সেই দিনই কালীনারায়ণ প্রথম "ব্রহ্ম" শব্দ শ্রবণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও ব্রহ্ম শব্দ শুনিয়াছিলেন না। "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ কি, ব্রহ্মজ্ঞানী কাহাকে বলে, সুকোমলমতি কালীনারায়ণ সেদিন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাণের মধ্যে "ব্রহ্ম" নামের তরঙ্গাঘাত হইতে লাগিল, প্রাণ উদ্বেলিত হইল। "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ কি, জানিবার জন্য কালীনারায়ণ ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই দিনে প্রাণব্রহ্ম ভগবান কালীনারায়ণের কোমল প্রাণে তাঁহার স্বর্গীয় সিংহাসন স্থাপন করিলেন। কালীনারায়ণ, অনেক অনুসন্ধানের পর জানিলেন, কলিকাতায় ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভা নামে দুইটী সভা স্থাপিত আছে। সেই সময়ে, কাওরাইদ মহাল বাটোয়ারা হইতেছিল। ছাম দেখিবার জন্য ময়মনসিংহ গিয়াছিলেন। পিতৃব্য বীরেশ্বর গুপ্তের বাসায় বসিয়া কাগজ পত্র দেখিতেছেন, এমন সময়ে পাঁচদোনা-নিবাসী কৃষ্ণদাস সেনের পুত্র বসন্তলাল সেন, অন্য একঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া খুব সুখ বোধ হইল। বসন্তলাল সেনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বই পড়িতেছ ?" বসন্তলাল উত্তর করিল, ইহা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "ধর্ম্মনীতি"। কালীনারায়ণ বলিলেন "এই বইখানা আমাকে কয়েক দিনের জন্য দিতে পার কি ?" বসন্ত বলিল, "আজ স্কুলে এই বইর পড়া দিতে হইবে, স্কুল হইতে আসিয়া আপনাকে বই দিব।" কালীনারায়ণ বই প্রাপ্তির আশায় বাসায় বসিয়া আছেন। স্কুল হইতে বসন্তলাল বাসায় না আসিতেই পথ হইতে বই নিয়া তিনি বাসায় যান এবং তখন হইতেই ধর্ম্মনীতি পড়িতে আরম্ভ করেন। বই পড়িতে খুব ভাল লাগিল বটে, কিন্তু এই বই ব্রহ্মসভার কি ধর্ম্মসভার, তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রহ্মসভার বই হইলেই তিনি খুব সুখী হইবেন, এই তাঁহার মনোগত ভাব। বসন্ত লালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। তিনি বসন্ত লালকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রকমের আর কোন বই আছে কি না। বসন্ত বলিল, "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির-সম্বন্ধ বিচার" নামে অক্ষয়কুমার দত্তের আর এক-

খানি বই আছে। কালীনারায়ণ স্কুল হইতে একখানা বই ক্রয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে বই তিনি ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকে বলে, কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়, তজ্জন্য প্রাণে অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মিল। কিরূপে ব্রহ্মসভার সংবাদ পাইবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। একদিন দুই প্রহর বেলার সময়, কালীনারায়ণ এবং তাঁহার স্বগ্রামবাসী পুরোহিত, এবং ময়মনসিংহের মোক্তার গোলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় বসিয়া আছেন, সমস্ত লোক কাচারিতে চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় বাবু জগচ্চন্দ্র দাসের সাক্ষাৎ মাতুল শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র গুপ্ত, পুকুরপাড় দিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গোলক চক্রবর্ত্তী বলিলেন "ঐ বেটা শালা ব্রহ্ম সভায় গান করে।" এইকথা শুনিয়া কালীনারায়ণ মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, কুলচন্দ্র বাবু যখন ব্রহ্মসভায় গান করেন, তখন ব্রহ্মসভার বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট অবশ্যই জানিতে পারিব। তিনি দৌড়িয়া গিয়া পথের মধ্যে কুলচন্দ্র বাবুকে ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মসভা কোথায়? কুলচন্দ্র বলিলেন, "স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু ভগবান চন্দ্র বসুর বাসায় ব্রহ্মসভা হয়। প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় সেই সভার কার্য্য হইয়া থাকে।" কালীনারায়ণ কুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মসভায় কোন বই পাওয়া যায় কি? কুলচন্দ্র বলিলেন, "ঈশান মাষ্টারের বাসায় পাওয়া যায়।" কুলচন্দ্র অন্যত্র যাইতেছিলেন, কালীনারায়ণ কুলচন্দ্রকে অনেক বলিয়া কহিয়া ঈশান মাষ্টারের বাসায় লইয়া যাইয়া শুনেন, ঈশান মাষ্টার নাই। তখন কুলচন্দ্র দ্বারা ঈশান মাষ্টারের আলমারা খোলাইয়া চারিখানা বই লইলেন—একখানা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম খণ্ড, একখান রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, একখানা প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা,আর একখানা সভ্যদিগের বক্তৃতা। বই আনিয়া ঈশান বাবুকে পরে মূল্য দিয়াছিলেন। তারপর বুধবার দিন ব্রহ্ম সভায় যাইয়া উপাসনায় যোগদান করেন। তাঁহার ব্রাহ্মজীবনের এই প্রথম সূত্রপাত। সেইদিন স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার রাধাচরণ বাবু এবং আরও ১০।১২ জন সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার পর প্রত্যেক বুধবার কালীনারায়ণ, ব্রহ্মসভায় নিয়মিতরূপে যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রতিদিন বাসায় উপাসনা করিতেন। প্রাত্যহিক উপাসনাতে ৭টী স্তোত্র ছিল। তিনি এক এক দিন এক একটী স্তোত্র পাঠ করিতেন। ব্রহ্মসভাতে জানিতে পারিলেন যে, কলিকাতা আদিসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী নামে একখানা পত্রিকা বাহির হয়। কালীনারায়ণ তত্ত্ববোধিনীর গ্রাহক হইলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, তিনি আশ্বিন মাসে বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রাপ্ত হন। তখন পোষ্ট আফিস ছিল না। থানার মারফতে চৌকিদার দ্বারা চিঠিপত্র বিলি হইত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তিনি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া, অন্য লোকদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাইতেন। পত্রিকা প্রাপ্তির এক বৎসর পর তিনি মাংস ভোজন পরিত্যাগ করেন। মাতা ভাগীরথী গুপ্তা দুর্গোৎসব করিতেন, তাহাতে অনেক পাঁঠা বলি হইত। একবার, পূজার ৪।৫ মাস পূর্ব্বে একদিন রাত্রে মাতৃভক্ত কালীনারায়ণ মার নিকট যাইয়া বলিলেন "মা, আমি আপনার নিকট একটী ভিক্ষা চাই।" মা বলিলেন, "কি ভিক্ষা চাও?" পুত্র বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে আর যেন পাঁঠা বলি না হয়।" মা তাহাতে সম্মত হইলেন। মার আজ্ঞা পাইয়া কালীনারায়ণ কাওরাইদ নায়েবের নিকট পত্র লিখিলেন—এইবার হইতে যেন তাঁহার হিস্যার পূজার সময় পাঁঠা পাঠান না হয়। পূজার সময় অন্য শরিকের বাড়ীতে পাঁঠা আসিল, কিন্তু কালীনারায়ণের বাড়ীতে পাঁঠা আসিল না। মা ভাগীরথী গুপ্তা কালীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার আমাদের বাড়ীতে পাঁঠা আসে নাই কেন? কালীনারায়ণ পূর্ব্বের ভিক্ষার কথা মাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। মা সন্তানকে

ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু সেই বৎসর হইতে পূজায় পাঁঠা বলি উঠাইয়া দিলেন। তার পর সন আশ্বিন মাসে কালীনারায়ণ মৎস্যাহার পরিত্যাগ করেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরামিষ ভোজন করিয়াছিলেন।”

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাহা এবং ধর্ম্মনীতি কালীনারায়ণের ধর্ম্মজীবন পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। মাতৃভক্তি ও শক্তিপূজায় যে জীবনের আরম্ভ, এইরূপে, ব্রহ্মভক্তি সেই জীবনের পরিণতি হইল। এইরূপ পরিবর্ত্তন রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছে। ক্রমে কালীনারায়ণের জীবনে ধর্ম্মের যে আধিপত্য বিস্তৃত হইল,তাহাতে কর্ম্মী কালীনারায়ণ গৃহস্থপ্রচারক হইলেন। ওঁ ব্রহ্ম নামের মহাবলে তিনি ঋষির জীবন পাইলেন। অন্তরঙ্গ-সাধনে সিদ্ধ হইয়া প্রমত্ত কালীনারায়ণ বীরবেশে ব্রহ্ম নাম প্রচারে ব্রতী হইলেন; তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইল, কাওরাইদ। তিনি জেনেরেল বুথের আদর্শে ব্রহ্মসেনা-দল গঠন করিলেন এবং দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঢাকা, মৈমনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, বরিশাল, কুমিল্লা, শিলচর প্রভৃতি স্থানে প্রচারক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, সে সব বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রচার করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি “পদাঘাত” কে “আশীর্ব্বাদ” বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক সময়ে যাঁহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, অন্য সময়ে তাঁহারা তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দেবতার ন্যায় পূজা করিত। কত পতিত লোকের সহিত তিনি মিশিয়াছেন, কত লোককে উদ্ধার করিয়াছেন, কত বিপন্ন দরিদ্রের সাহায্য করিয়াছেন, গুপ্ত জীবনের সে সকল গুপ্ত কথা কেহ জানে না। ওঁ ব্রহ্ম নাম তাঁহার জীবন মন্ত্র, ঐ নামসাধনের বলে জীবনের সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা, সর্ব্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর, সর্ব্বপ্রকার মান অভিমান কুসংস্কার পায়ে ঠেলিয়া বিনয়-বিভূতিতে ভূষিত হইয়া, দীন কাঙ্গাল বেশ ধারণ পূর্ব্বক পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের যে কিছু সৎকাজের কথা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি, মনে হয়, সে সকল কিছুই নয়, তিনি যত কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই গুপ্তভাবে করিয়াছেন। গুপ্ত-জীবন, বাস্তবিকই গুপ্ত।

তিনি যে মহৎ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাহা আদ্যন্ত-রহিত মানব জীবনের চরিত্র। সেই চরিত্রের পুণ্যময় ছায়া তাঁহার ৮পত্নী অন্নদাদেবীতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। অন্নদা দেবীর পবিত্র জীবন স্মরণে মানব-জীবন সার্থক হয়। সাধু কালীনারায়ণ এবং সাধ্বী অন্নদা দেবী কখনও জীবনে দুর্নীতি প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহাদের কোন কন্যা অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া অন্নদা দেবী,জীবনে আর সেই কন্যার মুখ দর্শন করেন নাই। কত বিখ্যাত লোক দেখিয়াছি, আত্মজের পাপ-ক্লেদ-রাশি মস্তকে করিয়া নৃত্য করিয়াছেন—শেষে আবার তাহাই সৎ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন! অন্নদা দেবী কখনও পাপ-প্রশ্রয় দেন নাই। এরূপ জীবন এদেশের আদর্শ। কালীনারায়ণ বিপত্নীক জামাতার সহিত কন্যার বিবাহে পর্য্যন্ত যোগদান করেন নাই। উভয়ে আজীবন দাম্পত্য জীবনের সুন্দর আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। উভয়ের চরিত্রের সংস্পর্শে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন।

যিনি কত লোকের চরিত্র পরিবর্ত্তনের কারণ ছিলেন, তাঁহার নিজ পরিজনের অবস্থা কিরূপ? তাঁহার পুত্র প্যারীমোহন এবং কন্যা সৌদামিনী এখন স্বর্গে, তাঁহাদের চরিত্রের মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ। যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের অনেকের জীবনই অতি সুন্দর। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিলে মনে হয় যেন, কালীনারায়ণ জীবন ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার পুত্র কন্যাগণের চরিত্রে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার অক্ষয় ব্রহ্ম-নাম-বীজ পরিবারের অক্ষয় কবচ হইয়া থাকুক।

এতক্ষণ যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাতে ঋষিত্বের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। তিনি সচ্ছলতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত—রাজযোগ্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও দেবতুল্য চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মাতৃভক্ত, তিনি কাঙ্গালভক্ত, তিনি স্বদেশভক্ত, তিনি বিশ্বপ্রেমিক,—এ সকল কথায় তাঁহার ঋষিত্বের পরিচয় নাই। তবে তাঁহার ঋষিত্বের পরিচয় কোথায়? তাঁহার দৃষ্টি বাহির হইতে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তিনি সংসার-বিরাগী চিদানন্দে নিমগ্ন মহাযোগী ছিলেন। তিনি বাহিরে চির মৃত—কিন্তু অন্তরে প্রজ্বলিত; যাহা অবিনশ্বর, অটল, ধ্রুব, সেই বিমলচরিত্রে তিনি চিরোজ্বল। এই খানেই তাঁহার ঋষিত্বের স্পষ্ট পরিচয়।

তিনি আজীবন কঠোর রূপে ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন। যে মন্ত্র-বীজ গ্রহণ করিয়াছিলেন, একদিনের জন্যও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, একদিনের জন্যও তাহা উপেক্ষা করেন নাই। ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও কালীনারায়ণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সন্ন্যাসী। প্রকৃত ধর্ম্মের পরিচয় তখনই পাওয়া যায়, যখন সাধক বহিরঙ্গসাধন পরিত্যাগ করিয়া অন্তরঙ্গ সাধনে সিদ্ধ হন,—তখন ভক্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া মৌনী হন, তখন তাঁহার নিরাড়ম্বর চরিত্রেই কেবল সকল ভাব, সকল কথা পরিস্ফুট হয়। আর কি হয়? তখন সাধক প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদন পায়—গণ্ডিতে বা পংক্তিতে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তখন দেশকালের অতীত চিদানন্দের নিত্যানন্দ ভাবরসে নিমগ্ন হয়। সংযম যদি ধর্ম্মজীবনের আদি মন্ত্র হয়, তবে ধর্ম্মজীবনের শেষ মন্ত্র, নিরাড়ম্বর ব্রহ্মচর্য্য। নিষ্কাম সেবা যদি ধর্ম্মজীবনের আরম্ভের অবলম্বন হয়, তবে শেষ জীবনের শেষ মন্ত্র—আত্মোৎসর্গ। ব্রহ্মচর্য্য এবং আত্মোৎসর্গ যেখানে, সেই খানেই ঋষিত্ব। গুপ্ত কালীনারায়ণ যখন সংযম, সেবা ও ব্রহ্মচর্য্যের পথ ধরিয়া আত্মোৎসর্গ করিলেন, তখন তিনি ঋষিত্ব পাইলেন—তখন তিনি মুক্ত হইলেন। এই ঋষিত্ব এবং মুক্তির পরিচয় কখন পাইলাম? ঋষি-প্রতিম কালীনারায়ণ, উপযুক্ত পুত্র, ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব সিবিলসার্জ্জন প্যারীমোহনের শবপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অটল ও অচলভাবে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘোষিত হইল, তিনি শোকবিজয়ী, সংসার-বিজয়ী ঋষি। মায়াগ্নিতে সমস্ত ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াও জনকরাজা যেরূপ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন, মনে হয়, এই দারুণ বিপদে কালীনারায়ণও তেমনি ছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত ইদানীন্তন কালে কেবল ঋষি রামতনুর জীবনে সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। আমরা উপরে যে সকল কথা লিখিলাম, তাহার প্রমাণ তাঁহার "ভাবসঙ্গীতের" পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। কাঙ্গাল হরিনাথের 'ফিকির চাঁদের সঙ্গীত' এবং কাঙ্গাল কালীনারায়ণের ভাবসঙ্গীত, এদেশে আধুনিক যুগের অন্তরঙ্গসাধনাসিদ্ধ ঋষিত্বের পরিচয় দিতে বর্ত্তমান থাকিল। যদি কখনও এদেশে চাকচিক্যময় মৃন্ময়ত্বের আদর কমিয়া নিরাড়ম্বর ঋষিত্বের আদর হয়, তখন এই কাঙ্গালযুগলের সঙ্গীত সকলের এদেশে বিশেষ আদর হইবে। আর যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যময় বিলাসিতা দিন দিন বাড়িতে থাকে, এবং যদি সাংসারিকতাই প্রাচ্য ধর্ম্মজীবনের আন্তরিকতা গ্রাস করিয়া ফেলে, তবে, নির্ভয়ে বলি, তবে, এদেশে কাঙ্গাল হরিনাথ এবং কাঙ্গাল কালীনারায়ণের পুণ্যময় জীবন চিরকালের জন্য ডুবিয়াছে,—আর জাগিবে না, আর মাতাইবে না;—তবে তাঁহাদের—সব কীর্ত্তি অনাদৃত, উপেক্ষিত, গুপ্ত, লুপ্ত, বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২২। মূক-শিক্ষা।—শ্রীমোহিনী মোহন মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১॥০। ৩ খণ্ডে পুস্তক সমাপ্ত।

ভারতবর্ষ দুইলক্ষ মূক-বধিরের বাসভূমি; অথচ ইহাদের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে এসব বিষয়ে বঙ্গদেশে কোন আন্দোলনই ছিল না। যে উপায়ে কলিকাতায় এই মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। সামান্য লোকের চেষ্টায় যে অসামান্য কাজ সম্পন্ন হইতে পারে, কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় তাহার আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু বঙ্গদেশে ৩১,১৫৪ মূক-বধিরের মধ্যে কেবল ৩০১৩২ বালক বালিকা ঐ স্কুল অধ্যয়ন করিতেছে। মোহিনী বাবু ঐ স্কুলের শিক্ষক; তিনি এজন্য এই পুস্তকে কত দুঃখ করিয়াছেন।

মোহিনী বাবু একজন সামান্য শিক্ষক, অতি পবিত্র কাজে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। যেরূপ কষ্ট করিয়া তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এই পুস্তকে অনেক চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিলাতের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরি এবং মূক-বধির যুবক মিঃ এগনিউ ছবিগুলি অল্প মূল্যে সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই মহৎ কাজের সহায়তা করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে শিক্ষাপ্রণালী এবং তৃতীয় খণ্ডে মূক-বধিরদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু সুন্দর সুন্দর চিত্রের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি সুন্দর এবং সরল বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইব।

২৩। অশ্রুধারা।— শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য।৶০। অনুকূল বাবু একজন কৃতী লেখক, তাঁহার লেখার পারিপাট্য দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল, কল্পনা করিয়া কেহ "ভীত" বা "শোকগ্রস্ত" হইতে পারে না। এই পুস্তক পাঠে সে বিশ্বাসের অন্যরূপ প্রমাণ পাইলাম। গ্রন্থকারের স্ত্রী জীবিতা আছেন, তবুও গ্রন্থকার প্রকৃত শোকগ্রস্তের ন্যায় এই গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের" অনুকরণে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।—অনুকরণ ব্যর্থ হয় নাই।

২৪। আনন্দী বাঈ।—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত, মূল্য ॥০। আনন্দ বাঈ মহারাষ্ট্রীয় রমণী সমাজে আদর্শ মহিলা ছিলেন। এরূপ মহিলা ভারতের সকলের পূজ্যা। সখারাম বাবু মহারাষ্ট্রীয় সুন্দর সুন্দর চিত্র বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। এ দেশের প্রকৃত উন্নতি মহারাষ্ট্রীয় জাতির উপর নির্ভর করে। এই জাতির প্রতিভা এখন ভারতের আদর্শ। ভারত-মহামিলনক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীর, পার্শি, পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীর সম্মিলন ভিন্ন ভারতের উন্নতির আশা নাই। সম্মিলনের মূলমন্ত্র—জাতীয় ভাষা ও ধর্ম্ম। মহারাষ্ট্রীয় জাতির সাহিত্য এদেশের বিশেষ গৌরবের জিনিস। বাঙ্গলাভাষা ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার মিলন, আমরা একান্ত অন্তরে প্রার্থনা করি। এইরূপ পুস্তক প্রচার তাহার সহায়তা করে বলিয়া আমরা সখারাম বাবুকে বিশেষ আদর করিয়া থাকি। তিনি সুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারেন। তিনি বাঙ্গলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের প্রার্থনা—মহারাষ্ট্রীয় জাতি বাঙ্গালীর সহিত একাত্মক হইয়া যাউক। আনন্দ-বাঈ পুস্তক অতি সুন্দর হইয়াছে—ঘরে ঘরে ইহা আদৃত হউক।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (৭)

সমাজশক্তি প্রকৃতি,—ব্যক্তিরক্ষায় প্রকৃতির কার্য্য,—জাতিরক্ষায় প্রকৃতির কার্য্য,—মাতৃরূপা প্রকৃতিশক্তি,—জগতে মাতৃশক্তির বিকাশ।

৫০। আমরা পূর্ব্বে যে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে সমগ্র মানবজাতি এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত। ভগবান স্বয়ং সেই বিরাট সমাজশরীরের আত্মা—তিনিই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার জন্যই এই সমাজশরীর সংহত। ব্যষ্টিসমাজ—ক্ষুদ্রবৃহৎ সভ্য অসভ্য নানারূপ সমাজ—সেই সমষ্টি বিরাট সমাজের অংশ—বা আংশিক বিকাশ মাত্র। ব্যষ্টিসমাজ—দেশ কালে সীমাবদ্ধ হইয়া পরমপুরুষের মনুষ্যত্ব কল্পনার ক্রমবিবর্ত্তিত বিকাশ,—ভগবানের বিরাট শরীরে—হিরণ্যগর্ভের মানস সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি। ভগবানের বৈষ্ণবী শক্তি বলে, এই সমাজের সৃষ্টি রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে। সেই পরমাপ্রকৃতি 'দেবী ভগবতী'র মহাশক্তিবলে, সেই সর্ব্বভূতা মহাশক্তি হইতে অভিব্যক্ত, ভগবানের জগৎরূপ বিরাটশরীরে, হিরণ্যগর্ভের মানবজাতিরূপ মানসসৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি হয়। 'যে কোথায় যা কিছু বস্তু ছিল আছে বা হইবে, সে সকলের যিনি শক্তি—সেই অখিলাত্মিকা' মহাশক্তি বলেই ভগবানের কল্পনাধিষ্ঠিত জগতের সংরূপে বিকাশ হয়,—সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। জ্ঞানময় ব্রহ্মের মহাকল্পনা অনুসারে, তাহার সেই বিশ্ববীজ পরাশক্তিবশে, এ সৌরজগতে ক্রমবিকাশ নিয়মে, আকাশ বায়ু প্রভৃতি ক্রমে এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়া পরে তাহা মানুষের বাসের উপযোগী হইলে, কিরূপে পৃথিবীতে সেই পরমাপ্রকৃতি, ভগবানের মনুষ্যত্ব কল্পনার ক্রমবিকাশ করেন, আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। সেই মহাশক্তিই নিজ শক্তি বলে সমাজ সংগঠন করেন—সমাজের রক্ষণ ও পোষণ করেন। তিনিই মানবের অন্তরে জাতিরূপে, স্নেহরূপে, দয়ারূপে, সহানুভূতিরূপে (১) অধিষ্ঠিত থাকিয়া, মানবদের মধ্যে মহা আকর্ষণবীজ উপ্ত করেন—মানবদের নানারূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করেন, এবং এইরূপে সমাজশক্তির বিকাশ করিয়া মানুষদের সমাজবদ্ধ করেন। তিনিই সর্ব্বভূতে চেতনারূপে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিয়া, মানবে জ্ঞান ক্রমবিকাশিত করিয়া দিয়া, মানবকে সেই মহা একত্ব জ্ঞানের দিকে লইয়া যান।

সেই মহাশক্তি হইতেই জড়জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। সেই মহাশক্তি হইতেই জীবজগতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়। সেই মহাশক্তি হইতেই প্রত্যেক জীবের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু হয়। তাঁহা হইতেই জীবজাতির রক্ষা ও পোষণ হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পারমার্থিক ভাবে জীবের ব্যক্তিভাব অসত্য, জাতিভাবই সত্য। এই জন্য প্রকৃতি ব্যক্তিজীব রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যস্ত, জাতি রক্ষার জন্য ততোধিক ব্যস্ত। মানবজাতি সম্বন্ধেও এই কথা। মানুষ

---

(১) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতি……রূপেণ সংস্থিতা,"—সেই মহাশক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করে, পুরুষকারের স্পর্দ্ধা করে, স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলে, কিন্তু মানবও যন্ত্রের ন্যায় সেই প্রকৃতিচালিত। ভগবানের এই মহাপ্রকৃতির কথা—এই মহা বৈষ্ণবী শক্তির তত্ত্ব আমরা সম্যক্ বুঝি না। সেই 'সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা সৃষ্টিস্থিতিবিনাশশক্তিভূতা ত্রিগুণময়ী ত্রিকালময়ী' প্রকৃতির কথা, সেই 'বিশ্বেশ্বরী বিশ্বাত্মিকা বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বব্যাপিনী সনাতনী মহাশক্তির মহাক্রিয়ার কথা,—আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া—অদ্ভুত কৌশল আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যাহা প্রকৃতির কার্য্য—মানুষ তাহা প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশলে নিজ কার্য্য মনে করিয়া আহ্লাদের সহিত সম্পাদন করে। মানুষের নিজের প্রকৃতিরূপে—স্বভাবরূপে সেই মহাপ্রকৃতির যে অভিব্যক্তি, মানুষ তাহা নিজের প্রকৃতি—তাহা মানুষের নিজের জ্ঞানপরিচালিত নিজের আয়ত্তীভূত প্রকৃতি বলিয়া মনে করে। মানুষ সেই প্রকৃতি চালিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া নিজে স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম্ম করিয়াছে মনে করে। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশে নিজ প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য জন্মিতে পারে বটে,—কিন্তু সে অনেক সাধনার কথা, পুরুষকারের বিশেষ বিকাশের কথা। মানুষ সাধারণতঃ তাহার প্রকৃতিরূপেই অবস্থিত সেই মহাপ্রকৃতিবলে চালিত হয়। প্রকৃতি তাঁহার কার্য্য করিবার পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক স্বরূপ মানুষকে কিঞ্চিৎ সুখ—কিঞ্চিৎ আনন্দ দান করেন। আর মানুষ সেই সুখ—সেই আনন্দ টুকু পাইবার জন্য নিজ প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া যায়, নিজ কর্ত্তব্য—বিবেকের নির্দ্দিষ্ট পথ হারাইয়া ফেলে, দাসের ন্যায় প্রকৃতির অনুসরণ করে। সকল প্রকার সুখ সম্বন্ধেই প্রায় এই নিয়ম।

৫১। বলিয়াছি ত জাতিরক্ষা ও জীবরক্ষা প্রকৃতির প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। আমরা যখন শৈশবে অজ্ঞান অবস্থায় থাকি, তখন মাতৃগর্ভ হইতে প্রকৃতি স্বয়ং—মাতার ন্যায় যত্ন করিয়া আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার অনুসারে, অথবা স্বয়ং সেই সংস্কারশক্তিরূপে আমাদের উপযোগী শরীর গড়িয়া দেন। সেই শরীর সংগঠনে—সেই আশ্চর্য্য কৌশলময় শরীর সংগঠন ব্যাপারে, আমাদের কোন হাত নাই। এই জ্ঞাতা আমি, কর্ত্তা আমি বা ভোক্তা আমি'র কোন হাত নাই। সে কৌশল আজি পর্য্যন্ত কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সম্যক্ বুঝিতেও পারেন নাই। সে অদ্ভুত শরীর সংগঠন, আমাদের সেই অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা সংসাধিত হয়। যখন আমাদের জ্ঞান হয়, আমাদের 'আমিত্বের বিকাশ হয়, তখনও সেই প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের শরীর রক্ষা ও পোষণ ভার বহন করেন। যখন শরীর রক্ষার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি স্বয়ং ক্ষুধারূপে আমাদের অন্তরে বিকাশিত হইয়া আমাদিগকে খাদ্য আহরণে প্রেরণ করেন। তিনিই জঠরাগ্নিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের পরিপাক করিয়া লন। যখন শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়—তখন তিনি নিদ্রারূপে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া লন। তিনিই প্রাণরূপে—জীবনীশক্তি রূপে আমাদের শরীর রক্ষণ ও পোষণ করেন, এবং শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদিগকে বলে আকর্ষণ করিয়া প্রবৃত্ত করান। জ্ঞানী

যখন আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা স্থির করিয়া অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহেন, যখন শরীরকে তাঁহার বন্ধনের কারণ বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করেন, যখন শোকবিষাদমগ্ন আর্ত্ত শরীরকে কেবল যন্ত্রণাদায়ক মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও প্রকৃতি তাহাদের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হইয়া, তাহাদিগকে শরীর রক্ষার্থ চেষ্টা বা কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান। সুতরাং আমরা যে আহার অন্বেষণ জন্য কর্ম্ম বা শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম আমাদের নিজের কর্ম্ম—আমাদের নিজের স্বার্থ মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমরা ঠিক নিজে করি না। তাহাতেও আমরা প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কর্ম্ম, তাহার জন্য আমাদের সহজজ্ঞান প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আহার সংগ্রহে কোন সময়ে অক্ষম হইলে—মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পিশাচ বা রাক্ষসে পরিণত হয়, তাহা আমরা দারুণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। প্রকৃতি এমনই মোহযুক্ত করিয়া মানুষকে স্বকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। এমনই করিয়া প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকে তাহার শরীর রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্তিত করেন। স্বার্থকর্ম্মের ন্যায় পরার্থ কর্ম্মেও আমরা প্রকৃতি দ্বারা বাধ্য হইয়া নিযুক্ত হই। বলিয়াছি ত, প্রকৃতি স্নেহ দয়া প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিরূপে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, আমাদিগকে পরার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। বলিয়াছি ত, প্রকৃতি তাঁহার এই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক স্বরূপ আমাদিগকে একরূপ সুখ ও আনন্দ দান করেন। প্রকৃতির নানা কাজ,—আমাদিগকে দিয়া প্রকৃতি নানা কাজ করাইয়া লন। তাহার মধ্যে কতকগুলি আমাদের ব্যক্তিত্ব ভাব রক্ষণ ও পোষণ জন্য কর্ম্ম, আর কতকগুলি জাতি রক্ষা ও পোষণ জন্য কর্ম্ম। বলিয়াছি ত, জাতিরক্ষার ন্যায় ব্যক্তি রক্ষা প্রকৃতির প্রয়োজন। ব্যক্তিরক্ষা ব্যতীত জাতিরক্ষা হয় না। ব্যক্তিরক্ষা ও জাতিরক্ষার জন্য আমাদের নানারূপ কাজ করিতে হয়। সকল কাজেরই পরিমাণ আছে। এজন্য এক কাজে অবহেলা করিয়া যদি আর এক কাজে আমরা অযথা যত্ন করি, তবে সে স্থলে প্রকৃতি সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ বা অবসাদ আনিয়া, আমাদিগকে সেই কাজ হইতে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া প্রকৃতির অন্য কাজে নিয়োজিত করেন। ইহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে। সন্তানউৎপাদন বা জাতিরক্ষার জন্য যে পরিমাণ কামবৃত্তি চরিতার্থের প্রয়োজন, সে পরিমাণে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিলে আমাদের সুখ হয়, কিন্তু তাহার অধিক সে বৃত্তি পরিচালন করিলে পরিণামে আমাদের দুঃখ হয়। শরীর রক্ষা ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, যে পরিমাণ ও যেরূপ আহার প্রয়োজন, সেই পরিমাণ আহারে আমাদের সুখ হয়। তদধিক আহারে আমাদের দুঃখ ও পীড়া হয়। এইরূপে প্রকৃতি অলক্ষ্যে সুখরূপ পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের সহায়ে আমাদিগকে তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত করেন। আমরা অবশ হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় কার্য্য করি। যতক্ষণ আমাদের প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, যতক্ষণ না আমরা মুক্ত হই, ততক্ষণ আমরা এইরূপে প্রকৃতির অধিকারে—বাসনারূপ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া 'প্রবৃত্তি মার্গে' কার্য্য করিতে বাধ্য হই,—

আর প্রকৃতির কার্য্যকে আমাদের নিজের কার্য্য, আমাদের স্বার্থ মনে করি।

৫২। সে যাহা হউক, যেন আমরা দেহাত্মজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া দেহ রক্ষাকে আত্মরক্ষা ভাবিয়া—এই শরীর রক্ষাকে যেন নিজের স্বার্থ, নিজের কার্য্য মনে করিলাম। কিন্তু সন্তান পালন ও রক্ষা কার্য্যে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কেন না অনেক স্থলে সন্তানকে আমরা 'আত্মজ' মনে করি। আমাদের সন্তানে 'আত্মজ্ঞান' ও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত, আমাদের মধ্যে অনেক স্থলে পুত্র বৃদ্ধ অক্ষম পিতামাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এজন্য সন্তান পালনে আমাদের স্বার্থ আছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু যে সকল লোক সন্তানকে আত্মজ মনে না করে, সন্তানকে দাম্পত্য সুখভোগের অবশ্যম্ভাবী দুঃখময় ফল মনে করে, যেখানে সন্তান বড় হইয়া পিতামাতা হইতে পৃথক হইয়া যায়, সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন না করে, সেখানে সন্তান পালন কার্য্যে পিতামাতা কোন স্বার্থ থাকা মনে করে না। মানুষ যখন প্রকৃতির বশে কাজ করে, বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হয়, তখন সে সন্তান পালনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। সেখানে মানুষ স্বার্থ নিঃস্বার্থের কথা আদৌ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় না। মানুষ যখন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করে, তখনও সে কর্ত্তব্য ভাবিয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া সন্তান পালন করে। কিন্তু মানুষ যখন সহজজ্ঞান ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে শিখে, তখন বুদ্ধি তাহাকে কেবল স্বার্থচালিত হইতে যুক্তি দেয়। বড় অধিক, সে নিজের স্বার্থ রক্ষা করিয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে। আমরা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যুক্তিবলে আমাদের কর্ত্তব্যের মূলসূত্র ধরিতে গিয়া (utilitarianism বা) হিতবাদী বা আত্মসুবিধাবাদে উপনীত হইতে পারি। (১) আমাদের বুদ্ধি আমাদের পরার্থবৃত্তি বিকাশ করে না, আমাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবার পরামর্শ দিতে পারে না। (২) দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সভ্য সমাজে অনেকে পুত্র লালনপালন বড় কষ্টকর মনে করে, তাহাদের নিজের সুখ ও সুবিধার অন্তরায় মনে করে। অনেক সভ্য স্ত্রীপুরুষ যাহাতে সন্তান না হয়, তাহার চেষ্টা করে। অনেক সভ্য স্ত্রীপুরুষ সন্তান লালনপালনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বিশেষ লালায়িত হয়। (৩) তাই বলিতেছিলাম,

---

(১) The fundamental error of utilitarianism is to find a sanction for right conduct in our inclinations ......It (philosophy) has urged from generation to generation the utilitarian doctrine that the all-sufficient sanction for right conduct is *simply enlightened self-interest.*

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

(২) The ideal of average individual is not the effort and sacrifice, but the desire to live in the greatest possible ease and comfort with the least exertion......the maximum of ease, comfort and security with the minimum of effort and sacrifice.

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

(৩) "A difference in his (man's) case is, that by the possession of reason he has become equipped with the power to obtain satisfaction of such instinct, without entailing the consequence. He has......particularly in this declining civilization engaged to circumvent even some of the most imparative of them, like the paternal instinct. He has......by the restriction of propagation, and by the *perversion* of the institution of marriage and the family, succeeded in obtaining its satisfaction for the individual while suspending its operations in furthering the interest of 'society and race."

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

সাধারণ জ্ঞান বা বুদ্ধি আমাদিগকে আত্মসুখ চরিতার্থ জন্যই প্রবৃত্ত করায়। পরার্থ আত্মত্যাগ, এই জ্ঞানজ নহে। সন্তানপালনবৃত্তি এই জ্ঞানজ নহে। তাহাতে প্রকৃতি প্রথমে অবশ করিয়া আমাদিগকে নিয়োজিত করেন।

৫৩। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা বুঝিতে পারি যে, ইতর জীবে সন্তান পালন কার্য্যে কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না। বংশ রক্ষা হউক, বা না হউক, তাহাতে তাহাদের কোন আসিয়া যায় না। তথাপি যে ইতর জীবে ও মানুষে বংশ রক্ষার জন্য, সন্তান—রক্ষার জন্য এত যত্ন করে, সে কেবল প্রকৃতির প্রেরণায়। জাতি রক্ষা বা জীবপ্রবাহ রক্ষা প্রকৃতির কার্য্য-প্রকৃতির প্রয়োজন। সন্তান উৎপাদন ও রক্ষার দ্বারাই জীবপ্রবাহ রক্ষা হয়। তাই সন্তান রক্ষার জন্য প্রকৃতি মাতার হৃদয়ে সন্তান পালন স্পৃহা এত বলবতী করিয়া দিয়াছেন। যে মমতাময়ী প্রকৃতি সন্তান রক্ষা করিবার জন্য মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ দিয়াছেন, তিনিই মাতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য উৎকট মমতার—অদ্ভুত স্নেহের বিকাশ করিয়াছেন,তিনিই পিতাকে সন্তান স্নেহের বশবর্ত্তী করিয়া তাহাকে সন্তান পালন কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছেন। পিতামাতা সন্তান পালন করিয়া, আপনার স্নেহ বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করে। এখানেও প্রকৃতিজননী পরার্থবৃত্তির সহিত আমাদের স্বার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। এখানেও প্রকৃতি আমাদের সুখ বা আনন্দরূপ পারিতোষিক দিয়া জাতিরক্ষা রূপ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত করেন এইরূপে আমরা নানাজাতীয় জীব মধ্যে প্রকৃতির অদ্ভুত কৌশলে স্বার্থবৃত্তি ও পরার্থ বৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন দেখিতে পাই। এই রূপে জীব স্বার্থবশে সুখ আশায় বা অজ্ঞানমোহে পরার্থ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। অতি নিম্ন জাতীয় জীবে অবশ্য এই সন্তান পালন রূপ মূল পরার্থ বৃত্তির বিশেষ বিকাশ থাকে না। অনেক নিম্ন জাতীয় জীব, সন্তান প্রসব করিয়া পরিত্যাগ করে, ওষধির ন্যায় অনেক নিম্ন জাতীয় জীব, সন্তান প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। প্রকৃতি ব্যক্তিজীব রক্ষা অপেক্ষা জাতি রক্ষার জন্য এমনি ব্যস্ত যে, মাতার দিকে তখন একবারও চাহিয়া দেখেন না, মাতার রক্ষার জন্যও ব্যবস্থা করেন না। প্রকৃতি এইরূপে বাধ্য করিয়া সকল জাতীয় জীবের মাতাকেই সন্তানের জন্য অল্পাধিক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। স্তন্যপায়ী জীব (mammals) মধ্যে সন্তান পালন বৃত্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। পক্ষী প্রভৃতি অন্য শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে সন্তান পালন বৃত্তিও যথেষ্ট প্রবল। নিম্ন জাতীয় জীব মধ্যেও সন্তান পালন ও সন্তান রক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতি করিয়া রাখিয়াছেন। মধুমক্ষিকাও সন্তান রক্ষার জন্য আশ্চর্য্য মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অনেক পক্ষী, শাবকের জন্য কুলায় নির্ম্মাণ করে। তাহাদের প্রকৃতিপরিচালিত সহজজ্ঞানের স্বতঃস্ফুর্ত্ত কুলায় নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এইখানে আমরা মমতাময়ী প্রকৃতির কার্য্য, তাঁহার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া মোহিত হই। সে যাহা হউক, অনেক পক্ষীদের মধ্যে এই প্রকৃতিজাত সন্তান পালন চেষ্টা এত প্রবল যে, তাহারা

ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াও অনেক স্থলে ডিম্বে তাপ দিতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হয় না। যতদিন শাবক উড়িতে না শিখে, ততদিন তাহাকে ত্যাগ করে না। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে, "পক্ষীদের জ্ঞান থাকিলেও তাহারা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহ বশতঃ সাদরে তণ্ডুল কণাদি শাবক চঞ্চুতে নিঃক্ষেপ করে।" (১) অতএব জীবগণও 'জ্ঞান বা আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিজ-বুদ্ধি সত্ত্বেও জাতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। এবং জাতি রক্ষার জন্য সন্তান পালনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইতর জীবে ও মানুষে পরার্থ বৃত্তির বীজ স্বয়ং মমতাময়ী প্রকৃতি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সন্তান পালনে সেই পরার্থ বৃত্তি প্রথম বিকাশ দেখা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানেও প্রকৃতি অদ্ভুত কৌশলে পরার্থ বৃত্তির সহিত স্বার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য—সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। যেখানে মানুষ নিজের জ্ঞানে কাজ করে, সেখানে কেবল স্বার্থের জন্য—নিজের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ পরিহার জন্য কাজ করিতে চাহে,—তাহা বলিয়াছি। সকল জীব সম্বন্ধেই এই কথা। সুতরাং জীব যদি পরার্থবৃত্তি পরিচালনকে সাধারণতঃ নিজের স্বার্থ ও নিজের সুখ বৃদ্ধির উপায় বলিয়া না বুঝিত, তাহা হইলে জীব সহজে পরার্থবৃত্তি বশে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত না।

ইতর জীবেও সন্তান পালন ও রক্ষা কল্পে,এই পরার্থবৃত্তি বড় প্রবল। অনেক জীব সন্তান রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। আমরা সচরাচর গার্হস্থ্য গো প্রভৃতি পশুগণের সন্তান হইলে, তাহাকে রক্ষার জন্য মাতাকে বড় চঞ্চল, বড় ব্যস্ত, বড় উগ্র হইতে দেখিয়া থাকি। অথচ সন্তান বড় হইলে, তাহার পালন বা রক্ষার প্রয়োজন শেষ হইলে, ইতর জীবের মধ্যে মায়ের সহিত সন্তানের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। মা আর সন্তানকে চিনিতেও পারে না। সন্তান সম্বন্ধে মানুষে ও পশুতে অনেক প্রভেদ আছে। ইতর জাতীয় জীবশিশুগণ শীঘ্রই আত্মরক্ষা ও পোষণে সমর্থ হয়, শীঘ্রই স্বাবলম্বন করে। কিন্তু মানবশিশুকে অনেক দিন লালন পালন করিতে হয়। সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা এ বিষয়ে মানবশিশু বড় অক্ষম, বড় পরমুখাপেক্ষী। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার লালনপালন প্রয়োজন হয়। এজন্য মানবে সন্তানস্নেহ স্থায়ী। এই স্নেহবন্ধন সমাজ বন্ধনের মূল।

৫৪। সন্তান লালনপালন সাধারণতঃ মাতার কার্য্য। ইতর জীবে প্রায়শঃই মাতা সন্তান পালন করিয়া থাকে। কোন কোন ইতর জীবে পিতাও সন্তান পালন কার্য্যে মাতাকে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যে মাতাপিতা উভয়েই মিলিয়া সন্তান লালন পালন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। মানুষের মধ্যে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ হীনবল। এজন্য তাহারা বিনা সাহায্যে আত্মরক্ষা বা সন্তান রক্ষা করিতে পারে না। তাই সন্তান পালন ও রক্ষার জন্য পিতার প্রয়োজন হয়। তাই পিতামাতাকে মিলিয়া সন্তান পালন করিতে হয়। মানুষের সহজজ্ঞান ইতর জীবের ন্যায় প্রবল নহে। মানুষ সাধারণ জ্ঞানবলে প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। বলিয়াছি ত, কেবল এই সাধারণ জ্ঞান বলে মানুষ স্বার্থচালিত

---

(১) জ্ঞানেহপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
"কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানাপক্ষুধা।"
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'—১।৪৮।

হয়। এই জন্য সন্তান পালন ও রক্ষার জন্য মানুষও প্রথম অবস্থায় নিজ বুদ্ধিতে চলিতে গিয়া স্বার্থচালিত হইত। অসভ্য মানুষ সন্তানকে গরু ছাগলের ন্যায় নিজের সম্পত্তি মনে করিত। নিজের স্বার্থের জন্য—দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, পিতা সন্তান পালন করিত,—বৃদ্ধাবস্থায় সাহায্য পাইবার জন্য সন্তান পালন করিত,—সন্তান পালনে সামান্যরূপে মাতার সহায় হইত। এইরূপে মহামমতাময়ী প্রকৃতি এখানেও স্বার্থের সহিত পরার্থ বৃত্তির অদ্ভুত সম্মিলন করিয়া দিয়া, পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে স্বার্থের আবরণেই পরার্থবৃত্তির প্রথম বিকাশ হয়। এইরূপে স্বার্থমোহে মোহিত হইয়া প্রথমে আমরা পরার্থ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে যে, 'মানুষও প্রত্যুপকার লোভে (বা বৃদ্ধ বয়সে নিজের সেবার সুবিধার জন্য) পুত্রের প্রতি স্নেহযুক্ত হয়।' (১) কিন্তু সন্তান পালন জন্য মানুষ আপাততঃ স্বার্থচালিত মনে হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে পরার্থবৃত্তি বিকাশের দ্বারা—মমতার বশে প্রকৃতিই তাহাকে পরিচালিত করেন। এই জন্য চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে যে, 'এ স্বার্থজ্ঞান সত্ত্বেও সংসার স্থিতিকারিণী মহামায়া প্রভাবে, মানুষ মমতাগর্ত্তে ও মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে।' (২)

৫৫। এইরূপে সেই মহামমতাময়ী প্রকৃতি আমাদের প্রথমে মোহযুক্ত করিয়া, আমাদের অন্তরে সন্তানের প্রতি 'মমতার' বিকাশ করিয়া দিয়া, আমাদের অন্তরে পরের প্রতি মমতার ক্রমাভিব্যক্তি করিয়া দিয়া, সেই মমতাবশে আমাদিগকে পরের জন্য কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন। তাহার পর যখন আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, যখন আমরা বুদ্ধিবলে সেই মমতার মোহ বুঝিতে পারি, জ্ঞানের প্রথম বিকাশে —'পর' পরই আপনার নহে—এ কথা বুঝিতে পারি, যখন সেই অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানবলে পরের মধ্যে আমাকে দেখিতে না পাই, তখনও সেই মহাপ্রকৃতি আমাদের সেই মহাপ্রকৃতি আমাদের সেই বুদ্ধিকে—সেই সাধারণ জ্ঞানকে 'মমতার' মোহে অভিভূত করিয়া আমাদিগকে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। শুধু পরার্থ কর্ম্ম বলিয়া নহে,—প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানকে অজ্ঞানজড়িত করিয়া আমাদিগকে স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্মে,—ব্যক্তিজীব রক্ষার্থ কর্ম্মে ও জাতিরক্ষার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন।

এইরূপে প্রকৃতিবশে আমাদের মধ্যে স্বার্থের সহিত পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। সেই মহাপ্রকৃতির সহায়ে স্বার্থবৃত্তির সহিত এই পরার্থবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলিত হইয়া আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। প্রথমে স্বার্থবৃত্তি বড় প্রবল থাকে। তখন সেই স্বার্থবৃত্তির মধ্যে পরার্থবৃত্তি কোথায় ডুবিয়া যায়। কেবল সন্তান পালন ও রক্ষা কর্ম্মে মানবের জাতি বা বংশরক্ষা প্রবৃত্তিতে সেই পরার্থবৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে প্রকৃতির সহায়ে আমাদের প্রকৃতির

---

(১) মানুষাঃ মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্‌প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৭।

(২) তথাপি মমতাগর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৮।

যত ক্রমআপূরণ হইতে থাকে, যতই জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, আমাদের আত্মসম্প্রসারণ দ্বারা যত পরকে আপনার করিয়া লইতে শিখি, যতই মমতার গণ্ডী বাড়াইয়া লইতে পারি, ততই আমরা পরের জন্য কর্ম্মকে আপনার কর্ম্ম মনে করিতে শিখি। যতই আমাদের কর্ম্মশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, ব্যক্তি রক্ষার্থ যে টুকু কর্ম্মের প্রয়োজন—তাহা অপেক্ষা অধিক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আমাদের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই আমরা পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। প্রথমে স্বার্থবৃত্তির সহিত পরার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন হইয়া উভয়ের সহায়ে উভয়েরই বিকাশ হয়। অবশেষে জগতে সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিতে শিখিয়া আমাদের আমিত্বের পূর্ণপ্রসার হইলে, ক্ষুদ্র স্বার্থবৃত্তি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া পরার্থবৃত্তির পূর্ণবিকাশ হয়। কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, মানুষ পূর্ণ উন্নত হইলে, "তাহার স্বার্থবৃত্তি ও পরার্থবৃত্তি একীভূত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ পরার্থবৃত্তি পরিচালনই তাহার স্বার্থসিদ্ধির প্রধান উপায়, তাহার সুখ ও আনন্দ লাভের প্রধান উপকরণ হইবে। তখন মানুষ পরার্থ কর্ম্ম করিয়াই আপনার আনন্দবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। (১) এ কথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৫৬। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মজ্ঞানে মনুষ্যত্বের ধারণা তাঁহার কালশক্তি বশে ক্রমবিবর্ত্তিত হয়, ও তাঁহার মহামহিমাময়ী মহাশক্তি বলে পৃথিবীতে ক্রমবিকাশিত হয়। সেই মহাপ্রকৃতিই মানুষের মধ্যে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশের দ্বারা এবং ক্রমে সে বৃত্তিকে জ্ঞানপরিচালিত করিয়া মানবসমাজের ক্রমবিকাশ করেন, বিশেষ দেশকালে ব্রহ্মের মানবসমাজরূপ বিরাটদেহের ক্রমবিবর্ত্তন করেন। বলিয়াছি ত, তিনি সর্ব্বভূতে জাতিরূপে, মাতৃরূপে, দয়ারূপে অবস্থিত হইয়া আছেন। মানুষের মধ্যে তিনি সেই সকল বৃত্তির ক্রমবিকাশ দ্বারা সমাজশরীরের ক্রমবিকাশ করেন—মনুষ্যত্বের ক্রমোন্নতি করেন। তিনিই জ্ঞানীকে বলে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিত্ত মোহযুক্ত করেন। (২) তিনিই মানবের অন্তরে, স্বার্থের মোহময় আবরণে আবরিত করিয়া অলক্ষ্যে সন্তান পালনাদি কর্ম্মে পরার্থবৃত্তির বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করেন। তিনিই মানবের অন্তরে দয়া, প্রীতি, ভক্তিরূপে সহানুভূতিরূপে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ করেন। তিনিই মানবকে সমাজশরীরের অন্তর্গত করিয়া তাহার পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি করেন, তাহার মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি করেন, তাহার স্বার্থ ও পরার্থ একীভূত করিয়া দিয়া, পরার্থ কর্ম্ম দ্বারা তাহার সুখ ও সন্তোষ বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তিনিই 'প্রসন্না হইয়া' পরকে আপনার করিতে মানুষকে শিক্ষা দিয়া, তাহার সেই মহা একত্ব জ্ঞানের বিকাশ করেন—মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যান।

---

(১) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—

"An ideal social being may be conceived as so constituted that his spontaneous activities are congruous with the conditions imposed by the social environment formed by such other beings"

H. Spencer's—Data of Ethics. P. 275.

(২) "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১।৫০।

অতএব পরার্থবৃত্তির প্রধান ও প্রথম বিকাশ—বংশ বা জাতি রক্ষা প্রবৃত্তি মাতাপিতার অন্তরে সন্তান পালন ও রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি। এই পরার্থবৃত্তির মাতৃরূপা প্রথম বিকাশ হইতেই জীবপ্রবাহ রক্ষা হয়। মাতাপিতার হৃদয়ে সন্তান পালন ও রক্ষা প্রবৃত্তিই শুধু মাতৃশক্তি নহে। সাধারণভাবে ধরিলে, এই পরার্থবৃত্তিকেই মাতৃশক্তি বলা যায়। এই পরার্থবৃত্তিবশেই জীব মাতার ন্যায় অন্য জীবে স্নেহযুক্ত হইয়া সহানুভূতি বশে তাহার জন্য কর্ম্ম করে। আর যেখানে জীবের চৈতন্য বিকাশিত হয় না, সেখানেও জীব প্রকৃতির মহামাতৃশক্তি বশে পরার্থ কর্ম্ম করে। প্রকৃতি স্বয়ং মাতৃশক্তিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। মানুষে মাতৃশক্তিরূপা এই পরার্থবৃত্তির বিকাশ হইতেই সমাজের বিকাশ হয়। তিনি মানুষকে পরার্থবৃত্তিবশে অলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া সমাজবদ্ধ করেন, সমাজশরীরের বিকাশ করেন। কোন বিলাতী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এ জগতে মাতৃত্ব বিকাশ করাই যেন প্রকৃতির প্রধান উদ্দেশ্য। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কতকটা তাঁহার কথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (১)

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

বন-পথে

কর্ত্তা লিখিয়াছেন—আমাকে কটক ছাড়িয়া বনে যাইতে হইবে। বন পথ শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানী মধ্যে শীত কালে—শীত কালে ব্যাঘ্র, ভল্লুকের জাগরণ দিনে—বন পথে পরিভ্রমণ বিপদ পূর্ণ, তাই পাছে আমি না যাই, কর্ত্তা নিজে কটকে আসিয়াছিলেন, পত্র পড়িবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ, তিনি জঙ্গল কার্য্যের অবস্থা বুঝাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উপায় কি? আমি বলিলাম, আমাকে যাইতে হয়, কর্ত্তা বলিলেন, আপনি ডাকের চিঠি পত্র পড়ুন, আমি আসিতেছি, চিঠি পড়িয়া যাহা জানিলাম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বৃদ্ধ শীকারীর মসি যুদ্ধে অনেক দিন শীকার করা হয় নাই। উড়িষ্যার জঙ্গল বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ, শীকারের সুবিধা হইবে বলিয়া বড়দিনের ছুটীতে যখন পুত্র কন্যাগণে গৃহ পরিপূর্ণ, তাহাদের শব্দ ছাড়িয়া বন পথে বাহির হইলাম। কিন্তু মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না। কর্ত্তার আদেশ গন্তব্য স্থানে শীঘ্র পৌছিবে। ঘোড়া গাড়ীতে যাইতে পারিলে যাইতে হইবে। সে পার্ব্বত্য পথে ঘোড়া গাড়ী চলে না, পাল্কীতে একা যাইয়া লাভ নাই, সঙ্গীরা পাছে পড়িয়া থাকিবে। গোযানে বা

---

(১) পণ্ডিত Drummond তাহার Ascent of Man নামক গ্রন্থে এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"It is too much to say that the one motive of organic nature is to make Mothers? It is at least certain that this was the chief thing she did .....The machinery of Nature is designed in the last result to turn out Mothers......It is a fact which no human mother can regard without awe, which no man can realise without a new reverence for women and a new belief in the higher meaning of nature, that the goal of the whole plant and animal king-dom, seems to have been the creation of a family which the very naturalist has had to call *Mammalia—Mothers*" .

নৌযানে সুবিধা, কেরাণী বাবু ধরিয়া বসিলেন, গোযানে যাওয়া হইবে না। সুদায় বাবু সেদিন বন পথে যাইতেছিলেন, তাঁহার চোখের সাম্নে বাঘে একটা গরু লইয়া গেল, রায় সাহেব বাঘে মারা একটা মহিষ দেখিয়াছেন, গত বৎসর নরসিংপুরে ৯৪টা মনুষ্য বাঘে মারিয়াছিল। রাজ প্রাসাদের সম্মুখে বেলা নয়টার সময় রাজা ও মন্ত্রীগণের চোখের সাম্নে বাঘে একটা মনুষ্য লইয়া যায়। কেরাণী বাবু নব বিবাহিত, সুশীলা পরমা সুন্দরী, এমন স্ত্রী ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে তিনি প্রস্তুত হন নাই, আমি এখন সন্ধি স্থলে, এদিকেও যা ওদিকেও তাই। কাজেই আমার কথা গ্রাহ্য হইল না। নৌযানেই যাওয়া স্থির হইল।

কর্ত্তার আদেশ, পরদিনে বাহির হইতে হইবে, তারে গুলি গোলা আনাইতে হইল। জিনিষ পত্র আয়োজন করিতে এক দিন বিলম্ব হইল, পরদিন বাহির হইব, এমন সময়ে মাঝি ইস্তফা দিল, সে জানিত না যে আমি এক মাসের জন্য বাহির হইব। সে অত দিনের জন্য পরবাসী হইতে প্রস্তুত নহে। কাজেই অন্য নৌকা স্থির করিতে হইল, সকল আয়োজন স্থির হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, আমার কেরাণী বাবুকে পুলিষে গ্রেপ্তার করিয়া কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া গিয়াছে, বাবু এক পয়সার মূলা কিনিতে দরের প্রভেদ হওয়ায়, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা মত দুটা মূলা বেশী কেন বিক্রেতা দিল না, বিশেষতঃ সে উড়িয়া, বাবু বাঙ্গালী—বাঙ্গালীরা মনে করেন, উড়িয়া তাঁহার নিকট চিরদাসখতে নাম লিখাইয়াছেন, ধনরত্ন সকলই বাঙ্গালীর শ্রীপদে সমর্পণ করিয়া নিজের জন্য লৌহ বিনির্ম্মিত হার প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, কাজেই দুটা মূলার অভাবে বার আনার শিঙ্গের ছড়িগাছা উড়িয়ার পৃষ্ঠ-দেশে ক্ষয় করিয়াছে, এবং গাড়ী ভাড়ায় আর পাঁচ টাকা ব্যয় করিলেন, সংবাদ পাইয়া আমি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘোর প্রতিবাদ করিলাম যে, যখন একপক্ষ মারিয়াছে, অন্য পক্ষ কেবল মার খাইয়াছে, কাজেই মারা মারী হয় নাই, মাজিষ্ট্রেটও বুঝিলেন যে কোনই অপরাধ হয় নাই। কেরাণী বাবুকে মুক্তি দিয়া বাদীকে তাড়াইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তাহার পিঠের মাংস ভবিষ্যতে যেন অত সহজে না ফুলিয়া উঠে। আমি স্বদেশ-হিতৈষী। সাহেবে এমন কাজ করিলে সংবাদ পত্রে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিতাম। গোলেমালে মঙ্গলবারটাও কাটিল, পূর্ব্ব রাত্রে ক্লবে যাঁহাদের কাছে বিদায় লইয়াছিলাম, আজ আবার দোকর তাঁহাদের কাছে বিদায় লইতে লইল। বুধবার সকালে বাহির হইলাম। নদী কূলে খোকার সে নীরব রোদন অনাথের ন্যায় বালীর উপরে বসিয়া কাতরে আয়ত লোচনের নীরব ধারা এখনও বুকের উপর ভাসিতেছে। বুদ্ধি হইয়াছে, ভুলাইলে ভুলে না। সুকুমার আসিয়া জোর করিয়া লইয়া গেল, বাঙ্গালীর বিদায় কি বিপদ পূর্ণ!

আজ কাল কটকে বোধা চাউল টাকায় আধ মোণের উপর বিক্রয় হইতেছে। অথচ যেখান হইতে চাউল আসিতেছে সেখানে চাউল পাওয়া যায় না। মফঃস্বলে বিশেষতঃ শীকার করিতে বাহির হইলে বিলাসকে বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু যে দেশে মফঃস্বলে ডাল ভাত পাওয়া যায় না, সে

দেশে বাহির হইলে কিছু আয়োজন করিয়া যাইতে হয়।

উড়িষ্যায় পার্ব্বত্য প্রদেশকে গড়জাত বলে। উড়িষ্যায় গড়জাত করদ রাজ্য, অথচ অশিক্ষিত ও অকর্ম্মণ্যতা হেতু এই রাজগণের সম্মান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অতি সামান্য। শিক্ষা ও কর্ম্মণ্যতা হেতু ময়ুরভঞ্জ রাজা সম্মানে গড়জাত রাজাগণের শীর্ষস্থানীয়। সম্পদে কিয়ঞ্জর এতদ্ভিন্ন ঢেঁকানল, পাললহড়া, তালচের, বৌধ, আটমালিক, দশ পাল্লা, নরসিংপুর খণ্ডপাড়া, টিগরিয়া, বড়ম্বা, আটগড়, হিন্দোল নয়াগড় প্রভৃতি পোনরটী রাজ্য আছে। মহানদী বাহিয়া উপরে উঠিতে হইলে, বামদিকে ডোমপাড়া, খণ্ডপাড়া, দশপাল্লা, ও বৌধ এবং দক্ষিণে আটগড়, টিগড়িয়া, বড়ম্বা, নরসিংহপুর, ও আটমালিক পওয়া যায়। মহানদীর ধারে যে সকল নগর আছে, তাহাদের মধ্যে সম্বলপুর, সোনপুর, বৌধ, আটমালিক, বড়মূল, নরসিংহপুর, কাণ্টিলো, বৈদেশ্বর, বাঁকী, ডোমপাড়া ও ধবলেশ্বর প্রধান।

পার্ব্বতীয় রাজ্যগুলি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ। জঙ্গল হইতে কুচিলা, হরিতকী, বয়ড়া, খয়ের, ধুনা, গালা ও গুটি কোয়ার এবং সমতল হইতে চাউল, তিল, বেড়ী, কোলথ যথেষ্ট পরিমাণে কটকে আমদানী হয়। পাহাড়ে লৌহ, মাঙ্গানিজ, শিসা, খড়ি, গেরীমাটী বিস্তর আছে। কিন্তু মূলধন ও বিষয় বুদ্ধির অভাবে ইহাদের যথেষ্ট আমদানী হইতেছে না।, বনভূমি সাল, পিয়ার শালের, আসন ও খদির বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শাল ও পিয়ার শালের যথেষ্ট আমদানী হইতেছে। ক্যাশ কোম্পানী, কোম্পানী, বেঙ্গল ট্রেডিং কোম্পানী, বি, বড়ুয়া প্রভৃতি সদাগরেরা রেলওয়ে স্লিপার প্রস্তুত করাইবার জন্য সহস্র সহস্র কাঠুরিয়ায় জঙ্গল পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মহানদীর ধারে ধারে কটক হইতে সোনপুর পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা পর্ব্বতের উপর দিয়া ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এতদ্ভিন্ন আর একটী রাস্তা সম্বলপুর গিয়াছে। পার্ব্বতীয় রাজ্যগুলির ভিতর ভাল রাস্তা নাই, প্রত্যেক রাজ্যেই একটী ইংরাজী স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল ও জেলখানা আছে। স্কুলগুলি সাধারণতঃ মধ্য শ্রেণীয়, ঢেঁকানল ও ময়ুরভঞ্জে দুটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি স্কুল আছে। স্কুল, হাঁসপাতাল, জেলখানা প্রভৃতি রাজধানীর শোভার জন্য। একটী করিয়া বাজারও আছে। তাহাতে দুই একজন মাড়য়ারী দেখা যায়। বাঙ্গালীরা এখনও গড়জাতে প্রবেশ করে নাই। কেরোসিন তৈল আসিয়াছে, সিগেরেট এখনও স্থান পায় নাই। উড়িয়া পিকা রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। টিকির সঙ্গে তেলের কি সম্বন্ধ বুঝা যায় না। কেরোসিনের বাতি যত জ্বলিতেছে উড়িয়ার টিকি তত অদৃশ্য হইতেছে। ময়ুরভঞ্জে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী অনেক আছে, ঢেঁকানলে দুই একজন দেখা যায় কিন্তু অন্যত্র উৎকল ব্রাহ্মণ ও মাহান্তির একাধিপত্য। গড়জাত রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজি বলিতে পারেন, কেহ কেহ বাঙ্গালা বুঝেন, কিন্তু উড়িয়া ভাষা না জানিলে বিদেশীর কথোপকথনে অসুবিধা হয়। মাদকতা দোষ প্রায় নাই। দু একজন রাজা আফিং বা গাঁজা ব্যবহার করেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা

সামান্য। উৎকলে ব্রাহ্মণাধিপত্যের এখনও পূর্ণ প্রভাব। মাদকতায় ব্রাহ্মণদের বিশেষ বিদ্বেষ। মাহান্তিরা কায়স্থ বা করণ জাতীয়। বিহারের লালারা মাদকতার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু সাহেবানুকারী ইংরাজি শিক্ষিত দু এক জন মাহান্তি ভিন্ন সুরা পান আর কোথাও দেখা যায় না। অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকে নেশা করে। খর্জ্জুরের রস পানও অজাতিকর। বনে সহস্র সহস্র খেজুর গাছ আছে, কিন্তু কেহ কাটে না। খেজুর গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে খাণ্ডোয়ায় না যাইয়া উৎকলে আসিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। বিশেষতঃ মাদকতা সম্বন্ধে তুলনা করিলে বাঙ্গালা দেশ উৎকল হইতে নিকৃষ্ট,উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী ও উৎকলবাসী অনেক ভিন্ন।

উড়িষ্যায় বনভূমি শ্বাপদে পরিপূর্ণ, হরিণ, ভল্লুক, বরাহ, হস্তী, ও ব্যাঘ্রের সীমা নাই, দুর্ভাগ্যক্রমে শান্ত প্রকৃতির উড়িয়া রাজাগণের মধ্যে মৃগয়া-প্রিয়তার লেশমাত্র দেখা যায় না। অঙ্গুলে একটী হাতী ধরিবার খেদা হইয়াছে, কোন কোন বৎসর দু একজন রাজা খেদা করিয়া হাতী ধরিয়া থাকেন। খেদার ধরা হাতী অধিকাংশ মরিয়া যায়। দশ বিশটী বাচ্ছা বাঁচে, সে গুলি রাজাদের ব্যবহারে আসে। পাহাড়ের মধ্যে হাতী থাকে। নরসিংহপুর ও আটমালিকের তিন দিকে পাহাড়ের মাধ্য হাতী বাস করে, একদিকে বেড়া দিলেই হাতী পাওয়া যায়। বনমুরগী গভীর জঙ্গলে চরে, রাত্রিকালে গাছে ডালে বসিয়া থাকে,বনলতায় আচ্ছাদিত শুষ্ক বাঁশ গাছের উপর সন্ধ্যার সময়ে নদীপার্শ্বে ময়ুর ময়ূরী সন্তান লইয়া শয়ন করে। বৌধ রাজস্ব মস্তক ময়ুর এজন্য বৌধ রাজ্যে ময়ূর মারা নিষিদ্ধ। গভীর শাল বনের মধ্যে জলের ধারে তরুমূলে হরিণ থাকে। বাঁশ জঙ্গলের ভিতর বরাহ পাওয়া যায়।

কটক ছাড়িয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে যতই প্রবেশ করা যায়, ভাষা ও বর্ণ এবং ব্যবহার ততই মিশ্রিত হইতে দেখা যায়, ভাষা উড়িয়া, কোল, তৈলঙ্গী মিশ্রিত। ব্রাহ্মণ ও মহান্তী উচ্চ বর্ণ ক্রমেই কম হইয়া নীচ জাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়। বোধ হয় কোল খন্দ, গোন্দ, প্রভৃতি বর্ব্বর জাতীয় মনুষ্যেরা হিন্দু হইয়া এই নিম্নশ্রেণী গঠিত করিয়াছে। আকৃতি ও প্রকৃতি কোল ও শাঁওতালদের মত। সুস্থ দেহ, প্রফুল্ল চিত্ত, হাসী মুখ, স্ত্রী পুরুষে জোহার করে এবং বনপথে ভ্রমণের সময়ে একখানি কুঠার হাতে থাকে। মেয়েদের কাপড় পরা ও চুল বাঁধা তৈলঙ্গীদের মত, ঘোম্‌টা কোথাও নাই। চরিত্রহীনতা বড় বেশী। আজও গরু বাছুরের ন্যায় আপন সন্তান বিক্রয় করিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ সময়ের কথাই নাই, দারিদ্র পীড়নে সন্তান বিক্রয় সকল সময়েই হইয়া থাকে। রাজা ও দেওয়ানের ঘরে এমনি ক্রীতদাস অনেক আছে। স্বজাতীয় হইলে ক্রীতদাসীকে অন্য লোকে বিবাহ করিয়া থাকে, নতুবা চিরদিনের জন্য তাহারা গোলামী করে। দুইটী বিক্রয়ের কন্যার সন্ধান পাইয়া দাস বিক্রয়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য আমি চেষ্টা করিয়া জানিলাম, অনতিপূর্ব্বে তাহারা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকে বিবাহ করিবার সময় স্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলি দাসী উপহার পাইয়া থাকে। রাজা রাজড়ারাও শতাধিক দাসী উপহার পায়। এই সকল দাসী স্ত্রীর ন্যায়, স্ত্রীও জানে কেন তাহারা আসে।

তজ্জন্য কেহ কোন দোষ ধরে না। এই দাসীগর্ভের সন্তানদিগকে বৈমাত্র ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। দাসীপুত্রকে সিংহাসনে বসিতে দেখা গিয়াছে। রাজকন্যারা পূর্ণ বয়সে বিবাহিত হয়। ক্রমে বাল্যবিবাহ প্রবেশ করিতেছে। "ভিত্‌রিয়া" নামে ভৃত্য অনেক সংসারে সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

উড়িষ্যার বনভূমে বৌদ্ধধর্ম্ম কখনও প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, প্রেত ও প্রকৃতির পূজাই অধিক, কিন্তু তাহাও হিন্দু ধর্ম্মের ছায়ায় হইতেছে। করাক তাঁতী বলিয়া এক সম্প্রদায় তন্তুবায় দেখিতে পাওয়া যায়। হয়তো ইহারা অন্য কোন স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। বোধ হয়,শ্রাবক হইতে সবাকের উৎপত্তি। ইহারা গণেশ ও অন্যান্য হিন্দু দেবতার সহিত বুদ্ধদেবের পূজা করে। ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাঙ্গালা ও উড়িয়ায় মিশ্রিত ভাষায় রচিত, এবং পূজা পাঠ ও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিশ্রিত। ইহারা জানে না যে, ইহারা বৌদ্ধ, আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়।

বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া শৈবধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়, এখন উচ্চ শ্রেণীর সকলেই বৈষ্ণব। জগন্নাথ, বিষ্ণুদেবতা বলিয়া গণ্য। পুরীতে জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির, ভুবনেশ্বরের শৈব মন্দিরের পরস্তন হইলেও জগন্নাথের প্রথম মন্দির ভুবনেশ্বর মন্দিরের পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রদেশে শিব মন্দিরের সংখ্যাই অধিক। ধবলেশ্বরে শৈব মন্দির, কণ্টিলোর মন্দিরের অবস্থান ও গঠন সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। এমন সুন্দর মন্দির ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখি নাই।

আর প্রকৃতির শোভা, তাহার তুলনা হয় না। বড়মূলে বসিয়া সাতকুশিয়া নামক গিরি সঙ্কটের অপূর্ব্ব শোভা, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহ চারিত বনভূম, বন-কুক্কুট, ময়ূর ও পাপিয়া-কলিত অধিত্যকা, মকর নক্র উদ্বেলিত মহানদার কলকল প্রবাহ, হৃদয় মুগ্ধ করে না, উদাসে পূর্ণ করিয়া ফেলে। মহানদী উড়িষ্যার প্রাণ। শিলাখণ্ড ও বালুস্তূপ জগদ্দল পাষাণের ন্যায় ইহার বক্ষদেশ নিষ্পেষিত করিয়াছে, দুর্ভিক্ষ হইতে উড়িষ্যা রক্ষা করিতে পয়োনালী প্রস্তুত করিতে গিয়া "আনিকট" শৈল শৃঙ্খলে মহানদীর শ্বাসনালী বন্ধ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সেই সঙ্গে উৎকলের অর্দ্ধেক প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। সাতকুশিয়া গিরি সঙ্কটের গঠন কৌশলে এখনও মহানদী জীবিত রহিয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী

মুক্তিক।

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া মুক্তিকোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত হইল। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে।]

মুক্তিক।

প্রথম অধ্যায়।

একদা অযোধ্যা ধামে সীতা সহ রাম
রতন মণ্ডপে বসি করেন বিশ্রাম।

ভরত শত্রুঘ্ন আর লক্ষ্মণ সুমতি,
বশিষ্ঠ সনক শুক করিছেন স্তুতি।
হেন কালে ভক্তিভাবে পবন নন্দন,
স্তব করি করযোড়ে কহেন বচন।
"হে রাম, সচ্চিদানন্দ সর্ব্বদর্শী তুমি,
মুক্তি হেতু এ সংবাদ জিজ্ঞাসিছি আমি।
তোমার স্বরূপ কিসে হইবেক জ্ঞান ;—
দয়া করি কহ প্রভু করুণানিধান।
এ তত্ত্ব বুঝিলে ভব-বন্ধন ঘুচিয়া
মুক্ত হব অনায়াসে ; কহ প্রকাশিয়া।"
"সাধু সাধু, মহাবাহু," কহিলা শ্রীরাম,
উত্তম এ প্রশ্ন তব ; হনু গুণধাম।
এ তত্ত্ব বেদান্ত মাঝে আছে প্রকটিত,
যাহে মুক্ত জীবকুল হইবে নিশ্চিত।
বেদান্ত আশ্রয় কর, তুমি শুদ্ধ জ্ঞানী।"
"বেদান্ত কি বস্তু নাথ ?" সুধিলা পাবনি।

শ্রীভগবান।—

আমার স্বরূপ বিষ্ণু-নিশ্বাস হইতে,
বেদের উদ্ভব হয় কালের আদিতে।
"বেদ মধ্যে আছে নিত্য বেদান্ত নিচয়,
তিল মধ্যে তৈল যথা গূঢ় ভাবে রয়

হনুমান। কত বেদ কত শাখা উপনিষৎ কত?

শ্রীভগবান।—

চারি বেদ, বহু শাখা আছে সুবিখ্যাত।
ব্যোম বসু বিধু সোম শাখা পরিমাণ ;
প্রতি শাখে এক উপনিষদের স্থান।
তা'সবে একটী ঋক্ যেই ভক্ত পড়ে
আমার সাযুজ্য পদ যেই লাভ করে।
ভ্রমর যেমতি পুষ্পে যুক্ত হয় আসি ;
সেও তথা যুক্ত হয় মৎ-স্বরূপে পশি।"
মারুতি কহিলা শুনি ভগবদ্বাণী,
"মুক্তি একরূপ মাত্র কহে কোন মুনি।
কেহ কহে তব নাম ভজনে উদ্ধার,
কেহ কহে সাঙ্খ্যযোগে, ভক্তিযোগে আর।
কোনি ঋষি কহে মুক্তি বেদান্ত বিচারে
কোন কথা সার প্রভু ? কহ দয়া কার।"
শ্রীরাম কহিলা তবে শ্রীমুখে বচন,—
"সবই সত্য বুঝ যদি পবন-নন্দন।
সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্য ভেদে,
চতুর্ব্বিধ মুক্তি পথ ধার্য্য আছে বেদে।
যেমন সাধন যার মুক্তি সেই মত,
কিন্তু শ্রেষ্ঠ কৈবল্য মুক্তি আছে খ্যাত।
বিশেষ প্রকাশি তোমা কহি উপদেশ,
বেদান্তের জ্ঞানে নাশ ভব-বন্ধ-ক্লেশ।
নাস্তিক কৃতঘ্ন কিম্বা দুরাচার জনে,
শুধু শাস্ত্র-তর্কে-পটু ভকতি বিহীনে,
মুক্তি তত্ত্ব কভু নাহি কথন উচিত,
তাহে ফললাভ মাত্র হিতে বিপরীত।
সেবাপর সৎ শুদ্ধ কুলীন সুশীলে,
সুভক্ত মেধাবী শিষ্যে কহিবে বিরলে।
মুক্তি অভিলাষ হবে শিষ্যের যখন,
শম দম আদি যত্নে করিবে সাধন।
নিত্য আর অনিত্যের ভেদ বুদ্ধি হলে ;
কামনা ত্যজিবে শিষ্য ইহ-পর-কালে।
ত'ার পর শ্রদ্ধাবান সদ্বংশ জাত
সুশাস্ত্র বৎসল, সর্ব্বভূত-হিতে রত,
দয়া সিন্ধু শ্রোত্রিয় সুগুরু সন্নিধি
উপনীত হবে শিষ্য বন্দি যথা বিধি।
হেন গুরু হেন শিষ্যে অষ্টাধিক শত ;
উপনিষদের বিদ্যা দিবেন সংযত।

গুরু মুখে শ্রুতিধ্বনি করিয়া শ্রবণ
সাঙ্খ্যাদি দর্শন বিধি করিবে চিন্তন।
চিন্তা করি এক-নিষ্ঠ ধ্যানে নিরন্তর
স্থূল-সূক্ষ্ম-অধিষ্ঠান দেহ নাশ কর।
দেহ ত্রয় নাশ হয়ে কর্ম্ম নাশ হলে,
কৈবল্য মুকতি লাভ হয় যথা কালে।
যেমন ভাঙ্গিলে ঘট অনন্ত আকাশে
ঘটস্থ ক্ষুদ্র আকাশ মিশে অনায়াসে।

জ্ঞানের উদয়ে হয় কৈবল্য মুকতি ;
পন্থা মাত্র কর্ম্ম, শাঙ্খ্য-যোগ, ও ভকতি।
নচেৎ নিষ্ফল কর্ম্ম, সাঙ্খ্য, ভক্তি বৃথা ;
ভক্তি ভাবে বুঝি লও এই সার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন সুধিলা রামে অঞ্জনা-নন্দন ;
"মুক্তি-কিবা বিশ্বনাথ, কি তার লক্ষণ ;
কেমন বিদেহ মুক্তি, কি তার প্রমাণ,
কি বা প্রয়োজন তাহে ? কহ ভগবান।

শ্রীভগবান।—

আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা, দুঃখী সুখী আমি ;
দারা পুত্র ধন ক্ষেত্র, আমি তা'র স্বামী—
এই মহা ভ্রমই ক্লেশ, জীব বদ্ধ তায় ;
এ ভ্রম ঘুচিলে দেহী জীবন্মুক্ত হয়।
স্থূলাদি ত্রিদেহ নাশে ক্ষয় হয় কর্ম্ম,
কর্ম্ম ক্ষয়ে নিত্যে লয়, এই সার মর্ম্ম।
বিদেহ মুকতি এই ; বেদান্ত প্রমাণ ;
কর্ম্মক্ষয়ে লয় হলে দুঃখ অবসান।
তাহে নিত্য আনন্দ, তা'ই প্রয়োজন ;
অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি জীবের সাধন।

হনু। কর্ম্ম কি ত্রিবিধ দেহেই আছে প্রতিষ্ঠিত?

শ্রীভগবান।—

দেহ সহ কর্ম্ম এক সূত্রে গ্রথিত।
দেহে কর্ম্ম স্বাভাবিক ; অথবা, মারুতি,
কর্ম্ম সৃজি লয় দেহ, নিত্য এ নিয়তি।

হনু। কিসে তবে কর্ম্মনাশ ? কহ দয়াময়।

শ্রীভগবান।—

বাসনা কর্ম্মের মূল, তার ক্ষয়ে ক্ষয়।

হনু। বাসনা কাহারে বলি ? কিসে নাশ হয় ?

শ্রীভগবান।—

পূর্ব্বাপর বোধ ত্যজি বিষয় চিন্তায়
দৃঢ় ভাবে মগ্ন হলে, বিষয় গ্রহণ
করিতে আকাঙ্ক্ষা অতি করে জীবগণ,—
সেইত বাসনা ; তা'র ইহাই লক্ষণ।
বাসনা বিনাশ হয় জীবের চেষ্টায়,
দেহীর প্রযত্ন সাধ্য বাসনার ক্ষয়।
চেষ্টাই পুরুষকার,—দ্বিপ্রকার খ্যাত ;
এক উচ্ছৃঙ্খল, অন্য নিয়ত সংযত।
উচ্ছৃঙ্খল বাসনায় জ্ঞান রাশি নাশে,
বাসনা সংযমে জীব মুক্ত হয় শেষে।
শুভাশুভ এই দুই বাসনারে কহে,
শুভরে আশ্রয় কর, অশুভরে নহে।
পূর্ব্ব কর্ম্ম বশে হলে অশুভ প্রবল
যত্নে শুভ পথে সদা ফিরাবে কেবল।
নিরন্তর সুচেষ্টায় চিত্ত-বালকেরে
লালন করিতে হয় বিবিধ প্রকারে।
ক্রমশঃ পৌরুষ জীবে অভ্যস্ত হইবে ;
অগ্রেতে অশুভ, শেষে শুভও যাইবে।
শুভাশুভ দুইবিধ বাসনা যখন
হইবে বিনাশ, চেষ্টা সফল তখন।
বাসনা, বিজ্ঞান, মন, একত্র বিনাশে
সমকালে সুঅভ্যাস কর অনলসে।
এ তিন বিনাশে যত্ন করিলে একদা,
সুদীর্ঘ অভ্যাসে চেষ্টা হইবে ফলদা।
পুনঃ পুনঃ সুঅভ্যাসে বিনাশ না হ'লে
ঐশ-পদ প্রাপ্তি নাহি হবে কোন কালে।
যুগপৎ নাহি করি এ তিনের নাশ,
একে একে ব্রতী হ'লে বিফল প্রয়াস।
তাহাতে সফল-যত্ন হবে না জীবের,
যেমন মন্ত্রাংশে ফল না হয় পাঠের।
এ তিনের যুগপৎ হইলে বিনাশ
চিত্ত গ্রন্থি ছিন্ন হবে ব্যতীত প্রয়াস।
মৃণাল খণ্ডিত হলে সূত্র খণ্ড হয়,
সেইরূপ হবে, সুধি, নাহিক সংশয়।
জন্ম জন্মান্তরে মিথ্যা সংসার বাসনা
সত্য বলি দৃঢ়রূপে হয়েছে ধারণা ;
সুদীর্ঘ-অভ্যাস যোগ বিনা কি কখন

সেই মিথ্যা মিথ্যা বলি হইবে স্ফুরণ ?
তাই বৎস, বিবেকেরে করিয়া আশ্রয়
যত্নে ভোগ-ইচ্ছা দূর করিবে নিশ্চয়।
তা'হলে বাসনা আদি তিনই খণ্ডিবে ;
তখন অভীষ্ট পদ, কপিশ্রেষ্ঠ, পাবে।
বিষয় বাসনা-জালে বদ্ধ হয় মন,
বাসনা ত্যজিলে মুক্তি, উক্তি সনাতন।

হনু। কিসে তাহা সিদ্ধ হবে ?

শ্রীভগবান। একমাত্র পথ—
বস্তুর স্বরূপ চিন্তা করিবে সতত।
পার্থিব বিষয় তরে হইলে লালসা
অমনি চিত্তেরে তুমি করিবে জিজ্ঞাসাঃ—
"একি বস্তু ? কিবা গুণ ? কেমনে গঠিত ?
ভোগ কতক্ষণ ? ফলে হিত কি অহিত ?
প্রকৃত প্রস্তাবে, কিসের এ পরিণাম ?"
এ ভাবে বিশ্লেষ করি, বিষয়ের নাম
রূপ, শক্তি, ভোগ, বুঝিলে তখনি,
ক্রমে বাসনার বেগ কমিবে, পাবনি।
তাই কহি বিষয়ের স্বরূপ চিন্তনে
ক্রমে বাসনার নাশ হবে শুভক্ষণে।
তখন অসম চিত্ত সমতা লভিবে
বিনির্ম্মল চিন্মাত্রে পরিণত হবে।
উৎকট বাসনা বেগ ক্রমে শান্ত হ'য়ে
যে চিত্ত সমতা লাভ করে সুসময়ে,
কি কাজ তাহার, হরে, কর্ম্ম অনুষ্ঠান ?
কি কাজ সমাধি কিম্বা ভজন সাধন ?
সহজে সে লাভ করে উত্তম আশয়,
প্রবণতা-শূন্য, স্থির, নিরুপাধি হয়।
তখন সকাম কিম্বা নিষ্কাম কর্ম্মের
একদা বিনাশ হয় প্রশান্ত জীবের।

হনু। স্ব-রূপ চিন্তনে নাথ কহ কি উপায় ?

শ্রীভগবান।—
সর্ব্বেন্দ্রিয় মৌনভাব করিলে আশ্রয়
বস্তুর স্ব-রূপ জ্ঞান হইবে উদয়।
বাহ্য স্বার্থে ইন্দ্রিয় স্বতঃই ভ্রমিছে
স্ব স্ব পথে বাসনার আদেশ পালিছে।
প্রাণের স্পন্দন হয় বাসনার মূল,
স্পন্দর নিরোধ কর, এই কথা স্থূল।
একবার ইন্দ্রিয় বাসনা-কিঙ্কর,
অন্যবার সে বাসনা ইন্দ্রিয়ের চর।
বীজ বৃক্ষ যেই মত এক অন্য হ'তে,
বাসনা ইন্দ্রিয় উভে হয় সেই মতে।
পদ্ম-পত্রে নীর সম বিষয় সংশ্রবে
সংশ্রবই মাত্র যেন ; জড়িত না হবে।
কেবল অভ্যাস, সুধি, কহি পুনঃপুনঃ
জীব-বন্ধ-ক্ষয়-কর ; ভক্তি ভরে শুন।
সংসার বৃক্ষের মূল একমাত্র মন,
সংকল্প মনের সংজ্ঞা, করহ ছেদন।
মূল ছেদে সে বৃক্ষের নিধন সাধিয়া
মুক্ত হও, ভক্তশ্রেষ্ঠ, সুশান্তি লভিয়া।
অজ্ঞের শৃঙ্খল মন, জানিবে নিশ্চয় ;
মনের স্ফুরণে নাশ, মনোনাশে জয়।
যে পর্য্যন্ত মন নাহি হইবে বিজিত
এক তত্ত্ব মাত্র চিন্তা নিতান্ত বিহিত।
তা হ'লে ক্রমশঃ চিত্ত আর অহঙ্কার
ক্ষীণ হবে, হেমন্তের পদ্মের আকার।
অঙ্কুশ বিহনে দুষ্ট দন্তী নহে বশ,
সেইমত বেদ বিদ্যা, সাধু সঙ্গে বাস,
বাসনার ত্যাগ, প্রাণ স্পন্দন দমন,—
চতুষ্টয় বিনা মুক্তি হবে না কখন।
অচিরে যে মূঢ় চিত্ত চাহে জিনিবারে,
মৃণাল-সূত্রেতে হস্তী পারে বাঁধিবারে।
প্রশান্ত চিত্তই হয় ব্রহ্মপদে লীন
প্রভা-শূন্য নিত্যানন্দ, উপাধি-বিহীন।
ঊর্দ্ধ অধঃ কিম্বা মধ্য হয় ব্রহ্ম-ময়
সমাধির পরিণতি অনন্ত চিন্ময়।

হনু।—
নানা শাস্ত্র ভগবন্‌, নহে কি বিরোধী ?

শ্রীভগবান।—

কিন্তু সেই এক কথা, গূঢ় বুঝ যদি।
"বহু শাস্ত্র কথা কন্থা-রোমন্থন" বৃথা,
বেদান্ত আশ্রয়ে চিত্ত লভিবে সমতা।
যেমন বিবিধ বস্তু করিয়া রন্ধন
পাচক বর্দ্ধিত রসে, জানিবা তেমন,
বহুশাস্ত্র গ্রন্থ মাত্র করি অধ্যয়ন
ব্রহ্মাতত্ত্ব স্বাদ কভু না হয় গ্রহণ।
বাসনায় বদ্ধ জীব, মুক্ত তা'র নাশে ;
বাসনা বিনাশি, নাশ' মুক্তি অভিলাষে।
বহু পল্লবিত ইচ্ছা সর্ব্বাগ্রে ত্যজিয়া
মুকতি কামনা মাত্র হৃদয়ে ধরিয়া
অবশেষে সে বাসনা করিবে বিনাশ,
হইবে জলদ-মুক্ত নির্ম্মল আকাশ।
সুখ দুঃখ, ত্যাগ ভোগ, দ্বন্দ্ব হ'ক সম,
নিরুপাধি হক চিত্ত নির্ম্মল নির্ম্মম।
মন বুদ্ধি নিবারিয়া চিন্মাত্র কেবল
হউক জীবের অবলম্বনের স্থল।
অবশেষে চিদ্বাসনা হবে তিরোহিত,
সমাধি অভাতে হবে আমাতে মিলিত।
শব্দহীন, স্পর্শহীন, রস-গন্ধ-হীন,
অনাম অরূপ-গোত্র কূটস্থ প্রাচীন,
অনাদি অনন্ত, কার্য্য-কারণ-অতীত
অব্যক্ত, সতত-ব্যক্ত, সত্ত্বা সর্ব্বগত—
উপাধি আমার-ভক্ত ; ভাব' সেই ভাবে,
অনন্ত বিদেহ-মুক্তি অধিকারী হবে।
ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত অমূর্ত্ত মূরতি,
তুমি সেই, সেই তুমি ; হইবে প্রতীতি।
তখন মুকতি ধনে লভিবে, হরীশ ;
অনন্ত বিশ্রাম, শান্তি ॥ জয় জগদীশ,—
জয় জগদীশ ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং ॥

শ্রীশশধর রায়।

কুচবিহারে সাহিত্য চর্চ্চা।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস প্রণয়ন কার্য্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য সমস্ত বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট ঋণী। দীনেশ বাবু পূর্ব্ব বঙ্গের লোক এবং তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, পশ্চিম বঙ্গেও প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহে তিনি এবং শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে উদ্দীপ্ত স্থান সমূহ এবং এই সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে প্রাচীন গ্রন্থাদির অনেকেই অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এই উন্নত অঞ্চলের অনেক গ্রন্থ সাধারণের উপভোগের বিষয়ীভূত হইয়া বঙ্গভাষার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু উত্তর বঙ্গে প্রাচীন কালে সাহিত্য কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং কিরূপ গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। কেবল মাণিকচাঁদের গীত বা গোপী চাঁদের কথা পড়িয়া সাহিত্যসেবী ব্যক্তির উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। পালবংশের রাজত্ব গেলেও অনেক গণ্য মান্য রাজা উত্তর বঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের আশ্রয়-ছায়ায় বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহাই সম্পূর্ণ

সম্ভব। দীনেশ বাবুর অনুমান সত্য হইলে কুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাসও আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে উত্তর বঙ্গে আসাই আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন এবং উত্তর বঙ্গ হইতেই রামায়ণ রচনার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কুচবিহার রাজ্যে প্রাচীনকালে কিরূপ সাহিত্য চর্চ্চা হইত, তদ্বিষয় পাঠকবর্গকে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। আশা করি, কোন সাহিত্যানুরাগী উপযুক্ত ব্যক্তি অধিকতর গবেষণা করিয়া "খনির তিমির গর্ত্ত" হইতে রত্নোদ্ধারে প্রয়াসী হইবেন।

কুচবিহারের রাজ সভায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষারই বিশেষ আদর ছিল। এবং অনেক গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় কেবল তুলট কাগজের শোভাবর্দ্ধন করিয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত আছে।

কুচবিহারে এক্ষণে যে রাজবংশের অধিকার, এই বংশীয় তৃতীয় রাজা নর নারায়ণের সময়ে কুচবিহার রাজ্যের চরম উন্নতি হয়। ১৫৫৫ হইতে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব কাল। ইনিই কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ইনিও ইহাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজের বাহুবলে বহু বিস্তৃত ভূভাগের উপর ইহাঁদের রাজত্ব সংস্থাপিত হয়। কথিত আছে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, মণিপুর, প্রভৃতি রাজ্য ইহাঁকে কর দিতে বাধ্য হয়। ইহাঁর অপর নাম মল্লদেব। ইহাঁর সময়ে পণ্ডিতগণ বিশেষ সমাদর লাভ করেন। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রয়োগরত্নমালা নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ ইহাঁর রাজত্বকালে রচনা করেন এবং রাম সরস্বতী ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ করেন। কুচবিহারের ষ্টেট লাইব্রেরীতে ভাগবত একাদশ স্কন্ধের হস্তলিখিত একখানি পদ্যানুবাদ রহিয়াছে। ইহা ঐ রাম সরস্বতীর রচিত কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। পুস্তক খানির হস্তাক্ষর বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষর হইতে কোন কোন অংশে স্বতন্ত্র। যাঁহারা প্রাচীন হস্তলিপি পড়িতে সক্ষম, তাঁহাদের হস্তে এই পুস্তক পরীক্ষিত হওয়া উচিত। প্রয়োগ-রত্নমালা ব্যাকরণ কুচবিহার ও আসাম অঞ্চলের টোলে পূর্ব্ববঙ্গীয় কলাপ ব্যাকরণের স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং কিছুদিন হইল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত লাইব্রেরীতে রামায়ণ আদিকাণ্ডের বাঙ্গালা পদ্যে একটী অনুবাদ ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হইয়া আছে। ১৭৪৮ শকের হস্তাক্ষর এবং ইহাতে কিঞ্চিত বিশেষত্ব আছে। এই গ্রন্থের শেষভাগে নর নারায়ণ ও শুক্লধ্বজের যেরূপ স্তুতি দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমিত হয়, ইহাও উঁহাদের সমকালের রচিত। প্রাণ নারায়ণের রাজত্ব কালে (১৬২৫—১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দ) রচিত একখানি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বিষয়ক পদ্য গ্রন্থের ১২০৮ বঙ্গাব্দের হস্তলিপি এই লাইব্রেরীতে দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত রূপ ভণিতা আছেঃ—

প্রাণদেব নৃপবর ভূমিপাল পুরন্দর—
বিদগত পুরুষ কেশরী
তার আজ্ঞা পরমাণে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে ভণে
সভাসদে বল হরি হরি।

অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ বাঙ্গালা কবিতায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হয়। কুচবিহার লাইব্রেরীতে স্থানে স্থানে ২।৩ খানি গ্রন্থ একত্র মিশ্রিত হইয়া প্রাচীন কালের হস্তাক্ষর যুক্ত থাকায় সাধারণ পাঠ-

কের বোধের অগম্য হইয়া রহিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একখানি প্রাচীন অনুবাদ গ্রন্থের সহিত অপর একখানি প্রাচীনতর গ্রন্থ মিলিত হইয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। গীতগোবিন্দের অনুবাদের প্রথম অংশ হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত হইল। প্রাচীন হস্তাক্ষর পাঠে অনভ্যস্ত ব্যক্তির সকল অংশ পাঠ করা কঠিন।

নমুনা—

"যমুনা সরিত তটে নন্দের কুমার
বিপিনে বনিতা সঙ্গে করয় বিহার"
"জলদে নিবিড় ব্যোম অন্ধকার বনে ;
চন্দ্রের কিরণ নাহি বিজনী সঘনে"
"বাসুদেব চরিত্রে চিত্রত যার মতি
পদ্মাবতী চরণ সেবাত চক্রবর্ত্তী,
হেন জয়দেব কবিরাজ মহাশয়
করিল গোবিন্দ কেলি কথা রসময়"
"কলঙ্ক কলয়া যেন শোভা চন্দ্রমার
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার"

একখানি গীতারহস্য পুস্তকের মধ্যে "কড়কড়া ভাত" এর উল্লেখ দৃষ্ট হইল। ইহার সমস্ত অংশ সাধারণ পাঠ্য নহে, এবং পুঁথিখানি পরীক্ষা করা সময়-সাপেক্ষ।

অনন্ত কন্দলীকৃত মহাভাগবত গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভূমিকা দৃষ্ট হয়—

"নিগদতি শুক শুন পরীক্ষিৎ
গৃহস্থের মহাধর্ম্ম"

কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের সময়ই (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দ) কুচবিহারে সাহিত্য চর্চ্চার এলিজাবেথান যুগ। মহারাজ হরেন্দ্র স্বয়ং কবি ছিলেন এবং তিনি নানা পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত করান। ভিন্ন কাণ্ড ও পর্ব্ব অনুবাদের ভার ভিন্ন ভিন্ন করিব উপর ন্যস্ত হয়। আমরা তাঁহার সময়ে অনুবাদিত মহাভারতের কয়েক পর্ব্ব এবং রামায়ণের অধিকাংশ কাণ্ড দেখিয়াছি। বোধ হয়, তিনি সম্পূর্ণ গ্রন্থই অনুবাদিত করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের বঙ্গানুবাদের বহু পূর্ব্বে যে মহাভারতের এরূপ পদ্যানুবাদ উত্তর বঙ্গের একজন রাজা করাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ কয় জনে রাখেন ?

এই সকল অনুবাদের অধিকাংশের ভাষা মার্জ্জিত এবং ইহাতে নানা ছন্দ দৃষ্ট হয়। এগুলি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে। মূলের অবিকল অনুবাদ না হইলেও এগুলি মূল অবলম্বনে লিখিত। অনেক স্থানে অনুপ্রাস বাহুল্যাদি দৃষ্ট হইলেও, এই গুলি প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্যসেবী ব্যক্তিগণ বিশেষ পরিতৃপ্তিলাভ করিবেন। পাঠক দেখিবেন, তোটকাদি ছন্দ কেবল কৃষ্ণনগরের রাজ সভায় বা পশ্চিম বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহার কোন কোন পুস্তকের রচনা হইতে নিম্নে নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড (দেবী নন্দাকৃত অনুবাদ) মুখ বন্ধঃ—

'সৃষ্টি স্থিতি লয় হেতু
ব্রহ্ম ধাম গতি সেতু
ও গুণাতীত গুণের আধার
স্থূল সূক্ষ্ম পরাৎপর   বায়ুমনের অগোচর
জ্ঞানগম্য জগতের সার"
অপর স্থলে—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ করি উপশম
সুগন্ধ শীতল বায়ু বহে মনোরম"

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড (ব্রজসুন্দর কৃত অনুবাদ)

ত্রিকূট ভূধর   অতি মনোহর
তাহার শিখর   এক (প্রথর) ?
লঙ্ঘিছে গগন   পাদপ শোভন

যেন মহাঘন লোচন হর।
শিখরে শোভিত রাবণ পালিত
অতি সুললিত লঙ্কা নগর
যেন রুচিকর নীরব পাণ্ডর
নগর সুন্দর সৌধ বিস্তর।
রজত-রচিত কাঞ্চন খচিত
রত্ন বিরচিত সকল দ্বার
করিলে দর্শন বিমোহন মন
তখন নয়ন অধীন তার"
"বিশিখ পরিঘ পট্টিশ গদা
প্রহারে কঠিন কুঠার তদা
শাল তাল শৈল তমাল বৃক্ষ
সমরে প্রহারে বানর ঋক্ষ"

মহাভারত বন পর্ব্ব (দ্বিজ মহীনাথ অনুবাদিত)

বৈশম্পানে কয় শুন জন্মেজয়
যুধিষ্ঠির নর পতি
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে চলিলেক রঙ্গে
পার্শ্বে যাজ্ঞসেনী সতী"

এই পর্ব্বে বর্ত্তমান বংশীয় কুচবিহার নৃপতিগণের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব (দ্বিজ রঘুরাম কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

"সঞ্জয় বদতি আজি হল সন্ধ্যাকাল
পাণ্ডবের কথা অতি বিলম্ব বিশাল"
"আমার বচনে আজি রণে মহাশয়
ভীষ্মকে বধিয়া প্রেয শমন নিলয়"

মহাভারত কর্ণপর্ব্ব—

"শুন সর্ব্বজন কর্ণ পর্ব্ব সমাপন
জয়তি ভূপতি শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ—
বসুধা জলধি বৈশ্বানর শশী
শাকে (শকে ?) নাকেশ্বর দিবাকর বারে যশী
সীতারাম দ্বিজের তনয় নয় শীল—
দ্বিজ লক্ষীরাম কর্ণপর্ব্ব বিরচিল"
"চিরকাল গেল মোর যাহার চিন্তায়
সে কর্ণক যুদ্ধে ক্ষয় কর কি উপায়"

ধর্ম্ম পুরাণ—(শ্রীরাম নন্দন কৃত)

হরেন্দ্র নরেন্দ্র চন্দ্র গুণ পারাবার
করুণ শিখর (শিখরি ? সুতা কল্যাণ তাঁহার।"

বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে, নানা স্থান হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া গুণগ্রাহী মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের আশ্রয়ে বিদ্যা চর্চ্চার সুবিধা লাভ করিতেন।

"মহাদেব কুলজাত মহীপতি সুবিখ্যাত
কমতা নায়ক মহামতি
শ্রীশ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র ধরণীত ধরণীন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র যাঁর যশ খ্যাতি।
কবিতা কুমুদ রবি নানা স্থান জাত কবি
নিকরের নিতান্ত আশ্রয়।
"তার কৃপ নিদেশনে পুরাণের পদ ভণে
কবি বৈদ্যনাথের তনয়।"
"নৃপতির নিদেশনে চতুর্দ্দশাক্ষরে
পদ বিরচিল শ্রীমাধব দ্বিজবরে"

মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের আদেশে শিবপুরাণ অনুবাদিত হয়।

"পালিব প্রভুর আজ্ঞা প্রসাদে তাহার" ইত্যাদি ইহাতে দৃষ্ট হয়।

অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। উদ্ধৃত অংশ বিশেষ যত্নের সহিত বাছিয়া লওয়া হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখকের সেরূপ বাছিয়া লইবার কিম্বা সমস্ত পুঁথি পরীক্ষা করিবার উপযোগিতা বা অবকাশ ছিল না। যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতেই পাঠকের প্রতীতি জন্মিবে যে, কুচবিহার লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত এমন অনেক পুঁথি আছে, যাহা যত্নের সহিত রক্ষিত ও মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। আশা করি, কুচবিহারের উদারচরিত্র, নানাবিষয়ে ব্যয়শীল মহারাজ সার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর এবং তাঁহার সুযোগ্য দেও-

মান রায় কালী দাস দত্ত বাহাদুরের দৃষ্টি এই গ্রন্থগুলির দিকে পতিত হইবে এবং এগুলি ক্রমে ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাঁহারা তাহার সমুচিত বন্দোবস্ত করিবেন। আর প্রাচীন সাহিত্যান্বেষী বঙ্গীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি উক্ত বঙ্গের দিকে পতিত হইলে অনেক নূতন হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবে, আশা করা যায়।

কুচবিহার লাইব্রেরীতে উপেক্ষিত অবস্থায় এবং অনেকস্থলে লিপিকরের দোষে বর্ণাশুদ্ধি দোষগ্রস্ত হইয়া যেরূপ হস্তলিখিত পুস্তক রহিয়াছে, অন্য স্থানে ধনীর প্রাসাদে এবং দরিদ্রের পর্ণশালায় তদ্রূপ অনেক পুস্তক থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। কবি সত্যই গাহিয়াছেন—

"Full many a gem of the purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air".

॥বশেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

চণ্ডীদাস। (১)

(জন্মবৃত্তান্ত।)

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সংসার-প্রবাহ প্রবহমান, কোথাও সে ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, আবার কোথাও বা বিশাল হইতে বিশালতর। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্র সমূহ মন্থন করিয়াও এমন কোনও ধর্ম্ম আবিষ্কার করা যাইবে না, যাহা হিন্দুধর্ম্মকে পদানত করিয়া স্বগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিতে পারিবে। কপোলকল্পিত যত কেন নব মতের অভ্যুদয় হউক না, হিন্দুধর্ম্মের সহিত তুলনা করিলে তাহার সত্তাই অনুভব করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হিন্দুধর্ম্মের উপর দিয়া যত বাধা বিঘ্ন বিপত্তি বহিয়া গিয়াছে, তদ্রূপ আর কোন ধর্ম্মের উপর দিয়া বহিলে এতদিন সে ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইত। হিন্দুধর্ম্মকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে,—নিকৃষ্ট প্রতীয়মান করিতে কত মহাত্মা যে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছেন, ফল তাহার কি হইয়াছে? যখন বৌদ্ধদিগের প্রবল প্রতাপে ভারতবর্ষ প্রকম্পিত, যখন ধর্ম্মবীর বুদ্ধ 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম-ধ্বজা উড়াইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শিষ্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যখন কান্যকুব্জ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বুদ্ধের সু-উচ্চ পতাকা মূলে আত্মসমর্পণ করিতে একান্ত উৎকণ্ঠিত, তখন কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের জ্বলন্ত মহিমাচ্ছটা প্রদর্শন করতঃ বৌদ্ধশিষ্যমণ্ডলীকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অদ্যাপিও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিলেও, যে ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমে আজ আমরা কয়জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে দেখিতে পাই? পূর্ণচন্দ্র উদ্ভাসিত গগনপটে কি খদ্যোতের দ্যুতি প্রকাশ পায়? হিন্দুধর্ম্ম—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণী।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইল, হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম জগতে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকোষ্ঠে অগ্রসর হইতে

লাগিল। অবশেষে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন,—যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গলায় হিন্দুরাজত্বের লোপ হয়। এই সময় পর্য্যন্ত হিন্দুনরপতি, হিন্দুসেনাপতি, হিন্দুমন্ত্রী, হিন্দু যোদ্ধা প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন, তৎসমুদয়ই হিন্দু দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত, হিন্দুর সমস্ত আশাই হিন্দুর দ্বারা পূরণ হইত। কিন্তু যেমনি দাসপতি বখ্‌তিয়ার বঙ্গে আসিয়া গ্রীবা উত্তোলন করিলেন,অমনি হিন্দুগণ শাস্ত্রদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বঙ্গে যবনাধিকার শাস্ত্রসম্মত হিন্দু নরপতির পলায়ন স্বতঃসিদ্ধ। এই সময় হইতে বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর মুসলমানগণ যত অত্যাচার করিয়াছে, বৈষ্ণবগণ যদি তাহা ধীরতার সহিত উপেক্ষা না করিত, তবে নিশ্চয়ই বঙ্গ-সাহিত্য মুকুলেই শুষ্ক হইয়া যাইত।

বঙ্গ সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় কাব্যেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রথমাবস্থা বলিতে দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা বুঝায় না। চসারের কবিত্ব সৌরভে যখন ইংলণ্ড পুলকিত, তাহার পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের ক্ষুদ্র পল্লী মাণিকচাঁদ, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতায় মুখরিত। যাঁহারা বঙ্গ ভাষাকে নবীন সাহিত্য বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

নিবিড় কাননাভ্যন্তরে যেমন মনাকর্ষণের একমাত্র উপাদান—পুষ্প, বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলেই যেমন তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মধুরতায় মুগ্ধ, মানব সমাজের উপর কবিতারও তেমনি কার্য্যকরী মনোগ্ধকারিণী ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু পুষ্প যেমন দুইদিন পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, কবিতার তেমন শৈশব, কিশোর, বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হয় না; উহা চির নবীনা, চিরসৌন্দর্য্যে টলটলায়মানা। মানব সমাজকে বিমোহিত ও বিমুগ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ—এই কবিতাসুন্দরী। যে সমাজের এই কবিতা-গৌরব করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, সে সমাজের ন্যায় মন্দভাগ্য আর কাহারও নাই। যে কয়জন মহাত্মা এইরূপে বঙ্গীয় সমাজকে সৌভাগ্যশালী, গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজন গীতিকাব্যকার বৈষ্ণব কবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,তাঁহারাই আমাদের বরণীয়, স্মরণীয় ও পূজনীয়। আমাদের অহঙ্কার করিবার আর কিছুই নাই, আছে কেবল কয়েকজন বৈষ্ণব-গীতিকাব্যকার। কেবল তাঁহাদের জন্যই আজ আমরা অন্যান্য প্রদেশীয়দিগের ব্যঙ্গোক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি। এই গীতি-কাব্য-কারদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদেরই একজন আজ আমার আলোচ্য।

বীরভূমির বড় সৌভাগ্য যে, সে কতকগুলি কবির জননী হইতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রধান গৌরব, প্রেমবিহ্বলা উন্মাদ চণ্ডীদাসকে বক্ষে ধারণ করিয়াছে বলিয়া। যে স্বভাবকবির সুমধুর সঙ্গীত ধারা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে, তিনি বীরভূম জেলার ক্ষুদ্র পল্লী নান্নুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামের এক প্রান্তে বসিয়া প্রেমবিহ্বলা

চণ্ডী বঙ্গবাসীকে প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়া হৃদয়ে যে প্রেমের উন্মাদকারী উচ্ছ্বাস জাগাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা এজগতে কোথায়?

সিউড়ী বীরভূমের প্রায় পঁচিশ মাইল পূর্ব্ব দিকে নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। নান্নুর সাকুল্লীপুর থানার অন্তর্গত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অহম্মদপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় কুড়ি মাইল পূর্ব্বাংশে। চণ্ডীদাস যদি নান্নুরে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে কয়জন সে গ্রামের নাম জানিত? তাঁহাকে লইয়াই নান্নুরের গৌরব। নান্নুরের পশ্চিমদিকস্থ এক ক্ষেত্রে হলাকর্ষণ কালে একটী পুরাতন চুল্লী পাওয়া গিয়াছিল। ইহার দ্বারা অনুমিত হয়, এক কালে ঐ স্থানে লোকের বসতি ছিল, কালের কঠোর ধ্বংস নীতির প্রভাবে এখন তাহা জঙ্গল প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সময়ে নান্নুরের যে অংশে লোকের বসতি আছে, পূর্ব্ব কালে যে অংশে নিবিড় জঙ্গল, হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস নান্নুরের বিশালাক্ষী দেবীর পুরোহিত ছিলেন, মন্দিরটী এখনো বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সুখ খ্যাতি জাগাইয়া দিতেছে। মন্দিরের সম্মুখে ও দক্ষিণে অন্য কতকগুলি শিবমন্দির আছে, সে সকল মন্দির কত দিনের পুরাতন, তাহা সহজে নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে দেখিয়া বোধ হয় যে, তিন শত বৎসরের কম নহে। বিশালাক্ষীর মন্দির সম্মুখস্থ শিব মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে আরো অনেকগুলি শিবমন্দির আছে ৮ তৎপশ্চাৎ একটী উচ্চ ভূমি—ইহা একটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। অনেকে বলেন, উহাই চণ্ডীদাসের আবাস বাটী। মধ্যে মধ্যে ঐ স্থান হইতে পুরাতন মোহর প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুনিতে পাইলাম ও নান্নুরে প্রকাশ যে, ঐ ভিটা খনন কালে একটী নর-কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল, তাহা আধুনিক খর্ব্বাকৃত মনুষ্যের কঙ্কাল নহে। প্রত্যক্ষ দর্শনকারীদিগের কথা এই যে, ঐ কঙ্কাল সপ্ত হস্ত পরিমিত মানব দেহের কঙ্কাল। আমাদের বিশ্বাস, ঐ স্তূপ খনন করিলে নানা অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এখন চণ্ডীদাসের জন্মকাল নির্ণয় করা যাউক। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণ দাস, নরহরি দাস, বৈষ্ণব দাস, ভক্তমাল-প্রণেতা অনেকানেক পুরাতন ও আধুনিক কবিগণের গ্রন্থে চণ্ডীদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের আর একটী কারণ এই যে, শ্রীচৈতন্যের পর যত বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় হইয়াছে, সকলেই নিজ নিজ গ্রন্থে ও পদাবলীতে অধিক বা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের একটী পদেও মহাপ্রভুর নাম নাই। ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্য প্রভু জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস জন্মিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার একটী পদ এইরূপ,—

> "বিধুর নিকটে নেত্র, পক্ষ পঞ্চ বাণ।
> নবহুঁ নবহুঁ রস, ইহ পরিমাণ॥
> পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নির্জ্জা।
> চণ্ডীদাস রস কৌতুক কির্জ্জা॥

বিধু নেত্র, পক্ষ, পঞ্চবাণে ১৩২৫ শক

হয়, ইহা ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দ। যদি ১৩২৫ শকে তিনি এই পদটী রচনা করিয়া থাকেন, তবে ইহার পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাই আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ বিদ্যাপতি, কবিত্ব-সৌরভে বিমোহিত করিয়া পঞ্চগৌড়েশ্বরের নিকট হইতে ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৩ শকে) বিসপী গ্রাম প্রাপ্ত হন। * এই সময়ে চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার কবিতা-উপহার আদান প্রদান হইত, তাহা যথা স্থানে বিবৃত করিব। এই পদটী যদি চণ্ডীদাস বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালেও লিখিয়া থাকেন, তবে ১৩০৫ শকে তাঁহার জন্ম ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'কবি-চরিতে' উল্লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক, সুতরাং ১৩০৫ শকে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠে তাঁহার জনক জননীর নাম জানা যায় না। ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের 'সোমপ্রকাশে' এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন, 'চণ্ডী দাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহাঁর পিতার নাম দুর্গা নাথ বাগছী. ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁর রচিত গ্রন্থের নাম গীত চিন্তামণি।' লেখকের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। চণ্ডীদাস যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিঃসংশয় রূপে প্রমাণ করা যাইবে। আমরা তাঁহার নিম্নলিখিত ভণিতাযুক্ত বাদ পদ পাইয়াছি,—

(১) চণ্ডীদাস কয়;
(২) কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস;
(৩) বড়ু (ব্রাহ্মণ কুমার) চণ্ডীদাস কহে।
(৪) কহে রতু চণ্ডীদাস।
(৫) রামু চণ্ডীদাস ভণে।
(৬) কবি চণ্ডীদাস কহে। ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের নব প্রকাশিত পদাবলীর এক স্থলে আমরা 'দাস চণ্ডীদাস' ভণিতা পাইয়াছি;—

অদভূত রীত, ইহার চরিত
দাস চণ্ডীদাস জার। *

বলা বাহুল্য এ 'দাস' জাতিবাচক নহে, হীনত্বক প্রকাশক। আর একস্থলে 'দাসী'ও ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩৩৯ শকের পূর্ব্বে যে চণ্ডীদাস জন্মিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাঁহার পিতার নাম দুর্গানাথ বাগছী ছিল কি না, তাহা বিশ্বাস করিবার কোন উপায় নাই। তবে তাঁহার নকুল নামে এক সহোদর ছিল। চণ্ডীদাস স্বীয় পদাবলীতে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রজকিনীর প্রেম-পাথারে চণ্ডীদাস নিমগ্ন হইলে, যখন তাঁহাকে জাতিতে আটক করিল, তখন নকুল তাঁহাকে রজকিনীর প্রেম ত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন।

আমি ১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে একস্থানে পাওয়া যায়, 'ভবানী চরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে ভৈরবী নাম্নী এক

পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিব সিংহ ভূপ
কৃপা করি লউ নিজ পাশ।
বিসপি গ্রাম, দান করিল মুঝে
রহতহি রাজ সন্নিধান॥ বিদ্যাপতি।

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

কামিনীর গর্ব্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়।’ বীরভূমিস্থ আমার জনৈক বন্ধুও লিখিয়াছেন, ‘নান্নুরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবাণীচরণ রায় ও জননীর নাম ভৈরবী সুন্দরী ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম ১৩০৮—১৫ শকের মধ্যে হইয়াছিল।” পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির সহিত বন্ধুবরের কথা ঐক্য হওয়ায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের জনক জননীর নাম ভবানী চরণ ও ভৈরবী সুন্দরীই ছিল। পাঠকগণ একথা কতকদূর বিশ্বাস করিবেন, তাহা জানি না। সাল দেখিয়া এই পুঁথি খানি চণ্ডীদাসের জীবিত কালেই লিখিত হইয়াছে জানা যায়।

চণ্ডীদাসের পিতা বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস নিজে বাশুলী দেবীর পুরোহিত নিযুক্ত হন ;—

নান্নুরের মাঠে, পত্রের কুটির
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি॥

নান্নুরের মাঠে নির্জ্জন পত্র কুটীরে থাকিয়া চণ্ডীদাস ভজন সাধন করিতেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বহু স্থানে বাশুলী দেবীর নাম পাওয়া যায়।

কহে রতু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছট্ ফট্ করে প্রাণ বঁধু নাহি ঘরে॥

বাশুলীর বরে চণ্ডীদাস পদাবলী লিখিতে আরম্ভ করেন। এই বাশুলীর বরদান প্রসঙ্গ এ স্থানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ বাশুলী। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী শালতোড়া গ্রামে নিত্যা নাম্নী বনদেবীর বাশুলী নাম্নী এক ডাকিনী সহচরী ছিল। বনদেবীর ঝুমুর গানের প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। একদা তিনি ঝুমুর শ্রবণে মুগ্ধা হইয়া সহচরীর প্রতি অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, যাহাতে সহজ ভজন দ্বারা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার উপায় বিধান কর। বাশুলী, দেবী আজ্ঞা প্রাপ্তে নান্নুর গ্রামে যাইয়া, নির্জ্জন গৃহে চণ্ডীদাসকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে ‘চাপড়’ মারেন। সেই আঘাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাশুলী তাঁহাকে গুরুর আশ্রয়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলা সংগীতে প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন।

শালতোড়া গ্রাম, অতি পীঠস্থান,
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে, নিদ ভাঙ্গিল
পিরীতি হইল সুরু॥

* *

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে॥

বাশুলী বলিলেন, বিশেষ সতর্কতার

সহিত মধুর রসের উপাসনা কর; কখন দক্ষিণ দেশে যাইও না, গেলে বিপদে পড়িবে। ব্রজ ভাবানুসারে ভজনই শ্রেষ্ঠ, তুমি সেইরূপ ভজন কর, রামিনী নাম্নী রজকিনী তোমারি হইবে।

বস্তুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যুজিতে, সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে,না যাবে কদাচিত, যাইলে প্রমাদ হবে।
এইকথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে, আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি পরকিয়া, যাহারে কহিল্যা, সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি, রামিনী নাম যাহার॥

বাশুলীর উপদেশ শ্রবণে চণ্ডীদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, রজকিনীকে আমার করিলে আমি কোন্ 'বরণ' (বর্ণ) হইবে ও কোন্ বৃন্দাবনে যাইব? সে বৃন্দাবন কোথায় এবং তথাকার কিশোর কিশোরীই বা কোথায়?"

'প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন্ বরণ হব।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয় সকল আনন্দ ময়।
কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥
কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে কিশোরা কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরীসাথে॥
কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম ভ্রমরা পশিছে তায়॥
গোপতের পথ না হয় বেকত রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ যাহার হয়েছে সেই সে মরম জানে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম ছিঃ নীচ সহ ব্যবহার॥'

ছিঃ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নীচের সহিত প্রবর্ত্ত হইব? বাশুলী উত্তর করিলেন;—

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥
প্রথম দুয়ারে (১) মদের গতি।
দ্বিতীয়দুয়ারে (২) আসক স্থিতি।
তৃতীয় দুয়ারে (৩) কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কুই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আখরে সাধিতে তিনে (৪)।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে (৫) বাণকে (৬) ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে (৭) সামান্যা রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আখরে (৮) সামান্যা রস।
তাহাতে কিশোর কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস সমুদ্র বেদান্ত পার॥

এই কথা শুনিয়া চণ্ডীদাস মূর্চ্ছিত হইলে বাশুলী অন্তর্ধান হইলেন।

চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা॥

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর চণ্ডীদাসের মন অতি চঞ্চল হইল। উত্তম কুলেতে জন্মিয়া নীচের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, কে-ই বা তাঁহাকে সাধন শিক্ষা দিবে, এইরূপ ভাবনায় তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। এমন সময় নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী তাঁহাকে রামীর সহিত 'রাধাকৃষ্ণ' মহামন্ত্র দান করিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমের কথা আমরা পরে বলিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের পিতা বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন। দেবীর প্রসাদে পুত্র দীর্ঘায়ু ও খ্যাতি সম্পন্ন হইবে, এই ভাবিয়া তিনি বোধ হয় পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখেন। চণ্ডীদাসও নামের

সার্থকতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাংশে চণ্ডীরই দাস ছিলেন। প্রত্যহ স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া সভক্তি চিত্তে বিশ্বপালনী চণ্ডীর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেন। এখনও এই দেবী-মন্দির বিদ্যমান আছে, কেবল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বাশুলীতে পরিণত হইয়াছে। দেবী প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজা, মহাদেবের বক্ষোপরি সংস্থাপিতা। পূর্ব্বে তান্ত্রিক মতে তাঁহার পূজা ভোগাদি সম্পন্ন হইত, কিন্তু এখন মৎস্য ও ছাগশিশু ভিন্ন আর কোন তান্ত্রিক ভোগাদির আয়োজন হয় না। চণ্ডীদাসের স্মৃতি রক্ষার্থে এখন বেলাই গ্রামে চণ্ডীর মেলা হইয়া থাকে।

চণ্ডীদাস অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন, কাজেই বিদ্যাভ্যাস করিবার তাদৃশ সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। বাল্যকাল হইতেই সংগীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। যেখানে গানের নাম শুনিতেন, সেইখানেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গমন করিতেন।

'সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাহস করে॥
আদি চণ্ডীদাস চারি সুবুলান।
দাউ উঠাইল যেমন মান॥

ইহার দ্বারা জানা যায় যে, চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ লীলার আদি প্রণেতা। তিনি নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন, তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে পশু পক্ষীও স্তম্ভিত হইত।

এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত নিশান বাজই রসিক রায়।
তবু না ভাঙ্গিল মান অভিমান চণ্ডীদাস পুনঃ গায়॥

বাল্যকালে চণ্ডীদাসের আর একটী দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। তামাক তাঁহার অতি প্রিয় ছিল এবং এইজন্য তিনি গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে 'চণ্ডে মাতাল' উপাধি পাইয়াছিলেন।

পিতৃ মাতৃ বিয়োগে চণ্ডীদাস ঘোর দুঃখে পতিত হন, আহারের কোন সংস্থানই নাই। যে সুশীতল সুমধুর বায়ু হিল্লোল তিনি মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদ ধারা বলিয়া মনে করিতেন, তাহাই এখন তাঁহার নিকট, তীব্র অভিশাপের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে এই ভাবে থাকিতে হইল না, সহৃদয় গ্রামবাসী ভাবী কবির মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক গলদেশে যজ্ঞোপবীত দিয়া তাঁহাকে বিশালাক্ষ্মীর পূজক করিয়াছিলেন। চণ্ডীর অন্নকষ্ট নিবারণ হইল।

চণ্ডীদাস নান্নুরের নির্জ্জন মাঠে পর্ণকুটীরে থাকিয়া ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একদিন তাঁহার জীবনস্রোত গতি অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইল। রামি (রামমণি) নাম্নী এক দুঃখিনী রজকিনীর কন্যা নিতান্ত অসহায় হইয়া চারিটী অন্নের আশায় বিশালাক্ষ্মীর মন্দিরে চণ্ডীদাসের নিকট উপনীত হইল। রামমণির বয়স অল্প, রূপও না ছিল তাহা নহে, বিশেষতঃ তাহার কার্য্যে একটু পবিত্রতার গন্ধ পাইয়া গ্রামবাসীগণ তাহাকে মন্দির মার্জ্জন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তথায় থাকিয়া দেবীর প্রসাদান্ন খাইয়া রামমণি দিন দিন 'শশী কলার' ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মন্দিরের কার্য্যে সে বিশেষ নিপুণতা দেখাইতে লাগিল, কাজেই সকলে তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল।

'অল্প বয়সে, দুঃখিনী রামিনী
সেবাতে নিযুক্ত হল।
চণ্ডীদাস কহে, শশীকলার ন্যায়
ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

রামিনী কামিনী, কাজেতে নিপুণা
সকলের প্রিয়তমা।'

রামমণি এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং চণ্ডীদাসেরও 'পিরীতি হইল সুরু।'

রামমণির নাম লইয়া একটু মতভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ তারা, কেহ রামতারা প্রভৃতি আখ্যায় তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্রের সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে জীবন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহার নাম 'রামতারা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নরহরি তাহাকে 'তারা ধুবিনী' নামে উল্লেখ করিয়াছেন,—

'শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবি কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবিনী দরশে কুরিবে বিবিধ মতে।'

আমরা তারা ধুবিনী বা রামতারা নাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। যদি ঐ নামই প্রকৃত হইত, তবে চণ্ডীদাস তাঁহার কোন না কোন পদে তাহার উল্লেখ করিতেন। যাহার প্রেমে বিভোর হইয়া কবি, কুল মান সব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমার প্রকৃত নাম লিখিতে যে কবি বিস্মৃত হইবেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

নান্নুরে রামী যে বাড়ীতে বাস করিত, তাহার ভিটা এখনো আছে। নাই কেবল রামি, তথায় এখন আর একজন আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে।

'বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে যাঁহারা বরণ্য হইয়াছেন, চণ্ডীদাস তাঁহাদের একতম;—

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামনন্দশ্চ নন্দদঃ।
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্রোহন্যঃ সিদ্ধ কৃষ্ণ কবীনকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্ণাস্তে সিদ্ধ রূপিনঃ।'

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (২)

৪। তুর্ক—ইহা প্রাচীন পারসীক দেশেরই পশ্চিমাংশ। ইহা অনার্য্য দেশ।

৫। আরব—প্রাচীন বনায়ু দেশ। ইহা পুরাতন কালেও অনার্য্য দেশ ছিল। এইদেশ উৎকৃষ্ট ঘোটকের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ;

"বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজ্য বাহ্লিকা হয়াঃ"
অমরকোষ।

৬। তিব্বৎ—প্রাচীন দেশের অন্তর্গত প্রদেশ। এই প্রদেশে মানস সরোবর নামক চির প্রসিদ্ধ দেবখাত বিরাজমান। ইহার তীরে সপ্তর্ষিগণ তপস্যা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কালে উহা অরণ্যময় এবং অনার্য্য-গণের বাসভূমি ছিল। উহার নানা স্থানে মুনি ঋষিগণের তপশ্চরণ যোগ্য বহুবিধ আশ্রম ছিল। ইদানীন্তন কালেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসি-গণ এই সকল স্থানে তপস্যা করিয়া থাকেন।

৭। চীন—ইহা অতি পুরাতন কালেও চীন নামে বিখ্যাত। এই দেশ শিল্পকর্ম্মের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। চীন দেশ জাত দ্রব্যজাত বিশেষতঃ, কৌষেয় বস্ত্র বাণিজ্য যোগে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে নীত ও ব্যবহৃত হইত। উহা প্রাচীন কাল হইতেই অনার্য্য দেশ।

৮। মহাচীন—পূর্ব্বকালে ইহা বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বৎ ও চীন সম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ লইয়া সুবিস্তৃত

ছিল। উহা অনার্য্য-গণের চিরবাসভূমি এই মহাচীনের কোন স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠ বহুকাল তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

৯। তুর্কস্থান-তুরান্ বা তাতার—এই দেশের কতিপয় প্রদেশ বাহ্লিক নামে খ্যাত ছিল। বাহ্লিকের রাজধানীর নামও বাহ্লিক। বর্ত্তমান—বাল্খ। প্রাচীন কালে এইদেশ উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।*

অথর্ব্ববেদের সময়ে বাহ্লিক, গান্ধার, অঙ্গ এবং মগধদেশ অনার্য্য-নিবাস এবং হিন্দুদিগের নিকট অতিশয় ঘৃণিত ছিল, † কিন্তু রামায়ণের সময়ে গান্ধার, অঙ্গ ও মগধ দেশ আর্য্যদিগের নিবাস ভূমি হইয়াছিল, কেবল বাহ্লিক দেশই অনার্য্য-গণের বসতি জন্য অতিশয় ঘৃণিত হয়। মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে যে,“বাহ্লীকা নামতে দেশ্য ন তত্র দিবসং বসেৎ”— বাহ্লীক নামক দেশে এক দিনও বাস করিবে না। অপিচ,—অনার্য্য ও অসভ্য পহ্লব জাতির নিবাসভূমি পহ্লব প্রদেশও এই তুর্কস্থানের অন্তর্গত। প্রসিদ্ধ পহ্লবী (Pehlvi) এই জাতির ভাষা ছিল; ঐ ভাষা এইক্ষণ পুষ্‌ত নামে খ্যাত। মহাত্মা গ্রিফিথ্ সাহেব বলেন যে, অসভ্য দরদ্ জাতির বাসভূমি—বর্ত্তমান দর্দ্দিস্থান।

১০। সাইবিরিয়া—ইহার প্রাচীন নাম উত্তর কুরুবর্ষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে,—

“এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মদ্রা ইতি বৈরাজ্যায়তেঽভিষিচ্যন্তে”—হিমালয়ের উত্তরে উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্র নামে যে সকল দেশ আছে, ঐ সমস্ত দেশ শাসনার্থ বৈরাজ্যকে অভিষিক্ত করা হইল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সুগ্রীব সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ বলিতেছে—“কুরুংস্তান্ সমতিক্রম্য উত্তরে পয়সাং নিধিঃ”—কুরুদেশ অতিক্রম করিয়াই উত্তরে সমুদ্র। “ন কথঞ্চ ন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণবঃ।”উত্তর কুরু দেশের উত্তরে তোমাদের কোনরূপেই যাওয়া উচিত নহে। ভূগোল-শাস্ত্রবিৎ টলিমিও বলিয়াছেন যে, হিমালয়ের উত্তর দেশে উত্তর কুরু নামক জনপদ এবং উহাতে কুরু (Morocorra) নামক জাতির বাস। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে রাজা ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, “উত্তরা কুরবোঽ বিক্ষং স্তদ্ভয়াজ্জন্ম পাদপান্” —তাঁহার ভয়ে উত্তর কুরুদেশবাসিগণ জন্মস্থানের বৃক্ষাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

এতদ্দ্বারা যে বর্ত্তমান সাইবিরিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ প্রাচীন উত্তর কুরুবর্ষ, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এই উত্তর কুরুবর্ষের উত্তরেই উত্তর মহাসাগর, সুতরাং তাহা লোকের অগম্য, ইহাও উক্ত হইয়াছে। পুরাণে এই উত্তর কুরুবর্ষ ঋষিক দেশ নামেও অভিহিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অষ্টম অধ্যায়ে কথিত আছে যে,—‘উত্তর কুরুবর্ষে বিরাজ নামক জাতি বাস করে”।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়গণ ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত ও পলায়িত হইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণবর্ত্তী নানা দেশে এবং হিমালয়ের উত্তর দিকে অবস্থিত সমস্ত ভূভাগে যাইয়া বসতি করিয়াছিল। স্বজাতি হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় ইহারা এবং ইহা-

---

* Vide Amara-kosha and Griffith's Ramayana Vol. IV. p. 208.

† Vide অথর্ব্ববেদ ৫।২২

দের সন্তানবর্গ, সামান্যতঃ, ম্লেচ্ছ ও যবন নামে অভিহিত হইয়া ক্রমে শক, তুরুষ্ক,দরদ, পহ্লব, বর্ব্বর, হূন, কিরাত, হারীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অসভ্য ও অনার্য্য জাতীয় নামে পরিচিত হয় *। ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ ছিল। রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে ইহাদের আকার প্রকার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "হেমকিঞ্জল্ক সন্নিভৈঃ। তীক্ষ্ণাসি পট্টিশ ধরৈর্হেম বর্ণাম্বরবৃতেঃ",। ইহাদের সকলেরই বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, পরিধানে পীতবসন এবং হস্তে তীক্ষ্ণ অসি এবং পট্টিশ নামক অস্ত্র। কিন্তু সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ দেশবাসিগণ বাসস্থান ভেদে গৌর, শ্যাম ও কৃষ্ণাদি বিবিধ প্রকার বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল জাতীয় লোকের কাহার মস্তক অর্দ্ধ-মুণ্ডিত, কাহার মস্তক সর্ব্ব মুণ্ডিত, কাহার আবার চিকুর দীর্ঘ এবং চূড়ায় নিবদ্ধ। ইহাদের প্রায় সকলের মুখেই দীর্ঘ শ্মশ্রু ইত্যাদি। †

এইরূপ উল্লিখিত জাতিসমূহ সম্বন্ধে বিশেষতঃ, হিমালয়ের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী দেশসমূহ নিবাসী জাতি নিচয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্‌গণের কিরূপ মত, তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, শকজাতির আবাসভূমি প্রধানতঃ তুর্ক (পৌরাণিক তুরস্ক) দেশস্থিত শক দ্বীপ। এই জাতি সামান্যতঃ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিত। ‡ ইতিহাসবেত্তা স্ত্রাবো বলেন যে, কাস্পীয়ান সাগরের পূর্ব্বদিকস্থিত সমস্ত জাতিই শক নামে অভিহিত। তাহারা বক্ত্রিয়া (Bactria) এবং অত্যুৎকৃষ্ট আর্ম্মাণি (Armenia) প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের জাতীয় নামানুসারে ঐ আর্ম্মাণি দেশ শকসেনী নামে কথিত হইয়াছিল। এই শকসেনী বাসিগণই ইয়োরোপীয় শাকসন্ (Saxon) জাতির পূর্ব্ব পুরুষ *। এই শাকসনদিগের যুদ্ধকারী দেবের ছয় মস্তক ছিল।†

হিন্দুদিগেরও দেব সেনানী কার্ত্তিকেয়ের ছয় মস্তক, তজ্জন্য তাঁহার অন্য একটী নাম ষড়ানন। যশল্মীরের ইতিহাসে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শকদ্বীপ নিবাসী তুরুস্কেরা যদুবংশসম্ভূত। ‡

শকদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সিন্ধুনদ উজাইয়া গিয়া পারোপমিসান্ দিয়া জেহুণ নদী ও শক দ্বীপে উপস্থিত হওয়া যায়। ¶

কথিত আছে যে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে দরায়ুস হিস্তাস্‌পিসের রাজত্বকালে শকেরা স্কাণ্ডিনেভিয়া (বর্ত্তমান সুইডেন ও নরওয়ে) দেশ অধিকার করিয়াছিল। ইহারা বুধদেবের উপাসক ছিল এবং আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করিত। পরে ইহারা মহাদেব, বুধ এবং উমা দেবীর উপাসক হইয়া

---

*Vide রামায়ণ, মহাভারত and বিষ্ণুপুরাণ।

† Ibid.

‡ Chagitai, Sakatai, the Saca-dwipa of the Puranas corrupted by the Greeks to Scythia, whose inhabitants worshipped the sun. Tod's Rajasthan, Vol. I.

* Strabo says, "All the tribes east of the Caspian are called Scythic."

"——Thus they have been seen to possess themselves of Bactria, and the best district of Armenia, called after them *Sacasenæ*. The *Sacasenæ* were the ancestors of the Saxons".

Turner's History of the Anglo-Saxons.
Vide also Tod's Rajasthan, Vol. I.

† The Saxon god of war has six heads.

Tod's Rajasthan, Vol. I.

‡ The Jessulmeer annals affirm that the whole Turushka race of Chagatai are of Jadu stock. Ibid.

¶ We must therefore voyage up the Indus, cross the Paropmisan, to the Jaxartes or Jipoon to Sakitai or Saca-dwipa. Ibid.

ছিল। ইহারা বসন্তকালে মহোৎসব সহকারে উমা দেবীর নিকট শূকর বলি প্রদান করিত *। ইহাদিগের মধ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। †

শকজাতি প্রবল প্রতাপ ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। শকেরা যেরূপ ইউরোপ খণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি আবার তাহারা ভারতেও আসিয়া বহুদেশ অধিকার করে, এমন কি, এক সময় তাহারা কাস্পীয়ান্ সাগর হইতে গঙ্গা নদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ‡ শকজাতির ন্যায় হূনজাতিও মহাবল পরাক্রান্ত। পুরাণোক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ুর যদু নামে একটী পুত্র ছিল, এই যদুর তৃতীয় পুত্র হ্যাচীন জাতির আদিপুরুষ। স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স বলেন যে, চীনেরা আপনাদিগকে হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন বলিত। ইহারা চন্দ্র-নন্দন ভগবান্ বুধের উপাসক ছিল। § হূনদিগের অনেকেই চীন দেশের উত্তর দিক্ হইতে তাড়িত হইয়া ইউরোপের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ দেশ সমূহে প্রস্থান করিয়াছিল; অবশিষ্ট লোকেরা প্রথমতঃ অক্ষু ও যক্ষর্ত্তী নামক নদীদ্বয়ের তীরে যাইয়া বাস করে, তথা হইতে কাস্পীয় সমুদ্র ও পারস্য (ইরান্) দেশের সীমান্ত প্রদেশ সমূহে গিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা আবার মেয়র উল্ নাহার প্রদেশে সিউ এবং মহাবল জীট্ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া ইউরোপ খণ্ডে চলিয়া যায়। এই সিউ এবং জীট জাতিই ইউরোপের প্রসিদ্ধ সিউবি এবং জীট্ জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কথিত হয়। *

ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত শকাদি সমস্ত জাতিই সামান্যতঃ তাতার বা তুরস্ক জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শকদিগের অধিকাংশই সূর্য্যোপাসক। শক ভিন্ন দরদ ও হূনাদি জাতি চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজার বংশ জাত † সুতরাং তাহাদের অধিকাংশই চন্দ্রোপাসক।

প্রাচীন কালে পূর্ব্বোক্ত তাতার জাতি আশিয়া খণ্ডের মালভূমি হইতে ভারতে ও আশিয়ার অপর সমস্ত দেশে এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা খণ্ডে যাইয়া বাস করিয়াছিল। হূন-প্রমুখ তাতার জাতীয় একদল ইউরোপের দক্ষিণস্থ গ্রীস দেশে

---

* Scandinavia was occupied by the Scythœ five hundred years before Christ. These Scythians worshipped Mercury (Boodha), Woden or Odin and believed themselves his progeny. The first (Thor, the thunderer, or god of war) is Hara, or Mahadeva, the destroyer; the second (Woden) is Boodha, the preserver, and the third (Freya) is Ooma, the creative power. The grand festival to Freya was in spring, then boars were offered to her by the Scandinavians.

Vide Tod's Rajasthan, Vol. I.

† Odin (Boodha) introduced the custom of consuming on the pyre;—as also the practice of the wife burning with her deceased lord. These manners were carried from Saca-dwipa, or Saca-Scythia.

Ibid.

‡ Pinkerton says "that a grand Scythic nation extended from the Caspian to the Ganges.

Tod's Rajasthan, Vol. I.

§ The Pauranic Ayu had a son, Yodu (pronounced Jadoo); from whose third son, Hyu, (Sir Wiliam Jones says—the Chinese assert their Hindu origin) came the first race of China. Ibid.

* When the Huns were chased from the north of China, the greater part retired into the southern countries adjoining Europe. The rest passed directly to the Oxus and Jaxartes, thence they spread to the Caspian and Persian frontiers. On Mawer ool-nehre (Transoxiana) they mixed with the Su, the Yuchi, or Getes, who were particularly powerful, and extended into Europe. One would be tempted to regard them as the ancestors of those getes who were known in Europe. Some bands of Su might equally pass into the north of Europe, known as the Suevi. Ibid.

† The Tatars all claim their descent from Ayu. Ibid.

উপনীত হইয়া কালক্রমে প্রাচীন এথেন্স ও স্পার্টা নগর সংস্থাপন করে। ঐ জাতীয় আর একদল ইতালী দেশে গমন করে এবং তথায় জগদ্বিখ্যাত রোম নগর নির্ম্মাণ করে।

একদল আবার জর্ম্মনির কানন মধ্যে আশ্রয় লইয়া উত্তরকালে রোম নগর ধ্বংস করিয়াছিল। ক্রমে দলে দলে তাতার জাতীয় লোক, আশিয়ার মধ্য ভাগ হইতে ইউরোপ খণ্ডে উপনীত হইয়া উপনিবেশ-সকল সংস্থাপন করে। ইহারাই ইউরোপ খণ্ডে সিম্ব্রিয়ান, কেল্ট, গল, গথ, হূন, এলান, সোয়েডিস্, ভুণ্ডাল, টিউটন, শ্লাবস্ ও ফ্রাঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ। * অধুনা ইউরোপীয় সমস্ত জাতিই উল্লিখিত জাতি সকল হইতে উৎপন্ন।

হূন জাতীয় একদল, পারসীক বা ইরান্ দেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল। ইহারা অগ্নিদেবের উপাসক। উত্তর কালে এই জাতি যবনবিতাড়িত হইয়া ভারতে আসিয়া গুজরাটে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাস করে। এইক্ষণ বোম্বাই নগরে এই জাতি পার্শি নামে খ্যাত। অপিচ, তাতার হইতে তক্ষক, জীট (জাঠ), কামারি, কাট্টি ও হূন জাতীয় লোকেরা ভারত আক্রমণ করিয়া তথায় রাজ্য শাসন করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তক্ষক জাতি ভারতে আসিয়া রাজত্ব করে। এই সময় ভারতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রকুলোদ্ভূত কোন রাজাই ছিল না। পুরাণশাস্ত্রে কথিত আছে যে,—এই সময় হইতেই ভারতে শূদ্র, তুরস্ক ও যবন জাতীয় লোকেরা প্রবল হইয়াছিল।¶

চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ু হইতে এল্‌খাঁ নবম ছিল। এল্‌খাঁর দুই পুত্র। প্রথমটীর নাম কৈয়ান্ এবং দ্বিতীয়টীর নাম নাগ। ইহাদের অধস্তন সন্তান সন্ততিই সমস্ত তাতার দেশে বাস করিত। প্রসিদ্ধ জঙ্গীস্ খাঁ আপনাকে কৈয়ানের বংশ জাত বলিত। এই নাগই সম্ভবতঃ পুরোণোল্লিখিত এবং তাতার জাতীয় কুলশাস্ত্রজ্ঞগণ কথিত তক্ষক বা নাগ জাতির আদি পুরুষ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাতারজাতির আদি পুরুষ আয়ু ও চীন জাতির আদিপুরুষ হ্য এবং এবং পুরাণোক্ত রাজা আয়ু কোন বিখ্যাত হিন্দু বংশের আদিপুরুষ ছিল। ইহারা সকলেই চন্দ্রবংশীয়; সুতরাং উল্লিখিত তিনটী জাতিই যে চন্দ্রবংশ সম্ভূত, ইহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। §

---

* "It was from Tartary those people came, who, under successive names of Cymbrians, Kelts, Gauls, possessed all the northern part of Europe. What were the Goths, Huns, Alans, Swedes, Vandals, Franks, Teutons and Slavs, but swarms of the same hive? The Swedes chronicles bring the Swedes from Cashgar, and the affinity between Saxon language and Kipchak is great; and the Keltick language still subsisting in Britany and Wales is a demonstration that inhabitants are descended from Tatar nations." (The translator of Abulgazi—the historian of the Tatars and the Moguls).
Tod's Rajasthan, Vol. I.

¶ From between the parallels of 30° and 50° of north latitude, 75° to 95° of east longitude, the highlands of Central Asia, alike removed from the fires of the equator and the cold of the Arctic circle, migrated the races which passed into Europe and within the Indus. The Takshacs, the Getes, the Camari, the Catti and the Huns passed into the plains of Hindustan. The sixth century is calculated for the Takshac from Sehesnagdes, and it is on this event and reign that the Puranas declare, that from this period "no prince of pure blood would be found but that the Sudra, the Turushka and the Yavan would prevail." Ibid.

§ Elkhan (the nineth from Ayu) had two sons: first, Kaian, and second Nagas; whose descendants peopled all Tatary. From Kaian, Jungeez Khan claimed des-

স্কাণ্ডিনেভীয়, শক, জর্ম্মণ, কেম্ব্রি, জাঠ, সুয়েভি ও রাজপুত জাতি নিচয়ের ধর্ম্মভাব, ব্যবহার ও কুসংস্কারগুলি প্রায় একরূপ ছিল। বুধ ও পৃথিবী, প্রাচীন জর্ম্মণ জাতির উপাস্য দেবতা। প্রাচীন জর্ম্মনেরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উপাসনার্থ অবগাহন করিত। তাহাদের গাত্রে অসংযত ও লম্বমান পরিচ্ছদ, মস্তকোপরি দীর্ঘ জটিল কেশ পাশ একটী গ্রন্থিতে আবদ্ধ থাকিত। ইহারা পণ ধরিয়া ক্রীড়া করিত, এবং পরাজিত হইলে বিজেতার দাসত্ব স্বীকার করিত ও বিজয়ীজন কর্ত্তৃক বিক্রীতও হইত।

স্কাণ্ডিনেভিয়া-বাসী সুয়েভিরা, আপ্‌সালা নগরীতে হর, বুধ ও উমাদেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করে। *

আমরা ভারত-বহির্ভূত দেশ সমূহের জাতি সকল সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারিলাম যে,—

১। প্রাচীনকালে ভারতের চন্দ্র ও সূর্য্য বংশীয় নৃপতিগণ, তাড়িত ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের (কুমারিকা খণ্ডের) বহির্ভূত দেশ-সমূহে যাইয়া বাস করিয়াছিল।

২। তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের সন্তানবর্গ, সাধারণতঃ যবন ও ম্লেচ্ছ নামে অভিহইয়া ক্রমে শক, তুরুষ্ক, দরদ, পহ্লব, হূন, বর্ব্বর, কিরাত ও হারীত প্রভৃতি অনার্য্য ও অসভ্য জাতীয় বিশেষ বিশেষ আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

৩। আসিয়ার মধ্যস্থিত মালভূমি হইতে উল্লিখিত জাতি সকল, আরব, তুর্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশে, ও ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার, নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া বাস করিয়াছিল; সুতরাং আরব প্রভৃতি দেশের এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বর্ত্তমান জাতি সকল পূর্ব্বোক্ত জাতি সমূহ হইতে উৎপন্ন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইউরোপীয় জাতি সমূহের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ, প্রাচীন আর্য্য জাতির পুরাতন বাসস্থান হইতে অর্থাৎ পারস্য রাজ্যের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী বেলুরতাগ্‌ ও মুস্‌তাগ্‌ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশ হইতে যে কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন দলে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেল্‌টিক্, আর্ম্মাণি, ও হেলেনিক্ জাতি এবং তাঁহাদিগের সন্তানগণই শ্লাবনীয়, লিথুনীয়, ও টিউটন্ জাতিরূপে সংগঠিত হইয়াছিল। গ্রীক্, রোমক, ইংরাজ, দিনেমার, ওলন্দাজ,

---

cent. Nagas was probably the founder of the Takshec, or Snake race of the Puranas and Tatar genealogists. Thus Ayu of the Tatar, Hyu of the Chinese, and Ayu of the Puranas evidently indicate the great Indu progenitor of the three races. Ibid.

* All these Indu-Scythic invaders held the religion of Boodha ; and hence the conformity of manners and mythology between the scandinavian or German tribes and the Rajputs, increased by comparing their martial poetry. Tuisto (Mercury) and Ertha (the earth) were the chief divinities of the early German tribes. The first act of a German on rising was ablution. "The loose flowing robe, the long and braided hair tied into a knot at the top of the head." Tacitus. Many other customs, personal habits, and superstitions of the Scythic, Cymbri, Juts, Catti, Suivi and Rajputs are nearly the same. The German staked his personal liberty, became a slave, and was sold as the property of the winner. The Suevi or Suc-ones, erected the celebrated temple of Upsala in which they placed the statues of Yhor, Woden, and Freya.

Tod's Rajasthan, Vol. I.

ফরাসী, জর্ম্মণ, স্পানিয়ার্ড ও পোর্টুগীজ প্রভৃতি জাতি, ঐ তিন প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত। এইরূপে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও আশিয়ার মধ্য প্রদেশ হইতে ভারতে এবং ইরান্ (পারস্য) দেশে যাইয়া উপনিবেশ সকল সংস্থাপন করেন ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা এইক্ষণ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত জাতি সম্বন্ধীয় বাক্যগুলির সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তির কোন বিরোধ নাই, তবে আর্য্য জাতির ভারতে আগমন সম্বন্ধীয় উক্তিটীর সহিত আপাততঃ আমাদিগের মতের বিরোধ হইলেও কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে বিরোধটীও তিরোহিত হইবে; কারণ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই বলিয়াছেন যে, আসিয়ার মধ্যপ্রদেশ হইতে আর্য্যগণ দলে দলে ইয়োরোপ খণ্ডে উপনীত হইয়া বাস করিলে, পরে ক্রমশঃ উক্ত মালভূমি হইতে আর্য্যগণ ভারতে ও ইরানদেশে যাইয়া উপনিবেশ সকল সংস্থাপন করেন। এই কথাটী আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত এবং উদ্ধৃত সবিস্তার বিবরণগুলি সহকারে দেশ,কাল ও পাত্রাদি সম্যক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত শক, হুন, জাঠ, ও কাটি প্রভৃতি জাতির ভারতাক্রমণ ও তথায় তাহাদিগের উপনিবেশ সকল সংস্থাপন দেখিয়া যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

অতএব প্রাচীনকালে আসিয়ার মধ্যস্থিত ভূভাগের অধিবাসিগণ আর্য্য ক্ষত্রবংশোদ্ভূত হইয়াও ভারত হইতে বিতাড়িত এবং জাতিভ্রষ্ট হওয়ায় অসভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা এবং তাহাদিগের সন্তানবর্গ শাস্ত্রানুসারে অনার্য্য বা পতিত ক্ষত্রিয়। ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং আসিয়ার ভারত-বহির্ভূত দেশ সকল, ভারত হইতে বিতাড়িত, জাতিভ্রষ্ট শক, হুন, দরদাদি নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় সন্তানদিগের দ্বারা উপনিবেশিত হইয়াছিল, এই বিষয়টী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বাক্য দ্বারাই সপ্রমাণ হইতে পারে, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ লিপিবাহুল্য হইল, ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক আমাদিগের এই দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

আর্য্যাবর্ত্তস্থ দেশ ও প্রদেশ সমূহ।

১। কেকয়—বৈদিক সাময়িক ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ। ইহার রাজধানী, শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগে অবস্থিত ছিল।

২। বাহিক—কেকয়ের উত্তরে, বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহা অনার্য্যভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে।

৩। সিন্ধু—বর্ত্তমান সিন্ধুদেশের পশ্চিম প্রান্ত।

৪। সৌবীর—বর্ত্তমান রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। ইহার অন্য নাম বদরী ছিল। বাইবলে ওফির (ophir) এবং মিশরীয় জাতি কর্ত্তৃক সফির(sofir)বলিয়া উক্ত আছে।

৫। কাম্বোজ—বর্ত্তমান খাম্বাজ উপসাগরে (Gulf of Cambay) নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশ। ইহা বৈদিক সময়ে আর্য্যদেশ মধ্যে পরিগণিত ছিল, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে উহা অনার্য্য প্রদেশ বলিয়া কথিত আছে।

৬। সৌরাষ্ট্র—বর্ত্তমান সুরাট। সুরাষ্ট্রীন্ বলিয়া টলেমি দ্বারা উক্ত।

৭। মালব—বর্ত্তমান মালব।

৮। দশার্ণ—বর্ত্তমান ছত্রিশ গড়ের অংশ বিশেষ। টলেমি ও পেরিপ্লাস্ কর্ত্তৃক ইহা দশারীন্ নামে কথিত, বেত্রবতী নদীতীরস্থা বিদিশা (ভিল্‌সা) দশার্ণের রাজধানী ছিল।

৯। অবন্তী—বর্ত্তমান উজ্জয়িণী।

১০। পুষ্কর—বর্ত্তমান আজমীরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

১১। মৎস্য—বর্ত্তমান জয়পুর দেশ।

১২। কুরুক্ষেত্র—বর্ত্তমান স্থানেশ্বর।

১৩। পঞ্চাল—মহাভারতের সময়ে পঞ্চাল দেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চাল—বর্ত্তমান রোহিলা-খণ্ড, প্রাচীন রাজধানী অহিচ্ছত্রা। দক্ষিণ পঞ্চাল—গঙ্গার দোয়াব, প্রাচীন রাজধানী কাম্পিল্য নগর। কিন্তু রামায়ণের সময়ে কাম্পিল্য, স্বনাম-খ্যাত এক বিভিন্নপ্রদেশের রাজধানী।

১৪। শূরসেন—বর্ত্তমান মথুরা প্রদেশ (Suraseni of Arrian)

১৫। সাঙ্কাস্য—(Seng-Kia-Si of Hewen Tsang) ইহার রাজধানী সাঙ্কাস্য, প্রাচীন ইক্ষুমতী বা কালস্ত্রী বর্ত্তমান কালী নদীর তটে স্থাপিত।

১৬। মদ্রদেশ—(Mardi of the Greeks) বর্ত্তমান পঞ্জাবের প্রদেশ বিশেষ।

১৭। বীরমৎস্য—বর্ত্তমান অম্বালা ও তাহার পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ।

১৮। কুরুজাঙ্গল—প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

১৯। অপরতাল—বর্ত্তমান নাইনিতালের দক্ষিণ ও বেরেলির উত্তর।

২০। প্রলম্ব—বর্ত্তমান বিজনোরের নিকট পশ্চিম রোহিলা-খণ্ডের অংশ বিশেষ।

২১। শৃঙ্গবেরপুর—স্যন্দিকা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী, প্রয়াগের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। ইহা নিষাদ-পতি গুহকের রাজধানী ছিল। এইক্ষণ সংরুর নামে বিখ্যাত।

২২। বৎসদেশ—প্রয়াগের পশ্চিম হইতে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত ভূভাগের নাম বৎসদেশ। ইহার প্রাচীন রাজধানীর নাম কৌশাম্বী, বর্ত্তমান কোশম্ গ্রাম।

২৩। মহোদয়—প্রাচীন কান্যকুব্জ, বর্ত্তমান কনোজ।

২৪। ধর্ম্মারণ্য—প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান কামরূপ ও আসামের কিয়দংশ) প্রদেশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

২৫। গিরিব্রজ—গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ।

২৬। কোশল—কাশীর উত্তর হইতে বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশসহ সমস্ত ভূভাগ কোশল নামে খ্যাত। ইহা উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত।

২৭। কাশী—বর্ত্তমান বারাণসী বা কাশী প্রদেশ।

২৮। মলদকরুষ—বৈদিক সময়ে ইহা অতি সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল, কিন্তু রামায়ণের সময়ে উহা তাড়কার বনে পরিণত হয়। চীন দেশীয় ফাহিয়ানও এই স্থান মহারণ্যময় বলিয়াছেন, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সাঙ্, এই স্থানে মহাসরঃ (Mo ho so-lo) নামক প্রদেশ দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মাসার গ্রাম প্রাচীন মহাসরঃ বলিয়া খ্যাত। সেই তাড়কার মহারণ্য এইক্ষণ আরা জেলা।

২৯। অঙ্গ—বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎ-

সমীপবর্ত্তী প্রদেশ। ইহার রাজধানী চম্পানগরী ছিল। অথর্ব্ববেদের সময়ে ইহার অংশমাত্র আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত হইয়াছিল। ঐ অংশ গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি স্থান।

৩০। মগধ—ঋগ্বেদে উল্লিখিত কীকট দেশ। অথর্ব্ববেদে ইহা মগধ নামে উক্ত (Prasii of the Greeks) অথর্ব্ববেদের সময়ে ও রামায়ণের সময়ে উহার অধিকাংশ অরণ্যময়।

৩১। গয়া—মগধ রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত।

৩২। বিশালা—গঙ্গার উত্তর ও গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বে এবং মিথিলার দক্ষিণস্থ ভূভাগের নাম বিশালা। ইহার বর্ত্তমান নাম বিসার।

৩৩। মিথিলা—বিশালার উত্তরেই মিথিলা রাজ্য। বর্ত্তমান কালে ইহা ত্রিহুত নামে খ্যাত প্রদেশ।

৩৪। পুণ্ড্র—বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলি পুণ্ড্র নামে খ্যাত। ইহা প্রাচীন কালে অরণ্যময় ও অনার্য্য নিবাস।

৩৫। বঙ্গ—বর্ত্তমান বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ, ইহা পুরাতন কালে অনার্য্য প্রদেশ।

দাক্ষিণাত্যস্থ দেশ ও প্রদেশ সমূহ।

১। ব্রহ্মমাল—বিন্ধ্যগিরি সমীপবর্ত্তী অনার্য্য প্রদেশ।

২। বিদর্ভ—বর্ত্তমান বিরার প্রদেশ। ইহার প্রাচীন রাজধানী কৌণ্ডিনা।

৩। মহীষিক—বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্য (Vide Griffith's Ramayana Vol. IV. P. 422.)

৪। গোকর্ণ—বর্ত্তমান মালাবার উপকূলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

৫। কেবল—বর্ত্তমান মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ।

৬। চোল—বর্ত্তমান করমণ্ডল উপকূলের অধিকংশ প্রদেশ।

৭। অন্ধ্র—বর্ত্তমান তৈলঙ্গদেশের কিয়দংশ। ইহার রাজধানী বারাঙ্গল।

৮। কিষ্কিন্ধ্যা—বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের উত্তরস্থ প্রদেশ।

৯। কলিঙ্গ-বর্ত্তমান উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রাবিড়ের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী বিস্তৃত প্রদেশ।

১০। দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যের বহু প্রদেশের সাধারণ নাম দ্রাবিড়। এই সকল প্রদেশের মধ্যে চোল, চের ও পাণ্ড্য প্রধান।

প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে যে সকল দেশ ও প্রদেশ অতি প্রসিদ্ধ ছিল, এ প্রস্তাবে কেবল সেইগুলিই উল্লিখিত ও তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তৎকালীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির এবং উল্লিখিত দেশ ও প্রদেশ সকলের বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা মহাত্মা কানিংহাম্ সাহেবকৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হইবেন।

অতঃপর আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব। ক্রমশঃ

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমতে জন্মান্তরবাদ" প্রতিবাদ।

আজ কাল নব্য শিক্ষিত সমাজ গীতার আলোচনায় আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতেছেন। একদিকে ইহা শুভচিহ্ন বটে, কিন্তু যখন দেখা যায়, অনেকে গীতার প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাহার স্বকপোল-কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিতেছেন; তখন তাদৃশ আলোচনার ফল, সর্ব্বত্র শুভ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। সে দিন, "গীতার ঈশ্বরবাদ" লইয়া হিতবাদীর স্তম্ভে বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে। আবার বিগত পৌষ সংখ্যার নব্যভারতে বাবু আশুতোষ দেব এম্‌এ কর্ত্তৃক লিখিত "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে জন্মান্তর বাদ" শীর্ষক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। ইহা পূর্ব্বে "দরজিপাড়ার পরাবিদ্যা-সমিতেতে" পঠিত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত বিষয় যেরূপ গুরুতর, লেখকও সেইরূপ প্রযত্নাতিশয়-সহকারে উহার আলোচনা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু, বোধ হয়, নব্যভারতের পাঠকগণের মধ্যে অনেকের পক্ষে উক্ত আলোচনা সর্ব্বাংশে সুখসেব্য হয় নাই। আমার তাদৃশ সময় ও যোগ্যতা নাই যে, আমি প্রস্তাবিত বিষয়ের যথোচিত সমালোচনা করি। সে জন্য উহার যে অংশে গীতাদির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব-লেখক স্বাভিমত সহ ব্যখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব এবং ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত মনে হওয়ায়, কেবল সেই অংশেরই প্রতিবাদ স্বরূপ কয়েক পঙ্‌ক্তি নব্যভারতের পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রস্তাবের এক স্থানে লেখক বলিতেছেন:—"অতি প্রাচীন কালের পুস্তকাদিতে, যেমন বেদাদি শাস্ত্রে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য তখন প্রায় মনুষ্য জন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইত,—কারণ, আদিম অবস্থা বলিয়া, এখনকার অপেক্ষা, তখন মনুষ্য জন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাহার বহুবৎসর পরে ভগবান্ গীতাতে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। গীতাতে আমরা কোন স্থানে দেখিতে পাই না যে, মনুষ্য পশ্বাদি জন্ম গ্রহণ করিবে।"

ইহার পর লেখক, পুণ্যবানদিগের গতির কথা গীতা হইতে ভগবদুক্তি প্রদর্শন করিয়া পরে বলিয়াছেন:—

পাপীদিগের গতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে। (১৪-১৫)

"অর্থাৎ, তমোগুণাপন্ন ব্যক্তি, মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

"ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। ১৬-১৯

অর্থাৎ, অশুভ-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

"এখানে মূঢ় ও আসুরী অর্থে অজ্ঞান অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি-মনুষ্য বুঝাইতেছে।"

লেখক, এস্থলে, উদ্ধৃত শ্লোকান্তর্গত "মূঢ় ও আসুরী" এই দুই শব্দের অর্থ, "অজ্ঞান অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি মনুষ্য" স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক এই দুই শব্দ দ্বারা অবস্থা বিশেষে কিরূপ যোনিতে মনুষ্যের জন্মলাভ হইবে, তাহাই সূচিত হইয়াছে। লেখক, আবার, স্বকীয় অর্থের পোষকে একটী উপনিষদের (কোন্ উপনিষদ্ প্রস্তাবে

উল্লেখ করেন নাই) প্রমাণ, পোষক স্বরূপ প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহা সত্য বটে যে, গীতায় সর্ব্বোপনিষদের সার সঙ্কলিত আছে। তাই বলিয়া গীতার কোন অংশের বিকৃত অর্থ উপনিষদের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। এস্থলে, লেখকের এতাদৃশ প্রমাণ আহরণ অবশ্যই অসংলগ্ন ও ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহা হউক, কোন বিষয়ে গীতার অভিমত কি জানিতে হইলে, যদি গীতা পূর্ব্বে গুরুমুখী না হইয়া থাকে তবে, গীতার যে যে স্থলে তদ্বিষয়ের নির্দ্দেশ আছে, সেই সেই অংশের পূর্ব্বাচার্য্য ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের কৃত ব্যাখ্যা, তদভাবে, অন্ততঃ প্রসিদ্ধ অনুবাদকের অনুবাদ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। আশুতোষ বাবু বোধ হয় ইহার কিছুই করেন নাই; অথবা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কোন গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, গীতার সদর্থ বিকৃত করিয়া জন সমাজে প্রচার করিয়াছেন। শুনা যায়, থিওসফি মতে, মনুষ্যের কোন কারণে পশ্বাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয় না। তৎপক্ষে তন্মতাবলম্বীদিগের যুক্তি অবশ্য কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ যুক্তি হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক হিন্দু শাস্ত্রের চির-সিদ্ধান্ত বিপর্য্যয় করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়া বোধ হয়।

অতঃপর জন্মান্তর সম্বন্ধে গীতার প্রকৃত মত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে; আশা করি, সুধীগণ ইহার অনুমোদন করিবেন, অথবা, ইহাতে আমার ভ্রম থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

পুরুষের বিভিন্ন যোনি লাভ সম্বন্ধে গীতায় উক্ত হইয়াছেঃ—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ[illegible]কৃতি জান্ গুণান্।
কারণ গুণসঙ্গোহস্য স[illegible]দ্ যোনিজন্মসু ৷৷" ১৩·২১

অর্থাৎ, পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া. প্রকৃতির সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। ইহার যে সদসদ্ যোনিতে জন্ম হয়, কথিত প্রকৃতির গুণ সংসর্গই তাহার কারণ। এখানে সদ্ যোনি বলিতে দেব ও মনুষ্য যোনি এবং অসদ্ বলিতে পশ্বাদি যোনি বুঝিতে হইবে। তদ্ যথা।

শাঙ্কর ভাষ্যম"—সদ্ যোনয়ো দেবাদি যোনয়ঃ, অসদ্ যোনয়ঃ পশ্বাদি যোনয়ঃ সামর্থ্যাৎ সদসদ্ যোনয়ো মনুষ্য যোনয়োঽপ্যবিরুদ্ধা দ্রষ্টব্যাঃ।"

স্বামিকৃতটীকা—"অস্যচ পুরুষস্য সতীষু দেবাদি যোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদি যোনিষু যানি জন্মানিতেষু ইত্যাদি।'

মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা—"সদসদ্-যোনি জন্মসু সদ্‌যোনয়ো দেবাদ্যাস্তেষুহি সাত্ত্বিকমিষ্টং ফলংভুজ্যতে অসদ্‌যোনয়ঃ পশ্বাদ্যাস্তেষু হি তামসমনিষ্টং ফলং ভুজ্যতে সদসদ্‌যোনয়ো ধর্ম্মাধর্ম্ম মিশ্রত্বাৎ ব্রাহ্মণাদ্যা মনুষ্যাস্তেষু হি রাজসংমিশ্রং ফলং ভুজ্যতে ইত্যাদি।

ইহাতে জানা গেল, ভগবান্ উক্ত শ্লোকে যে গুণানুসারে সৎ ও অসৎ যোনি লাভের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বস্তুগত্যা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত সূচিত হইয়াছে। দেবযোনি, মনুষ্যযোনি এবং পশ্বাদি যোনি।

স্থানান্তরে ভগবান্, গুণত্রয়ের মধ্যে কোন্ গুণ বৃদ্ধি থাকা অবস্থায় জীবের মৃত্যু হইলে তাহার কিরূপ গতি হয়, তাহা স্পষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা;—

"যদাসত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ় যোনিষু জায়তে।" (১৪—১৫)

শাঙ্কর ভাষ্যম্;—যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে উদ্ভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহ ভৃদাত্মা, তদা উত্তম বিদাং মহদাদি তত্ত্ববিদামিত্যেতল্লোকানমলান্ মলরহিতাম প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ।

রজসি গুণে বিবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু স্বকর্ম্মাসক্তি যুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তদ্বদেব প্রলীনোমৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশ্বাদি যোনিষু জায়তে।

স্বামিকৃত টীকা:—সত্ত্বে বিবৃদ্ধে সতি যদা জীবোমৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্য গর্ভাদীন্ বিদন্ত্যপাসত ইত্যুত্তম বিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থান-বিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি।

রজসি বিবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনোমৃতোমূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে।

মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা;—সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা প্রলয়ং মৃত্যুং যাতি প্রাপ্নোতি দেহভৃৎ দেহাভিমানী জীব স্তদোত্তমাষে হিরণ্যগর্ভাদয় স্তদ্বিদাং তদুপাসকানাং লোকান্ দেবসুখোপভোগ-স্থান-বিশেষানমলান্ রজস্তমো সুখরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি।

রজসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলয়ং মৃত্যুং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু শ্রুতি স্মৃতি বিহিত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মফলাধিকারিষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তদ্বদেব তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনোমৃতো মূঢ় যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে।

ভগবান্, ইহার পরে, উল্লিখিত বিভিন্নগুণ সেবীদিগের গতির কথা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা;—

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।"
(১৪—১৮)

শাঙ্কর ভাষ্যম্:—ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষু উৎপদ্যন্তে সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণ বৃত্তস্থাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষু উৎপদ্যন্তে রাজসাঃ জঘন্য গুণ বৃত্তস্থা জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্য গুণস্তমস্তস্য বৃত্তং নিদ্রালস্যাদি তস্মিন স্থিতা জঘন্য গুণ বৃত্তস্থা মূঢ়া অধোগচ্ছন্তি পশ্বাদিষু উৎপদ্যন্তে তামসাঃ।

স্বামিকৃত টীকা:—সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তি প্রধানাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষ তারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্ব পিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোক পর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোকএবোৎপদ্যন্তে, জঘন্যোনিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদ মোহাদিঃ তত্রস্থিতা অধোগচ্ছন্তি তমসোবৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষুৎপদ্যন্তে।

ইহাতে জানা গেল, সত্ত্বগুণাবলম্বীগণ দেবাদিলোক, রজোগুণাবলম্বীগণ মনুষ্য লোক, এবং তমোগুণাবলম্বীগণ পশু প্রভৃতি নীচ লোক, এমন কি নরক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়।

অপর একস্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন, "যাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধাদির আশ্রয় লইয়া, দেহান্তরবর্ত্তী আমাকে (ঈশ্বরকে) বিদ্বেষপূর্ব্বক অসূয়া করিয়া থাকে, এরূপ ক্রূরমনা, ঈশ্বর-বিদ্বেষক, অশুভদর্শী নরাধমদিগকে আমি সর্ব্বদা এই সংসারে অসুর যোনিতে (অর্থাৎ ব্যাঘ্র, সিংহ সর্প প্রভৃতি যোনিতে) নিক্ষেপ করি।" তদ্যথা:—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ।
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"
(১৬—১৮।১৯)

শাঙ্করভাষ্য :—"আসুরীষ্বেব ক্রূরকর্ম্ম প্রায়াসু ব্যাঘ্র সিংহাদি যোনিষু ক্ষিপা" ইত্যাদি।

স্বামিকৃত টীকা :—"আসুরীষ্বেবাতি-ক্রূরাসু ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিষু অজস্রমনবরতং ক্ষিপামি, তেষাং পাপ কর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ।"

মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা ;—"আসুরীষ্বেব অতি ক্রূরাসু ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিষু তত্তৎ কর্ম্মবাসনানুসারেণ ক্ষিপামীত্যনুষজ্যতে" ইত্যাদি।

পর শ্লোকেই ভগবান্ বলিয়াছেন, "ঐ মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মেই আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া, নানা প্রকার অধমা গতি প্রাপ্ত হয়।" তদ্যথা :—

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততোযান্ত্যধমাংগতিম্।
(১৬—২০)

শাঙ্কর ভাষ্যম্ :—"আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ প্রতিপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি অবিবেকিনঃ প্রতিজন্ম তমোবহুলাস্বেব যোনিষু জায়মানা অধোগচ্ছন্তি তে মূঢ়া মামীশ্বরং অপ্রাপ্য অনাসাদ্যৈব হে কৌন্তেয়! ততঃ তস্মাদপি যান্তি অধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিং মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদপ্যাশঙ্কাস্ত্যতোমচ্ছিষ্ট সাধুমার্গ প্রাপ্তিমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ।"

স্বামিকৃত টীকা :—"তেচ মামপ্রাপ্যেবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তি শঙ্কাপি কুতস্তেষাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য অতোহপ্যধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যুক্তং শেষং স্পষ্টং।"

মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা :—"যে কদাচিদাসুরীং যোনিমাপন্নাস্তে জন্মনি জন্মনি প্রতি জন্মনি মূঢ়াস্তমোবহুলত্বেনাবিবেকিনস্ততস্তস্মাদপি যান্ত্যধমাং গতিং নিকৃষ্টতমাং গতিং মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদাশঙ্কাপ্যস্তি অতোমদুপদিষ্টং বেদমার্গ মপ্রাপ্যেত্যর্থঃ।" ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা গেল, ঈশ্বর-বিদ্বেষী, ক্রুরকর্ম্মা পাপাত্মাদিগকে ভগবান্ আসুর যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করেন বলিয়াছেন। তাহার ফল এই হয়, উহারা প্রথমে পশুযোনি লাভ করিয়া, ভগবান্‌কে না জানিতে পারিয়া তদনন্তর তদপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট (যেমন কৃমি, কীট প্রভৃতি) যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ মনে করেন, করুণাময় ভগবান্ পাপাত্মাদিগের উপরে এত নির্দ্দয় কেন? তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, অত্যন্ত নিকৃষ্ট অর্থাৎ পশু প্রকৃতির লোককে, মনুষ্য শ্রেণীতে না রাখিয়া, মনুষ্য জাতির শান্তি বিধান এবং তাদৃশ নরাধমেরই ভবিষ্যৎ উন্নতির উদ্দেশে হয়ত তাহাকে পশু যোনিতে নিক্ষেপ করা ভগবান মনে করিতে পারেন। বস্তুতঃ এরূপ না হইলে তিনি কি করিয়া বলিয়াছেন :—

"সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বামাং শান্তিমৃচ্ছতি।"(৫-২৯)

পাঠকগণ. উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে মনুষ্য শ্রেণী বিশেষের নিরন্তর পশ্বাদি যোনিতে যে জন্মলাভ হইয়া থাকে, তাহা গীতার মত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যখন দেখা যায় যে, বিভিন্ন কালে উদিত

সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্য ও টীকাকার আচার্য্যগণ বেদাদি শাস্ত্র সাহায্যে জন্মান্তর বিষয়ে গীতার অর্থ প্রকটিত করিয়াছেন, আর যখন ঐ শাস্ত্র সমুদয় যুক্তিবিহীন নহে বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তখন গীতার কেহ অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থ প্রচার করিলে একদিকে যেমন তাহা হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হইবে না, অন্য দিকে উহা যুক্তি-বহির্ভূত বলিয়াও বিবেচিত হইবে। আশুতোষ বাবু যদি গীতার উক্তিকে শাস্ত্রানুমত ও ভগবদুক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে জন্মান্তর সম্বন্ধে গীতার সহিত কোন শাস্ত্রের কোনরূপ বিরোধ দেখিতে পাইতেন না, এবং তাহা হইলে তিনি এরূপ চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেও পারিতেন না। তাঁহার উপসংহার বাক্য এই :—

"সুতরাং আমরা অবগত হইতেছি যে, পূর্ব্বে মনুষ্য জন্ম হইতে বিচ্যুত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা ছিল, গীতাকারের সময় বোধ হয় সেইরূপ সম্ভাবনা ছিল না। সেইরূপ সম্ভাবনা থাকিলে তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন।"

পূর্ব্বে কেন সম্ভাবনা ছিল এবং "গীতাকারের" সময় কেন তাহা দূর হইয়াছে, লেখক তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। আমরা পরা-বিদ্যা-সমিতির সভ্য নহি, সুতরাং এ রহস্য আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। লেখকের কথা সত্য হইলে, আমাদের কাহাকেও,এমন কি, ঈশ্বরবিদ্বেষী নিতান্ত পাপাত্মাকেও আর সে কালের মত পশ্বাদি যোনিতে জন্ম লইতে হইবে না। ইহা বড়ই আনন্দের সমাচার সন্দেহ নাই। তবে কি বুঝিব যে, কলিকালে যাবতীয় ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যাত্মারাই মনুষ্য যোনিতে আবির্ভূত হইতেছেন? অথবা ইদানীং কেহ একবার মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ করিলে,কোন অভূতপূর্ব্ব নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন বলে তাহার আর কোন কারণেই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট যোনিতে গতি হইবে না?

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।"

বসন্তে কিংশুক।

রাঙা কিংশুকে ফুটেছে বিলাস কার এ?
শুষ্ক শাখায়, নিম্নে উচ্চে,
সধূম-বহ্নি পুষ্পগুচ্ছে
জ্বলিছে কাহার আকুল, তপ্ত,
অসরম কামনা রে?
শিশির-শীর্ণ রিক্ত তরুতে,
কিবা এ দৃশ্য, মলয়-মরুতে,—
অস্থি বিদারি শোণিত-উৎস,
দীপ্ত লালসা-সারে!
তুমি কি, বৃক্ষ, সমাধি-মগ্ন
পঞ্জর-শেষ তাপস নগ্ন?—
বাসব-অসূয়া-কেন্দ্র হয়েছ
সংহরি বাসনারে?
মদিরা-অধীর, ঘন-রঞ্জিত,
চুম্বন তরে মণ্ডলীকৃত,
কাহার মত্ত অধর-ওষ্ঠ
মথিছে,—কুসুমাকারে?

অ-সুরভি, শুধু বর্ণে শেষ,—
এ বিলাসে নাহি প্রেম-লেশ,—
কাহার ব্যঙ্গ-নিঠুর রঙ্গে
সঁপিয়াছ আপনারে?

একি উর্ব্বশী, মদন-গরবে,
জ্বালি আলিঙ্গনে বাসনা-বাড়বে,
দহিছে শান্তি সমাধি, শতেক
অনল-প্রতিম মারে ?

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

"রামায়ণের উত্তর কাণ্ড কি প্রক্ষিপ্ত" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

রামায়ণের উত্তর কাণ্ড কি প্রক্ষিপ্ত ?—শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিলাম, যে সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া উত্তর কাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলা হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয় রামায়ণের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। লঙ্কাকাণ্ডের শেষাংশে রামায়ণ পাঠের ফল ও উপকারিতা বর্ণিত হওয়ায় সাধারণ নিয়ম অনুসারে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বলিয়া প্রবন্ধ-লেখক উত্তরকাণ্ড যে নিঃসন্দেহরূপে প্রক্ষিপ্ত, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত অথবা অনুমান সহসা মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সমগ্র রামায়ণের প্রতি দৃষ্টি করিলে মহাকবি বাল্মীকির রচনাকৌশল অন্যরূপ প্রমাণ করিয়া দিবে।

আদিকাণ্ড অথবা বালকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলি বিবেচনা করিয়া পাঠ করিলে প্রবন্ধ-লেখকের ঐরূপ সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত নয়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

পাঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্ব মীয়াৎ।
স্যাৎ ক্ষত্রিয়োভূমি পতিত্ব মীয়াৎ।
বণিক জনঃ পণ্য ফলত্ব মীয়াৎ।
জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ব মীয়াৎ।।

অর্থঃ—ইহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাগ্মী, ক্ষত্রিয় রাজা, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও শূদ্র মহত্ব প্রাপ্ত হয়।

আদি কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে রামায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় ঐপর্য্যন্তই কি রামায়ণের শেষ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে ? আদি কাণ্ডের পর যে সকল অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত যুক্তি অনুসারে দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে সমগ্র রামায়ণকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়। রামায়ণের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ ভাগে ঐরূপ এক ২ শ্লোক দ্বারা ঐ অধ্যায় পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে, ইহা ভিন্ন তদ্দ্বারা রামায়ণ শেষ করা হয় নাই।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে লঙ্কাকাণ্ডের শেষ ভাগে রামায়ণের ফলশ্রুতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হওয়ার অন্য একটী কারণ উপলব্ধি হয়। রামায়ণ দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ ষষ্ঠকাণ্ড পর্য্যন্ত তাহা রামের রাজ্যাভিষেকের পর বাল্মীকি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে দ্বিতীয় ভাগ রামের রাজ্যাভিষেকের পর হইতে স্বর্গারোহণ জন্য সরযূ নদী প্রবেশ, যাহা উত্তর কাণ্ড নামে অভিহিত, তাহাই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বাল্মীকি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত রাজ্যণা রামণ্য বাল্মীকি ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্র পদ মর্থবৎ ॥
অনাগতঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ রামণ্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকি ভগবান্ ঋষিঃ ॥

রাবণ বধের পর রামের সস্ত্রীক অযোধ্যায় আগমন, রামের রাজ্যাভিষেক এবং তদনন্তর বহুকাল পর্য্যন্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন ইত্যাদি বিস্তৃত ভাবে ঘটনাবলী বর্ণিত না হইয়া সাধারণ ভাবে ঐ সকল বিষয় লঙ্কাকাণ্ডের উপসংহারে উল্লেখ মাত্র

থাকায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ অনুমান হয় যে, এ-সকল ঘটনাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া কখনও কোন মহাকাব্য-প্রণেতা তাঁহার কাব্যের পরিসমাপ্তি করেন না। মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। বিস্তৃত বর্ণনা না থাকিলে অপরিসমাপ্তি দোষ যে ঘটিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে হইলে তাহার জীবনের সমুদয় ঘটনাবলী লেখাই সাধারণ নিয়ম। নতুবা অসম্পূর্ণ থাকে।

উত্তরকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ থাকায় প্রবন্ধ-লেখক কিরূপে ঐ অধ্যায়ের আধুনিকত্ব উপলব্ধি করিলেন, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়ায় প্রবন্ধ-লেখক কি ঐ উপলক্ষে তদবধি কুরুক্ষেত্রে তীর্থস্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় অনুমান করিয়াছেন যে, কুরুপাণ্ডবের লীলা খেলার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র অতি সাধারণ স্থান ছিল। মহাভারতের শল্য পর্ব্বে দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধাধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রের সবিস্তার বিবরণ বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে কুরুক্ষেত্র যে অতি প্রাচীন তীর্থস্থান এবং রাম রাবণের যুদ্ধের বহুপূর্ব্বাবধি তীর্থস্থান বলিয়া অভিহিত, তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

রামায়ণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য উত্তর কাণ্ড লেখা হয় নাই। রামের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আদিকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কাকাণ্ডে শেষ করেন। তৎপর সপ্তম কাণ্ড অর্থাৎ উত্তর কাণ্ড লিখিয়া রামের জীবনের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী শেষ করা হইয়াছে। রামায়ণের লেখা অনুসারে তাহা ভবিষ্যৎ লেখা হইয়াছিল। পাঠক তাহাকে ভূত অথবা ভবিষ্যৎ যাহাই বলুন, তাহা যে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আধুনিক যুক্তি অনুসারে সরযূজলে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগকে আত্মহত্যা বলিতে হইবে এবং আমিও তাহাই বলিব। কিন্তু যে সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে, সে সময়ে হিন্দু-জগতের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল, প্রায়োপবেশন, মহাপ্রস্থান, সমুদ্র প্রবেশে জীবন বিসর্জ্জন, সে সময়ে স্বর্গ সাধনের প্রধান দ্বার স্বরূপ ব্যবস্থিত ছিল, সেই ধর্ম্ম বিশ্বাসেই মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতাগণ মহা প্রস্থান গমন করিয়াছিলেন।

মুসলমান রাজত্ব সময়েই হউক, অথবা লিপি কারকের দোষেই হউক, কোন একখানি রামায়ণও হস্ত লিখিত অন্য রামায়ণের সহিত ঐক্য হয় না, কিন্তু অতি প্রধান ঘটনাবলী যে প্রক্ষিপ্ত দোষে দূষিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করার কোন ন্যায়সঙ্গতযুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যবদ্বীপের রামায়ণ কখনও দেখি নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই মাত্র বলিতে পারি যে, এতদ্দেশীয় রামায়ণে যেরূপ উত্তরকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের রামায়ণেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের রামায়ণে রামানুজ টীকাও সন্নিবেশিত আছে। তাহাতেও উত্তরকাণ্ড আছে।

ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দানের বিধি উত্তর কাণ্ডে থাকায় প্রবন্ধ-লেখক তাহাই ব্রাহ্মণদিগের অর্থ উপার্জ্জনের জন্য শেষে প্রক্ষিপ্ত লেখা হওয়া বলিয়া যেরূপ উপহাস করিয়া-

ছেন, ব্রাহ্মণদিগের তাৎকালিক ও বর্ত্তমান সময়ের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না করাই ঐরূপ উপহাসের কারণ বলিয়া বিবেচনা করি। পূর্ব্বকালের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণগণও সুবর্ণদান গ্রহণ করেন না। সুবর্ণদান গ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতি কঠিন। সুবর্ণ দান গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণদিগকে পতিত হইতে হয়। এই ব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান সময়ে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণও সুবর্ণদান গ্রহণ করেন না। যাঁহারা অর্থ লোভে ঐরূপ দান গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া অতি ঘৃণিতভাবে নীচ শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন।

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

কলিকা ও ফুল।

(১)

যবে দেখেছিনু তায় প্রভাত-প্রভায়
বসন্ত-কুঞ্জ-কাননে—
সেহি অস্ফুট-দল কলিকা বিমল
মৃদু বিচলিত পবনে,
সেথা ছেয়েছিল তার ঘিরি চারি ধার
ফোটা ফুল কত বর্ণে;
সে যে পরাজি সবায় রূপের আভায়
ছিল গো মুদিত পর্ণে।

(২)

মৃদু বহিল সমীর, গাহিল অধীর
কোকিল, অখিল মোহিয়া;
কত মধুমাস আসি গেল হাসি হাসি
কলিকার মুখ চাহিয়া।
শেষে ফুটিল রে কবে এমন গরবে
শতেক শোভন দলে গো?
আজি বসন্ত আপনি হেরি মুখখানি
বিহরে চরণতলে গো।

(৩)

তার পর্ণে পর্ণে সোণার বর্ণে
উজলি উঠিছে বিধুরে।
ওগো ছেয়ে শতদল সুরভি অমল
উছলি উঠিছে সীধুরে!
নব সমীরণ ধায় সুখের আশায়,
সুরভি তাহার যাচিয়া;
কত গুঞ্জরে অলি কুঞ্জের তলে,
বিহগেরা গায় নাচিয়া!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দীপ্ত শিরার দাহন

আমরা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ সময়ে আমাদিগকে অনেক দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। সহিয়া সহিয়া যখন আমরা এরূপ কষ্টসহিষ্ণু হইব যে, অম্লানচিত্তে কর্ত্তব্যানুরোধ প্রজ্জলিত অগ্নি-শিখায় প্রবেশ করিতে বা উত্তাল তরঙ্গময় সাগরে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হইব না, তখন এদেশে নব জাতির অভ্যুদয় হইবে। এখন মৃতবৎ পড়িয়া পড়িয়া সকল দাহন সহ্য করিতে হইবে।

বহুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, এ জগতে অত্যাচার ভিন্ন কোন জাতির অভ্যুদয় হয় নাই;—ভারত যদি কখনও উত্থিত হয়, কেবল অত্যাচারে হইবে। রাজার যে

অনুচরের দ্বারা দেশে অত্যাচার বৃদ্ধি হয়, সে অনুচর রাজার হিতকামী নহেন। তাহা দ্বারা রাজশক্তির মূল উৎপাটনের বীজ রোপিত হয়। যিনি প্রজার ভিতরে অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, তিনি আর যাহা হয়েন, হউন, তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ নহেন।

মানব জীবনের এমন একটা সময় আছে, যখন কেবল উত্তেজনাই তাহার নিকট প্রিয় হয়। যৌবন-মত্ততায় মানুষকে বড়ই অহঙ্কারী করে। কেবল অহঙ্কারী নয়—মানুষকে অসংযত করে। কেবল অসংযত নয়,—মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করে। এজন্য রাজনৈতিক-জগতে চঞ্চলমতি অসহিষ্ণুদিগের মস্তকে বুদ্ধিমান রাজা কখনও গুরুভার অর্পণ করেন না। যদি কখনও করেন, হাতে হাতে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

কি জানি কেন, আমাদের উদার-হৃদয় রাজা অপরিণত-বয়স্ক অহঙ্কৃত যুবকের মস্তকে যখন গুরুতর রাজ্যশাসন ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তখন এ দেশের ভবিষ্যতের মঙ্গলের আশা নাই। অহংজ্ঞানে আত্মহারা যুবককে যতই যুক্তিযুক্ত কথা বল না কেন, সে হিতোপদেশ তাহার ভাল লাগিবে না, সে তুড়ি দিয়া সব উড়াইয়া দিবে। যাহা তাহার মনের খেয়াল হইবে, তাহা সে করিবেই করিবে। পতনের পথে চলিবার সময় কে কাহার হিতোপদেশ শ্রবণ করে?

বিগত মাঘ মাসে ভবানীপুরের ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার করিন্থিয়ান রঙ্গালয়ে ভদ্রঘরের যুবক-যুবতীর নীরব অভিনয় হইয়াছিল। মা ভগ্নীদিগকে দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করা সঙ্গত নয় বলিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি আপত্তি করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের তিন বিভাগ হইতেও উহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল; কিন্তু তবুও ঐ অভিনয় বন্ধ হয় নাই। নীরবঅভিনেতৃবর্গ পুত্রপৌত্রাদির জন্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন যে, সমাজের কথা, প্রবীণদের কথা কখনও গ্রাহ্য করা উচিত নহে। এই অবহেলা-দুর্নীতির পথ ধরিয়া ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরগণই যে অধঃপাতে যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না। তিন সমাজই প্রতিবাদ করিলেন, অথচ তিন সমাজের প্রধানদের আত্মীয়গণই প্রকাশ্যে এবং গোপনে ঐ নীরব অভিনয়ে উৎসাহ দিলেন। ভক্ত কেশবচন্দ্রের পৌত্র, মহর্ষির পুত্র এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিত্রয়ের আত্মীয়েরা উহাতে যোগ দিলেন, উৎসাহ দিলেন, ইহা ভাবিতেও কষ্ট পাই। যাঁহারা যোগ দিলেন, কই, তাঁহাদের প্রতি এখন ত আর কাহারও ভাবান্তর দেখি না। রঙ্গরস, থিয়েটার, নাচগান, এখন এইরূপে, এখানে সেখানে উঁকি মারিতেছে। কালে সমাজ-মন্দির যে এইরূপ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইবে না, কে বলিতে পারে? কেন না, এখনই কোন আচার্য্য ও প্রচারকের পত্রিকায় ইহার পোষকতা দেখিতেছি; এবং আরো কেহ কেহ পোষকতা করিতেছেন। এইরূপে ক্রমে যদি এ কাজ সকলের নিকট ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তথাকথিত নির্দ্দোষ রঙ্গরস ভবিষ্যতে সমাজমন্দিরে করিতেও আপত্তি না থাকিবার কথা। এই সকল ভাবিবার সময়, আমাদের মনে এই প্রশ্নটী জাগরিত হইয়াছিল যে, জগতে যে কোন গর্হিত কাজ করা যায়, তাহারই

পোষক পাওয়া যাইতে পারে। তাহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। এই কাজটাকে ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্যও অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। সে সকল বাদ প্রতিবাদ পড়িয়াছি। পরিপোষকগণ বলেন, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ কি ব্রাহ্মসমাজে থাকিবে না? ব্রাহ্মসমাজ কি কেবল প্রেম ভক্তি বিশ্বাস লইয়াই থাকিবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই,—রঙ্গরস, আমোদ প্রমোদ, ইন্দ্রিয়চালনা, বিলাসিতা দেশের চতুর্দ্দিকেই চলিয়াছে,—সেই স্রোত ফিরাইবার জন্য কেবল ব্রাহ্মসমাজই বদ্ধপরিকর। এতদিন পর ব্রাহ্মসমাজ যদি আবার সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দেন, এ দেশের উদ্ধারের আর পথ নাই। যদি সামঞ্জস্য রক্ষার কথা বলেন, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই—ব্রাহ্মসমাজ দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও, এখনও, এই সমাজের সর্ব্ব সাধারণের মতিগতি, ভক্তি বিশ্বাস ও বিশুদ্ধির দিকে ফিরে নাই;—অন্য সমাজের লোকেরাও যেমন, এ সমাজের অধিকাংশ লোকও তেমনি। যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই একথা প্রতিপন্ন করা যায়। যদি ভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতার দিকে সকলের মতি গতি ফিরিত, তবে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, অন্য দিকে গতি ফিরাইবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতাম। অন্তরঙ্গধর্ম্মসাধনে অতি অল্প লোক সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। চরিত্র বলিয়া একটা জিনিস, অল্পের মধ্যেই দেখা যায়। এই অবস্থায়—বিলাসিতা ও রঙ্গরসের প্রতি আকর্ষণ বাড়াইলে, ভাবী বংশের উদ্ধারের আর উপায় থাকিবে না। এখন কঠোর সংযমী হইয়া না চলিলে, ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে নীতিহীন হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের আশা ভরসা ডুবিয়া যাইবে। আর কোন যুক্তি গ্রাহ্য না হইলেও, কেবল এই এক কারণে, ম্যাট্সিনির ন্যায় কঠোর সংযমী হইয়া, এখন ব্রাহ্ম-সাধারণকে চলা উচিত। কিন্তু সে কথা শুনিবে কে? তোমরা বাতুল, তোমরা অনুদার, তোমরা reformer নহ—ইত্যাদি বিশেষণে, সুতরাং প্রতিবাদীগণ যে অভিহিত হইবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। প্রদীপ্ত বহ্নি-শিখার ন্যায় প্রমত্ত নীরব-অভিনেতাগণ সম্মানের স্বর্ণমুকুট শিরে ধারণ করিয়া ধু ধু করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন। সেই দাহনে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। দগ্ধ হইতেছি এবং বানরের হাতে খোন্তার কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি।

দীপ্ত শিখার আর এক ভীষণ দাহন বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। লর্ড কর্জ্জন যুক্তিতর্ক-ইন্ধন লইয়া বহুব্যয়ে বঙ্গ-বিভাগ-যজ্ঞের সূত্রপাত করিতেছেন; সকলকেই সেই যজ্ঞে পুড়িয়া মরিতে হইবে! তিনি প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত;—কিন্তু আমরা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রতিভা বা সুবুদ্ধির কোন পরিচয় পাই নাই। সংযম, ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্য ভিন্ন কেহ কি রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারে? এ সকলের কিছুরই কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত তাঁহাতে পাই নাই; তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে অসহিষ্ণুতা, চাঞ্চল্য, অহঙ্কারের পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি। তিনি মনে করেন, তাঁহার ন্যায় সুবক্তা আর কেহ নাই;—তিনি মনে করেন, তিনি যাহা করিতেছেন বা যাহা করিবেন, তাঁহার অপেক্ষা ভাল কোন কাজ আর কেহ কখনও করিতে

পারে নাই। এইরূপ আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ হইয়া তিনি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত-শাসনে যে অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, ইহার ফল কি ভাল হইবে? যদি তিনি আত্ম-গোপন করিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর সন্তোষ বিধান করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনকে অটল এবং অচল ভিত্তিতে দৃঢ় করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে তাঁহাকে কৃতী পুরুষ মনে করিতাম। তৎপরিবর্ত্তে তিনি যে অসন্তোষ-বহ্নি আপামর-সাধারণের হৃদয়ে প্রজ্বলিত করিতেছেন, এই চির-দাসত্ব-মগ্ন জাতিকে অত্যাচার-অগ্নির উত্তাপ দ্বারা জাগাইয়া দিতেছেন, ইহার ফল ভাল হইবে কি?

তিনি ভাবিতেছেন, এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণী যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া মাথা খাড়া করিতেছেন, ইহার প্রতিবিধান না করিলে ভবিষ্যতে দেশ শাসন করা কঠিন হইবে। আমরা কিন্তু অন্তরূপ ভাবিতাম। এদেশের শিক্ষিত শ্রেণী যেরূপ দাস-খত লিখিয়া দিয়া চিরদাসত্বকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তিনি বুদ্ধিমান হইলে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন। তিনি রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, এবং এই জন্য সর্ব্বপ্রকারে সকলকে অনুন্নত করিতে চাহেন। অথচ তিনি মনে করেন, তাঁহার অভিপ্রায় কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। তিনি সকলকে শিক্ষায় অনুন্নত করার চেষ্টায় আছেন, জাতি-বিদ্বেষ প্রজ্বলিত করিয়া অসদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন, বিভাগ-নীতি অবলম্বন করিয়া একতা-বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, যে-সে প্রকারে ভারতের অর্থ রাশি ব্যয় করিয়া বা করাইয়া, চির-দারিদ্র্যে ভারতবাসীকে ডুবাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই—কেহ আর বড় না হয়, কেহ আর মাথা না তোলে। তিনি মনে করিতেছেন, তাঁহার গুপ্ত মন্ত্র কেহই বুঝিবে না,—বক্তৃতার ছটায় সকলকে ভুলাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, তিনি ধরা পড়িয়াছেন। দুই দশ জন খোসামুদে লোক ভিন্ন তাঁহাকে অনেকেই চিনিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ভারতের হিতৈষী কি না, আর কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। এই রূপে যিনি আপনাকে ধরা দেন, তিনি কি বুদ্ধিমান, তিনি কি সুচতুর? তিনি আপনার কূটনীতি দ্বারা এ দেশে যে অসন্তোষের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছেন, আমরা নির্ভয়ে বলিতেছি, তাহার ফল কদাচ ভাল হইবে না।

তিনি আমাদের কথা শুনিবেন না, তাহা জানি। এ জগতে কে কোন্ অপকর্ম্ম করিবার সময় অন্যের হিত-কথা শ্রবণ করে? তিনি বঙ্গকে বিভাগ করিবেন, নিশ্চয় করিবেন, আমরা জানি। তিনি নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিধিবদ্ধ করিবেন, তাহা আমরা জানি। তিনি নিশ্চয়, যত রূপে পারেন, ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির অবরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা জানি। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে? আবার কি উন্নতি-গঙ্গার স্রোত গোমুখীতে ফিরিবে? বিজ্ঞানে যাহা অসিদ্ধ, কাহারও সাধ্য নাই তাহা করিতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে অত্যাচারের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া কেহ আর কাহাকে অনুন্নতিতে ডুবাইতে পারিবে না। অত্যাচার,—অত্যাচার—অত্যাচার—ইহাই জাতীয় অভ্যুদয়ের মূল মন্ত্র। এদেশ

যে ভবিষ্যতে জাগিবে, লর্ড কর্জ্জন তাহার সূত্রপাত করিয়া যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে শত ধন্যবাদ। আর ইংলণ্ড? ইংলণ্ড এহেন ব্যক্তির হস্তে শাসন-কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া যে অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে সে জন্য তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

এ হেন দুর্দ্দিনে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের কর্ত্তব্য— অম্লানচিত্তে সকল অত্যাচার মস্তক পাতিয়া লওয়া এবং যাহাতে আমরা চরিত্রবান হইতে পারি—মনুষ্যত্বে উন্নীত হইতে পারি, তৎপক্ষে কঠোর সাধনা করা। এক হস্তে চরিত্র, আর এক হস্তে সেবা, এক হস্তে পুণ্য আর এক হস্তে কর্ত্তব্য লইয়া, যাহাতে ভাবী বংশ, আত্মত্যাগ-মঞ্চে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইতে পারে, বিধাতা নানা ঘটনার ভিতর দিয়া তাহা করুন।

শুনিয়াছি, জাপানের টর্পেডো যখন অন্য পক্ষের জাহাজ ভাঙ্গিতে জলের নিম্ন দিয়া ধাবিত হয়, তখন দুই জন করিয়া লোক তাহাতে উঠিয়া অন্য পক্ষের জাহাজের তলদেশের জাল কাটিবার জন্য গিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, টর্পেডো বিদারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ আত্মত্যাগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিতাধিক পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে, জাপান আজ শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। আমরা যদি এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারি, তবে আমাদের ভয় কি? শত কর্জ্জন, শত রিজ্‌লী আসিলেও, আমাদের ভবিষ্যতকে কেহ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। বিধাতার কৃপা এই দুর্দ্দিনে আমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক— আমরা তাঁহার কৃপাবলে বলীয়ান হইয়া অশেষ নির্য্যাতন, অত্যাচার যেন অম্লান বদনে সহ্য করিয়া মরিতে পারি;—এবং তাহার পর আমাদের ভাবীবংশ যেন মহামতি রিয়েঞ্জির ন্যায় কর্ত্তব্য-পথে অটল ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে। বিধাতার অব্যক্ত ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বিদায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যু উপলক্ষে।

জন্ম—২রা নভেম্বর ১৮৩৩ খ্রী, পাইকপাড়া, হাবড়া।
মৃত্যু—২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৪, মঙ্গলবার, কলিকাতা।

চলিলা লভিতে শান্তি দূরতর দেশে,
বিস্তারি কিরণজাল সুস্নিগ্ধ বিমল,
ভ্রান্তি অন্ধকার মাঝে বঙ্গের আকাশে
ছিলে যেই অচঞ্চল তারকা উজ্জ্বল।

প্রতিভা কবচ বক্ষে তুচ্ছি বৈরীদল
বিজ্ঞান বিমানোপরি তিষ্ঠি তেজোভরে,
জিনেছ কতই দুর্গ যুক্তি শাস্ত্র বলে
সত্যের পতাকা তুলি কর্ত্তব্য-সমরে।

সিঞ্চিয়া শান্তির বারি ব্যাধি-ক্লিষ্ট দেহে
অন্তরিত করিয়াছ কতই সন্তাপ,
উপেক্ষি অক্লান্ত মনে এই মর গেহে
শিক্ষা-অন্ধ মানবের নিষ্ফল প্রতাপ।
যাও তবে কর্ম্মবীর যথা অভিলাষ
হিংসার শাণিত অসি করি উপহাস।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

হেরড্ সাহেবের হাকিমী।

তিন পণ্ডিতে রক্ষা নাই, পাঁচ পণ্ডিতে গাধা।
রামা শ্যামা পলায়ে গেল, ধরা পড়্‌লো মাধা ॥

মাধবপুর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর একখানি পুরাতন গণ্ডগ্রাম। অনেক দিন ইহাতে এখানে একটী পুলীশ ষ্টেশন (থানা) আছে, সেই থানার দারোগার নাম মৌলবী এনায়েৎ হোসেন। মৌলবী সাহেব বয়সে বৃদ্ধ, পেন্সনের উপযুক্ত, কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া আরও কয়েক বৎসর ইহাঁকে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন, এজন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত দারোগা সাহেব থানার কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিতেছেন। তিনি সেকালের পাঠশালায় কিঞ্চিৎ উর্দ্দু ও পারস্য এবং বাঙ্গালা ভাষার পাঁচখানি পুস্তক আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। কেশবপুরের থানার এলাকা খুব বড়, এলাকায় অনেক গ্রাম, সুতরাং স্থানে স্থানে আউট পোষ্ট (ফাঁড়ি) আছে, একটা ফাঁড়ির নাম যাদবপুর। এই আউট পোষ্টের বৃদ্ধ ফাঁড়িদারের নাম মৌলবী রফিক্ হোসেন। ফাঁড়িদার সাহেব দারোগা সাহেবের প্রায় সমতুল্য পণ্ডিত কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য আরও কিছু কম। সাধারণ লোকে জানে, কেশবপুর থানার দারোগার, আর যাদবপুরের ফাঁড়িদারের তুল্য পণ্ডিত ইংরাজ রাজত্বের কোথাও আর নাই !! মৌলবীদ্বয়ও মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদের তুল্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর হইতেই পারে না, সুতরাং এখন বুঝা গেল, দুইটা নামজাদা বিদ্বান পুরুষ দুইটা থানাকে আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

ফাঁড়িদারেরা থানার দারোগার অধীন। ফাঁড়ির এলাকায় যাহা কিছু ঘটে, অথবা ঘটিবার উপক্রম হয়, দারোগার নিকটে তাহার যথারীতি রিপোর্ট পাঠাইতে হয়, সুতরাং যাদবপুর হইতে চৌকিদারেরা কেশবপুরের থানায় প্রায়ই রিপোর্ট লইয়া যাইত।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মকাল চলিয়া গেল; প্রবলভাবে বর্ষাঋতু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাদ্রের প্রথম ভাগে মুষলধারে দিন দিন অনবরত এবম্প্রকার বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল যে, যাদবপুর ফাঁড়ির নিকটবর্ত্তী সমুদয় গ্রাম প্রায় জলমগ্ন হইয়া গেল। নদ, নদী, ডোবা, পুকুর, দীঘী, খাল প্রভৃতি সমুদয়ই জলময় দেখা যাইতে লাগিল; যে-দিকে চাও, কেবল জল আর জল! লোকের পারাপার বন্ধ হইয়া গেল; গ্রামের লোকরা গ্রামাভ্যন্তর হইতে অন্য গ্রামে অথবা অন্য গ্রামের লোক এই গ্রামে আসিতে সাহসী হইল না। যাদবপুর গ্রামে একজন প্রাচীন জমিদার ছিল, তাহারা মুসলমান শাসনকাল হইতে "রাজা" উপাধিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক সম্বোধিত হইতেন। তাঁহাদের বাটীকে লোকে রাজবাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিত। জমিদারদিগের অবস্থা এখন ভাল নয়; জমিদারী ও তালুকদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; সামান্য আয়ে এখন তাঁহাদের দিনপাত হয়, কিন্তু সেকালের বড় বড় পুরাতন বাটীগুলা এখনও বর্ত্তমান আছে। অর্থাভাবে বহুকাল মেরামত না হওয়ায় বাটী সমূহের অবস্থা অতীব জঘন্য এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা বাটীর নাম "চণ্ডীমণ্ডপ"—এই বাটীতে এক সময়ে দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, প্রভৃতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। এখন তাহার কিছুই হয় না। যেটা খাস রাজবাটী, তাহারও অবস্থা অতি জঘন্য।

ক্রমাগতঃ বর্ষার জল পাইয়া, প্রকাশ্য

রাস্তার উপরিস্থিত চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজবাটীর অবস্থা ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, সে পথ দিয়া লোকে একেবারে যাতায়াত বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই ঐ দুইটা বাটীর ভূমিসাৎ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায়, প্রাণভয়ে সে পথদিয়া আর কেহই যাইতে সাহসী হইত না, অথচ সেই পথ প্রকাশ্য পথ এবং সে পথ দিয়া না গেলে লোকের বিশেষ কষ্টও হইত, সুতরাং গ্রামের লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া ফাঁড়িদার মহাশয়ের নিকটে আগমন পূর্ব্বক এজাহার দিল—"হজুর! রাজাদের চণ্ডীমণ্ডপ ও খাসবাটীর ভয়ে ঐ পথে পথিকের গমনাগমন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, অতএব ইহার একটা সত্বর প্রতীকার করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।" বৃদ্ধ ফাঁড়িদার এই বলিয়া এজাহারকারীদিগকে অভয় দিল যে, "আচ্ছা, তোমরা যাও, থানার দারোগা সাহেবকে রিপোর্ট করিয়া যাহা হুকুম প্রাপ্ত হইব, তাহা তোমাদিগকে যথা সময়ে অবগত করা যাইবে।"

যাদবপুরের ফাঁড়িদার মৌলবী রফিক হোসেন, তাঁহার রিপোর্টে বাঙ্গালা কথাগুলা "সাধুভাষায়" অর্থাৎ শুদ্ধভাষায় লিখিতে ভালবাসেন। রাইটার কনেষ্টবল সারদা হাজরাকে মৌলবী জিজ্ঞাসা করিল "ওহে হাজরা! বল দেখি, রাজবাটী শব্দটার খুব ভাল বাঙ্গালা কি?"

হাজরাজী কহিল "হজুর! রাজবাটীর সাধু বাঙ্গালা "রাজ পর্‌সাদ্‌।"

আফিমের নেশায় ফাঁড়িদারজী, কেশবপুরের থানায় যে রেপোর্ট লিখিয়া পাঠাইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। আমরা মৌলবী সাহেবের নিজের ভাষা কিছু কিছু রাখিয়া দিয়া রিপোর্ট খানি সংশোধন করিয়া দিলাম।

ফাঁড়িদারের রিপোর্ট।

গরিব নেওয়াজ মহামহিম কেশবপুর থানার হজুর দারোগা সাহেব আলা-এ হাকিম বাহাদুর বরাবরেষু—

লিখিতং গোলাম রফিক হোসেন ফাঁড়িদার, মোকাম যাদবপুর; বহুৎ বহুৎ সেলাম বাদে নিবেদন এই যে, অত্র থানার চারিদিকে বহু দুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জলমগ্ন হওয়ায় লোকের পারাপার বন্ধ হইয়াছে এবং এখানকার লোক অন্যস্থানে এবং অন্যস্থানের লোক এখানে আসিতে অক্ষম। এরূপ অবস্থায় এক শত লোক একত্র হইয়া বিদ্রোহী হইলে তাহার দমন হওয়া অসম্ভব। আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে, অন্যস্থান হইতে সিপাহী আসিয়া দেশ রক্ষা কবিতে সমর্থ হইবে না। খোদা তাল্লার কি মর্জ্জী আছে তাহা বুঁঝি না।

অধিকন্তু এই গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদের ভয়ে পথিকেরা পথ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে। সদর রাস্তায় অতি প্রবল ভাবে চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, লোকেরা প্রাণভয়ে সে দিক দিয়া যাইতে পারিতেছে না, দলে দলে লোক আসিয়া ফাঁড়িতে রিপোর্ট করিতেছে। এই হুলস্থুল ব্যাপারে চারিদিকেই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, এই উপদ্রব থামাইবার জন্য একটা আদ্‌মীও দেখা যাইতেছে না। অতি শীঘ্র শীঘ্র সদর জেলার বড় হুজুরদিগের নিকটে রিপোর্ট পাঠান বিশেষ দরকার। ফাঁড়িতে দুই এক জন মাত্র কনেষ্টবল আছে, তাহাদের দ্বারায় ইহা দমন হওয়া দুষ্কর, আর চৌকিদারেরা ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।"

বেলা চারিটার সময়ে একজন চৌকিদার যাদবপুরের ফাঁড়ি হইতে এই অদ্ভুত রিপোর্ট লইয়া কেশবপুর থানায় পৌঁছিল। থানার দারোগা (বৃদ্ধ মৌলবী) সাহেব, অপরাহ্ণ অতীত হইয়াছে দেখিয়া, আফিমের কৌটা খুলিয়া মাত্রা চড়াইলেন এবং অহিফেনের নেশায় রিরোর্টের পাঠ সমাপ্ত করতঃ, চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ মুদিত করিয়া ফুর্শীতে তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন "তোবা তোবা!! ঈদৃশী স্পর্দ্ধা! আমি বর্ত্তমান থাকিতে, আমার এলাকায়, এরূপ রাজবিদ্রোহ!" তদনন্তর আফিমের আর একটু

মাত্রা চড়াইয়া দারোগা সাহেব মাধবপুর জেলার ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমীপে স্বহস্তে রিপোর্ট লিখিয়া প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। সন্ধ্যার সময় ডাক রওয়ানা হয়, সুতরাং তাড়াতাড়ি রিপোর্ট সমাপ্ত করিতে মৌলবী সাহেব বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ অদ্ভুত রিপোর্ট এই—

দারোগার রিপোর্ট।

"মেহেরবাণ কদরদাণ পরবর্দ্দীগার হজুর-এ-আলা ডিশ্‌টেরাকট্ মাজিশ্‌টরট্ সাহেব বাহাদুর বরাবরেষু—

লিখিতং গোলাম এনায়ৎ হোসেন দারোগা কেশবপুর থানা, সেবকের নিবেদন এই যে, যাদবপুর ফাঁড়ির চারিদিকে বৃষ্টি ও বন্যা জন্য সর্ব্বত্র পাণি আর পাণি হইয়া গিয়াছে। লোকের পারাপার একেবারেই বন্ধ, এখানকার লোক অন্যস্থানে অথবা অন্যস্থানের লোক এখানে আসিতে একেবারেই অক্ষম। খোদা তাল্লা এমনই হাল পয়দা করিয়াছেন যে, এই দুর্দ্দিনে যদি ৫০ জন মাত্র দুষ্ট লোক আইসে, তাহা হইলে রাজ্য জয় করিয়া লইতে পারে। আমরা অতি সাবধানে রহিয়াছি, আর দিবা রাত্র হজুরকে স্মরণ করিতেছি ও খোদার নাম লইতেছি, পরন্তু খোদাতাল্লার অনুগ্রহে আর হজুরের নেক্ আশীর্ব্বাদে কিছু মাত্র ভয় নাই বরং খুব হিম্মত আছে, ইহা হজুর মালিক নিশ্চয় জানিবা।"

যাদবপুরের ফাঁড়িদারের ১৩৭ নং রিপোর্ট এবং ১২৮৬ নং রোজনামচায় প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদ্, ইহারা উভয়ে সদর রাস্তায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর পথিকেরা প্রাণভয়ে সে দিক দিয়া গমনাগমন করিতে পারিতেছে না এবং গ্রামের লোকেরা দলে দলে ফাঁড়িতে আসিয়া এজাহার দিতেছে ও কাতরোক্তি করিতেছে। ফাঁড়ী ও থানায় কয়েকজন মাত্র কনেষ্টবল আছে, তাহাদের দ্বারায় দমন হওয়া অসম্ভব। হজুর মালিক নিবেদন ইতি।"

দারোগার রিপোর্ট যথাসময়ে সদরে পৌঁছিল। জিলার মাজিষ্ট্রেট জনকট্ সাহেব মফস্বলে গিয়াছিলেন, সুতরাং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীমান হেরড্ সাহেব ডিস্‌ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট স্বরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। রিপোর্ট তাঁহারই হস্তগত হইল।

সিবিলসার্ব্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবক হেরড্ ভারতে পদার্পণ পূর্ব্বক কিছু কালের জন্য আসিসটাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন, তদনন্তর সুপারিশের জোরে অতি শীঘ্র শীঘ্র জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছেন। শুনা যায়, তিনি বাঙ্গালা ভাষার কয়েক খানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষায় একটু আধটু কথাবার্ত্তা করিতে অথবা চিঠিপত্র পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রিপোর্ট খুলিয়া তাহার এক চতুর্থাংশ পাঠ করিয়া অতি কষ্টে রিপোর্টের মর্ম্ম কোনও প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। পাঠ করিবার সময় "চণ্ডীমণ্ডপ"কে "চণ্ডীমণ্ডল" এইরূপ পাঠ করিলেন, তদনন্তর নাজিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নাজির! রাজপর্‌সাদ্ এরূপ নাম হিন্দুস্থানীয় বলিয়া কি বোধ হয় না এবং চণ্ডীমণ্ডল বোধ হয় বাঙ্গালীর নাম।" নাজির কহিল, হজুর, আপনি সত্য কহিয়াছেন, রাজপর্‌সাদ্ হিন্দুস্থানীয় এবং চণ্ডীমণ্ডল বাঙ্গালীর নাম, ইহা নিশ্চয়।" তাহার পর সেরেস্তাদারকে ওয়ারেণ্টের ফারম আনিতে আজ্ঞা করায় ফারম আনীত হইল. সাহেব বাহাদুর দারোগাকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন, "অবিলম্বে দুরাত্মা রাজ পর্‌সাদ্ ও চণ্ডীমণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর থানায় চালান দেও। ইহাদের পায়ে বেড়ী এবং হাতে হাতকড়ী লাগাইয়া অতি সাবধানে পাঠাইবা; সঙ্গে রীতিমত চৌকীদার ও কনেষ্টবলের পাহারার যেন অনুমাত্র ত্রুটি না হয়।"

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ দারোগা ভাবিল "কি আশ্চর্য্য! চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজবাটীকে কি গ্রেপ্তার করা যায়? শত সহস্র লোক একত্র হইলেও কি ইহাদিগকে মাধবপুরে পাঠান যাইতে পারে? - এমন

নির্ব্বোধ ও লক্ষ্মীছাড়া হাকিমের পাল্লায় আমি এই বুড়ো বয়সে নিতান্তই হয়্‌রাণ ও পরেশাণ হইতেছি।" যাহা হউক. সাহেব সমীপে দারোগা লিখিয়া পাঠাইল "হুজুর! চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদ্ নিতান্তই প্রবল, তাহারা রাস্তাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা অথবা সদরে চালান দেওয়া অসম্ভব। দুই শত চৌকিদার এক হইলেও ইহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করা যায় না; যেন কলিকাতার গড়ের মাঠের কেল্লা (দুর্গ)!! সুতরাং গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ফিরৎ পাঠাইতে বাধ্য হইলাম।" শ্রীমান হেরড্ সাহেবের নিকটে এই সমাচার উপস্থিত হইলে তিনি একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; কহিলেন "কি এতাদৃশী আস্পর্দ্ধা! এতদীর্ঘ কালের সুশাসনের পরে এবং এত সেনা ও সেনাপতি থাকিতে আবার রাজবিদ্রোহ—আবার Mutiny and massacre!!"

উচ্চ হতে উচ্চতর আমরা উঠিব,
মহান গৌরব গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ দেশে।
যাহে আমাদের নাম রহিবে সজীব,
কালাবর্ত্তে স্বদেশের ইতিহাসে শেষে॥

তৎক্ষণাৎ নগরের চারিদিকে এই মহা অশুভ সমাচার বনপোড়া আগুনের ন্যায় ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। পুলীসের অনেক লোকের অনেক দিন হইতে পদোন্নতি বা পুরস্কার হয় নাই, তাহারা এই সমাচার শ্রবণ করিয়া লম্ফ দিয়া গাহিল—

সাজরে সাজ সাজ সৈন্যগণ।
ভণ্ডবীরের দণ্ড দিতে বাধিবেক রণ॥

হেরড্ সাহেবের নিম্নবর্ত্তী আসিসটাণ্ট মাজিষ্ট্রেট অজাতশ্মশ্রু শ্রীবান জেম্‌স্ সাহেব, ইংরাজ মেম্‌দিগকে অভয় ও উৎসাহ দিতে আসিয়া কহিল—

মোরা রাজা সবাকার হেরি যা এখানে,
মোদের স্বত্ব বিরোধিতে নাহি কেহ আর।
আসমুদ্র ধরা কেন্দ্র করি মধ্য স্থানে,
মোরা রাজা জীবজন্তু বিহঙ্গ সবার॥

জেলার হুজুর মাজিষ্ট্রেট ও পুলীশ সাহেব মফস্বলে ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে রাজবিদ্রোহের সমাচার সেই দিনেই তারযোগে যথারীতি প্রেরিত হইল; আর শ্রীমান হেরড্ সাহেব স্বয়ং রাত্রিতে নিদ্রা কালে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তাঁহারই বীরত্বে সেনাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আনন্দে গাহিতেছে—

Rule Brittania rule the waves,
Britons shall never be slaves.

এদিকে মফস্বলে বসিয়া ডিস্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট জনকট্ সাহেব ও পুলীশ সাহেব, জমিদার প্রদত্ত ছাগ, পারাবত, কুক্কুট এবং হংস মাংস অংশ করিয়া ধ্বংস করিতেছিলেন, এমন সুখের সময়ে তারের খবর পৌঁছিয়া হরিষে বিষাদ উৎপন্ন করিল। টেলিগ্রাম পড়িয়াই বড় সাহেবের চক্ষু স্থির! বড় সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন—

I am the monarch of all I survey,
My right there is none to dispute.
From one end of the district to the other,
I am the Lord of the man and the brute.

যাহা হউক, জনকট্ সাহেব তাড়াতাড়ি পুলিশ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, সদরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আড়তদারেরা তাহাদের শস্যরাশি, মহাজনেরা তাহাদের টাকাকড়ি, জহুরীগণ তাহাদের স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, রত্ন এবং মাড়োয়াড়িরা তাহাদের দোকানের শাল, জামিয়ার ইত্যাদি লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কি জানি, কোন্ সময়ে, সহরটা বা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়!!

নগরে উপনীত হইয়াই, জনকট্ সাহেব (হেরড্ সাহেবের পরামর্শানুসারে এবং রাজবিধি মতে) পুলিশের ইনেস্‌পেক্টর জেনেরল সাহেব বাহাদুরের নিকটে ও ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের দপ্তরে রাজবিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ সহ তার পাঠাইলেন। পরদিবস ইংলিশম্যান, ডেলিনিউশ, ষ্টেট্‌শ্‌ম্যান, পাইওনিয়র প্রভৃতি ইংরাজী সমাচার পত্রে সুদীর্ঘ তাড়িত-বার্ত্তা প্রেরিত হইল। ছোটলাট সাহেব তাঁহার মিলিটরী সেক্রেটরির সহিত পরামর্শ করিয়া, বারাকপুর, দমদমা এবং কলিকাতার কেল্লায় লিখিয়া পাঠাইলেন "ফৌজ যেন রীতিমত প্রস্তুত থাকে, আবশ্যক হইলে যেন মুহূর্ত্ত

মধ্যে গতিশীল হইতে পারে।” সেনামহলে এই সমাচার প্রেরিত হইলে, সেনারা লম্ফ দিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল “যুদ্ধ জয় হইলেই আমি খুব লুঠিয়া লইব”, কেহ বলিল “Well, there are fair lots of women there—not like the Chanak old hags. I thank my stars, I shall pick up some of them for our queen-slaves’’. শ্রীমান বাউর্চ্চি ও ভিস্তি মিঞা মধুর হাস্য হাসিয়া কহিলেন “আল্‌হাম্‌দোলিল্লা! আল্লা চাহেতো এবারে মুই থোড়া বহুৎ দৌলৎ কামায়ে লবো, আর কর্জ্জার দায়ে হয়রাণ পরিশাণ হোতে হবে।” এদিকে নারিকেল তৈল ও সুর্কি সহযোগে তৈলঙ্গ সিপাহীরা তরবারী পরিষ্কার করিতে লাগিল; গোরাগণ বন্দুক লইয়া চাঁদমারির দিকে লক্ষ্য ঠিক করিতে গেল।

পুলীশ সাহেব বাঁশ কাটিতে হুকুম দিলেন। রাশি রাশি বাঁশের লাঠির দরকার! যাহাদের পুকুরের ধারে বাঁশ ছিল, তাহারা এবারে বেশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। স্কুল ও কলেজের ভারতোদ্ধারী ছেলেরা এই সকল কথা লোকমুখে শ্রবণ এবং সম্বাদ পত্রে পাঠ করিয়া বুঝিল, এবারে নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর উদ্ধার! এবারে নিশ্চয়ই বাঙ্গালায় আবার বাঙ্গালী রাজত্ব!! তাহারা যথা তথা গাহিতে লাগিল—

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মোল্লা, পথে চলিতে চলিতে “যুদ্ধে ইংরাজ হারিয়া গেলে, হিন্দু কিম্বা মুসলমান ইহাদের মধ্যে কে রাজা হইবে” এই চিন্তায় এমন আত্মবিস্মৃত ছিল যে, হঠাৎ একটা বৃহদাকার পাথরের আঘাত লাগিয়া রাস্তার ধারে একটা গভীর পুকুরের জলে পড়িয়া গেল। অদ্য পর্য্যন্ত তাহার মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এদিকে হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী ও সঞ্জীবনী সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের কার্য্যালয়ের নিকট দিয়া গুপ্তভাবে পুলিশের লোক দিবা রাত্রি বিচরণ করিতে লাগিল। “বেঙ্গলী’’ ও ‘‘অমৃত বাজার পত্রিকা’’র আফিস প্রায় খানাতল্লাশী হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মাধবপুর নগরে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইত, তাহার সম্পাদকের পর্ণকুটীরে দিনে ৫বার আর রাত্রে ৭বার পুলীশের লোক ঘুরাঘুরি করিত। শ্রীমান সম্পাদক বাবাজী কয়টা ব্যঞ্জন সহযোগে ভাত খায়, তাহার নাম পর্য্যন্ত লিখিয়া রিপোর্ট হইতে লাগিল।

এদিকে দুইশত চৌকিদার, একশত পুলিশ কনেষ্টবল, কয়েক জন হাওলদার, জমাদার, দারোগা, ইনেস্‌পেক্টর এবং জিলার বড় হুজুর (অর্থাৎ ডিঃ মাজিষ্ট্রেট জনকট্ সাহেব) জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট হেরড্ সাহেব এবং পুলীশ সাহেব, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বহুবিধ অস্ত্র শাস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্য, ঔষধাবলী, তাম্বু, পরিচ্ছদাদি সহ, যাদবপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুসলমান কনেষ্টবলগণ “আল্লা হো আকবর” এবং হিন্দু সিপাহীগণ “হর বম্ বম্’’ বলিয়া চাৎকার করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সেই গর্ভিণী-গর্ভ-বিদারণকারী শব্দরাশি মধ্যে প্রধান পুলীশ ইনেস্‌পেক্টর মহাশয় গম্ভীর স্বরে উৎসাহ দিতে দিতে গাহিতে লাগিলেন—

সাহসে চল, চল সৈন্যগণ।
ভণ্ড বীরের দণ্ড দিতে বাধিবেক রণ॥

যাহা হউক, অতিকষ্টে খাল, ডোবা, পুকুর, দিঘী, নদ, নদী, জলাশয় ইত্যাদি পার হইয়া বিক্রমী বীরগণ যাদবপুরে উপনীত হইলেন। জল পার হইতে জলের ন্যায় টাকা ব্যয় হইয়া গেল। ইতি পূর্ব্বেই কেশবপুরের দারোগা আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। সেনারা পৌঁছিলে, খট্ খট্ রবে তাম্বু খাটান হইল এবং হেরড্ সাহেব একখানা বাঙ্গালা বই খুলিয়া চুরট্ টানিতে টানিতে বঙ্গীয় বীর সেনাদিগের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় রে॥

বাউর্চ্চী, ভিস্তি, বেহারা এবং কুলীগণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, অবশেষে

নাপিত ও ধোবা আসিয়া কহিয়া গেল "হেরড্‌ সাহেব যেন মা সরস্বতী! ধন্য! ধন্য! এমন পণ্ডিত ত আর দেখি না; সাহেবের মুখে যেন খৈ ফুটে!"

গ্রামে মহা ভীষণ গোলযোগ শ্রবণ করিয়া এবং বহুসংখ্যক বংশ দণ্ডধারী কনেষ্টবলের আগমন দেখিয়া, গ্রামের লোকেরা গ্রামে বাঘ আসিয়াছে অথবা বন্য শুকরের উপদ্রব হইয়াছে ভাবিয়া, বড় বড় বাঁশের লাঠি ও তীর ধনু লইয়া তাম্বুর দিকে হৈ হৈ রবে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাহেবেরা তাহা দেখিয়া স্থির করিল "ইহা নিশ্চয়ই রাজবিদ্রোহ।" হেরড্‌ সাহেব কহিলেন "অত্র বিষয়ে সন্দেহ নাস্তিঃ।" কিন্তু বন্দুকের শব্দ শুনিয়া গ্রামের লোকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল; ইংরেজেরা ভাবিল "প্রথম উদ্যম শুভ ফলপ্রদ।"

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। রাত্রিতে চব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহারান্তে তাম্বুর ভিতরে সাহেবদিগের গোপনীয় সমর মন্ত্রণার কৌন্সাল বসিয়াছিল। আমরা সে সকল গোপন কথার কিছুই জানি না, তবে একথা শুনিয়াছি যে, সাহেবেরা নাকি বলিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে দুই একজন জমিদারকে খেতাব (উপাধি) দিবার বন্দোবস্ত করা হইবে, কারণ একজন জমিদার নাকি এমনই রাজভক্তি দেখাইতেছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "যতদিন পর্য্যন্ত আমি জয়লাভের সমাচার না পাইব, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে চা মধ্যে চিনি, মধ্যাহ্নে স্নানের সময় গাত্রে তৈল এবং রাত্রে পোলাও মধ্যে গরম মশালা ব্যবহার করিব না;" আর একজন মুসলমান তালুকদার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "যুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মোর্গা বা মুর্গি ভিন্ন অন্য মাংস আদৌ ব্যবহার করিবই না।"

রজনী প্রভাত হইলে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। পুলীস সাহেব চীৎকার করিয়া কহিলেন—

সাজরে সাজ সাজ সৈন্যগণ।
ভণ্ডবীরের দণ্ড দিয়া করিব নিধন।

ক্রমে মহাবীর জনকট্‌ সাহেব, ডিঃ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ সাহেব এবং হাকিমপ্রবর হেরড্‌ সাহেব দল বল লইয়া চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দারোগা ও ফাঁড়িদার, আফিমের মাত্রা চড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া মাজিষ্ট্রেট কহিলেন "দারোগা"! দারোগা কহিল "হুজুর"। সাহেব বলিলেন, "তুমি রাজপরসাদ ও চণ্ডীমণ্ডলের দুর্গ দেখাইয়া দাও।" অঙ্গুলী নিক্ষেপ করিয়া দারোগা কহিল "হুজুর! ঐ দেখুন চণ্ডীমণ্ডপ আর ঐ দেখুন রাজপ্রাসাদ।" সাহেব কহিল "দুর্গ (কেল্লা) কোথায়?" দারোগা কহিল "হুজুর! আপনি দুর্গা দুর্গা কহিতেছেন, এক সময়ে হাঁ দুর্গা পূজা হইত বটে, কিন্তু এখন কেবল ভিতরে লোক থাকে, পূজা হয় না।" সাহেব কহিল "লোককে ডাক"। তখন মৌলবী দারোগা এনায়ৎ আলি সেই বাটীর বৃদ্ধ জমিদারকে ডাকিতে গেল। বুড়ো জমিদার হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছিল, সাহেবেরা ডাকিতেছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দারোগার সঙ্গে আসিতে লাগিল। তাহার পায়ে চটিজুতা, গায়ে নামাবলী, মাথায় টিকি এবং গলায় হরিনামের মালা। সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জমিদার সেলাম করিলেন। সাহেব কহিলেন "Is this old hag the ringleader of the gang?" (এই বুড়া বদ্‌জাৎটা কি রাজবিদ্রোহীগণের সর্দ্দার?) বুড়ো কহিল "হুজুর! গ্রামে কেহ রাজবিদ্রোহী হয় নাই, এখানে কোনও বদ্‌মায়েস বাস করে না, সকলেই গবর্ণমেণ্ট বহাদুরের রাজভক্ত প্রজা। সরকার বাহাদুরের রাজ্য অক্ষয় হউক, আমাদের এই প্রার্থনা"। মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া দারোগা কহিল "হুজুর! ইনি খুব ভাল মানুষ, ইনি দস্যু বা বদমায়েস্‌ নহেন, ইনি সরকারের বন্ধু এবং অতি ধর্ম্মপরায়ণ লোক"। তখন সাহেবেরা দারোগাকে বলিল "তবে দস্যুবর কোথায়, আর তাহাদের দুর্গ কোন্‌ স্থানে অবস্থিত?" দারোগা কহিল

"হুজুর! এই বাটীরই নাম চণ্ডীমণ্ডপ, আর ঐ বাটীর নাম রাজবাটী ওরফে রাজপর্সাদ। বর্ষার জলে, রাস্তার উপরে এই পুরাতন বাটীদ্বয় প্রায় পতিতাবস্থায় আছে, এইজন্য প্রাণভয়ে পথিকেরা পথ দিয়া যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে।" হেরড্ সাহেব তখন বুঝিলেন প স্থানে ল পড়ায় এবং বাঙ্গালা রিপোর্টের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় এই বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব "It is a grand fun I see" কহিয়া হেরড্ সাহেবের দিকে তাকাইলেন, হেরড্ সাহেব লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া "It is a regular tempest in a teapot" কহিয়া পুলিশ সাহেবের দিকে তাকাইল। পুলিশ সাহেব "It is all the moonshine" বলিয়া ইনেস্পেক্টরের দিকে চাহিল, ইনেস্পেক্টর "A mountain of a molehill" বলিয়া দারোগার দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিল; দারোগা সাহেব আফিমের আবার মাত্রা চড়াইয়া "শোভান্ আল্লা" কহিয়া ফাঁড়িদারের দিকে কটাক্ষ করিল, বৃদ্ধ ফাঁড়িদার আকাশের দিকে তাকাইয়া "তোবা" "তোবা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইংরাজী-নবিশ নেটিব ডাক্তার চুপ্ চুপ্ কহিতে লাগিলেন "ভারতের টাকা যেন বে-ওয়ারীশ মাল। "Indian taxpayers' money gaes to the dogs."

মাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দারোগা! তোমার এমন নির্ব্বুদ্ধিতা কেন?" কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়ো দারোগা বলিল "হুজুর! আমি জানিতাম, আমি এবং আমার ফাঁড়িদার ও আমাদের পুলিশ সাহেব, এই তিন পণ্ডিতের মত বুঝি আর পণ্ডিত দুনিয়ায় নাই, কিন্তু হুজুর স্বয়ং এবং আপনার সহযোগী হেরড্ সাহেব যে আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর পণ্ডিত, তাহা জানিতাম না, এই টুকু অবশ্য আমার ভুল এবং নির্ব্বুদ্ধিতা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমাকেই ক্ষমা করুন; জেলের (ধীবরের) জালে ছোট ছোট মাছগুলা প্রায়ই ধরা পড়ে, বড় বড় মাছগুলা প্রায়ই ধরা দেয় না।" তখন আবার আকাশের দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ দারোগা অশ্রুপাতন করিতে করিতে কহিল—

তিন পণ্ডিতে রক্ষা নাই, পাঁচ পণ্ডিতে গাধা।
রামা শ্যামা পলায়ে গেল, ধরা পড়লো মাধা॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৫। বেলা—গীতিকাব্য, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, গরিবপুর। গিরিজানাথ বাবুর পরিমল পড়িয়া আমরা যেরূপ সুখী হইয়াছিলাম, এই বেলা পড়িয়াও সেইরূপ সুখী হইলাম। আজকালকার দিনের অনেক কবির লেখাই অস্পষ্টভাব যোজনায় দুষ্ট, তাহাতে শিল্প-চাতুর্য্য থাকিলেও ভাবের পরিচয় পাওয়া তত যায় না। বেলার কবি, যেমন শিল্পী, তেমনি ভাবুক। তাঁহার হৃদয়ে যে পবিত্রতা আছে, দয়া আছে—ভাব আছে, তাহা অপরূপ সৌন্দর্য্যে এই বেলায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। লেখা যেমন সরল, তেমনি সুমিষ্ট। একটু একটু পরিচয় দিতেছি।

পবিত্রতার পরিচয়—"নারী।"

"বিদ্রোহ-বিপ্লব মাঝে তুমি মুছাইয়া দেও—
শোণিতের লেখা!
স্বার্থের সংগ্রাম-মাঝে আত্ম বিসর্জ্জন ল'য়ে
তুমি দাও দেখা!
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে ধ্রুবতারা-সম তুমি
হও গো, উদয়!
বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে জীর্ণ মানবের কর্ণে
শুনাও অভয়।
তোমার করুণ নেত্র ভরি' উঠে পর দুঃখে,
চারু মুক্তা ঝরে!

তোমার হাসির ছটা আলো করে সৌভাগ্যের
উদয়-শিখরে !
তোমার প্রেমের উৎস মর্ত্ত্যের শ্মশান-ভূমে
বহে মন্দাকিনী !
তোমার স্নেহের নদী জেগে রহে মাতৃরূপা—
জগত-পালিনী !
যেথায় অপূর্ণ আশা, শিয়রে মরণ জাগে,
সুখে—অবসান !!
যেথা রবি, শশী ডুবে, সেথা তুমি বিধাতার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
দণ্ডে দণ্ডে যেথা নর— জীবন-সংগ্রামে যুঝি
করে আত্মক্ষয়,—
নাহি জানে অবসাদ,— সেথা তুমি বরহস্ত
দেবতা উদয় !
তোমার সৌন্দর্য্য-মাঝে— জন্ম লভিয়াছে প্রেম,
ঘুরে তোমা' ঘেরি'।
তোমার কোমল- কান্ত— অকলঙ্ক মুখে চাহি'
স্বর্গ-শোভা হেরি।
তোমার কল্যাণ-করে— শ্রীসম্পদ ভরি' উঠে,
তুমি তাই আন'।
তোমার অঞ্চলে বাঁধা— চঞ্চল মানব সুখ
তুমি নাহি জান' !
তুমি নারি, প্রেম-পুণ্যে— রও, বিরাজিত রও
সমুচ্চ আসনে !
দিবে পুষ্পাঞ্জলি কবি, বিজয়-মুকুট বীর,—
তোমার চরণে !

দয়ার পরিচয়—"ভিক্ষুক"

"তবে আর কাজ নাই, যেওনা'ক কোন ঠাঁই—
ভিক্ষা পাত্র টেনে ফেল, হে ভাই ভিক্ষুক।
আজি দৈন্য হোক্ শেষ—ঘুচুক সকল ক্লেশ
অমৃতে মণ্ডিয়া দিক্ তব ম্লান মুখ !"

ভাবের পরিচয়—"অভেদ"

"এক প্রলয়ের সাথে, বাঁধি দোঁহে হাতে হাতে
এক মিলনের মাঝে দোঁহার বিলয় !!
দৃষ্টি-স্থিতি চূর-চূর তারি মাঝে একসুর
দুজনে অভেদ—সেথা, একাকারময়।"

—"মৃত্যু"

"শত অত্যাচার—শত উৎপীড়ন মাঝে—
আছি অবিচল শুধু তোমারে চাহিয়া !
টুটেনিক ধৈর্য্য তাই, পড়ি নাই লাজে,
শত অস্ত্রাঘাতে বুক দিয়েছি পাতিয়া !
দিবে অবসর কবে পৃথিবীর কাজে,
ভাবিতেছি,—দিবে কবে নয়ন মুদিয়া।"

—"সন্ধ্যা-তারা"

"পূরবের রবি, শশী, পশ্চিমে ডুবিয়া যায়
নিবিয়া— নিবিয়া।
শুধু এক বিন্দু জ্যোতি—এক বিন্দু পুণ্য থাকে
অনন্তে ফুটিয়া।"

26. Gita and Gospel by Neil Alexander. গীতা এবং বাইবেলের সমালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, গীতা অপেক্ষা বাইবেল শ্রেষ্ঠ। লেখকের চিন্তাশক্তি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু উদারতা এবং নিরপেক্ষতার পরিচয় পাইলাম না।

২৭। ভারত-প্রদক্ষিণ। শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ১৲। নব্যভারতে এই পুস্তকের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই পাঠকগণ গ্রন্থকারের সরল লেখার পরিচয় পাইয়াছেন। অন্যান্য পত্রিকাতেও ইহার কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল; সমস্ত একত্রিত করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে, আশা করি।

২৮। সাধন-সঙ্গীত। শ্রীমুকুন্দ দাস বিরচিত, মূল্য ॥০। রাধাকৃষ্ণের সাধন বিষয়ক সঙ্গীত। এক শ্রেণীর লোকের নিকট এ পুস্তক বিশেষ রূপ আদৃত হইবে।

২৯। গাথা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত, মূল্য ।৶০ নবীন লেখকের লেখা। আমাদের বিবেচনায়, পুস্তকখানি এখন প্রকাশ না করিয়া আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অপেক্ষা করিলে লেখক নিজের দোষ নিজেই দেখিতে পাইতেন।

৩০। কাঙ্গাল-গীতা। শ্রীকাঙ্গাল কালিদাস প্রণীত, মূল্য ।০ লেখকের লেখা সরল এবং সরস।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (৮)

সর্ব্বভূতে মাতৃত্বের বিকাশ,—সর্ব্ব জীবের পরার্থ কর্ম্ম,—সর্ব্বত্র ত্যাগগ্রহণ কর্ম্ম,—প্রকৃতির মহাত্যাগ কর্ম্ম,—পরার্থ কর্ম্মে ক্ষতি ও দুঃখবোধ।

৫৭। এই মাতৃরূপা মহাপ্রকৃতির আশ্চর্য তত্ত্ব আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না সর্ব্বভূতে এই মহাপ্রকৃতির মাতৃরূপে অবস্থিতিতত্ত্ব আমরা সহজে বুঝিতে পারি না সর্ব্বজীবে জাতিরক্ষা বৃত্তিতে, সন্তানরক্ষা ও পালন প্রবৃত্তিতে আমরা এই মাতৃশক্তির মহাবিকাশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কেবল এই সন্তান পালন বৃত্তিতেই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। কেবল জাতিরক্ষা বৃত্তিতেও তাহা পর্য্যবসিত হয় না। সহানুভূতিবশে স্বজাতিরক্ষাবৃত্তিতে তাহা চরিতার্থ হয় না। সর্ব্বজীবরক্ষা ও পালনকর্ম্মে সেই মহামাতৃশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে; এই মাতৃশক্তিরূপা পরার্থবৃত্তি জ্ঞানপরিচালিত হউক, অথবা অজ্ঞানপরিচালিত হউক, সর্ব্বজীবে ইহার বিকাশ হইয়া থাকে। সর্ব্বজীব এই প্রকৃতির মাতৃশক্তির মোহে পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। এক জাতি অন্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম জ্ঞানকৃত হউক বা অজ্ঞানকৃত হউক, তাহাতেও এই মহামাতৃশক্তির বিকাশ দেখা যায়। শুধু জীব বলিয়া নহে—জড়ও পরার্থ কর্ম্ম করে। জগতে সর্ব্বত্রই সকলে প্রকৃতিবশে স্বার্থকর্ম্ম ও পরার্থকর্ম্ম করিতে বাধ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জড়ও সেই প্রকৃতিবশে আত্মত্যাগ করিয়া—জীবশরীর সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য আপনাকে অভিভূত করিয়া, নিজের নিজত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জড় জীব—সকলের মধ্যেই প্রকৃতি মাতৃরূপে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। জড়ের কথা এস্থলে কাজ নাই। সর্ব্বজীবই যে পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য, আমরা এ কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৫৮। এক জাতি অন্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্ম করে। প্রত্যেক জীব আত্মরক্ষা, স্বজাতিরক্ষা ও পরজাতিরক্ষার জন্য কর্ম্ম করে। প্রত্যেক জীব আত্মরক্ষার্থ ও পররক্ষার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক জীব সেই মহাশক্তি হইতে যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে, সেই শক্তিবলে সে আত্মরক্ষার্থ কর্ম্ম করে, এবং সেই কর্ম্ম করিয়া তাহার যে পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা সে পররক্ষার্থ কর্ম্ম করে। অথবা জীব প্রথমে নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অন্নরূপে প্রকৃতি হইতে শক্তি গ্রহণ করে। তাহার পর যখন তাহার বিকাশ কর্ম্ম একরূপ শেষ হইয়া আসে, তখন সে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পরার্থ দান করে। তখন জীব পরার্থ কর্ম্ম করে। ওই যে ওষধি বনস্পতি দেখিতেছ, ও প্রথমে সৌরতেজ সহায়ে ক্ষিতি অপ্‌ বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতে আপনার বিকাশোপযোগী উপকরণ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার

পর ঐ দেখ তাহারা ফলভরে অবনত হইয়াছে। সে ফল কিসের জন্য? উহা কি কেবল তাহার বংশরক্ষার জন্য—জাতিরক্ষার জন্য? তাহা নহে। তাহার জাতিরক্ষার জন্য যে পরিমাণ ফলের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা লক্ষ কি কোটী গুণ ফল সে প্রসব করিতেছে। কেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে! এ কি প্রকৃতির অপব্যয়! না অপরিণামদর্শিতা! প্রকৃতি কি, সেই বৃক্ষের বংশরক্ষার উপযোগী যে কয়টী ফলের প্রয়োজন, তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ বা অক্ষম বলিয়া তাহাকে এত অধিক ফল প্রসব করিবার শক্তি দিয়াছেন? তাহা কখন সম্ভব নহে। সে বৃক্ষের একটী ফলেরও ধ্বংস নাই—অযথা অপব্যয় নাই। তাহার জাতিরক্ষার জন্য যতগুলি ফলের প্রয়োজন, তাহা বাদে অবশিষ্ট সকল ফলই সে অন্য জাতীয় জীবের আহার জন্য অকাতরে দান করে। সকল ফলে সে বৃক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। তাহার জাতিরক্ষার জন্য সামান্য কয়েকটী ফলের আবশ্যক। আর অন্য জীব রক্ষার জন্য, অন্যজাতীয় জীবের আহার জন্য তাহার অধিকাংশ ফলের প্রয়োজন।(১) ওই যে ধানের গাছ অসংখ্য ধান্য উৎপাদন করিয়া মরিয়া যাইতেছে, উহার মধ্যে কয়টী ফল তাহার নিজের প্রয়োজন? কয়টী তাহার জাতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন? তাহার অধিকাংশই আমাদের খাদ্য—অন্যজীবের খাদ্য। আমাদের আহার যোগাইতেই ত সে এত ধান্য উৎপাদন করে? শস্যজীবী জীবের খাদ্য উৎপাদন জন্য যে কত উদ্ভিদ্ কত ফল উৎপাদন করে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে?

উদ্ভিদের কথা ছাড়িয়া দাও। সকল জীব সম্বন্ধেই এই কথা। ঐ যে মৎস্য প্রভৃতি জীব অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে,তাহার মধ্যে কয়টী দ্বারা তাহার বংশ রক্ষা হয়? তাহার অধিকাংশই ত অন্য জীবের আহার! এক জাতীয় জীব—অন্য জাতীয় জীবের আহার। জীব জীবের ভোজ্য। (১) নিম্ন জাতীয় জীব উচ্চতর জীবের অন্নের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে। সামান্য amæba, protoplasm প্রভৃতি জীবাণু ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে সমুদায়ই জীব। সমুদায় জীবশ্রেণী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। স্থাবর জঙ্গম—সর্ব্বত্র এই নিয়ম। সর্ব্বত্র জীবজগৎ—অন্ধ হইয়া সেই মহাপ্রকৃতির মহাশক্তিবলে—এক দিকে নিজের রক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, অন্যদিকে পরকে রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। (২) এক দিকে আত্মরক্ষা, আর

---

(১) উদ্ভিদ ব্যতীত প্রাণীর আহার জন্য অন্ন কেহ সংগ্রহ করিতে পারে না। উদ্ভিদ্ই অন্য জীবের জন্য সংগ্রহ করে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। মাংসাশী জীব যে মাংস-অন্নরূপে গ্রহণ করে, সে মাংসও—উদ্ভিদ্খাদ্যে পরিপুষ্ট। অতএব মূলত উদ্ভিদ্ই জঙ্গম জীবের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইহা আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(১) "প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনং॥
চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥"
মনুসংহিতা,—৫। ২৮, ২৯।

(২) মৃত্যুর পরেও বুঝি আমাদের অব্যাহতি নাই। মৃত্যুর পর শুধু আমাদের স্থূলশরীর জড় ও জীবের ভক্ষ্য হয় না,—আমাদের সূক্ষ্ম শরীরও উচ্চতর জীবের ভক্ষ্য হয়। কোন শ্রুতিতে পাইয়াছি যে, মৃত্যুর পর যে মানুষ পিতৃলোকে বা দেবলোকে গমন করিতে পায়, সে সেই লোকের পিতৃদেব বা দেবতাদের আহার হয়।

একদিকে আত্ম ত্যাগ। একদিকে স্বার্থকর্ম্ম, আর এক দিকে পরার্থকর্ম্ম। জীব স্বার্থকর্ম্ম করে—পরার্থকর্ম্ম করিবে বলিয়া আত্মরক্ষা করে—পরকে রক্ষা করিবে বলিয়া। সকল জীবই এই মহাপ্রকৃতির মাতৃশক্তি বশে বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়,—অজ্ঞানবশে অন্ধ শক্তিবলে পরার্থ কর্ম্মে চালিত হয়। সকল জীবই সেই মহাপ্রকৃতি বলে—প্রয়োজন হইলে আত্ম বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য। প্রত্যেক ‘এক’ তৎসংসৃষ্ট প্রত্যেক ‘অন্যের’ জন্য নিয়ত কর্ম্ম করিতে—আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য। আত্মবিসর্জ্জনে পরার্থকর্ম্মের পূর্ণত্ব। প্রত্যেক জীব প্রয়োজন হইলে পরার্থ আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য।

৫৯। জগতে এক মহাচক্র নিয়ত চলিতেছে। নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম জীব পর্য্যন্ত সকলে কি এক মহা বন্ধনে আবদ্ধ। কি এক মহা সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ‘একের’ অভাবে ‘অন্যের’ চলে না। এই বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে একের তিরোভাবে তৎসংসৃষ্ট অন্যের ক্ষতি হয়। আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সকল সময়ে আমরা সে ক্ষতির কথা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সমস্ত জীবজগৎ এক মহাসূত্রে আবদ্ধ। সমস্ত জাতীয় জীব এইরূপে এক মহাবিরাট সমাজের অঙ্গীভূত। কেবল সমগ্র মানুষ ধরিয়া এক বিরাট মানব সমাজের ধারণা বুঝি যথেষ্ট নহে। সমস্ত জাতীয় জীব মিলিয়া এক মহা সমাজ। (১) বুঝি সমস্ত জড় জীব মিলিয়া এক মহা সমাজ। ঐ দেখ জড়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরে আদান প্রদান দ্বারা জড়জগতের ক্রমবিবর্ত্তন হইতেছে। ঐ দেখ উদ্ভিদ্ জড় হইতে আপন শরীরগঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। ঐ দেখ জীব মাত্রে জল বায়ু তাপ তড়িৎ প্রভৃতি স্থূল ভূত ও শক্তি হইতে, আপনার শরীরগঠনোযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে—আপনার কর্ম্মশক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আবার ঐ যে জীব জড় হইতে আপনার উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, তাহা কোন না কোন ভাবে জড়কে

এই অন্নতত্ত্ব ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে স্থানে স্থানে যেরূপ বিশদ ও সুন্দর রূপে বুঝান আছে, এমন বুঝি আর কোথাও নাই। সে অন্নতত্ত্ব এখানে আলোচ্য নহে। অন্ন—ব্রহ্ম। অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি হয়, অন্ন হইতে প্রাণ রক্ষা হয়। আমরা যেমন একদিকে অত্তা তেমনই আর একদিকে অন্ন। জীব মাত্রেই এক অবস্থায় অত্তা আর এক অবস্থায় অন্ন। আমরা শুধু অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হই না—আমরা অন্ন হইতেই জন্ম গ্রহণ করি। আমাদের প্রাণময় সূক্ষ্ম শরীর যে অন্ন মধ্যে থাকে, সেই অন্ন আমাদের পিতা গ্রহণ করিলে তাহা রেতঃ রূপে পরিণত হয়, তাহা হইতেই আমাদের জন্ম হয়। সর্ব্বজীব সম্বন্ধে এই নিয়ম। যাহা হউক, এই সকল গুরুতর বিষয় এ স্থলে উল্লেখের বা আলোচনার প্রয়োজন নাই।

(১) কোন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন,—

“So there is in a certain sense, not only a universal brotherhood of man, although few recognise even this fact, but there is likewise a greater brotherhood, which includes not only man, civilzed man, savage man, Christian man, heathen man,—all men,—but likewise man’s four footed relatives, into whose nostrils, as well as into man’s, God breathed the breath of life, thereby making each a living soul.”

“There is a fraternity more comprehensive and universal than the brotherhood of man. Let us think and speak of the brotherhood of being.”

J. H. Kellogg’s—“Shall we Slay to Eat?”

প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। ঐ যে উদ্ভিদ্ সৌরতেজবলে ভূবায়ু হইতে অম্লজান বায়ু আকর্ষণ করিয়া, তাঁহা হইতে অঙ্গার পৃথক্ করিয়া লইয়া, নিজের শরীর পোষণ করিতেছে, এবং সেই শরীর দ্বারা বা ফল উৎপাদন করিয়া অপর জীবের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেছে, সেই উদ্ভিদ্কেই আবার মানুষ প্রভৃতি জঙ্গম জীব প্রশ্বাস দ্বারা অম্লজান বায়ু ত্যাগ করিয়া আহার দান করিতেছে। এই যে উচ্চজাতীয় জীব নিম্নজাতীয় জীবশরীরকে খাদ্যরূপ গ্রহণ করিতেছে, সেই উচ্চজাতীয় জীবশরীরই আবার নিম্নজাতীয় জীবের আহার হইতেছে,—নিম্নজাতীয় জীবশরীরের উপকরণ দিতেছে। এই মানুষের শরীরই যে কত কৃমি কীট কত জীবাণুর (germs) আহার—কত জীবাণুর আবাসভূমি—তাহা কে সংখ্যা করিতে পারে? সর্ব্বত্র সেই এক নিয়ম। এক জীব একদিকে একরূপে যাহা গ্রহণ করিতেছে,—অন্য জীবকে তাহা আর একদিকে আর একরূপে দান করিতে বাধ্য হইতেছে। একদিকে এক জীব পরকে তাহার জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিতেছে--পর হইতে গ্রহণ করিয়া নিজে রক্ষিত ও পোষিত হইতেছে—এমন কি নিজের খাদ্যের জন্য পরকে পূর্ণ আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য করিতেছে,—আর একদিকে আর একরূপে সে, স্বেচ্ছায় হউক বা বাধ্য হইয়া হউক, পরার্থ কর্ম্ম করিতেছে—পরকে রক্ষা ও পোষণ করিতেছে—পরের জন্য আত্মত্যাগ করিতেছে,—এমন কি পরের খাদ্যরূপে নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে। আবার যে তাহার জীবন গ্রহণ করিতেছে, সেও আর একদিকে আর এক জীবের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। সর্ব্বত্র এই নিয়ম। সর্ব্বত্র ত্যাগ গ্রহণ। একদিকে আয় বা সঞ্চয়, আর একদিকে ব্যয় বা ক্ষয়। একদিকে যোগ, আর একদিকে বিয়োগ। একদিকে আবির্ভাব, আর একদিকে তিরোভাব। একদিকে (+), আর একদিকে (−)। একদিকে হরণ, আর এক দিকে পূরণ। একদিকে সঙ্কলন, আর একদিকে ব্যবকলন। একদিকে অভাব, আর একদিকে ভাব। একদিকে ঘাত, আর একদিকে প্রতিঘাত। ইহাই জগতের মহাচক্র। ইহাই এ জগতের মহানিয়ম।(১) এই নিয়মবশে প্রত্যেক জীব নিজের

(১) জগতের এই মহানিয়ম—মহাপ্রকৃতির এই মহাকর্ম্মতত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক হইতে বহু ও বহু হইতে এক—ইহাই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিয়ম—জগতের ক্রমবিকাশ নিয়ম। অবিশেষ হইতে বিশেষের বিকাশ, ও বিশেষের অবিশেষে পরিণতি,—ইহাই মহাবিবর্ত্তনবাদ। জগৎ সৃষ্টি কল্পে—ভূমা 'এক' হইতে অনন্ত 'অণু' একের (units) বিকাশ, ও সেই অনন্ত অণু 'এক' ক্রমে সম্মিলিত হইয়া সেই ভূমা একের দিকে ক্রমশঃ গতি--ইহাই মূল জগৎতত্ত্ব। এইরূপে জগৎ ব্যাকৃত হইলে, সেই অণু 'একের' পরস্পর সঙ্কলন ব্যবকলন হইতে জগতের ক্রমপরিণতি হয়। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে—'এক' (unit) বিন্দুর সঙ্কলন হইতে স্থান বা দিক্। 'এক' ক্ষণের সঙ্কলন হইতে কাল। এক পরমাণুর সঙ্কলন হইতে জড় জগৎ। ব্যষ্টি 'এক' জীবাণুর সঙ্কলন হইতে জীবজগৎ। মহাকালবশে এই মহাসঙ্কলন দ্বারা জগৎ ব্যাকৃত হইলে, ব্যষ্টি সঙ্কলন ব্যবকলন দ্বারা জগৎ ক্রমবিবর্ত্তিত হয়। জড়জীব জগতে সর্ব্বত্র কালের এই সঙ্কলন ব্যবকলনের নিত্য লীলা। এই যোগবিয়োগ ক্রিয়ার সমাহারে জগতের স্থায়িত্ব—নিত্যত্ব। সমস্ত জগৎ এক মহা যোগবিয়োগের এক আশ্চর্য্য আদান প্রদানের কর্ম্মক্ষেত্র। অথবা (আধুনিক গণিত-

জন্য কর্ম্ম করিয়া যাহা গ্রহণ করে, পরের জন্য অন্য ভাবে তাহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এ নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই—ইহাতে কোথাও পক্ষপাতিতা নাই,—ইহা হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই,—ইহা হইতে কাহারও নিস্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

৬০। এইরূপে জগতে সর্ব্বত্র ত্যাগ-গ্রহণ বা যোগবিয়োগের লীলা—বিকাশ-বিনাশের লীলা চলিতে থাকে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে সর্ব্বত্র এই ত্যাগগ্রহণের লীলা। সমষ্টিভাবে সেই মহাশক্তির মহা ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি বিকাশ পরিণতি হয়। কিন্তু সেই মহা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে সে অনন্ত অবিনাশী শক্তির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সে মহা শক্তিভাণ্ডার অক্ষয়। সেই শক্তির স্বরূপ অবস্থায় বা ব্রহ্মে লীন অবস্থায় যখন জগৎ থাকে না, তখন সে শক্তি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যখন সেই মহাশক্তি জগৎকে ব্যক্ত বা বিকাশ করেন, জগৎকে সৎ-রূপে পরিণত করেন, তখন সে শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সাম্যাবস্থা বা শান্ত অবস্থা পরিত্যাগ করেন, নিজের স্বভাব বা শান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন। তখন সে মহাশক্তি বিরাম অবস্থা হইতে কার্য্যাবস্থায় কর্ম্মরূপে বা প্রকৃতিরূপে পরিণত হন, ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে ব্যষ্টিভাবে জড়-জীবরূপে বহু কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া—পূর্ব্ব লীন সৃষ্টির সঞ্চিত কর্ম্মবীজকে বিকাশিত করেন, এবং সমষ্টিভাবে নিয়ন্ত্রীরূপে কর্ম্ম করাইয়া তাহাদিগকে ক্রমপরিণত করেন। সেই মহাত্যাগ অবস্থায় সেই মহাশক্তি নিয়ত কর্ম্মশীল হওয়ায়, পূর্ব্ব কর্ম্মবীজ বিকাশিত হইয়া কর্ম্ম সঞ্চিত (accumulated) হইতে থাকে। এবং সেই কর্ম্মের ক্রমসঞ্চয়ে জগতের ক্রম-পরিণতি হয়। আর সেই শক্তির নিয়ত ক্রিয়ায় জগৎ ক্রমবর্দ্ধিত (accelerated) বেগে পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব সেই ব্রাহ্মশক্তিই অপরা জড়প্রকৃতি রূপে ও পরা জীবপ্রকৃতি রূপে এবং সেই ব্যষ্টি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রী রূপে নিয়ত কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে জগতের ক্রমবিকাশ করেন। সেই মহাশক্তির মহাত্যাগ হইতে যে জড়জীবপ্রকৃতি রূপ জগতের বিকাশ হয়, সেই জড়জীবপ্রকৃতিও সেই শক্তিবলে সেই শক্তির নিয়ন্তৃত্বে ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মের দ্বারা ক্রমপরিণত হইতে থাকে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের জগৎ ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের জগতের মধ্যে যে প্রভেদ—তাহা যে এই মহাশক্তির এই কর্ম্ম-জনিত—তাহা যে এই ব্যষ্টি জড়জীব সমূহের এই মহাশক্তি-নিয়মিত ত্যাগগ্রহণ কর্ম্ম হেতু পরিবর্ত্তন জনিত—ও সেই কর্ম্মফল সঞ্চয় হেতু উন্নতি জনিত—তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

[আমরা এস্থলে কেবল জগতের বিকাশতত্ত্বই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। জগতের সৃষ্টি লয় তত্ত্ব আমাদের বুঝিবার এখানে আবশ্যক নাই। তবে এই মাত্র বুঝা আবশ্যক যে, সৃষ্টি অবস্থায় সমষ্টিভাবে জগতের ক্রমোন্নতি হইলেও ব্যষ্টিভাবে এই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্ম জন্য কোথাও ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক উন্নতি, কোথাও বা অবনতি হইয়া থাকে। যেখানে শক্তিসঞ্চয় কর্ম্ম-

---

বিজ্ঞানের কথায়) এ জগৎ—is a function—a materialised or objectified process of the Integral and Differential calculus। এ-কঠিন দার্শনিকতত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।

সঞ্চয়, যেখানে শক্তি সক্রিয়—সেখানে উন্নতি বা বিকাশের দিকে গতি হয়। আর সেখানে শক্তি ক্ষয়, কর্ম্মব্যয়, যেখানে শক্তি অভিভূত,—সেখানে অবনতি বা বিনাশের দিকে গতি হয়। যেখানে এক অবস্থায় বা এক সময় উন্নতি বা বিকাশ, সেখানে আর এক অবস্থায় বা আর এক সময় অবনতি বা বিনাশ। আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কথায়,—যেখানে প্রকৃতির রজঃ বা কার্য্যশক্তি প্রকাশাত্মক সত্ত্বশক্তি পরিচালিত—সেখানে উন্নতি, আর যেখানে তমঃ বা আবরণশক্তি পরিচালিত, সেখানে অবনতি। সেই মহাশক্তির রজোরূপ কর্ম্মাবস্থায়—একদিকে সত্ত্ব আর একদিকে তমঃ, একদিকে জ্ঞান আর একদিকে অজ্ঞান, একদিকে সূর্য্য আর একদিকে সোম, একদিকে অগ্নি আর একদিকে শৈত্য, একদিকে শক্তির পূর্ণপ্রকাশ বা কর্ম্মের মূলরূপ, আর একদিকে শক্তির অভিভূত বা নিবৃত্তি বা অপ্রকাশ অবস্থা, (অথবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথায়—একদিকে highest potential, highest source of energy—আর একদিকে zero potential, absolute zero of temperature)। সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল রজোরূপা কার্য্যজগৎ আকর্ষণবিক্ষেপাত্মক বা রাগদ্বেষাত্মক মহা সংকর্ষণ শক্তিবলে ব্যষ্টি বিকাশবিনাশ, উন্নতিঅবনতি যোগবিয়োগ রূপ কর্ম্ম মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে এই উন্নতি অবনতি রূপ 'এজগৎ' অনুকম্পন বা তরঙ্গ তুলিয়া ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সমুদয় জগৎ সেই মহাপ্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি অবস্থার মধ্যে নিয়ত গতাগতি করে। যদি কখন সেই প্রকৃতির পূর্ণনিবৃত্তি বা নিক্রিয় অবস্থা হয়, তখন সত্ত্বশক্তি নিদ্রিত হয়, সমুদয় সঞ্চিত কর্ম্ম আবার সংস্কার বা বীজঅবস্থায় (Potential state) তমোঅভিভূত হইয়া সেই মহাশক্তিতেই বিলীন হয়। আবার ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে সেই মহাব্রহ্মশক্তি সক্রিয় হইলে, সত্ত্বশক্তি জাগরিত হইলে, আবার সেই সংস্কাররূপে পূর্ব্ব সৃষ্টির সঞ্চিত কর্ম্ম,—বীজ বা শক্তিঅবস্থা হইতে বিকাশিত বা কার্য্যঅবস্থায় পরিণত হইতে থাকে। আবার সেই সঞ্চিত কর্ম্মবীজ বা অনাদি বাসনাবীজ হইতে সেই মহাশক্তির মহাত্যাগ হেতু জগতের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বাহ্যআন্তর জগৎ, স্থূলসূক্ষ্ম জগৎ, ব্যক্তঅব্যক্ত জগৎ—সর্ব্বত্র এই এক নিয়ম। এই ত্রিগুণতত্ত্ব, এই মহাসৃষ্টিলয়তত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।]

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের বিকাশ অবস্থায় সেই পরমা বৈষ্ণবী শক্তি নিয়ত কর্ম্মশীল হইয়া, কর্ম্মরূপে আপনার স্বরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া, জড়জীবময় ব্যষ্টি জগৎকে আপনার শক্তি দান করিয়া এবং সেই শক্তিবলে জড়জীবকে নিয়ত ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম করাইয়া সেই কর্ম্ম ক্রমসঞ্চয়ের দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতি করেন। ইহা হইতে আমরা প্রকৃতির মাতৃশক্তির কথা বুঝিতে পারি। মা নিয়তকর্ম্মশীল হইয়া সন্তানকে পালন করেন রক্ষা করেন, সন্তানকে উন্নতির দিকে লইয়া যান, এবং সেইজন্য আপনার শক্তি সন্তানে দান করেন, এবং প্রয়োজন হইলে সন্তানের জন্য আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সেইরূপে সেই জগন্ময়ী মহাশক্তিও মাতার ন্যায় আপন শক্তি এই জড়জীবময় জগৎকে দান করেন। একদিকে আপনি জগৎরূপিণী হন, আর একদিকে জগৎকে পালন

ও রক্ষা করেন। আর সেই শক্তি লইয়া সেই শক্তির নিয়ন্তৃত্বে নিয়ত কার্য্যশীল হইয়া জীব ক্রমশঃ উন্নতির দিকে, পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃতি জীবের উন্নতির জন্য ও পরিণতির জন্যই বাধ্য করিয়া জীবকে প্রথম হইতেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মে—স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তাহাতে সেই মহাপ্রকৃতি জীবের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রক্ষা করেন না—সাময়িক উন্নতি অবনতির দিকে লক্ষ্য করেন না,—সমষ্টিভাবে সর্ব্বজীবের শেষ উন্নতি শেষ পরিণতির দিকে মহালক্ষ্য করিয়া জীবকে কর্ম্মে রত করেন।

৬১। অতএব যে মহাশক্তি এই মহাত্যাগ কর্ম্ম দ্বারা জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি করেন, যিনি তাঁহার স্বরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা—ব্রহ্মে বিরাম অবস্থা ত্যাগ করিয়া সক্রিয় হইয়া কর্ম্মরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করেন,—জগতে কর্ম্মরূপে ক্রমসঞ্চিত হইয়া তাঁহার কালশক্তিবলে জগৎকে ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে ক্রমপরিণত করেন, যিনি জড়জীব প্রকৃতিরূপে বিকাশিত হইয়া জড়জীবকে নিজের কর্ম্মশক্তি দান করিয়া জড়জীবকে সেই শক্তিবলে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, তিনিই প্রত্যেক জড়জীবকে স্বার্থ কর্ম্মের সহিত পরার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, মহা সঙ্কর্ষণ শক্তিবলে আকর্ষণ বিক্ষেপ ক্রিয়া দ্বারা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে বা স্বার্থপরার্থ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। এইজন্য জড়জগতে সর্ব্বত্র ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম,—জীবজগতে সর্ব্বত্র ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম।

[এই জন্য জড়জীবময় সমুদয় জগৎ এক অনন্ত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ—কর্ম্ম-সূত্রে সেই মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। সেই কর্ম্মসূত্র দ্বারা প্রত্যেক 'এক' প্রত্যেক 'অন্যের' সহিত সম্বদ্ধ। প্রত্যেক কর্ম্মেই একের সহিত অন্যের সংস্রব থাকে। আর শুধু 'একের' সহিত অন্যের সম্বন্ধ ধরিলে বুঝি যথেষ্ট হয় না। সমুদয় জগৎ যে মহা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃত কর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। সে মহা কর্ম্মসূত্রের ধারণা হয় না। প্রত্যেক 'এক' যে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্মে তৎসংসৃষ্ট সমুদয় অন্যের সম্বন্ধ থাকে—সমুদয় জগতের সম্বন্ধ থাকে। 'এক' যে কর্ম্ম করে, তাহাতে সমুদয় 'অন্যের অল্পাধিক পরিমাণে আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হয়। এ'কের' প্রত্যেক কর্ম্মে 'অন্য'কে আঘাত করে, আর সেই 'এক'কে প্রতিঘাত করে। আর সেই ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ বুঝি সমুদয় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ যে সুদূর সৌরদেহে তাপ তাড়িত আলোক তরঙ্গ নিয়ত উত্থিত হইতেছে, সে তরঙ্গ আকাশ পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া প্রতিঘাত করিতেছে। তাই আমরা তাপ আলোক পাইয়া জীবিত রহিয়াছি। ঐ যে সৌর দেহে সময়ে সময়ে তাড়িত বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতিঘাতফলে এ পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সূর্য্য ত পৃথিবী হইতে কিঞ্চিদধিক যোজন কোটী ক্রোশ পথ মাত্র দূরে অবস্থিত। যে সকল নক্ষত্র এখান হইতে পরার্দ্ধ কোটী যোজন পথ দূরে রহিয়াছে, তাহারও আলোক তরঙ্গ—এ অনন্ত স্থান ব্যবধান উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর তটে আসিয়া প্রতিঘাত করিতেছে। গ্রহে উপগ্রহে সূর্য্যে সুদূর নক্ষত্রে যেখানে যখন যে শক্তিক্রিয়া হইতেছে, এ পৃথিবীতে সে ক্রি-

ঘার প্রতিক্রিয়া হইতেছে, তাহাতে এ পৃথিবীর অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহা পৃথিবীর প্রত্যেক জড়জীবকে আঘাত করিতেছে। সে আঘাত ফলে সর্ব্বত্র যোগবিয়োগ কর্ম্ম, ত্যাগগ্রহণ কর্ম্ম, আকর্ষণবিক্ষেপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে,—জগতে সর্ব্বত্র অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। সে কর্ম্মশক্তি যত অধিক হয়, ক্রিয়ার বল যত অধিক হয়, এই ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ তত বেগবতী—তত সুদূরপ্রসারী হয়। তত আমরা সে ক্রিয়ার ব্যাপকতা বুঝিতে পারি। কিন্তু যেখানে শক্তিক্রিয়া সামান্য, যেখানে ফল সামান্য, সেখানে তাহার ব্যাপকতা আমাদের ধারণা হয় না। গণিতবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে, আমি একখণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া যে মনে করি যে, উহার গতি রুদ্ধ হইলেই উহার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে,—তাহা বাস্তবিক পক্ষে সত্য নহে। সে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া মহা আকর্ষণ শক্তিবলে পৃথিবীকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। কেন্দ্রচ্যুত পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য—সমুদয় সৌরজগৎকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। সৌরজগৎ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া প্রত্যেক নাক্ষত্র-জগৎকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। অবশ্য সে কেন্দ্রচ্যুতি এত সামান্য যে, আমরা তাহার পরিমাণ করিতে পারি না—তাহার ক্ষুদ্রত্ব ধারণা করিতে পারি না। যেমন অতি বৃহতের ধারণা হয় না,—তেমনই অতি ক্ষুদ্রেরও ধারণা হয় না। যেমন মহানের ধারণা হয় না, তেমনি বিন্দুর ধারণা হয় না। (১) তাহা না হউক, আমার ঐ ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপে যে সমুদয় সৌর নাক্ষত্র জগতের কেন্দ্রচ্যুতি হয়, তাহা গণিতবিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য।

ইহা জড় জগতের কথা। জড়জীবের সকল কর্ম্মে—আমাদের কায়িক বাচনিক মানসিক সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই এই কথা। চিন্তা জগতের—ভাব জগতেরও এই কথা। আমরা যে কোন চিন্তা করি, যে কোন কথা বলি, তাহার ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দতরঙ্গ তাহার সূক্ষ্ম শক্তিতরঙ্গ সূক্ষ্ম ভাব জগতে থাকিয়া যায়, তাহা বুঝি জগতের সর্ব্বত্র ঘাত প্রতিঘাত করিতে থাকে, তাহা বুঝি হিরণ্যগর্ভে গিয়া মিশাইয়া যায়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার অন্তরের নিভৃত কক্ষের একটী সামান্য চিন্তা যে এমন করিয়া সমস্ত জগৎকে আলোড়িত করিতে পারে, সমস্ত ভাব জগতে যে ধীরে ধীরে ক্রিয়া করিতে পারে, অথবা আমার সামান্য বলে একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপে সমস্ত জগৎ যে বিচলিত হইতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। জগতে প্রত্যেকের প্রতি কর্ম্মে

---

(১) বিন্দুর ধারণা হয় না। এইজন্য ব্রহ্মকে অনন্ত ও বিন্দু বলে। আমরা যত ক্ষুদ্র অণুর ধারণা করি না কেন—অণুবীক্ষণে তাহাই কত বৃহৎ দেখায়। যে সামান্য কীটাণুকে ভাল অনুবীক্ষণেও স্পষ্ট দেখা যায় না, তাহারও শরীরে কত যন্ত্র, তাহারও শরীরসৃষ্টিকৌশল কত অদ্ভুত, তাহারও শরীরের পরমাণু সংখ্যা কত অধিক। বহু নহে—এমন এককে স্পষ্ট ধারণা করিতে গিয়া আমাদের জ্ঞান অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা যতই অণুর কল্পনা করি—সকলই ভাবিয়া দেখিলে বৃহৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। একটী রেখার অনন্ত বার বিভাগ করিতে করিতে গিয়াও যেখানে তাহা আর বিভক্ত হইতে পারে না—বা যেখানে সে রেখা বিন্দুতে শেষ হইবে—আমরা সে পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি না। Infinitely great এবং Infinitely small—উভয়ই আমাদের ধারণার অতীত।

এইরূপে সর্ব্বত্র ঘাতপ্রতিঘাত, যোগবিয়োগ ব্যাপার চলিতে থাকে। বলিয়াছি ত, প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তে জড়জীবজগতে প্রত্যেক ‘এক’ প্রত্যেক অন্যকে যেরূপ পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ত্যাগ গ্রহণ কর্ম্ম দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল—প্রত্যেক পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের জগৎ পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তের সেই পরিবর্ত্তন দ্বারা গঠিত। এই রূপে সমুদয় জগৎ কর্ম্ম দ্বারা ক্রমপরিণত হয়, কর্ম্ম সঞ্চয়ে ক্রমবিকাশিত হয়,—কাল রেখায় ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়,—অনন্ত অতীত হইতে বর্ত্তমানে আসিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে চলিয়া যায়। এই কর্ম্ম তত্ত্ব বড়ই গহন—বড় আশ্চর্য্য। এস্থলে সে সব তত্ত্বের আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

৬২। জগতের এই মহা কর্ম্মতত্ত্ব—কর্ম্মের এই অনন্ত ব্যাপকত্ব এস্থলে আমাদের বুঝিবার আবশ্যক নাই। জীবজগতের ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম্মের কথা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। বলিয়াছি ত, জীব যখন কোন কর্ম্ম করে, তখন হয় কিছু গ্রহণ করে—না হয় কিছু ত্যাগ করে। বলিয়াছি ত সকল কর্ম্মে জড়জীবজগতের সমুদয় কর্ম্মেই একের সহিত অন্যের নানারূপ সম্বন্ধ থাকে। এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। কর্ম্মের যে মূল কারণ প্রকৃতি (১), কর্ম্মের যে বিভিন্ন ব্যষ্টিকারণ (২), যে বিষয়সম্পর্কজনিত ইচ্ছাদ্বেষ কারণ, কর্ম্ম প্রবৃত্তির যাহা হেতু বা আশ্রয় (৩), কর্ম্মের যে কর্ত্তা কর্ম্ম করণ উপাদান অধিকরণ প্রভৃতি কারক,—তাহার কথা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা কেবল কর্ম্মের ‘কর্ত্তা’ ও ‘কর্ম্ম’ সম্বন্ধ, এবং কর্ম্মের দাতা গৃহীতা সম্বন্ধ, বা যাহার জন্য কর্ম্ম কৃত হয় বা যাহাকে কর্ম্ম সম্প্রদান করা হয়, তাহার সহিত কর্ত্তার ও কর্ম্মের সম্বন্ধ—তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। কর্ম্মের যে ব্যবহারিক কর্ত্তা, সে স্বশক্তি বলে বা প্রকৃতির বশে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম করে। আর—এক জনের উপর কর্ম্ম কৃত হয়। একজন (active) কর্ম্মশীল, আর এক জন (passive) কর্ম্মসহ। জীব বা কর্ত্তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা প্রকৃতিচালিত হইয়া স্বার্থবৃত্তিবশে যেমন নিজের সুখকর বিষয় গ্রহণ ও দুঃখকর বিষয় ত্যাগ করে, তেমনই পরার্থবৃত্তিবশে পরের জন্য নিজের সুখকর বিষয় ত্যাগ করে বা দুঃখকর বিষয় গ্রহণ করে। জীব যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতি চরিচালিত হইয়া নিজের ও পরের জন্য কর্ম্ম করিতে জড়জগৎ হইতে বিষয় গ্রহণ করে, তখন সে কর্ম্মে জীবজগতের লাভ হয়, জড়জগতের ক্ষতি হয়। আবার জড়জগৎ যখন জীবজগৎ হইতে তাহার প্রাপ্য কর আদায় করে,—সে যখন তাহার নিজের ক্ষতি পূরণ করিতে যায়,—জড় আত্মত্যাগ করিয়া জীবকে যে শরীর দিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ফিরাইয়া লইতে যায়, তখন জীবজগতের ক্ষতি হয়।

---

(১) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
গীতা,—৩। ২৭।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।
গীতা,—৩। ৫।

(২) পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
গীতা,—১৮। ১৩।১৪।

(৩) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥
গীতা,—১৮। ১৮।

কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও কথা আছে। এই ভাবে দেখিলে, কর্ম্ম মাত্রেই একদিকে লাভ ও আর একদিকে ক্ষতি হয় বটে,—ব্যষ্টি ভাবে এই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে একের ক্ষতি ও অপরের লাভ হয় বটে,—কিন্তু বলিয়াছি ত, সমষ্টিভাবে সেই লাভ ক্ষতি থাকে না। সে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় না, বরং কর্ম্মরূপে জগতে সে শক্তিসঞ্চয়ে জগতের লাভ বা ক্রমোন্নতি হয়। তবে সেই ক্রমোন্নতি জন্য পর পর নিম্ন সৃষ্টির ক্ষতি করিয়া পর পর উচ্চ সৃষ্টির লাভ করিয়া দিতে হয়। জীবত্বের ক্রমবিকাশ জন্য জড়ত্বের ক্ষতি করিতে হয়। এই জীবত্বের ক্রমবিকাশ জন্য এ পৃথিবীর উদ্দাম প্রাকৃত শক্তিলীলাকে উৎকট তাপাদির ক্রিয়াকে অভিভূত করিতে হয়, পৃথিবীর সে গলিত তরল অগ্নিময় অবস্থাকে অভিভূত করিয়া শান্ত শীতল কঠিন মেদিনীরূপে পরিণত করিতে হয়। সেইরূপ উচ্চ প্রাণীজাতির বিকাশের জন্য পৃথিবীর উদ্ভিদ্‌জাতির ক্ষতি করিতে হয়। পৃথিবীতে যখন মানবাদি উচ্চ জীবের আবির্ভাব ছিল না—তখন চারিদিকে যে ঘোর অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত ছিল, এখন আর সে অরণ্যানী ক্বচিৎ কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পৃথিবী তাহার সেই উদ্ভিদ্ আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া—তাহা মানুষাদি উচ্চ জীবের বাসোপযোগী করিয়া দিয়াছে, তাহার উদ্ভিদ্‌কে মানুষদের আহার ও অন্যরূপে ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিয়াছে—তাহার জড়শক্তিকে উদ্ভিদ্‌কে ইতর জীবকে মানুষের সহায়রূপে পরিণত করিয়াছে। তখন সে অরণ্যানী যে বৃহদাকার ম্যামথ্ ম্যাস্তদনে পূর্ণ ছিল, সে ভীমকায় জীবজাতির লোপ করিতে হইয়াছে। বলিয়াছি ত, পৃথিবীতে যতই মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ হইতেছে, ততই সে মনুষ্যত্ব বিকাশে যে অপর জীব বাধা দেয়,—সে সব হিংস্র জীবের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। উন্নত জনপদে ব্যাঘ্র সিংহাদি বা বিষধর সর্পাদি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই রূপে যে সকল পশুজাতি মনুষ্যের সহায়—তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। মনুষ্য মধ্যেও, উন্নত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের জন্য, নিম্ন শ্রেণীর অসভ্য মনুষ্যসমাজের ক্রমশঃ লোপ হইয়া যাইতেছে। জগৎ যে মহা একত্ব সূত্রে গ্রথিত—প্রত্যেক ব্যষ্টি যে সমষ্টির অন্তর্গত—যে এক বিরাট সমাজের অঙ্গীভূত,—পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া যে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত,—তাহাতে যাহারা বাধা দেয়, যাহারা জগতের মহাসঙ্গীতে বিতন্ত্রী রূপে তাড্যমান হয়, তাহাদের বিনাশই জগতের মহানিয়ম। অতএব সমষ্টিভাবে এই লাভ ক্ষতি রূপ কর্ম্মের দ্বারা জগতের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে।

৬৩। এই ক্রমবিকাশ নিয়মবশে ব্যষ্টি জীব সকলেই স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য। স্বার্থকর্ম্মে জীবের নিজের লাভ ও পরের ক্ষতি হয়, আর পরার্থ কর্ম্মে তাহার নিজের ক্ষতি ও পরের লাভ হয়। এই ক্ষতি লাভ সামঞ্জস্য করিবার জন্যই জীব স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য। জীবের চৈতন্য যতক্ষণ বিকাশিত বা জাগরিত না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানমোহে প্রকৃতিচালিত হইয়া জীব স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম করে। পরে যখন চৈতন্য বিকাশিত হয়, তখন জীব তাহার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানবলে নিজের লাভ মাত্র বুঝিয়া লইয়া—নিজের সুখকর বিষয় অর্জ্জন ও দুঃখকর বিষয় পরিহার জন্য

কর্ম্মে প্রেরিত হয়। তখন জীবচৈতন্য তাহার স্বার্থ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, জীব পরের সুখ দুঃখ বুঝে না, নিজের সুখের জন্য পরকে দুঃখ দিতে বা নিজের লাভের জন্য পরের ক্ষতি করিতে কাতর হয় না,—সেখানে সে পরের লাভের জন্য নিজের ক্ষতি করিতে কিছুতেই প্রবৃত্ত হয় না। ক্রমে জ্ঞানবলে জীবের এই স্বার্থ গণ্ডী বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে জীব মমতার মোহ সন্তানকে আপনার ভাবিতে শিক্ষা করিয়া সন্তানার্থ কর্ম্মকে স্বার্থকর্ম্ম মনে করে। তাহার পর আরও প্রকৃতির আপূরণে সহানুভূতি বশে মানুষ যতদূর পর্য্যন্ত যে যে পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে, সে পর্য্যন্ত স্বার্থ কর্ম্ম ভাবিয়া সেই সেই পরের জন্য কর্ম্ম করিতে পারে। আমরা পূর্ব্বে প্রকৃতির অদ্ভুত কৌশলে স্বার্থ কর্ম্মের সহিত পরার্থ কর্ম্মের আশ্চর্য্য সম্মিলন বা সামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। জ্ঞান যতই বিকাশ হইতে থাকে, পরার্থবৃত্তি সহানুভূতি প্রভৃতির যতই বিকাশ হয়, ততই সে সামঞ্জস্যের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা যে যে পরকে পর ভাবি, যে যে পরের সহিত আমাদের সহানুভূতি না হয়, সে পর্য্যন্ত সে পরের সহিত কর্ম্ম করিতে আমাদের প্রবৃত্ত হয় না। পরকে পর ভাবিয়া স্বেচ্ছায় সাধারণ জীব পরার্থ কর্ম্ম করিতে চাহে না। কেন না সে পরার্থ কর্ম্মকে স্বার্থ কর্ম্ম না ভাবিলে জীব পরার্থ কর্ম্মে ক্ষতি বোধ করে, তাহাতে সুখ পায় না। এতএব যে নিজের ব্যক্তিগত সুখ চাহে, স্বার্থ চাহে, সে পরকে পর ভাবিয়া —স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে না।

কিন্তু জীবের পরার্থ কর্ম্ম না করিলেও চলে না। জীব নিজের বৃদ্ধি পোষণ ও রক্ষার জন্য পরের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করে, তাহা পরার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য—পরকে তাহা 'কড়া ক্রান্তিতে' বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। কাজেই যেখানে জীবের জ্ঞান বিকাশ হইয়াছে—যেখানে জীব নিজের সুখ দুঃখ বুঝিয়া, কেবল স্বার্থ কর্ম্ম মাত্র করিতে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত, যেখানে জীব কেবল আপনার গণ্ডাই বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত, পরের নিকট যাহা ঋণ করিয়াছে, তাহা দিতে চাহে না, সেইস্থলেই প্রকৃতি বাধ্য করিয়া জীবকে পরার্থ কর্ম্ম করান। আর সেইস্থলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে গিয়া জীব দুঃখ পায়। জীব ইচ্ছা করিয়া সহজজ্ঞান চালিত হইয়া পরার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে না। জীব পরের খাদ্য হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে চাহে না। জীব জড়-প্রকৃতির নিকট নিজ শরীরগঠনোপযোগী যে উপকরণ লইয়াছে, তাহা আর সে প্রকৃতিকে ফিরাইয়া দিতে চাহে না। সুতরাং সে অবস্থায় প্রকৃতি জীবকে বাধ্য করিয়া পরার্থ কর্ম্মে প্রেরণ করেন, অথবা পরার্থ কর্ম্ম সহ্য করিতে বাধ্য করেন, পরার্থে শরীর পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য করেন, জীবশরীরকেও অন্য জড় ও জীবশরীরের খাদ্যরূপে পরিণত করিতে বাধ্য করেন। তাহাতেই জীব দুঃখ পায়। আর শুধু যে জীব অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করে বলিয়া বলিয়া দুঃখ পায়, তাহা নহে। জীব স্বার্থচালিত হইয়া কর্ম্ম করিতে গিয়াও দুঃখ পায়। জীব যখন নিজের—ও সহানুভূতিবলে পরের—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য

পরের নিকট তাহার প্রেয় বিষয় গ্রহণ করিতে যায়, নিজের সুখের জন্য পরকে দুঃখ দিতে যায়, তখন সে পর তাহার কর্ম্মে বাধা দেয়। স্বার্থচালিত জীব স্বার্থে ত্যাগ-গ্রহণ কর্ম্মে পর কর্ত্তৃক যে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সে দুঃখ পায়। সে কর্ম্মে সে নিজে দুঃখ পায়, পরকেও দুঃখ দেয়। আর যখন মানুষ পর হইতে এইরূপ বাধা পায়, তখন সে পরের প্রতি তাহার ক্রোধ হয়। তাহার হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়। কাজেই বাধা দূর করিয়া সে কর্ম্মে সফলতা লাভ করিলেও মানুষের প্রকৃতি ক্রমে কলুষিত হওয়ায় পরিণামে তাহার ক্ষতি হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে বলিয়াছি। প্রতি কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া মানুষের অন্তরে সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়। এই কু-সংস্কার কুপ্রবৃত্তি—আমাদের পরিণামে দুঃখের কারণ। এইরূপে স্বার্থ কর্ম্মে আপাততঃ পরের ক্ষতি করিয়া লাভ করিতে পারিলেও পরিণামে আমাদের ক্ষতি হয়। স্বার্থকর্ম্ম মাত্রেই তাই পরিণাম দুঃখজনক। সে কর্ম্মফল দুঃখ। আর যে স্বেচ্ছায় সুপ্রকৃতি-বলে পরার্থ কর্ম্ম করিয়া আপাততঃ নিজের ক্ষতি করে—সে কর্ম্ম আপাতদুঃখকর হইলেও সেইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতেই সে তাহা হইতে আনন্দ পায়, আর তাহাতে যে সুসংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাতে পরিণামে তাহার লাভ হয়। এই অর্থে কর্ম্মমাত্রেই দুঃখকর,—কর্ম্মমাত্রেই দুঃখজড়িত। অতএব কর্ম্মহেতু জীবদুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যতদিন জীব সহজ বা সঙ্কীর্ণ জ্ঞানবশে ক্ষুদ্র স্বার্থ চালিত হয়, যতদিন মানুষ কেবল নিজের লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়া কর্ম্ম করিতে চাহে, যতদিন জীব যে পরের জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়—সে পরকে আপনার করিয়া লইতে না পারে, পরার্থ কর্ম্মকে স্বার্থ কর্ম্ম মনে করিতে না পারে, পরার্থ কর্ম্মকে স্বার্থ কর্ম্ম মনে করিয়া না সুখ পায়, ততদিন জীবদুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যতদিন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থচালিত হইবে, পরকে পর ভাবিয়া পরার্থ কর্ম্মকে আপনার কর্ম্ম—স্বার্থ কর্ম্ম—নিজ সুখকর কর্ম্ম—মনে করিতে না পারিবে, পরের মঙ্গলের জন্য নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সমুদয় কর্ম্মবৃত্তিকে পরার্থ পরিচালিত করিতে না পারিবে, প্রয়োজন হইলে পরার্থ শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত স্বার্থ কর্ম্ম ভাবিতে না শিখিবে—যতদিন মানুষ নিজের স্বরূপ না বুঝিবে, যতদিন মানুষ জগতের এই মহা কর্ম্মচক্র ধারণা করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ততদিন সে দুঃখ মোহে অভিভূত হইয়া, প্রকৃতির করুণা মমতার কথা, তাহার শরীর গঠন রক্ষা ও পোষণের জন্য প্রকৃতির নিয়ত চেষ্টার কথা, তাহার জন্য অপরের ত্যাগের কথা ভুলিয়া গিয়া সে প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবে, নিজের অদৃষ্টকে—বিধাতাকে দোষ দিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

উপনিষদের উপদেশ। (১০)

ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ।

একদা ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে অতি বিনীতবেশে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-শ্রবণার্থী হইয়া, মহামতি প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। উঁহারা উভয়েই 'ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করতঃ, প্রজাপতির নিকটে

করযোড়ে আত্মাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্ম কি পদার্থ, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, এই বিষয়টী জানিবার জন্য তাঁহারা প্রজাপতিকে বলিলেন—"ভগবান্! আপনি যে অনেক দিন পূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন যে, আত্মা পাপরহিত, জরা-রহিত, মরণাতীত, শোকশূন্য, সত্যকাম ও সত্য সংকল্প; এই আত্মার অন্বেষণ করিতে হইবে। আমরা সেই আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইয়া অদ্য উপস্থিত হইয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন্"। প্রজাপতি উভয়কেই, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের জন্য সমুৎসুক দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এই যে তোমরা চক্ষুর মধ্যে "অক্ষি-পুরুষকে" * দেখিতেছ, ইনিই ব্রহ্ম পদার্থ; যোগিগণ বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া, সাংসারিক বাসনাকে দূরে পরিত্যাগ করতঃ, এই পদার্থেরই অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ইহাঁকে পাইলেই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের লাভ ঘটিয়া থাকে; ইনি অমৃত, ইনি অভয়, ইনি ব্রহ্ম"। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে প্রজাপতির উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, "অক্ষি-পুরুষ" অর্থে চক্ষে যে মনুষ্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রহ্মন্! পরিষ্কৃত খড়্গ ও জলাদিতে যে আত্মার প্রতিবিম্ব প'ড়িয়া থাকে, তাহাই কি তবে ব্রহ্ম?" প্রজাপতি উত্তর করিলেন, "যিনি চক্ষুতে থাকিয়া দর্শন করেন, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছি।" ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই, প্রজাপতির বাস্তবিক অর্থ না বুঝিয়া অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করিল দেখিয়াও, প্রজাপতি উহাদিগকে আর কিছু না বলিয়া, একটা পাত্রে জল স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই জলের মধ্যে কি দেখিতেছ।" তাহারা উত্তর দিল—"ভগবন্! লোম, নখ, শ্মশ্রু প্রভৃতির সহিত নিজেরই প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়াছে; আমরা আত্মাকেই দেখিতেছি।" প্রজাপতি বলিলেন—"তোমরা তোমাদের পরিহিত বল্কলাদি পরিত্যাগ কর; কেশ, লোম, শ্মশ্রু আদি ছেদন কর; উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, পুনরায় এই জলের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ"। উহারা তাহাই করিয়া উত্তর দিল,—"আমরা নিজেরা যেমন সুপরিষ্কৃত, ছিন্ন-কেশলোম ও সুবসনধারী, জলের মধ্যেও সেইরূপই দেখিতেছি; এবার আমাদের আত্ম-দর্শন ঘটিয়াছে! ইহাই তবে অজর, অমর, অশোক, আত্ম পদার্থ!" ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই, প্রথমবার দর্শনে, প্রতিবিম্বিত দেহচ্ছায়াকেই আত্মবস্তুরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের এই ভ্রম দেখিতে পাইয়া, সেই ভ্রমাপ-

---

* অক্ষিশব্দ এস্থলে উপলক্ষণ মাত্র। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি স্বরূপে অক্ষি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। "অক্ষি-পুরুষ" অর্থ এই যে, যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, চালক। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যিনি দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার শক্তিতে চালিত ও দর্শনাদি ক্রিয়া-ক্ষম হইয়া থাকে। তবেই অক্ষি-পুরুষ অর্থে সেই পরম চৈতন্য ব্রহ্মমাত্র। প্রজাপতি "অক্ষিপুরুষ" শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না। তাহারা চক্ষে যে পুরুষ-ছায়া পতিত হয়, তাহাকেই "অক্ষিপুরুষ" মনে করিল। তাহারা বুঝিল যে, চক্ষুতে যে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, প্রজাপতি বুঝি সেই প্রতিবিম্ব পুরুষকেই "অক্ষিপুরুষ" বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু সে সমস্ত কথা আমরা এই উপাখ্যানাংশের শেষ সময়ে বলিব।

নোদনের জন্য, দেহের কেশলোমাদি ছিন্ন করিয়া, বেশ ভূষাদির পরিবর্ত্তন করিয়া, পুনরায় প্রতিবিম্ব দেখিতে বলাতেও, তাঁহাদের সে ভ্রম অপনোদিত হইল না। প্রজাপতি মনে করিয়াছিলেন যে, যখন নখ লোমাদিবিশিষ্ট ছায়া জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তখন উহাদের মনে যাহাতে ঐ নখ লোমাদি পদার্থই যে নিত্য এইজ্ঞান-ধ্বংস হয়, তজ্জন্যই, ঐ নখলোমাদি ছিন্ন করিয়া প্রতিবিম্ব দেখিতে বলিয়াছিলেন। এইরূপ করিলেই, উভয়ে বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বে কেশ নখাদির ছায়া পড়িয়াছিল, এখন ত আর সে ছায়া পড়িতেছে না; অতএব উহা নিত্য নহে। এইরূপ দেহ আত্মা নহে। দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃই যেমন কেশ নখাদির ছায়া দেখা গিয়াছিল, দেহও তেমনি আত্ম-সম্বন্ধেই অবস্থিত রহিয়াছে। এইটুকু বুঝাইয়া দেওয়াই প্রজাপতির অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচনের তখনও দেহে আত্মবোধ নষ্ট হইল না। প্রজাপতি মনে করিলেন যে, আমি যে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দিলাম, তদ্বিষয়ে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে করিতে কালে ইহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে। সেই জন্যই সন্তুষ্ট চিত্তে গমনোন্মুখ ইন্দ্র ও বিরোচনকে, প্রজাপতি আর কিছু বলিলেন না। উহাঁরা ফিরিয়া গেলেন।

বিরোচন স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া স্বজাতি মধ্যে দেহাত্মবাদ প্রচার করিল; জড়াতিরিক্ত আর চৈতন্য নাই, এই ভ্রান্ত মত প্রচার করিল। কিন্তু ইন্দ্র, ফিরিয়া যাইবার সময়, পথে প্রজাপতির কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রের মনে, প্রকৃত সত্যের একাংশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ইন্দ্র মনে করিতে লাগিলেন যে, যেমন এই শরীরে নানাবিধ বসন ভূষণ পরিলে, জলে প্রতিবিম্বিত ছায়াত্মাকেও বিবিধ বসন ভূষণ সমন্বিত বলিয়া বোধ হয়, আবার শরীরস্থ বসনাদি ও নখ লোমাদি না থাকিলে, সরাবস্থ জলে প্রতিবিম্বিত ছায়াকেও নখ লোমাদিশূন্য বলিয়া প্রতীত হয়; এইরূপ দেহেরও যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, হস্ত পদাদি ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, তবে উহার প্রতিবিম্বও নিশ্চয় চক্ষুরাদিশূন্য ও হস্তপদাদিহীন বলিয়া বোধ হইবে! অতএব ছায়া বা প্রতিবিম্ব ত মিথ্যা পদার্থ বুঝিতেছি! তদ্রূপ এ দেহটী নষ্ট হইয়া গেলে, উহার প্রতিবিম্বও ত নষ্ট হইয়া যাইবে! অতএব এই ছায়াত্মা দর্শনে, আমি কোন ফল লাভ করিতে পারি নাই!! ইন্দ্র এই সমস্ত কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে পুনরায় প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র ছায়াত্মাতে যে যে দোষ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই প্রজাপতিকে নিবেদন করিয়া, পুনরায় ব্রহ্মোপদেশের প্রার্থনা করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে আরো কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য করিতে আদেশ করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে উপস্থিত হইলে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন—"বৎস! স্বপ্নে যাহাকে দেখিতে পাও, স্বপ্নে যে নানাবিধ ভোগ অনুভব করে, নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত আত্মা; তাহাই ব্রহ্ম; তাহাই অমৃত ও অভয়"। ইন্দ্র কৃতার্থ হইয়া পুনরায় স্বগৃহাভিমুখে ফিরিলেন। কিন্তু পথে তাঁহার মনে পুনরায় এই চিন্তা উদিত হইল—'আমি বুঝিতেছি, এই দেহ যদি চক্ষুশূন্য হয়, তবে স্বপ্নে যে পুরুষ

ক্রিয়াদি করিয়া থাকে, সে ত অন্ধ হয় না; তেম্নি শরীর বধ করিলেও, তাহার ত বধ হয় না। অতএব সেই স্বপ্নাত্মা ত এই দেহের কোন দোষেই লিপ্ত নহে দেখিতে পাইতেছি। দেহের বৃদ্ধত্ব, জরায় উপনীত হইলে, এই স্বপ্নাত্মার ত জরাদি হইতে দেখা যায় না। সে ত স্বপ্নে অবিকল সমুদয় ক্রিয়াই করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে "ছায়াত্মা" দেখিয়াছিলাম, দেহের অবস্থান্তরে তাহারও যেমন অবস্থান্তর উপস্থিত হইত, এ স্বপ্নাত্মার ত সেরূপ হয় না। পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম যে, এই দেহের নাশ হইলে, 'ছায়াত্মাও' বিনষ্ট হইয়া যায়; এ 'স্বপ্নাত্মাতেও' কিন্তু আমি একটী গুরুতর দোষ দেখিতে পাইতেছি। শরীরের অবস্থান্তরে এ স্বপ্নাত্মার অবস্থা দেখিতেছিনা বটে, কিন্তু এ স্বপ্নাত্মাকে ক্রিয়াশীলের ন্যায় দেখিতেছি। পুত্রনাশ দেখিলে, এ স্বপ্নাত্মা ক্রন্দন করিতেছে, এইরূপ নানা সময়ে নানারূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। ইহার শোক দুঃখাদি আছে; কিন্তু প্রজাপতি ত বলিয়াছেন যে, আত্মা বিশোক, বিজর, অমর। এ স্বপ্নাত্মা ত সেরূপ শোকদুঃখাদি বর্জ্জিত নহে। অতএব ইহাও প্রকৃত আত্মা নহে।' এই সকল ভাবিয়া, ইন্দ্র প্রকৃত আত্মাকে জানিবার জন্য পুনরায় প্রজাপতির নিকটে ফিরিয়া গেলেন। প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাকে আর কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলিলেন। ইন্দ্র তাহাই করিলে, প্রজাপতি বলিলেন—"গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে যখন বৈষয়িক জ্ঞান (জন্যজ্ঞান) কিছুই থাকে না, সেই যে আনন্দময় অবস্থা, তাহাই ব্রহ্মের প্রকৃত পূর্ণস্বরূপ। যাঁহাকে অক্ষিতে দেখিয়াছ, যাঁহাকে স্বপ্নে ক্রিয়াশীল বলিয়া বুঝিয়াছ, তিনিই সুষুপ্তি সময়ে সৎরূপে বিদ্যমান থাকেন। তিনিই ব্রহ্ম; তিনিই অমৃত, অজর"। ইন্দ্র কিন্তু এ উপদেশেও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, ইহাতে দোষ আছে। ইন্দ্রের মনে হইল—'যদি তাহাই হয়, তবে এখন আত্মাকে সে ভাবে জানিতে পারিতেছি না কেন? অন্য কোনও প্রাণীই বা সে ভাবে জানিতে পারিতেছে না কেন? এই দেহস্থ আত্মাকেই বা মরণ সময়ে বিনষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে কেন? সুষুপ্তি অবস্থায় ত কোন জ্ঞানই থাকে না। অতএব সে অবস্থায়, আত্মা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, একথাই বা বলি না কেন? অতএব আত্মা ইহা অপেক্ষাও কোনরূপ ভিন্ন পদার্থ হইবেন। কেন না, প্রজাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে, আত্মা অমৃত, ইঁহার বিনাশ নাই।' ইন্দ্র এই সমুদয় মনে আন্দোলন করিতে করিতে পুনরায় ফিরিলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন যে—"তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে আর অতি অল্পই বাঁকী আছে। তুমি আর কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য কর; তোমায় সকল কথা বুঝাইয়া দিব"। কিন্তু প্রজাপতির এই শেষ উপদেশটী আমরা পাঠকবর্গের নিকটে আর একদিন উপস্থিত করিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উপনিষদ-গ্রন্থাবলী।

মুণ্ডক।

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া মুণ্ডকোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে।]

প্রথম মুণ্ডক—প্রথম খণ্ড।

একদা শৌনক আসি অঙ্গিরা সন্নিধি
জিজ্ঞাসেন ব্রহ্ম বিদ্যা বন্দি যথা বিধি।
কোন বস্তু, ভগবন্, জানিলে বিশেষ,
সমস্তই হয় জ্ঞাত, নাহি থাকে শেষ?
অঙ্গিরা কহিলা তবে করিয়া বিচার
দুই বিদ্যা মাত্র, সুধী, অন্য নাহি আর।
পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা হয়
ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্‌গণ কহেন নিশ্চয়।
চতুর্ব্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ,
নিরুক্ত, জ্যোতিষ এই অপরা কথন।
পরা-বিদ্যা সর্ব্বসার, তাহা হ'তে হয়
অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান নাহিক সংশয়।
জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় নাহি পায় যাঁরে,
স্থূল সূক্ষ্ম রূপহীন, প্রকাশ অন্তরে;
যিনি নিত্য, চরাচর বিশ্বের আশ্রয়,
ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত যিনি সর্ব্বভূতময়;—
যে বিদ্যা প্রভাবে হয় সেই ব্রহ্ম জ্ঞান
সেই বিদ্যা পরাবিদ্যা, অনন্ত-প্রধান।
দেহ হ'তে কেশ লোম বাহিরায় যথা,
অথবা পৃথিবী হ'তে তরুগুল্ম লতা;
ঊর্ণনাভি দেহ হ'তে বাহির করিয়া
যেমন দেহেই সূত্র লইছে টানিয়া;—
সেই মত অক্ষর হইতে বিশ্ব সব
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে হয়েছে উদ্ভব।
অক্ষর হইতে বীজ, বীজে প্রাণ মন,
মন হতে দৃশ্য সপ্ত লোকের জনম;
তাহা হতে হয় কর্ম্ম, কর্ম্ম হতে ফল,
এইরূপে ক্রমে হয় প্রকাশ সকল।
যিনি সর্ব্বজ্ঞানময় তাঁর জ্ঞান হতে
কার্য্যরূপ এ প্রপঞ্চ হয়েছে ক্রমেতে।
তাঁহারে জানিলে সর্ব্ব-তত্ত্ব জ্ঞান হয়;
শৌনক, এ গূঢ় কথা কহিনু নিশ্চয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ত্রেতা যুগে যাগ যজ্ঞ আদি কত শত
হইয়াছে অনুষ্ঠান বেদ বিধি মত।
কর্ম্ম ফল প্রাপ্তি হেতু সে সব বিধান,
ফল চাহ যদি, কর সেই অনুষ্ঠান।
অগ্নি হোত্র আদি ক্রিয়া স্বর্গলাভ তরে,
অজ্ঞানী যাজক মাত্র স্বর্গ আশা করে।
সপ্ত জিহ্ব হুতাশনে আহুতি প্রদান
করিলে সে ইন্দ্রলোকে যায় যজমান।
কিন্তু "এস এস" বলি মিষ্ট প্রলোভনে
ব্রহ্মলোকে অগ্নি-দেব লন যজমানে।
সেই সব লোক লাভ ক্ষণিক কেবল,
ভোগ ক্ষয়ে আসে কর্ম্মী পুনঃ ধরাতল।
নর-যোনি কিম্বা আরো নীচ-যোনি পায়.
স্বর্গলাভ বৃথা মাত্র নাহিক সংশয়।
জ্ঞানের উদয় বিনা নাহি মুক্তিলাভ,
অগ্নি হোত্র আদি জ্ঞান-শূন্য পরিতাপ।
সংকল্প করিয়া করে মন্ত্রের সাধন,
প্রকৃত বস্তুরে মূঢ় না পায় কখন।

অন্তরে প্রকৃত হলে জ্ঞানের সঞ্চার
সংসারে বিরাগ সত্য হইবে তাহার।
বাণপ্রস্থ কি সন্ন্যাস করিয়া আশ্রয়
যথাকালে জ্ঞানী ত্যজি ইন্দ্রিয় নিচয়,
হিরণ্য গর্ভের ধ্যানে হইলে মগন।
ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান লভিবে তখন।
ব্রহ্ম বিদ্যা লাভে পাপ পুণ্য হ'য়ে ক্ষয়
অব্যয় অক্ষর নিত্যে হইবেক লয়।
নিখিল সংসার কর্ম্মে হয় উপচিত।
কর্ম্ম হ'তে সংসার আবার উত্থিত।
বীজাঙ্কুর মত এক হয় অন্য হতে
এ হেতু অনর্থ রাশি সঞ্চিত তাহাতে।
বৃথা এ নিখিল বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী সব,
জ্ঞানের উদয়ে ইহা করি অনুভব
ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য ধর্ম্ম করিবে গ্রহণ,
কর্ম্মের বিকৃতি সব বুঝিবে যখন।
কর্ম্ম সুখ-দুঃখ-হেতু অনিত্য অসার
বৃথা কর্ম্ম অনুষ্ঠান, বৃথা বহা ভার।
ফল চিরস্থায়ী নহে নিশ্চয় যখন,
আয়াস-বহুল কর্ম্মে কিবা প্রয়োজন?
এ বৈরাগ্য জ্ঞান লয়ে নিত্য শিবময়
অভয় অক্ষয় পদ করিবে আশ্রয়।
এই ভাবে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিষ্ঠ হ'য়ে
শান্ত শুদ্ধ শিষ্যভাবে সমিৎ লইয়া
বিদ্যান সুগুরুতটে হলে উপনীত
গুরু ব্রহ্ম বিদ্যা তারে দিবেন বিহিত।
তাহে শিষ্য হৃদে হবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।
দূরে যাবে কর্ম্মাকর্ম্ম সুখ দুঃখ তাপ।

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

ব্রহ্ম বস্তু সার সত্য; কর্ম্ম কর্ম্ম-ফল
মিথ্যা ভ্রমে সত্য বলি ধারণা কেবল।
অগ্নি হ'তে শত শত স্ফুলিঙ্গ যেমন
বাহিরায় অগ্নিরূপ সুষ্ঠু সলক্ষণ,
তেমতি অক্ষর হ'তে নানাবিধ ভাবে
বাহিরিছে মহাবিশ্ব পুনঃ প্রবেশিবে
(লোমরূপ দেহ সব ত্যজি অবশেষে)
সেই এক অক্ষরে স্বভাবের বশে।
তিনি জ্যোতির্ম্ময়, অজ, অমূর্ত্ত, অপ্রাণ,
নিষক্রীয়, নিরুপাধি, অক্ষর, অমন; *
তাঁহা হ'তে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ,
বায়ু, জ্যোতি, অপঃ, পৃথ্বী হ'য়েছে প্রকাশ
সেই
বিরাট পুরুষ, অনন্ত রূপের রাশিঃ—
দ্যুলোক মস্তক তাঁ'র, নেত্র রবিশশি,
দশদিক কর্ণ, বেদ বাক্য-সুধাধারা,
বায়ু প্রাণ, হৃদয় অনন্ত বিশ্বভরা।
চরণ হইতে পৃথ্বী, ত্রিলোক শরীর,
সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা, প্রথম, গভীর।
তাঁহা হ'তে অগ্নি, সূর্য্য, সোম, জলধর।
ওষধি, পৃথিবী, পুং-স্ত্রী-জীবের প্রসার।
ঋক্ সাম যজু যজ্ঞ দক্ষিণা তাঁ'হ'তে,
সম্বৎসর কর্ম্মফল, সকলি ক্রমেতে।
দেব, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট
প্রাণ, অপান, গ্রীষ্ম, শরৎ, প্রাবৃট,
তাঁ'হ'তে সমুদ্র গিরি, নদী, জলাশয়,
ব্রীহি আদি ওষধি, রস সমুদয়।
রস হ'তে স্থূল দেহ; তাহাতে বেষ্টিত
লিঙ্গ দেহ সূক্ষ্মরূপে আছে প্রতিষ্ঠিত।
পুরুষই প্রকৃত, আর সকলি অসার,
তাঁহাকেই জান, সর্ব্ব জ্ঞানের আধার।
আত্মবোধ ব্রহ্মবোধ অভিন্ন হইলে
অবিদ্যার দৃঢ় গ্রন্থি যাইবেক খুলে।
ইহলোকে মুক্ত জীব হইবে তখন;
শৌনক, এ তত্ত্ব বুঝ স্থির করি মন।

দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড।

প্র। অরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান সম্ভবে কেমনে?

---

* বিবিধ শক্তি ও ভেদজ্ঞান যুক্ত, সংকল্পাদি-ময় মন যাঁহাতে নাই, তিনি অমন।

উ । তিনি স্বপ্রকাশ তাঁ'র অনুভব মনে ।
বাহ্যেন্দ্রিয়গণ কভু নাহি পায় তাঁরে,
জ্ঞানে বুঝ ব্রহ্মবস্তু হৃদয়-কন্দরে ।
শব্দ কর্ণে, বর্ণ নেত্রে, রস রসনায়,
স্পর্শ ত্বকে,—ব্রহ্ম মনে অনুভব হয়।
(তিনি) অণু হ'তে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম মন-শরে
বিদ্ধ কর একমাত্র সুলক্ষ্য অক্ষরে ।
উপনিষৎ ধনু, বাণ ধ্যান-নিষ্ঠ-মন,
ইন্দ্রিয়ের নিবর্ত্তন হ'ক আকর্ষণ ;
ব্রহ্মে লক্ষ্য করি হ'য়ে একাগ্র তন্ময়
ছাড় সেই শর, লক্ষ্য বিঁধিবে নিশ্চয় ।
অথবা ওঙ্কার ধনু, শুদ্ধ আত্মা শর,
একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম, বিঁধ নিরন্তর ।
লক্ষ্য সহ শর যথা এক হ'য়ে রয়,
সাধক তেমতি ব্রহ্মে হইবেক ল'য় ।
ইহ পরলোক, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সব,
ইন্দ্রিয় প্রাণ মন,—কর অনুভব
সমস্তেই প্রশস্ত সে মহাআত্মরূপ,—
সেই মহা-আত্ম-জ্ঞান মুক্তির স্বরূপ ।
সংসার মহাসাগর তরিবার তরে
সেই একমাত্র সেতু, বুঝহ অন্তরে ।
তিনি মনোময়, তিনি হৃদে প্রতিষ্ঠিত,—
চিদানন্দময়ে বুঝ, হইবে অ-মৃত ।
বুঝ তাঁ'রে, চিন তাঁ'রে, অতীব সরল,—
মৃত্যু পরাজিত হ'বে, হইবা সফল ।
তব ক্ষুদ্র চৈতন্য, তব অহঙ্কার
একমাত্র চৈতন্যে হইবে প্রসার ।
সেইক্ষণে,
কোথা তুমি, কোথা তিনি, তিনি তুমি এক ;
কোথা জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কর্ম্ম, বাসনা, বিবেক ।
কোথা গুণ, কোথা রূপ, কোথা মায়া মোহ,—
নির্গুণ, নিরজ, স্বচ্ছ, নিষ্কল, নির্দেহ ।
সূর্য্য না প্রকাশে তাঁ'রে নহে চন্দ্র তারা,
অনন্ত আকাশ কিম্বা এই ক্ষুদ্র ধরা,
সকলি চলিয়া যায় জ্ঞানের নয়নে ;
একমাত্র পরিব্যাপ্ত ব্রহ্ম জাগে মনে ।
এ ভাবে করহ ধ্যান, শৌনক সুধীর,
অন্য সব ভ্রমমাত্র শুধু ব্রহ্ম স্থির ।

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ।

দুই পক্ষী এক বৃক্ষে আছেন বসিয়া,
একে খান ফল, অন্যে দেখেন চাহিয়া ।
লিঙ্গদেহ ফল ভোগ করেন শরীরে,
মুক্ত পরমাত্মা মাত্র দরশন করে ।
অবিদ্যা কামনা কর্ম্ম কর্ম্ম-ফল সব ।
জীবাত্মা এ দেহ সহ করে অনুভব ।
সুখ দুঃখ শোক মোহ, জীবাত্মার ভোগ,
পরমাত্মা নিত্য মুক্ত নাহি দুঃখ শোক ।
নানা যোনি ভ্রমে জীব ভোগের কারণ,
ভোগ অবসানে মুক্ত নির্ম্মল তখন ।
বহু দুঃখ সুখ ভোগি জন্ম জন্মান্তরে
গুরুর দয়ায় জ্ঞান উদিলে অন্তরে,
সত্য, শম, দম, ত্যাগ, অহিংসা আশ্রয়
করিয়া জীবাত্মা মুক্ত হ'বে সে সময় ।
তখনি সে জরা মৃত্যু সুখ দুঃখ পার
হবে, ব্রহ্মে হেরি সর্ব্বভূতের মাঝার ।
তখন বিমল শান্তি, সাম্য অচঞ্চল
লভিয়া জীবাত্মা মুক্ত হইবে নিষ্কল ।
ক্ষুদ্র জীব আত্মা তবে অনন্ত প্রসারি,
এক হ'বে ব্রহ্ম সহ, ভোগ পরিহরি ।
"আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মময় প্রপঞ্চ সকলি,"
এই জ্ঞানে দূরে যাবে অন্য জ্ঞান চলি ।
প্রশ্ন । কিসে লাভ হ'বে এই নিরঞ্জন ভাব ।
উত্তর । সত্যের আশ্রয়ে হবে এইভাব লাভ ।
সত্য, সত্য, সত্য হ'লে জীবের আশ্রয়
নির্ম্মল নিরুপাধি হইবে হৃদয় ।
রিপুচয় ক্ষয় হ'বে সত্যের প্রভাবে,
কাম, কর্ম্ম, ফল, ভোগ,—সব দূরে যাবে ।

চিত্তশুদ্ধি হ'বে তাহে ; অমনি তখন
লভিবে জীবাত্মা সেই ভাব নিরঞ্জন।
অবিবেকী হ'তে ব্রহ্ম বহু দূর বটে,
বিবেকী বৈরাগী হ'তে অতীব নিকটে।
ব্রহ্ম বস্তু জীব দেহে নিহিত গুহায়,
বিদ্যান সুবুদ্ধি বলে করেন প্রত্যয়।
অরূপ সু-সূক্ষ্ম ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-অতীত,
কর্ম্মে তাঁরে লাভ কভু না হ'বে, নিশ্চিত।
জ্ঞানে শুদ্ধ হ'লে চিত্ত, হৃদয়ে দর্শন
করেন সাধক সেই নিত্য নিরঞ্জন।
জীবের সমগ্র চিত্ত আবৃত ইন্দ্রিয়ে,
ইন্দ্রিয় মোহের বশে আচ্ছন্ন বিষয়ে।
তাহে পরিত্যাগ করি, জ্ঞানে বুঝ হৃদে
প্রতিষ্ঠিত পরব্রহ্ম চিত্ত-কোকনদে।
আপনারে বুঝ শিষ্য, জান আপনারে,
তা হ'লে ভাবিবে সেই নিত্য সারাৎসারে।

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড।

যেই ব্রহ্মে সর্ব্বভূত রয়েছে নিহিত।
তাঁরে জানি আর জন্ম না হয় নিশ্চিত।
দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের কামনার ফলে
ভোগ হেতু পুনঃ পুনঃ জন্ম ধরাতলে।
কামনার নাশ হ'লে জন্ম নাহি আর
কারণের নাশে হয় কার্য্যের সংহার।
বেদ অধ্যয়ন, বহু শাস্ত্রার্থ স্মরণ।
কিম্বা পরমুখে বহু গ্রন্থের শ্রবণ,—
এ সকলে ব্রহ্মবস্তু নাহি লাভ হয়,
আত্ম তত্ত্বদর্শী মাত্র লভেন বিস্ময়।
আপন স্বরূপ আত্মা আত্মদর্শী জনে
করেন প্রকাশ, তাঁ'রে অন্যে নাহি জানে।
না হইলে বলীয়ান আত্মনিষ্ঠা বলে,
ভোগ-ইচ্ছা ত্যজি জ্ঞান উদয় না হ'লে,
"আমার আমার" ভ্রম না হইলে গত,
ব্রহ্ম বস্তু লাভ কভু হবেনা নিশ্চিত।
ভোগেচ্ছা বর্জ্জিত জ্ঞানী, আত্ম বলে বলী,
শান্ত জিতেন্দ্রিয় যিনি, তাঁরে ঋষি বলি।
সর্ব্বভূতগত ব্রহ্মে হইয়া মিলিত
নিরুপাধি মুক্তি তিনি লভেন নিশ্চিত।
পঞ্চদশ কলা * আর ইন্দ্রিয় নিচয়
জ্ঞান কর্ম্ম আত্মা, সব ব্রহ্মময় হয়।
ভিন্ন নাম ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন নদী,
নাম রূপ লুপ্ত হয় প্রবেশয়ে যদি
অনন্ত সাগর নীরে;—বারি মাত্র সার ;—
সেই মত নাম রূপ করি পরিহার
জ্ঞানী জন প্রবেশেন সেই ব্রহ্মধামে
বিমুক্ত উপাধি-শূন্য, শেষ পরিণামে।
তখন জীব-ই হয় ব্রহ্মবস্তু সম ;
সেই কুলে অজ্ঞানীর না হয় জনম।
ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান বেদজ্ঞ যেজন
করেন একর্ষিতেজে † আহুতি ক্ষেপণ।
শিরোব্রত বিধিমতে করেন বিধান,
সেই জনে ব্রহ্মবিদ্যা করিবে প্রদান।
অঙ্গিরা কহিলা পূর্ব্বে এ সার বারতা,
গুরু পরম্পরা ক্রমে লভিনু একথা।
বিধিমতে নাহি করে ব্রত সেইজন।
এ গ্রন্থ করে না যেন কভু অধ্যয়ন।

ঋষিগণে নমস্কার।
ঋষিগণে নমস্কার।

শ্রীশশধর রায়।

---

* দেহপ্রবর্ত্তক প্রাণাদি।

† অগ্নি।

দিল্লি-মহোৎসব-কাব্যম্

(সমালোচনা)

"বিজয়িনীকাব্য" প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "দিল্লিমহোৎসব কাব্যের," সংবাদপত্রাদিতে কতিপয় সমালোচনা পড়িয়া, এই উপাদেয় গ্রন্থের যথোপযুক্ত সমালোচনা হয় নাই বলিয়া বোধ হওয়ায়, উক্ত কাব্য সম্বন্ধে আমার এই সামান্য মত প্রকাশ করিলাম। পাঠকবর্গ দোষগুণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

এই দিল্লিমহোৎসবকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। ইহাতে বিগত দিল্লি-দরবারের যাবতীয় বিষয় কবি, যথোপযুক্ত বাক্-পটুতা ও লিপি-কুশলতার সহিত, নানাবিধ সুললিত ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এ কাব্যের বিশেষ নূতনত্ব এই যে, বর্ত্তমান কালের প্রধান প্রধান ভারতীয় রাজন্যবর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এই গ্রন্থেই একত্র নিবদ্ধ ও একত্র বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়; সংস্কৃত ভাষায় আর কোন গ্রন্থে ইহা নাই (২য় সর্গ দেখুন্)। আবার, ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে কি কি শিল্প দ্রব্য অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ গ্রন্থে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাহারও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (৪র্থ সর্গ দেখুন্)। আমরা ষষ্ঠ সর্গে দেখিতে পাই যে, হিন্দু-রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, দিল্লির মুসলমান-রাজন্যবর্গের ও ইংরেজ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক হতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থে কাব্য ও ইতিহাস, এ উভয়েরই পূর্ণলক্ষণ বর্ত্তমান আছে; পাঠক ইহাতে কাব্য ও ইতিহাস একাধারে পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। এই সকল নীরস ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিখিতে গিয়াও, কাব্যের মধুরতার হানি হয় নাই, ইহা কবির কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। তাজমহলের বর্ণনাত্মক কবিতাগুলি কত উৎকৃষ্ট ও সুমধুর হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠক ষষ্ঠ-সর্গ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি খণ্ড কাব্য; সুতরাং কোন একটী রস প্রধান নহে। বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা রসের অবতারণা বড়ই সুমধুর বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্র উদাত্ত ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই প্রায় ইতিহাস জানেন না; এমতাবস্থায় কবি, আপনার ঐতিহাসিক জ্ঞান নিজ গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করিয়া, আমাদের বড়ই আদরণীয় হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় "রাজতরঙ্গিণী" ভিন্ন এইরূপ ঐতিহাসিক কাব্য-গ্রন্থ নাই; বহুকাল কোন কবি কাব্য গ্রন্থে ইতিহাসের অবতারণা করেন নাই। সম্প্রতি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থ পড়িয়া আমাদের সে আশা কতক পরিমাণে মিটিয়াছে।

কাহারও কাহারও আপত্তি, সংস্কৃতশব্দের সহিত পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ বহুল পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, কাব্যখানিকে অনেকস্থলে নীরস করিয়া তুলিয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, কাল দেশ পরিবর্ত্তনের বলে, ভাষাও রূপান্তর পরিগ্রহ করে। এই রূপান্তর-পরিগ্রহে ভাষা হৃষ্ট পুষ্ট, ও বলিষ্ট হয়; নতুবা ভাষার

মৃত্যু ধ্রুব। সংস্কৃত ভাষা মৃতপ্রায় বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে নূতন প্রকাশিত কাব্য, নাটকের রচনা দেখিয়া আমাদের এই মতটী ক্রমে দৃঢ় হইতেছে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যদি দিল্লি-দরবারের ঘটনাবলী চিত্রিত করিতে গিয়া, নূতন নূতন জিনিষের ও নূতন নূতন ভাবপ্রকাশক শব্দগুলির নির্ম্মাণ ও রচনা নিজে করিয়া লইতেন, তবে বোধ করি কেহই দরবারের ঘটনাগুলি পড়িয়া বুঝিতে পারিতেন না। সুতরাং কবি সেই সেই স্থানে বাধ্য হইয়া, যবন ভাষার শব্দগুলি নিজ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল শব্দপ্রয়োগে কবির দূরদর্শিতা ভিন্ন অবিমৃশ্যকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই। কাব্য গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় সুগম হওয়া আবশ্যক; যদি অর্থ অতিকষ্টে বোধগম্য হয়, কেহই সে গ্রন্থ পড়িতে অগ্রসর হন না, ইহা স্বাভাবিক। কে বলিতে সাহসী হইবেন যে, প্রাচীনকালেও সংস্কৃত ভাষায় অন্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করে নাই? পাঠকগণ পর্য্যালোচনা করুন, বর্ত্তমান কালের ইয়ুরোপের ভাষা গুলি বিচার করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, বিদেশীয় ভাষার বিস্তর শব্দ ইয়ুরোপের প্রত্যেক ভাষায় মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার অবস্থা দেখুন; এই শতাব্দীর বঙ্গভাষা ইংরাজিশব্দ ও ইংরাজী ভাবে কিরূপ অবস্থান্তর পাইতেছে; এমতাবস্থায় কবির ইংরেজী ভাষার শব্দ প্রয়োগে ক্ষুণ্ণ হইবেন না। ইহাতে আমি একথা বলিতেছি না যে, কবি এইরূপ যাবনিক শব্দ প্রয়োগে সর্ব্বত্রই কবিতাগুলিকে সুমধুর ও সুন্দর করিতে পারিয়াছেন; তবে ইহা নিশ্চয় যে, দেশ কাল পাত্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ও ভাষার পক্ষে হিতকর। কবি এই অবশ্যম্ভাবিতাই প্রমাণ করিয়াছেন। কবি উৎকট শব্দগুলিকে যেরূপ কৌশলে সংস্কৃতছন্দোমধ্যে গাঁথিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ প্রশংসার্হ হইয়াছে। যাঁহার সংস্কৃত ভাষার উপরে বিশেষ আধিপত্য নাই, তিনি কখনও এরূপ লিখিতে পারিতেন না। কবির বিশেষ বাহাদুরী এই যে, পাশ্চাত্য-ভাষার শব্দের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও কোন স্থলেই ছন্দোভঙ্গ করেন নাই। কবি নিজ কবিতাগুলি বিদেশীয় সজ্জায় সংস্কৃতের সুকোমল পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গ স্বয়ংই বিচার করিয়া দেখিবেন। শেষ সর্গে প্রায় কুড়িটী কবিতায় কবি স্বদেশ-প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান কালে স্বদেশের অভাব গুলি, রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের নিকটে বিশদ ভাবে, জানাইয়া দিয়াছেন। ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই বোধ করি এ বিষয়ে কবির সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে এটীও নূতন ভাব, সন্দেহ নাই। আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে সংসারের অসারত্ব প্রতিপাদনই দেখা যায়; এরূপ স্থলে হিন্দুজাতির মুখপাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যে, নূতন ভাবের অবতারণা করেন, ইহাতে হিন্দুজাতির নূতন আশা সঞ্চারের পথ উন্মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে আমরা আর একটী মাত্র কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কাকিনার রাজা বাহাদুর এ গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনব্যয় বহন করিয়াছেন। এখনকার দিনে হিন্দুর রুচি-

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্য-শাস্ত্র, আর্য্যচিকিৎসা—সকল বিষয়েই হিন্দুজাতি বীতশ্রদ্ধ ও বীতানুরাগ। এ অবস্থায় যে, সদাশয় মহাত্মা রাজা মহিমারঞ্জন ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিয়াছেন, ইহা কম আনন্দের কথা নহে। আমরা রাজা বাহাদুরকে এ জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এস্থলে একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমরা পরম্পরাসূত্রে শুনিতে পাইয়াছি যে, ভারতের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ [†] বিজয়িনী ও দিল্লিমহোৎসব কাব্যদ্বয়ের প্রত্যেকে অনেক খণ্ড ক্রয় করিয়া লইয়া কবির উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেণ্ট এবং মান্দ্রাজের গভর্ণমেণ্টও, বর্ত্তমান পুস্তকের অনেক খণ্ড ক্রয় করিয়া সদাশয়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য আমরা গভর্ণমেণ্টকেও অকপট হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কবিবর হেমচন্দ্র। [*]

বঙ্গসাহিত্য তখন সবে মাত্র সমুদ্রের তত্ত্ব পাইয়াছে, তাহার উন্মুক্ত নেত্রে আকাশের অসীমতা প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহার পায়ের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে। একদিকে মহাত্মা রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর, অন্যদিকে মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে এই নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি এই অজ্ঞাত রসের প্রথম প্রেরণায় আকুল হইয়াছে, ও বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বত্র একটা অনির্ব্বচনীয় উত্তেজনা দেখা দিয়াছে, উহা ভাল কি মন্দ, তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বঙ্গসাহিত্যের এবম্বিধ অবস্থায় কবি হেমচন্দ্রের আবির্ভাব।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর যে উত্তেজনা আনিয়াছিলেন, তাহা অনেকাংশে সামাজিক, কিন্তু ঈদৃশ উত্তেজনাতেই সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হয়। বিশেষতঃ তাঁহারা আপন উদ্দেশ্য সাধনে সাহিত্যকেই প্রধান মন্ত্রস্বরূপ আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই উভয় ব্যক্তির গ্রন্থাবলী এবং কার্য্যপ্রণালীর মুখ্য অথবা অবান্তর ফলে বঙ্গসাহিত্য এখন পর্য্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতেছে।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সমাজে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তাহা বহু পরিমাণে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্ক এবং শিক্ষার ফলে ঘটিত হয়; দেশের লোক তাহা খ্রীষ্টানি ভাব বলিয়া ধরিয়া লয়, কারণ দেশের প্রচলিত সমাজ তন্ত্রে তাহার তিষ্ঠিবার অবকাশ মাত্রও ছিল না। কিন্তু উক্ত দুই জনের কেহই খ্রীষ্টান ছিলেন না, খ্রীষ্টান হইলে তাঁহাদের কোন চেষ্টাই সমাজে স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী হওয়ার উপযোগী হইত না। কিন্তু বিধাতা বুঝিলেন, কবি খ্রীষ্টান হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য কোনরূপে

---

[*] এই প্রবন্ধটী লিখিয়া সুকবি শশাঙ্ক মোহন চৈতন্য-লাইব্রেরী হইতে একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

[†] মহীশুর, ত্রিবাঙ্কুর, কাশ্মীর, যোধপুর, পাতিয়ালা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি প্রদেশের রাজন্যবর্গ প্রত্যেকে পুস্তক ক্রয় করিয়া ইতি মধ্যেই গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়াছেন, ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।

বিস্মিত হইতে পারিবে না, বরং প্রণোদিত হইবে; তাই তিনি মধুসূদনকে খ্রীষ্টান করিয়া, অবাধ গতিতে সমস্ত দুঃখ দৈন্য বিপদের মধ্য দিয়া, জগতের সমস্ত জাতীয় বিজাতীয় বড় বড় ভাবের তীর্থে স্নান করাইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে তুলিয়া ধরিলেন। এই উদ্ধতস্বভাব শিশুও সর্ব্ব প্রথম বঙ্গভাষার পায়ের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তৎপরে শৃঙ্খলা, ভাব এবং প্রচলিত সাহিত্য শস্ত্রকে পদদলিত করিয়া এমন গান আরম্ভ করিয়া দিল যে, দেশের লোক যুগপৎ মুগ্ধ, ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া গেল। এইরূপে বঙ্গসমাজ জগতের সমাজের সহিত একাত্মতা দেখাইতে এবং বঙ্গসাহিত্য সমস্ত সভ্যজগতের সাহিত্যের সহিত শোণিত-সম্পর্ক স্থির করিতে চেষ্টিত হইয়া গেল।

হেমচন্দ্র আসিয়া ভূলুণ্ঠিত মধুসূদনকে মাথায় তুলিলেন, তুলিয়া বঙ্গবাসীকে বলিলেন, তোমরা ইহাকে বৃথা তুচ্ছ করিয়াছ, তোমাদের দেশে এত বড় কবি আর জন্মে নাই। এই কার্য্যে হেমচন্দ্রের হৃদয়ের অকৃত্রিম মহত্ত্ব পরিদৃষ্ট হইবে। প্রতিযোগী কবির প্রতি এইরূপ নির্ভীক সহৃদয়তা সাহিত্যসংসারে দুর্লভ, কারণ কবিগণ স্বভাবতঃ আত্মপ্রিয়, তাঁহারা আপন হৃদয়ের সমগ্র আদর্শে আপন রুচির অনুবর্ত্তনে নিজ নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাহাকে নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মধুসূদনের মৃত্যুপলক্ষে হেমচন্দ্র "স্বর্গারোহণ" নামক যে কবিতা প্রকাশ করেন, তাহা বঙ্গীয় কাব্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উক্ত কবিতার প্রধান সৌন্দর্য্য হেমচন্দ্রের সহৃদয়তা। পাঠক দেখিবেন, কত দূর প্রেম, কতদূর সৌহার্দ্দ, কতদূর উদারতা থাকিলে প্রতিযোগীর জন্য এইরূপ মহনীয় স্বর্গলোক নির্দ্দেশ করিতে পারে, এবং এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী উচ্ছ্বাসে ক্রন্দন করিতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ সহৃদয়তা বিশেষ গৌরবাবহ সন্দেহ নাই।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর নিকট যে স্বাধীনতার সমাচার আনিয়াছিলেন, যুবক হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় তাহা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। পূর্ণ-গঠিত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে যুবক প্রথম বঙ্গসাহিত্যে আত্ম পরিচয় করিয়াছিলেন, তাঁহার কবি-হৃদয় চিরদিন সেই আদর্শেই স্থির ছিল; বয়সের পরিণতিতে সেই আদর্শের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এইস্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হেমচন্দ্র ধর্ম্মবিষয়ে দ্বৈতবাদী হিন্দু, উপাসনা প্রণালীর কোনরূপ সংস্কার অথবা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ উক্ত মতের সহিত নির্ব্বিরোধে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার "কাশী বিশ্বেশ্বরের আরতি," "অন্নদার শিবপূজা," "বঙ্গে দুর্গোৎসব," "দশ মহাবিদ্যা" পাঠে বুঝা যাইবে, তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্মমত অপেক্ষা কত পৃথক ছিল।

এইরূপ চরিত্রভিত্তি লইয়া নবীন যুবক সর্ব্ব প্রথম "চিন্তা-তরঙ্গিণী" প্রকাশ করেন। এই কাব্য অনেক বিষয়ে বায়রণের ম্যানফ্রেডের সমধর্ম্মী, রচনা প্রণালী ভারতচন্দ্রের এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরূপ। এই কাব্যে একজন নব্যবঙ্গীয় যুবক স্বদেশের এবং স্বসমাজের দুর্দ্দশা মোচন করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা

অসম্ভব ও নিজেকে অসমর্থ বুঝিয়া আত্মহত্যা পূর্ব্বক নিষ্ফল জীবনের পর্য্যবসান করে। যুবকের মনোভাব যথা—

কি হবে থাকিয়া হেথা প্রাণের কমল!
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু।
প্রীতিবারি সমাজেতে ঢালিলাম কই।
স্বার্থ দ্বেষ পরহিংসা নাশিলাম কই?
কই আপনার মন নিরমল হল?
কই কর্ম্ম পথে মন স্থির হয়ে রল?

এই কাব্যের লক্ষ্য কি? লক্ষ্য নবীন কবি বলেন নাই, বলিতে সাহস করেন নাই, গ্রন্থের শেষ ভাগে কবি যে নীতিসূত্র বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসঙ্গে গ্রন্থের গতি কি প্রণালীর কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। উহা কেবল সাধারণের চক্ষু হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়কে আবৃত রাখার উদ্দেশ্যে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কবির বক্তব্য প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মহত্যা নহে। আত্মোৎসর্গ, ন্যায় এবং দেশের জন্য আত্মহত্যা মানব সমাজে মহনীয় আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য মাত্র না রাখিয়া একমাত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধির নির্ভরে যে আত্মহত্যা, তাহাই আত্মোৎসর্গ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার ইপ্সিত উন্নতি অসম্ভব হইলেও অকুতোভয়ে জীবন দান কর, কিছু অগ্রসর হইবে।

জয়ত মোদের নয়
জয় ত সে ন্যায়ের জয়
আজি হোক্ কালি হোক্ শত অসি শক্তি আসি
কে পারে রোধিতে তারে—? শতধা কাটিবে ফাঁসি।

আমরা দেখিব, “চিন্তা-তরঙ্গিণীর” এই অল্পায়ুঃ এবং অপরিণত যুবক পুরুষটী পরে শ্মশান হইতে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশময় জাতীয় সঙ্গীতের ভেরী বাজাইয়াছে, হতভাগিনী বিধবা এবং কুলীন মহিলার জন্য অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া গিয়াছে; সমাজের শক্তিস্বরূপা রমণীজাতীয় দুরবস্থার ক্ষোভে রোষে সমাজস্থ পুরুষগণের বক্ষে হৃদয়ভেদী ধিক্কারের চির-প্রজ্জ্বলিত বৃশ্চিক দংশন রাখিয়া গিয়াছে; এবং পরিশেষে জীবন-সায়াহ্নে জাতীয় মহাসমিতির পূর্ণ এবং অপূর্ণ শত সহস্র আশা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সম্মিলিত ভারতের মহিমান্বিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়া “জীবন সার্থক আজিরে আমার” গাইতে গাইতে আলোক রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

“চিন্তা-তরঙ্গিণীর পরেই “বীরবাহু”। নবীন কবির দৃষ্টি এই গ্রন্থে জাতীয় স্বাধীনতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাই একটা মনগড়া হিন্দুরাজা করিয়া তদ্দ্বারা একটা মনগড়া পাঠান রাজাকে পরাস্ত করাইয়া হিন্দু সূর্য্যের পুনরভ্যুদয় ঘোষণা করিতে হইতেছে; এই কাব্য “চিন্তা-তরঙ্গিণী” হইতে ভাষা ও ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর; কিন্তু অচতুর হস্তের চিহ্ন সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কবির কল্পনা-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। যথা বরুণতনয়াগণের আত্মকথা—

সাগরে সাগরে ভ্রমণ করি
মাণিক মুকুতা দেখিলে ধরি,
এই উপবনে আসিয়া বসি
শ্রম নাশি পুনঃ সাগরে পশি।
হলো বহুদিন প্রভাত কালে
সকলে পশিনু জলধি জলে
সারাদিন জলে ধরিনু মণি
ভানু অস্ত যান আসে রজনী।
দেখিয়া তপন মূরতি শোভা
আমরা কজনে হইনু লোভা।
ধরিব বলিয়া ধাইনু পাছে
যত দূরে যাই না পাই কাছে।

ক্রমশ নামিছে দেখিতে পাই।
না পারি ধরিতে যতই যাই।
প'ড়ে অই ফেরে পোহায় রাতি
পাতাল পুরেতে না জ্বলে বাতি।
আমাদেরি কাছে আছিল মণি
আঁধারে সকলে যাপে রজনী।

পরিণত বয়সেও হেমচন্দ্র ইহাপেক্ষা স্নিগ্ধোজ্জ্বল কবিতা লিখিতে পারেন নাই।

"বীরবাহু" প্রকাশের পর হেমচন্দ্রের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। মানব হৃদয়েও প্রতিভার উদ্বোধন এবং জাগরণ আছে। অকস্মাৎ এমন সময় আইসে, যখন নির্ঝরের স্বপ্ন ভগ্ন হয় এবং সে

আমি ঢালিব অমিয় ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগত জুড়িয়া বেড়াব গাইয়া
আকুল পাগল পারা—

জগতের দিকে অভিযান করে। "বীরবাহুর" পর হেমচন্দ্র মহতী আশায় এবং আপন সামর্থ্যে উদ্বুদ্ধ হইলেন, সাহিত্য-জগতের আপন স্থান অধিকার করিতে আশ্বস্ত হইলেন; তাঁহার হৃদয় কেবলমাত্র ভারতের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত রহিল না, তিনি পৃথিবীর ভিতর আপন বাস্তব্য গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। "আশা-কানন" বিশ্বসংসারের হৃদয় গাথা। কেবল একবার মাত্র যশঃ-শৈলে বাল্মীকির সহিত সাক্ষাতে হেমচন্দ্র দুঃস্থ ভারতের কাহিনী তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন; এবং আশার সম্মোহন মুকুরে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন—

ভারত জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে,
ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
পূর্ব্ব তেজ হাস্যাননে।
ঘেরিয়া তাহারে সব আর্য্যজাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝারিয়া কলঙ্ক ধূলি।

এই কাব্যে হেমচন্দ্র ভাষার সৌন্দর্য্য এবং ভাবের গাঢ়তায় হটাৎ বহু পরিমাণে, অগ্রসর হইয়াছেন। ইতিমধ্যে জাতীয় এবং বিবিধ ভাবের কোন কোন কবিতা লিখিত হইয়া থাকিবে, ও কবি দেশীয় এবং বিদেশীয় কবিদিগের কাব্য সম্পদ বহুপরিমাণে অনুধাবন এবং আয়ত্তীকৃত করিয়া থাকিবেন। "আশা-কাননের" উদ্দেশ্য বিষয়ে হেমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন "আশা-কানন একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য, মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজিতে এইরূপ রচনাকে এলীগরি কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সাদৃশ্য সূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত, ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশ্য সূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্য বোধক।" ইংরাজ কবি চসারের "House of Fame" এবং পোপের "Temple of Fame" এর সঙ্গে এই কাব্যের সাদৃশ্য আছে, সম্ভবতঃ কবি "আশা-কানন" রচনার পূর্ব্বে এই দুই কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন।

"আশা-কাননে" হেমচন্দ্রের হৃদয় কি রূপে বিশ্বমানবের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, "চিন্তাতরঙ্গিণী"র মনোভাবাক্রান্ত যুবা কিরূপে পুর্ণজীবন লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে। "সাহস" বলিতেছে—

এই পথে যাও কর্ম্ম ক্ষেত্র মাঝে
না কর অন্তরে ভয়,
কে বলে ক্ষণিক মানব জীবন?
জগতে প্রাণী অক্ষয়;

প্রাণিরঙ্গভূমে ভ্রম তীব্র তেজে
শরীরে অক্ষয় ভাব,
মৃত্যু তুচ্ছ করি জীব রঙ্গে মজি
দৈত্যের বিক্রমে ধায় ;
ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে এ মহীমণ্ডলে
জীবাত্মা বিধির সৃষ্টি ;
সেই ধন্য প্রাণী নিত্য থাকে যার
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি।

কিন্তু হেমচন্দ্র "আশাকাননের"শেষাঙ্কে নিরাশার ভীষণ মরুক্ষেত্র দেখিয়াছেন। বিশ্ব সৃষ্টির মধ্য স্থলে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড দেখিয়া তাঁহার আশার স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে। হেমচন্দ্র কি এই স্থলে আপন সংসার-জীবনের শোচনীয় পরিণতির বিষয় কবির চক্ষে দেখিয়াছিলেন ? কে জানে ! কিন্তু ঘটনা পরম্পরাত অপ্রত্যাখ্যাত ভাবে মিলিয়া যাইতেছে।

"আশা-কাননের" পরেই "ছায়াময়ী।" ইহজগতের মরুক্ষেত্র, পরজগতের অনন্ত নরকের সঙ্গে অপূর্ব্ব ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য. ইটালীয় কবি দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া নামক কাব্যের ছায়াবলম্বনে এই কাব্য প্রণীত হইয়াছে। ডিভাইনা কমেডিয়া বাইবেলের মতাবলম্বী অনন্ত নরকবাদী কবির বিরচিত, সুতরাং ইহাতে মানবাত্মার অনন্ত নরক যন্ত্রণা বিবৃত হইয়াছে,অনন্ত নরকবাদ ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। পরলোক, আত্মার পুনর্জ্জন্ম এবং অসংখ্য জীব-যোনিতে মানবাত্মার সংসরণ ও পরিশেষে ক্রমোন্নতিতে পরমাত্মার নির্ব্বাণ,—ভারতীয় ঋষিগণ এই মতেই সংসারকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং "ছায়াময়ী" সর্ব্বাংশে ভারতীয় বিশ্বাসের অনুকূল নহে। ইয়ুরোপে বিশেষতঃ ইটালীতে দান্তের কাব্য অপরিসীম অর্চ্চনা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত যেমন সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ অপেক্ষা ভারতীয় আর্য্যজাতীয় সমাজে এবং ধর্ম্মে এক অদ্ভুত একত্ব আনয়ন করিয়াছে; বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন লোকনিবহকে একই সূত্রে বদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত এবং এক অনির্ব্বচনীয় সমপ্রাণতার দিকে অগ্রসর করাইতেছে; মহাকবি দান্তের কাব্যও সেইরূপ নব্য ইটালীয় জাতিকে সংহত, গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই কাব্যের মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্য বিষয়ে দ্বৈধমত হইতে পারে না। "ছায়াময়ী'' অনুবাদ হইলেও ইহার অনেক স্থল পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। হেমচন্দ্রের ভাষা এবং ছন্দোবন্ধ উভয়ই এই কাব্যে বৈচিত্র্য এবং বিস্তার লাভ করিয়াছে। ফলতঃ "বৃত্রসংহার" কাব্যের রচয়িতার শিক্ষা, চিত্তস্থৈর্য্য, নিপুণতা, শক্তি এবং উদ্দাম কল্পনার পূর্ব্বাভাষ "ছায়াময়ী''তে পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ছায়াময়ীতে" সংসারের এক ভয়াবহ নিয়তি চিত্রিত হইয়াছে। এই চিত্রে কুত্রাপি অনুমাত্র সান্ত্বনা নাই। জীবরঙ্গভূমে, এই অবিশ্রাম ষড়রিপুর অনিবার্য্য সংগ্রাম এবং ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্খলিত-পদ দুর্ব্বল মানবের জন্য কোন্ বিভু এই ভীষণ নরক যন্ত্রণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, জানিনা। হেমচন্দ্র উহার চিত্র অনুপম ভাবে বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন।

'চিন্তা-তরঙ্গিণী' 'আশাকানন' 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,হেমচন্দ্র কেবল মাত্র জগতের

অশুভদর্শী কবি। এই উক্তি সমীচিন নহে। হেমচন্দ্র অদৃষ্টবাদী ; প্রবীণ গ্রীক দার্শনিক ও কবিগণ এবং ভারতীয় ঋষিগণের অনেকেই অদৃষ্টবাদী ছিলেন। মঙ্গলই জগতের নিয়তি এবং জগদীশ্বর মঙ্গলময়, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল। যাঁহারা জীবাত্মার কোটী কোটী বার সংসরণ অর্থাৎ জন্ম পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন, এবং যাঁহাদের ধর্ম্ম সেই আদর্শে গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এক জীবনের দুঃখ কষ্ট কিছুই নহে। হেমচন্দ্র বীর পুরুষ, তাঁহার হৃদয় প্রবীণদিগের ধাতুতে গঠিত। সেই হৃদয়ে কোন রূপ ভীরুতা কিম্বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ছিল না। ইহজগতের হৃদয়ের ভিতর যাহা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তিনি অকুণ্ঠিত এবং অব্যাকুল ভাবে "আশাকাননে" তাহা দেখাইয়াছেন ; তৎপরে "ছায়াময়ী" প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে আপন মত যে সম্পূর্ণ মিলিতেছে না, সে কৈফিয়তও দিয়াছেন।

"ছায়াময়ী" প্রকাশ করিয়া হেমচন্দ্র নরক-বাদ এবং আপন বিশ্বাসের মধ্যে এক তুমুল আত্মিক সংগ্রামে পড়িয়া গেলেন। বিশ্বজগতের পর্দ্দার নীচে প্রবেশ করিয়া একবার প্রকৃত রহস্য কিসে বুঝিয়া লইবেন, সেই আশায় আকুল হইলেন। হেমচন্দ্র প্রকৃত মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী, সম্মিলিত মানব জাতির উন্নতি সম্বন্ধে এত ভাবনা ভাবিয়াছেন, আমাদের দেশে এমন কবি আর নাই। এই আকুলতার ফল "দশমহাবিদ্যা।" "দশমহাবিদ্যার" 'মানসী মূর্ত্তি হেমচন্দ্রের হৃদয়ে কবে কল্পিত হইয়াছিল, জানি না, দেখা যাইতেছে, ইহা 'বৃত্রসংহারের' পরে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এই কাব্য "আশাকানন" ও "ছায়াময়ীর" সঙ্গে সমসূত্রতার সম্বন্ধ এবং হেমচন্দ্রের পরিণত কল্পনার এবং বিশ্বাসের ফল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে এক অদ্বিতীয় বস্তু, ইহা সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত নয়, সুতরাং সাধারণের জন্য ইহার সদর দরজা ভিতর হইতেই বন্ধ আছে। এই কাব্যে 'ছায়াময়ীর' ক্ষণিক বিষাদ-ভারাক্রান্ত কবির ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস, কবিত্ব গৌরবের সঙ্গে মিশিয়া, এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহা একভাবে গ্রীষ্টীয় নরকবাদের প্রতিবাদ। কবি প্রথমাবস্থায় নারদ সাজিয়া দুঃখময় জগতের মধ্যে মঙ্গলময়ীকে—জগদীশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে আকুল ভাবে খুজিতেছেন, কোথাও দেখিতে পাইতেছেন না। তখন মানব হৃদয়ের সেই পিপাসা-কাতর চিরন্তন প্রশ্ন উঠিয়াছে—

কহ, ত্রিপুরারি কোথা গেলে তারি—
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙ্গা চরণ মনের মতন
সাধনে আবার পূজিব।

তখন শিব দেখাইলেন ; নারদের ভ্রান্তি দূর করিলেন। বিশ্বের আবরণ খুলিয়া দিলেন, সুখে দুঃখে, পতনে স্খলনে সহস্র আশা হতাশার মধ্যে জগতের ভিতর যে মহামায়ার ছায়া, যে মঙ্গল নিয়তি কার্য্য করিতেছে, উন্মার্গগামী মানব হৃদয়কে যাহা হিরণ্য রজ্জুতে আনন্দময়ী পরা শান্তির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া ধারণ করিতেছে, নারদকে দয়াপরবশে তাহা দেখাইলেন—

বিশ্ব আবরণ হবে নিবারণ
দেখিবে এখনি নিমেষে,
বিশ্বরূপ ধরা বিশ্বরূপ হরা
খেলেন আপন হরিষে।

দেখিবে এখনি অন্যান্য মূরতি
অপার আনন্দে মাতিয়া—
বিদ্যারূপ দশ ভুবন পরশ
করেছে আকাশ জুড়িয়া।
মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়
সেরূপ দেখিবে নয়নে।
এই ভবলীলা যেবা বিরচিলা
দেখিবে সে আদি কারণে।

ভব-কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া নারদ দিব্যচক্ষে অনবগুণ্ঠিত দশটী মহা ভুবন দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন, মহাকাশ উজ্জ্বল করিয়া প্রাণীগণ ভুবনে ভুবনে অভিযান করিতেছে—

বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ু পথে চলেছে,
হৃদয়দর্পণ-ছায়া বদনেতে ফুটেছে।
প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার,
নানা পাশ নানা ফাঁসে গলদেশে পড়েছে;
বিবিধ শৃঙ্খল হার কর পদে বেঁধেছে;
কত প্রাণী হেন রূপে বায়ু পথে চলেছে।

এই প্রাণীগণ কে

সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ,
মাটীর শরীরে ধরে দেবের বাসনা;
মিটেনা মনের সাধ হৃদয়ে বেদনা!
আধ ভাঙ্গা সাধ যত পরাণে জড়ায়।
অসুখে কতই দুঃখে জীবন কাটায়।
দেব তুল্যবাসনায় উর্দ্ধদিকে গতি
পশু তুল্য পিপাশায় সদা দগ্ধ মতি!

ইহারা মানব, কিন্তু ইহারা এ কষ্ট কেন সহ্য করিতেছে, এ কষ্টের কি শেষ নাই? এখানেই সেই অশুভবাদিতার আপত্তি উঠিতে পারে—

না হও নিরাশ অরে ভক্তিমান,
ভূতেশ কহেন নারদে;
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন আছেরে আপদে;
কলামাত্র তার হেরিলে নয়নে
অনাদ্যার অঙ্গ জগতে।
পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে।
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা,
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন
এমনি বিধানে যোজনা।
পর পর পর এদশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি;
অনন্ত অসীম কাল আছে মাঝে
অনন্ত জীবিত মণ্ডলি।

এই বলিয়া শিব নারদকে মহাবিদ্যার দশ মহাপুরি দেখাইলেন। নারদ বুঝিলেন, এক অনবচ্ছিন্ন নীতির নির্ভরে বিশ্ব-সৃষ্টি পালিত হইতেছে। ন্যায় এবং ক্রমবিকাশের প্রণালী অবলম্বনে সভ্যতা এবং স্বাধীনতার অনুপাতে সুখ দুঃখ জগতে জগতে বিভাজিত হইতেছে—

জগত অশুভ নয় কালেতে হইবে লয়—
জীব দুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।

"দশমহাবিদ্যা" রচনা করিয়া হেমচন্দ্রের হৃদয় শান্তি লাভ করিল, অতঃপর তিনি আর এই ক্ষুরধার দুর্গম পথে লেখনী চালনা করেন নাই; তিনি সমধিক উচ্চ আশায় মহৎ লক্ষ্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি বঙ্গ সাহিত্যে একটী মহাকাব্য রাখিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা, নৈপুণ্য, লোক-চরিত্র-জ্ঞান, এবং দেশীয় বিদেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যাদির অভিনিবিষ্ট অধ্যয়ন, এই কাব্যের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট উপযুক্ত করিয়াছিল। বিষয় নির্ব্বাচন, সাহিত্যে সফলতার প্রধান সেতু। কবি হেমচন্দ্র, যিনি মানবহৃদয়ের শক্তি, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি প্রবৃত্তিকেও ব্যক্তিত্ব প্রদান করেন, যিনি জাতীয় সঙ্গীতের রৌদ্র রসে স্বদেশ পরিপ্লাবিত করিতে

চান, যিনি অমরী সহ মানবের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় লোকে বিচরণ করেন, স্বীয় মহাকাব্যের জন্য কল্পনার স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াভূমির জন্য, ইতিহাসের অথবা পুরাণের কীদৃশ বিষয় তাঁহার মনঃপুত হইতে পারে? যাহাতে স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং রসাতলে অবাধে বিচরণ করা যায়, যাহাতে অব্যাকুল ভাবে ধীর, করুণ এবং অদ্ভুত রসে সন্তরণ করিতে পারা যায়, হেমচন্দ্র বাছিয়া বাছিয়া এমন বিষয়ই স্থির করিলেন।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রক্ষেপ ও বৃত্রের (মেঘের) নিধনের ক্ষুদ্র রূপক লইয়া পৌরাণিকেরা একটা বৃহৎ আখ্যায়িকা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। দধিচির মহান্ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে এই আখ্যায়িকা সর্ব্বাগ্রে চিত্তাকর্ষণ করিত, হেমচন্দ্রও আকৃষ্ট হইলেন। দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যূন "আশাকাননের" সমসাময়িক কাল হইতে উক্ত বিষয় হেমচন্দ্রের হৃদয়ে উপাদান সংগ্রহ করিতেছিল, যথা

ইন্দ্রাদি দেবতা   দনুজ দৌরাত্ম্যে,
পরিহরি স্বর্গ পুরী।
ধরি ছদ্মবেশ   করিলা ভ্রমণ
অসিয়া পৃথিবী 'পরি।
স্বার্থ পরবাস   আশা না আইল
অমরাবতীতে থাকে।

বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্র পরে এই কল্পনা পরিত্যাগ করেন, বৃত্রসংহার কাব্যে আশার পরিবর্ত্তে সুরবিরহিত স্বর্গপুরীতে মদন ও রতিকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে।

"বৃত্রসংহারের" বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। স্থূলতঃ এই বলিতে পারা যায়, কবি এই কাব্যে আপন শক্তি „সামর্থ্যের চরম সীমা দেখাইয়াছেন। সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া স্বসমাজ এবং স্বদেশের সমস্ত সংকীর্ণতা দূরে রাখিয়া, বিশ্বজনীন ভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত চরিত্র সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন, কল্পনার আলোকচ্ছটায় কখন বা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে, কখন বা মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে পাঠকের অজ্ঞাত অভাবনীয় সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

রসের এবং ভাবের উদ্দীপনায়, স্থিরীকরণে যথোপযুক্ত সংযম এবং একগ্রতা এই কাব্যের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কুত্রাপি কবির চাঞ্চল্য অথবা দুর্ব্বলতার পরিচয় নাই, সর্ব্বদিক বিবেচনা করিলে, এই কাব্যকে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ, সুগঠিত এবং সুগ্রথিত কাব্য বলা যাইতে পারে।

"বৃত্র-সংহার" কাব্যের নাটকীয় সমাধন সুন্দর। চরিত্রগুলি একটা বিশেষ বিশেষ স্থায়ীভাবে অনুপ্রাণিত। কবির লক্ষ্য সর্ব্বত্র স্থায়ীভাবের উদ্দীপনায় স্থির আছে। ভাবের আলম্বন এবং উদ্দীপন কারণ সমস্তই সবিশেষ গৌরবান্বিত; চরিত্র সমূহের ভিত্তি, মেরুদণ্ড এবং অভিযান অসাধারণ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কাব্যের সৌষ্টব এবং চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা বিষয়ে কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কবি অবশ্য ভাষার লালিত্য, অথবা ভাবের সৌকুমার্য্য বিষয়ে সর্ব্বত্র অল্পাধিক উদাসীন, স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের গুরুভারে ভাষা নিপীড়িত এবং ভাবকে নিষ্পেষিত হইতে দেখা যাইবে। আবার কোথাও এক একটা পদের ভিতর এত অর্থ সংহত হইয়া আছে যে, পাঠ মাত্র মন ধ্যানস্থ হইয়া উঠিবে। এইরূপ এক একটা পদ হীরক খণ্ডের মত কঠিন এবং উজ্জ্বল। কোথাও বা অতি ক্ষুদ্র অবস্থা সংস্থানে মনে অতি-

ত্বরিত ভাবে আলোকের দ্বারা খুলিয়া যাইবে। এইরূপ পদ ও ঘটনাসংস্থানের দৃষ্টান্ত "বৃত্রসংহার" হইতে অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, উহারা শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত। কিন্তু কবি সূক্ষ্ম শিল্পী নহেন, "বৃত্র-সংহারে" চরিত্রের বা ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কচিৎ পরিদৃষ্ট হইবে। যেই অবস্থায় সুর ক্রমশঃ কোমলে মধুরে নামিয়া আসিয়া পরিশেষে শ্রোতৃমণ্ডলীকে হঠাৎ ভাবের অতলস্পর্শের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া মনোময় প্রপঞ্চে বিলীন হইয়া যায়, "বৃত্র-সংহারে" সেই অবস্থা বিরল। কবির স্বর সর্ব্বত্র উচ্চগ্রামে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে স্বর হয়ত কাটিয়া যাইয়া কর্কশে পরিণত হইতেছে, তথাপি শ্রোতৃবর্গ গায়কের শক্তি ও স্বর-সাধনায় বিমুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছে। অলৌকিক বিষয়ের আশ্রয়ে মহাকাব্য-লেখক মাত্রেরই এই দোষ দৃষ্ট হয়; কি মিলটন, কি দান্তে, কেহই এই দোষের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্র রচনাধর্ম্মে, গাম্ভীর্য্যে এবং অর্থ-গৌরবে বঙ্গভাষার ভারবি। উক্ত কবির "কিরাতার্জ্জুনীয়ের" ন্যায় বৃত্রসংহার চিরকাল বঙ্গভাষার একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বি বিশিষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। হেমচন্দ্র যেই প্রকৃতির বিষয়ে লেখনী চালন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া গেলেন, সেই পথে হেমচন্দ্রকে অতিক্রম করা অসম্ভব হইবে। অপরিজ্ঞাত অলৌকিক বিষয়ের ধারণায়, চিত্রণে এবং স্ফুটীকরণে কবি কল্পনার যে মাহাত্ম্য আছে, সেই মাহাত্ম্যে হেমচন্দ্রের নাম চিরকাল বঙ্গসাহিত্যে সমুজ্জ্বল থাকিবে।

"বৃত্রসংহারে" সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক এবং উজ্জ্বল চরিত্র শচী, শচীই 'বৃত্রসংহারের' নায়িকা, সমস্ত ঘটনা-বৈচিত্র্যের পরিচালয়িত্রী এবং বৃত্রের ধ্বংসের মূল কারণ। হেমচন্দ্র আপন কল্পনায় সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া এই চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। শচীর সুখ দুঃখ সমস্তই অসাধারণরূপে মহামান্বিত, কখন বা শচীর কথায় ব্যবহারে, কখন বা ঈর্ষাকাতরা ঐন্দ্রিলার অসূয়াবাক্যে, হেমচন্দ্র শচী-চরিত্রের যে রেখা-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা চিরদিন বঙ্গসাহিত্যে দর্শনীয় স্থল অধিকার করিয়া থাকিবে। ঐন্দ্রিলা বলিতেছে :—

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি যে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে
শচীর মহত্ত্ব ভুলেনা কেহ !
শুনেছি নাকি সে পরম রূপসী,
বড় গরবিনী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদে কিবা সে হরষে
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে।

ঐন্দ্রিলার ঈর্ষাই শচী চরিত্রের নৈতিক গুরুত্বের প্রধান প্রমাণ। এই শচী কবি-হৃদয়স্থ রমণী-মহিমার মানসী মূর্ত্তি; অপর পক্ষে "বৃত্রসংহার" কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী বাণীর মূর্ত্তিও কি এইরূপ নহে? "বৃত্রসংহারে" যেই বাণী প্রকটিত হইয়াছেন, হেমচন্দ্র তৎ পূর্ব্বে কি পরে আর তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। কবির কাব্যরাজীর মধ্যে উহা একরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মস্তক উন্নমিত করিয়া উঠিয়াছে। বৃত্রসংহারে মহীয়সী বাগ্দেবতার অধিষ্ঠান হেমচন্দ্র জাগ্রতভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। মনে হয়, সেই 'বড় গরবিনী নারী গরীয়সী' মূর্ত্তি যেন কেবল শচী বর্ণনা নহে, কবি অতর্কিতে আপন হৃদ্পদ্মস্থিতা বীনাপাণীর মূর্ত্তিও লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়াছেন।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র উভয়েই প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন মহাকাব্য লেখকগণের ভাব সঙ্কলন বা পন্থানুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের স্বাভাবিকতা অসাধারণ, তাঁহার প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক পাত্রে পতিত হইলে পরের জিনিষও সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়; শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ ইহাকেও এক শ্রেণীর মৌলিকতা বলিয়া মনে করেন। মধুসূদন ধুম জ্যোতি সলিল এবং বায়ুর সংযোগে বঙ্গভূমির সাহিত্য-কাননে এক অভিনব ছায়াপূর্ণ বর্ষাচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সহস্র দোষ সত্ত্বেও এক মাত্র স্বাভাবিকতার গুণে এই চিত্র বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। মধুসূদনের মত স্বাভাবিকতা হেমচন্দ্রের নাই, কিন্তু প্রতিভার ইন্দ্রজাল পূর্ণমাত্রায় আছে; এবং তিনি মধুসূদন অপেক্ষা সমধিক সাবধান এবং সতর্ক। হেমচন্দ্রের হৃদয় বীরজন-সুলভ কঠোরতায়, সরলতায় এবং সাধুতায় পরিপূর্ণ; ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব।

উক্ত উভয় কবি প্রবীণ মহাকবিদের প্রায় সমস্ত লোভনীয় উপাদান এবং উপকরণ প্রতিভার ইন্দ্রজাল সাহায্যে বঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। অলৌকিক ক্ষেত্রে এমন করিবার জন্য পরবর্ত্তীর জন্য কোন সুবিধা রাখিয়া যান নাই, তাই তাঁহাদের পর নবীন চন্দ্রের প্রতিভা ঐতিহাসিক এবং জাতীয় সূত্র অবলম্বনে বিভিন্ন এবং মৌলিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। এই কবিত্রয়ের ভারতী পরস্পর বিভিন্ন। হেমচন্দ্রের রচনায় সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শক্তির পরিচয়ই অধিক; মধুসূদনে ইহার বিপরীত। মধুসূদন চিত্রকর, চঞ্চল তুলিকা স্পর্শে তিনি মনোরথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলেন, উজ্জ্বলতায় এবং কোমলতায় তাহা সর্ব্বাগ্রে চিত্তাকর্ষণ করে। হেমচন্দ্র ভাস্কর, সুদৃঢ় লৌহদণ্ডের সাহায্যে বাহুবলে তিনি পাষাণ গাত্র হইতে প্রাণী প্রতিমা প্রকটিত করেন; তাহারা পাষাণময়ী হইলেও সজীবতায় এবং বৈচিত্র্যে হৃদয়গ্রাহী হয়। নবীনচন্দ্র বাহুকর, সত্য এবং কল্পনার প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত ভাবের সংমিশ্রণে, রসের বৈচিত্র্যে, উজ্জ্বলতায় এবং দ্রুত গতিতে তাঁহার রচনা মনে মোহ উৎপাদন করে।

তথাপি "বৃত্রসংহার" বঙ্গীয় পাঠকসমাজে আশানুরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই; তাহার কারণ প্রধানতঃ বঙ্গে প্রকৃত কাব্যরসজ্ঞের সংখ্যাহীনতা। সুখের বিষয়, এই সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের হৃদয় এখনও উচ্চাঙ্গের কবিতা এবং প্রতিভার বৃহৎ সৃষ্টিশক্তির ধারণা ও তদ্গত আনন্দ উপভোগ করিবার উপযুক্ত হয় নাই। আমরা কবিতার ক্ষণিক আমোদই খুঁজিয়া থাকি। রসের কিম্বা ভাবের সংযম কিম্বা গাম্ভীর্য্যে আমরা তৃপ্তি লাভ করি না; সংযত করুণ রসের পরিবর্ত্তে উৎকট আর্ত্তনাদ এবং বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন, সংযত বীররসের পরিবর্ত্তে উন্মত্ত প্রলাপ এবং বিকট গর্জ্জন শুনিতে পাইলে আমরা শিশুর মত পরিতৃপ্ত হই। দ্বিতীয় কারণ, উক্ত কাব্যে জাতীয়তার অভাব, বাঙ্গালীর জাতীয়তা নাই বটে; কিন্তু তাহারা প্রাচীন আর্য্য জাতির সঙ্গে আপনাদের রক্ত সম্পর্ক স্থির করিয়া বসিয়া আছে। রামায়ণ, মহাভারত কি পুরাণ-বর্ণিত আর্য্য-বীরত্বের উদাত্ত গাথা তাহার

হৃদয় পুলক পূর্ণ করে ; রাক্ষস অথবা দৈত্যের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাহার সাধারণ সহানুভূতি থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত রাক্ষস অথবা দৈত্য যখন আর্য্য অথবা আর্য্যোপাসিত দেবতার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, তখন সহস্র শৌর্য্যবীর্য্যে অথবা মহত্বে মণ্ডিত হইলেও তাহার চরিত্র-কাহিনী বাঙ্গালীর মনে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হইতে পারে না। হেমচন্দ্রের কাব্যানুরাগী পাঠক বঙ্গদেশে যে পরিমাণে অল্প, তাঁহার প্রভাব সেই পরিমাণে পরিমিত। সাহিত্যে কবির প্রভাব বুঝিতে হইলে, কবির আশ্রিত এবং উপজীবী উপকবির সংখ্যা ও তাহাদের অনুচিকীর্ষা পর্য্যালোচনা করিলেই অনেকটা স্থির করা যায়। হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত আদৃত হইয়াছে, দুই এক স্থানে হয়ত সম্যকরূপ অনুকৃতও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তদীয় অন্য কোন কবিতার বিশেষ কোন অনুকরণ হয় নাই। হেমচন্দ্রের ভাষায় কোন বিশেষ বর্ণ নাই, তাহার ছন্দেও বিশেষ বৈচিত্র্য নাই ; এক মাত্র ভাবের উদ্দীপনাতেই হেমচন্দ্র কবি। হেমচন্দ্রের রচনাধর্ম্ম বা উদ্দীপন প্রণালী এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্বের সহিত অনুসৃত হয় নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিবাদের ভাষায় বলা যায়—হেমচন্দ্র রচনায় উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থায়ী ভাব পরিস্ফুট করিতেই চেষ্টিত ছিলেন ; পরবর্ত্তী কবি ও কবিতা লেখকগণের মধ্যে ব্যভিচারী ভাবের প্রাধান্যই নিয়ত লক্ষিত হইতেছে।

অতঃপর হেমচন্দ্রের ক্ষুদ্র কবিতাবলী আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। এই সমস্ত কবিতা-সৃষ্টির কোন স্থান বা কাল নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতেছে না। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়া ইহারা সংগ্রহাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতাবলী কবি-হৃদয়ের প্রকৃত ইতিহাস। হেমচন্দ্র সর্ব্বত্র সরল। তাঁহার বাক্যভঙ্গিতে কোথাও কোন বক্রতা নাই ; ভিতরের মানুষটাকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। দুই শ্রেণীর গীতি-কবিতা পরিদৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর কবিগণ ভাবাবিষ্ট হইলে ভাবের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করেন ; সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে সেই সৌন্দর্য্যের কারণ স্থান কোথায়, তাহা খুজিবার জন্য প্রয়াসী হন। আবার এক শ্রেণীর কবিগণ ভাব এবং সৌন্দর্য্যে আবিষ্ট এবং মুগ্ধ হইয়া কবিতা লিখেন। তাঁহাদের লেখা পড়িয়া সহানুভূতি ক্রমে অপরেরা আবিষ্ট এবং মুগ্ধ হয়, এবং রচয়িতাও যে স্বয়ং মুগ্ধ হইয়াছেন, পাঠকের এই জ্ঞান তাঁহার কাব্যের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সহায় হয়। ইংলণ্ডের ওয়ার্ডসোয়ার্থ, সেলী, কীট্‌স এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ স্থূলতঃ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কবি ; হেমচন্দ্র শেষোক্ত শ্রেণীর। এই শ্রেণীর কাব্য পাঠকের পক্ষে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী চিরদিন নিশিগন্ধার ন্যায় সৌরভ প্রদান করিবে।

হেমচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতাগুলির বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। তাহারা কেম্পবেলের জাতীয় সঙ্গীতের ন্যায় মহত্বে, ঔদার্য্যে এবং সরলতায় বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। এই কবিতাগুলির সঙ্গে বায়রণের যৌউর (Giaur) নামক কাব্যের সাধর্ম্ম্য লক্ষিত হয়। তবে বায়রণ বিদেশী, গ্রীসের প্রতি উত্তেজনা-পূর্ণ ধিক্কার ভাবে তাঁহার কবিতা অনুপ্রাণিত। হেমচন্দ্রের কবিতায়

স্বদেশী স্বজাতীয় প্রতি সহানুভূতি এবং সমদুঃখকাতরতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়।

মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের মধ্যে হেমচন্দ্রের হৃদয়ই সমধিক উন্নত এবং প্রশস্ত, দেশের উন্নতি-স্বপ্নে সর্ব্বপ্রকার আশায় এবং তাহার সফলতায় হেমচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। মধুসূদন বিজাতীয় ভাবাপন্ন কবি, তিনি শক্তি ছিল বলিয়াই আস্ফালন করিতেন, গান গাহিতে জানিতেন বলিয়াই গাহিতেন; গৌড়জনের জন্য অক্ষয় মধু ভাণ্ডার সৃজন করিয়া যাইব, অমর হইব, স্মৃতি-জলে চিরফুল্ল তামরসের ন্যায় ফুটিয়া থাকিব, এইরূপ উৎকট যশোলিপ্সাতেই তিনি ভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশের সামাজিক জীবনের মূলশিখর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রতিভা-তরু সমাজের অন্তস্তলবাহী প্রকৃত প্রাণরস আকর্ষণ করিতে পারে নাই; আকাশে আস্থানিক শিকড় বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে স্বদেশ-প্রেম, অধীনতা এবং দেশাচারের লৌহ পীড়ন হেমচন্দ্রের প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এবং পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত কবির লেখাতেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, মধুসূদনে তাহার লেশ মাত্র পাওয়া দুষ্কর। এই অধঃপতিত জাতির হৃদয়োচ্ছ্বাস যখন প্রথম পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন এই অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণটী একেবারেই প্রকাশ পাইল না। সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা এক নূতন পদার্থ।

ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে 'গঙ্গার উৎপত্তি' একটা উৎকৃষ্ট বর্ণাত্মক কবিতা; 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' এবং 'দূর কাননের কোণে পাখী এক ডাকিছে' কবিতাদ্বয়ে যে মদিরময়ী বিহ্বলতা আছে, তাহাতে পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, ইহা কবির আত্ম-জীবনের কোন প্রকৃত ঘটনাবলম্বনে লিখিত কি? 'যমুনা-তটে' এবং 'জীবন-মরীচিকায়' যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আছে, মনে হয়, তাঁহা কবি-হৃদয়ের মর্ম্মতল হইতে বাহির হইয়াছে, তাই ইহারা এত আলোকে, অশ্রুতে এবং সৌরভে ওতঃপ্রোত। সহৃদয়তা, বন্ধু-প্রেম, উৎপীড়িত নারী জাতির প্রতি কারুণ্য, স্বদেশানুরাগ, জগতের সর্ব্বত্র সভ্যতা এবং ন্যায়ের বিস্তৃতিতে অপরিসীম সহানুভূতি, নিয়তিতে নির্ভর, সর্ব্বত্র সাধুতা এবং সতর্কতা এবং বীরজন-সুলভ কঠোরতায় হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় ওতঃপ্রোত ভাবে গঠিত করিয়াছিল। মানুষটীকে স্বরচিত কাব্যে গঙ্গাপ্রবাহের মত নির্ম্মল পবিত্র ভাবে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এই বঙ্গদেশে এই প্রকৃতির কবি আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

হেমচন্দ্র অনুবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, ইহাতেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের আদর্শ বুঝিতে পারা যায়। তিনি নানা দেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়া দীনা মাতৃভাষাকে ভূষিতা করিয়াছেন। স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি হউক, ইহাই তাঁহার একাগ্র কামনা ছিল। সহযোগী সাহিত্যিক কি কবির প্রতি তাঁহার অনসূয়া ও সহৃদয়তা বঙ্গীয় লেখকগণের আদর্শ স্থানীয়। "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীকে বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত করার সময় তিনিই লিখিয়াছিলেন "বলিতেই বা কি, সময় সময় হিংসার উদ্রেক হইয়াছে।" এইরূপ অনাবিল সারল্য ও সহৃদয়তা কয়জন দেখাইতে পারে?

হেমচন্দ্র শেষ জীবনে অন্ধ হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর অনেক মহাকাব্য-রচয়িতাকে অন্ধ হইতে দেখা যায়। কবি গ্রের অনুকরণে আমরা বলিতে পারি, দিব্য পদার্থে দৃষ্টি করিতে করিতে উজ্জ্বল আলোক সম্পর্কে তাঁহাদের দৃষ্টি দগ্ধ হইয়া যায়। হেম চন্দ্রের হৃদয় সর্ব্বথা মিল্টন, দান্তে এবং টেসোর উপাদানে গঠিত ছিল, তাঁহাদের ন্যায় জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কারণে হেমচন্দ্র দুর্ব্বহ যাতনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র দুর্গত দরিদ্র পরাধীন দেশের কবি, এই দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরস্বতীর সেবায় গ্রাসাচ্ছাদনও মিলিত না। তাই হেমচন্দ্র লক্ষ্মীর সেবাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মনকে সমগ্রভাবে সরস্বতীর চরণে অর্পণ করিতে পারেন নাই; "দশমহাবিদ্যা" প্রকাশ করিয়া ১৬ ষোল বৎসর কাল হেমচন্দ্র একরূপ নীরব ছিলেন। ইতি মধ্যে দুই চারিটী ক্ষুদ্র সামান্য কবিতা এবং রোমিও জুলিয়েতের অনুবাদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে যখন এত করিয়াও লক্ষ্মীমাতা অনুকূল হইলেন না এবং ভারতীও বিমুখ হইলেন, তখন সে দরিদ্র চক্ষুহীন অবস্থায় হেমচন্দ্র যে তীব্র যন্ত্রণায় নৈরাশ্যের নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাহা মানব-চরিত্র-পাঠকের এবং বঙ্গদেশীয় সাহিত্য-সেবীর অনুধাবনের বিষয় হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, একি করিয়াছি, কেন মজিয়াছিলাম, কেন সারদাকে ভুলিয়াছিলাম, এখন যে উভয়কে হারাইলাম।

প্রতিদিন কল্পনারে
পাই যদি পূজিবারে,—
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি,
এ চির মনের সাধ
মিটিল না অপরাধ;
নিও না দুঃখিনী মাগো দৈব প্রতিকূল,
কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা তরু মম বিনা ফল ফুল।

এই বলিয়া হেমচন্দ্র দুঃখিনী জন্মভূমির নিকটে, স্বদেশ স্বজাতির নিকটে সকরুণভাবে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই যৌবনের বীর-হৃদয় রুদ্রতেজোময় হেমচন্দ্র কি এই? তিনি চক্ষু হারাইয়াছিলেন, নিতান্ত দৈন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহার কারণ কি এই নৈরাশ্য? না, হেমচন্দ্রের বীর হৃদয় সমস্ত সাংসারিক আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারিত। প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মীর সেবায় হেমচন্দ্র হৃদয়ের আলোক হারাইয়াছিলেন, প্রাণের পরশ মণি হারাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছিল; কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। "আশাকাননের" শেষ ভাগে যে ভীষণ মরুক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রাণেই এই সময়ে জ্বলিয়াছিল। তাঁহার মানস চক্ষু বহু পূর্ব্বে হারাইয়াছিলেন, তাই যখন বাহিরের চক্ষু দুইটীও নিবিয়া গেল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তর্জগত ও বাহির্জগত তাঁহার নিকট অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া গেলঃ—

ধরা শূন্য জল স্থল অরণ্য ভূমি অচল,
না রহিবে কিছুরই বিচার;
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক ঘোর অন্ধকার,
বিভু কি দশা হবে আমার!

এ ক্রন্দন প্রকৃত প্রস্তাবে বহিশ্চক্ষুর জন্য নহে, অন্তশ্চক্ষুর জন্য। হেমচন্দ্রের এই 'বিভু কি দশা হবে আমার' কবিতার সঙ্গে একবার মিল্‌টনের শেষ কবিতার সহিত তুলনা করুন; দেখিবেন, একটা অপূর্ব্ব সত্যের উপর আলোক-পাত হইবে। মিলটনও হতভাগ্য অন্ধ; কিন্তু মিলটন অন্ধাবস্থা-

তেই প্যারেডাইস-লষ্ট্ রচনা করেন। বহির্জগত যখন মিল্‌টনের নয়ন হইতে সরিয়া গেল, চক্ষুদ্বয় যখন মুদ্রিত হইয়া গেল, তখন এই মহাকবির অন্তশ্চক্ষু বিকশিত হইয়া উঠিল। মিলটন অনন্ত আলোক রাজ্যে দিবারাত্রি বাস করিতে লাগিলেন, যথা ;—

অন্ধ আমি বিগত যৌবন,
লোকে বলে ভবেশের ভ্রূকুটী আহত,
শোকতপ্ত, মনোবল হয়েছে বিগত
তবু আমি নহি ক্ষুণ্ণ মন !
এত দুর্ব্বলতা মাঝে কত বল স্বামি !
নয়নে দেখিনা বলে না হই কাতর,
দীন নিরাশ্রয় তবু, তোমারিত আমি
ওহে পিতা অখিল ঈশ্বর !
অহে দেব করুণা নির্ঝর !
মানুষ সরিলে দূরে তুমি আস কাছে,
স্বজনেরা ছেড়ে গেলে তব কর্ণে বাজে
তোমার রথের চক্রস্বর !
তব জ্যোতির্ম্ময় মুখ স্নেহেতে আনত—
মম পানে ; পূত জ্যোতি তার
আমার বিজন বিশ্বে ঝরি' অবিরত
নাশিতেছে আমার আঁধার।
নত শিরে বিশ্বাসে নির্ভরে—
তব ইচ্ছা ইচ্ছাময় পেরেছি বুঝিতে
এ আঁখি নিয়েছ তুমি দিয়েছ দেখিতে
তোমারেই কেবল তোমারে !
আর মম নাহি কোন ভয়,
এ আঁধার সেত তব স্নেহপক্ষ ছায়া,
পবিত্র হয়েছি তাহে নিকটে আমার
নাহি আসে কলুষের মায়া !
ওহে দেব মনে হয় আসিয়াছি চলে
যে দেশে মানব কভু ফেলেনি চরণ.
দাঁড়ায়েছি জ্যোতির্ম্ময় তব হস্ত তলে
মানবের আঁখি ধারে পায়নি দর্শন !
কত দৃশ্য আসে যায় চলে,
অপরূপ জ্যোতিমূর্ত্তি ঘিরে চারিধার,
অমর অধর হ'তে সঙ্গীত উথলে
কি পবিত্র মাধুরী তাহার !
কি দুঃখ তাহার দেব, খুলেছে যখন
দৃষ্টিহীন দৃষ্টিপরে ত্রিদিবের দ্বার,
লাগিছে স্বর্গের বায়ু ভালেতে আমার
এ ধরণী রহে যদি আঁধারে মগন !
সেই সে পবিত্রতর জগতের মাঝে
ভূমানন্দে ভরে উঠে আমার অন্তর,
কোথা হতে ছুটে আসে ভাবের লহর,
মহান্ সঙ্গীত রাগ অযাচিত বাজে !
দাও মোরে বীণাটী আমার !
হৃদয়ে দেবের প্রীতি হতেছে সঞ্চার,
অপার্থিব অগ্নিজ্বালা জ্বলিয়াছে বুকে
যাহে মোর নাহি অধিকার !

প্যারাডাইস্‌লষ্ট-রচয়িতার চিত্ত-সমুন্নতি ও চরিত্র-ভিত্তি কতদূর দৃঢ়, তাহা উপরোক্ত কবিতার প্রতি ছত্রে প্রকাশিত হইতেছে। মিল্‌টন অন্ধকারে অচল অটল সুমেরুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার শিরোদেশ দেবাধিষ্ঠানে আলোকমণ্ডিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের শেষ কবিতায় যে নৈরাশ্য-মিশ্রিত অশ্রুজল বর্ষিত হইয়াছে, তাহা "বৃত্রসংহারের" কবির লিখিত বলিয়া প্রথমে বিশ্বাস করা যায় না। মন বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়। কেবল হেমচন্দ্রের দুঃখে নয়, একজন মহামহিম পুরুষকে ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে দেখিলে ক্ষোভ ও দুঃখ উভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের চিত্ত-সমুন্নতি মিল্‌টন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না ; ইহার জন্য একা হেমচন্দ্র দায়ী নহেন, আমরাও দায়ী, আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের বর্ত্তমান দুরবস্থা দায়ী।

আমরা এই প্রবন্ধে স্থূলতঃ হেমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ, তাঁহার কবিতা ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব আলোচনা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মতে তাঁহার কাব্য-জীবনেরও আলোচনা করা

গিয়াছে। তাঁহার বাস্তব জীবন কাব্য-জীবন হইতে পৃথক ছিল কি না, সেই বিষয় বলিবার আবশ্যক মনে করি নাই, কারণ কাব্যে ও গ্রন্থাদিতে নিমগ্ন হইয়াও ওতঃপ্রোত হইয়া যে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান আছেন, সেই অশরীরী হেমচন্দ্রই আমাদের পরিচিত, তিনিই অমর। তিনি এই বিশ্ব-সংসারের স্থায়ী অধিবাসী। তিনিই এখন হইতে আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের সুখ দুঃখের চিরসঙ্গী। তিনিই অনন্তকালের জন্য মনোজগতে বর্ত্তমান থাকিয়া বাঙ্গালীর জীবনকে গঠন করিতে থাকিবেন। অদ্য আমাদের নিকট তিনি বিদেহ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণ, তাঁহার প্রেম, তাঁহার সহৃদয়তা অদ্য আমাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। হইতে পারে, তাঁহার সাংসারিক জীবন অপর সাধারণ লোকের ন্যায় ছিল; হয়ত তিনি সকল সময়ে জীবনকে আপন ইচ্ছার এবং আদর্শের অনুরূপ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। সংসারের হেমচন্দ্র প্রকৃত হেমচন্দ্র নহেন। আমাদের দর্শন বলেন, মানুষের একটা সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহা জ্ঞানময়, আমরা যে বিষয় দীর্ঘদিন চিন্তা করি, জীবনের অধিকাংশ সময় যাহার ধ্যান করি, এই বিজ্ঞান দেহে তাহার ছায়া পড়ে। মৃত্যুর সময়ে চিরজীবনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা এবং প্রবৃত্তিই প্রবল হয়; শরীর পড়িয়া থাকে, ও তাহা লইয়াই জীবাত্মা পরলোকে চলিয়া যায়। সংসারের ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ধর্ত্তব্য নয়, আমরা বিজ্ঞান-দেহী প্রকৃত হেমচন্দ্রকে দেখিতেছি। তাঁহার কতদিনের কত রাত্রির গভীর ধ্যান যোগের ফল, বিন্দু বিন্দু হৃদয় রক্তের বিক্রয়ে কত পরিশ্রম, কত অন্বেষণের পুরস্কার; মানবের চক্ষু যাহার কখনও সন্ধান পায় নাই, এমন কত দুর্গম ক্ষুরধার পথে ভ্রমণের ইতিহাস, আমরা তাঁহার কাব্যাদিতে পাইতেছি। তিলে তিলে শরীর পাত হইয়া যে অশরীরী হেমচন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি চির কালের জন্য আমাদের মন, আকাশ, বায়ু জল, স্বদেশ এবং সমাজ অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন! *

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

জগৎকিশোর ও জিতেন্দ্রকিশোর। †

জগৎকিশোর।

নির্ব্বংশ সগর বংশ করিতে উদ্ধার,
মর্ত্ত্যধামে মন্দাকিনী আনে ভগীরথ,
মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি নাহি আর তার,
সে এখন কীর্ত্তিনাশা কর্ম্মনাশাবৎ!

মৃত এ পতিত জাতি, মৃত জন্মভূমি,
ভাষা মাত্র আশা তার উদ্ধার উপায়,
সে পুণ্য অমৃত-গঙ্গা বহাইয়া তুমি,
জাতীয় জীবন রাখ স্নেহ করুণায়!
অনন্ত অভাব ঘটা বেষ্টিত জটায়,

মহা দৈন্য গিরি অন্য, সবে রোধে পথ,
কঠোর জঠর জ্বালা জহ্নু সম হায়,
দুর্ভাবনা দুর্ম্মনস্ মহা ঐরাবত!
নাশি এপথের বিঘ্ন ভাসায়ে ভারত,
বহাও অমৃত-গঙ্গা নব ভগীরথ!

---

* এই প্রবন্ধ বিগত ২৫ শে জুন তারিখে "চট্টোগ্রাম অধ্যয়ন-সম্মিলনী’ কর্ত্তৃক আহূত কবির স্মৃতিসভায় পঠিত হইয়াছিল।

† মুক্তাগাছার বিখ্যাত দানশীল জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

জিতেন্দ্রকিশোর।
মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুণ্য তপোবনে,*
আরম্ভিলা যজ্ঞ বিঘ্ন অসুর যখন,
কুমার শ্রীরাম তারে বিনাশিয়া রণে
তাপসে তুষিয়া কৈলা যজ্ঞ সম্পাদন!

তেমনি এ বঙ্গভাষা—সাহিত্য-কাননে,
মহাশত্রু মহাবিঘ্ন দারিদ্র্য দানব,
অন্নচিন্তা অর্থচিন্তা শত উৎপীড়নে,
করে সারস্বত যজ্ঞে মহা উপদ্রব!

কুমার রামের মত তুমিও কুমার
কর এই যজ্ঞ রক্ষা—দেশের মঙ্গল,
জগতে এমন যজ্ঞ নাহি আছে আর
এ যজ্ঞে উদ্ভবে কাব্য-সুধা-পুণ্যফল!
দুঃখভয় ধনুর্ভঙ্গে, ভুবন-বিদিতা
লাভ কর লক্ষ্মীরূপা মহাকীর্ত্তি সীতা!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

* * *

চণ্ডীদাস। (২)

(রামীর প্রেম।)

কবি-হৃদয়ে প্রেমের অস্বাভাবিক স্ফুরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পরম প্রেমিক প্রেমময় বিধাতার আশীর্ব্বাদে প্রেম সকলের হৃদয়েই প্রতিভাত, তবে কাহারো হৃদয়ে বা বেশী, কাহারো হৃদয়ে বা কম। মানুষ সেই প্রেমময়ের প্রেমের অংশটুকু ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেনা; সে প্রেম একের জন্য নহে,—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই তাহা এজমালী ধন; আপনা হইতেই তাহা বিশ্ব সংসারে ছড়াইয়া পড়ে,—চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া লোকে সেই প্রেমময়কেও বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই প্রেমকণাটুকু সহস্র চেষ্টাতেও ভুলিতে পারে না। জীবন মরণে তাহারই 'চরণসার'।

'ওরূপ মাধুরী, পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস।
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার।'

চণ্ডীদাসের প্রেমের গভীরতা আছে, ইহা কেবল মুখের দুইটী মধুর কথা নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ('Love is Heaven and Heaven is love') রামীর সহিত তাঁহার প্রেম যত নিন্দনীয় বলিয়াই না কেন লোকে ঢক্কা নিনাদে প্রচার করুক, মণিকাঞ্চনের ন্যায় রামীর সহিত তাঁহার সংযোগ না হইলে, তাঁহার প্রীতি ও কবিত্বের মূল প্রস্রবণ বিচ্ছুরিত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার প্রেম যে স্বর্গীয় পদার্থ, রামা যে সামান্যা স্ত্রী নহে, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব। যে প্রেমিক রজকিনী প্রেমিকাকে বলিতে পারে—

'শুন রজকিনী রামি!
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।

যে বলিতে পারে—

তুমি রজকিনী, আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়িত্রী।

সে 'রজকিনী-প্রেম' নিশ্চয়ই 'নিকষিত হেম'। সে প্রেমিক এ জগতের নহে, আর সে 'রামাও সামান্যা নহে'।

চণ্ডীদাসের সহিত রামমণির মিলন বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। রামী নিঃসহায় অবস্থায় ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায় বিশালাক্ষীর মন্দিরে দাসীরূপে নিযুক্তা হইল। পরে বাশুলী দেবী তাঁহার সহিত প্রবর্ত্ত হইতে চণ্ডীদাসকে আদেশ করেন। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ হইয়া রজকিনীতে প্রবর্ত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, বাশুলী তাঁহাকে সার উপদেশ দেন। আবার এদিকে রামীকেও বাশুলী স্বপ্নে চণ্ডীদাসের সহিত প্রবর্ত্ত হইতে আদেশ করেন।* স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে রামী চণ্ডীকে সকল কথা বলিল, চণ্ডী প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। পরে—

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি
নিশ্চয় মরম কহি জ্ঞানে।
বাশুলী কহিছে যাহা সত্য করি মান তাহা
বস্তু আছে দেহ বিদ্যমানে॥
আমিত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥

ইহার পর চণ্ডীদাস আর কোন অপত্তি করিলেন না,—বাশুলীর আদেশ ও রামীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 'ধোপানী চরণ সার' করিলেন।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, চণ্ডীদাসের এতটা করা কি ভাল হইয়াছে? তুমি না হয় রামিনীকে খুবই ভাল বাসিলে, তাহা বলিয়া কি তাহার চরণ মাথায় করিতে আছে? এদুত্তর আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চণ্ডীদাস রামীকে সামান্যা রমণী জ্ঞান করিতেন না। তিনি তাহাকে বেদমাতা গায়ত্রী বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহারো পূর্ব্বে অজয় নদীতীরে বসিয়া সুমধুর স্বরে গাহিয়াছিলেন—

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডলং
দেহি পদপল্লব মুদারং॥

তাঁহারো পূর্ব্বে রামচন্দ্রের প্রণয় বর্ণনায় ভবভূতি গাহিয়াছিলেন,—'দেবি! দেবি! অয়ং পশ্চিমস্তে রামশিরসাপাদপঙ্কজাস্পর্শেঃ।' দেবি! তোমার যে চরণে রামের মস্তক লুণ্ঠিত হইত, আজি এই তাহার শেষ। সুতরাং বলা যাইতে পারে, প্রেমের শেষ পরিণতি পদ-সেবায়।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা সুদুষ্কর। রামিনীর সহিত মিলনের একটী জনশ্রুতি এইরূপ। একদা চণ্ডীদাস হাটে মৎস্য ক্রয় করিতে যান। তিনি মৎস্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর একজন লোক আসিয়া সেই মৎস্য বিক্রেতার নিকট হইতে, তিনি যে পরিমাণ মৎস্য পাইয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক মৎস্য সমান মূল্যে ক্রয় করিল। ইহাতে চণ্ডীদাস কৌতুহলী হইয়া সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আমার সমান পয়সা দিলেন, অথচ মৎস্য পাইলেন বেশী, ইহার কারণ কি? লোকটী বলিল যে, মেছুনীর সহিত আমার প্রণয় আছে। এই ঘটনার পর চণ্ডীদাস প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রেমিকা অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং নদী তীরে বিচরণ করিতে করিতে রামিনীর সাক্ষাৎ পাইলেন। চণ্ডীদাস, তাঁহার অল্প বয়স ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন,-রামীর রূপ যেন ফুটে ফুটে ফুটেনা। তৎপরে চণ্ডীদাস তাহাকে দেখিবার আশায়, সে যে ঘাটে

---

* "আহা কহি বাণী, শুনহ রামিনী,
একথা ভুবন পার।
চণ্ডীদাস নামে, আছে একজন,
তাহারে আরোপ কর॥"

কাপড় কাচিত, সেই ঘাটে মৎস্য ধরিবার জন্য প্রত্যহ যাতায়ত করিতে লাগিলেন। রামীর রূপ-রস-গন্ধে চন্দীদাসের মত্ত মন-ভৃঙ্গ যেন তাহা হইতে উঠে উঠে উঠেনা। ক্রমে ক্রমে রজকিনীরও মন টলিল—উভয়ের মিলন হইল। এই কিম্বদন্তি বিশ্বাস করিবার কোন উপায় নাই। তাহাদের মিলনের বৃত্তান্ত আমরা প্রথম পরিচ্ছেদেই ব্যক্ত করিয়াছি।

যাহা হউক, ধোপানীর সহিত চণ্ডীদাসকে প্রবর্ত্ত হইতে দেখিয়া নান্নুর-বাসিগণ তাঁহাদিগকে বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল, অপবাদে দেশ রাষ্ট্র হইল।

পিরীত করিল, জগতে ভাসিল
ধোবিনী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল, কলঙ্ক ভাসিল
কাণাকাণি লোকজনে ॥

চণ্ডীদাস মন্দির ত্যাগ করিয়া রজকিনীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেইখানেই নিয়ত বাস করিতে লাগিলেন। কাজেই গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপর আরো খড়্গহস্ত হইলেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসের ভ্রাতা প্রভৃতিকে সমাজচ্যুত করিলেন। সমাজচ্যুত হইয়া একঘরে অবস্থায় থাকার ভয়ে, তাঁহার ভ্রাতা ও খুড়িমাতা চণ্ডীদাসকে সৎপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—চণ্ডীদাসের 'পিরীতে মজিয়াছে মন' 'হাঁড়ী ডোম মানিবে' কেন? অবশেষে চণ্ডীদাসের মাতৃস্থানীয় খুড়িমাতা, রজকিনীর বাড়ী যাইয়া পুত্রস্থানীয় দেবর-পুত্রের হাত ধরিয়া বাড়ী আনিলেন। চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল বলিলেন, 'ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন, করিঞা উঠাব কুলে।' কিন্তু চণ্ডীদাস ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বলিলেন,—

'শুনি চণ্ডীদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস, ভিজিয়া নয়নজলে
ধোবিনী সহিতে, আমি যেন তাথে, উদ্ধার হইব কুলে।
পিরীতি আলম্ব, পিরীতি কুটম্ব, পিরীতি সমুদ্র বিধি।
পিরীতি উন্মাদ, পিরীতি আস্বাদ, পিরীতে পাইব নিধি।
পিরীতি আচার, পিরীতি ব্যভার, পিরীতে আমার ভাই।
পিরীতের তরে, দুয়ারে দুয়ারে, আদর করিতে চাই।

আমি জানি, ধোবিনীর সহিতই কুলে উদ্ধার হইব। তুমি একি বলিতেছ? আমিত তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। পিরীতিই আমার সর্ব্বস্ব,—পিরীতি কুটম্ব, পিরীতি আচার, পিরীতি ব্যভার এবং পিরীতের জন্য তোমরা ভাই।

যাহা হউক, চণ্ডীদাসের সে কথায় ফল হইল না। 'ঠাকুর নকুল, মনেতে বাড়িল, আমন্ত্রণ ঘরে ঘরে।' নকুলকে ঘরে ঘরে বেড়াইয়া নিমন্ত্রণ করিতে দেখিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা নকুলকে ধরিয়া বলিলেন,—"তুমি একজন মহাশয় ব্যক্তি, তুমি ভাল কাজ করিয়াছ। পুত্র পরিবার ত্যাগ করিয়া ধোবিনী আবাসে থাকা অতি গর্হিত কাজ, তুমি তাঁহাকে ঘরে আনিয়া কুলের মুখ উজ্জল করিলে।"

ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া নকুল ভ্রাতাকে অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁহাকে বকুল তলায় লইয়া যাইয়া বলিলেন, ধোবিনীর সহিত সহবাস করা উচিত নহে, সে পিরীতিতে তুমি কি ধন পাইবে? চণ্ডীদাস বলিলেন,—

* * * *

ভজন যাজন, পিরীতি সাধন, পিরীতি সেবিলে পায়॥
ভজিব পিরীতি, স্বভাব আরতী, পিরীতি পরাণ সার।
পিরীতি করম, পিরীতি ধরম, এ ভবে পিরীতি সার॥

চণ্ডীদাসের তন্ময়তা ও গভীর প্রেম দেখিয়া নকুলের শরীর অস্থির হইল। তিনি নিঃশব্দে গৃহে আসিয়া কুটুম্ব ভোজনের

নিমিত্ত "জিলেফি, মালপা, কচোরি, আলফা, পুরি খিরি চিনি কলা, পিরীতি-ঔষধি" প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

খাদ্যাদির আয়োজন করিয়া নকুল স্নানার্থ ঘাটে যাইয়া দেখেন, জলে বসিয়া ধোপানী পিরীতি মন্ত্র জপ করিতেছে। নকুল জলে নামিতেই ধোপানীর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। সম্মুখে নকুলকে দেখিয়া তাহার রুদ্ধ শোকাবেগ উৎসারিত হইল। তাহার অতৃপ্ত, প্রেমামৃত-বঞ্চিত, তৃষিত হৃদয় কাঁদিয়া বলিল,—

'শুনি নাকি ভাল, পিরীতি নৈরাশ, কুটম্ব ভোজনে মন।
ঠাকুর নকুল, হয়েছ সকল, তুমি এক মহাজন ॥
তোমার চরিত্রে, জগত পবিত্র, তোমার সাধু সে বাদ।
তুমি সে সকল, জাত্যে পাত্যে তোল, নীচ প্রেমে উনমাদ ॥
বর্ণাশ্রম ছাড়, পিরীতিতে দড়, যাহার পিরীতি হয়।
এসব ভাবিয়া, যেজন করিল, সে কেন ভারতে রয় ॥'

এই বলিয়া ধোপানী প্রস্থান করিল। নয়নের ধারায় তাহার আবক্ষ ভাসিতে লাগিল, কোন মতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। গৃহে যাইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, মস্তকের উপাধান অশ্রু-আর্দ্র হইল। সে করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "অগাধ, অসীম বিস্মৃতির বিরাট গহ্বরে তোমার আসৃষ্টি আজ ডুবাইয়া দাও।"

অনেকক্ষণ পর: কিছু সুস্থ হইয়া ধোপানী আর একবার চণ্ডীদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিল। বাটীর নিকটস্থ হইয়া এক বকুল তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ সেই স্থান দিয়া নকুল যাইতেছিল, তিনি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন—

'নকুল পাত্রতে,ধরি দুটী হাতে,ধোপিনী কাঁদিয়া বলে।
তুমি মহাজন, শুনহ ব্রাহ্মণ. পিরীতির কিবা মূলে ॥
আমি অতি হীন,পিরীতি অধীন,পিরীতি আমার গুরু।
এ তিন আপর, হৃদয়ে যাহার, সে জনা কল্পতরু ॥
পিরীতি ভজিল,পিরীতি সাধিল,পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে ধোপিনী সহিতে,মিশ্রিত একই প্রাণে॥"

নকুল ধোপানীর আক্ষেপে অন্তরে বিগলিত হইলেন সত্য, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ উপনীত হইলে, 'পত্র দিয়া গেল, ব্রাহ্মণ বসিল, অন্ন আন চণ্ডীদাস।' ব্রাহ্মণগণের আদেশানুযায়ী চণ্ডীদাস 'দিঞা করতালি, হরি হরি বলি' অন্ন আনিতে গেলেন, চণ্ডীদাস অন্ন পরিবেশন করিয়া গেলেন, পরে—

ব্যঞ্জন কটোরা, শাক সূপ ভরা
ঝাল নাকরাদি আনে।
আনিল ঘণ্টের ব্যঞ্জন সকল
সুখে খায় দ্বিজগণে॥

সুখে খাইতে খাইতে দ্বিজগণ ব্যঞ্জনের গুণ 'বাখান' করিতে লাগিলেন, এবং পুনরায় অন্ন আনিতে চণ্ডীদাসকে ডাকিলেন। এবার চণ্ডীদাস যেই ব্যঞ্জন লইয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি ধোপানী তাঁহার সম্মুখে উপনীতা হইয়া বলিল,—'কিরে চণ্ডে! তুই নাকি আমাকে ছেড়ে জাতে উঠছিস?' চণ্ডীদাসের স্ফূর্ত্তি দমিয়া গেল, তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল! তিনি ব্যঞ্জন লইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিঃশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিতে পাইলেন, চণ্ডীদাসের দুই হাতে ব্যঞ্জনের থালা

আবদ্ধই আছে, অথচ আর দুইখানি হাত বাহির করিয়া তিনি রজকিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। রজকিনীর দেহ হইতে সেই সময়ে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া দ্বিজগণকে বিমোহিত করিল। তাহার গৌর মুখমণ্ডল মধ্যাহ্ন রবিকরে লাবণ্যময় হইয়া উঠিল। যাহারা জন্ম মৃত্যু পীড়িত, দুঃখ বিষাদ তাড়িত মানব জীবনে বীতরাগ হইয়া কুহেলিকা-বেষ্টিত সূত্র-ভাষ্যের পদানুসরণ করত লোকালয় অপেক্ষা বনচর-সেবিত আরণ্য জীবনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, সেই বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ তখন 'রামীত সামান্যা নহে' জ্ঞান করিয়া তাহাকেও পরিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণাজ্ঞায় রামী পরিবেশন করিতে লাগিল, হঠাৎ তাহার অবগুণ্ঠন বায়ু তাড়িত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইল। ব্রাহ্মণগণ দেখিতে পাইলেন, সে যেন আরো দুইখানি হাত বাহির করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিয়া তাঁহারা চণ্ডীদাসের জাতি মারিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। 'পিরীতি হইল জয়ী!'

চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমে 'কাম গন্ধ নাই।' চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া অমানুষিক প্রেম রাজ্যের সামগ্রী হইয়াছে। তাঁহারা যে পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য মিলিত হন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বাশুলীর আদেশে জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের রূপ যৌবনে উপভোগ লালসা ছিল না; চণ্ডীদাস বলিয়া গিয়াছেন 'রজকিনী রাধা হয়।' স্থানে স্থানে তিনি তাহাকে 'পিতৃমাতৃ' 'বেদমাতা গায়ত্রী' বলিয়া অভিহিত করিয়াও পরিশেষে অঞ্জলি দিয়াছেন,—

আসক দিঞাসে, শুন রজকিনী
রহিনু চরণতলে।

কি নিঃস্বার্থ অকপট প্রেম! এ প্রেম-মূর্ত্তি কি স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না? চণ্ডীদাসের ভাষার দিকে লক্ষ্য ছিল না, কেবল হৃদয়ের গূঢ় অন্তস্তল হইতে প্রেমময়ী তৃষা বাহির করিয়া জগৎকে মাতাইয়াছেন। তাঁহার আকাঙ্খা ও লক্ষ্য ছিল কেবল—

পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পরশি পিরীতি প্রিয়সী অন্য সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে এ দেহ রাখিব পিরীতি করিব বল।
পিরীতি বিকথা সদাই কহিব পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব পিরীতি বালিস মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস করিব রহিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সায়রে সিনান করিব পিরীতি অলসে থাব।
পিরীতি দুঃখের দুঃখিনী যে জন পরাণ বাটিয়া দিব॥
পিরীতি বেশর নাসাতে পরিব রহিব নক্ষুথা সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে পিরীতি থুইব দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

যদি পিরীতি করিতে হয়, তবে যেন চণ্ডীদাসের মতই পিরীতি করি, যদি কলঙ্ক কিনিতে হয়, তবে যেন জন্ম জন্মান্তরে তাঁহারই ন্যায় প্রেম-কলঙ্ক-পসরা শিরে বহন করিয়া আধুনিক কবি-কল্পনা-প্রসূত প্রেম-উচ্ছ্বাস, বিরহ প্রভৃতি একঘেয়ে আলোক হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে পারি।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া চণ্ডীদাস জাতিতে উঠিলেন। কিন্তু লোক-গঞ্জনায় তাঁহাদিগকে অস্থির হইতে হইল। একদা রামিনী লোক গঞ্জনার কথা চণ্ডীদাসকে বলিয়া নান্নুর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। চণ্ডীদাস তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—

ইন্দ্র আদি করি, সুরনর দানব, তিনপুর জিনিল দশমাথে।
বিশ বাহুপর, বিজয় ধনুর্দ্ধর, নৃপতি নিশাচর নাথে॥
মণিময় কুণ্ডল, রত্ন সব আভরণ, শোভা করল দশমুণ্ডে।
দ্বিগ্বিজয় করি, বিক্রম কেশরী, ছত্রধরল নব খণ্ডে॥
সোহা লঙ্কাপতি, বেবে হরল মতি, বিপদ সময় ভব ভেল
রতন মুকুট পর, বনচর বানর, চরণঘাত কত দেলা॥
হরি হরি, দৈব কি গতি নাহি জান।
কভু সুখ সম্পদ, কবহুঁ রাজপদ, কবহুঁ গুরু অপমান॥
ভণয়ে চণ্ডীদাস ইহা বড় বাত।

হানি, লাভ, জীবন, মরণ, সুখ, যশ, অপযশ, বিধিহাত!

কি সুন্দর উপদেশ! আমরা কয়জন এরূপ উপদেশ দিতে জানি? চণ্ডীদাস প্রেমিকার চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত ভাষার নিরাবিল পবিত্র দেহে কুরুচির কালিমা তুলিপাত করেন নাই, তিনি পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখাইয়াই তাহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্য-সুধা তিল তিল করতঃ

সঞ্চয় করিয়া প্রেমিকাকে উপঢৌকন দিয়াছেন। এ প্রেমে কি কামগন্ধ থাকিতে পারে

তাহার পর চণ্ডীদাস বলিলেন, যদি লোকাপবাদ তোমার নিকট এতই অসহনীয় হইয়া থাকে, তবে আমাদের উভয়ের স্থান পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? তুমি থাক, আমিই অন্যত্র যাইতেছি। তচ্ছ্রবনে রামিনী কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—

‘কোথা যাবে অহ,প্রাণবঁধু মোর দাসীরে উপেক্ষা করি
না দেখিয়া মুখ ফাটে মোর বুক ধৈরজ ধরিতে নারি
বাল্যকাল হইতে এ দেহ সঁপিনু মনে আন নাহি জানি
কি দোষ পাইয়ে মথুরা যাইবে বলহে সে কথা শুনি।
তোমরে সারথি ক্রুর অতিশয় বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে দুঃখ-সিন্ধুনীরে অবলা ভাসাতে নাই।
পিরীতি জালিয়া যদি বা যাইবা কবেবা আসিবে নাথ
রামীর বচন করহ শ্রবণ দাসীরে করহ সাথ।’

আজ কাল রমণীগণ যেমন পদাহতা অভিমানিনী কাল-সাপিনীর ন্যায় সামান্যতেই ঊর্দ্ধশিরে গর্জ্জিয়া উঠে, রামিনীর সেরূপ তীব্র তেজে গর্জ্জন নাই। তাহার সম্বলের মধ্যে কেবল ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমটুকু আর অশ্রু। তাই সে তাহার সংযত পবিত্র উদার হৃদয়ের সমস্ত প্রেমটুকু ঢালিয়া চণ্ডীদাসের করুণা প্রার্থনা করিল।

অতঃপর কলঙ্ক স্খালনের নিমিত্ত তাঁহারা এক পরামর্শ স্থির করিলেন। চণ্ডীদাস পীড়ার ভাণ করিয়া তাঁহার পর্ণকুটীরে শয়ন করিলেন। দুই দিবস যায়, চণ্ডীদাস কেবলই যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, তাহার শুশ্রূষার লোক কেহই নাই। পিতা মাতা ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বিনীতভাবে প্রতিবেশিদিগের নিকট একটু জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না, দুই দিনের উপবাস-ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের আন্তরিক প্রার্থনাটুকুও কেহ গ্রাহ্য করিল না। পর দিবস কোন সাড়া শব্দ নাই। প্রতিবেশিগণ মনে করিল, চণ্ডী বোধ হয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই কোন কোন সহৃদয় প্রতিবেশী এক পা এক পা করিতে করিতে তাহার কুটীরে যাইয়া উকি মারিয়া দেখে, চণ্ডীদাস মরিয়া আছেন এবং তাঁহার গৃহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উপবাসী হইয়া আছেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সৎকারের ও দেবসেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কতিপয় ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া চণ্ডীদাসকে শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতায় তুলিয়া যেমন অগ্নি সংযোগ করিবে, এমন সময়ে প্রেমবিহ্বলা, আলুলায়িত কুন্তলা রামিনী উন্মাদিনী বেশে তথায় যাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

‘তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বড় ক্ষণে ক্ষণে।
ত্রুটি সমকাল, মানি সুদীর্ঘকাল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মনস্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ।
কুটিল কুণ্ডল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা।
যাহে সর্ব্বক্ষণ, তব দরশন, নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়া বিধাতারে।
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার।

অন্তিমের একমাত্র পথ মহা শ্মশানে দাঁড়াইয়া রামিনীবেশে রাধিকার এই বিরহ গীতি ধ্বনি যেন হতাশ্বাস বিষাদ ও অনন্ত ব্যথার পসারা লইয়া কোন্ দূর দুরান্তরের স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যাইতেছে। রামিণীর বিলাপ শুনিয়া চণ্ডীদাস যেন নিদ্রাভঙ্গের পর চিতা হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন,—‘চল, এ দেশ ছাড়িয়া আমরা প্রস্থান করি, আর এখানে থাকিব না।’ চণ্ডীদাসের কথায় রামিনীর অশ্রু শুষ্ক হইল, তাঁহারা আনন্দাতিশয্যে গাহিতে গাহিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শ্মশান-বন্ধুগণ ভাবিলেন, চণ্ডীদাসকে ভূতে পাইয়াছে, তাই তাঁহারা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের পলায়নে শিবা ও সারমের দল লুব্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া ছুটিতে লাগিল। শীঘ্রই গ্রামে একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল।

এদিকে বিনোদ রায় * নামক এক ব্রাহ্মণকে বাশুলীদেবী স্বপ্নে বলিলেন, ‘গ্রামবাসীগণ আমার সেবক ও সেবিকার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়াছে। যদি তাহারা চণ্ডীদাসের নিকট

---

* বিনোদ রায় বন্ধু বিনোদ রায়।
ভাল হ'ল যুড়াইল পিরীতের দায়।

ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে তাহাদিগকে আমি সবংশে নিধন করিব।' বিনোদ প্রত্যুষে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকলকে জানাইল। রটনাকারীগণ স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়া ভীত, চকিত ও সন্ত্রাসিত হইয়া চণ্ডীদাসের নিকট ভূয়োভূয়ো ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে অনেকে চণ্ডীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বিনোদ রায়ও তাঁহার নিকট রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। এই সময় একদা রামিনী চণ্ডীদাসের নিকট হাসিমুখে যাইয়া বলিল, পাষণ্ডগণের প্রতি ভগবানের করুণা বর্ষিত হইয়াছে। ধোপানীর প্রেম যে অপবিত্র নহে, এখন তাহাদের জ্ঞান হইয়াছে।　　ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

অর্থ ও নীতি।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, তাহা এই ;—"অর্থ, সকল অনর্থের মূল।" অর্থ হইতেই সকল অনর্থ উপস্থিত হয়, ইহা অনেকের ধারণা। মহাত্মা ঈশা, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, বুঝিবা, এই জন্যই সর্ব্ব প্রযত্নে অর্থের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতেন। আমাদের সময়ে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস মহোদয়, কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি কিরূপ বিমুখ ছিলেন, অনেকেই জানেন। বাস্তবিক পক্ষে, অর্থই কি সকল অনর্থের মূল ?

অতি প্রাচীন কালে দ্রব্যাদির বিনিময়েই দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত, পণ্যবীথিকায় অর্থের কোন প্রয়োজন হইত না। কালক্রমে অর্থ বিনিময়ের মধ্যবিন্দু হইয়াছে। অর্থাভাব হইলে এখনকার দিনে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া উঠে। ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলকেই এখন অর্থকে হাতে করিতে হয়, অর্থের জন্য লালায়িত হইতে হয়,—অর্থের জন্য কত কি করিতে হয়। কেন না, অর্থ না হইলে দিন চলে না। অথচ "অর্থই নাকি সকল অনর্থের মূল ;"—সামঞ্জস্য কোথায় ?

অর্থ যখন বিনিময়ের মূল, তখন সকলকেই অর্থের অন্বেষণে ব্যস্ত হইতে হয়। কেহ জমীদারী মহাজনী করেন, কেহ চাকুরী করেন, কেহ ভিক্ষা করেন, কেহবা শরীর খাটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন,—সকলকেই অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থের অন্বেষণ করিতে হয়। সকলেই কি অনর্থের সাধন করিতেছেন ?

অনেকে বলেন, যাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা সৎপথে থাকিয়া, নীতিকে বজায় রাখিয়া, উপার্জ্জন করিলেই ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। অসৎ উপায়ে, নীতিকে ডুবাইয়া, অর্থ উপার্জ্জন করা কদাচ উচিত নয়। অপিচ, নিজের শরীর ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত অর্থ পাইলে তাহা দ্বারা সৎব্যয় করা উচিত। শরীর-ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার অর্থ কি এবং সৎব্যয়েরইবা অর্থ কি ? ১০ টাকা মাসিক হইলেই কাহারও কাহারও শরীরের উপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, কাহারও ৫০০ টাকা মাসে চাই। ইহার সীমা নির্দ্ধারণ কে করিবে ? তুমি যাহাকে সৎব্যয় বল, আমি যদি তাহাকে অসৎব্যয় বলি, তবে তাহার মীমাংসাই বা কে করিবে ? অন্য দিকে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনেরই বা অর্থ কি ?

লোকেরা বলেন, চোর, ডাকাত, প্রবঞ্চক, প্রতারক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে, বেশ্যারা অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে—ইত্যাদি ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, তোমরা কেরাণীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারী বা হাকিমী করিতেছ, তোমরাও শরীর ও মস্তিষ্ক খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছ, আর চোর ডাকাত এবং বেশ্যারাও শরীর ও মস্তিষ্ক খাটাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছে।

তাহাদের কাজ অসৎ হইবে কেন? একথার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, তাহারা বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ করে, তাহারা ঐ সকল কাজ করার সময় নীতি ধর্ম্মকে বিস্মৃত হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে কেহ কেহ বলেন, অভ্যাসে তাহাদের বিবেক ও নীতির টান নিষ্প্রভ হয়। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ম কাহারও একচেটিয়া নহে, তাহারাও ধর্ম্মকার্য্য করিতে সমর্থ এবং করিয়া থাকে। দস্যুরা, লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিবার সময় কালীপূজা করে, আল্লার নাম করে, প্রবঞ্চক, প্রতারকগণও পূজা আহ্নিক করিয়া থাকে, আর বেশ্যারা ত রীতিমত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। একথার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা কোন সৎকাজ হয় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করা যায়, বা অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করা যায়; বা আর যে কোন সৎকাজের কথা বল, তাহা যদি করা যায়, তবে কি তাহা ধর্ম্মকাজ বলিয়া গণ্য হইবে না?

আমাদের একজন বিশিষ্ট ধনী জমীদার-বন্ধু ছিলেন। তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত অনেকস্থলে বেশ্যালয় ছিল। আমরা তাঁহাকে বেশ্যালয় সকল তুলিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, এরূপ করিলে বেশ্যাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। তাহারা, ঐ কুৎসিৎ কাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিকা করিয়া গৃহস্থের ন্যায় বাস করিলে তাহাদের ভরণ-পোষণের ও নিকার ব্যয় ষ্টেট-হইতে দেওয়া হইবে, এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তাহারা ঐ কুৎসিত কাজ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই; সুতরাং বিতাড়িত হইয়াছিল। ঐরূপ কুৎসিৎ কাজের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ কিরূপে ভাণ্ডারে রাখিবেন, এই কথা বিশেষ জেদের সহিত জমীদার-বন্ধুকে বলিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অন্যায় কাজ বুঝিয়া বেশ্যালয় তুলিয়া দিয়া সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। এইরূপ বেশ্যালয় সর্ব্বত্র আছে, এবং অনেক জমীদারই এইরূপ ঘৃণিত কাজের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল ইহা কেন, অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, জমীদার এবং পুলিস, দস্যুর লুণ্ঠিত অর্থেরও ভাগ লইয়া থাকেন। এরূপ করায়, কেহ কেহ বলেন যে, কোন দোষ নাই। তাঁহারা বলেন, "মসী চালনা করিলে যেমন হাত পচিয়া যায় না, সেইরূপ, উহাদের শরীরও পচিয়া যায় না; দোষ কি?"

সমাজ-নীতির নিগূঢ় তত্ত্ব অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, নিজের ইষ্টানিষ্ট ও সমাজের ইষ্টানিষ্ট বিশেষভাবে বিজড়িত। কেবল আত্মতৃপ্তি বা আত্মস্বার্থ অন্বেষণ করিলে সমাজ চলিতে পারে না। সমাজ অশেষ প্রকারে আমার ভরণপোষণ ও রক্ষণের জন্য চেষ্টা করিতেছে, আমাকেও সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া কাজ করিতে হইবে। যেন-তেন-প্রকারে আপন স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিলে সমাজ রক্ষা হয় না। সমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা সকলে দায়ী, আমাদের সকলকেই সমাজের জন্য ভাবিতে ও খাটিতে হইবে।

যে সকল কাজে সমাজের অমঙ্গল হয়, সে সকল কাজ করা অসঙ্গত, করিলে অন্যায় হয়। নীতি, মানুষকে সদা সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পরামর্শ দিতেছে। নীতিকে অবহেলা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা কোন মতেই সঙ্গত নয়।

নীতি কাহাকে বলে? নীতি তাহাই; যাহা আমার সহিত তোমাকে এমন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করে, যাহাতে তোমারও মঙ্গল হয়; আমারও মঙ্গল হয়;—উভয়কে একত্রে মঙ্গলের পথে লইয়া যাওয়াই নীতির কাজ। তুমি নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য আমার বুকে ছুরিকা নিবদ্ধ করিতে পার না, কেন না তাহাতে আমার অনিষ্ট হয়। আমিও তোমার অনিষ্ট সাধন করিয়া তোমার অর্থ লুণ্ঠন করিতে পারি না, কেন না, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হয়। যে কাজের দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর মঙ্গল সাধিত হয় না, তাহা দুর্নীতির কাজ, বুঝিতে হইবে।

সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত নীতির

পরিবর্ত্তন হইতে পারে, একথা গভীর ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যখন পরিবর্ত্তন হইবে, তখন পরিবর্ত্তিত নীতির অনুসরণ করিব; যতদিন নীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, ততদিন তাহার অনুসরণ করাই সঙ্গত। সমাজ-বদ্ধ জীব অন্য রূপ করিলে অশান্তির উদ্ভব হয়। মানব-সমাজ বাসের অযোগ্য হয়।

রাজ আইন, মানব-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, নীতির ভিত্তিতে, বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে। রাজ-আইন ও নীতিতে যেখানে বিরোধ, সেখানে মানবজাতি রাজ-আইনকে তুচ্ছ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে; তখন দেশে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। নীতির ভিত্তিতে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে মানবের বিশেষ কল্যাণ হয়।

নীতি-প্রমুখ রাজ-আইন যে সকল কাজকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিলে মানবের মঙ্গল হয়। কিন্তু এমন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমাজ সম্বন্ধীয় কথা আছে, রাজ-আইন যেখানে নীরব থাকিতে বাধ্য। নীতির শাসনকে সেস্থলে মান্য করিয়া চলিতে হইবে। নীতিকে অগ্রাহ্য করিলে মানব জাতির সমূহ অকল্যাণ হয়।

সুতরাং দেখিতে হইবে, যে কাজে আমার ইষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনিষ্ট হয়, তাহা আমাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিতে হইবে। আমি অর্থ পাইলাম, কিন্তু তোমাকে ডুবাইলাম, এরূপ কাজ করিলে নীতিকে অবহেলা করা হয়, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এমন কাজ পরিত্যাগ করা আমার কর্ত্তব্য।

মদ্যপানে মানবের অহিত হয়, এজন্য, মদ্যের ব্যবসা চালাইতে দিতেছেন বলিয়া, আমরা, গবর্ণমেণ্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া থাকি। ঐ ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের অনেক অর্থ লাভ হয়, কিন্তু আপামর-সাধারণের অপকার হয়, এই জন্য, আমরা গবর্ণমেণ্টকে কত তিরস্কার করিয়া থাকি। এই প্রকার, যে সকল দ্রব্যে মানুষের বিলাসিতা বাড়ে, সে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করাকেও আমরা দোষের বলিয়া মনে করি। বিলাসিতা—মানুষকে অহঙ্কার ও বহির্দৃষ্টি প্রধান জড়বাদ-সাধনের পথে লইয়া যায়;—যাহা মানুষের চিরলক্ষ্য নয়, সেই পথে লইয়া যায়; সুতরাং বিলাসিতার উপকরণ যে সকল দ্রব্যে নিবদ্ধ, তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা অসঙ্গত। অহিফেন, গাজা, মদ্য প্রভৃতির ন্যায়, শরীর ধারণের অপ্রয়োজনীয় চা, কোকেন, নানা সুগন্ধি তৈলে এবং নানা প্রকার এসেন্সে, অযথা ব্যয়ের সহিত বিলাসিতা বাড়ে, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে জগতের অমঙ্গল হয়, সুতরাং তাহা করা সঙ্গত নয়। সেইরূপ, দস্যু ও বেশ্যার কার্য্যের দ্বারাও জগতের কত শত প্রকার অমঙ্গল হয়; সুতরাং তাহা করা সঙ্গত নয়। যদি তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও করা যায়, তবে তাহা দ্বারাও জগতের মঙ্গল হয় না। গরু বধ করিয়া জুতা দানের ন্যায় সে কার্য্য চিরগর্হিত। মানব-সমাজের অনিষ্ট করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহা স্পর্শ করাও অসঙ্গত।

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, থিয়েটারের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সৎকাজ করা সঙ্গত নয় কেন? থিয়েটার দ্বারা কোন দেশের, কোন্ সমাজের কখনও উপকার হইয়া থাকিলেও, থিয়েটারের দ্বারা আমাদের দেশের প্রভূত অপকার হইতেছে, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে বলিতেই হইবে। এতৎসম্বন্ধীয় সমাজনীতি যদি কখনও পরিবর্ত্তিত হয়, তখনকার কথা স্বতন্ত্র. এখন, এই বহির্মুখ জড়বাদ-সাধনের যুগে, ভারতকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। চরিত্র-হীনতার দুর্জ্জয় প্রভাবে যত অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা এই ভারতের যথেষ্ট হইয়াছে, আর না। এখন একটু একটু ভিতরের দিকে সকলের দৃষ্টিকে ফিরাইতে হইবে। অবাধ গোলামীগিরির অনেক শতাব্দী করা হইয়াছে,—এখন একটু ভবিষ্যতের আশা ভরসা লইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হওয়া উচিত। কেন, সে কথা বলিতে চাই না। ইংরাজ যত বড় লোকই হউন না কেন, তাঁহাদের পন্থানুসরণে

আমরা যে ক্রমে ক্রমে অসার জীবে পরিণত হইয়া পড়িতেছি, এখন তাহা একটু স্মরণ করিতে হইবে, এই ভাবে চলিলে, এদেশের উদ্ধারের পথ নাই। "ভবিষ্যতে যাহা হয়, হউক, আমরা খাই, বেড়াই, নাচি"—এরূপ অসার ভাব প্রশ্রয় না পায়, ইহার জন্ম প্রত্যেক উন্নতি-কামী ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। এখন—এখন একটু একটু সংযমের পথে এই জাতিকে চালাইতে হইবে। যে ডুবিয়া গিয়াছে, হিতৈষী সংস্কারক, তুমি তাহাকে আরো ডুবাইবে?—না—তুলিয়া ধরিবে? বিলাসিতার পথে হাঁটিয়া হাঁটিয়া এ জাতির কতদূর অধঃপতন হইয়াছে, একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ।

বলিতেছিলাম, থিয়েটারে অন্য দেশের উপকার হইয়া থাকিলেও এ দেশের হয় নাই। থিয়েটার এ জাতিকে ক্রমাগত সর্ব্বপ্রকার তারল্য, চাঞ্চল্য ও চাপল্যের দিকে লইয়া চলিয়াছে। বেল্লিক-বাজারের অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া এ জাতি দিন দিন বেল্লিক হইয়া উঠিতেছে। সংস্কারক, তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও বুঝাইতে পারিবে না যে, থিয়েটার ও রঙ্গরসের দ্বারা এ জাতির কোন স্থায়ী উপকার হইয়াছে।

সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্ম থিয়েটারের প্রয়োজন আছে, কেহ কেহ বলেন। সে প্রয়োজন যখন আসিবে, তখন তাহা করিতে হয়, করিও। আমরা ২৫ বৎসরের ইতিহাস দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারি, থিয়েটারের দ্বারা এ দেশের সমাজের বা সাহিত্যের তেমন কোনই উন্নতি হয় নাই। থিয়েটার—সাহিত্যকে ক্রমাগত তারল্যের দিকে লইয়া চলিয়াছে। চুট্‌কি সাহিত্য যে আজ কাল সকলের প্রিয় হইতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল থিয়েটার। পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিতেন, এখন ঘরে ঘরে উপন্যাস-লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। মাসিক কাগজের ত কথাই নাই, সাপ্তাহিক জুড়িয়াও উপন্যাস বাহির হইতেছে। চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ এখন আরও ভাল লাগে না, কেবল গল্প, নাচ গান, রঙ্গরস, ইহাই সকলের মুখরোচক হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। থিয়েটারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চুটকি সাহিত্যের আদর প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই স্রোত প্রতিহত না হইলে, এদেশে জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সুদূরপরাহত হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এ জাতির ভবিষ্যত গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইবে।

যে থিয়েটারের দ্বারা এদেশের অশেষ অমঙ্গল হইয়াছে, সে থিয়েটারের উন্নতি এ যুগে আমরা চাই না। এখন থিয়েটারের নাম শুনিলেই আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। হায়, এজাতিকে ডুবাইবার জন্ম এত আয়োজন!!

সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্ম করিন্থিয়ান থিয়েটারে যে নীরব অভিনয় হইয়াছিল, তাহা দ্বারা এ দেশের বিশেষ অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজের চেষ্টায় যে স্রোত কতকটা ফিরিতেছিল, সেই স্রোত আবার প্রবল হইয়াছে। দস্যু-লুণ্ঠিত, বেশ্যা-উপার্জ্জিত এবং আরো নানা অসদুপায়ে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইলেও যেমন তাহা দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় না,—ঐ অভিনয়ের উদ্বর্ত্ত অর্থ দ্বারা ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মিত হইলেও তদ্দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে না। বড় বড় লোকের দৃষ্টান্তে সমাজ রঙ্গরসে ডুবিয়া যাইবে, সাত্ত্বিক ভাব চিরকালের জন্ম অদৃশ্য হইবে।

এখন এ দেশের সর্ব্বত্র তামসিক ও রাজসিক ভাবের প্রাধান্য,—সাত্ত্বিকভাব ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মুখে মুখে সাত্ত্বিক ভাবের অনেক কথা শুনা গিয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাত্ত্বিক ভাবের রাজত্ব বিলুপ্ত-প্রায়। দেশ ডুবিবার পথে অগ্রসর। এখন দৃঢ়তার সহিত সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির সংযম অস্ত্র লইয়া কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সর্ব্ব প্রকার কুকার্য্যকে দমন করিবার একমাত্র অস্ত্র সংযম। সংযম ভিন্ন সাত্ত্বিক জীবন লাভের আর উপায় নাই। সংযমকে জাগরিত করিবার জন্য সকলের কঠোর সাধনার প্রয়োজন। গ্রাসাচ্ছাদনাতিরিক্ত অর্থ চাই না, বিত্ত চাই না, সম্পদ চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, এখন চাই,

কেবল মানব সমাজের মঙ্গল এবং কল্যাণ, এবং আত্মার উন্নতি ও চরিত্র। চরিত্র লাভের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, সকলে তাহার সাধনা করুন। চরিত্র পাইলে, আর আর সকল বিধাতা প্রেরণ করিবেন। আর আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, চরিত্র লাভের পরে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের যুদ্ধ কেবল দুর্নীতের সহিত—বিলাসিতার সহিত;পাপের সহিত। এই সংগ্রামে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়—সংযম। বিধাতা, এই জাতিকে সংযমের পথে লইয়া যাউন।

দোল-পূর্ণিমা।

হাসিছে জোছনা ডুবায়ে মেদিনী
    অমিয় রজত কিরণে,
হাসিছে বসন্ত বিপুল বিভবে
    বসিয়া কনক আসনে।
হাসিছে তটিনী তরল আবেগে
    মিলায়ে সঙ্গীত জীবনে,
হাসিছে পবন মেদুর ধারায়
    বিনাশি করাল দহনে।
গাইছে বিহগ স্থিত তরু দেহে
    জাগায়ে প্রাচীন স্বপনে,
হাসিছে কুসুম বিতরি সুবাস
    সমর-বিজয়ী পবনে।
হাসিছে কামিনী চলি পতি-পাশে
    কুসুম-বাসিত শয়নে,
হাসিছে বিলাস জিনিয়া বিরাগে
    অবহেলে আজি ভুবনে।
এ হেন সময়ে, ওহে বিশ্বনাথ,
    কেননা, প্রেমের আবেশে,
পূজিবে মানব হৃদয়ে, তোমার
    প্রেমের মূরতি হরষে।
দিয়াছ কুসুম, দিয়াছ চন্দন,
    দিয়াছ সঙ্গীত পরাণে,
কেন না তোমায় কৃতজ্ঞ মানব
    পূজিবে বিহিত বিধানে।
দিয়াছ প্রেমের কোমল অঙ্কুর,
    বাড়াতে সতত যতনে,
দিয়াছ উর্ব্বর হৃদয় উদ্যান,
    উপযোগী স্থান বপনে।
দিয়াছ তুমিই ভকতি-সলিল
    ঢালিতে নবীন পাদপে,
দিয়াছ বিবেক, দিব্য আবরক
    রক্ষিতে প্রমাদ আতপে।
কর সমুচিত কর্ষণ, মানব,
    থেকনা ডুবিয়া কুহকে,
কহিতেছে তাই দোল পূরণিমা
    সাজিয়া প্রেমের পুলকে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩১। রসায়ন-পরিচয়।—শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। বেঙ্গল কেমিক্যাল ষ্টিম্ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্। মূল্য ১৲ টাকা। কৃষি বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রেরও অন্ততঃ কতকটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন্ গাছ গাছড়ায় কি কি পদার্থ আছে, কোন্ মাটীর উপাদান কি, কিরূপ উপাদান বিশিষ্ট মাটীতে কোন্ কোন্ গাছ গাছড়া উত্তমরূপে ফলিয়া থাকে, কোন ২ মাটীতে সেই সেই উপাদানের

কোনটীর অসদ্ভাব থাকিলে কিরূপে তাহার পূরণ হইতে পারে, এই সকলই Agricultural Chemistry বা কৃষি-রসায়নের বিষয়। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থে তাহাই সংক্ষেপে কিন্তু অতি বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থের অন্তে একটী বিস্তৃত নির্ঘণ্ট আছে। এটীও গ্রন্থকারের সুশিক্ষার নিদর্শন।

৩২। History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of the Nil durpan case. Compiled by Lalit Chandra Mitra, M.A. Acme Printing and Process Works. Price Rs. 2.

গ্রন্থকার ৺ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র। যে ঘটনা স্রোতের তাড়নে নীলদর্পণের জন্ম, পাদ্রী লংএর কারাবাস, মাইকেল মধুসূদনের কর্ম্মচ্যুতি, মহামনাঃ সীটন-কারের অপমান, এই গ্রন্থ তার ধারাবাহী বিবরণ। এরূপ গ্রন্থ যে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত, তাহা বলা বাহুল্য।

৩৩। বঙ্গ-দর্পণ।—বাণীপ্রেস্, রাজসাহী। মূল্য ।০ আনা। শ্রীমনোমোহিনী দেবী প্রকাশিত। আমাদের বড় সন্দেহ হয়, এ কবিতা পুস্তক তাঁহারই রচিত। কবিতার বিষয়, বাঙ্গালী সমাজে আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা প্রদর্শন—

অযোগ্যে যোগ্যের ভাণ, অধর্ম্মে ধর্ম্মের,
... ...
যে যাহা সে তাহা নহে, যে নহে যেমন
সে তেমন ভাব ধরি করে বিচরণ।

দৃষ্টান্ত দেখ—

আলস্যে হন দার্শনিক, কবি হন ছোঁড়া,
ইতিহাসে উপহাস, শুধু নাড়া চাড়া।

এ কবি বর্ষীয়সী কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ কবিতা প্রকাশ আর এক উত্তম দৃষ্টান্ত।

৩৪। অর্ঘ্য।—শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত। বিশ্বকোষ প্রেস্। মূল্য ১৲ টাকা। এ খানি গীতি কাব্য। ‘ভয়’ ‘সিন্ধু লজ্জা’ ‘আগমনী’ প্রভৃতি দুই চারিটী কবিতার স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্য আছে। ‘কোকিল’ রবীন্দ্রনাথের ‘কো তুঁহু’ নামক প্রসিদ্ধ কবিতার অনুকরণ। এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণের আরও চিহ্ন আছে। অনেকগুলি কবিতাই আবার গ্রাম্যতাদুষ্ট। সৌন্দর্য্য থাকিলে গ্রাম্যতা দোষটা তেমন লাগে না, নহিলে বড় লাগে।

৩৫। যোগেশ কাব্য।—

৺ ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ভারত-মিহির প্রেস্। মূল্য ১৲ টাকা। অতি মনোরম আকারে চিরলুপ্ত যোগেশ আবার উদিত হইয়াছে। চেনা মানুষ চিনাইতে হইবে না।

৩৬। বৈরাগী রঘুনাথ দাস।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত সঙ্কলিত। হেয়ার-প্রেস। মূল্য ।০ আনা। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রঘুনাথ দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। কলিকাতাস্থ অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৭। পরিত্রাণ কাব্য।—

শেখ ফাজ্‌লল করিম প্রণীত। রেয়াজুল্‌ ইস্‌লাম প্রেস। মূল্য ১৲ টাকা। এই কাব্যে ইস্‌লামধর্ম্মেতিহাসের কিয়দংশ বর্ণিত হইয়াছে। অনেক স্থলে বেশ সৌন্দর্য্যও ফুটিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে মুসলমান কবির শক্তি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

৩৮। দশানন বধ মহাকাব্য।

শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী প্রণীত। সংস্কৃত যন্ত্র। মূল্য ৫৲ টাকা। নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দ এবং গ্রন্থকারের স্বরচিত আর এক কুড়ি নূতন ছন্দে এই কাব্য রচিত। ইহা মেঘনাদ বধ কাব্যের পরিশিষ্ট। বঙ্কিমের তিন চারি খানি পরিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের পরিশিষ্ট এতকাল বাকী ছিল। এইবার লস্কর মহাশয় তাহা শুরু করিয়াছেন।

এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষায় অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু করিলে কি হইবে, রচনা এত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে যে, সাধারণের নিকট আদর পাইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

ও নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্র ছাড়া অন্যত্র এই পুস্তক পঠিত হইলে আমরা অবশ্য বিস্মিত হইব।

৩৯। **শিশুপাল-বধ।**—বঙ্গানুবাদ। প্রথম ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকে মাত্র প্রথম দুই সর্গের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুবংশের অনুবাদে নবীন বাবু যশস্বী হইয়াছেন। এ অনুবাদও সুন্দর হইয়াছে।

৪০। **হিন্দুধর্ম্ম।**—প্রথম ভাগ। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত। নিউ-ব্রিটেনিয়া প্রেস। মূল্য।০ আনা। এই পুস্তকে মন্বাদিশাস্ত্র হইতে নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট হিতোপদেশ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৪১। **ত্রিসমন্বয়-ঘনামৃতের অনুবাদ পরিণাম বা শ্রীচৈতন্য-চরিত।** শ্রীকালীহর বসু প্রণীত। স্যমন্তক প্রেস্‌. ঢাকা। মূল্য ৵০ আনা। আমরা স্বীকার করি, পুস্তকের প্রথম নামটার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

৪২। **তত্ত্বজ্ঞানতরঙ্গিণী।** ৺দ্বারকা নাথ তালুকদার তন্ত্রবাগীশ প্রণীত। প্রথম খণ্ড। মঙ্গলগঞ্জ-মিশন্-প্রেস্। এই পুস্তকে কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ক কতকগুলি শাস্ত্রবচন সংগৃহীত হইয়াছে।

৪৩। **কুসুম-চরিত।**—শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। আশুতোষ যন্ত্র, ঢাকা। লেখক হাজারীবাগ স্কুলের হেড মাষ্টার। পুস্তকে তাঁহার পরলোকগত একমাত্র সন্তান, জীবনের এক লক্ষ্য, পঞ্চদশবর্ষ-বর্ষীয়া কুসুমকামিনীর অপূর্ব্ব জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে চক্ষের জলে ভাসিয়াছি। "কুসুম আড়াই বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করে। কেমন করিয়া তাহার লেখা পড়ার জ্ঞান হইল, আমরা বুঝিতে পারি নাই। সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখে। শৈশব হইতে ধর্ম্মে মতি, বুদ্ধির প্রখরতা, সত্যনিষ্ঠা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা, নম্রতা, মধুর ভাষা, দয়া, পরকে আপন করিবার ক্ষমতা, …"! এই পুস্তকের পত্রে পত্রে তার প্রমাণ আছে। মৃত্যুকালে কুসুম শ্বশুরালয়ে ছিল, স্বামী যোগেশ তখন প্রবাসে। শ্বশুরের অনুমতি হয় নাই বলিয়াই আর কোনও ডাক্তার কবিরাজ ডাকা হয় নাই, গ্রামের ভীমা নাপিতই চিকিৎসা করিয়াছিল। "যোগেশের হস্তে কুসুমকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। সে তখন ভাগলপুর কলেজে পড়ে এবং হয়ত কুসুমের ব্যারাম সম্বন্ধে কিছুই জানিত না এবং জানিলেও পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত বাড়ী যাইতে পারিত না এবং বাড়ী থাকিলেও বোধ হয় লজ্জাবশতঃ কুসুমের শুশ্রূষা করিতে পারিত না।" বারো বৎসর বয়সে কুসুম লিখিয়াছিল—

আমি কে যে জগতের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি,
তোমার জগত তুমি যাহা ইচ্ছা কর হরি।

হায় হায়! এ দেশে মেয়ে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে কেন?

৪৪। **সরল বেদান্তদর্শন।**—শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্ প্রণীত। বুধোদয় যন্ত্র, চুঁচুড়া। মূল্য ১।০ আনা। এই গ্রন্থে বেদান্তের চতুঃসূত্রী অর্থাৎ প্রথম চারিটী ব্রহ্মসূত্র প্রাঞ্জল মধুর ভাষায় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যের শুধু অনুবাদিনী নয়, অপিচ বহুগুণে পুষ্টিবর্দ্ধিনী। ভাষ্যধৃত প্রায় সমস্ত শ্রুতিই তাহাতে অতি বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। তা ছাড়া আরও অনেক শ্রুতিস্মৃতি গ্রন্থকার নিজে ধরিয়া দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মযোগ, উপাসনাতত্ত্ব, এবং উপাসনার প্রসঙ্গে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ বিরাট্ প্রভৃতি দেবতাতত্ত্বও পাণ্ডিত্যের সহিত বুঝাইয়াছেন। চতুঃসূত্রীর ভাষ্যেই বেদান্তদর্শনের নিখিল তাৎপর্য্য নিহিত আছে। অতএব এ গ্রন্থে সাধারণ পাঠকের পরমোপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে আর এক দিকে আজকালকার এই সকল গ্রন্থে প্রায়ই যে অভাব দেখিতে পাই,

ইহাতেও তাহা বিদ্যমান। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে যে সকল দার্শনিক বাধা আছে, এ গ্রন্থে তার সমাধান নাই। ব্যবহারদশায় শঙ্করও হেগেলেরই মত ভেদাভেদবাদী—জ্ঞেয় জ্ঞাতা পরস্পর বিভিন্ন, আবার ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, কেন না জ্ঞেয় জ্ঞাতা পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু পরমার্থদশায় শাঙ্করদর্শন, অনেকটা শেলিঙ্গের পূর্ব্ব মতের মতন, নির্ব্বিশেষবাদী—এক অদ্বিতীয় সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য ব্রহ্ম, Indifference and Identity. এ দুই বিরুদ্ধ দশার সংযোজন-সেতু কই? মায়াবাদ কি এ সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান? নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতেরই বা প্রমাণ কি? সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধির দ্বারা তার কি এবং কতটা প্রমাণ হয়? পঞ্চদশীকার বলেন, সুষুপ্তিকালেও তৎকালীন অজ্ঞান ও আনন্দের বোধ থাকে। ৩৬ পৃঃ সুরেশ বাবুও প্রশ্নোপনিষদের অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, "তখন জীবের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বীজভাবে বিলীন হওয়ায় কেবল একমাত্র স্বপ্রকাশ আনন্দ আত্মা জীব কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, এবং জীব প্রতিবন্ধশূন্য পূর্ণানন্দ ভোগ করেন।" অনুভাব্য অনুভাবক এবং ভোগ্য ভোক্তা যখন আছে, তখন সুষুপ্তিতেও ত্রিপুটী বর্ত্তমান। তবে আর সুষুপ্তি নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতের প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত হইবে কিরূপে? বেদান্তে এ সকল হইতে গুরুতর সমস্যা আর নাই। বেদান্তবাগীশদের দ্বারা ইহাদের মীমাংসা হইবে, এমন দুরাশা করি না। কিন্তু সুরেশ বাবুর কাছে আশা করিতে পারি।

৪৫। শান্তিলতা।—শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ভিক্টোরিয়া প্রেস। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি উপন্যাস। উপন্যাসের প্লট বা চরিত্র সৃষ্টিতে কোনও কৃতিত্বের পরিচয় নাই। যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে, তাহাতেও কোনও নূতনত্ব নাই। এরূপ সামাজিক উপন্যাসের এখন আর এদেশে অভাব নাই। বালবিধবার বিবাহ দেওয়া উচিত, কন্যা স্বয়ংবরা হইলে আর তাকে অন্য বরে বিবাহ দিতে চেষ্টা করা উচিত নয়, করিলে মহানর্থ ঘটে—এই সংস্কারপরাঙ্মুখ দেশেও এ সকল উপদেশ এখন কিছু তেতো হইয়াছে। উপন্যাসে ভরিয়া আর সেগুলিকে তেতো করিবার প্রয়োজন ছিল না। উপন্যাসও কাব্য, বিধবাবিবাহাদি বিষয়ক প্রস্তাব নয়। সামাজিক উপন্যাস-লেখকেরা এ কথাটা একটু মনে রাখিলে সাহিত্যের উপকার হইত। শান্তিলতার ভাষা কিন্তু বড় বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম, কদাচিৎ সংস্কৃতিমন্থরা হইলেও তরস্বিনী।

৪৬। উড়িষ্যার চিত্র।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। ভারত-মিহির প্রেস্। মূল্য ১।৹ আনা। উড়ে মেড়া বল আর যাই বল, সে মেড়া না থাকিলে কিন্তু এই কলিকাতা রসাতলে যাইত। উড়ে বেহারা, উড়ে বেয়ারা, উড়ে মালী, উড়ে প্লম্বর—উড়ে যে কলিকাতার সর্ব্বস্ব। উড়ে খান্‌সামা না থাকিলে সুবর্ণবণিকের সংসার ডুবিত। উড়ে মুটিয়া না থাকিলে বড়বাজারের বাণিজ্য বিগড়াইত। উড়ে পাচকের প্রসাদাৎ এখন দেশেও হবিষ্যান্ন লুপ্তপ্রায়। উড়ে ধোপার ইন্দ্রজালে বাঙ্গালীও এখন তিন দিনে কাপড় ছাড়ে। এই চৈত্রের রৌদ্রেও উড়ে ভোমরা পল্লী পল্লী ঘুরিয়া ছানা আহরণ করে, তাই নিদাঘসন্ধ্যায় বউবাজারের সন্দেশ খাইতে পাও। নদের চাঁদের সঙ্গে রগুয়া ছিল, তাই লীলাবতী আজিও জীবিত। উড়ে মালী আছে বলিয়াই অনেক রসজ্ঞ কৃষ্ণকান্তের উইল পাঠ করেন। উড়ে না হইলে এখনও থিয়েটারে নাটক জমে না। "উড়িষ্যার চিত্র" এ হেন উড়ে ধনের রাজতরঙ্গিণী। পাঠক! এমন জিনিস কিনিয়া দেখিবে না তো দেখিবে কি?

উপন্যাসের নমুনায় সাজান হইলেও "উড়িষ্যার চিত্র" বস্তুতঃ কতকগুলি বিশ্লিষ্ট বিচিত্র লোকচরিত্রের সংগ্রহ ছাড়া আর কিছু নহে। মণিনায়ক, পঙ্কজসাহু, বীরভদ্র

মর্দ্দরাজ, বাবাজী নরোত্তমদাস, কিল্লা কনকপুর—ইহার প্রত্যেক চিত্রই সম্পূর্ণ, কোনটার স্ফূর্ত্তি অপর কোনটার তেমন অপেক্ষা রাখে না। অন্ততঃ বীরভদ্রের সহিত কনকপুরের সম্বন্ধ ঠিক্ এইরূপ। উপন্যাসসূত্রে এ সকলের সংগ্রথন আকস্মিক মাত্র। তবে উপন্যাসে এই হইয়াছে যে, উড়িষ্যার আচার ব্যবহার, রীতি নীতির কতকগুলি একঘেয়ে বর্ণনা পাঠ করিয়া হৃদয়ে সে গুলি মুদ্রিত করিতে আর যেটুকু পাঠককে করিয়া লইতে হইত, উপন্যাসে যতীন্দ্র বাবু আগে হইতে সেটুকু করিয়া দিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু পাঠকের কল্পনা বাঁচাইয়াছেন। উপন্যাসের কেলিডস্কোপে 'রজা' হইতে চাষা পর্য্যন্ত রঙ্গ বরঙ্গ উৎকল-সমাজ মিশামিশি হইয়া চক্ষের উপর ভাসিতেছে! এই হিসাবেই উপন্যাস সফল হইয়াছে, বলিতে পারি। নচেৎ কলাংশে বা যথার্থ উপন্যাসের হিসাবে ইহার কোনও মূল্য নাই। যতীন্দ্র বাবুও বোধ হয় সে দাবী করিবেন না। পক্ষান্তরে, একটা অচেনা বা আধ-চেনা সমাজের বুক চিঁড়িয়া সব দেখাইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ চিত্রের মূল্য অপরিসীম। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার বহিঃপ্রকৃতিও এখানে সেখানে জাগিতেছে। কত পাহাড়, কত মন্দির, কত পক্ষী, কত বন! কত শালবন, কত আমের বন, কত তালের বন! কত তেঁতুল কাঁটাল বকুলের গাছ! এ দেশে যার একটা দেখিতে পাই না, কত সেই পুন্নাগ (উড়ের 'পুনাঙ্গ') বা নাগকেশরের গাছ! দুই একটী চিত্রে বড় ঠিক্ রঙ্গ ফলিয়াছে। পাঠক ৫,৮, ও ১৬৬ পৃঃ দেখিবেন। কিন্তু অনেক স্থানে স্থানীয় রঙ্গ লাগে নাই, তাই সে সকল চিত্র কিছু কৃত্রিম, কিছু "মুখস্থ" রকমের ঠেকে। ৮ ও ১৯৭ পৃঃ কোকিলে একটু বঙ্কিমের গন্ধও পাইয়াছি। সমাজের সব দেখাইয়াছেন বলিয়াছি, কিন্তু তারও মাঝে মাঝে ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। যে উড়িষ্যার মঠের বিবরণে শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ মঠচতুষ্টয়ের অন্যতম পুরীর গোবর্দ্ধনমঠের উল্লেখ নাই, সে বিবরণ অকিঞ্চিৎকর। পুরীতে রামানুজসম্প্রদায়েরও নাকি এক মঠ আছে। এই সকল ভারতবিখ্যাত মঠের সন্ন্যাসীদিগের নিত্যকৃত্য কি, চরিত্র ও বিদ্যা কিরূপ, কোন্ মঠে কোন্ কোন্ গ্রন্থের পঠন পাঠনা হয়, কোন মঠের পুস্তকসংগ্রহ কিরূপ--এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে অপ্রাসঙ্গিক হইত না, অথচ গ্রন্থের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইত। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ সমাজ সম্বন্ধেও যতীন্দ্র বাবুর চিত্র অসম্পূর্ণ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সংস্কৃতচর্চ্চার প্রচলন কিরূপ, কোন্ কোন্ ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি-নিবন্ধ ও দর্শন অধীত হয়, বাঙ্গালার মত উৎকলেও কি বেদবিদ্যা বিলুপ্ত, যথার্থ পণ্ডিতের সংখ্যা কিরূপ, কোন্ কোন্ স্থান সংস্কৃত বিদ্যার প্রসিদ্ধ স্থান—"উড়িষ্যার চিত্রে" এ কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। অথচ, জানা থাকিলে, শিখণ্ডিপুরের রাজপণ্ডিতের প্রসঙ্গে এ সকল খবর সুকৌশলে সন্নিবেশিত হইতে পারিত। কিন্তু এমন এক আধটুকু ত্রুটি কোন্ গ্রন্থের নাই?

৪৭। মোহিনী-উপন্যাস।—

শ্রীরাধা নাথ মিত্র প্রণীত। ফাইন্ আর্ট প্রিণ্টিং সেণ্ডিকেট্। মূল্য ১্ টাকা। এক নির্ম্মলমতি যুবা গৃহশূন্য হইয়া দলে মিশেন। বেশ্যাটার নাম মোহিনী। পরে—যেমন হইয়া থাকে—আবার যুবার চিত্ত শুধরাইয়া যায়। মোহিনীও একেবারে তপস্বিনী হইয়া উঠে—কাহারও হাসি ঠাট্টা গ্রাহ্য করে না। উপন্যাসের আদ্যন্ত মধ্য এইরূপ মধুময়। মাঝামাঝি একটু কৃষ্ণকান্তের উইলের শ্রাদ্ধ এবং সর্ব্বত্র 'বসুজা মহাশয়' 'সাবকাশ' প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে।

৪৮। আকাশ-গঙ্গা। উপন্যাস।

হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক পরিব্রাজক শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত। হিন্দু সৎকর্ম্ম মালা প্রেস্, বরাহনগর। মূল্য ১॥০ টাকা। লেখক বেশ বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, কিন্তু উপন্যাস না লিখিয়া আর যা কিছু হয় লিখিলে পারিতেন। মসলার কোনও ত্রুটি নাই—লম্বা লম্বা রূপ বর্ণন, ততোধিক লম্বা স্থানে অস্থানে স্বভাব বর্ণন, রসিকতা, হিন্দুয়ানী,

দেশী বিলাতী কবি ও দার্শনিকদিগের নামের ফর্দ্দ, রাজপুত্র, রাজকন্যা, হরেক রকমের Historical allusion, নিধু টপ্পা, তুরীয় ব্রহ্ম, পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্র যে বাস্তবিক আছে তার প্রমাণ, মেয়েলী ছড়া, সকল জিনিসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সম্ভোগ, বিরহ, "Mad scene"—এই ৪০৪ পাতার পুস্তকে কোনও মসলার অভাব নাই। তবু কিন্তু উপন্যাসখানা ভাল হয় নাই। এ সকল অদৃষ্টে ঘটে।

৪৯। পারিবারিক জীবন।—শ্রীপ্রসন্নতারা গুপ্ত প্রণীত। কুন্তলীন-প্রেস্। মূল্য ১৷৷০ টাকা। পুস্তক খানির কাগজ, ছাপা, ও বাঁধাই বড় মনোহর। লেখিকার লিখিবার শক্তিও আছে। সকল প্রবন্ধের সকল সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও, অনেক প্রবন্ধে এমন অনেক উৎকৃষ্ট কথা আছে, যাহাতে কোনও সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকিতে পারে না। পুস্তকের আদিতে চন্দ্রনাথ বাবু এক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা না থাকিলেই ভাল হইত।

৫০। বিক্রমোর্ব্বশী। শ্রীবিহারী লাল রায়, বি-এ অনুবাদিত। সাথী প্রেস্। মূল্য ৷৷০ আনা। অনুবাদ সর্ব্বত্র অবিকল না হইলেও অনেক স্থল আমাদের কাছে বেশ মধুর লাগিয়াছে। অনুবাদকের কবিত্ব শক্তি আছে।

৫১। *The Map of India* from the Buddhist to the British period (with 6 maps). An open letter to Lord Curzon by Prithwis Chandra Ray. বঙ্গের প্রস্তাবিত অঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে লেখক প্রাচীন কাল হইতে ভারতের রাজনৈতিক বিভাগ সমূহের পরিবর্ত্তন বিবৃত করতঃ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম পাঁচ খানি মানচিত্রে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, শেষ খানিতে লেখকের মতে কিরূপে নূতন প্রদেশ সমূহ সংগঠিত হওয়া উচিত, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন মৈমনসিংহে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, যাহাতে দেশে অধিকতর সুশাসন হয়, সেই লক্ষ্য রাখিয়া যদি প্রস্তাবিত সীমা পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কোন নূতন যুক্তি প্রদর্শন করা যায়, তবেই গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের এখনও প্রতিবাদ হইতে পারে। তাই পৃথ্বীশ বাবুর এই উদ্যম। পৃথ্বীশ বাবু গোয়ালপাড়া ও কামরূপকে বাঙ্গালার সহিত রাখিতে চান, কারণ এই প্রদেশের লোকের সহিত বাঙ্গালীর অনেক সাদৃশ আছে। বেহারকে বেনারস প্রভৃতির সহিত একত্র করিতে চান—অনেক বেহারীরও সেইরূপ ইচ্ছা। উড়িষ্যাকে মধ্য ভারতের সহিত মিলাইতে চান। চট্টগ্রাম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আকিয়াবকে আসামের সহিত গাঁথিতে চান,—এটী বড় সুব্যবস্থা নয়। পৃথ্বীশ বাবুর ভাষা ভাল এবং তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রামাণ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া পত্রের কলেবর অকারণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। লোক সংখ্যা অস্থায়ী বলিয়া লোক সংখ্যার বিচার না করিয়া প্রদেশ বিভাগ পৃথ্বীশ বাবু কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন, বুঝিলাম না। রাজনৈতিক বিভাগে লোকসংখ্যা একটী প্রধান বিবেচ্য বিষয়। লোক সংখ্যার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিভাগ ও বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের মেম্বরদিগের নির্ব্বাচন বিধির পুনঃ পুনঃ সংস্কার দেখিলেই তাহা সহজে বোধগম্য হয়। পৃথ্বীশ বাবু রামায়ণ ও মহাভারতকে ভৌগোলিক বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়াছেন কিন্তু "পুরাণ" গুলিকে এক কথায় উড়াইয়া দিয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত না হইলেও রামায়ণ ও মহাভারত কি পুরাণ নয়? এইরূপ অনেক বাদ দিলেও এই পত্র বা পুস্তিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

৫২। সচিত্র কবিতা-কোরক। শ্রীরমেশচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত। মূল্য ।০ ভাষায় সরলতা আছে, কিন্তু এ কোরকগুলি গ্রন্থকার অকালে ছিঁড়িয়া বাজারে, বাহির না করিয়া স্বীয় উদ্যানে রাখিয়া দিলেই ভাল করিতেন।